প্রকাশনা-তথ্য

গ্রন্থের নাম : **"শ্রীমন্ত-বাটে পাদ্রীশিবপুর ঃ ঐতিহ্যবাহী একটি খ্রিস্টান জনপদ"**

গ্রন্থণায় : প্রধান সম্পাদক ও লেখক ঃ **কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি**
সহ-সম্পাদক ও লেখক ঃ **যোসেফ ডি'রোজারিও**
সহ-সম্পাদক ও লেখক ঃ **ড. মেরী মনিকা গোমেজ**

সম্পাদনা কমিটি: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, যোসেফ ডি'রোজারিও, ড. মেরী মনিকা গোমেজ, জেমস গোমেজ, শ্যামল লরেন্স গোমেজ, বার্নার্ড পঙ্কজ ডি'রোজারিও, যোয়ান্না রীনা গোমেজ ও ইভন ছিলু ডি'রোজারিও।

বর্ণবিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা : জেমস গোমেজ ও রোজ আভা গুডা

প্রকাশনা ও অর্থায়নে : শ্যামল লরেন্স গোমেজ

মুদ্রণ সহযোগিতায় : জেমস গোমেজ, কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি, শ্যামল লরেন্স গোমেজ ও বার্নার্ড পঙ্কজ ডি'রোজারিও

স্বত্বাধিকার : কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি.

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ২৫, ২০২৪ খ্রি.
২০২৫ পুণ্যবর্ষের উদ্বোধন,
পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ-প্রতিষ্ঠার ২৬০তম বর্ষপূর্তি

মুদ্রণে : millennium
COMPUTER & PRINTERS
Chattogram-Dhaka | **Hello : 01711-103895**
E-mail : millennium.pradip@gmail.com

ম্যাপ, চিত্র ও প্রচ্ছদ: সার্বিক দায়িত্বে: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও ও জেমস গোমেজ; ডিজিটাল ম্যাপ: প্রকৌ. অলিভার জেড়ান্ড গুডা; ব্যাক কভার, চিত্র ও ম্যাপ: কিরিট সেবাস্তিন গোমেজ, মি. ফরহাদ মজুমদার ফাহিম, জেরমি ট্রয় গোমেজ; কভার প্রচ্ছদ: মাহবুব রহমান – সহযোগিতায়: আলবার্ট প্রশান্ত গোমেজ।

আই.এস.বি.এন : ৯৭৮-৯৮৪-৩৬-০৮০৩-১

শুভেচ্ছামূল্য : ৩০০ টাকা

ওয়েব পেইজ : cardinal-porompora.com

প্রাপ্তিস্থান : মি: শ্যামল লরেন্স গোমেজ
ঢাকা: House-77, Flat-B/2, Monipuripara, Tejgaon, Dhaka 1215
পাদ্রীশিবপুর: Albina Abash, House No. 2528, Ward No. 04, Padrishibpur, Barishal 8282.

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি
মরো হাউজ, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা।

শ্রীমন্ত–বাটে পাদ্রীশিবপুর

ঐতিহ্যবাহী একটি খ্রিস্টান জনপদ



লেখক

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

যোসেফ ডি'রোজারিও

ড. মেরী মনিকা গোমেজ





সম্পাদনা কমিটি

প্রধান সম্পাদক ও লেখক ঃ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি, সহ-সম্পাদক ও লেখক ঃ যোসেফ ডি'রোজারিও, সহ-সম্পাদক ও লেখক ঃ ড. মেরী মনিকা গোমেজ, মি. জেমস গোমেজ, মি. শ্যামল লরেন্স গোমেজ, মি. বার্নার্ড পঙ্কজ ডি'রোজারিও, মিসেস যোয়ান্না রীনা গোমেজ এবং মিসেস ইভন ছিলু ডি'রোজারিও

শ্রীমন্ত-বাটে পাদ্রীশিবপুর
ঐতিহ্যবাহী একটি খ্রিস্টান জনপদ

উপস্থাপনা ঃ পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও
বরিশাল কাথলিক মণ্ডলীর বিশপ

ইতিহাস, স্থান-কাল-পাত্রের মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া, অতীত ঘটনার কথা বলে। সূচনার কথা, অস্তিত্বের কথা, প্রভাব ও বিস্তারের ইতিকথা তুলে ধরে। সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভের জন্য গভীর মনোযোগ সহকারে তা অধ্যয়ন করতে হয়। অতীত সম্পর্কিত লব্ধ জ্ঞান বর্তমানকে সুস্পষ্টরূপে বুঝতে সহায়তা করে এবং একটি সুন্দর, সুনিশ্চিত ও সমৃদ্ধময় ভবিষ্যতের জন্য বর্তমান প্রজন্মকে প্রস্তুত করে। বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা, পরিপূর্ণ ও প্রকৃত ঘটনা সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে স্মরণীয় ক'রে তুলে ধরার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হল ইতিহাস লিপিবদ্ধকরণ। সেই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি, স্ব-উদ্যোগী হয়ে, তাঁর সহ-লেখকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পাদ্রীশিবপুর ঐতিহ্যবাহী খ্রিস্টান জনপদের ইতিবৃত্ত তু'লে ধরেছেন "শ্রীমন্ত-বাটে পাদ্রীশিবপুর ঃ ঐতিহ্যবাহী একটি খ্রিস্টান জনপদ" নামক পুস্তকে।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি, একজন বিশিষ্ট লেখক, চিন্তাশীল শিক্ষাবিদ, বিশ্লেষক ও গবেষক। পাদ্রীশিবপুর তাঁর জন্মস্থান বিধায় সেখানকার অবস্থা, বাস্তবতা ও মানুষ সম্পর্কে তাঁর রয়েছে বিস্তর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। তথাপি দেশে বিদেশে অবস্থানরত পাদ্রীশিবপুরের আরও দু'জন বিশিষ্ট-লেখকদের সহযোগিতায় ও চিন্তাশীল এবং অনুসন্ধানী সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাঁদের লেখনীতে তুলে ধরেছেন পাদ্রীশিবপুরের ভৌগোলিক অবস্থা, বাস্তবতা ও বিবর্তনের কথা। সেখানকার জনমানুষের মানবিক, সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক অবস্থার চিত্র। ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সঙ্গীতশিল্প, ক্রীড়া, ধর্ম-বিশ্বাস ও সামাজিক মূল্যবোধসহ মানুষের আচরণিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং বিভিন্ন ব্যক্তি, গির্জা, স্থান, প্রতিষ্ঠান, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, স্মৃতিসৌধ, ইত্যাদির ঐতিহ্যগত কিছু ছবিও স্থান পেয়েছে এই পুস্তকে।

আরও উল্লেখ করা হয়েছে পাদ্রীশিবপুর এলাকায় প্রথম খ্রিস্টবিশ্বাসের বীজ বপন করা ও বিভিন্ন সেবাকার্যক্রম পরিচালনার আদিকথা। সেই বীজ অঙ্কুরিত হওয়া, বৃদ্ধি, বিস্তার ও ফলপ্রসূতার ধারাবাহিকতায় বিশ্বাস বিস্তার ও খ্রিস্টভক্তদের আধ্যাত্মিক ও পালকীয় যত্নের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লী। পর্যায়ক্রমে এর শাখা-প্রশাখা বিস্তারলাভ করে বিভিন্ন কেন্দ্র-উপকেন্দ্রে। ধর্মীয় জীবনাহ্বানে সাড়াদান এবং সন্ন্যাস-সংঘের আবির্ভাবের কথাও বাদ পরেনি। তাছাড়াও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কথা। এগুলোর মধ্য দিয়ে মানুষের সমন্বিত ও সামগ্রিক

বিকাশ ও গঠনের লক্ষ্যে শুরু হয় শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যসেবা, গৃহায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম, যাতে এখানকার মানুষ প্রকৃত মানবসম্পদ হিসাবে গড়ে উঠে এবং স্থানীয় মণ্ডলী, দেশ ও জাতি গঠনে দায়িত্বশীল ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই মহৎ উদ্যোগ ও আন্তরিক প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়নি। সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দায়িত্ববোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্থানীয় মণ্ডলী গঠন ও মণ্ডলীতে নেতৃত্বদানে যেমন, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও তেমনি অনেকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন এবং স্বীকৃতিও পেয়েছেন। তাদের অনন্য অবদানের তথ্যও সন্নিবেশিত রয়েছে পুস্তকটিতে যা সকলের জন্যই অনুপ্রেরণার উৎস হবে।

অধিকন্তু, পাদ্রীশিবপুরে মঙ্গলবাণী প্রচার, ধর্মপল্লী প্রতিষ্ঠা এবং তৎপরবর্তীকাল থেকে অদ্যাবধি যেসকল মিশনারি, ধর্মপাল ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এই স্থানীয় মণ্ডলীতে পরিচালনা, প্রশাসনিক ও পালকীয় সেবাকাজে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে সেবাদান করেছেন তাদের কথা ক্রমানুসারে ও পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। স্থানীয় মণ্ডলীর জন্য তাঁদের ভাবনা, চিন্তা, দর্শন ও পালকীয় কার্যক্রমে অগ্রাধিকারসমূহ সুনিপুনভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এতে একদিকে যেমন রয়েছে তাঁদের কাজের স্বীকৃতি, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে মণ্ডলীতে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের প্রতি অন্তরের কৃতজ্ঞতাবোধ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি তাঁদের যে পক্ষপাতহীন ভালবাসা এবং মানুষের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা, বাস্তবধর্মী উদ্যোগ ও আত্মত্যাগ তা সকল মানুষের কাছেই অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

লেখকগণ ও সম্পাদকগণ তাদের লেখনীর শিল্পনৈপুণ্য দিয়ে প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে ত্রয়োদশ বিভাগে বিভক্ত করে অত্যন্ত সচেতন, সুনিপুণ, যৌক্তিক ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করেছেন। প্রথম দশটি ভাগে রয়েছে মূল বিষয়টির উপর বিশদ আলোচনা। একাদশ ভাগে রয়েছে উপসংহার যেখানে লেখকগণ পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীকে নিয়ে তাদের কিছু ভবিষ্যৎ প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেছেন। দ্বাদশ ভাগে পরিসংখ্যান-তথ্য ও পাদ্রীশিবপুর-নিবাসী ও পাদ্রীশিবপুর-অভিবাসীদের সাথে আলোচনার ফলাফল লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। ত্রয়োদশ ভাগে পরিশিষ্টে রয়েছে কয়েকটি বংশ-তালিকা ও তথ্যপঞ্জি। আর পাঠকের জন্য লেখকদের এই গবেষণার খুঁটিনাটি তথ্য-উপাত্ত বিস্তারিতভাবে প্রদানের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি তাঁরা। অতীতের অভিজ্ঞতা ও গবেষেণালব্ধ জ্ঞান নিয়ে বর্তমান বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে লেখকগণ ভবিষ্যতের জন্য কিছু প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন যা নিঃসন্দেহে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ভাবনা-চিন্তা, প্রস্তুতি ও সামনে এগিয়ে চলার পথে দিকদর্শন হিসাবে কাজ করবে।

পুস্তকটি সুপাঠ্য, তথ্যসম্বলিত এবং প্রেরণাদায়ক। গবেষণাধর্মী বিধায় এই পুস্তকটি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে চিরস্মরণীয় ও জ্ঞান-ভাণ্ডার-সমৃদ্ধ একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দলিল এবং প্রামাণ্য ঐতিহ্য হয়ে থাকবে।

প্রাক-কথন: প্রধান লেখক ও সম্পাদক
কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

"শ্রীমন্ত-বাটে পাদ্রীশিবপুর ঃ ঐতিহ্যবাহী একটি খ্রিস্টান জনপদ" – এই শিরোনামের মধ্যে নিহিত রয়েছে গবেষণামূলক এই গ্রন্থটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

গ্রন্থের সূচনায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের একটি গানের কলি স্মরণ করছি: "যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে; আমি বাইবো না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে"। যদিও কবিতা ও কলিটির ভাব ভিন্ন। তথাপি শব্দগুলোর চয়ন আরেকটি ভাব আমাদের মধ্যে জাগ্রত করছে যা আমাদের গ্রন্থটির জন্য প্রাসঙ্গিক বলে মনে করছি। আভিধানিক অর্থে: "শ্রীমন্ত" হচ্ছে "সৌভাগ্যবান বা সম্পত্তিশালী" এবং "বাট" হচ্ছে "পথ বা রাস্তা"।

অতএব "শ্রীমন্ত" নদীটি বড়োই ভাগ্যবান ও সম্পত্তিশালী। শ্রীমন্ত "বাট" বা পথ ধরে ২৬০ বছরেরও অধিক বছর পূর্বে পর্তুগীজ বণিকদের আনাগোনা ছিল। এই পথ বেয়ে আদি খ্রিস্টান বাসিন্দারা এবং খ্রিস্টান মিশনারিরা শিবপুরে এসেছিলেন। এই শ্রীমন্ত-বাটে কত নৌকা আর বিখ্যাত সেই জলযান "গয়না-তরী" যুগ যুগ ধরে শ্রীমন্ত ঘাটে "আনাগোনা" করেছে এবং চলেছে মানুষের যোগাযোগ ও পথচলা। এখানে হয়েছে অনেক "বেচা কেনা", "লেনা দেনা"! এই অববাহিকার অতীত ইতিহাসের স্রোতধারা এবং তরীবাট বয়ে নিয়ে এসেছে অনেক মানুষ, তাকে ঘিরে সৃস্টি হয়েছে মানুষ ও তার ধর্ম, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মিলনমোহনা; প্রবাহিত হয়েছে মানুষের মধ্যে অনেক উন্নয়নধারা। অসংখ্য মানুষ রেখে গেছে তাদের "পায়ের চিহ্ন এই বাটে"। তাই "শ্রীমন্ত" বড়োই সৌভাগ্যবান এবং বড়োই সম্পত্তিশালী। "শ্রীমন্ত-বাটে" ও "শ্রীমন্ত নদী"র তীরে গড়ে উঠেছে "শিবপুর" গ্রামে ঐতিহ্যবাহী একটি খ্রিষ্টান জনপদ। কালে ও কালান্তরের একদিন এই খ্রিস্টীয় জনপদ নাম ধারণ করেছে "পাদ্রীশিবপুর"। ঐতিহ্যবাহী পাদ্রীশিবপুর তার ধর্মীয় ও কৃষ্টিগত, ভাষা ও সংস্কৃতিগত, শৈল্পিক স্থাপত্য ও মানবসেবার ঔজ্জ্বল্য এবং মানবোন্নয়নের নিদর্শন হয়ে মাথা উঁচু করে যুগ-যুগান্তরে দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্তা ও সমৃদ্ধিতে।[১]

প্রেরণা ও ধারণার কথন

২০২৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের একটি শুভদিনে, প্রার্থনা-গৃহে বসে, জীবনের আশিতম বর্ষপূর্তির অপেক্ষায় প্রার্থনায় যখন মগ্ন ছিলাম তখন মনে একটি ধ্যান আসল: যে মৃত্তিকায় আমার জন্ম হয়েছিল সেই "পথ-প্রদর্শিকা কুমারী মারীয়া"র ধর্মপল্লীর মাতৃ-গর্ভে জীবনের সায়াহ্নে চিরতরে যদি শায়িত হতে বাসনা করি, তাহলে আমার জীবনের কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ "ধর্মপল্লীর জীবন-চরিত" ভাবনায় একটি পুস্তক রচনা হয়তো ক্ষুদ্র একটি অবদানের নিদর্শন হয়ে থাকবে। এই বিষয়টি যতোই ভাবতে লাগলাম ততই বাসনাটি প্রবল থেকে প্রবলতর হতে লাগল এবং স্বপ্নটি আরও স্বচ্ছ ও সম্ভাব্য বলে প্রতিভাত হল।

---

[১] *"বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস" পুস্তকে বলা হয়েছে যে: "শ্রীমন্তপুর খালকে শিবপুর খালও বলা হয়। এই খাল বাকরগঞ্জ ও শিবপুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত", পৃ: ৩৮৭।*

প্রথমেই আমার ভ্রাতস্পুত্র যোসেফ ডি'রোজারিও-র সাথে এই বিষয়টি নিয়ে ফোনে আলাপ করলাম। উত্তম চিন্তা বলে সায় দিল। কার্ডিনালের "জীবন-চরিত" প্রকাশনায় আমাদের দু'জনার অতীত অভিজ্ঞতাকে পূঁজি ক'রে, ভবিষ্যৎ কাজে পা বাড়ানোর সাহস আমরা উভয়েই পেলাম। পরবর্তীতে পরিকল্পিত গ্রন্থটি সম্বন্ধে একটি "ধারণাপত্র" রচনা করে কার্ডিনাল পরম্পরার কোর কমিটির সাথে শেয়ার করলাম। এই প্রস্তাবে সবাই উৎসাহী হয়ে আন্তরিক সমর্থন জানাল এবং আপন আপন জায়গা থেকে সকলেই সাহায্য-সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিল। কার্ডিনাল পরম্পরার কোর টিমের সদস্যরা হচ্ছেন: যোসেফ ডি'রোজারিও, শ্যামল লরেন্স গোমেজ, জেমস গোমেজ, রীনা যোয়ান্না ডি'রোজারিও, বার্নাড পংকজ ডি'রোজারিও, ইভন ছিলু ডি'রোজারিও। পাদ্রীশিবপুরে সরেজমিনে সকল কাজে সহায়তা করার জন্য নেওয়া হল অমল গোমেজ এবং রনি ডি'রোজারিও-কে।

প্রথম "ধারণাপত্র"-এ গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতি, সম্পাদনা কমিটির দায়িত্ব এবং ৬ টি অধ্যায় সম্বলিত একটি খসড়া প্রস্তুত করেছিলাম। যাত্রাকালে পরবর্তীতে প্রয়োজনের খাতিরে ৬ টি অধ্যায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করে গোটা গ্রন্থকে ১৩ টি ভাগে বিভক্ত করে এবং প্রতিটি ভাগে একাধিক অধ্যায় সন্নিবিষ্ট করে গ্রন্থটির পরিকল্পনা করা হল। সেই সঙ্গে সকল কাজের সময়-সীমা বেধে দেওয়া হল যাতে পরিকল্পনা মাফিক এই বিশাল কাজটি নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত ক'রে প্রকাশ করা যায়। সময়-সীমার লক্ষ্য ছিল ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস। তার কারণ পাদ্রীশিবপুরের সূচনা ও প্রথম গির্জা স্থাপনের ২৬০ বছরের পূর্তিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষের মধ্যে প্রকাশ করা।

গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য

যে-কোন প্রকল্পের কয়েকটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। এই উদ্দেশ্যগুলো প্রকল্পের লক্ষ্যকে নির্দিষ্ট রাখে, গতিকে চলমান করে এবং কর্মসকল ফলপ্রসূ করে। পরবর্তীতে নির্ধারিত উদ্দেশ্যই মূল্যায়নের মাপকাঠি হয়ে থাকে। আমরাও আমাদের গ্রন্থ-রচনার জন্য তিনটি মূল উদ্দেশ্য নির্ধারিত করেছি। এই উদ্দেশ্য সম্পাদন করাই ছিল আমাদের সকল কাজের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য দ্বারাই মূল্যায়ন করা হবে আমাদের এই প্রচেষ্টা। তবে এ কাজে কতটুকু আমরা সফল হয়েছি তা মূল্যায়ন করবে পাঠকবর্গ ও উপকারভোগীরা।

(১) পাদ্রীশিবপুরের অতীতের ইতিহাস, বর্তমানের অবস্থা ও ভবিষ্যতের প্রত্যাশা সম্পর্কে পুস্তক রচনা

এই প্রথম উদ্দেশ্য সফল করার জন্য এই গ্রন্থে রচিত হয়েছে পাদ্রীশিবপুরের একটা ইতিহাস যার বিস্তৃতি বিরাজিত অতীতে, বর্তমানে ও ভবিষ্যতের প্রত্যাশায়। প্রেক্ষাপট রূপ আলোচিত হয়েছে বৃহত্তর বাকেরগঞ্জ ও বরিশালের সম্যক পরিচিতি। এখানে রয়েছে খ্রিস্টান জনপদের গোড়াপত্তনের কথা, খ্রিস্টান জনপদের ক্রমবিবর্তনের ধারা, এবং পাদ্রীশিবপুর অধিবাসী ও অভিবাসীদের চিত্র, পরিসংখ্যান ও বিশ্লেষণ মূলক আলোচনা। কেবলমাত্র অতীতের ইতিহাস, বর্তমানের অবস্থার মধ্যে সীমিত না থেকে আমাদের মধ্যে কয়েকজন ভবিষ্যত প্রত্যাশার কথাও ব্যক্ত করেছেন।

পাদ্রীশিবপুর ঐতিহ্যবাহী ধর্মপল্লী বটে; তবে শুধু নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না। ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় মণ্ডলী হিসেবে আমাদের রয়েছে একটি মিশন-দায়িত্ব। অনেক সময় আমাদের অজান্তে বা সমসাময়িক কালে নিশ্চিন্তায় অনেক কিছু অর্জন হয়েছে যা সৃষ্টি করে গেছে যুগে যুগে ধর্মপল্লীর অবদান। এই অবদান বহুরূপী, বহুমাত্রিক এবং বহুবিস্তৃত। তাই আমরা লিপিবদ্ধ করে রেখেছি সেই সমস্ত অবদান যা খ্রিস্টান জনপদের অভ্যন্তরীণ বিষয়, সেই সমস্ত অবদান যা বৃহত্তর সমাজ ও দেশের মঙ্গল নিয়ে এসেছে এবং সেই সমস্ত অবদান যা বাংলাদেশ মণ্ডলীকে করেছে সমৃদ্ধ। এই আলোচনাও আমাদের গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

(২) পাদ্রীশিবপুরের প্রায় হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করে তা সংরক্ষণ করা

যাকিছু কালের অতল গর্ভে তলিয়ে গেছে তা যতদূর পারা যায় পুনরুদ্ধার করা এবং তা সংরক্ষিত করে রাখা ছিল আমাদের দ্বিতীয় প্রধান উদ্দেশ্য। সবকিছু পাওয়া যাবে না, উদ্ধার করাও হবেনা, আর সবকিছুর সংরক্ষণ – তা তো অসম্ভব। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা গবেষণা করেছি পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান জনগোষ্ঠির জাতিগত ও ধর্মীয় পরিচয়, তাদের ভাষা ও সঙ্গীত, তাদের বসতবাড়ি, ভূ-সম্পত্তি ও জীবনধারা; আলোচনা করা হয়েছে তাদের কৃষ্টিগত ও ধর্মীয় জীবন এবং তাদের জীবনাচরণ। এই গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে ধর্মপল্লীর অতীত ও বর্তমানের সেবাকর্ম, নিজস্ব সমাজমুখী ও বৃহত্তর সমাজমুখী সেবাপ্রতিষ্ঠান ও সেবাকর্মীদের পরিচয় – প্রয়াত ও জীবিতদের চিন্তাধারা, কর্মকীর্তি ও অবদান। সংগ্রহ ও পুনরুদ্ধার করা হয়েছে কিছু অতীতের ছবি, লিপিফলক, ব্যবহারিক দ্রব্য-সামগ্রী যা নিদর্শন হয়ে থাকবে যুগ-যুগান্তরে। ইতিহাস উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে, প্রয়াত বেশ কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তিদের লেখা, জীবন-কাহিনী ও তাদের অবদান লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পরিশেষে উদাহরণ স্বরূপ ইতিমধ্যে প্রাপ্ত কয়েকটি বংশ-তালিকা উল্লেখ করে পরিবার-পরম্পরার ঐতিহ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যাতে অভিবাসন-প্রবণ বিশ্বে অন্যেরাও যেন একই কাজে অনুপ্রাণিত হয়। এই গ্রন্থ রচনায় প্রয়াস ছিল, যা প্রায় হারিয়ে গেছে তাকে আবার উদ্ধার করা, যা সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলময় তা ধরে রাখা এবং তা সংরক্ষণ করা। চেষ্টা করা হয়েছে এই উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য; কিন্তু কতটুকু তা সফল হয়েছে তার বিচার পাঠকদের হাতে।

(৩) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শেকড়ের সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত করা।

আমরা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত নই, আমাদের আছে প্রজন্ম, প্রজন্মান্তরের প্রজন্ম। তারা আমাদেরকে কীভাবে দেখে? আমাদের সম্বন্ধে তারা কী বলে? আমরা কীভাবে তাদেরকে দেখি, আমরা তাদের জন্য কী রেখে যাব? তাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা কী? এই সব বিষয়গুলো আমাদের আলোচনায় স্বল্পাকারে হলেও স্থান পেয়েছে। শূন্য থেকে কেউ আসেনি, আমরা পরিবার-পরম্পরা, আমাদের একটা শেকড় আছে। আমরা ব্যক্তি মাত্র নাই, আমরা সমাজ, মিলন-সমাজ। অতএব এই গ্রন্থে আমাদের সকল আলোচনার মধ্যে এই ভাবটি ছিল আমাদের অতীতের ইতিহাস, আমাদের জীবনধারা, আমাদের মূল্যবোধ, প্রভৃতি প্রজন্মান্তরে প্রজন্মের মধ্যে বা আন্তঃপ্রজন্মের মধ্যে একটি গর্ব, ঐক্য, পাদ্রীশিবপুরজাত বা বংশোদ্ভূতদের মধ্যে একটা মিলন ও যোগাযোগ সৃষ্টি করবে। আমরা ভাসমান কোন জনপদ নই; আমাদের মধ্যে রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও চলমান মূল্যবোধ।

গ্রন্থের বিষয়বস্তু

আমাদের গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় নিম্নোক্ত ত্রয়োদশ ভাগে ভাগ করে উপস্থাপিত করেছি:

প্রথম ভাগ: প্রেক্ষাপট: বাকেরগঞ্জ/বরিশাল জেলা, বাকেরগঞ্জ উপজেলা ও পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়ন
দ্বিতীয় ভাগ: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের ইতিহাস অবকাঠামো ও ক্রমবিবর্তন
তৃতীয় ভাগ: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের অধিবাসী ও অভিবাসী
PART FOUR: EXTERNAL MIGRATION OF THE PADRISHIBPURIANS
পঞ্চম ভাগ: পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর ধর্ম, ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি
ষষ্ঠ ভাগ : পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ: অতীত ও বর্তমানের সেবাপ্রতিষ্ঠান
সপ্তম ভাগ: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ: বৃহত্তর জনগোষ্ঠির জন্য সেবাপ্রতিষ্ঠান
অষ্টম ভাগ: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ: বিশপ, যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী: অতীত ও বর্তমান
নবম ভাগ: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ: অতীতের প্রবন্ধ ও প্রবন্ধকার, প্রয়াত বিশেষ ব্যক্তিত্ব, অ্যালবাম ও রচনা
দশম ভাগ: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ: স্থানীয় সমাজ, দেশ ও মণ্ডলীতে অবদান
একাদশ ভাগ: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ: উপসংহার ও ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা
দ্বাদশ ভাগ: সংগৃহীত পরিসংখ্যান ও দলীয় আলোচনার ফলাফল ও তথ্যপ্রদানকারী
ত্রয়োদশ ভাগ: পরিশিষ্ট: তথ্য-সংকলন
পরিশিষ্ট -১: "রামুর পালা" – পুস্তক
পরিশিষ্ট -২: বংশ-তালিকা
পরিশিষ্ট -৩: গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র

গ্রন্থ-রচনার কর্মপদ্ধতি

১) লিখিত তথ্য সংগ্রহ করা:

* প্রথমেই আমাদের কাজ ছিল যা-কিছু লিখিত ইতিহাস বা তথ্য আছে তা সংগ্রহ করা। এই কাজটি প্রথম দিন থেকে গ্রন্থরচনার সমাপ্তি পর্যন্ত চলমান ছিল।
* পাদ্রীশিবপুর মিশনের ম্যাপ ও চিত্র, লিপিফলক ও ফটো, ঘর-বাড়ি, প্রকৃতি ও প্রতিষ্ঠান – এ গুলো আমাদের কাছে লিখিত তথ্য হিসেবে কাজ করেছে এবং যা প্রকাশ্যে কথা বলে ও সাক্ষ্যদান করে।
* দ্বাদশ ভাগ: পরিশিষ্ট-৩-এ উল্লেখ রয়েছে গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্রসমূহ।
* বংশ-তালিকায় উদ্ধৃত যারা বেঁচে আছে বা মরে গেছে তারা সবাই এই গ্রন্থে জীবিত; যারা দেশে আছে বা প্রবাসে আছে তাদেরকে নিয়ে রচিত পাদ্রীশিবপুরের জনপদ; এটা যেন একটি সংগৃহীত ও সংকলিত রচনাবলী।

২) পরিসংখ্যান সংগ্রহের জন্য জরিপ ও দলীয় আলোচনা (Focus Group Discussion = এফ.জি.ডি.)

* নানা পরিসংখ্যান সংগ্রহের জন্য পাদ্রীশিবপুরে ভিন্ন দুটো জরিপ ফরম এবং চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনার অভিবাসীদের জন্য অন্য ধরনের একটি ফর্ম ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
* তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ৬টি বিষয়ে ২৫টি প্রশ্নের মাধ্যমে দলীয় আলোচন-সভা (এফ.জি.ডি) আয়োজন করা হয় এবং পরবর্তীতে আলোচনার ফলাফল নিয়ে সার-সংক্ষেপ রচনা করা হয়।
* পাদ্রীশিবপুরবাসী জনগণের পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও তাদের মতামত জানার জন্য চারটি দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করা হয়েছে: (১) পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের দলে ৪২ জন; (২) পশ্চিমবঙ্গের পাদ্রীশিবপুরবাসীদের দলে ২২ জন; (৩) চট্টগ্রামে পাদ্রীশিবপুর অভিবাসীদের দলে ২৪ জন: (৪) ঢাকাতে পাদ্রীশিবপুর অভিবাসীদের দলে ১৮ জন: (৫) খুলনাতে পাদ্রীশিবপুর অভিবাসীদের দলে ৩ জন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রতিটি দলের সঙ্গে ছিলেন গ্রন্থ-সম্পাদক কমিটির ৭ জন সদস্য। তাদের সবার নাম দ্বাদশ ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে।
* যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সকল জরিপ ও এফ.জি.ডি আলোচনা পরিচালনায় প্রধান ছিলেন ড. মেরী মনিকা গোমেজ এবং সহযোগিতায় ছিলেন জেরী বেসিল গোমেজ। এই গ্রন্থের চতুর্থ ভাগের জন্য ড. মেরী মনিকা গোমেজ প্রধান পরিচালিকা, সম্পাদিকা ও ইংরেজী লেখিকা ছিলেন এবং তিনি যাদের (প্রায় ৫০ জন) সহায়তা নিয়েছেন তাদেরকে তিনি ইংরেজী ভাষায় লেখা প্রাক-কথনে (FOREWORD) উল্লেখ করেছেন।
* এটা লক্ষ্য করা যায় যে, জরিপে এবং দলগত আলোচনায় সর্বমোট ১৭০ জন সক্রিয়ভাবে মতামত ব্যক্ত করে অংশগ্রহণ করেছেন।
* এই গ্রন্থে জরিপের পরিসংখ্যান ও আলোচনার ফলাফল, আংশিক ভাবে তৃতীয় ভাগে, চতুর্থ ভাগে এবং দ্বাদশ ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩) প্রবন্ধ সংকলন ও সাক্ষাৎকার:

* গ্রন্থের বিষয়বস্তু যেন তার নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে তার জন্য বিগত দিনের অনেকের ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ লেখা, হয় পুরোটা নয়তো কিছু সম্পাদনা করে এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তারাও যেন এই গ্রন্থের লেখক। জীবিত না থেকেও এই গ্রন্থের মাধ্যমে তারা তাদের অবদান রাখছে – অতীতে যেমন বর্তমানেও তেমনি।
* আবার এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে অনেক ব্যক্তির লেখা, অনেকের সাক্ষাৎকার, প্রয়াত বিশেষ ব্যক্তির জীবন পরিচিতি ও নতুন প্রবন্ধ রচয়িতা।
* পরিশেষে বর্তমান পরিস্থিতিতে পাদ্রীশিবপুর-অধিবাসী ও পাদ্রীশিবপুর-অভিবাসীরা কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা কী তা জানার উদ্দেশ্যে বিশেষ কয়েকজন ব্যক্তিদের চিন্তাধারা প্রকাশ করার জন্য কয়েকজনকে অনুরোধ করা হয়। তাদের রচনা এই গ্রন্থকে সমৃদ্ধ এবং সময়োপযোগী করতে সহায়তা করেছে।
* বিভিন্ন শ্রেণিতে যারা প্রবন্ধ রচনায় ও সাক্ষাৎকারে এই গ্রন্থ-রচনায় সহায়তা করেছেন তাদের সংখ্যা ৫০ জনের কম নয়।

গ্রন্থ-সম্পাদনা কমিটি ও সাহায্যকারী

গ্রন্থ-সম্পাদনা কমিটি যে দায়িত্বটি পালন করেছেন তা হল: সমবেতভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা, কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা, জরিপ ও আলোচনার ফলাফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, কাজের জন্য ব্যক্তি বেছে নেওয়া, সমন্বয় সাধন করা, প্রয়োজনীয় ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। তাছাড়া গ্রন্থ প্রকাশনা ও অর্থায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করা; প্রকল্পের সমন্বয় ও সার্বিক সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করা।

গ্রন্থটি রচনার সরাসরি কাজে নিয়োজিত ছিলেন: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি (লেখক ও প্রধান সম্পাদক), যোসেফ ডি'রোজারিও (লেখক ও সহকারী সম্পাদক) এবং প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মেরী মনিকা গোমেজ, এমএড, ব্রাক ইউনিভার্সিটি, যিনি স্বেচ্ছায় আগ্রহভরে "প্রবাসী অভিবাসী বিভাগ"-এর লেখক ও সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্যে এগিয়ে এসেছেন। তাদের সকলের মেধা, দক্ষতা, সময় ও শ্রম এই কাজে উৎসর্গ করার জন্য সবার প্রতি রইল আমাদের অজস্র ধন্যবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

অন্যান্য দায়িত্বে চলমান সহযোগী সদস্যবৃন্দ হচ্ছেন: শ্যামল লরেন্স গোমেজ, জেমস গোমেজ, রীনা যোয়ান্না ডি'রোজারিও, বার্নার্ড পংকজ ডি'রোজারিও, ইভন ছিলু ডি'রোজারিও।

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি মুদ্রণযোগ্য করার জন্য দু'জন পাঠক ও বর্ণবিন্যাসকারী হিসেবে অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে পরীক্ষা-নীরিক্ষা ও সংশোধন ও শ্রুতিমধুর করার জন্য মি: জেমস গোমেজ ও মিসেস রোজ আভা গুডা অনেক শ্রম, মেধা ও সময় উৎসর্গ করেছেন। তাদের কাছে নিবেদন করি আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা।

গ্রন্থের টেকনিকাল কাজে যারা সহায়তা দিয়েছেন তারা হলেন: প্রকৌ. অলিভার জেড়াল্ড গুডা, যিনি পাদ্রীশিবপুর মিশন কম্পাউন্ডের ডিজিটাল ম্যাপ তৈরির ব্যবস্থাপনায় ও অর্থায়নে সহায়তা দান করেছেন। যে-তরুণরা গ্রন্থ প্রকাশনা কাজে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেছে তারা ছিল: গ্রাফিক্স ডিজাইনার জেরমি ট্রয় গোমেজ, যে বিভিন্ন ম্যাপ, ছবি ও লিপিফলক বিষয়ে পরিকল্পনা, সংযোজনা ও সম্পাদনা কাজে অনেক মেধা ও শ্রম এবং মুদ্রণকাজে সার্বক্ষণিক সহায়তা দান করেছে। মাঝে মধ্যে অস্কার অর্ক গোমেজ এবং ক্যাথেরিন শ্রেয়া গোমেজ বর্ণবিন্যাসে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তাদের কাছে আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থের প্রচ্ছদ-শিল্পী হচ্ছেন মি. মাহবুব রহমান এবং সহযোগিতায় ছিলেন আলবার্ট প্রশান্ত গোমেজ। পাদ্রীশিবপুরের প্যারিশের ম্যাপ তৈরিতে এবং মিশন প্রাঙ্গণের অতীত ম্যাপ প্রস্তুতিতে এবং গ্রন্থের ব্যাক-কভার প্রস্তুতিতে অনেক মেধা, সময় ও শ্রম দিয়েছেন মি. কিরিট সেবাস্তিন গোমেজ ও মি. ফরহাদ মজুমদার ফাহিম। তাদের সবার কাছে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ধর্মপাল, পালক ও যাজক, সন্ন্যাসব্রতী

বরিশাল ডাইয়োসিসের ধর্মপাল পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও-এর সমর্থন এবং পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের পাল-পুরোহিত ফাদার রবার্ট গমেজ, সিএসসি ও সহকারী ফাদার খোকন

নকরেক, সিএসসি-এর এ প্রকল্পে সার্বিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞ।
পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের সন্তান যাদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়া হয়েছে তারা হলেন: ফাদার লরেন্স বরুন গোমেজ, ফাদার লাজারুস কানু গোমেজ, ফাদার যেরোম রিংকু গোমেজ, সিস্টার আরতি ডি'কস্তা, এলএইসি, ফাদার লিটন গোমেজ, ফাদার টেরেন্স রড্রিগ্‌স, ফাদার রুবেন গোমেজ, ফাদার রিগন ডি'কস্তা। তারা লিখিতভাবে অথবা সাক্ষাৎকার এবং আলোচনা-সভায় যোগদান ক'রে তথ্য-সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন।

সুতরাং বলা যাবে যে, ঐতিহাসিক লিখিত তথ্য ছাড়া যে মতামত এই গ্রন্থে ব্যক্ত হয়েছে তা কিন্তু এসেছে শেকর থেকে; প্রয়াত ও জীবিত অনেকের লেখা, অনেকের চিন্তা-ভাবনার ফসল, অনেকের সম্পৃক্ততা ও অবদান। সামগ্রিক ভাবে এই বইয়ের রচয়িতা প্রায় ২২০ জন ব্যক্তির অধিক।

প্রসঙ্গত একান্ত উল্লেখযোগ্য যে, যাদের লেখা এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে তাদের মতামতের জন্য দায়বদ্ধতা তাদেরই কাছে; তাদের মতামতের সাথে সম্পাদকবৃন্দ সর্ববিষয়ে একমত পোষণ না-ও করতে পারেন।

আরেকটি কথা উল্লেখ করতে চাই যা পাঠকবর্গকে স্মরণে রাখতে হবে। কোন জরিপ ও তথ্য-সংগ্রহ সম্পূর্ণ নিখুঁত সম্ভব নয়। সমাজবিদ্‌রা প্রতিটি সামাজিক জরিপ ও তথ্যানুসন্ধানে প্রায় শতকরা দশভাগ ভুল থাকতেই পারে বলে স্বীকার করে নেন। অতএব এই বইয়ের তথ্যের ব্যাপারেও সেই ধরনের সম্ভাবনা থাকতে পারে।

সমাপনী কথন

উপরে উল্লেখিত কয়েকটি অনুচ্ছেদে স্মরণ করেছি অনেক মানুষের সম্পৃক্ততা, সহযোগিতা, সহায়তা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ; গ্রন্থে স্থান পেয়েছে বহু মানুষের শ্রম ও মেধা, চিন্তা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা; কত ভক্তবিশ্বাসী, ভক্তপ্রেমিক ও ভক্ত-প্রত্যাশী মানুষের সাক্ষ্যদান; অসংখ্য মানুষের খ্রিস্টীয় জীবনসাধনা, জীবনধারা, জীবন-সম্পদ যা খ্রিস্টান জনপদকে করে তুলেছে ঐশ্বর্যশালী ও ঐতিহ্যবাহী; অসংখ্য মিশনারি বিশপ-ফাদার-ব্রাদার-সিস্টার ও ভক্তসেবক-সেবিকাদের বিচরণ, আচরণ ও কর্মসেবন; কত মানুষের সাধন-ভজন, শিখন-পালন, আবরন-আচরণ এবং পরিচালন ও প্রতিপালন; শ্রীমন্ত নদীর মিলন-মোহনায় কত হিন্দু-মুসলমান ও বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ভাইবোনদের রয়েছে আনাগোনা, চলা-ফেরা, লেনা-দেনা এবং একসঙ্গে পথচলা।

উপসংহারে উক্ত চেতনায় আমরা ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে প্রকাশ করি যে, এই গ্রন্থের বিষয়-প্রতিপাদ্যের লেখক-রচয়িতা সবাই। সবার প্রতি রইল আমাদের কৃতজ্ঞতা। সবার প্রতি উৎসর্গীকৃত হল এই গ্রন্থটি। শ্রীমন্ত-বাটে পাদ্রীশিবপুর কাল-কালান্তরে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকুক ঐতিহ্যবাহী এই খ্রিস্টীয় জনপদ।

প্রাক-কথন: লেখক ও সহ-সম্পাদক যোসেফ ডি'রোজারিও

শ্রীমন্ত নদীর বাটে আমাদের চিরচেনা একটি জনপদ পাদ্রীশিবপুর। এখানে আমাদের জন্মগ্রহণ এবং এখানেই আমাদের বেড়ে ওঠা। সবচেয়ে গর্বের বিষয় হলো এই জনপদটি একটি খ্রিস্টান জনপদ যার গোড়াপত্তন হয়েছিল ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে। সেই থেকে অদ্যাবধি আমাদের সরব বিচরণ এই জনপদে। এই গ্রামের রয়েছে একটি ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস। এই ঐতিহাসিক দিকটি, সাথে মানুষের জীবনাচরণ, শিল্প-সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠান এবং অতীত ও বর্তমানের ধারা এসবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানব জীবন ক্ষণস্থায়ী আর এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে আমাদের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস পাদ্রীশিবপুরের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ধরে রাখা। এই বিষয়ে প্রথম প্রস্তাবনা রাখেন পাদ্রীশিবপুরের সন্তান এবং বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর একমাত্র মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি। তিনি এই পুস্তকটি রচনার জন্যে সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত রূপরেখা প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকটি রচনার সাথে সম্পৃক্ত আছেন পাদ্রীশিবপুরের অনেকেই। কেবল বাংলাদেশ নয় বিশ্বে যেখানেই পাদ্রীশিপুরের খ্রিস্টান সদস্য রয়েছেন তারা সবাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই পুস্তক রচনায় যার যার অবস্থান থেকে অবদান রেখেছেন।

এই পুস্তকখানা রচনার মূল দায়িত্ব পালন করেছেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি মহোদয়। আমরা তাঁকে আমাদের সাধ্যমত সহযোগিতা করেছি। এই পুস্তকটির একাধিক "ভাগ" রচনার দায়িত্ব আমার উপরে ন্যস্ত হয়। তবে আমার অংশের যে বিশাল বিষয়াদি তা আমার একার পক্ষে রচনা করা সম্ভব ছিলো না। আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন অনেকেই। তাদের সকলের প্রতি রইলো কৃতজ্ঞতা। সেই সাথে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অনেক তথ্য আমরা পাদ্রীশিবপুর সেন্ট আলফ্রেড স্কুল এবং কলেজের আর্কাইভ থেকে পেয়েছি। প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করেছেন। তাদের প্রতিও আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা।

একটি কমিটি এই পুস্তকটি প্রকাশের জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। তাদের নাম ইতোমধ্যেই পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে। এই পুস্তক নিয়ে কাজ করতে গিয়ে কমিটির সাথে আমরা বার বার মিলিত হয়েছি, আলোচনা করেছি এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ করেছি। আমরা দেখেছি সকলেই পাদ্রীশিবপুরের সন্তান হিসেবে এই পুস্তকটি যাতে আলোর মুখ দেখতে পারে তার জন্যে আন্তরিকভাবে কাজ করেছেন। কেবল তাই নয় আমাদের তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে পাদ্রীশিবপুর, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও কোলকাতায় পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টান জনমানুষের সাথে মতবিনিময় করেছি। তাদের কাছ থেকেও আন্তরিক সাড়া পেয়েছি। সকলেই যার যার অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের সহযোগিতা প্রদান করেছেন। সকলের প্রতি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

একটি বড় ধরনের প্রকাশনার জন্য যতটা সময় ও তথ্য প্রয়োজন তা হয়তো আমাদের ছিল না। কিন্তু আন্তরিকতার কোন ঘাটতি ছিল না। তারপরেও এই প্রকাশনায় আমাদের হয়তো অনেক ভুল রয়ে গেছে, সামগ্রিকভাবে সবকিছুর আলোকপাত হয়তো আমরা করে উঠতে পারিনি। আমরা সূচনা করলাম। এই পুস্তকটি হয়তো আগামীতে আরও বড় আকারে, সমস্ত তথ্য সম্বলিত এবং ঐতিহাসিক বিষয়াদি নিয়ে প্রকাশনার একটি নিদর্শন হিসেবে কাজ করবে। আগামী প্রজন্ম উৎসাহিত হবে নতুন করে পাদ্রীশিবপুরকে আরও আলোকিত করে তুলে ধরতে। এই পুস্তকে যা কিছু সীমাবদ্ধতা, ভুল ও দুর্বলতা আছে তা আমাদের। যা কিছু সার্থকতা সেটা আমাদের প্রাণপ্রিয় পাদ্রীশিবপুরবাসীর।

কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিতের প্রতি। তিনি আমাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। সেই সাথে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই যারা বিভিন্নভাবে আমাদের সহায়তা দিয়েছেন। এই প্রকাশনার জন্যে এবং এ যাবৎকাল বিভিন্ন সভা সেমিনার করার জন্যে আমাদের সার্বিক সহযোগিতা দান করেছেন মি. লরেন্স শ্যামল গোমেজ। তাকেও ধন্যবাদ জানাই। সেই সাথে কামনা করি ঈশ্বর তাকে এমনিভাবে উদার চিত্তে কল্যাণকর্মে সহযোগিতা করার জন্যে প্রয়োজনীয় সামর্থ্য ও সুযোগ দান করুন।

আমাদের প্রকাশনার কাজে সানন্দে অনেকেই সহযোগিতা করেছেন। তাদের মূল্যবান সময়, মেধা ও শ্রম দিয়ে আমাদের কর্মযজ্ঞের সাথে নিজেদের সংযুক্ত করেছেন। আজ যখন এই পুস্তকটি সকলের হাতে তুলে দেয়া হবে তখন নিশ্চয়ই তারাও আনন্দিত হবেন। এমন একটি কাজ সুসম্পন্ন করার প্রতিটি পদক্ষেপে পরম পিতা ঈশ্বর আমাদের সহবর্তী ছিলেন। তাঁর দ্বারা চালিত হয়েই এই কাজটি আমরা করতে সক্ষম হয়েছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

সকলের সর্বাঙ্গিণ মঙ্গল কামনা করছি।

FOREWORD (External Migration)

Dr. Mary Monica Gomes (Toronto, Canada)

Having deep and strong ties to Padrishibpur, the land and people around whom this book, ***'Srimonto-Bate Padrishibpur: Legacy of Christian Inhabitants'*** has been written, I was fortunate and honoured that the distinguished and eminent writer of the book, Cardinal Patrick D'Rozario csc chose me to collaborate in writing a section of the book on 'External migration of the Padrishibpurians', focusing on those living in Canada and USA. As a daughter of this land, and daughter-in-law as well, I have always taken pride in this unique land of our ancestors!

For those who have ancestral and family roots in this small region of southern Bangladesh, it has always been a matter of great pride to belong to this historical and cohesive community whose origins and traditions can be traced back several hundreds of years. But, though there have been rich oral traditions that testify to the foundations of this society, lifestyle and people of this area, very little has been written about them. From time to time, some have taken the initiative to document their family genealogy and names of ancestors, while few have tried to construct their family tree and ancestry.

Cardinal Patrick, as one of the leaders of the Church in Bangladesh and an eminent son of the soil of Padrishibpur, took an active interest in researching and documenting the history of Christians and the Church in Padrishibpur. He has painstakingly put together the history from various sources as well as from Church documents. In this present initiative, he has put together a team to do research and documentation on Padrishibpur, its parish and institutions, its people and their lives, culture, values and the how the different generations of Padrishibpurians have fared and lived over these past several centuries since the establishment of the parish of Padrishibpur, particularly in the modern era.

For writing this chapter on 'External migrants of Padrishipur: Canada and USA', Cardinal Patrick and his team prepared formats for collecting information and data regarding the migrants in the form of surveys, questionnaires for conducting interviews and small Focus Group Discussions (FGDs), as well as an outline and timeline for conducting the various tasks. The initial planning and conceptualizing of the book and its purpose was done in July-August 2023, and a Concept Paper was prepared and circulated in Sept 2023. Data collection forms for the Survey, Focus Group discussion and Key Informant Interview questionnaires were prepared and distributed to different places where people from Padrishibpur were currently residing in Bangladesh and outside the country. I was placed with the responsibility to conduct these surveys, FGDs and interviews in Canada and USA as I was a resident of Canada since several years and had experience in conducting research for academic, professional and programmatic purposes.

The most important part of the research were the surveys on Padrishibpur migrants in Canada and USA, identified as those with roots and origins in Padrishibpur, now living in these countries. The surveys were conducted in November and December 2023 and updated in June and July 2024.

The surveys and group discussions were organized with the help of a small group of facilitators, primarily those who had very long-standing knowledge and contacts with people from Padrishibpur residing in Canada and USA. Among the key persons who enabled the work to be conducted with ease and authenticity were Cecilia Romola Rozario for Canada and Jerry Basil Gomes for USA. They were helped by the younger generation support from Christina D'Rozario, Pearl Anthony, Rudolph Rossie Gomes, Lloyd Nelson, Juliet Lipica Sarker and Lila Gomes.

Three Focus Group Discussions were conducted in Canada in November 2023. These FGDs were very intensive and frank discussions around a set of key points that looked at how the migrants viewed their roots and heritage in Padrishibpur and how migration has influenced their life, views and culture. FGD 1 with Early Migrants was held on November 26, 2023 at Christina and Ronnie D'Rozario's house. The participants were: Cecilia Romola Rozario, Isaac Gomes, Lila Gomes, Clinton Bulbul Gomes, Alphonse Kala Gomes, Sheila Gomes and Ivan Robi D'Rozario.

FGD 2 with Young Adults was also held on November 26, 2023 at Christina and Ronnie D'Rozario's house where the participants were Pinku Anthony Sarker, Champa Sarker, Tina D'Rozario, Ronnie D'Rozario, and Noreen Mercer.

FGD 3 with New Generation was held on November 25, 2023 at Jenny and Peter Penheiro's house with College and High School Graduates. The participants were: Valentine Mridongo Rozario, Roland Auritro Rozario, and Andrea Penheiro.

Interviews were held with Key Informants who had deep knowledge and experience of life in Padrishibpur as well as life as migrants in a foreign land. Among those who consented and gave their time and views in interviews were Cecilia Romola Rozario, Clinton Bulbul Gomes, David Rozario, and Pearl Anthony Rozario (in Canada) and Jerry Basil Gomes, Promila Victoria Quiah, Juliet Lipica Sarker, Jonathan D'Silva, Dr. Angelina Gomes and Prof. Mabel Gomes (in USA).

Focus Group Discussions, interviews and survey updates were held in USA in June and July 2024. Prof. Mabel Gomes, Jerry Basil Gomes, Juliet Lipica Sarker and Jacinta Gomez helped to facilitate these events. Among those who participated in the discussions and survey updates were Mary Gomes, Juliana D'Rozario, Rosemary D'Costa, and Nixon Dias.

In New York, a Group meeting was held at the residence of Juliet Lipica Sarker on July 1, 2024 with the participation of Jerry Gomes, Paulina Gomes, Minoti Adhikari Fraizer, Marystella Jhorna Sarker, Juliet Lipica Sarker, Rudolph Rossie Gomes and Tithi Gomes, where the members discussed about their life as a migrant and their feelings about their roots in Padrishibpur.

In Maryland, a group meeting was held on July 7, 2024 at the residence of Jacinta and Jude Gomez, with the participation of Raphael Gomes, Olivia Gomes (D'Costa), Jacinta Gomez and Jude Gomez to seek their views and experiences of being Padrishibpur migrants in USA. On July 12 and 13, 2024 discussions were held with Jonathan D'Silva, Jacklin D'Silva, Francis Gomes, and Promilla Quiah and Milton Quiah about their experience and views on being a migrant and their feelings about their heritage and traditions in Padrishibpur and Bangladesh.

Among those who contributed to the documentation process, I would like to thank Christina D'Rozario and Andrea Penheiro for being rapporteurs during FGDs. I would also like to mention Leena Gomes (w/o Dr. Medlicot Gomes), Rupert Gomes, Jude Pijush Gomes and Lloyd Nelson for writing brief life sketches of deceased prominent Padrishiburians that are included in the book. Family genealogies were updated with the help of Jarmen Torun Gomes, Dulal Gregory Gomes, Edward Aloysius, David Aloysius, Leena Gomes, Pauline Francis, Noman Aloysius Rahman, Rudolph Rossie Gomes, Ricardo D'Costa, Ishita Benedict, Nino George Biswas, Molly Aloysius, Marcella Gomes, Rigby Satu Gomes and other family members.

At the end, I sincerely thank all those whose interest and collaboration made this endeavour possible. I also wish to make a personal tribute to three illustrious persons whose life and legacy as sons of Padrishibpur inspired me in this awesome task – William Albin Gomes (my late father), Vincent Gomes (my late father-in-law), and Capt. Leonard Gomes (Sanu) (my late husband). I hope that the readers find this book, ***'Srimonto-Bate Padrishibpur: Legacy of Christian Inhabitants'*** as a rich resource book and a beacon of pride and hope for all those who view this land as their roots and seek inspiration from those forerunners who over the centuries have helped to build this unique and special society that seeks to spread the message and goodwill of love and humanity to all!

শ্রীমন্ত-বাটে পাদ্রীশিবপুর
ঐতিহ্যবাহী একটি খ্রিস্টান জনপদ

বিষয়সূচি **পৃষ্ঠা**

উপস্থাপনা : পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও, বরিশাল কাথলিক ডাইয়োসিসের বিশপ ---- ০১

প্রাক-কথন: লেখক ও প্রধান সম্পাদক – কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি ---------- ০৩

প্রাক-কথন: লেখক ও সহ-সম্পাদক – যোসেফ ডি'রোজারিও ---------- ১০

FOREWORD : Writer and Editor: Part Four – Dr. Mary Monica Gomes ------- ১২

BACKGROUND: SOME HISTORICAL EVENTS IN CHRONOLOGICAL ORDER ------- ২১
Cardinal Patrick D'Rozario, csc.

প্রথম ভাগ ঃ প্রেক্ষাপট: বাকেরগঞ্জ/বরিশাল জেলা, বাকেরগঞ্জ উপজেলা ও পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়ন ৩৮-৫১
লেখক: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

প্রথম অধ্যায়: প্রেক্ষাপট: বাকেরগঞ্জ/বরিশাল জেলা ---------- ৩৮
॥ ক ॥ বাকেরগঞ্জ জেলা এবং বাকলা-র ইতিবৃত্ত
॥ খ ॥ বাকেরগঞ্জ জেলা থেকে বরিশাল জেলা

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাকেরগঞ্জ উপজেলা ---------- ৪৬

তৃতীয় অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়ন (১৩ নং) ---------- ৪৮

দ্বিতীয় ভাগ: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের ইতিহাস, অবকাঠামো ও ক্রমবিবর্তন ----- ৫২-৯৮
লেখক: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

প্রথম অধ্যায়: মাইলাপুর ডাইয়োসিসের প্রশাসনামল (১৭৬৪-১৯৩০) ---------- ৫৩
॥ ক ॥ শিবপুরের প্রাগ-ইতিহাস, খ্রিস্টান জনপদের গোড়াপত্তন ও ক্রমবিবর্তন
॥ খ ॥ পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের উপকেন্দ্র: দেশান্তরকাঠি, মাটিভাঙ্গা ও রাজাবাড়িয়া

দ্বিতীয় অধ্যায়: চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের প্রশাসনামল (১৯২৭-২০১৬) ---------- ৮৪
॥ ক ॥ প্রথম ধর্মপাল: পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ আলফ্রেড ল্য পাইয়র, সিএসসি (১৯২৭-১৯৫১)
॥ খ ॥ পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ রেমণ্ড লারোজ, সিএসসি (১৯৫২-১৯৬৭)
॥ গ ॥ পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি (১৯৬৮-১৯৯৪)
॥ ঘ ॥ পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি (১৯৯৫-২০১০)
॥ ঙ ॥ পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মজেস মন্টু কস্তা, সিএসসি (২০১১-২০১৫)

তৃতীয় অধ্যায়: বরিশাল ধর্মপ্রদেশের প্রশাসনামল (২০১৬ --) ৯৫
॥ ক ॥ পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি (২০১৬-২০২২)
॥ খ ॥ পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও (২০২২--)

তৃতীয় ভাগ: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের অধিবাসী ও অভিবাসী ৯৯-১২১
রচনা ও সংকলনে: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

প্রথম অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে খ্রিস্টানদের বসবাস ও পরিসংখ্যান ১০০
॥ ক ॥ শিবপুর মিশনের সূচনা
॥ খ ॥ পাদ্রীশিবপুরে দীক্ষাস্নানের পরিসংখ্যান
॥ গ ॥ বিভিন্ন জরিপে উল্লেখিত শিবপুর মিশনের জনসংখ্যা
॥ ঘ ॥ ধর্মপল্লীর বাড়ি, ঘর ও জনসংখ্যার সারাংশ
॥ ঙ ॥ বিবাহ সংক্রান্ত কিছু তথ্য
॥ চ ॥ চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশীয় জরিপ – ১৯৯৩ খ্রি.

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ পাদ্রীশিবপুর-অভিবাসী ১০৬
॥ ক ॥ পাদ্রীশিবপুর থেকে অন্যত্র অভিগমন
॥ খ ॥ প্রথম অভিবাসন থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিবাসন
॥ গ ॥ পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টভক্তদের সামগ্রিক পরিসংখ্যানের সার-সংক্ষেপ
॥ ঘ ॥ সম্পাদনা কমিটির জরিপ ও সীমাবদ্ধতা
॥ ঙ ॥ পাদ্রীশিবপুর অধিবাসীদের অভিবাসন সম্পর্কে এফজিডি আলোচনায় প্রকাশিত অভিমত

তৃতীয় অধ্যায়: পশ্চিমবঙ্গে অবস্থানরত পাদ্রীশিবপুরবাসীদের পরিসংখ্যান ও মতামত ১১৪
॥ ক ॥ ব্রিটিশ আমলে পাদ্রীশিবপুরবাসী খ্রিস্টান জনগণ
॥ খ ॥ পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণপুরে আলোচনা-সভার ফলাফল

PART FOUR: EXTERNAL MIGRATION OF THE PADRISHIBPURIANS ১১২-১৯৭
Writer & Editor: Dr. Mary Monica Gomes, Toronto, Canada.

Chapter One: External Migrants of Padrishibpur: Canada and USA ১২৩
Chapter Two: Statistical information of Migrants in USA with Padrishibpur roots and heritage ১৪৫
Chapter Three: Statistical information of Migrants in Canada with Padrishibpur roots & heritage ১৫৭
Chapter Four: Deceased Persons who made contribution ১৬৭
Chapter Five: Interviews of Migrants in USA & Canada ১৭১
Chapter Six: Brief Statistical Infomation of Padrishibpur ১৯৬
Migrants in Australia, Asia, Middle East and Europe

পঞ্চম ভাগ: পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর ধর্ম, ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ১৯৮-২৫৮
লেখক: যোসেফ ডি'রোজারিও

প্রথম অধ্যায়: জাতিগত ও ধর্মীয় পরিচয় ---------- ২০০

দ্বিতীয় অধ্যায়: জনগণের ভাষা ও সংগীত ---------- ২০৩

তৃতীয় অধ্যায়: বসত বাড়ি, ভূ-সম্পত্তি ও জীবনধারা ---------- ২৩০

চতুর্থ অধ্যায়: সামাজিক ও কৃষ্টিগত আচার-অনুষ্ঠান ---------- ২৩৯

পঞ্চম অধ্যায়: ধর্মীয় জীবন: বিশ্বাস ও আচরণ ---------- ২৫১

ষষ্ঠ ভাগ : পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ: অতীত ও বর্তমানের সেবাপ্রতিষ্ঠান ২৫৯-২৭২
লেখক: যোসেফ ডি'রোজারিও

প্রথম অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের অবকাঠামোগত প্রতিষ্ঠানসমূহ ---------- ২৫৯
॥ ক ॥ প্যারিশের জনগণ ও সেবাদানের মৌলিক প্রতিষ্ঠান
॥ খ ॥ প্রশাসনিক কাঠামো ও ধর্মীয় জীবনে গঠন-প্রশিক্ষণ

দ্বিতীয় অধ্যায়: প্যারিশ নিবাসী ও অভিবাসীদের মধ্যে সেবাকাজ ---------- ২৬৫
॥ ক ॥ খ্রিস্টান জনগণের জন্য কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক সেবাকাজ
॥ খ ॥ প্যারিশ অঙ্গ-সংগঠন, সেবামূলক সংঘ ও কার্যক্রম
॥ গ ॥ পাদ্রীশিবপুরে ধর্মপ্রদেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ

সপ্তম ভাগ: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ: বৃহত্তর জনগোষ্ঠির জন্য সেবাপ্রতিষ্ঠান ২৭৩-৩২৬
লেখক: যোসেফ ডি'রোজারিও

প্রথম অধ্যায়: শিক্ষাসেবা প্রতিষ্ঠান: ---------- ২৭৩
॥ ক ॥ শিক্ষা-সেবা সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ
॥ খ ॥ সেন্ট আলফ্রেডস্ উচ্চবিদ্যালয় – প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি
॥ গ ॥ সেন্ট আলফ্রেডস্ উচ্চ বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী (১৯৩৩-১৯৫৮ খ্রি.)
॥ ঘ ॥ সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ব্রাদার ডেনিস গডফ্রে, সিএসসি-এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী
॥ ঙ ॥ সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী – ১৯৮৩ খ্রি.
॥ চ ॥ সেন্ট আলফ্রেডস্ স্কুলের প্লাটিনাম জুবিলী - ২০০৮ খ্রি.
॥ ছ ॥ নারী শিক্ষা ও সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুলটি কলেজে উন্নীতকরণ : ২০২১ খ্রি.

দ্বিতীয় অধ্যায়: স্বাস্থ্য-সেবা : ফাতিমা স্বাস্থ্য কেন্দ্র ---------- ৩১৭

তৃতীয় অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুর কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্র (পি.এ.ডি.সি) ---------- ৩১৮

চতুর্থ অধ্যায়: ত্রাণ, পুনর্বাসন ও সমাজ-উন্নয়ন ও অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ ---------- ৩২০

অষ্টম ভাগ: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ: যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী: অতীত ও বর্তমান ৩২৭-৩৮৪
লেখক ও সম্পাদক: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

প্রথম অধ্যায়: তালিকা: বিশপ, ধর্মপ্রদেশীয় যাজক, সন্ন্যাসব্রতী পুরোহিত, সিস্টার এবং ব্রাদার ---------- ৩২৮

দ্বিতীয় অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে নিয়োগকৃত পালপুরোহিত ও সহকারী পুরোহিতবৃন্দ ---------- ৩৩৫

তৃতীয় অধ্যায়: যাজক/বিশপ/আর্চবিশপ ও কার্ডিনাল ---------- ৩৪১

নবম ভাগ: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ; অতীত ঐতিহ্যের অ্যালবাম ও রচনা ---------- ৩৮৫-৫০২
লেখক ও সম্পাদক: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

প্রথম অধ্যায়: ঐতিহ্যগত ম্যাপ, ছবি, লিপিফলক দ্রব্য ও স্মৃতিচিহ্ন ---------- ৩৮৭

॥ ক ॥ পাদ্রীশিবপুর মিশন বাড়ির ঐতিহাসিক অবস্থান ও প্রতিষ্ঠান
১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে মিশনবাড়ির অবস্থান ও চিত্র
২০২৪ খ্রিস্টাব্দে মিশনবাড়ির অবস্থান ও চিত্র
২০২৪ খ্রিস্টাব্দে মিশন প্রাঙ্গণ ও প্রতিষ্ঠানের ছবিসমূহ

॥ খ ॥ পাদ্রীশিবপুরের অতীত গির্জা ও বিশেষ ব্যক্তিদের ছবি

॥ গ ॥ পাদ্রীশিবপুরের কিছু লিপিফলক ও সমাধিফলক

॥ ঘ ॥ পাদ্রীশিবপুর অতীত গির্জার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কলকাতার দুটো ঐতিহাসিক গির্জা
মুর্গিহাটার গির্জা: কলকাতা আর্চডাইয়োসিসের কাথিড্রাল – পবিত্র জপমালার গির্জা (১৭৯৭)
বৈঠকখানা গির্জা: শোকার্ত জননী মারীয়ার গির্জা (১৮১০)

॥ ঙ ॥ পাদ্রীশিবপুরে ব্যবহৃত পুরনো দ্রব্য-সামগ্রী ও স্মৃতিচিহ্ন

দ্বিতীয় অধ্যায়: অতীতের গবেষণামূলক লেখা সংগ্রহ: বিভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্ত লেখা ---------- ৪৩০

তৃতীয় অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের প্রয়াত বিশিষ্টজনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ---------- ৪৪৮

॥ ক ॥ পাদ্রীশিবপুর ও উপকেন্দ্র: প্রয়াত বিশেষ ব্যক্তিবর্গ

॥ খ ॥ ভারত: প্রয়াত বিশেষ ব্যক্তিবর্গ

॥ গ ॥ চট্টগ্রাম: প্রয়াত বিশেষ ব্যক্তিবর্গ

॥ ঘ ॥ ঢাকা: প্রয়াত বিশেষ ব্যক্তিবর্গ

॥ ঙ ॥ প্রবাসী – যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা: প্রয়াত বিশেষ ব্যক্তিবর্গ

দশম ভাগ: সমাজ, দেশ ও মণ্ডলীতে পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর অবদান ৫০৩-৫১৫
লেখক: যোসেফ ডি'রোজারিও
॥ ক ॥ পাদ্রীয়ান তালুক-এর অবদান
॥ খ ॥ পাদ্রীশিবপুরের সন্তান বা বংশোদ্ভূত ধর্মীয় সেবক-সেবিকাদের অবদান
॥ গ ॥ পাদ্রীশিবপুরের সেবা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অবদান

একাদশ ভাগ: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ: উপসংহার ও ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা ৫১৬-৫৭০
সম্পাদক: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

প্রথম অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুর-নিবাসী ও পাদ্রীশিবপুর-অভিবাসীদের জন্য প্রত্যাশাসমূহ ৫১৭
(১) "শ্রীমন্তনদীর বানে রামুর পালাগানে আমাদের আত্মানুসন্ধান" – পারাবত
(২) জনসংখ্যা ও অভিবাসন বিশ্লেষণ: চ্যালেঞ্জ ও প্রত্যাশা – কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রেজারিও
(৩) External Migrants of Padrishibpur: Canada and USA – Dr. Mary Monica Gomes
(৪) আর্থিক জীবন: অতীত, চ্যালেঞ্জ ও প্রত্যাশা – মি. মাথিয়াস গোমেজ
(৫) সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ও নেতৃত্ব – মি. যোসেফ ডি'রোজারিও
(৬) ছেলেমেয়েদের শিক্ষা: চ্যালেঞ্জ ও প্রত্যাশা – প্রফেসর সুইটি ব্রিজেট গোমেজ
(৭) কারিগরি শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা ও প্রত্যাশা – মি. জেমস গোমেজ
(৮) খ্রিস্টীয় জীবন: বর্তমান ও প্রত্যাশা – কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও
(৯) সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য: সংরক্ষণ ও প্রত্যাশা – মি. যোসেফ ডি'রোজারিও
(১০) মা মারীয়ার প্রতি বর্তমানের ভক্তি ও ভবিষ্যতের প্রত্যাশা – ফাদার রুবেন গোমেজ

দ্বিতীয় অধ্যায়: সম্পাদনা কমিটির সারসংক্ষেপ প্রস্তাবনা ৫৬৪

দ্বাদশ ভাগ: সংগৃহীত পরিসংখ্যান ও দলীয় আলোচনার ফলাফল ও তথ্য প্রদানকারী ৫৭১-৬৩৬
সম্পাদক: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

প্রথম অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুরের অধিবাসী ৫৭২

দ্বিতীয় অধ্যায়: পশ্চিমবঙ্গের পাদ্রীশিবপুরবাসী ৫৯৬

তৃতীয় অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুরবাসী – চট্টগ্রামে অভিবাসী ৬০১

চতুর্থ অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুরবাসী – ঢাকাতে অভিবাসী ৬১৯

পঞ্চম অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুরবাসী – খুলনাতে অভিবাসী ৬৩৬

ত্রয়োদশ ভাগ: পরিশিষ্ট: তথ্য-সংকলন ৬৩৭-৭৬৮

পরিশিষ্ট –১ ঃ রামুর পালা পুস্তিকা ৬৩৭

পরিশিষ্ট - ২ ঃ বংশ-তালিকা ৬৯৩

প্রথম অধ্যায়: পারের বাবুর বাড়ির বংশ-তালিকা
দ্বিতীয় অধ্যায়: উইলিয়াম ডি'রোজারিও, পন্ডিত বাড়ির বংশ-তালিকা
তৃতীয় অধ্যায়: ফিলিপ ডি'কস্তা (পোস্টমাস্টার) বাড়ির বংশ-তালিকা
চতুর্থ অধ্যায়: গ্রেগরী পিওন ডি'রোজারিও বাড়ির বংশ-তালিকা
পঞ্চম অধ্যায়: যোসেফ গোমেজ (হাওলাদার) বাড়ির বংশ-তালিকা
ষষ্ঠ অধ্যায়: শিকদার বাড়ির বংশ-তালিকা
সপ্তম অধ্যায়: সান্তামারীয়ার বাড়ি এবং পঞ্চায়েত বাড়ির বংশ-তালিকা
অষ্টম অধ্যায়: দেশান্তরকাঠি বংশ তালিকা

পরিশিষ্ট – ৩: গ্রন্থপঞ্জি – BIBLIOGRAPHY ৭৬৩
সম্পাদক: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

লেখক পরিচিতি

BACKGROUND
SOME HISTORICAL EVENTS IN CHRONOLOGICAL ORDER

Cardinal Patrick D'Rozario, csc.

This preliminary background article has two Sections: Section one highlights some of the known events and Milestones of the general Secular and Church History which provide evolutionary background related, somewhat indirectly to Padrishibpur. Section two deals with the historical evolution and events of importance of Padrishibpur Parish.

We write this brief annals mainly for the people for whom Bengali is the not the language spoken or understood well. This paper will also help to see the history with a bird's eye view.

Section one: Secular and General Historical Events:

Bengal: "The Paradise of India" (Campos, p. 19)

900 In the 10th century Chandra Rajbongsho was set and hence Bakla-Chandradeep as it was called later was ruled by Kings of Chandradeep for many centuries.

1498 The Discovery of India by Vasco Da Gama.

1510 Goa was conquered by the Portuguese

1514 PADROADO Agreement between Pope Leo X and the King of Portugal.

1518 The first arrival of Christian Portuguese traders and sailors in Chittagong, the Porta Granda, Big Port. (Campos, p. 27)

1526 Arrival of Babur and starting of Mughal Dynasty. Moghal Rule in India lasted till 1761.

1534 Archdiocese of Goa was established under the PADROADO by the King of Portugal.

1537 The first Portuguese Settlement in Diang, Chittagong (Campos, pp. 66)

1538 Sher Shah, the Tiger, made himself Master of Bengal. The Bengal was called "The Paradise of India".

1582 Bakerganj District was under the Bakla-Chandradeep and then annexed to Dhaka ruled by Mugal Emperor.

Jurisdiction of Cochin Diocese (1557-1606).

1598 Fr. Nicolau de Pimenta, the Metropolitan of the Portuguese India, sent two Jesuit Priests from Cochin to Chittagong: Fr. Francesco Fernandez, S.J. and Fr. Domingo de Sousa, J.S (Campos 101). In 1598 there were 2500 Portuguese and their descendants in Chittagong and Arakan". (Campos. 105) .

Fr. Francesco Fernadez, SJ and Fr. Domingo de Sousa, SJ instead of going to Hoogly, they went to Chittagong in spite of the invitation given by the King of Chandecan. Fr. Francesco heard the dissatisfaction of King.

1599 From the second group of Missionaries Fr. Melchior de Fonseca SJ and Fr. Andre Boves, SJ, Fr. Fonseca was sent to Chandecan (presently Jessore). On his way to Sandecan Fr. Fonseca stopped in Bakla (center of Bakla-Chandradeep, presently Bawphol Thana of Patuakhali District) and met some Portuguese Christians who did not have a priest for the last two years, but promised them that Fr. Francesco will visit them soon, which he did in 1599 and received the authorization to do the Mission work. (Beveridge., P. 156-157).

1600 The first Church in East Bengal was built by the first Jesuit Missionaries in Chandecan (Jessore, Iswaripur). (Campos, 101-102)

1600 First two Churches were erected in Chittagong: Patherghata Church was dedicated to "John the Baptist" on 24th June and Jamalkhan Church was named the Church of the Immaculate Conception on December 8, 1600. (Bp. Le Pailleur, Vol. II)

1602 Arakanese ransacked Diang on November 8 and Fr. Francesco Fernandes, SJ who was wounded, kept him in the prison cell and finally died on 14th November 1602. He was buried under the ruins of the first Church where later the present Cathedral of Holy Rosary was built. Fr. Francesco Fernandes is the missionary suffered martyrdom in the soil of East Bengal. The first Martyr in Bengal.

Jurisdiction of Mylapore Diocese (1606-1929)

1606 Mylapore Diocese was created in the 1606 bifurcated from the Archdiocese of Goa. The Church of Bengal was put under the jurisdiction of Mylapore Diocese.

1621 The arrival of the Priests of the Order of St. Augustin, popularly called Augustinians or Augustinian Fathers.

1666 The Nawab of Dhaka annexed Chittagong to his Kingdom.

1666 There were about 3-7 thousand Christians in Chittagong.

1712 The Second Bishop of Mylapore Diocese, Mgr. Francois Laynes, SJ, visited East Bengali and stayed for nine months without interruption and went around, preaching, administering sacraments, encouraging people and meeting officials in Dhaka, Chittagong, Noakhali, Bhulua, etc.

1757 The Battle of Plassey won by the British East Indian Company led by Lord Robert Clive which resulted in the fall of Mughal Empire and starting of the British rule in India .

1797 Blessing of the Cathedral Church of Holy Rosary, Murgihata, Kolkata

1797 Bakerganj was created as District taking the area of Bakla-Chandradeep.

1810 Blessing of the Church of Our Lady of Sorrows, Boithakkhan, Kolkata

Section Two: Historical Evolution and Events of Padrishibpur.

Some main dates, events and names that appear in historical writings of the Padrishibpur Mission are recorded here in Chronological order. The record gives a gradual evolution of the history of Padrishibpur Mission indicating the past as historical perspective to understand the present highlighting the important events which will again become a history for the future generations.

Padrishibpur Under Mylapore Archdiocese (1763-1930)

1763 King Rajballov Sen, the head of the Bakla-Chandradeep, very well-known Pargana at that time, invited the Christian Mission in Hoogly to provide four Christians to settle in Shibpur in order to assist him to collect taxes. Four Christians came to Shibpur from Bandel Mission in Hoogly in 1763 and they were given four "howlas" by the King.

1764 After one year, King Rajballav Sen again requested the Christian Mission in Hoogly for a Priest to take care of the Christians of Shibur. Hoogly Mission has again conceded to the request and the first Priest sent was Father Raphael Das Anjos. The four "howlas" were joined together to make a "Taluk" and then it was given to Father Raphael Das Anjous by King Rajballav Sen. At a much later stage "Taluk" was called "Padrian Talluk" because of the person responsible was "Padre", priest. This is how the Shibpur Portuguese Colony came into being.

1764 First Church in Shibpur was built in 1764 by Pedro Gonsalves and the Pastor was Father Raphael Anjous of the Augustinian Order.

1801 The Administrative Office of Bakerganj District was transferred to Barisal City.

1823 After destroying the first building of the Church, the more big and extended Second Church Building was built by Manuel Domingo, with funds and instructions left by his father Domingo D'Silva.

1833 Arrival of Protestant Missionaries in Bakerganj, Gournadi Thana, Dhamshor and other places.

1834 Bengal came Under the Propagation of Faith, Apostolic Vicariate of Bengal with See in Calcutta and entrusted the Mission work in Bengal to the Society of Jesus. The Vicar was Fr. Robert de Leger, sj.

1843 The Benedictines came to Chittagong.

1845 Apostolic Vicariate of Bengal was divided by creating East Bengal Apostolic Vicariate with See in Chittagong. Fr. Thomas Oliffe, sj. appointed as Coadjutor. The See of the Vicariate was in Chittagong.

1846 Loreto Nuns came from West Bengal in Chittagong, the First Religious Community in Bengal. They left East Bengal in 1854 and returned in Padrishibpur in 2005.

1850 Fr. Thomas Oliffe, sj. was appointed as Bishop of the East Bengal Vicariate.

1853 Congregation of Holy Cross (Fathers, Brothers and Sisters) came to Bengal by

boat from Calcutta to Noakhali.

1864 Catholic Priest House and the Chapel was built at 5 Sadar Road of Barisal; blessed in 1873 and the present St. Peter's Church as built in 1901 and extended in 1951.

1872 Christian Population in Bakerganj was 4,852, counting 800 Christians in Shibpur Mission Colony.

1880 According to the Baptism Register of Padrishibpur Parish, for the first time instead of "Shibpur" the name "Padrishibpur" was introduced.

1886 Dhaka was erected as Diocese under the Metropolitan Archdiocese of Calcutta. With the joined contract signed between the Propaganda Fide and Padroado, it was agreed that only the Missions in Tejgaon (Dhaka), Nagari, Hashnabad-Tuital, Sripur and Padrishibpur (Tengrakhali)" will be under the Mylapore Bishop, the rest will be under the Bishop of Dhaka.

1800-1850: Although not known exactly when the Christians started their habitation in Deshantorkathi (Tengrakhali), Mativanga and Rajabaria (Kalada), however with cross verification of information available, people started living in those places sometime in the beginning of 19th Century (1800-1850).

1872 Some Censuses: 1872, 1901, 1941, 2011, 2022,

1872 There were 800 Christians in Shibpur Portuguese Colony.

1908 Anglican Church of Oxford Mission was inaugurated.

1919 The First Holy Cross Priest in Bengal was Fr. Augustin Mascarenhas, born on 1st January, 1890 in Akyab, West Burma. He was ordained in Dhaka on 25th May, 1919 by Bishop Legrand, csc. Fr. Augustin joined Holy Cross Novitiate in Toomilia in 1920 and made his First Profession in February, 1923.

1923 First Centenary of the Second Church Building (1823) was celebrated as inscribed "In Loving Memory of Domingo D'Silva " on a stone tablet left by Jas. P. Deepholts (Esq.)

Padrishibpur Under Chittagong Diocese (1927-2015)

1927 Most Rev. Alfred Le Pailleur, csc, Bishop of Chittagong

1927 The Diocese of Chittagong was created with the territory of Asam and some portion of Burma as suffragan to Calcutta Archdiocese. First Bishop was Bishop Alfred Le Pailleur, csc, who served till 1951.

1930 Till 1930 the following Mission Centers in Bengal were under the Padraodo Management of Portugal: Tejgaon, Nagari, Hashnabad and Padrishibpur.

1930 Padrishibpur Parish was annexed to Chittagong Diocese in April 1930. Thus the end of Augustinian Fathers "Black Fathers" (wearing black cassock) and the beginning of "White Fathers" (wearing white cassock) in Padrishibpur.

1930 Arrival of the first Bishop of Chittagong, Bishop Alfred Le Pailleur, csc in Padrishibpur for the first time.

1933 Arrival of Holy Cross Brothers in Padrishibpur: Bro. Denis Godfrey, csc, Bro.

Flavian Laplante, csc. .... bought a piece of land from D'Silva where Brothers' House and St. Joseph's Boarding was erected. St. Alfred High School started with opening of Class VI.

1934 Renovation and Repair of the Padrishibpur Church in 1934.

1936 Arrival of Holy Cross Canadian Sisters in Padrishibpur. For the first time Padrishibpur saw Religious Nuns in the Parish.

1936 Holy Cross Started a Dispensary in 1936 and later it was called Fatima Health Center started on 11th May by the CSC Sisters.

1937 The first group of St. Alfred High School appeared and passed Matriculation under the Calcutta University.

1943 Second World War started and continued till 1945. Big famine in Bengal which is called "Ponchasher Monantor" according to Bengali year of 1350. Because of the World War II, the residential boys of St. Placid Cambridge School was shifted to Padrishibpur and stayed here till 1945.

1947 Pakistan was created with two wings: East Pakistan and West Pakistan, separated from India, independence Day of India is in 1948.

1947-1954: Fr. Betrand Rodrigues, the Parish Priest of Padrishibpur built a small Chapel in Kalada, Rajabaria for Worship.

1948 The name Bakerganj was changed to Barisal District.

1949 "Ecole des Cardes", Teacher's training school started for Catholic teachers.

1950 Dhaka was made Metropolitan Archdiocese with suffragan Dioceses of: Chittagong, Dinajpur and Khulna.

1950 Girls High School in Padrisibpur started along with boarding facilities.

1952 Most Rev. Raymond Larose, csc., Bishop of Chittagong

1952 Fr. Raymond Larose, csc was made the Bishop of Chittagong who retired in 1967 and died in 1987.

1952 Padrishibpur Christian Young Movement (CYM) started.

1953 Girls School was shifted to Barishal with the name "Pravati High School"

1954 East Pakistan Government has abolished Zaminder System in 1951, but it was effective in Padrishibpur in 1954 during the last Zaminder of Padrishibpur, Fr. Betrand Rodrigues, the Parish Priest of Padrishibpur.

1954 Padrishibpur Girls High School is transferred to Barisal

1955 Renovation and Repair of the Church (1956)

1956 "Little Handmaids of the Church" (LHC), a local Religious Society started in Barisal and quite a few Padrishibpur girls joined the Society at later years.

1957 Starting of "Jishur Sebok Sebika" Sangha for girls and for altar boys.

1958 Renovation and Repair of the Church

1958 St. Joseph's Boarding House was made into a St. Joseph Apostolic Boarding for students aspiring to be Priest, male Religious and leaders in the community. The boarding was closed in 1964.

1958 St. Alfred's High school celebrated the Silver Jubilee of its foundation.

1958 'Agricultural Development Center (ADC)' of Padrishibpur was created.

1960 Padrishibpur "Ujjala Mohila Somobay Somity" started in 1960.

1961 St. Vincent de Paul Society (SVP) started in Padrishibpur.

1961 Tidal Waves and Tornado in the Coastal Area about 100 km from Padrishibpur. Patrick D'Rozario and Gabriel Manik Gomes (Matibhanga), were caught by natural calamities as they were in Sonatola in the South teaching Catechism. They were sent by Fr. Philip Payent, csc, PP. to those Baptist families who wanted to join the Catholic Church. People of the village came to Padrishibpur for a temporary shelter after the cyclone. The initial and direct contact with the Rakhaine Community was made.

1964 Renovation and Repair of the Church and construction of the 2nd floor House for the Priests.

1965 Because of the war between India and Pakistan, the Holy Cross Sisters left their convent and went to Barisal for their safety. From 1992 LHC Sisters took their residence in their House. Renovation was done in 2023.

1966 St. Alfred High School opens the Co-education of Boys and Girls in the School.

1967 Girls boarding again started with new name, Dipty Hostel.

1968 Most Rev. Joachim Rozario, csc, Bishop of Chittagong

1968 Fr. Joachim Rozario, csc, from Solepur, was appointed and consecrated as the first Local Bishop for the Diocese of Chittagong. Bishop Joachim Rozario, csc retired in 1994 and died in 1996.

1969 The Sisters of the LHC opened a Convent in Padrishibpur at the house of Mr. Bernard Sir infront of Nayeb Mohashoy's house.

1970 Cyclone and Tidal Waves took place in the coastal belt of Bangladesh. Padrishibpur was also affected by the calamity.

1970 The present two story Building of St. Alfred School was built for High School on West-Northern side in the campus by Bro. Alberic Houle, csc. at the front of the Gilbert Wheatley House, the latter is now being used as Parish Hall.

1971 With war of Liberation starting from March Bangladesh became an independent country separating from Pakistan and winning final Victory on 16th December. Padrishibpur Parish took active part in the liberation struggle and development work after the Independence because of the exceptional involvement of Fr. Germain Grandmaison, csc, the Parish Priest of Padrishibpur. In the Liberation he played a major role.

1973 In Padrishibpur "Preventive Health Program" started which was changed to Under Five and Maternity Clinic which was active till 2016.

1974 Six new Districts were created in Barisal: Barisal, Patuakhali, Borguna, Pirojpur, Bhola and Jhalakathi.

1974 Bazar and Shops from the two sides of the road approaching D'Silva ghat to

Srimonto, from the South-West corner of the Sisters' campus, and at the western side of of the school field was shifted to the present New Market which was built by the Mission.

1974 The Road to West infront of the Church was built by Fr. Germain by CORR project.

1983 First starting of Basic Christian Community (BCC) with Bible Sharing and other activities at the 11 wards including the sub-centers, with the initiative of Fr. Patrick D'Rozario, csc.

1983 Padrishibpur Credit Union Somobay Somity started.

1989 Fr. Leo Gomes, the first Priest of Padrishibpur died on March 17 and buried in Padrishibpur cemetery.

1990 Fr. Patrick D'Rozario, csc, a son of the soil of Padrishibpur, was appointed and consecrated as the First Bishop of newly erected Diocese of Rajshahi in North Bengal and served there till 1995 April.

1991 Major Renovation and Repair of the Church was done by Fr. G. M. Tourangeau, csc.

1993 St. Joseph's Home for the orphan boys started in the old house of the Brothers of Holy Cross. Afterwards in 2003 it was shifted to Gournadi.

1995 Most Rev. Patrick D'Rozario, csc, Bishop of Chittagong

1995 Bishop Patrick D'Rozario, csc was appointed and installed as Bishop of Chittagong Diocese and was transferred from Rajshahi on 21st April.

1996 The present new "Church of Our Lady of Protection" in Deshantorkathi was blessed by Bishop Patrick D'Rozario, csc., the Bishop of Chittagong.

1998 Fr. Benjamin Labbe, csc, the Parish Priest of Padrishibpur died of a road accident on Gournadi road on the way back by motor cycle. He has been buried in Padrishibpur cemetery.

2000 The Great Jubilee of 2000 and also of the 400th Anniversary of the first Church in Chittagong was celebrated throughout the Diocese of Chittagong.

2002 The 75th Anniversary of the Diocese of Chittagong was celebrated in all parishes and institutions.

2004 Present new "Church of St. Anthony" in Rajabaria has been built by the Parish Priest of Padrishibpur Fr. Ezzio Mascaretty, Pime and was blessed by Bishop Patrick D'Rozario, csc.

2005 Third Church new Church of Padrishibpur was built and blessed on 14th April, by Bishop Patrick D'Rozario, csc., Bishop of Chittagong.

2005 The Loreto Sisters from Calcutta opened a Convent in Padrishibpur at the old house of the "Ujjala Mohila Somobay Somity" after being renovated for their living accommodation.

2006 The Golden Jubilee of the "Little Handmaids of the Church" was celebrated in Barisal.

2006 Holy Rosary Seminary was transferred from Gournadi in 2003 and the present new building constructed, campus renovated and blessed on november 2006.

2008 Present new Church along with School and Rectory building of Matibhanga was blessed and inaugurated.

2008 St. Alfred High School celebrated 75th Anniversary of its foundation.

2009 Three-storied Building called Jubilee Bhavan of St. Alftred High School on northern side was constructed & in augurated on January 30.

2009 Five Cyclone Shelters were built among the Rakhaine Communities in the South and four among Bengali Communities in Patuakhali, Sonatola and Matibhanga.

2010 The present new Dipty Hostel building was erected in 2010 by Fr. Ezzio Mascaretti, pime

2010 Bishop Patrick D'Rozario, csc, was appointed on 25th November as Coadjutor Archbishop of Dhaka who took the responsibility of the Metropolitan Archbishop of Dhaka on 22nd October, 2011. He served the Archdiocese and CBCB as President till 2020 when he went to retirement at the age of 77 years of age.

2011 Most Rev. Moses Montu Costa, csc, Bishop of Chittagong

2011 Bishop Moses Costa, csc of Dinajpur Diocese was appointed and installed as the Bishop of Chittagong. He served the Diocese till his death in 2020.

2012 Reception was given to Archbishop Patrick D'Rozario, csc, at the first visit to Padrishibpur after being the Archbishop of Dhaka on 1st January both at the Parish and at his home.

2013 The office of the Diocesan Pastoral Service Team was transferred from Barisal to Chittagong.

2013 The new two-storied Covent building of the Loreto Sisters was constructed by Fr. Ezzio Marcarenhas, pime, financed by the Loreto Community.

2016 The 25th Anniversary of the Episcopal Ordination of Bishop Patrick D'Rozario, csc was celebrated together with all the Priests, Religious and married couples of Padrishibpur completing 25 years. It was celebrated at the Parish Center as well as at home of Archbishop Patrick D'Rozario, csc. on 1st January, 2016.

2016 Archbishop Patrick D'Rozario, csc, the Archbishop of Dhaka was elevated to be a Cardinal by His Holiness Pope Francis during the Consistory of November 19. He is the first Bishop and Archbishop of Padrishibpur, first Bengali Cardinal of Bengal – Bangladesh and West Bengal.

2017 Chittagong Catholic Diocese was made a Metropolitan Archdiocese of Chattagram on 2nd February, 2017 and Bishop Moses Costa, csc was appointed the Archbishop of Chattagram.

2019 Five Hundred Years of Christianity was celebrated in Diang commemorating the first settlement of Christians from Portugal.

Padrishibpur Under Barishal Diocese (2016-20...)

2016 Most Rev. Lawrence Subrato Howlader, csc, Bishop of Barishal

2016 Erection of Barishal Catholic Diocese and Auxiliary Bishop of Chittagong, Bishop Lawrence Subrato Howlader, csc, was installed as the Ordinary of the Diocese of Barishal.

2017 Rajabaria Church of St. Anthony was made a Diocesan Pilgrimage Center after the Pilgrimage of St. Anthony's partial body was brought to this Church.

2017 Barishal Diocese of the "Church of Bangladesh" was established in 2017.

2018 The Chittagong Diocese was elevated as Metropolitan Archdiocese and Bishop Moses Costa, csc, was made the Archbishop of Chittagong.

2018 Five Hundred Anniversary of the Christian presence in Bengal was celebrated in Diang, Chittagong on 2-5 February.

2018 Fr. Philip D'Rozario, a Priest of Padrishibpur died on 10th May and is buried in Padrishibpur.

2021 Matibhanga Sub-Center of Padrishibpur has been made a new full fledged Parish with name "Catholic Parish of Queen of Peace" by Bp. Subrato Lawrence Howlader, csc., Bishop of Barishal Diocese.

2021 Bishop Subrato Lawrence Howlader, csc has been appointed as the Archbishop of Chittagong Archdiocese and took possession of it on 9th April.

2021 St. Alfred High School was upgraded as College, now named: St. Alfred High School and College.

2022 The present "Cardinal Porompora Museum" was erected in 2021 by the Relatives and Well-wishers of Family Porompora at the home of Parer Babur Bari, Padrishibpur and inaugurated and blessed by Cardinal Patrick D'Rozario, csc, on the occasion of the Golden Jubilee of his Sacerdotal Ordination celebrated on 1st January, 2022, with presence of many dignitaries and leaders of the Church.

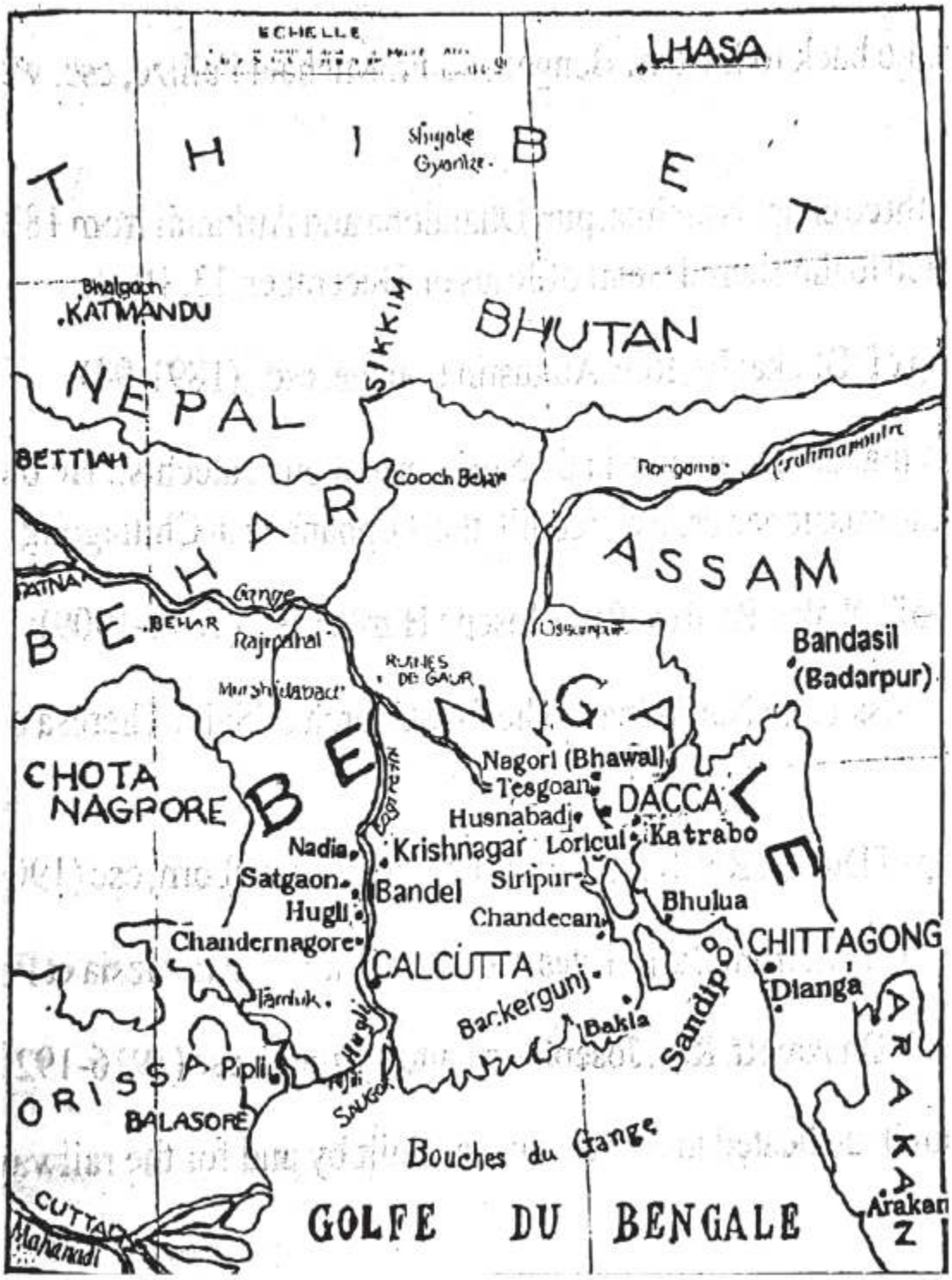
2022 Most Rev. Emmanuel Kakon Rozario, Bishop of Barishal

2022 Fr. Immanuel Kanon Rozario, a priest of the Rajshahi Diocese, was appointed and consecrated as Bishop of Barishal Catholic Diocese.

2023 Cardinal Patrick D'Rozario, csc, together with assistance of a Committee for Publications took the initiative to compose a Book on Padrishibpur to commemorate the 260th Anniversary of the foundation of Padrishibpur Mission Center in 1764.

2024 Launching of the Book named: SRIMONTO-BATE PADRISHIBPUR : A LEGACY OF CHRISTIAN INHABITANTS with Solemn Eucharistic Celebration presided over by Most Rev. Emmanuel Kakon Rozario, Bishop of Barishal Diocese on 29th December. On the occasion people came from Chattogram, Dhaka, USA-Canad, India and other places and participated in the celebration of the historic event.

MAP OF BENGAL IN BRITISH PERIOD



MAP OF BANGLADESH



MAP OF BARISHAL DIVISION



MAP OF BARISHAL CATHOLIC DIOCESE



MAP OF BARISHAL DISTRICT



DISTRICT MAP; DISTRICT BARISAL

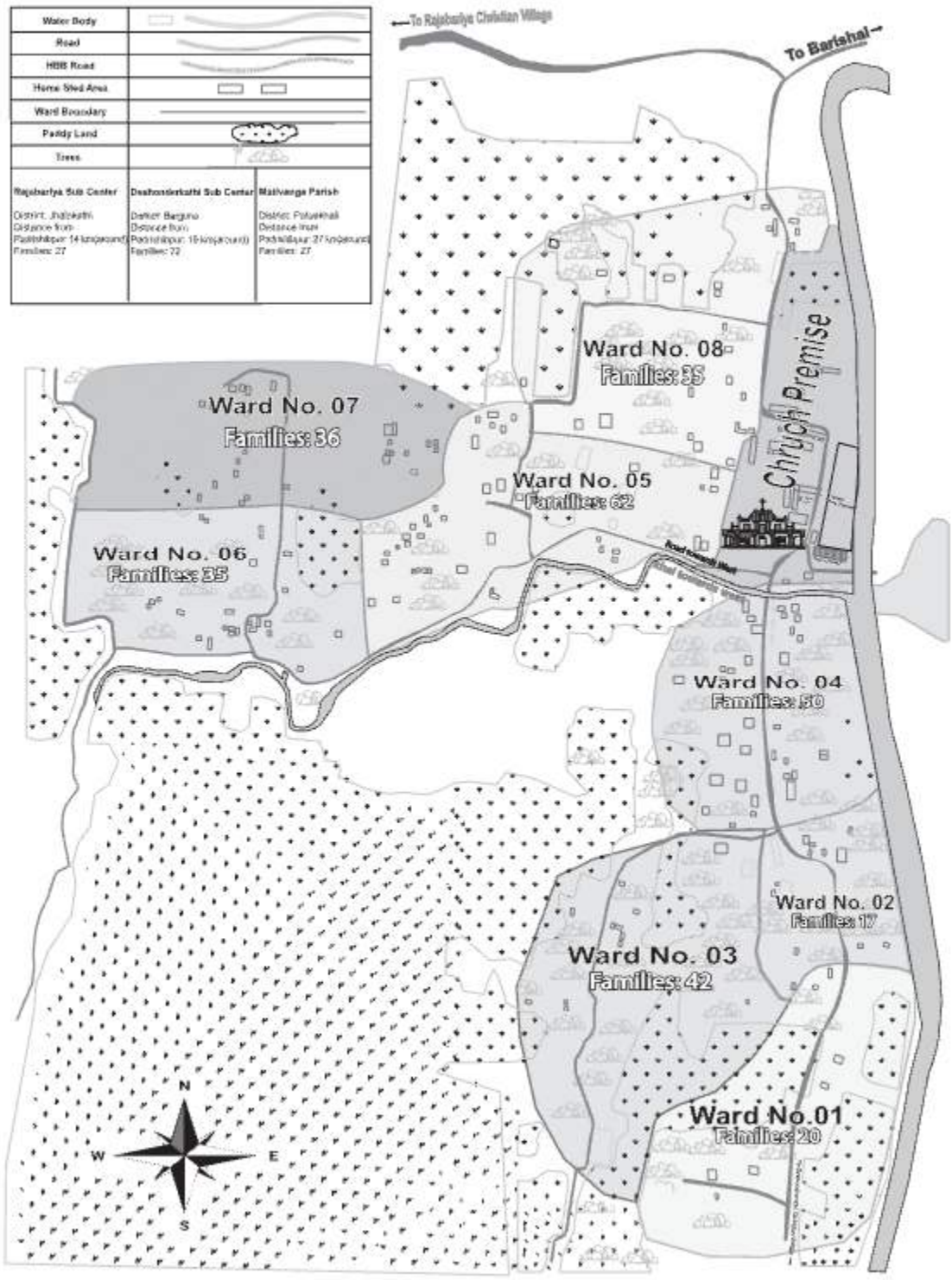
MAP OF BAKERGANJ UPAZILA



MAP OF PADRISHIBPUR UNION



MAP OF PADRISHIBPUR PARISH



প্রথম ভাগ

প্রেক্ষাপট: বরিশাল জেলা, বাকেরগঞ্জ উপজেলা ও পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়ন

লেখক: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

আলোচ্য বিষয়সূচির সারসংক্ষেপ
প্রথম অধ্যায়: বাকেরগঞ্জ/বরিশাল জেলা
॥ ক ॥ বাকেরগঞ্জ জেলা এবং বাকলা-র ইতিবৃত্ত
॥ খ ॥ বাকেরগঞ্জ জেলা থেকে বরিশাল জেলা:
(১) বরিশালে খ্রিস্টান জনবসতি
(২) বরিশাল শহরে কাথলিক গির্জা
(৩) বরিশাল কাথলিক ডাইয়োসিস প্রতিষ্ঠা
দ্বিতীয় অধ্যায়: বাকেরগঞ্জ উপজেলা
তৃতীয় অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়ন

অবতারণা:

এই গ্রন্থের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে "শ্রীমন্ত-বাটে পাদ্রীশিবপুর ঃ ঐতিহ্যবাহী একটি খ্রিস্টান জনপদ"। ভৌগোলিক মানচিত্রে পাদ্রীশিবপুর একটি অতি ক্ষুদ্র গ্রাম। কিন্তু বৃহত্বের সাথে পাদ্রীশিবপুরের সম্পৃক্ততা অকল্পনীয় ও সীমানা বিহীন। বৃহত্বের পরিধি ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ, দেশ ও বিদেশ সম্প্রসারিত। কালের সীমানায় পাঁচশত বছরের ও তারও অধিককালের সাথে সম্পর্কিত। একাধিক ধর্ম ও কৃষ্টি, জাতি ও সংস্কৃতি, ইতিহাস ও এতিহ্য এবং ভাষা ও আচরণের সংমিশ্রণ এ গ্রামে অতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

অতএব পাদ্রীশিবপুরে গড়ে ওঠা খ্রিস্টান এতিহ্যবাহী জনপদকে বুঝতে হলে অবশ্যই তার প্রত্যক্ষ-পারিপার্শ্বিকতার সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে। সেই জন্যে এই অধ্যায়ে গ্রন্থটির প্রেক্ষাপট হিসেবে এলাকার আদি ইতিহাস, ভৌগোলিক পরিবেশ ও জনগণের ধর্ম ও জীবন-সংস্কৃতির খুবই সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হল।

প্রথম অধ্যায়: বাকেরগঞ্জ/বরিশাল জেলা

॥ ক ॥ বাকেরগঞ্জ জেলা এবং বাকলা-র ইতিবৃত্ত[১]

বাকেরগঞ্জ পূর্ববঙ্গে অবস্থিত। এক সময় বৃহৎ বাকেরগঞ্জ জেলা ছিল ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরকুল নিয়ে এ জেলাটি গঠিত ছিল। উত্তরে ছিল ফরিদপুর, পশ্চিমে ফরিপুর ও বালেশ্বর নদী যা যশোহর থেকে পৃথক করে, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পূর্বে মেঘনা ও তার অববাহিকা। সর্বমোট আয়তন ছিল ৪৩০০ বর্গমাইল।

---

[১] *বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস, সংগ্রহ ও সম্পাদনায় তপংকার চক্রবর্তী ও সিকদার আবুল বাসার*

শংকর লাল দাশ-এর বিবরণে বলা হয়: "বরিশাল অঞ্চলের প্রাচীন নাম বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ। তবে বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের নামের আগে এটি "বাঙ্গালা" নামেও পরিচিত ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, বাঙ্গালা নামটি পরিবর্তিত হয়ে বাকলা হয়েছে। চতুর্দশ শতকে রাজা দনুজমর্দন চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তখন চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী ছিল বাকলা। মুঘল আমলে বাকলায় সুবে বাংলার একটি সমৃদ্ধশালী সরকারের শাসন ছিল। ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ অঞ্চল বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ নিয়ে বাকেরগঞ্জ নামে নতুন জেলা সৃষ্টি করা হয়। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে বাকেরগঞ্জ জেলার সদরদপ্তর বরিশাল শহরে স্থানান্তরিত করা হয়। বরিশাল নামটি অনেকটা হাল আমলের।"[২]

বাকলা সুন্দরবনেরই অংশ। বাকলার আরেকটি নাম "কচুয়া" যা ঐতিহ্যগত ভাবে চন্দ্রদ্বীপ রাজার পুরনো বাসস্থান বলে পরিচিত ছিল। কচুয়া বাউফল থানায় অবস্থিত, যা আজ পর্যন্ত খুবই উর্বরশীল এলাকা বলে পরিচিত এবং জেলার মধ্যে সবচাইতে বৃহৎ চাষাবাদী এলাকা বলে চিহ্নিত। দক্ষিণাঞ্চলের এই থানাটিতে হিন্দুদের একটি বিরাট বসতি ছিল। কচুয়ার অনেক এলাকা নদীগর্ভে চলে যায়। যার ফলে বাকলা নগর এবং ভূখণ্ড নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, যার সাথে সভ্যতাও ধ্বংস হয়ে যায়।

বাকলা একটি হিন্দু পরিবারের রাজত্বের অধীন ছিল। এই পরিবারটি বাংলার বার ভূঁইয়া বা শাসকদের মধ্যে একটি, যাদেরকে কাব্যিকভাবে বাংলার "দ্বাদশ সূর্য" বলে আখ্যায়িত হত।[৩]

পরিব্রাজক রালফ ফিচ্ ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে বাকলা পরিদর্শন করেন। বাকলা নামটি উল্লেখ করে পরিব্রাজক রোমে অবস্থিত জেসুইটদের সুপিরিওর জেনারেল ফাদার নিকোলাচ পিমেন্টার কাছে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে লেখা একটি চিঠিতে বঙ্গে কাথলিক মিশনারিদের কাজের সফলতা উল্লেখ করেন। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে ফাদার মেলখিওর ফন্সেকা, এস.জে তার একটি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন যে, অক্টোবর মাসে কমান্ডার-এর (সেকেন্ড ক্যাপ্টেন) নিমন্ত্রণে, চান্দেকান-এ (বর্তমান যশোহর) যাত্রাপথে তিনি বাকলা পরিদর্শন করেন এবং তিনি লিখেন যে, গত দুই বছর ধরে ওখানকার খ্রিস্টানরা কোন সাক্রামেন্ত গ্রহণ করার সুযোগ পায়নি।[৪]

বাকলার রাজা রামচন্দ্র রায় চান্দিকানের রাজা প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে বিবাহ করেন এবং বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ-এ প্রতিষ্ঠিত হয় তার রাজ্যের আসন। পরবর্তীতে "মগ"-দের আগমনে ও উৎপাতে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য মাধবপাশাতে স্থানান্তরিত হয়।[৫]

---

[২] BEVERIDGE, H.B.C.S, The District of Bakerganj: Its History and Statistics, London Trumer & Com., 1877. Reprint by Bakerganj District Council, Habib Press & Publications, 88 Sadar Road, Barisal, 1970, p. 23

[৩] শংকর লাল দাশ, গলাচিপা, পটুয়াখালি, শেরে বাংলা জীবনানন্দের বরিশাল, দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ।

[৪] Beveridge, 154

[৫] Beveridge, 23

সতেরো শতাব্দীতে, আওরঙ্গজেবের ভ্রাতা শাহ্ সুজাহ্, বরিশালে দক্ষিণ-পশ্চিমে পাঁচ মাইলের মাথায় সুজাবাদ নামে একটি স্থানে দুর্গ স্থাপন করেন। আঠারো শতাব্দীর প্রথম দিকে আগা বাকর খান এই এলাকার মালিক হন এবং বুজুর্গ উমেদপুর পরগনাতে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন যার নাম হয় বাকেরগঞ্জ, আক্ষরিক ভাবে "বাকেরের বাজার/গঞ্জ" বলে পরিচিত হয়। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে বাকেরগঞ্জ বাকলা সরকারের অঞ্চলে অন্তর্ভূক্ত হয় এবং মোঘল সাম্রাজ্যের সময় ঢাকা প্রদেশের আওতায় সংযুক্ত হয়।[৩]

ব্রিটিশ শাসন আমলে ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে বাকেরগঞ্জকে জেলা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। আবার ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে এই জেলার মধ্যে আসে অনেক পরিবর্তন। বিশেষ করে ঐ সময় ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটিয়ে মাদারিপুরকে ফরিদপুরের সাথে সংযুক্ত করা হয় এবং বরিশাল শহরে বেশ কয়েকটি সরকারী অফিস ও আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। তৎকালীন সময়ে প্রায় ৪,০০০ গ্রাম নিয়ে জেলাটি বিস্তৃত ছিল।

প্রকৃতিগত ভাবে বাকেরগঞ্জের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এটি নদীমাতৃক পলিমাটিভরা নদীতটের একটি সমতল এলাকা। "ধান নদী বিল খাল তার নাম বরিশাল" বলে পরিচিত; আরও বলা হত: "ধান নদী খাল – এই তিনে মিলে বরিশাল; "আবার আইতে সাল যাইতে সাল, তার নাম বরিশাল"। বড় বড় নদীতে আবার আছে ছোট ছোট বহু দ্বীপ বা চর। সবুজ গাছ-পালা, বন-জঙ্গল, খোলা (কোলা) জায়গা নিয়ে সজ্জিত। বাকেরগঞ্জ বৃহত্তর সুন্দরবনেরই অংশবিশেষ। তাই সেখানে রয়েছে সুন্দর ও রোমাঞ্চকার পরিবেশ ও প্রকৃতি।[৪]

বরিশাল ছিল এক শস্যভাণ্ডার, যার ফলশ্রুতিতে বরিশালকে "কৃষি ম্যানচেস্টার" বলেও আখ্যায়িত হতে থাকে। নদীমাতৃক সৌন্দর্যময় এলাকা হিসেবে, বঙ্গোপসাগরের তীরে এবং কীর্তনখোলা নদীকে ঘিরে জেলাটি অবস্থিত বলে "বাংলার ভেনিস" নামেও বরিশালকে অভিহিত করা হয়ে থাকে।[১]

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে বাকেরগঞ্জ জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ২,২৯১,৭৫২। তার ৬৮% মুসলিম; হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৭১৩,৮০০ এবং বৌদ্ধ ৭২২০ রাখাইন/"মগ" যারা ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে আরাকান থেকে এসে বসতি স্থাপন করে। বরিশালের আয়তন ছিল তখন ১১,৭৬৩ বর্গকিলোমিটার (বর্গমাইল ৪,৫০০)।

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি অনুসারে জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ছিল মুসলমান, আর এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে ছিল হিন্দু, কয়েক হাজার বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য কিছু জাতিগোষ্ঠি।

[৩] Beveridge, 27-28

[৪] Beveridge, 154

॥ খ ॥ বাকেরগঞ্জ জেলা থেকে বরিশাল জেলা

পাকিস্তান আমলে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে বাকেরগঞ্জ নাম বদলি করে নতুন নাম বরিশাল দেয়া হয়। আবার বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণাঞ্চলে বৃহত্তর বরিশালকে পুনর্গঠন করা হয় এবং সেখান থেকে আরও ছয়টি ভিন্ন জেলা স্থাপন করা হয় যার নাম হচ্ছে: বরিশাল, পটুয়াখালি, বরগুনা, পিরোজপুর, ভোলা এবং ঝালকাঠি। এই ছয়টি জেলা নিয়ে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে বরিশাল ডিভিশন গঠিত হয়।[৮]

বর্তমান বরিশাল জেলাটি ১০টি উপজেলা নিয়ে গঠিত: বাকেরগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, বানরিপাড়া, উজিরপুর, গৌরনদী, আগৈলঝাড়া, হিজলা, মুলাদি, মেহেন্দিগঞ্জ এবং কাজির হাট। নতুন জেলা হওয়ার পরে বরিশাল জেলার আয়তন দাঁড়ায় ২৭৮৪.৫২ বর্গকিলোমিটার (বা ১০৭৫.১১ বর্গমাইল) যা পূর্বের আয়তনের প্রায় এক চতুর্থাংশ। ২০১১ খ্রিস্টাব্দের আদম শুমারি অনুসারে বরিশালের জনসংখ্যা ছিল ২,৩২৪,৩১০ জন।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো: জনশুমারি ও গৃহগণনা - ২০২২ অনুসারে বরিশাল ডিভিশনের মোট জনসংখ্যা হচ্ছে: ১১,১৫৪,৫৭১। তার মধ্যে আছে: মুসলমান ৮,৩৩১,৫৪২; হিন্দু ৭৫০,১৫৪; খ্রিস্টান ১২,০৭২; বৌদ্ধ ৪,৫০৭; অন্যান্য: ১,১০৪ জন।[৯]

২০২২ খ্রিস্টাব্দের জরিপ অনুসারে বরিশাল জেলার মোট জনসংখ্যা: ২,৫৪০,২৪৭; তার মধ্যে মুসলমান: ২,২৫৩,৬৫৮; হিন্দু: ২৭৫,২৫৮; খ্রিস্টান: ১১, ১৩৮; বৌদ্ধ: ১২৯; অন্যান্য: ৬৪ জন।[১০]

বরিশাল ও তার পূর্ববর্তী নাম বাকেরগঞ্জের আদি সম্বন্ধে বিভিন্ন জনার বিভিন্ন মতামত রয়েছে। একটি গবেষণা অনুসারে প্রাচীনকালে বরিশাল বাঙ্গালা নামে পরিচিত ছিল। কালের বিবর্তনে এই বাংলা শব্দটি বাকলা নামে পরিচিতি লাভ করে। কথিত আছে ডাঃ কানুনগো নামে এক ব্যক্তি বাকলা বন্দরটি নির্মাণ করেন। আরব ও পারস্য বণিকরা এখানে সমুদ্রবন্দরে বাণিজ্য করতে আসত। দশম শতাব্দীতে চন্দ্র রাজবংশ দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় চন্দ্রদ্বীপ নামে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। বাকলা ছাড়াও চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত ছিল বর্তমান মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলাগুলি। চতুর্দশ শতাব্দীতে সমগ্র বাংলাদেশ যখন মুসলমানদের দখলে, তখন দনুজমর্দন দেব বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ নামে পরিচিত এই অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৯৭ সালে এই অঞ্চলকে ব্রিটিশ প্রশাসন বাকেরগঞ্জ জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮০১ সালে জেলার সদর দপ্তর গিরদে-বন্দরে (বৃহৎ বন্দর) অর্থাৎ বর্তমানে বরিশাল শহরে স্থানান্তরিত হয়।[১১]

---

[৮] উইকিপ্যাড

[৯] Bp. Alfred LePailleur, csc., *Le District de Backerganj et Nos Missio,* Chittagong 1941, 1-4

[১০] Wikipedia : Barishal Division

[১১] Beveridge, 231-232

বরিশালের নামকরণ নিয়ে অনেকের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বড় উইলো গাছের কারণে (বরো + শাল) = বরিশাল; পর্তুগীজ বণিক বেরি এবং শেলির প্রেমের গল্প থেকে বরিশাল; বড় লবণ বলের জন্য বরিশাল ইত্যাদি। গিরদে বন্দরে (বৃহৎ বন্দর) বরিশালে ঢাকার নবাবদের একটি বড় লবণ ফাঁড়ি ছিল। ইংরেজ ও পর্তুগীজ বণিকরা এই অঞ্চলকে "বরিসল্ট" বলত কারণ এখানে বড় (বরি) লবণের (সল্ট) মজুদ এবং লবণের বড় দানা খ্যাত ছিল। বরিসল্ট বদলে বরিশাল হয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে। অনেকে আবার মনে করেন বরিশাল বরিশাল বলেই পরিচিত।[১২]

বরিশালের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনুধাবন করে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার তার ১৯১৩-১৪ সালের বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে ফরিদপুর ও খুলনা জেলাসহ বরিশাল বিভাগ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছিল।

পরবর্তীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে তা বাস্তবায়িত না হলেও বরিশাল খুলনা বিভাগের অন্তর্ভূক্ত ছিল। অবশেষে, ফরিদপুর ও খুলনা জেলা থেকে পৃথক করে প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য এবং বৃহত্তর বাকেরগঞ্জ জেলা নিয়ে ১৯৯৩ সালের ১লা জানুয়ারি বরিশালকে বিভাগ স্থাপিত হয়।[১৩]

বাংলার শস্যভান্ডার বরিশাল এক সময় 'কৃষি ম্যানচেস্টার' নামে পরিচিত ছিল। বরিশালের অর্থনীতির সঙ্গে বাংলার অর্থনীতি যুক্ত ছিল। পলির সমন্বয়ে গঠিত এই উর্বর এলাকাটি ছিল কৃষির জন্য চমৎকার এবং বসবাসের জন্য উত্তম। অর্থনীতির প্রধান উৎস ছিল কৃষি। পর্যটক রাল্ফ ফিস ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে বাকলাকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ বলে বর্ণনা করেন, যেখানে চাল, কার্পাস, সিল্ক কাপড় এবং বড় ঘরের কথা উল্লেখ করা হয়।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় এ অঞ্চলের মানুষ সাহসিকতার সঙ্গে পাক হানাদারদের প্রতিহত করে। বাংলাদেশের সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের মধ্যে ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের জন্ম বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলায় এবং বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোস্তফা কামাল ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। যুদ্ধকালীন হেমায়েত বাহিনীর বীরত্ব আজও ইতিহাসে জ্বলজ্বল করছে।[১৪]

বরিশাল অঞ্চলটি ১৮০০ সাল পর্যন্ত হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল। পরবর্তীকালে, বিভিন্ন এলাকা থেকে মুসলমানদের আগমন, ধর্মান্তরকরণ এবং হিন্দুদের ব্যাপক দেশত্যাগের ফলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়। বর্তমানে এখানে বেশ কিছু খ্রিস্টান ও বৌদ্ধও বসবাস করে। প্রাচীনকালে বরিশালে 'চন্দ্রভদ্র' নামে এক জাতি বাস করত। বর্তমান নমঃশূদ্ররা তাদেরই বংশধর। রাখাইন নামে পরিচিত একদল মানুষ পটুয়াখালীর দক্ষিণাঞ্চলে বসবাস করে, সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতির দিক থেকে তাদের নিজস্ব পরিচয় ধরে রেখেছে।[১৫]

---

[১৩] ibid, p. 233
[১৪] ibid, p. 236
[১৫] ibid, pp.327-328
[১২] Beveridge, 231-232 ,

বরিশাল অঞ্চলের মানুষ সত্যিই আরামদায়ক এবং খাবারের প্রতি অনুরাগী। পারিবারিক দিক থেকে তারা খুবই ঘনিষ্ঠ এবং আন্তরিক। নানা রকম সুস্বাদু তেলে ভেজানো খাবারের পর ডেজার্ট ছাড়াও তৃপ্ত হয় না তারা। এখানে চালের গুড়ে খেজুরের রস, নারিকেল এবং দুধ দিয়ে নানা রকম পিঠা, পুলি ও কেক বানানো হয়। অতিথি আপ্যায়নে বরিশালের মানুষের সুনাম সর্বজনবিদিত।[১৬]

শিল্প সাহিত্যের দিক থেকে বরিশালের রয়েছে গৌরবময় ঐতিহ্য। কবি জীবনানন্দ দাশ, সুফিয়া কামাল, আহসান হাবীব, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বিজয় গুপ্ত, চারণ কবি মুকুন্দ দাস, বরিশাল বিভাগের সন্তান। অন্যান্য ক্ষেত্রে এই বিভাগের স্মরণীয় ব্যক্তিত্বদের মধ্যে রয়েছেন শেরে বাংলা একে.এম, ফজলুল হক, তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, আবদুর রব সেরনিয়াবাদ, আরজ আলী মাতুব্বর, মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজরিও, সিএসসি (বাংলার প্রথম ও একমাত্র বাঙালি কার্ডিনাল) প্রমুখ।"[১৭]

(১) বরিশালে খ্রিস্টান জনবসতি

বর্তমান গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক বলে, ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট হিসাবে এবং খ্রিস্টীয় ঐক্য প্রচাষ্টার সাথে সংযুক্ত বলে, এই বরিশাল জেলার বর্তমান খ্রিস্টান বসতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা উল্লেখ করা যুক্তি যুক্ত মনে করছি।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি অনুসারে বাকেরগঞ্জে ৪,৮৫২ জন খ্রিস্টান ছিল। বাকেরঞ্জের মধ্যে তখন কোটালিপাড়া এবং গৌরনদী এলাকাও অন্তর্ভূক্ত ছিল, যে-এলাকা ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে মাদারিপুরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। অতএব মাদারিপুর বাদ দিলে বাকেরগঞ্জের খ্রিস্টানদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০০ তার মধ্যে প্রায় ৮০০ জন খ্রিস্টান ছিল পাদ্রীশিবপুর পর্তুগীজ কলোনিতে আর বাকী ১০৫২ জন ছিল বাকেরগঞ্জের উত্তর-পশ্চিম এলাকায়।[১৮]

ড. ডেনিস দিলীপ দত্ত "আমি ও আমার সময়"[১৯] , ২০১৭, পৃষ্ঠা ১০-২৪ প্রকাশিত বইয়ের বিবরণ অনুসারে বাকেরগঞ্জের উত্তর এলাকাটি ছিল ধামশর, শিকারপুর, ইন্দুরকানী, আশকর, ধানডোবা ও অন্যান্য গ্রাম। ইতিহাসবিদ এইচ. বেভেরিজের লেখার উদ্ধৃতি দিয়ে ড. দিলীপ দত্ত বলেন যে, বিভারেজ "ধামশরকে' ব্যাপ্টিস্ট মিশনের প্রধান কেন্দ্র" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এই এলাকায় বিশেষভাবে রেভা জন চেম্বারলেন পেইজ নামক একজন মিশনারি বাণী প্রচার করেন। ১৮৩৩-১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে নব বিশ্বাসীরা নানা ভাবে অত্যাচারিত হতে লাগল। স্থানীয় জমিদার তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে খ্রিস্টানদের হয়রানি করত। ঐ সময়কালে এলাকার খ্রিস্টানদের একটি সুন্দর চিত্র ড. ডেনিস দত্ত তাঁর লেখায় তুলে ধরেন। যারা নববিশ্বাসী ছিল তাদেরকে ড. দত্তের প্রপিতামহ দীপচাঁদ ধামশরে একত্রিত করে একটি খ্রিস্টান সমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের দিকে।

---

[১৬] বাংলাদেশ বুরো অব স্টাটিস্টিক; ২০২২ খ্রিস্টাব্দের জরিপ

[১৭] Wikipedia: Barisha Division; Wikipedia Padrishibpur.

[১৮] Beveridge, 231-232

[১৯] ড. ডেনিস দিলীপ দত্ত "আমি ও আমার সময়", ২০১৭, পৃষ্ঠা ১০-২৪

এই গ্রামের এক পাশে ছিল একটি এ্যাংলিকান চার্চ। হেনরি বেভেরিজ তৎকালীন বেশ কয়েকজন মিশনারীদের নাম উল্লেখ করেন। তাদের মধ্যে আছেন: মি. গারেট, মি. প্যারী, মি. স্মিথ, মি সিলভেস্টার বাড়েইরো (বাড়ৈ), মি. পেইজ, মি. সেইল প্রমুখ আরও অনেকে।[২০]

খ্রিস্টধর্ম প্রসারের অন্যতম কারণ হিসেবে অনেকে "কর্তা ভজ" এবং "সত্য গুরু" – দুটো সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেন। "কর্তা ভজ" ছিল তারা যারা প্রভুর উপাসনা বা ভজনা করে। আর দ্বিতীয় সম্প্রদায়, অর্থাৎ "সত্য গুরু" সম্প্রদায়ের মন্ত্র ছিল: "সত্য বল, গুরু ধর, সঙ্গে চল"।[২১]

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল শহরটি পাঁচটি গ্রাম নিয়ে গঠিত ছিল: বরিশাল, বগুরা, আমানতগঞ্জ, আলেকান্দা এবং কাউনিয়া। অন্যান্য সরকারি অফিস ও আদালত ছাড়াও এখানে ছিল শুল্কাগার, রেজিস্ট্রেশন অফিস এবং ইংলিশ চার্চ। বরিশালের মোট লোক সংখ্যা ছিল ১৩,৩৩২ যার মধ্যে মাত্র ১৫০ জন ছিল খ্রিস্টান। নিশ্চিত করে বলা যায় যে, তখনকার সময়ে মোট লোকসংখ্যার অর্ধেক ছিল মুসলমান এবং অর্ধেক ছিল হিন্দু।[২২]

মিথু শিলকের লেখায় বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের স্থাপত্যশিল্পের শৈল্পিক নিদর্শন হচ্ছে "এপিফানি অক্সফোর্ড মিশন গির্জা"। "ইংরেজ, আইরিশ ও আমেরিকান মিশনারীরা সাম্রাজ্যের অধীনস্ত এলাকায় থিতু হয়েছেন শতাব্দীকাল পূর্বেই। রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতায় নয় কিন্তু গড়ে উঠেছে আধ্যাত্মিক ও আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে অক্সফোর্ড মিশন চার্চ গির্জা।" গির্জাটি নির্মাণের কাজ শুরু হয় ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে এবং সমাপ্তি ঘটে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে। "সময়কে হার মানিয়ে বরিশাল শহরের প্রাণকেন্দ্রে গড়ে ওঠে সুউচ্চ গির্জাটি। ... ইংল্যাণ্ডভিত্তিক অ্যাংলিকান মিশনারিরা ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে বরিশালে তাদের কার্যক্রম শুরু করেন।"

বরিশালে বিভিন্ন থানা উপজেলায় কমবেশী বেশ খ্রিস্টান ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করছে। বরিশাল জেলার প্রায় প্রত্যেকটি উপজেলায় বিশেষ করে গৌরনদী, আগৈলঝড়া, উজিরপুর, প্রমুখ বিভিন্ন মণ্ডলীর খ্রিস্টানগণ রয়েছে এবং তারা কোন কোন জায়গায় একই বাড়িতে, গ্রামে ও পাশাপাশি গ্রামে একত্রে বাস করে। নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, একসময়ে বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রোটেস্টান্ট মণ্ডলী মূল ধারা ব্যাপ্টিস্ট ও অ্যাংলিকানদের উৎপত্তি হয় গৌরনদী ও আগৈলঝড়া উপজেলা থেকে এবং এলাকার মণ্ডলীগুলোর নেতাদের নেতৃত্ব সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে অ্যাংলিকান চার্চের বরিশাল ও ফরিদপুর প্যারিশগুলো নিয়ে জোবারপাড় ডিনারী নিয়ে নতুন বরিশাল ডাইয়োসিস প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের জনসংখ্যা জানার কোন সূত্র পাওয়া যায়না।

২০২২ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি অনুসারে বরিশালের খ্রিস্টানদের সংখ্যা হচ্ছে ১১,১৩৮। অনেকেরই ধারণা এ সংখ্যা সঠিক নয়। তবে সংখ্যা যাই হোক না কেন অনেকের মতে মোট খ্রিস্টান জনসংখ্যার মধ্যে কাথলিক দুই-তৃতীয়াংশ এবং এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছে অ্যাংলিকানসহ সকল প্রোটেস্টান্ট মণ্ডলী।

---

[২০] Ibid
[২১] Ibid
[২২] Ibid

(২) বরিশাল শহরে কাথলিক গির্জা

লিখিত আছে যে, প্রথম দিকে বরিশালে কোন কাথলিক গির্জা ছিল না। কয়েকটি ইউরোপীয় পরিবার বাস করত এবং তাদের জন্য বাড়িতে খ্রিস্টযাগ অর্পণ করার জন্য পূর্ববঙ্গ ভিকারিটের প্রধান শ্রদ্ধেয় বিশপ অলিফের নির্দেশনায় ফাদার গোয়ারাঁ নামে একজন পুরোহিত আসতেন। শহরের প্রখ্যাত কাথলিকদের মধ্যে ছিলেন মি. পিটার ডি'সিলভা। তিনি "সাগরদি লাল কুটি"তে বসবাস করতেন। পাদ্রীশিবপুর ইতিহাসেও তার নাম এবং তার পুত্র ইগ্নেসিয়াস ডি'সিলভার নাম উল্লেখ রয়েছে। বরিশাল শহরে প্রথম পুরোহিত যিনি বসবাস শুরু করেন তিনি হলেন ফাদার ডুসে, সিএসসি। ডি'সিলভাদের বদান্যতায় প্রদত্ত জমির ওপর যাজকের জন্য একটি বাসভবন ও চ্যাপেল নির্মাণ কাজ শুরু করা হয় ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন, "সাধু পিতরের চ্যাপেল" নামে ফাদার বি. রুশ নবনির্মিত চ্যাপেলটি উৎসর্গ করেন। বর্তমান যাজকদের বাসগৃহটি অতীতের সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বরিশাল ৫নং সদর রোডে অবস্থিত "সাধু পিতরের গির্জা" নির্মিত হয় ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে বারান্দা নির্মাণ করে সম্প্রাসারিত করা হয়। পিটার ডি'সিলভার ছেলে ইগ্নেসিয়াসের উদ্যোগে এবং ঢাকার নওয়াবসহ আরও অনেক বিদেশী খ্রিস্টভক্তদের অনুদানে মূল গির্জাটি নির্মিত হয়। অনুদাতাদের নাম গির্জার প্রাচীরে প্রস্তর ফলকে লিখিত রয়েছে।[২৩]

(৩) বরিশাল কাথলিক ডাইয়োসিস প্রতিষ্ঠা (২০১৬)[২৪]

২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন প্রতিষ্ঠিত বরিশাল কাথলিক ডাইয়োসিস উদ্বোধন করা হয় এবং শ্রদ্ধেয় বিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার, সিএসসি, ডাইয়োসিসের প্রথম বিশপরূপে অধিষ্ঠিত হন। ডাইয়োসিসের মধ্যে নিম্নোক্ত জেলাগুলো: বরিশাল, বরগুনা, ভোলা, ঝালকাঠি, পটুয়াখালি, গোপালগঞ্জ, মাদারিপুর, শরিয়তপুর, ফরিদপুর এবং রাজবাড়ি। বরিশাল ডাইয়োসিসের মধ্যে আছে পাদ্রীশিবপুরসহ এবং পাদ্রীশিবপুর থেকে পৃথক করে ২০২১ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত নতুন মাটিভাঙ্গা ধর্মপল্লীসহ মোট সাতটি ধর্মপল্লী এবং ২টি উপধর্মপল্লী। অতীতের বৃহত্তর প্যারিশগুলো হচ্ছে: পাদ্রীশিবপুর (১৭৬৪), বরিশাল (১৮৬৪), গৌরনদী (১৮৮৪), নারিকেলবাড়ি (১৯২১) ও বানিয়ারচর (১৯৩৮-খুলনা)। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের কাথলিক ডিরেক্টরী অনুসারে বরিশাল ডাইয়োসিসের জনসংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে ১৯,৫৬৭ জন। আমার মতে এই পরিসংখ্যানও সম্পূর্ণভাবে সঠিক নয়। আমার মনে হয় বর্তমানে স্থানীয় বাসিন্দা সংখ্যা পেতে হলে অন্ততঃ ২০-২৫% সংখ্যা বাদ দিয়ে গণনা করতে হবে, তার কারণ হচ্ছে তারা বিভিন্ন কারণে বরিশাল ডাইয়োসিসের বাইরে অভিবাসী হয়ে চলে গেছে।

---

[২৩] জুবিলী খ্রি. পৃষ্ঠা ৫৩-৫৪,

[২৪] The Catholic Directory of Bangladesh, 2023

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাকেরগঞ্জ উপজেলা[২৫]

ভৌগোলিক অবস্থান, আয়তন ও ইউনিয়নসমূহ

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে বাকেরগঞ্জ জেলা যখন বরিশাল জেলা হিসেবে নামকরণ করা হয় তখন বাকেরগঞ্জকে সরকারি প্রশাসনিক ভাবে একটি উপজেলা হিসেবে গণ্য করা হল। বিশ্বের মানচিত্রে বাকেরগঞ্জ-এর অবস্থান ২২০২৭' এবং ২২০৪০ অক্ষাংশের এবং ৯০০১২' এবং ৯০০৩৩' দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। বাকেরগঞ্জের আয়তন ৪১.৯৯ বর্গ কিলোমিটার। বাকেরগঞ্জের সীমানা: উত্তরে নলছিঠি ও বরিশাল সদর উপজেলা, দক্ষিণে মির্জাগঞ্জ, দুমকি ও বাউফল উপজিলা, পূর্বে ভোলা সদর, পশ্চিমে বেতাগি ও রাজাপুর উপজেলা।

১৪টি ইউনিয়ন নিয়ে উপজেলাটি গঠিত: কলসকাঠি, কাবাই, গারুরিয়া, চরাদি, চর আমাদ্দি, দারিয়াল, দুধাল, দুর্গাপাশা, নালুয়া, নিয়ামতি, পাদ্রীশিবপুর, ফরিদপুর, রঙ্গশ্রী, ভরপাশা। এখানে সর্বমোট মৌজা হচ্ছে ১৫১ টি এবং গ্রাম হল ১৯০ টি।

বাকেরগঞ্জের জনসংখ্যা: ৩৫৩,৯০৯ জন; পরিবারের সংখ্যা: ৭১,৫৩৭; বসবাসের ঘনত্ব: প্রতিবর্গ কিলোমিটারে ৮৫৭।

ধর্মীয় পরিচিতিতে ৯০.০৯% মুসলমান; হিন্দু ৯.৫৯% হিন্দু এবং ০.৩২% অন্যান্য সম্প্রদায় ভুক্ত যার মধ্যে ৩২০০ কাথলিক খ্রিস্টভক্ত।

সরকারি প্রশাসনিক অবকাঠামো ও রাজনীতি

* নির্বাচনের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন, উপজিলা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি বেছে নেওয়া হয়। জনপ্রতিনিধি বেছে নেওয়ার সময় এবং জাতীয় সংসদের জন্য এম.পি নির্বাচনে জনগণ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়।
* বাকেরগঞ্জ উপজিলার মধ্যে: উপজিলা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও পরিষদ ও মহিলা প্রতিনিধি এবং ওয়ার্ড মেম্বারগণ জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে থাকে।
* বাকেরগঞ্জ এলাকায় আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, জাসদ, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ফোরাম প্রভৃতি দল রাজনীতিতে সক্রিয়।

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম

* শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: কলেজ ৭ + ১; মাধ্যমিক স্কুল ৬৬, প্রাইমারী স্কুল ২৩৪; ফা. চার্লস জে ইয়াং টেকনিকাল স্কুল ১; মাদ্রাসা ৭২; ছাত্র-ছাত্রী নিবাস ৩; স্বাক্ষরতা: ৬২.৭৫%; পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টানদের স্বাক্ষরতা: ১০০%।
* প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক স্মৃতি চিহ্ন: মেহেদিগঞ্জ জামে মসজিদ (মুঘল আমল); গান্ধী ও রামকৃষ্ণ মিশন; পাদ্রীশিবপুর কাথলিক চার্চ ও প্রতিষ্ঠান (১৭৬৪ খ্রি.)।

[২৫] Wikipedia 2000: Barishal Division

* মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস: পাকসেনা দ্বারা কলসকাঠিতে ১৮১ জন মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যাকাণ্ড ব্যতীত আরও অনেক লুটতরাজ, হত্যাকাণ্ড ও ঘরবাড়ি অগ্নিকাণ্ড দ্বারা ধ্বংস করা হয়।
* ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান: মসজিদ ৮৬৯; মন্দির ১২১, চার্চ ১, কবরস্থান ২; খ্রিস্টান কবরস্থান ১।

পেশা, আয় ও কর্মসংস্থান

* ভূমির মালিকানা স্বত্ব: ৬৯.৬৩%; ভূমিহীন ৩০.৩৭%;
* আয়ের উৎস: কৃষিকাজ ৪২%; ব্যবসা-বানিজ্য ১৭.৬৫%; চাকরি ১৫.২৪%; অকৃষি শ্রমিক ৫.৭৬%; শিল্প ১.০৪%; যোগাযোগ কর্মসংস্থান ১.৬৭%; ভাড়া ২.৬৫%; এবং অন্যান্য ১১.৪৮%।
* কৃষি দ্রব্য ও ফলাদি: ধান/চাল, গম, পাট, সরিষা, আলু, পান, রবিশস্য ও শাক-সব্জি, মৎসচাষ, গরু ও মুরগী পালন; আম, কাঠাল, কলা, লিচু, কালজাম, সুপারি, পেঁপে, নারিকেল।
* কলকারখানা ও ফ্যাক্টরি: ধানকল ৭৫, কাঠ-কারখানা ৫০, ইটভাটা ২৮, বরফ কল ২; ওয়েল্ডিং কারখানা ১২।
* বিভিন্ন পেশায় যারা সম্পৃক্ত ছিল তাদের পরিসংখ্যান: মৎসচাষ ৪৯০, পশুপালন ৪০; কার্মকার ৭২, যুগী ১৫, মৃৎশিল্পী ৯৭, বাশের কাজ ১৭৬ জন।

যোগাযোগ, বিদ্যুত, স্বাস্থ্যসেবা

* যোগাযোগ ব্যবস্থা: পাকা রাস্তা ২৬ কিলোমিটার, সেমি পাকা রাস্তা, ৬৯ কিলোমিটার, মাটির রাস্তা ৭০০ কিলোমিটার; জলযোগাযোগ: ৬৯ নটিকাল মাইল।
* বিদ্যুতায়ন প্রায় ১০০% কিন্তু বিদ্যুতের অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা।

স্বাস্থ্য জীবন ও নিরাপদ ব্যবস্থা

*প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারি হাসপাতাল, ডিসপেন্সারি ও ক্লিনিকের ব্যবস্থা আছে; পানীয় জলের ব্যবস্থা: টিউব ওয়েল ৯০.১৩%; পুকুরের জল ৭:৭৫%, অন্যান্য: ২.০৭%; সেনিটারি ল্যাট্রিন ৪৩.৪১% এব ৫১.১৭% নন-সেনিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার করে আর ৫.৪২% পরিবারের কোন ল্যাট্রিন ব্যবস্থা নেই।

ক্রীড়া ও সামাজিক উন্নয়ন ও বিনোদন ব্যবস্থা

* হাট-বাজার, মার্কেট ও মেলার ব্যবস্থা আছে; ধর্মীয় উৎসব ও পার্বণ পালন এবং পহেলা বৈশাখ, মাতৃভাষা দিবস, ও বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা: ফুটবল, ক্রিকেট, হাডুডু, ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা, ইত্যাদি।
* উপজিলার মধ্যে বেশ কয়েকটি এন.জি.ও সংস্থা কাজ করে, যেমন: কেয়ার, কারিতাস, ব্রাক, আশা, প্রশিকা, পল্লী গণ-উন্নয়ন কেন্দ্র, সমবায় ঋণদান সমিতি ও ক্রেডিট ইউনিয়ন, প্রভৃতি কার্যরত আছে।

বিলুপ্ত প্রায়

গয়না, নৌকা যাত্রা, পাল্কী, নৌকা বাইস, দাড়িয়াবান্দা, বাইস্কোপ, যাত্রাগান, সার্কাস, বাঘের বসবাস, গ্রামের মধ্যে জোয়ার-ভাটা, জোয়ার-ভাটায় বিভিন্ন ধরনের মাছ ধরা, রাতে বাতি দিয়ে মাছ কোপানো, জাম্বুরা দিয়ে বা কাপড় দিয়ে বল তৈরী করে বল খেলা, দাড়িয়াবান্দা খেলা, কাচারী পুকুর থেকে পানীয় জল বাড়িতে নেওয়া, লীলা গান, (বিশেষ দ্রষ্টব্য: বাঁকা অক্ষরে লেখকের সংযোজন)

তৃতীয় অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়ন (১৩ নং)[২৬]

বাকেরগঞ্জ উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়নের মধ্যে পাদ্রীশিবপুর একটি অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য ইউনিয়ন। দক্ষিণ বাংলাদেশের অন্যতম শ্রীমন্ত নদীর তীরে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের একটি সৌন্দর্যমণ্ডিত ঐতিহ্যবাহী অঞ্চল হল পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়ন। বাকেরগঞ্জের তুলাতলা নদী থেকে শ্রীমন্ত নদী হয়ে পায়রা নদীর সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে নৌযোগাযোগ ছিল। বর্তমানে শ্রীমন্ত নদীর গোড়া থেকে বেদখলদাররা শ্রীমন্ত নদীর "শ্রী" হারিয়ে ফেলেছে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ ও দূষণের কারণে।

মিশন শ্রীমন্ত নদীর সঙ্গে পাদ্রীশিবপুর সংযুক্ত ছিল তিনটি ঘাট দ্বারা। মিশন প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে প্রাক্তণ হলিক্রস ব্রাদার বাড়ির (বর্তমানে হলি রোজারি সেমিনারি) সঙ্গে যুক্ত ছিল "গয়না ঘাট", ব্রাদার বাড়ির দক্ষিণ সীমানায় ছিল আড়াইবাকি থেকে আসা "ডি'সিলভা ঘাট" এবং বর্তমান খেলার মাঠের মাঝামাঝি ছিল "মিশন ঘাট"। সেই একই শ্রীমন্ত নদী বয়ে গেছে দক্ষিণে পায়রা নদীর দিকে আর তার পশ্চিমতীরে গড়ে উঠেছে দক্ষিণের খ্রিস্টান জনপদ।

শ্রীমন্ত নদীর আরেকটি অববাহিকা যা মিশনের দক্ষিণ-সীমানা ঘেসে পশ্চিম-দিকে প্রবাহিত হয়েছে একটি খাল যাকে বলা হত পশ্চিমের খাল। দক্ষিণে রাস্তার দিকে একই খালের উপর ছিল একটি পাকা পুল। গির্জার সামনে আরেকটি ঘাট ছিল যার নাম "পুলের গোড়ার ঘাট"।

জীবনদায়ী স্রোতঃস্বিনী শ্রীমন্ত ও তার একটি অববাহিকার তীরে গড়ে উঠেছে পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টীয় জনপদ – তার ইতিহাস ও পুরাকীর্তি, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য, পেশা, খ্রিস্টধর্মীয় জীবনধারা।

পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি[২৭]

ইউনিয়নের আয়তন: ৩০ বর্গ কিলোমিটার

---

[২৬] Wikipedia: Barishal Division

[২৭] Wikipedia: padreeshibpur.barisal.gov.bd

গ্রামের সংখ্যা: ১০ এবং লোকসংখ্যা: ৩৩,৯০০ (আদমশুমারী ২০১১)।

(১) আড়াইবাকী :	৩৭২৭ জন	(২) ভবানিপুর:	৩২০৫
(৩) বড় পুইয়াউটা	৩২৭১	(৪) পূর্ব মহেশপুর:	২৮৫৯
(৫) পশ্চিম দূর্গাপুর	৪৩২৩	(৬) পাদ্রীশিবপুর	৪৮০৮
(৭) পাঁচশিবপুর	২৮৭১	(৮) ছোট রঘুনাথপুর	২৫৮২
(৯) শাকবুনিয়া	২৮৩০	(১০) বড় রঘুনাথপুর	৩৪৭৮

ওয়ার্ড ও মৌজার সংখ্যা:

* ওয়ার্ড ৯ টি; পাদ্রীশিবুর ধর্মপল্লী দুটো ওয়ার্ড (৪ নং ও ৫ নং)-এর অন্তর্ভুক্ত।
* মৌজার সংখ্যা ১১ টি

সেবামূলক ও প্রতিষ্ঠান

* হাট-বাজার সংখ্যা: সরকারি ৩ টি এবং বেসরকারি ৭ টি (নিউ মার্কেটসহ)।
* যোগাযোগ মাধ্যম: অটো রিক্সা, টেম্পু, মটর সাইকেল, দুরপাল্লার বাস, প্রাইভেট গাড়ি..
* শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৩ টি, বে-সরকারি রেজি. প্রা: বিদ্যালয় ১৩ টি; উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়: ৬ টি; নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১ টি; মাদ্রাসা ৫ টি, কলেজ ২ টি; খ্রিস্টান ছাত্রী আবাস ১ টি, সেমিনারি (যাজক প্রার্থীগৃহ) ১ টি;
* এন.জি.ও ৭ টি
* গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থান ৪ টি; ঐতিহাসিক পর্যটন স্থান: পাদ্রীশিবপুর গির্জা ও প্রতিষ্ঠানগুলো।
* ব্যাংক (জনতা ব্যাংক বাংলাদেশ) ১ টি

সাংগঠনিক কাঠামো:

* ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যান – ১ জন;
* নির্বাচিত সাধারণ সদস্য: ৯ জন; এবং সংরক্ষিত মহিলা সদস্য - ৩ জন (সম্মিলিত ৯টি ওয়ার্ড থেকে)
* সচিব ও গ্রাম পুলিশ

ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে সেবা:

* কৃষি ও প্রাণি সম্পদ সেবা;
* স্বাস্থ্যসেবা: সরকারি ডাক্তারখানা, ফাতিমা ক্লিনিক
* শিক্ষা সেবা: পরীক্ষার ফলাফল, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, এমপিও আবেদন, শিক্ষাবোর্ডসমূহ
* নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা: গ্রাম-পুলিশ, অপরাধের তথ্য দেওয়া, ফোনে পুলিশ সহায়তা, আনসার ভিডিপি
* ভূমি অফিসের সেবা: ই-মিউটেশন, ইউনিয়ন ভূমি সহকারি কর্মকর্তা, ভূমি বিষয়ক তথ্য ফরম, ভূমি উন্নয়ন কর ও বিভিন্ন ফি।

খ্রিস্টানসমাজের স্মরণীয় ব্যক্তি

* কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি, ডি.ডি., পাদ্রীশিবপুরবাসী {পাদ্রীশিবপুর থেকে প্রথম বিশপ (রাজশাহী -১৯৯০ ও চট্টগ্রাম-১৯৯৫) এবং প্রথম আর্চবিশপ (ঢাকা-২০১১), বাংলার প্রথম ও একমাত্র বাঙালি কার্ডিনাল-২০১৬, বিশ্বজনীন কাথলিক মণ্ডলীর পোপের মন্ত্রণা পরিষদের একজন সদস্য}।

খ্রিস্টান সমাজের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি (পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়ন)

(১) মৃত মজেস গোমেজ, পিতা: মৃত ফ্রান্সিস গোমেজ , মিস্ত্রি বাড়ি, ওয়ার্ড মেম্বার, ওয়ার্ড নং ১৩

(২) মৃত মন্টু গোমেজ, পিতা: মৃত রিচমণ্ড গোমেজ, ওয়ার্ড নং ১৩

(৩) রনি ডি'রোজারিও, পিতা: মৃত ক্যামিয়েল ডি'রোজারিও, ওয়ার্ড নং ১৩

(৪) মিঠু ডি'কস্তা, পিতা: মৃত জুলিয়াস ডি'কস্তা, ওয়ার্ড নং ৪

(৫) প্রয়াত সুশীল সরকার, পিতা: মৃত নগেন সরকার, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক (পার্টি দ্বারা মনোনয়ন)

খ্রিস্টান সমাজের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি: মাটিভাঙ্গা উপকেন্দ্র

(১) প্রয়াত উইলসন গোমেজ, পিতা: প্রয়াত স্যামুয়েল গোমেজ/হাওলাদার, ছোট বিঘাই ইউনিয়ন, মির্জাগঞ্জ

(২) দীপ্তি গোমেজ, স্বামী: মৃত উইলসন গোমেজ, মহিলা সদস্য, ছোট বিঘাই ইউনিয়ন, মির্জাগঞ্জ

মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা

* মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা পাওয়ার জন্য পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়ন থেকে ২৩ জনের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং তারা সরকার থেকে মাসিক সম্মানী ভাতা পাচ্ছে।
* তবে ২৩ জনার মধ্যে খ্রিস্টানদের মধ্য থেকে মাত্র চারজনার নাম রেজিষ্টার করা আছে।

মুক্তিযুদ্ধে খ্রিস্টানদের অবদান:

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাদ্রীশিবপুর ছিল অত্র অঞ্চলের মুক্তিবাহিনীর একটি প্রধান ঘাটি। এখানকার কতিপয় যুবক মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করেছিল। খ্রিস্টান গ্রামের প্রায় পরিবারেই বিভিন্ন স্থানে আগত হিন্দু ভাই-বোনদের আশ্রয় ছিল। তৎকালীন পালপুরোহিত কানাডাবাসী ফাদার জারমেন গ্রাঁমেজোঁ, সিএসসি, মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ঐ এলাকার হিন্দুদের সোনাদানা ও গয়না-গাটি নিজের ঘরে রেখে তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। ফাদারের স্পীড বোট থাকায় দক্ষিণাঞ্চলে জলোচ্ছাসে কবলিত মানুষের জন্য "কোর" সংস্থার ত্রাণমূলক কার্যের তত্ত্বাবধানে যেতেন এবং একই সাথে দক্ষিণাঞ্চলে ঘাটি করা মুক্তিবাহিনী ও তাদের প্রধানদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। তার সুদক্ষ পরিচালনার কারণে পাদ্রীশিবপুর এলাকা পাকবাহিনীর হামলা থেকে রক্ষা পায়। ফাদার জার্মেনের নিজের একটি লেখায় এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন, যা এই বইয়ে নবম বিভাগে উল্লেখিত রয়েছে।

খ্রিস্টান সমাজ থেকে সরকারি স্বীকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের নাম

(১) ফ্লাভিয়ান গোমেজ, পিতা: মৃত লালজন গোমেজ, ৪ নং ওয়ার্ড
(২) এমরোজ গোমেজ (মৃত), পিতা: মৃত পিটার গোমেজ, ৪ নং ওয়ার্ড
(৩) এ্যালেক্সিস গোমেজ, পিতা: মৃত লুইচ গোমেজ, ৪ নং ওয়ার্ড
(৪) অরলান্ড গোমেজ, পিতা: মৃত বেঞ্জামিন গোমেজ, ৬ নং ওয়ার্ড

আমাদের জানামতে আরও অনেকে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে তাদের নাম নিম্নে দেয়া হল:[২৮]

১) ফাদার জার্মেন গ্রাঁমেজোঁ, সিএসসি.
২) বুলবুল গোমেজ
৩) ক্যাবট গোমেজ
৪) ক্লোভিন আলেকজান্ডার মন্টু গোমেজ
৫) জেভিয়ার গোমেজ
৬) মাথিয়াস গোমেজ
৭) জোনাস ডি'কস্তা
৮) জোনাস গোমেজ
৯) আলবিন গোমেজ
১০) সিলভেরা গোমেজ
১১) ফুলরী গোমেজ
১২) ভিক্টর গোমেজ (বেনি দোকানদার বাড়ি)
১৩) লরেন্স সুশীল সরকার
১৪) মেরী রেনু গোমেজ
১৫) জন গোমেজ
১৬) গাব্রিয়েল ডি'রোজারিও
১৭) সানছিয়া গোমেজ
১৮) পল গিলবার্ট গোমেজ
১৯) ক্লাউড গিলবার্ট ডি'রোজারিও
২০) আলবার্ট পিকু গোমেজ
২১) দুলাল গোমেজ
২২) ক্লারেন্স গোমেজ
২৩) পিটার গোমেজ (মাটিভাঙ্গা)

তথ্যসূত্র:[২৯]

(BEVERIDGE, H.B.C.S, The District of Bakerganj: Its History and Statistics, London Trumer & Com. 1877 Reprint by Bakerganj District Council, Habib Press & Publications, 88 Sadar Road, Barisal, 1970) (Beveridge, 23)

Wikipedia : Barishal Division, https://www.barisaldiv.gov.bd/en/site/page/e31h
https://padreeshibpurup.barisal.gov.bd/bn/site/page/m2un-

https://www.google.com/search?q=bakerganj+upazila+padrishibpur+union&oq=&aqs=chrome.0.35i39i362l8.31974752j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Bangladesh Population Census 2001, Bangladesh Bureau of Statistics; Cultural survey report of Bakerganj Upazila 2007

Md. Mijanur Rahman (2012). "Bakerganj Upazila". In Sirajul Islam and Ahmed A. Jamal (ed.). Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh (Second ed.). Asiatic Society of Bangladesh.

[২৮] স্মরণিকা, বিশপীয় অভিষেক ও অধিষ্ঠান - বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও, ১৯ আগস্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দ.
[২৯] তথ্যসূত্র:

দ্বিতীয় ভাগ

পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের ইতিহাস, অবকাঠামো ও ক্রমবিবর্তন

লেখক: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

আলোচ্য বিষয়সূচির সারসংক্ষেপ

প্রথম অধ্যায়: মাইলাপুর ডাইয়োসিসের প্রশাসনামল (১৭৬৪-১৯৩০)

॥ ক ॥ শিবপুরের প্রাগ-ইতিহাস, খ্রিস্টান জনপদের গোড়াপত্তন ও ক্রমবিবর্তন

(১) বাকেরগঞ্জের বুজুর্গ উমেদপুর পরগনা এবং "পাদ্রীয়ান তালুক"

(২) পাদ্রোয়াদো-এর ইতিকথা ও পাদ্রীশিবপুরের সম্পৃক্ততা

(৩) শিবপুর মিশন: গির্জা ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা

(৪) পাদ্রীশিবপুরের গির্জা নির্মাণ, ডি'সিলভা-দের সম্পৃক্ততা ও জমিদারগণ

(৫) ব্রিটিশ আমলে পাদ্রীশিবপুর ও "সাহেব বংশ"

(৬) গির্জা সংস্করণ ও সর্বশেষ তৃতীয় গির্জা নির্মাণ

॥ খ ॥ পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের উপকেন্দ্র: দেশান্তরকাঠি, মাটিভাঙ্গা ও রাজাবাড়িয়া

(১) উপকেন্দ্র: দেশান্তরকাঠি (টেংরাখালি)

(ক) মিশনের গোড়ার কথা

(খ) দেশান্তরকাঠির বর্তমান পরিচিতি

(গ) খ্রিস্টানদের কিছু পরিচিতি

(ঘ) সাক্ষাৎকার – নির্মলা গোমেজ

(ঙ) মিশন ও সমাজের প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও কার্যক্রম

(২) উপকেন্দ্র: মাটিভাঙ্গা

(ক) মিশনের গোড়ার কথা

(খ) সাক্ষাৎকার: এরিমোহন গোমেজ ও দীপ্তি গোমেজ এবং উত্তম গোমেজ

(গ) মাটিভাঙ্গা পূর্ণাঙ্গ ধর্মপল্লী

(ঘ) ধর্মপল্লী রূপে মাটিভাঙ্গার পরিচিতি

(৩) উপকেন্দ্র: রাজাবাড়িয়া (কালাদা)

(ক) রাজাবাড়িয়ার ইতিবৃত্ত ও বিশেষত্ব: মার্টিন সি. গোমেজ এবং লাজারুস ফকু গোমেজ

(খ) রাজাবাড়িয়া সম্বন্ধে আরও তথ্য

দ্বিতীয় অধ্যায়: চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের প্রশাসনামল (১৯২৭-২০১৬)

॥ ক ॥ প্রথম ধর্মপাল: পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ আলফ্রেড ল্য পাইয়র, সিএসসি (১৯২৭-১৯৫১)

॥ খ ॥ পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ রেমণ্ড লারোজ, সিএসসি (১৯৫২-১৯৬৭)

॥ গ ॥ পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি (১৯৬৮-১৯৯৪)

॥ ঘ ॥ পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি (১৯৯৫-২০১০)

॥ ঙ ॥ পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মজেস মন্টু কস্তা, সিএসসি (২০১১-২০১৫)

তৃতীয় অধ্যায়: বরিশাল ধর্মপ্রদেশের প্রশাসনামল (২০১৬ --)
॥ ক ॥ পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি (২০১৬-২০২২)
॥ খ ॥ পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও (২০২২--)

অবতারণা:

গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে "পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের ইতিহাস, অবকাঠামো ও ক্রমবিবর্তন"। এই বিষয়ের প্রেক্ষাপট হিসেবে পূর্বেই আমরা প্রথম ভাগে আলোচনা করেছি। প্রথম ভাগের আলোচনায় ছিল তৎকালীন ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও প্রশাসনিক প্রেক্ষাপট। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, বর্তমান আলোচ্য বিষয়, বিশেষ করে পাদ্রশিবপুরে খ্রিস্টানদের আগমন, খ্রিস্টান জনপদ হিসেবে গোড়াপত্তন ও ক্রম-বিকাশ এবং বিবর্তিত অবকাঠামোর উপর আলোকপাত করা। যখনই আমরা একটি প্যারিশের আলোচনা করি তখনই এটা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হয় প্যারিশটি কোন ডাইয়োসিসের আওতাভুক্ত এবং সেই সময়ে ডাইয়োসিসের বিশপ বা ধর্মপাল কে ছিলেন। কোন ডাইয়োসিস ছাড়া এবং তার ধর্মপাল ছাড়া পূর্ণ অর্থে প্যারিশের অস্তিত্ব বিবেচনা করা যাবে না কেননা স্থানীয়ভাবে মণ্ডলীর প্রধান হচ্ছেন ধর্মপাল বা বিশপ।

প্রথম অধ্যায়: মাইলাপুর ডাইয়োসিসের প্রশাসনামল (১৬০৬-১৯৩০)

প্রথম অধ্যায়ে একটি বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। এই অধ্যায়ের মধ্যে পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের মধ্যে যে তিনটি উপকেন্দ্র ছিল, যেমন দেশান্তরকাঠি, মাটিভাঙ্গা ও রাজাবাড়িয়া – সেই উপকেন্দ্রগুলোর আলোচনা এই বিভাগে করা হয়েছে। এই আলোচনায় পরিকল্পিত ভাবেই উপকেন্দ্রের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা মাণ্ডলিক প্রশাসন আমলের সাথে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায় নি উপকেন্দ্রের স্বার্থে এবং পুনরুল্লেখ বর্জন করার জন্য। তবে যা লিখিত হয়েছে তাতে কোন ঐতিহাসিক তথ্যের বিভ্রান্তি নেই।

॥ ক ॥ শিবপুরের প্রাগ-ইতিহাস, খ্রিস্টান জনপদের গোড়াপত্তন ও ক্রমবিবর্তন

পাদ্রীশিবপুর হচ্ছে বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের একটি পুরাতনতম ও ঐতিহ্যবাহী খ্রিস্টান জনপদ। অনুমান করা যায় যে, পাদ্রীশিবপুরের ইতিহাস ষোড়শ শতাব্দীতে গড়ে ওঠা "বাকলা" (বর্তমান পটুয়াখালির বাউফল থানা) পর্তুগীজ খ্রিস্টান বণিকদের ঘাটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই সম্পর্ক এলাকার শাসন আমল এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ের সাথে পরোক্ষ ভাবে জড়িত ছিল। তবে প্রত্যক্ষ ভাবে তৎকালীন বাকেরগঞ্জের আওতাভুক্ত "শ্রীমন্তপুর খাল" (পরবর্তীতে শ্রীমন্ত নদী) এর তটে গড়ে ওঠা পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান জনপদের সূচনা হয় আজ থেকে দুইশত ষাট বছর পূর্বে, অর্থাৎ ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে। বর্তমান পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টান জনপদ সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা পেতে হলে অতীত ইতিহাসের দিকে তাকাতে হয় কেননা সেখানেই রয়েছে তার গোড়াপত্তনের কারণসমূহ। তাই নিম্নে অতি সংক্ষেপে ইতিহাসের ক্রমবিবর্তন তুলে ধরছি।

(১) বাকেরগঞ্জের বুজুর্গ উমেদপুর পরগনা এবং "পাদ্রীয়ান তালুক"[১]

বুজুর্গ উমেদপুর (লেখা অন্তরে বোজরগ উমেদপুর) বাকেরগঞ্জের একটি অতি পুরাতন পরগনা। আগা বাকের এর আগমনের অনেক আগে থেকেই বুজুর্গ উমেদপুর একটি উল্লেখযোগ্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত পরগনা বলে পরিচিত ছিল।[২] এই পরগনার সাথে পাদ্রীশিবপুরের কী সম্পর্ক সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য এখানে আলোচনা করা কর্তব্য বলে মনে করি।

বুজুর্গ উমেদপুর উৎপত্তি হচ্ছে বুজুর্গ উমেদ খান ব্যক্তির নাম থেকে। বুজুর্গ উমেদ খান ছিলেন বাংলার নওয়াব শায়েস্তা খান এর পুত্র। শায়েস্তা খান রাজত্ব করেছেন সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে। আগা বাকের এর মৃত্যুর পর আলিবর্দী খান-এর ভ্রতুস্পুত্র এবং জামাই শাহামত জুংগ বুজুর্গ উমেদপুর পরগনার মালিক হন। রাজা রাজবল্লভ সেন বুজুর্গ উমেদপুরের নায়েব রূপে দায়িত্ব পালন করেন।

ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানির পক্ষে মি. হেনরী লজ নামক একজন ইউরোপবাসী এক সময়ে বুজুর্গ উমেদপুর পরগনার কালেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে রাজা রাজবল্লব সেন বিদেশীদের আচরণ, নির্যাতন, শোষণ-শাসন, এলাকা থেকে জনগণকে বিতাড়ন, লুটপাট ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক অভিযোগ তিনি লিখিত আকারে সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে জানান। পরবর্তীতে রাজা রাজবল্লভের মৃত্যুর পর তার প্রপৌত্র পিতাম্বর সেন ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে বুজুর্গ উমেদপুরের জমিদারি লাভ করে। একসময় বুজুর্গ উমেদপুর একটি ছোট পরগনা ছিল পরবর্তীতে তা বিশাল আকার ধারণ করে এবং একসময় বুজুর্গ উমেদপুরে ২ টি জমিদারি, ৪৩১ টি তালুক এবং আরও ১১ টি খাস এলাকায় বিস্তৃতি লাভ করে। প্রতি বছর ঢাকা নওয়াবকে তিন লক্ষ সাইত্রিশ হাজার রুপি খাজনা দেওয়া হত। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে রাজা পিতাম্বরের আমলে পুরো বুজুর্গ উমেদপুর ব্রিটিশ সরকারে অধীনে চলে যায়।

বাকেরগঞ্জে প্রায় ১০১ টি জমিদারি ছিল কিন্তু জমিদারের সংখ্যা ছিল তারও চার গুণ বেশি। এর মানে হচ্ছে একটি জমিদারির মধ্যে একাধিক ব্যক্তি নিজেকে জমিদার বলে দাবি করত। জমির ওপর দখলদার ছিল নিম্নরূপ: (১) জমিদার, (২) তালুকদার, (৩) হাওলাদার (৪) চাষাদার বা চাষী, সাধারণ কৃষক, (৫) বরগাদার। যারা হাওলাদার তাদের অধীনে থাকত সাধারণত ১০-১২ জন চাষী যাদের মধ্যে জমি ভাগ করে দেওয়া হত। একজন চাষী ৪০-৫০ বিঘার অধিক জমিতে চাষ করতে পারত না। সবার উপরে ছিল জমিদার, যারা সরকারের কাছে খাজনা ও কর প্রদান করত। এরূপ ছিল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা।

---

[১] Beveridge, pp. 190-210

[২] বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস, পৃ. ১৩৫-১৪৩; ৩০৪-৩০৫, ৪৪৯ খ্রি.

(২) পাদ্রোয়াদো এর ইতিকথা ও পাদ্রীশিবপুরের সম্পৃক্ততা

পঞ্চদশ শতাব্দীতে পর্তুগাল ছিল এমন একটি রাজ্য যা, ভাস্কোদা গামা কর্তৃক ভারত আবিষ্কারের পর থেকে, পূর্ব প্রাচ্যের ভারতবর্ষে সবচাইতে ক্ষমতাশীল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। ব্যবসা-বাণিজ্যের পরে খ্রিস্টধর্ম সম্প্রচার করা ছিল তাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। খ্রিস্টধর্মকে প্রচার করতে, রক্ষা করতে এবং আর্থিকভাবে সাহায্য করতে তারা ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পোপ দশম লিও এবং পর্তুগাল রাজার মধ্যে ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার নাম "*পাদ্রোয়াদো*"। এই চুক্তির ফলে পর্তুগাল রাজার হাতে ভারতে চার্চ স্থাপন ও দেখাশুনা করার জন্য, এমন কি ডাইয়োসিস স্থাপন, বিশপ নিয়োগ, মিশনারি প্রেরণ, নতুন নতুন খ্রিস্টান এলাকা স্থাপন এবং চার্চের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পর্তুগাল রাজ্যের প্রশাসনকে দেওয়া হয়েছে। এই চুক্তির ফলে একসময়ে একদিকে চার্চ উপকৃত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু এর ফলে চার্চকে জাগতিক ক্ষমতার সাথে হাত মেলাতে গিয়ে অপকারও হয়েছে অনেক। অনেক সময় পোপের ক্ষমতা লঙ্ঘন হয়েছে, পর্তুগাল যথেষ্ট মিশনারি দিতে পারেনি, অথচ অন্য কোন ধর্মসংঘের মিশনারিদেরকে ভারতে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হত না। তাতে ভারতে তথা বঙ্গে বাণীপ্রচার বহু বছর ধরে বাধাগ্রস্থ হয়েছে। একদিকে পোপ ও তার বাণীপ্রচার সংস্থা *(প্রোপাগান্ডা ফিদে)* এবং অন্যদিকে পর্তুগাল রাজ্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গোয়া ডাইয়োসিস এবং ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মাইলাপুর (মাদ্রাজ) ডাইয়োসিসের সাথে বহু শতাব্দী ধরে টানাপোড়েন, দ্বন্দ্ব ও বিরোধ চলতে থাকে। এ কারণে ভারতের চার্চের মধ্যে ছিল দ্বৈত প্রশাসন। উপরোক্ত বিষয়টি উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, এই পাদ্রোয়াদোর সাথে পূর্ববঙ্গের ঢাকা মিশন (তেজগাঁও, নাগরী, শ্রীপুর, হাসনাবাদ) এবং পাদ্রীশিবপুরের মিশন সংযুক্ত ছিল।

ফাদার ফ্রান্সেসকো ফেরনান্ডেস, এস.জে. ছিলেন প্রথম মিশনারি পুরোহিত যিনি ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে আগমন করেন। তিনি বঙ্গে জেসুইট মিশনের দায়িত্বে ছিলেন এবং চট্টগ্রামে/দিয়াং এ বাস করতেন। তারই অনুমোদনে ফাদার লুইছ ফন্সেকা বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলে "বাকলা" তে আসেন। তৎকালীন সময়ে বাকলার রাজা ছিলেন রাজা রামচন্দ্র। তার সময়ে পর্তুগীজ পাদ্রীরা বঙ্গদেশে আগমন করেছেন। ফাদার ফন্সেকা ও পর্তুগীজ পাদ্রীগণ রাজা রামচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বাকলাতে ফাদার ফ্রান্সেসকোর আসার কথা ছিল। কিন্তু যেহেতু বঙ্গের গোটা এলাকা আরাকান রাজার অধীনে ছিল, সেহেতু ফাদার ফ্রান্সেসকো রাজার কাছ থেকে অনুমতি পাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। ইতিমধ্যে আরাকান রাজা দিয়াং এ নির্যাতন শুরু করেন। ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং প্রায় ছয়শত খ্রিস্টানদের মেরে ফেলা হয়। সেই সময়ে ফাদার ফ্রান্সিসকোকেও শারীরিকভাবে গুরুতর আঘাত করা হয়। তাকে চট্টগ্রাম শহরে একটি বন্দী-গুহায় রাখা হয়, যেখানে তিনি ঐ বছরেই নভেম্বর মাসের ১৪ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। ফাদার ফ্রান্সেসকো হচ্ছেন বঙ্গে প্রথম খ্রিস্টান শহিদ ব্যক্তি।[৩]

[৩] Chittagong Jubilee - 2000: বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস, পৃ. ১১৮, ৫৯০ খ্রি.

দিয়াঙ-এ খ্রিস্টানদের এই ঘাঁটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় খ্রিস্টানরা শ্রীপুর, বাকলা এবং চান্দেকান এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দের পরে পূর্ববঙ্গে জেসুইটদের মিশনারি কাজ সেই সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, বঙ্গের বার ভূঁইয়ার রাজত্ব সমাপ্ত হয় এবং রাজ্য প্রশাসনের ভার আরাকান রাজ্যের অধীনে চলে যায়।[৪]

১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতে কাথলিক মণ্ডলীর জন্য একটি নতুন যুগের সৃষ্টি হয়। পোপ মহোদয় গোটা বঙ্গের জন্য একটি অ্যাপোস্টলিক ভিকারিয়েট স্থাপন করেন জেসুইটদের হাতে মিশনের দায়িত্ব প্রদান করেন। ভিকারিয়েটের প্রথম প্রধান ছিলেন ফাদার রবার্ট দ্য লেজের; পরবর্তীতে মনসিনিয়র তাবেড, এস.জে (১৮৩৮) এবং মনসিনিয়র ক্যারু (১৮৪০)। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববঙ্গে পৃথক আরেকটি অ্যাপোস্টলিক ভিকারিয়েট স্থাপন করা হয়। ফাদার টমাচ অলিফ, এস.জে-কে প্রথমে কোএডজুটর পরে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববঙ্গের ভিকারিয়েটের বিশপ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই পর্তুগীজ সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং এমন কি কোর্টেও মামলা করা হয়।

পরবর্তীতে যখন প্রাচ্যে পর্তুগীজদের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে তখন ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে আরেকটি চুক্তির মাধ্যমে প্রোপাগান্ডা ফিদে এবং পাদ্রোয়াদো এর মধ্যে একটি সমাঝোতা সৃষ্টি হয়, যার মাধ্যমে আপন আপন অধিকার স্পষ্ট করা হয়। উক্ত চুক্তি অনুসারে পূর্ববঙ্গে: "ঢাকা, তেজগাঁও, নাগরী, হাসনাবাদ-তুইতাল, শ্রীপুর এবং টেংরাখালি" মাইলাপুর বিশপের অধীনে থাকবে এবং বাকী সকল মিশনের দায়িত্ব নব নিযুক্ত ঢাকার বিশপের হাতে ন্যস্ত থাকবে। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি: লেখক কাম্পোসের বইতে পাদ্রীশিবপুরের নাম মাইলাপুর ডাইয়োসিসের অধীনস্থ তালিকায় উল্লেখ নেই। এর কারণ পরিষ্কার নয়। হতে পারে যে, প্রোপাগান্ডা ফিদে এবং পাদ্রোয়াদো'র মধ্যে পাদ্রীশিবপুরের অবস্থান নিয়ে কোর্টে একটি কেইস চলেছিল তা যদিও ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে আগষ্টিয়ানরা তাদের পক্ষে রায় পায়, তথাপি হয়তো সব সমস্যার সুরাহা তখনও হয়নি।[৫]

ইতিহাসে লিখিত আছে যে, ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবারের মতো মাইলাপুর ডাইয়োসিসের বিশপ ফ্রান্সোয়াঁ লেইন এস.জে. পূর্ববঙ্গে পালকীয় সফরে আসেন। তিনি তখন পূর্ববঙ্গে একটানা ৯ মাস পূর্ববঙ্গে অবস্থান করেন এবং যেখানেই খ্রিস্টানদের জনবসতি ছিল সেখানে গিয়ে পবিত্র সাক্রামেন্ত প্রদান করেছেন। কিন্তু এই সফরের স্থান হিসেবে বাকলা বা পাদ্রীশিবপুরের নাম উল্লেখ করা হয় নি। তাতে অনুমিত হয় যে, ওখানে খ্রিস্টানদের কোন অবস্থান ছিল না।[৬]

বাকেরগঞ্জের বুজুর্গুমেদপুর পরগনায় দুটো জমিদারি এবং অনেকগুলি তালুক ছিল। এই তালুকগুলির মধ্যে "পাদ্রীয়ান তালুক" বা "শিবপুর মিশন তালুক" ছিল বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ। রাজা রাজবল্লভ সেন ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে হুগলী ব্যান্ডেল মিশনের কাছে কয়েকজন খ্রিস্টান লোক চেয়ে আবেদন করেন এবং সেই আবেদন মঞ্জুর করে চারজন খ্রিস্টানকে শিবপুরে পাঠানো হয়। পরবর্তী বছরে তারা ব্যান্ডেল মিশনের কাছে ধর্মীয় উপাসনার জন্য একজন পুরোহিত চেয়ে আবেদন করেন। রাজা রাজবল্লভ সেন একজন পুরোহিত পেলেন এবং তাকে চার খন্ড জমি বা হাওলা দেয়া হয় তার ভরণপোষণের জন্য।[৭]

---

[৪] Beveridge, 29-31

[৫] Campos, pp. 110-111.

[৬] দেখুন: জুবিলী ২০০০ খ্রি. পৃষ্ঠা ৩

[৭] বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস, পৃ. ১৪৪ খ্রি

হুগলী থেকে আসা চারজন খ্রিস্টানদের মধ্যে এক সময়ে বিবাদ সৃষ্টি হয়, যার ফলে সেই চারটি হাওলাকে একত্রিত করে একটা তালুক করা হয় যার নাম "পাদ্রীয়ান" বা "শিবপুর মিশন তালুক"। শিবপুর পুরোহিতের নামে ৭ ফাল্গুন ১১৭১ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে একটি পাট্টা ক'রে তালুকটি দেয়া হয়। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে মি. টম্পসন উক্ত চুক্তিটি নবায়ন করেন।[৮]

প্রশ্ন জাগতে পারে রাজা রাজবল্লভ সেন কেন হুগলী থেকে বুজুর্গ উমেদপুর অঞ্চলে খ্রিস্টানদের আনতে গেলেন। এর উত্তরে হেনরী বেভেরিজ যে কারণ উল্লেখ করেছেন তা হল এই: ঐ সময়ে স্থানীয় জনগণ যারা ভাড়াটে জমির টেনেন্ট বা ইজারাদার ছিল, তারা অনেক অসৎ ও অবাধ্য ছিল, রীতিমত তারা জমির খাজনা ও অন্যান্য শুল্ক প্রদান করত না। রাজা রাজবল্লভ ভেবেছিলেন যে, স্থানীয় জনগণ খ্রিস্টানদের সংস্পর্শে আসলে তাদের নিজেদের শ্রেণীভেদ সম্পর্কে সচেতন হবে এবং একদিন খ্রিস্টান বিদেশীদের বিপক্ষে যাওয়ার জন্য তারা নিজেদের মধ্যে ঐক্য আসবে এবং এভাবে নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন ঘটাবে।[৯]

(৩) শিবপুর মিশন: গির্জা ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা

লিখিত ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসেবে ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে শিবপুরে প্রথম গির্জাটি নির্মাণ করেন পেদ্রো গনসালভেস। "পথ প্রদর্শিকা মারীয়ার গির্জা" নামটি তখন থেকে দেয়া হয়েছে কি-না অথবা কখন থেকে এই নামটি দেয়া হয়েছে তার লিখিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। পুরোহিত হিসেবে যিনি প্রথম শিবপুর মিশনে নিযুক্ত হন তিনি ছিলেন ফাদার ফ্রে রাফায়েল আঞ্জুস। তিনি আগষ্টিনিয়ান ধর্মসংঘের পুরোহিত ছিলেন। আগষ্টিনিয়ান সংঘের ফাদারদের দ্বারা শিবপুর মিশন পরিচালিত হতে থাকে। তারা পশ্চিমবঙ্গের ব্যান্ডেলের সুপিরিয়রের তত্ত্বাবধানে এবং মাইলাপুর ডাইয়োসিসের অধীনে কাজ করতেন। এই ব্যবস্থাপনা ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলতে থাকে।

১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে পোপ মহোদয় "প্রোপাগান্ডা ফিদে"-এর অধীনে "বেঙ্গল অ্যাপোস্টলিক ভিকারিয়েট" প্রতিষ্ঠা করেন। শিবপুর মিশনের জনগণ পাদ্রোয়াদোর ব্যবস্থা ছেড়ে প্রোপাগান্ডা ফিদের ব্যবস্থাপনায় যোগ দিয়ে প্রশাসনকে স্থানীয় পর্যায়ে নিয়ে আসার বাসনা করেছিল। এই কারণে ভিকারিয়েটের প্রধান ফাদার রবার্ট দ্য লেজের শরণাপন্ন হন। ফাদার রবার্ট দ্য লেজের তৎকালীন আগাস্টিনিয়ান ফাদার যোস দ্যস নেভেসকে শিবপুর মিশন থেকে বহিষ্কার করেন এবং তার স্থানে ফাদার ইগ্নেসিয়াস জেভিয়ার মাসকারেনহাসকে নিয়োগ দান করেন। বাকেরগঞ্জের সিভিল কোর্টের আদেশ বলে শিবপুরের পালক এবং পাদ্রীয়ান তালুকের অধিকার প্রাপ্ত হন।

হেনরী বেভেরিজের মতে বিষয়টির ব্যাখা অন্যরকম। শিবপুরের কাথলিকরা তাদের পালপুরোহিত ফাদারের সাথে এক বিবাদে জড়িত হয়ে পড়েন। জনৈক একজন কাথলিক মৃত্যুর আগে পাপস্বীকার না করায় তাকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আশীর্বাদ দিতে ফাদার রাজি হন নি। লোকেরা এর কঠোর প্রতিবাদ করে। এই সময়ে শিবপুরের কাথলিকরা "বেঙ্গল অ্যাপোস্টলিক ভিকারিয়েট"-এর প্রধান ফাদার সেন্ট লেজের-এর শরণাপন্ন হন। এই বিবাদের কারণে বহু বছর ধরে শিবপুর চার্চে কোন উপাসনা অনুষ্ঠিত হয় নি। এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি পরবর্তীতে বেশ কয়েকবার হয়েছে।

---

[৮] Beveridge, p. 96 [৯] Ibid. pp. 106-118

বর্তমান লেখকের মতে এই বিষয়টি নিয়ে আদালতে যেতে হয়েছে মূলত ধর্মীয় কারণে নয় বরং পাদ্রীয়ান তালুকের আইনগত কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে। জাগতিক বিষয়ে যখন মণ্ডলী জড়িত হয়ে পড়ে তখন এ ধরনের সমস্যায় মণ্ডলীকে পড়তে হয়েছে অনেকবার।

কোর্টে যখন কেইসটি বিচারাধীন তখন আগস্টিনিয়ান ফাদারগণ বাকেরগঞ্জের একজন রোমান কাথলিক ব্রিটিশ উকিলের পরামর্শে কেইসটি পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণার আদালতে ট্রান্সফার করা হয়। আগষ্টিনিয়ান ফাদারগণ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে তাদের নিজেদের পক্ষে কোর্টের রায় পান। এভাবে অতীতের মতো শিবপুরের ফাদারগণের গোয়ার আর্চবিশপ কর্তৃক নিয়োজিত হওয়ার ব্যবস্থাপনা পুনর্বহাল করা হয়।

শিবপুর মিশনের ফাদারদের উপর দায়িত্ব ছিল পাদ্রীয়ান তালক দেখাশুনা করা। শিবপুর মিশন বহুকাল ধরে বাকেরগঞ্জ বুজুর্গ উমেদপুর জমিদারকে আয়কর প্রদান করে আসছে। কিন্তু ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে পাদ্রীয়ান তালুককে বুজুর্গ উমেদপুর জমিদারি থেকে পৃথক করে নতুন ব্যবস্থাপনায় নিয়ে যাওয়া হয়। পাদ্রীয়ান তালুককে বছরে আট কিস্তিতে সরকারের নিকট আয়কর পরিশোধ করার নির্দেশ দেয়া হয়। বার্ষিক আয়কর পরিশোধ করার পর প্রতিবছর প্রায় ৭০০-৮০০ রুপি উদ্বৃত্ত থাকত যা শিবপুর মিশন পরিচালনার জন্য ব্যবহার করা হত।

এই সময়ে ইতিহাসবিদ মি. হেনরী বেভেরিজের মতানুসারে শিবপুর এলাকা আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ ছিল। বেশ কয়েকজন বড় বড় ঘরের মালিক ছিল। বাকেরগঞ্জ থেকে পাঁচ মাইল দূরে থাকলেও রাস্তা ও শ্রীমন্ত খালের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল ছিল। বাকেরগঞ্জ থেকে শিবপুরের পাঁচ মাইল রাস্তায় পাঁচটি পাকা ব্রিজের ব্যবস্থা ছিল।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া সমীচীন বলে আমি মনে করি। পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের বাপ্তিস্ম রেজিস্টার খাতা ঘেটে দেখা গেল যে, ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, মিশনের নাম মাত্র "শিবপুর" লেখা হয়েছে। বাপ্তিস্ম রেজিস্টারে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে সেখানে "পাদ্রীশিবপুর" লেখা শুরু হয়। এ কথা উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে প্রথম থেকেই মিশন বা প্যারিশকে পাদ্রীশিবপুর বলা হয় নি। "শিবপুর"-এর সাথে "পাদ্রী" যোগ হয় ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের পর কোন এক সময় থেকে।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে লেখা ইতিহাসবিদ জে. জে. এস. কাম্পোস এর পুস্তকে লেখা রয়েছে যে, "পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের জনসংখ্যা এক হাজার। এখানে একটি দাতব্য ডিসপেন্সারি রয়েছে যেখানে রোগীদের পরামর্শ এবং বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়। প্যারিশে সেন্ট আন্তনী নামে ছেলেদের একটি এবং সেন্ট যোসেফ নামে মেয়েদের একটি স্কুল আছে এবং রবিবাসরীয় স্কুল আছে ছেলে ও মেয়েদের জন্য" (কাম্পোস, পৃ: ২৫২)। আমার মনে হয় এই ডিসপেন্সারিটি বর্তমানের সরকারি ডাক্তারখানার পুরাতন ঘরটির ইঙ্গিত করে যা পূর্বে মিশনের অধীনে ছিল। দ্বিতীয়ত, আমি যখন উনিশ শতকের চল্লিশ দশকের শেষের দিকে শিশু শ্রেণিতে পড়াশুনা করছিলাম তখন সেন্ট আন্তনী স্কুলেই পড়াশুনা করেছি। তখন স্কুলটি ছিল বর্তমান ফাদার বাড়ির নিচ তলায়।

(৪) পাদ্রীশিবপুরের গির্জা নির্মাণ, ডি'সিলভা-দের সম্পৃক্ততা ও জমিদারগণ[১০]

শিবপুরে দোমিঙ্গ ডি'সিলভা নামে একটি পরিবার ছিল। তারা সম্ভবত গোয়া থেকে এসেছিল। তাদের আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল ছিল। চালের ব্যবসা করে তারা অনেক সম্পদের মালিক হয়েছিল। দোমিঙ্গ ডি'সিলভা ২১ নভেম্বর ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে শিবপুরেই মৃত্যুবরণ করেন। দোমিঙ্গো ডি'সিলভার রেখে যাওয়া উইল অনুসারে, তার পুত্র ম্যানুয়েল দোমিঙ্গো পুরাতন গির্জাটি ভেঙ্গে নতুন ও বর্ধিত আকারে আরেকটি গির্জা ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেন। পরবর্তী কালেও ডি'সিলভা পরিবার গির্জার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করতে থাকে।

তাছাড়া আরেকটি উইলের মাধ্যমে দোমিঙ্গ ডি'সিলভা শিবপুর মিশনের কাছে ৫০০ রুপির একটি ফান্ড গরিবদের সাহায্যের জন্য রেখে যান। উইলে তিনি উল্লেখ করে যান যেন প্রতি বছর তার মৃত্যুবার্ষিকীতে তার জন্য মিসা অর্পণ করা হয় এবং ঐদিনে মিসার পরে উপস্থিত সকল গরিবদের মধ্যে চাল-ডাল বিলি করা হয়। এই বিষয়টি শিবপুরবাসীদের কাছে খুবই পরিচিত ছিল এবং এলাকার মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিস্টান গরিবরা প্রতি বছর ঐ দিনের অপেক্ষায় থাকত। আমি নিজেও এই ব্যবস্থাপনার প্রচলন প্রতি বছর ২১ নভেম্বর মিসার পর, গির্জার প্রাঙ্গণে স্বচক্ষে দেখেছি।

ইতিহাসবিদ বেভারিজের মতে তৎকালের পঞ্চাশ বছর আগে পাদ্রীশিবপুরের যে অবস্থা ছিল তার অনেক অবনতি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন; খ্রিস্টানদের সংখ্যা কমে গেছে, আর্থিক অবস্থারও হয়েছে নিম্নগতি। বেশ কয়েক খ্রিস্টান ব্যক্তি তাদের আয়ের উৎস হিসেবে মুসলমান ও হিন্দুদের উৎসবে বাজি ও পটকা ফুটাতো। বেভেরিজের সাথে দ্বিমত পোষণ করে আমি মনে করি এই ব্যবসায় কয়েকটি হিন্দু পরিবারও যুক্ত ছিল যার প্রমাণ পরবর্তী ইতিহাসও সাক্ষ্য বহন করছে। চাষাবাদ ও কল-কারাখানার প্রতি খ্রিস্টানদের তেমন একটা ঝোক ছিল না। কিছু লোক পুলিশ প্রশাসনে কাজ করত। বেভারিজ বলেন যে, খ্রিস্টানদের বিষয়ে তিনি একটা বিষয়ে প্রশংসা না করে পারেন নি । আর তা হল খ্রিস্টানরা অত্যন্ত পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি জীবনযাপন করত, ঘর বাড়িতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিরাজ করত। হয়তো জনগণ কৃষিকাজে বেশি সম্পৃক্ত না থাকায় তাদের এরূপ জীবনযাপন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

হেনরী বেভেরিজের লেখায়, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি অনুসারে তৎকালীন বাকেরগঞ্জের লোক সংখ্যা (মাদারিপুর ও গৌরনদী অংশ নিয়ে) ছিল এরূপ: মুসলমান: ১,৫৪০,৯৬৫; হিন্দু: ৮২৭,৩৯৩; খ্রিস্টান: ৪,৮৫২; বৌদ্ধ: ৪,০৪৯; অন্যান্য ১৭৪; সর্বমোট লোকসংখ্যা: ২,৩৭৭,৪৩৩ জন। ৪,৮৫২ জন খ্রিস্টানদের মধ্যে ৩০০০ জন ছিল গৌরনদী ও ফরিদপুর এবং বাকেরগঞ্জে ছিল ১০৫২ জন; আর ৮০০ জন শিবপুর পর্তুগীজ কলোনীতে বাস করত।

[১০] Beveridge, pp. 106-110; দ্রষ্টব্য: "বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস" পৃ: ১৪৩

প্রস্তর লিপিফলক ও ডি'সিলভা বংশাবলী[১১]

এ বছরের ইস্টারের সময় পাদ্রীশিবপুরে তথ্য সন্ধান করতে গিয়ে আমি মার্বেল পাথরে লেখা কয়েকটি লিপিফলক এবং কবরের উপরে লেখা কয়েকটি লিপিফলক খুঁজে পেলাম। এই লিপিফলকগুলো অতীতের কিছু ইতিহাস উদঘাটন করতে সাহায্য করেছে। তাই তথ্য সম্বলিত এই ফলকগুলো এখানে উল্লেখ করছি এবং এই গ্রন্থের নবম ভাগে ছবিগুলো সংযোজিত করছি। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে যখন ২য় গির্জাটি ভাঙ্গা হয় তখন মার্বেল পাথরের এই লিপিফলক সংরক্ষণ করার নির্দেশ আমি দিয়েছিলাম। সৌভাগ্য যে, ফাদার বাড়ির গুদামে লিপিফলকগুলো পাওয়া গেল এবং বর্তমান কবরস্থানের ওয়ালে তা স্থায়ীভাবে লাগানোর পরামর্শ পালপুরোহিতকে দেয়া হল।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম গির্জা নির্মাণের শতবর্ষ পূর্তি (১৮২৩-১৯২৩ খ্রি) উল্লেখ করে মার্বেল পাথরে যিনি একটি স্মারকফলক লিখে গেছেন তার নাম জেস. ডপ. ডিফল্টস, স্কয়ার (জ্ঞানী)। বর্তমান গির্জার ভেতরে প্রাচীরে এই ঘটনাটির উল্লেখ রয়েছে।

ডি' সিলভা বংশাবলী সম্পর্কে যে তথ্য পেলাম তার ফলে নিম্নলিখিত উত্তারিধকার প্রমাণিত বলে ধরে নেওয়া যায়:

প্রথম গিজাটি নির্মিত হয়: পেদ্রো গনসালভেস: ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে

জমিদার: পাদ্রীয়ান তালুক: ফাদার রাফায়েল আঞ্জুস (১৭৬৪ --
এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে অন্য কেউ জমিদার ছিলেন কি-না সে সম্বন্ধে সঠিক তথ্য এখনও পাওয়া যায় নি।

জমিদার: পিটার ডি' সিলভা (জন্ম: ১৭৯৩- মৃত্যু: ১৮৬৯) কবরের ফলকে উল্লেখ রয়েছে।
ছেলে ইগ্নেসিয়াস ডি' সিলভা (১৮৬৯) পিতার কবরের ফলকে উল্লেখ করেছেন। (দ্র: বরিশালের গির্জা নির্মাণ প্রসঙ্গে পিটার ডি' সিলভা (১৮৬৪ খ্রি.) ও তার ছেলে ইগ্নেসিয়াস ডি' সিলভার (১৯০১ খ্রি.) নাম উল্লেখ রয়েছে।)

জমিদার: ডেভিড ডি' সিলভা (জন্ম ১৮১৫-মৃত্যু ১৮৮৫); তার ছেলে ও ছেলে-বউ: যোহন এবং মেরী ডি' সিলভা কবরের ফলকে উল্লেখ রয়েছে।

জমিদার: দোমিঙ্গো ডি' সিলভা (মৃত্যু ২১ নভেম্বর, ১৮২১)
ছেলে: ম্যানুয়েল ডি' সিলভা
দ্বিতীয় গীর্জা নির্মাণ প্রস্তর ফলক: ১৮২৩-১৯২৩ খ্রি. (প্রস্তর ফলকে লেখা আছে)

জমিদার: ব্রাদার ডেনিস গডফ্রে, সিএসসি/ফাদার লুইস ফিনো, সিএসসি/ফাদার জি.জি. লাপিয়ের, সিএসসি. (১৯৩৩-১৯৪৬)

জমিদার: ফাদার বট্রান্ড রড্রিগস (১৯৪৭-১৯৫৪ খ্রি.)

[১১] পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে সংরক্ষিত প্রস্তরফলক ও লিপিফলক।

ফলকলিপি

- "Sacred PETER D'SILVA Esq. Late Zemindar of Shibpur, who departed this life on the 14th September 1869, Aged 76 Years (Born 1793). This Tablet is erected by his Affectionate Son IGNITIUS D'SILVA." (Parish Store Room)
- "Sacred to the memory of DAVID DE SILVA (Zemindar), Son of JOHN and MARY de Silva, who died on the 22nd July 1885, Aged 70 Years" (Born 1815) (Parish Store Room)
- "In Loving Memory of PRISCILLA De SILVA, 26 Years, 7 Mths, 24 DYS, Died on 23rd January, 1917, Erected by her Bro-in-Law J. P. De SILVA." (Born 1890) (Parish Store Room)
- "PRESENTED BY JAS. P. DEEPHOLTS ESQ. ON THE OCCASION OF THE CENTERAY OF THIS CHURCH: 1823-1923." (Parish Store Room)
- "Erected to the Memory of THOMAS GOMES, who departed this life on the 17th March 1885, Aged 72 years. By His Wife Anna Maria Gomes" (Born 1813) (Parish Store Room)
- "In loving memory of our Dear Father GERMAN GOMES, Muktar and Talukdar of Padri Shibpur who leading an exemplary life left in Christ on the 3rd November 1937, Aged 72 Years. By Beloved Children." (Born 1865) (Parish Store Room)
- "Sacred to the Memory of Eliza Annie, W/0 Mr. J. Henry Monose of Barisal. Died on 20th October 1892, (Born on 1865) (Parish Store Room)
- "পিতৃদেবের স্মরণার্থে, আলেকজান্ডার গোমেজ, জন্ম ১৮৭৭, ২৮শে সেপ্টেম্বর, মৃত্যু ২রা জানুয়ারি ১৯৩৬" (কবরস্থান)
- Manuel Gomes, Born in 12/05/1902; Died on 11/11/1975, Wife Borjiana Born on 29/01/1902; Died on 17/01/1975, Kalada. (Graveyard)
- "In Loving Memory of DOMINGO D'COSTA, Son of Pascal and Rofina D'Costa, Born on 5 Nov. 1959 ('59). Died 14 April, 1996 ('96) (Graveyard)

(৫) ব্রিটিশ আমলে পাদ্রীশিবপুর ও "সাহেব বংশ"

ব্রিটিশরা ক্ষমতায় আসার পর গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হ্যাস্টিংস এর আমলে (১৯১১ খ্রি.) কলকাতার গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়, অনেক সাহেবরা এখানে বাস করতে থাকেন এবং পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টানরা সাহেবদের অধীনে কাজ করার বিশেষ সুযোগ পায়। আমি মনে করি এর প্রমাণ অনেক পাওয়া যায়: মি. ভেনানসিও ডি'কস্তা, নিকোলাস ডি'কস্তা, আগস্টিন ডি'রোজারিও যিনি জাহাজে টেলিফোন অপারেটর ছিলেন এবং তাকে মি. ব্রাউন সাহেব বলে ডাকতেন।

তাছাড়া পাদ্রীশিবপুরে "সাহেব" নামে কয়েকটি পরিবার পরিচিত ছিল তারা ইংরেজদের লাইফ-স্টাইল অনুসরণ করত, পোশাক-আশাক অ্যাংলোদের মত কিছুটা ছিল – পুরুষরা হাফ-প্যান্ট বা ফুল প্যান্ট পরতো আর স্ত্রীলোকেরা ফ্রক পরতো। পুরুষদের বলা হত সাহেব আর তাদের স্ত্রীদের বলা হত মেমসাহেব। অভিজাত শ্রেণির লোক হিসেবে নিজেদের গণ্য করত এবং আর্থিকভাবেও তারা বিত্তশালী ছিল। তারা বাংলা বেশি ভাল জানতনা। উদাহরণস্বরূপ বার্নাড গোমেজ, যিনি নবু সাহেব হিসেবে পরিচিত ছিল। নবু সাহেবের দুই মেয়ে ফ্রেদা গোমেজ এবং বেটি গোমেজ এবং ছেলে ক্লাউডিন

গোমেজ যিনি পশ্চিমের পিটার (পিওন) ডি'রোজারিও এর বড় মেয়ে তেরেজা ডি'রোজারিও-কে বিয়ে করেছিলেন। নবু সাহেবের দুই ভাই হচ্ছেন ডেভিড সাহেব এবং জাকু সাহেব; পাদ্রীশিবপুরে গিলবার্ট উইটলি (স্কটিস) সাহেব এবং দেশান্তরকাঠির মাইকেল সাহেব একই জনগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। অনুমেয় যে পশ্চিমের পালো সাহেব, ব্রাউন সাহেব, মিস্ত্রি বাড়ির সাহেবরা ও মেম-সাহেবরা একই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। "মিস্ত্রি" বাড়ির আদি অর্থ হচ্ছে "মেস্তারা" বাড়ি। যিনি "মেস্তারা" তিনি কাটিখিস্ট হিসেবে পরিচিত ছিলেন। একাধিক "মেস্তারা" পাদ্রীশিবপুরে ছিলেন। একটা জনশ্রুতি সূত্রে "সাহেব বংশ" শুরু হয় মাইকেল সাহেব থেকে, যিনি পাদ্রীশিবপুরে থাকতেন এবং মিশনবাড়ির জন্য কিছু জমি তিনি দান করেছিলেন। অন্যান্য "সাহেব" এর সাথে মাইকেল সাহেব কীভাবে সম্পৃক্ত তার সঠিক তথ্য এখনও সন্ধানের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

পাদ্রীশিবপুর থেকে যারা দেশ বিভাগের পূর্ব এবং পরবর্তী সময়ে কোলকাতা বাস করতেন তারা অধিকাংশই মুর্গিহাটার পবিত্র জপমালার রাণীর গির্জা, বৈঠকখানার শোকার্ত জননীর গির্জা, মলালী আভিলার সেন্ট তেরেজা গির্জা এবং জামসেদপুর এলাকায় বাস করতেন এবং নিকটবর্তী এলাকার গির্জায় তারা উপসনায় যোগ দিতেন এবং সংস্কারসমূহ গ্রহণ করতেন। এখান থেকেই পাদ্রীশিবপুরের চারটি মেয়ে মাদ্রাজ-মাইলাপুরে "শুভ সহায়তাকারিনী মারীয়া"র ধর্মসংঘে যোগদান করে সিস্টার হয়েছেন। তাদের নাম এই গ্রন্থের অষ্টম ভাগে উল্লেখ রয়েছে।

এ বছর অর্থাৎ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে আমি প্রথমবারের মতো মুর্গিহাটার গির্জা, অর্থাৎ কলকাতা আর্চডাইয়োসিয়ের কাথিড্রাল গির্জা এবং বৈঠকখানা গির্জা পরিদর্শন করি। উদ্দেশ্য ছিল এই বইয়ের পটভূমিকা লেখার জন্য তথ্য সংকলন করা। উভয় দুটো গির্জাই ঐতিহাসিক এবং পর্তুগিজ গির্জার চিত্র এখনও সংরক্ষিত রয়েছে। পাদ্রীশিবপুরের গির্জাটি ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ঠিক একই স্টাইলে এবং উপাসনালয়ে কিছু মূর্তি একই ধরনের ছিল। এই কারণে সেখান থেকে তুলে আনা কয়েকটি ছবি এই গ্রন্থের নবম ভাগে সংযুক্ত করেছি।

(৬) গির্জা সংস্করণ ও সর্বশেষ তৃতীয় গির্জা নির্মাণ

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে পাদ্রীশিবপুর গির্জার আবার সংস্কার করা হয়। সংস্কারের দায়িত্বে ছিলেন ব্রাদার স্টিফিন (এটিয়েন), সিএসসি। তৎকালীন শ্রদ্ধেয় বিশপ আলফ্রেড ল্য পাইয়োরের নির্দেশনায় এই সংস্কারটি করা হয়।

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে আবারও গির্জায় সংস্কারের কাজ করা হয়। পূর্বের গির্জার মধ্যে উত্তর দিকে কাঠ দিয়ে বানানো বড় আলতার বা বেদী ছিল। প্রসঙ্গত বলে রাখি যে, তখন আলতারের দিকে মুখ করে মিশা উৎসর্গ করা হত এবং জনগণ পেছনে থেকে মিশায় যোগদান করত। কাঠের দ্বারা নির্মিত আলতার থাকায় এক সময়ে উই পোকায় তা খেয়ে নষ্ট করে দেয়। মিশা উৎসর্গের জন্য তখন সামনে বেদী আনা হয়; উল্লেখ্য যে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার নির্দেশের পূর্বেই এই ধরনের নবায়ন স্থানীয় প্যারিশে করা হয়েছে। সংস্কারের সময় সাক্রিস্টি পেছনের দিকে নেওয়া হয়, পশ্চিমদিকে গির্জা সংলগ্ন পুরাতন সাক্রেষ্টি মূল গির্জার সাথে সংযুক্ত হয় লোকদের বসার জন্য এবং তার সোজাসোজি পূর্বদিকে আরেকটি অংশ বাড়ানো হয় যেখানে জণগণ উপাসনার সময় বসতে পারত। তাই ঐ সময় থেকে গির্জাটি উত্তর

দিকে ক্রুশের আকার ধারণ করে। কমুনিয়ন গ্রহণের জন্য যে লোহার রেলিং ব্যবস্থা ছিল তাও তখন সরিয়ে ফেলা হয় কেননা নবসংস্করণের সাথে রেলিং ব্যবহারের উপযুক্ততা আর রইল না। (কিছু ছবি নবম বিভাগে দেয়া হয়েছে)।

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে গির্জায় নতুন বেল টাওয়ার নির্মাণ করেন ফাদার পাইয়া, সিএসসি. তিনি ইতালি থেকে দুটো ঘন্টা আনার ব্যবস্থা করেন। ঘন্টা দুটোকে বাপ্তিস্ম দিয়ে নাম রাখা হয়েছিল যোসেফ ও মারীয়া। উক্ত অনুষ্ঠানে আমি সেবক ছিলাম বিধায় স্মৃতি এখনও স্পষ্ট। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উপরোক্ত সংস্কারিত অবস্থা বিরাজ করতে থাকে।

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ে গির্জার সম্মুখভাগের চূড়া ভেঙ্গে পড়ে। যার ফলে গির্জার সম্মুখভাগের সজ্জিত গথিক আকৃতি নষ্ট হয়ে যায়। দেশীয় শিল্পীদের দ্বারা নির্মিত পথপ্রদর্শিকা কুমারী মারীয়ার একটি মূর্তি উপরে রাখার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। গির্জার মধ্যে, দক্ষিণ দিকে, প্রবেশ দরজার উপরে গানের দলের জন্য একটি অংশ দ্বিতীয় তলা ছিল। সেখানে অর্গানের ব্যবস্থা ছিল এবং গ্রেগরিয়ান (তৎকালে প্রচলিত কথায় "লাতিন") গান করার জন্য গানের দল ওখানে অবস্থান নিয়ে গান করত। সাধু যোসেফ বর্ডিং এর ব্রাদারদের পরিচালনায় (যেমন ব্রাদার হ্যামেল, ব্রাদার ডনাল্ড নাডো প্রমূখ) বোর্ডিং এর গানদল দ্বারা অর্গান বাজিয়ে লাতিন গান গির্জায় গাওয়া হত। স্থানীয় জনগণের মধ্যে সিলভেস্টার স্যার অর্গান বাজিয়ে গান চালাতেন এবং মোক্তারবাড়ির আইরিন দিদির কণ্ঠে লাতিন গানের দ্বারা বড়ো (গানসহ) মিশা উৎসর্গ করা হত। দ্বিতীয় তলাটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাওয়ায় ব্যবহারের জন্য পরবর্তীতে বন্ধ করে দেওয়া হয় (ছবি নবম বিভাগে দেয়া হয়েছে)।

আরও একটি প্রস্তর লিপিফলকে লেখা আছে: "১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত পথ প্রদর্শিকা কুমারী মারীয়ার গির্জা। আজ ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯১ খ্রি. পূর্ণ সংস্কার শেষে মান্যবর ধর্মপাল যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি নব পর্যায়ে উদ্বোধন করেন। এই নির্মাণকাজে ধর্মপল্লীর প্রবীণ পুরোহিত শ্রদ্ধেয় জি. এম. তুরাঞ্জু, সি.এস.সি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করেন: গির্জার নির্মাণ কমিটি, পাদ্রীশিবপুর।"

গির্জার মধ্যে সম্মুখের ওয়ালের পেছনে লেখা রয়েছে: "তৃতীয় গির্জা উদ্বোধন ১৪ই এপ্রিল, ২০০৫ খ্রি. চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি; আর্কিটেক্ট: রেভা ফাদার ইজ্জিয় মাসকারেত্তি, পিমে, পালপুরোহিত"। নতুন গির্জা নির্মাণে যারা দাতা ছিলেন তাদের নাম গির্জার সম্মুখ-প্রাচীরের ভেতর দিকে লেখা রয়েছে। চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের তৎকালীন ধর্মপাল, বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি, বিভিন্ন বিদেশি ও দেশি সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেন। যারা অর্থায়নে সাহায্য করেছেন তাদের তালিকা অর্থের পরিমাণ অনুসারে নিম্নক্রমে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত তালিকা ভুক্ত করা হয়: (১) পোপের বিশ্বাস বিস্তার-সংস্থা (প্রোপাগান্ডা ফিদে), (২) জার্মানী - চার্চ ইন নীড সংস্থা, (৩) জার্মানী - কলোন ডাইয়োসিস, (৪) কানাডার হলি ক্রস ফাদার প্রোভিন্স, (৫) মিস মাদলেন ব্রুস্টেন, বেলজিয়াম (বিশপ প্যাট্রিকের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী), (৬) ফাদার ইজ্জিও মাসাকারেত্তি, পিমে (আর্কিটেকক্ট ও ইতালীর দাতাবর্গ), (৭) চট্টগ্রাম ডাইয়োসিস (৮) পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টভক্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষীবৃন্দ (৪৪ জন – যারা প্রত্যেকে পঁচিশ হাজার টাকার উর্ধ্বে দান করেছেন), (৯) পাদ্রীশিবপুরবাসী যাজকগণ। এখানে উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রাম কারিতাসের সহায়তায় জামালখান

প্যারিশ দ্বারা প্রদত্ত একটি বড় সেগুন গাছ পাদ্রীশিবপুরে আনা হয় যা গির্জার সমস্ত কাঠের কাজে জন্য ব্যবহার করা হয়।

তৃতীয় গির্জা উদ্বোধন আশীর্বাদ ও উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগে, তৎকালীন চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি, যে উপদেশটি দিয়েছিলেন তা অনেক ইতিহাসের তথ্য সম্বলিত বিধায় সংশ্লিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে উদ্ধৃতি দিলাম।

"পথ-প্রদর্শিকা কুমারী মারীয়া, আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর" – এই প্রার্থনাটি পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীবাসীর খুবই আপন প্রার্থনা। ভক্তদের অন্তরে গভীর থেকে উচ্চারিত হয়ে আসছে এই প্রার্থনাটি যুগ যুগ ধরে।

আজ, পথ-প্রদর্শিকা কুমারী মারীয়ার নবনির্মিত গির্জার উদ্বোধন ও আশীর্বাদের এই মহান দিবসে খুবই গাঢ় ও গভীর উপলব্ধিতে উচ্চারিত হচ্ছে: "পথ-প্রদর্শিকা কুমারী মারীয়া, আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর"।

পাদ্রীশিবপুরের নবনির্মিত গির্জার উদ্বোধন ও আশীর্বাদ অনুষ্ঠান করতে গিয়ে আমাদের স্মরণ পড়ছে ২৪২ বছর পূর্বে ধর্মপল্লীর গোড়াপত্তনের কথা। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে, রাজা বল্লভ সেনের আমন্ত্রণে ব্যান্ডেল থেকে চারজন পর্তুগীজ খ্রীষ্টান শিবপুরে এসে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। তাদের ওপর চারটি হাওলার দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তী বছরে অর্থাৎ ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে, খ্রীষ্টানদের দেখাশুনা করার জন্য একজন পুরোহিত দেয়া হয় যার নাম ছিল পাদ্রী (ফাদার) রাফায়েল ডাস আঞ্জুস। জমিজমা নিয়ে বিবাদ সৃষ্টির কারণে, পাদ্রী (ফাদার) রাফায়েল ডাস আঞ্জুস-এর হাতে শিবপুর তালুকের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়, যা "পাদ্রীয়ান তালুক" বা "মিশন তালুক" নাম ধারণ করে।

একই বছর, অর্থাৎ ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে পাদ্রীশিবপুরে ছোট্ট একটি গির্জা নির্মিত হয় যা "পথ-প্রদর্শিকা কুমারী মারীয়া"-র নামে নিবেদিত। লেখা আছে যে, পেদ্রো গনসালভেস কর্তৃক গির্জাটি নির্মিত হয়। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে, পাদ্রীশিবপুরের দ্বিতীয় গির্জাটি নির্মাণ করা হয়। মি: দমিঙ্গো ডি'সিলভা নামক একজন খ্রীষ্টান ব্যবসায়ী অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে পাদ্রীশিবপুরে বসবাস করতে শুরু করেন। চালের ব্যবসায় লাভবান হয়ে অনেক সম্পদের মালিক হন এবং নতুন আরেকটি গির্জা নির্মাণের জন্য উইল করে অর্থ রেখে যান। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে নভেম্বর দমিঙ্গো ডি'সিলভা মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুর দু'বছর পর, তার পুত্র মানুয়েল ডি'সিলভা পূর্বের গির্জা ভেঙ্গে আরও বড়ো আকারে দ্বিতীয় গির্জাটি নির্মাণ করেন।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত গির্জাটি বিভিন্ন সময়ে, বিশেষভাবে ১৯৩৪, ১৯৫৯, ১৯৬৪, ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কার করা হয়। আমরা যারা আজ জীবিত আমরা ঐ গির্জাতেই বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় সংস্কার গ্রহণ করেছি, এখানে আমাদের উপাসনা ও প্রার্থনার জীবন লালিত পালিত হয়েছে এবং এই গির্জাকে ঘিরে চলেছে খ্রীষ্টানসমাজের জীবনযাত্রা। মারীয়ার মাতৃস্নেহে আকৃষ্ট হয়ে আমরা কতবার "পথপ্রদর্শিকা কুমারী মারীয়া" বলে ডেকেছি এবং আবেদন করে বলেছি "আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর"। আর তিনি আমাদের পথ দেখিয়েছেন ও মঙ্গল করেছেন।

পাদ্রীশিবপুরে নতুন গির্জার নির্মাণের কথাবার্তা শুরু হয় ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বছর প্রকৌশলীদের রিপোর্ট অনুসারে পুরাতন গীর্জার অবস্থা নাজুক ও ঝুকিপূর্ণ বলে মতামত ব্যক্ত করা হয়। ২০০০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী পাল-পুরোহিত ফাঃ মরিছ ডি'ক্রুজ সি.এস.সি.-এর আমন্ত্রণে এবং আমার ও ভিকার জেনারেল ফাঃ ফিলিপ ডিরোজারিও-এর উপস্থিতিতে, পালকীয় পরিষদসহ সমাজের কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমাবেশে একটি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আমি তৎকালীন গির্জার অবস্থা সম্পর্কে প্রকৌশলীদের মতামত এবং নতুন গির্জা করার প্রস্তাব তুলে ধরি। উক্ত সভা থেকেই শুরু হয় বিগত পাঁচ বছরের সকল আলোচনা, সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা গ্রহণ, তহবিল সংগ্রহের ব্যবস্থা ও কার্যক্রম ও নির্মাণ কাজ।

২০০৪ খ্রীষ্টাব্দের নববর্ষে, পহেলা জানুয়ারী, খুবই একটি আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে ধর্মপল্লীর ১২ জন প্রবীণদের দ্বারা পুরনো গির্জার দেয়াল প্রতীকীভাবে ভেঙ্গে, নতুন প্রজন্মের ১২ জন শিশুর হাতে তুলে দেওয়া হল তৃতীয় গির্জার নতুন নক্সা ও পরিকল্পনা। তৎকালীন পালপুরোহিত, ফাদার রবি গোমেজ, সিএসসি-এর পরিচালনায় একটি সুন্দর আধ্যাত্মিক ও প্রার্থনাপূর্ণ পরিবেশে পুরনো গির্জা ভাঙ্গনের কাজের সূচনা ঘটে।

২০০৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী, পুরনো গির্জা ভাঙ্গা শুরু হয় এবং একমাসের মধ্যে সে কাজ সম্পন্ন হয়। মাটি খুঁড়তে গিয়ে প্রথম গির্জার ধ্বংসাবশেষরও সন্ধান পাওয়া যায়। মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত ৭২ জন শিষ্য এবং পালকের প্রতীকস্বরূপ ৭২ টি স্তম্ভ, ৩৭-৪০ ফিট মাটির নীচে বসিয়ে পাইলিং করা হয় যেন গির্জার ভিত্তি যুগ যুগ ধরে শক্ত থাকে। সেই স্তম্ভের উপরে ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে বর্তমান গির্জার কাঠামো। একই বছরের ২৬শে মার্চ, বাংলাদেশ স্বাধীনতার মহান দিবসে, একটি অর্থপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। আজ ১৪১২ বাংলা নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখ, ১৪ই এপ্রিল, ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় গির্জার উদ্বোধন ও আশীবাদ অনুষ্ঠান করছি।

পাদ্রীশিবপুর খ্রীষ্টমণ্ডলীর গোড়াপত্তনের দিন থেকে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত (১৮৩৬-১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সাময়িকভাবে রোমের বিশ্বাস-বিস্তার সংস্থার অধীনে ছিল) পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লী, পর্তুগীজ "পাদ্রোয়াদো" ব্যবস্থাপনায় দক্ষিণ ভারতের মায়লাপুর ডাইয়োসিসের আওতাধীন ছিল এবং আগস্টিনিয়ান ফাদারদের দ্বারা পরিচালিত হত। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম ডাইয়োসিস প্রতিষ্ঠিত হবার পর, পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লী ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই এপ্রিল চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। নব নির্মিত গির্জা উদ্বোধনের দিনে আমরা সেই ঘটনাও আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি।

প্রথমেই আমি অত্যন্ত আনন্দ, তৃপ্তি ও কৃতজ্ঞতার সাথে প্রকাশ করতে চাই যে, পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর সকল ভক্ত – পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর স্থানীয় ও অন্যান্য গ্রামবাসী, দেশের বিভিন্ন শহর ও দেশের বাইরে অবস্থানরত – পাদ্রীশিবপুরের সকল ভক্তজনের জন্য আমি গর্বিত। বর্তমান গির্জাটি নির্মাণে আমি লক্ষ্য করেছি আপনাদের উদ্যোগ, আগ্রহ ও আনন্দ; আর দেখেছি প্রার্থনায়, উদার দানে, সাহায্য-সহযোগিতায় এবং কষ্ট-শ্রমে আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অবদান। আশা করেছিলাম পাদ্রীশিবপুর গির্জা নির্মাণে প্রত্যেকের আর্থিক অংশগ্রহণ থাকবে, আর আমার যতটুকু জানা তা নিশ্চিত হয়েছে প্রায় পুরোটাই।

আমি আপনাদের কাছে আবেদন করেছিলাম যেন নতুন গির্জা নির্মাণ কাজটা খ্রীষ্টীয় জীবন-সাধনা এবং খ্রীষ্টসমাজ হওয়ার একটি বিশেষ প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে। এখন আমি স্বাচ্ছন্দে বলতে পারি যে, এই উদ্দেশ্য কতভাবেই না সফল হয়েছে। গির্জা নির্মাণকে ঘিরে আপনারা সাক্ষ্য দিয়েছেন: ঈশ্বরের উপর আস্থা ও বিশ্বাস, প্রার্থনা, বিশেষভাবে কুমারী মারীয়ার সাহায্য যাঞ্চনা, সময়, শ্রম, দান-অনুদান দেওয়ার উদারতা, কষ্ট ও ত্যাগস্বীকার, ভালবাসা ও ক্ষমা, মিলন ও ঐক্য, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান এবং বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীবাসী সকলের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি।

আজকের এই মহোৎসব ও ধন্যবাদের অনুষ্ঠানে আমি, গির্জা নির্মাণের উদ্দেশ্যে স্থানীয় ভাবে তহবিল সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পাদ্রীশিবপুর স্থানীয় কমিটি, ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের পাদ্রীশিবপুর সংগঠন ও তাদের দ্বারা নিয়োজিত তহবিল-সংগ্রহ কমিটির সকল সদস্য-সদস্যা এবং কোলকাতাসহ অন্যান্য জায়গায় নিয়োজিত সংগ্রহকারীদের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তারা সুদীর্ঘকাল ধরে গির্জা নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ প্রসঙ্গে পাদ্রীশিবপুরের প্রাক্তন পাল-পুরোহিত, ফাদার মরিছ ডি'ক্রুজ, সিএসসি এবং তার পরে শ্রদ্ধেয় ফাঃ রবি হিউবার্ট গমেজ, সিএসসি, বর্তমান পাল-পুরোহিত ফাঃ এথসিও মাসকারেত্তি, পিমে, এবং অন্যান্য পুরোহিতগণ যারা তহবিল সংগ্রহে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতি রইল আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

নতুন গির্জা নির্মাণের জন্য যারা স্থানীয়ভাবে অনুদান দিয়েছেন তাদের মধ্যে আছেন: বিভিন্ন স্থানে (পাদ্রীশিবপুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, কোলকাতা, ও অন্যান্য দেশে-বিদেশে) অবস্থানরত পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীবাসী জনগণ ও বিশেষ দাতাবৃন্দ, জন্মসূত্রে পাদ্রীশিবপুরবাসী পুরোহিতগণ, ফাঃ এজ্জিও মাসকারেত্তি, পিমে, চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ ও অন্যান্য দাতাগণ। স্থানীয় অনুদান দেওয়ার দায়িত্ব আপনারা সকলে গ্রহণ করেছেন, তার জন্য আমি আপনাদের নিকট খুবই কৃতজ্ঞ।

নতুন গির্জার স্থপতি বা আর্কিটেক্ট ও নির্মাণ কাজের পরিচালক ফাঃ এজ্জিও মাসকারেত্তি, পিমে-কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। গির্জা নির্মাণ কাজে তাঁর ভূমিকা ছিল একক, অনন্য এবং অতুলনীয়। ফাঃ এজ্জিও-র সহকর্মী সুপারভাইজার, কারিতাস ইঞ্জিনিয়ার, কাঠমিস্ত্রী, কারিগর, শিল্পী ও অন্যান্য কর্মীদের নিকট আমরা আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। একই সঙ্গে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি গির্জা নির্মাণকারী সংস্থা চৌধুরী কনস্ট্রাকশন, ও তার মালিক জনাব এস.ইউ. চৌধুরী, তার ইঞ্জিনিয়ার, সুপারভাইজার, অন্যান্য কর্মী ও শ্রমিকবৃন্দ। গির্জা নির্মাণে সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতার জন্য পাদ্রীশিবপুর এলাকাবাসী স্থানীয় জনগণ ও নেতৃবর্গের নিকটও আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

আজকের এই মহা মিলনোৎসবে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের প্রতিনিধি, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভাটিকানের রাষ্ট্রদূত, পরম শ্রদ্ধাভাজন আর্চবিশপ পল চ্যাং ইন-নাম, ঢাকার মহামান্য আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও ও বাংলাদেশের অন্যান্য মহামান্য বিশপগণের সদয় উপস্থিতি, প্রার্থনা ও সান্নিধ্যের জন্য আমরা অত্যন্ত সুখী ও কৃতজ্ঞ। পুরোহিতবর্গ, ব্রাদারগণ, সিষ্টারগণ ও বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে আগত ভক্তজনগণের নিকট আমরা আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। নতুন যাত্রাপথের সূচনা মুহূর্তে আপনারা আমাদের শরীক হয়েছেন।

পরিশেষে আমার একটি ব্যক্তিগত তৃপ্তি ও আনন্দের কথাও ব্যক্ত করতে চাই। পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর ইতিহাসের এই তৃতীয় গির্জা নির্মাণ করার কাজে, পাদ্রীশিবপুরেরই সন্তান এবং একই সময়ে চট্টগ্রামের ধর্মপাল হিসেবে ঈশ্বর আমাকে যে ব্যবহার করেছেন তা ভেবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ। চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল হিসেবে আপনাদের যে ভালবাসা, সাহায্য-সমর্থন ও প্রার্থনা পেয়েছি তার জন্য আপনাদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।[১২]

প্রায় একই সময়ে গির্জার পূর্বদিকে সংলগ্ন গ্রোটোটিও নির্মাণ করা হয়। গির্জার ঘন্টার চূড়া থেকে বাজানো ঘন্টাধ্বনি পাদ্রীশিবপুর নিবাসী সকল খ্রিস্টানদের বাড়িতে শোনা যায়। গির্জার সম্মুখ চত্তর প্যারিশ হলের সম্মুখ ভাগ সম্পূর্ণ পাকা করা হয়। এর সাথে সাথে আরও অনেক কিছুর সংস্কার করা হয়।

॥ খ ॥ পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের উপকেন্দ্র: দেশান্তরকাঠি, মাটিভাঙ্গা ও রাজাবাড়িয়া

পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লী বা প্যারিশ বলতে আমরা পাদ্রীশিবপুর কেন্দ্র এবং আরও তিনটি উপকেন্দ্রকে বুঝে থাকি। উপকেন্দ্রগুলো হচ্ছে: দেশান্তরকাঠি, মাটিভাঙ্গা ও রাজাবাড়িয়া। এই উপকেন্দ্রগুলো পাদ্রীশিবপুরের গোড়াপত্তনের সময় থেকে সম্পৃক্ত এবং একই সময় থেকে উৎপত্তি এবং একই ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। জমিদারি প্রথায় পাদ্রীয়ান তালুক থেকে কিছু কিছু মানুষ চাষাবাদের কারণে ও জীবিকা নির্বাহের জন্য এই তিনটি জায়গায় "হাওলা"র দায়িত্ব পেয়ে কিছু ব্যক্তি ও পরিবার এই তিনটি স্থানে চলে যায়; পরবর্তীতে তারাও অন্যদের নিয়ে যায় এবং এভাবে তিনটি জনপদ গড়ে উঠে। পাদ্রীশিবপুরের কেন্দ্রীয় প্যারিশের সাথে সংযুক্ত থেকে ক্ষুদ্র সামাজিক, ধর্মীয় ও মাণ্ডলিক অবকাঠামো গড়ে ওঠে এবং ধর্মপল্লীর উপকেন্দ্র হিসেবে কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত থাকে। উপকেন্দ্রগুলো ও পাদ্রীশিবপুর কেন্দ্রের মধ্যে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করা হয়, আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুন্ন রাখা হয়, বিবাহের দ্বারা সম্পর্ক আরও সম্প্রসারিত করা হয়। আবার কেউ কেউ উপকেন্দ্র থেকে কেন্দ্রে এসে পরবর্তীতে বসতি স্থাপন করে নানাবিধ কারণে। ধর্মীয় ও সংস্কারীয় জীবনের জন্য প্যারিশ কেন্দ্রের ফাদার-ব্রাদার-সিস্টারগণ নিয়মিত পালকীয় যত্ন ও তত্ত্বাবধান করে থাকেন।

গ্রন্থটি রচনার এই প্রসঙ্গে তিনটি উপকেন্দ্রের গোড়াপত্তন ও মধ্যবর্তীকালের ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমানের অনেক কিছু সম্পৃক্ত করে খুবই সামান্য লিখিত তথ্য পাওয়া গেছে বিধায় লেখকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এবং তথ্যের ও লেখকের চিন্তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য পাওয়া তথ্য হুবহু এখানে উল্লেখ করা হল। তবে বিভিন্ন ধর্মপালের শাসনামলে ঘটিত বাড়তি তথ্য তাদের শাসনামল-প্রসঙ্গে অথবা অন্য গ্রন্থের অন্য অধ্যায়ের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

[১২] বিশপ প্যাট্রিক ডি রোজারিও, সিএসসি, ধর্মপাল, চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ ১৪ই এপ্রিল, ২০০৫ খ্রি.

(১) উপকেন্দ্রঃ দেশান্তরকাঠি

(ক) মিশনের গোড়ার কথাঃ

বরগুনা জেলার (গঠিত ১৮৮৪ খ্রি.) বেতাগী থানার ১ নং বিবিচিনি ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশান্তরকাঠি একটি খ্রিস্টান জনপদ। বরগুনা মহাকুমাটি ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে জেলায় উন্নীত করা করে বরগুনা জেলায় পরিণত করা হয়। এ এলাকাটি পূর্ববর্তী সুন্দরবনের অংশবিশেষ ছিল। বরগুনা নামের ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য না পাওয়া গেলেও জানা যায় যে, উত্তরাঞ্চলের কাঠ ব্যবসায়ীরা এতদাঞ্চলে কাঠ নিতে এসে খরস্রোতা খাকদোন নদী অতিক্রয় করতে গিয়ে অনুকূল প্রবাহ বা বড় গোনের জন্য এখানে অপেক্ষা করত বলে এ স্থানের নাম বড় গোনা। কারো মতে আবার স্রোতের বিপরীতে গুন (দড়ি) টেনে নৌকা অতিক্রম করতে হতো বলে এ স্থানের নাম বরগুনা। কেউ কেউ বলেন, বরগুনা নামক কোন প্রতাপশালী রাখাইন অধিবাসীর নামানুসারে বরগুনা।[১৩]

বেতাগী থানার ১নং ইউনিয়নের নাম বিবিচিনি যেখানে দেশান্তরকাঠি অবস্থিত। এই ইউনিয়নের লোক সংখ্যা ৫৮০৩ জন। তবে এই থানায় মোট ৭টি ইউনিয়ন আছে তার মধ্যে বিবিচিনি ছাড়াও চর-বিবিচিনি নামে ও দেশান্তরকাঠি নামে আরও দুটো ইউনিয়ন আছে; এবং অন্যান্য ইউনিয়ন গুলি হল, গাবুয়া-পুটিয়াখালি, গড়িয়াবুনিয়া, ফুলতলা ও তালগাছিয়া।

কখন থেকে এই খ্রিস্টান জনপদের সূচনা হয়েছে তা নিয়ে প্রচলিত ধারণা ও তথ্য এবং বাবলু গোমেজের লেখায় কিছু মতভেদ রয়েছে। তিনি দাবি করছেন যে, অনেকের কাছ থেকে তিনি তার তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং ডি.সি কোড থেকে বিশ বছর আগে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন । এছাড়াও স্বর্গীয় মিঃ নরবার্ট গোমেজ (৯১), মিঃ ভিনসেন্ট গোমেজ (৮৭), মোঃ আশোক হাওলাদার (৮২), মোঃ হায়দার আলী (৮৭), শ্রী রশিক সাধু (১১৫), শ্রী বিজেন্দ্র মিস্ত্রি (৯২), শ্রী মনোরঞ্জন বল (৮৮) এদের সাথে আমার বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব থাকার কারণে প্রত্যেকেই আমাদের বাড়িতে আসা যাওয়া করতো এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে এই খ্রিস্টান পাড়ার তথা বিবিচিনি ইউনিয়নের ইতিহাস নিয়ে ... আলাপ আলোচনা করতেন" ।[১৪] তবে কিছু তথ্য খুবই স্পষ্টভাবে প্রমাণসিদ্ধ ইতিহাসের ঘটনা ও তারিখের সাথে অমিল ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য রয়েছে। এ জন্য তার সব মত গ্রহণ করা যাচ্ছে না। আমার মনে হয় শিবপুর পর্তুগীজ কলোনীর গোড়াপত্তনের দেশান্তরকাঠির সূচনার সংযোগ রয়েছে। তথাপি বাবলু গোমেজের লেখাটি এই পুস্তকে পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এর সত্যতার সঠিক প্রমাণ করার জন্য গবেষণা হতে পারে। তথাপি বাবলু গোমেজের লেখা থেকে গ্রহণযোগ্য কিছু তথ্য উল্লেখ করছি।

---

[১৩] উইকিপিডিয়া, বরগুনা

[১৪] বুলবুল গোমেজ, দেশান্তরকাঠির ইতিহাস

বুলবুল বলেন: "আজ থেকে প্রায় ৫ শত বছর আগে এই বর্তমান বিবিচিনি ইউনিয়ন নামকরণ করা হয়। এখানে নেয়ামতুল্লা নামে একজন জমিদার ছিলেন। যার নামানুসারে নেয়ামতি নামকরণ করা হয়। তার দুই বোন ছিল। একজনের নাম চিনিবিবি এবং আরেকজনের নাম ইসাবিবি। চিনিবিবির নামানুসারে এই ইউনিয়নের নামকরণ হয় বিবিচিনি এবং ইসাবিবির নামানুসারে নামকরণ হয় ইসাপুকুর এবং ইসা শাহী মসজিদ প্রায় ৬০ বছর আগে। আর এই নেয়ামুতুল্লার জমিদারির সীমানা ছিল এই ব্যারের ধন নদীর চর ঘেসে। যেখানে কাঠের খুটি দিয়ে সীমানা নির্ধারণ করা থাকতো। একবার নেয়ামুতুল্লা তার সীমানা পরিদর্শন করতে আসে এবং এসে দেখে তার সেই সীমানার কাঠিটা নেই। তখন সে তার লোকদের বলে কাঠিটা কি দেশান্তরিত হলো? তার খুটি দেশান্তরিত হওয়ায় এই এলাকার নাম হয় দেশান্তরকাঠি। ... এভাবেই আমাদের দেশান্তরকাঠির খ্রিস্টান পল্লীর সৃষ্টি। ... এখান থেকে অনেকেই পরবর্তীতে পাদ্রীশিবপুর গিয়ে বসবাস করেছে, যেমন: বুদাই কাম্পুর বাবা। আড়াই বাকির পিটার গোমেজ এর বাবা মিলাট গোমেজ, হ্যারেল সাব, রাজাবাড়িয়া নরবার্ট গোমেজ এর দাদা। এভাবেই অনেকেই সেই বৃটিশ আমলেই এখানে থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে।

"তবে এখানে আমরা বর্তমান পর্যন্ত প্রতিবেশী মুসলিম ভাইদের সাথে সুসম্পর্কের আদলে আছি। তারা এখন পর্যন্ত আমাদেরকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসে এবং আমাদের পাশে থাকে। এই ভালোবাসার বীজ বপন করে গিয়েছেন আমাদের পূর্ব পুরুষগণ। আমি তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি। তারা হলেন (১) আলিচাঁন কাম্পু, (২) কানাই মৃধা, (৩) বাবু গোমেজ, (৪) সাবু গোমেজ, (৫) বাতিস্তা গোমেজ, (৬) সন্তুনু গোমেজ, (৭) ফিলিপ গোমেজ, (৮) নিকলাস গোমেজ, (৯) ফেলু মৃধা, পরবর্তীতে (১০) ভিনসেন্ট গোমেজ, (১১) পল গোমেজ, (১২) বেনেডিক গোমেজ, (১৩) বার্নাড গোমেজ, (১৪) ভেনানসিও গোমেজ, (১৫) বেনানসিও কাম্পু, (১৬) হিরোন গোমেজ, এবং আরো অনেকে। এরা সবাই পরলোকগমন করেছেন। তাঁদের আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।"[১৫]

(খ) দেশান্তরকাঠির বর্তমান পরিচিত

দেশান্তরকাঠি পূর্বে "টেংরাখালি" নামে গ্রামটি প্রচলিত ছিল। দেশান্তরকাঠি স্মরণকাল থেকে পাদ্রীশিবপুর মিশনের অধীনে একটি উপকেন্দ্র হিসেবে ছিল। পুরোহিতগণ পাদ্রীশিবপুর থেকে এসে ধর্মীয় ও পালকীয় দায়িত্ব পালন করে আসছেন শুরু থেকে। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের পাদ্রীশিবপুরের বাপ্তিস্ম রেজিস্টারে টেংরাখালির নাম উল্লেখ আছে। তার আগে পাদ্রীশিবপুরসহ টেংরাখালিরও কোন তথ্য প্যারিশে নেই।

(গ) খ্রিস্টানদের কিছু পরিচিতি

২০২৪ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে সরেজমিনে যে জরিপ করা হল, সেই অনুসারে দেশান্তরকাঠিতে মোট ৬টি ছোট-বড় বাড়ি আছে। সেখানে ৭২টি পরিবার রয়েছে এবং ঘরের সংখ্যা প্রায় একই। বর্তমানে যারা গ্রামে সর্বদা বাস করে তাদের সংখ্যা ১৯৩ জন। তবে উৎসবের (বিশেষ করে বড়দিনের) সময় তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০৪-এর অধিকসংখ্যক হয়ে থাকে। যদিও দেশান্তরকাঠির জনসংখ্যা উপোরক্ত সংখ্যার বেশি তথাপি তারা স্থানীয় ভাবে স্থায়ী অবস্থান করে না। তারা অভিবাসী হয়ে দেশের মধ্যে চট্টগ্রাম, ঢাকা ও অন্যত্র এবং দেশের বাইরে প্রবাসী হয়ে অবস্থান করছে। কেবলমাত্র ঢাকাতেই ৪৮ ব্যক্তি চাকরিরত আছে।[১৬]

---

[১৫] উপরে উল্লেখিত

[১৬] নির্মলা গোমেজ, দেশান্তরকাঠির জরিপ-২০২৪

দেশান্তরকাঠি উপধর্মপল্লী থেকে কত লোক অন্যত্র অভিবাসী হয়ে চলে গেছে তা নিরূপন করা কষ্টসাধ্য। তবে যতটুকু তথ্য পাওয়া যায় সেই অনুসারে বিট্রিশ আমলে ৯০ জন পাদ্রীশিবপুর অধিবাসী ভারতে থেকে যায়। পাকিস্তান আমলে ৯ পরিবার এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৫টি পরিবার (ঢাকা ৫টি, চট্টগ্রামে ৩টি, প্রবাসে ১১টি, এবং অন্যত্র ৫টি পরিবার) সর্বমোট ২৪টি পরিবার স্থায়ী ভাবে গ্রামের বাইরে চলে যায়। (সম্পাদনা কমিটির তথ্য-সংগ্রহ –২০২৪)

(ঘ) সাক্ষাৎকার – নির্মলা গোমেজ[১৭]

সাক্ষাৎকার গ্রহণে – কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও এবং যোসেফ ডি'রোজারিও, এপ্রিল ৫, ২০২৪।

দেশান্তরকাঠি খ্রিস্টান জনগণের সম্বন্ধে কিছু তথ্য নেওয়ার জন্য নির্মলা গোমেজের সাথে সাক্ষাৎকার করেছি এবং তার সহায়তায় উপধর্মপল্লীর সকল তথ্য-উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেছি। তিনি উপধর্মপল্লীর বহুদিনের কাটিখিস্ট। তিনি যে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তা থেকেই নিম্নলিখিত রচনা ও তথ্য সামগ্রী।

খ্রিস্টানদের পেশা বিবেচনার দেখা যায় যে, কৃষিকাজে আছে ৮-১০ পরিবার; চাকরি পেশায় আছে ৬৬ পরিবার (সরকারি অফিস, কোম্পনিতে চাকরি, হোটেল, নার্সিং, শিক্ষকতা); মৎসজীবী পেশায় ৩টি পরিবার। অধিকাংশ পরিবার আর্থিকভাবে স্বচ্ছল তবে প্রায় ২০-২৫ টি পরিবার এখনও গরিব আছে। প্রায় ২০ টি পাকা ঘর আছে এবং অন্যগুলি আধাপাকা অথবা কাঁচা ঘর।

খ্রিস্টানদের ধর্মীয় জীবনে যা লক্ষ্য করা যায় তা হল: গির্জায় ও বাড়িতে প্রার্থনা করে। পূর্বে অনিয়মিত ভাবে খ্রিস্টযাগ অর্পণ করা হত এখন পাদ্রীশিবপুরের যত্নের কারণে এবং রাস্তাঘাট ভাল হয়ে যাওয়া প্রতি রবিবার জনগণ খ্রিস্টযাগে যোগদান করার সুযোগ পায়। খ্রিস্টযাগে সবার অংশগ্রহণ ভাল এবং নারীরা খুবই সক্রিয়। গির্জায় মারীয়ার নভেনা, বড়দিন, পুনরুত্থান পর্বে যোগদান করে। নির্দিষ্ট দিনে উপবাস রাখে; যিশু হৃদয় ও খ্রিস্টরাজার পর্ব পালন করে এবং অক্টোবর ও মে মাসে কুমারী মারীয়ার পর্ব ভক্তি অর্চনা ও নভেনা করে পালন করে। তাছাড়া চল্লিশা ও মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়।

তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত স্কুল আছে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এবং প্রতি শুক্রবার ছেলেমেয়েদের জন্য ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয়। গ্রামে স্বাক্ষরতার হার ১০০%। এই উপকেন্দ্র থেকে ইতিমধ্যে ৫জন এম.এ পাশ করেছে।

সামাজিক ভাবে সবার সাথে মিল-মিশ আছে তবে ব্যক্তিগত কিছু কিছু কোন্দল আছে। তবে আগের চাইতে মিলনের পরিবেশ অনেক উন্নতি হয়েছে। সমাজে এখনও বিচার-সালিসী এখনও কার্যকরী আছে।

অন্য ধর্মের সাথে সম্পর্ক খুবই ভাল। বৃহত্তর সমাজ থেকে কোন অত্যাচার হয় না। অন্য ধর্মের মানুষ এসে গ্রামে কোন গণ্ডগোল করে না। খ্রিস্টানদের, পুরোহিত ও সিস্টারদের অন্য ধর্মের মানুষ খুব শ্রদ্ধা করে। খ্রিস্টান ছেলে মেয়েরা মুসলমান স্কুলে নিরাপত্তার পরিবেশে পড়াশুনা করে। ধর্মীয় পারিবারিক উৎসবে, অন্তত পুরুষরা নিয়মিত আমন্ত্রিত হয় এবং খ্রিস্টানদের বাড়ীতে বড়দিনের সময় আসে। সরকারি প্রশাসনের লোকজন নিয়মিতভাবে গ্রামে আসে।

[১৭] সাক্ষাৎকার: নির্মলা গোমেজ

তবে দুঃখের বিষয় যে, আজ পর্যন্ত দেশান্তরকাঠি গ্রাম থেকে কেউ-ই ধর্মীয় জীবনে যোগদান করেনি। এখান থেকে এখনও কোন ফাদার, ব্রাদার বা সিস্টার হয় নি। নির্মলা গোমেজ বললেন যে, ভবিষ্যতে এদিকে গুরুত্ব দিতে হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে আজ পর্যন্ত গ্রামের বা এলাকার জনপ্রতিনিধি হয়ে বৃহত্তর সমাজকে সেবা করার প্রচেষ্টা কেউ করেনি।

স্মরণকালের প্রয়াত বিশেষ ব্যক্তিদের মধ্যে যাদের নাম স্মরণ করা যায় তারা হলেন: কানাই মৃধা, ভিনসেন্ট গোমেজ, আইজেক গোমেজ, নর্বাট গোমেজ, বেনাস গোমেজ, বেনেডিক্ট গোমেজ, পল গোমেজ, হরেছ কাস্পু, হিরন গোমেজ প্রমুখ।

(ঙ) মিশন ও সমাজের প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও কার্যক্রম[১৮]

(১) মিশন বাড়ি ও গির্জা: দেশান্তরকাঠি উপকেন্দ্রের প্রতিপালিকা হচ্ছেন "পরিবারের রক্ষাকারিনী মা-মারীয়া"। বর্তমান গির্জাটি বিশপ যোয়াকিমের পরিকল্পনায় এবং বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও দ্বারা আনীত বিদেশী অর্থায়নে সম্পূর্ণ নতুনভাবে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। গির্জা নির্মাণে দান করেছেন তাদের নাম গির্জার প্রাচীরে লিখিত রয়েছে। আর্কিটেক্ট হিসেবে ফাদার এজ্জিয় মাসকারেত্তি, পিমে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১মে ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে প্রতিপালিকার পর্বটি পালিত হয়ে থাকে। একজন খ্রিস্টভক্তের উদারতায় কুমারী মারীয়ার নামে একটি গ্রোটো নির্মাণ করা হয়েছে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে।

(২) মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়: শিশু শ্রেণি থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত। বিদ্যালয়ের নাম দেশান্তরকাঠি মিশন প্রাথমিক বিদ্যালয়। গির্জা ও বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল কারো কাছে জানা নেই।

(৩) (ক) শিশু মঙ্গল সংঘ: প্রতি শুক্রবার শিশু মঙ্গল ছেলেমেয়েদের ক্লাস করা হয়।

(খ) ওয়াই.সি.এস: ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের নিয়ে ওয়াই.সি.এস. দল রয়েছে। মাসে একবার মিটিং করে। তারা সেবামূলক কাজ করে।

(গ) বি.সি.সি দল: ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ: মাসে একবার বাইবেল সহভাগিতা হয়।

(ঘ) প্রার্থনা পরিচালনা দল: প্রায়শ্চিত্তকালীন প্রার্থনা, মে মাস ও অক্টোবর মাসে জপমালা প্রার্থনা, জুন মাসে যিশু হৃদয়ের প্রার্থনা, আগমনকালীন প্রার্থনা পরিচালনা করে।

(ঙ) মারীয়া সংঘ: সপ্তাহের প্রতি শনিবার মারীয়া সংঘের মিটিং হয়।

(৪) দেশান্তরকাঠি খ্রিস্টান সমাজ-সংঘ (প্রতিষ্ঠাকাল ২০০৫ খ্রি.) দেশান্তরকাঠি খ্রিস্টান সমাজ সংঘের পক্ষ থেকে মেধাবী ও গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আর্থিক সহায়তা দান করে। অসুস্থদের চিকিৎসার জন্যেও সহায়তা করে ও সমাজসেবামূলক কাজ করে।

(৫) দেশান্তরকাঠি খ্রিস্টান যুব সংঘ (প্রতিষ্ঠাকাল ২০২২ খ্রি.)

(৬) দেশান্তরকাঠি খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনিয়ন (প্রতিষ্ঠাকাল ২০০৯ খ্রি.)

(৭) দেশান্তরকাঠি খ্রিস্টান বন্ধু সমিতি (প্রতিষ্ঠাকাল ২০১৬ খ্রি.)

[১৮] নির্মলা গোমেজ, লিখত তথ্য, ১৬/৭/২০২৪

যুগ যুগ ধরে দেশান্তরকাঠি উপকেন্দ্রটি পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর সাথে একাত্ম হয়ে একটি সক্রিয় খ্রিস্টীয় জনপদ হিসেবে জীবনযাপন করে আসছে। যখন পালকীয় যত্ন সীমিত ছিল সে সময়ে যেমন, এখনও যখন নানাভাবে পালকীয় যত্নের সুযোগ পাচ্ছে এখও আরও সক্রিয়ভাবে খ্রিস্টান সমাজ জীবনযাপন করে আছে। এই ক্ষুদ্র সমাজটির দিকে আমরা তাকিয়ে বলতে পারি: খ্রিস্টীয় জীবনে সমাজটি অনেক সক্রিয়; অধিকাংশ লোক অংশগ্রহণ করছে; পুরুষ ও নারীরা নেতৃত্ব দিচ্ছে; সমাজের প্রয়োজন নিজেরাই মেটাচ্ছে; শিশু থেকে বৃদ্ধ বয়সের মানুষের সেবা দেওয়ার জন্য সংঘ-সগঠন রয়েছে; ধর্মীয় জীবনের বিশ্বাস ও ভালবাসার অনুশীলন হচ্ছে; পুরোহিত ও সিস্টারদের সেবা নিয়মিত; স্থানীয় নেতৃত্ব বিকশিত হচ্ছে; যুগের পর যুগ ধরে অন্যধর্মের সাথে সুম্পর্ক রক্ষা করে খ্রিস্টীয় সাক্ষ্য বহন করে আসছে। অপেক্ষায় থাকব যখন পরিবারগুলো ধর্মীয় জীবনে সন্তানদের অনুপ্রাণীত করবে এবং যুবক-যুবতীরা ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মণ্ডলীকে সেবা করবে।

(২) উপকেন্দ্র: মাটিভাঙ্গা

(ক) মিশনের গোড়ার কথা

মাটিভাঙ্গা পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর একটি উপকেন্দ্র। মাটিভাঙ্গা সম্পর্কে একটি লেখা ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার পাদ্রীশিবপুর "শ্রীমন্ত তটে" নামক ধর্মপল্লীর ম্যাগাজিনে ছাপানো হয়েছে। লেখাটির মূল লেখক মেনুয়েল ডেমার্স ডি'রোজারিও এবং যার কিছু পরিমার্জন করে প্রকাশ করেন সিলভেস্টার গোমেজ। মাটিভাঙ্গার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে তাদের লেখাটা এই গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়: পরিশিষ্ট-এ মুদ্রিত রয়েছে। তবে এখানে শুধু ঐতিহাসিক ও প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য তার লেখা থেকে তুলে ধরছি[১৯]

"মাটিভাঙ্গা গ্রামটি বর্তমান পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ থানাধীন ছোটবিঘাই ইউনিয়নের অন্তর্গত। গ্রামটির পূর্ব দিকে মাদারবুনিয়া, পশ্চিমে ও উত্তরে পায়রা নদী ও দক্ষিণে বড়বিঘাই ইউনিয়ন। খ্রিস্টানদের জমিজমার পরিমাণ মোটামুটি ৭৭ কুড়ার মত। কিছু কম বেশি হতে পারে।

মাটিভাঙ্গা নামটি কে রেখেছিল তা আজো অজ্ঞাত রয়ে গেছে। তবে ধারণা করা হয় যেহেতু এটি একটি খরস্রোতা নদীর তীরে অবস্থিত এবং নদীর স্রোত কূলে ভাঙ্গন সৃষ্টি করতো তাই এর নাম মাটিভাঙ্গা হয়েছে। "নদীর একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে" এ প্রবাদটির যথার্থতা প্রমাণ করতেই এহেন নামকরণের স্বার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু কালের বিবর্তনে নদীর অন্য পার ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং যুগপৎ এপাড়ের মাটিভাঙ্গা গ্রামটি দিন দিন সমৃদ্ধশালী ও উন্নত জনপদে পরিণত হচ্ছে।

---

[১৯] "মাটিভাঙ্গার ইতিবৃত্ত": নবযাত্রা - স্মরণিকা: মাটিভাঙ্গা শান্তির রানী ক্যাথলিক ধর্মপল্লী, ১৬ মে, ২০২১ খ্রি. "পাদটিকা ঃ ভাই মেনুয়েল ডেমার্স ডি'রোজারিও এর রচিত লেখাটির মূলকাঠামো ও তথ্য উপাত্ত ঠিক রেখে প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে মাত্র। এ লেখাটি ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮ সনে মাটিভাঙ্গার নতুন গির্জা উদ্বোধন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ভাই ডেমার্সকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই কারণ তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন তার লেখাটিকে পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করার জন্য। ধন্যবাদান্তে, সিলভেষ্টার গোমেজ)।

সবচেয়ে দর্শনীয় স্থান হচ্ছে পায়রা নদী ও দুই পাড়ের অপার মোহময়ী সৌন্দর্য। জোৎস্না প্লাবিত রাতে নদীর পানিতে চাঁদের আলো খেলা সত্যিই অপরূপ ! আছে গির্জা সংলগ্ন স্বচ্ছ টলটলে পানি ভরা একটি চমৎকার দীঘি।

ধারণা করা হয় ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে পাসকেল গোমেজ (হাওলাদার) নামে এক ব্যক্তির আগমনের মধ্য দিয়ে গ্রামটিতে খ্রিস্টান বসতি স্থাপন হয়। তাই আট পুরুষ আগেকার হিসাব ধরে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ হতে আজ পর্যন্ত প্রায় ১৭০/১৭১ বছরের পুরানো ইতিহাস বলা যায়। ইতিহাস বলে পাসকাল গোমেজই (হাওলাদার) এ গ্রামে প্রথম খ্রিস্টান। পূর্বে এ এলাকায় হিন্দু ও মুসলিমদের বসবাস ছিল। পাসকাল গোমেজ অনেক জমির মালিক ছিলেন বলে তিনি হাওলাদার নামে পরিচিতি লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি তার মেয়ে জামাই নাগর মৃধাকে এ গ্রামে নিয়ে আসেন।

সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে এদের সুনাম সর্বজনবিদিত। পূর্বে ঘোড়দৌড়, নৌকা বাইচ, জারি গান, সারি গান, বিজয়-বিচ্ছেদ ও রূপবান গানের প্রতিযোগিতা হতো। বর্তমানে এসব বিলুপ্তপ্রায়। ঐতিহাসিক স্থানের মধ্যে ছিল প্রায় ১৫০ বছরের একটি পুরানো গির্জা (যেটি ভেঙ্গে বর্তমানে মিশনারীদের বাসস্থান ও প্রাইমারি স্কুল করা হয়েছে)। রয়েছে একটি সুন্দর গির্জাঘর আর ছবির মত সুন্দর একটি গ্রাম।

মাটিভাঙ্গার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রয়াত পাসকাল গোমেজ ছিলেন কিংবদন্তীসম। তিনি সর্বপ্রথম খ্রিস্টান হিসাবে মাটিভাঙ্গায় বসতি স্থাপন করেন। তিনিই অত্র গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা জনক। তিনি একজন দক্ষ ও প্রতাপশালী লোক ছিলেন। .. নাগর মৃধা (কাম্পু) নামে তার মেয়ে জামাইও একজন সৎ ও দক্ষ লোক ছিলেন। তারাই ছিলেন মাটিভাঙ্গার আদিপুরুষ ও মাটিভাঙ্গার ইতিহাস সৃষ্টির নেপথ্য কারিগর।

পরবর্তীতে তাদের বংশধরদের মধ্যে স্যামূয়েল গোমেজ (ছেমু হাওলাদার) ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। তিনিও অনেক জমির মালিক ছিলেন। সালিসী ও ন্যায়বিচারে তার দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। নিজের ইউনিয়নের বাইরেও সালিশীর জন্যে তাকে যেতে হত। তার ছিল অকৃত্রিম নিরপেক্ষতা, ধৈর্য, সাহস ও প্রগার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা। তিনি খুবই সংস্কৃতিকমনা লোক ছিলেন। তার সুখ্যাতি সর্বজনবিদিত ছিল। তিনি ৯৩ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। তার স্ত্রী ফিলোমিনা গোমেজও একজন রত্নাগর্ভা মহিলা ছিলেন। তিনিও সমাজে একজন ধার্মিকা ও মহিয়সী নারী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি এ সংসার থেকে বিদায় নেন। এলাকাবাসী এখনো এ দম্পতিকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। তাদের ৫ ছেলে। বড় ছেলে যোষেফ গোমেজ কলকাতা কাস্টমস্ বিভাগে উচ্চ পদে কাজ করেছেন। তিনি বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে থেকে মানুষকে সেবা দিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

মেজো ছেলে সিপ্রিয়ান গোমেজ একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছোটবিঘাই ইউনিয়নের ১ম পোস্টমাস্টার ছিলেন। তিনি ১৯৭২ খ্রি. হতে আমরণ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। তিনি একজন জনদরদী লোক ছিলেন। এলাকায় তিনি সৎ মানুষ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। বিগত ২৫শে জুলাই ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

সেজো ছেলে উইলসন গোমেজ এলাকায় অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন লোক ছিলেন। তিনি এক সময় শিক্ষকতা করেছেন মানুষ গড়ার কারিগর ছিলেন। তিনি এক সময় ছোটবিঘাই ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি এলাকায় অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তিনি নানাগুণের অধিকারী ছিলেন। তার মধ্যে নেতৃত্ব দেয়ার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। সরকারী অফিসে আদালতে তার ব্যাপক প্রভাব ছিল। এলাকার মানুষ এখনো চোখের জলে তাকে স্মরণ করে।

স্যামুয়েল ফিলোমিনা দম্পতির ৪র্থ ছেলে অধ্যাপক গাব্রিয়েল মানিক গোমেজ দীর্ঘ ৩৪ বছর দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ নটর ডেম কলেজ বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসাবে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি দেশ বরেণ্য একজন জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। খ্রিস্টান সমাজের এমন কোনো সংগঠন নেই যেখানে তার বিচরণ ছিল না। তিনি খ্রিস্টান সমাজের সকল প্রধান সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। সমাজ সেবক হিসাবে তিনি ব্যাপক পরিচিত ছিলেন। তিনি শুধু খ্রিস্টান সমাজের নেতাই ছিলেন না, তিনি জাতীয় পর্যায়েও নেতৃত্ব দিয়েছেন। জাতির পিতার অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। এক সময়ে তিনি আওয়ামী লীগের কোষাধক্ষ্য ছিলেন। তিনি গোটা খ্রিস্টান সমাজের একজন পরীক্ষিত নেতা ছিলেন।

এলাকার সবচেয়ে ফূর্তিবাজ লোক ছিলেন জর্জ বেনেডিক্ট গোমেজ। তিনি নিজে আনন্দে থাকতে চেষ্টা করেছেন এবং অন্যদেরকেও আনন্দ দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। মানুষের প্রয়োজনে পাশে থেকেছেন। তার ছোট ভাই লাজারেস গোমেজ বিগত কয়েক বছর পূর্বে সুদুর কানাডায় মৃত্যুবরণ করেন। প্রয়াত সিরা মৃধা ছিলেন সহজ সরল ও নির্বিবাদী ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন শান্তিকামী পায়রার প্রতীক। তার ছোট ভাই লিও ছিল তারই মতো সহজ সরল একজন মানুষ।

প্রয়াত পিটার গোমেজ এলাকায় যিনি পিতু আলাদার (হাওলাদার) হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রয়াত ছেমু (স্যামুয়েল) হাওলাদারের ছোট ভাই। তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসীম সাহসের অধিকারী ছিলেন। এলাকায় তার ব্যাপক পরিচিতি ছিল। মানুষ তাকে প্রচুর শ্রদ্ধা করতো ও ভালবাসতো। সব সরকারী অফিস আদালতে তার ব্যাপক বিচরণ ছিল।

প্রয়াত ফ্রান্সিস গোমেজ ছিলেন গ্রামের একজন সহজ সরল ব্যক্তি। তার ৭ ছেলে ও ১ মেয়ে। তার ছেলেরা এলাকায় দারুন পরিচিত তাদের হাডুডু খেলার জন্য। এ খেলার জন্য তারা খুবই পারদর্শী ছিল। প্রয়াত বাপ্তিস্তা গোমেজ (বাইত্তা মাষ্টার) ছিলেন এলাকার মধ্যে একজন অত্যন্ত সংস্কৃতিমনা মানুষ। তিনি প্রখর বুদ্ধিমান লোক হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। তিনি মৃত পিতু পুলিশের শ্বশুর ছিলেন।

প্রয়াত পিটার গোমেজ (পিতু পুলিশ) এলাকায় একজন গুণী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন পুলিশ বিভাগে কাজ করেছেন। তিনি গান বাজনায় ভীষণ পারদর্শী ছিলেন।

প্রয়াত আলফ্রেড কাম্পুর নাম উল্লেখ না করলে মাটিভাঙ্গার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস অপূর্ণ থেকে যাবে। তার সাংগঠনিক দক্ষতা ও সেবামূলক কাজে নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা সবাইকে মুগ্ধ করতো। তিনি অতীব সংস্কৃতিমনা ছিলেন। তার রূপবানের দল ছিল যা এলাকায় তাকে ব্যাপক পরিচিতি দিয়েছিল। ঘোড়-দৌড়, নৌকা বাইচ, যাত্রা ইত্যাদির সাথে তার সরব উপস্থিতি ছিল। তিনি মানুষের কল্যানের জন্য বহু সেবামূলক কাজ করে গেছেন। তার ছোট ভাই ম্যানুয়েল (মানবেল) কাম্পু বহু বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন।

প্রয়াত মার্টিন গোমেজ (মাউন্তা) কিংবদন্তী নায়ক প্রয়াত জেরমান গোমেজের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাষী ও দুরন্ত সাহসী ছিলেন। তিনি নিজ গ্রামের জন্য অনেক অবদান রেখে গেছেন। মাটিভাঙ্গা গ্রামের সৎ ও নিরিহ লোক হিসাবে স্বর্গীয় টমাস গোমেজ এর ব্যাপক পরিচিতি ছিল। তিনি অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করেছেন। তার ২ বোন এ্যামিলিয়া ও আইরিন ইতিমধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এ্যামিলিয়া দিদি বহুদিন গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন।

অতঃপর যে বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করলে মাটিভাঙ্গা খ্রিস্টান গ্রামের ইতিহাস পরিপূর্ণতা পাবে না তিনি হলেন প্রয়াত নিকলাস গোমেজের একমাত্র ছেলে রবিন গোমেজ। তিনি একজন সৎ ও ভালো মানুষ হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। তিনি অসীম সাহসী ছিলেন। এলাকায় তিনি একজন প্রিয় মুখ হিসাবেই জীবনযাপন করেছেন। তিনি কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। তিনি একজন সংস্কৃতিমনা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কখনোই নীতির সাথে কোনো আপোস করেননি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছিল যে বাইচের নৌকা, ঘোড় দৌড়, রূপবান যাত্রা গান প্রভৃতিতে দল গঠনে যে কয়জন নমস্য ব্যক্তি ছিলেন তাদের মধ্যে রবিন গোমেজ ছিলেন অন্যতম। ছোট বিঘাই ইউনিয়নে প্রথম ডাকঘর স্থাপিত হলে তিনি ছিলেন প্রথম পোস্টম্যান। তিনি এ কাজ করতে গিয়ে সবার কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। গ্রামের যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য তিনিই সবার আগে এগিয়ে আসতেন। মিষ্টি কণ্ঠের অধিকারী বলে গীর্জার গান ও প্রার্থনা পরিচালনা করতেন।

প্রয়াত বেনজামিন ও সেবাস্তিন গোমেজ ধলাই হচ্ছে মাটিভাঙ্গার আরো দু'টি জনপ্রিয় পরিবার। তাদের বংশধরগণ বিভিন্ন স্থানে কর্মরত আছে।

প্রয়াত ফাদারদের মধ্যে মাটিভাঙ্গার প্রতি যাদের বিশেষ কৃপা দৃষ্টি ও সহানুভূতি ছিল তারা হলেন ফাদার পাইয়ান্ট, ফাদার রড্রিক্স, ফাদার সেন্টপিয়ার, ফাদার ডেমার্স, ফাদার জারমেন, ফাদার বিমল, ফাদার মরিচ, ফাদার তিমথী, ফাদার জর্জ লাপ্রাদ উল্লেখযোগ্য।

(খ) সাক্ষাৎকার: মি. এরিমোহন গোমেজ (৬৯ বছর) দীপ্তি গোমেজ (৭৮) এবং জেমস উত্তম গোমেজ (৪০)

সাক্ষাৎ গ্রহণে: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, এপ্রিল ২, ২০২৪ খ্রি.

গোড়াপত্তনের কথা

* বনজঙ্গল এলাকা; চাষাবাদী এলাকা; পাদ্রশিবপুর থেকে ডি'সিলভা জমিদার মাটিভাঙ্গা লোক পাঠিয়েছে এলাকায় চাষাবাদ করার জন্য, একটি হাওলা দেয়া হয় জীবিকার নির্বাহের জন্য এবং শুল্ক আদায়ের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়।
* প্রথম বসতি স্থাপন দুই হাওলাদার: পাসকাল গোমেজ ও সেমু হাওলাদারের ঠাকুর দাদা; আনুমানিক ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে।
* পরবর্তীতে বিবাহসূত্র ধরে কিছু পরিবার পাদ্রীশিবপুর থেকে এবং কিছু পরিবার টেংরাখালি থেকে মাটিভাঙ্গা এসে বসতি স্থাপন করে।

পরিসংখ্যান

* বর্তমানে স্থায়ী লোক সংখ্যা ১০০ জনের নীচে। তবে উৎসবের সময় তা দ্বিগুণ পরিমান ধারণ করে।
* জমি জমার ওয়ারিশসূত্রে একটি বংশতালিকার কিছু তথ্য পাওয়া যায়: দেশান্তরকাঠি থেকে আসা সিজার গোমেজের ছেলে > সন্তোন গোমেজ > ছেলে ফিলিপ গোমেজ > ছেলে ভিনসেন্ট গোমেজ > ছেলে স্যান্ডি গোমেজ > ছেলে ফেলু গোমেজ > ছেলে এরমান হাওলাদার > ছেলে স্যামূয়েল হাওলাদার > ছেলে উইলসন্ গোমেজ + দীপ্তি > জেমস উত্তম। এই বংশ তালিকা অনুসারে দেখা যায় যে, ৯টি বংশ ধরে তারা মাটিভাঙ্গা আছে, অর্থাৎ আনুমানিক ২২৫ বছর বা ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে খ্রিস্টানদের বসতি আছে তা নিশ্চিত।
* এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের বাপ্তিস্ম রেজিস্টারে আন্তনিও গোমেজ – বাবা যোয়াও গোমেজের নাম লেখা রয়েছে।

পেশা জীবন: প্রথম দিকে বাসিন্দাদের পেশা ছিল কৃষিজীবি ও মৎসজীবি। পরবর্তীতে কিছু লোক চাকরি জীবনেও যোগদান করে বিশেষ ভাবে শিক্ষকতার কারণে। অভিভাসীদের মধ্যে অনেকে চাকরিজীবি, সমাজকর্মী ও রাজনৈতিক কর্মীও রয়েছে।

[২৮] সাক্ষাৎকার - এরিমোহন ও দীপ্তি: সাক্ষাৎকারগ্রহণে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, এপ্রিল ২, ২০২৪)

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব

* রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বেও সূত্রপাত ঘটে বিশেষ করে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের জলোচ্ছাস এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধোত্তর কালে কোর-কারিতাসের ত্রাণকাজ ও পুনর্বাসন প্রকল্পের কারণে।
* সিপ্রিয়ান গোমেজ: আওয়ামী লীগের সভাপতি – ২৯ বছর ধরে একটানা সেই দায়িত্বে বহাল ছিলেন
* ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ১৯৭৩-১৯৭৫ খ্রি. তার স্ত্রী দীপ্তি গোমেজ ইউনিয়ন কাউন্সিলের নির্বাচিত মহিলা সদস্য (১৯৯৮-২০০০)। তাছাড়া মাটিভাঙ্গা থেকে আওয়ামী লীগের ৬নং ওয়ার্ডে একজন মেম্বার জন প্রতি হয়ে কাজ করেছে।
* সামাজিক বিচার সালিশীতে খ্রিস্টানদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য, বিশেষভাবে এ কাজে, সেমু হাওলাদার, সিপ্রিয়ান, উইলসন, ক্লাউডিন, রবিন, পিটার ও তার ছেলে স্বপন জড়িত ছিলেন।

ধর্মীয় জীবন

* খ্রিস্টযাগে যোগদান, বিশেষ করে প্যারিশ হওয়ার পরে প্রতিদিন ফাদার খ্রিস্টযাগ অর্পন করে। উপবাসকালে ও মে মাসে প্রার্থনা ও রোজারিমালা বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবৃত্তি করা হত।
* ধর্মীয় শিক্ষা, ধর্মীয় ও খ্রিস্টীয় নৈতিকতার সাক্ষ্য; মাঝে মাঝে নেতৃত্ব নিয়ে সমাজের মধ্যে কোন্দল ও অশান্তি বিরাজ করত।
* নতুন ধর্মপল্লী হওয়ায় বেশ কতকগুলো ধর্মীয় সংঘ চালু হয়েছে সেখানে তাদের অংশগ্রহণ বেড়েছে।
* আরেকটা জিনিস লক্ষণীয় সেটা হল পাদ্রীশিবপুর থেকে যাওয়া অভিবাসীদের কারণে ঢাকার ভাওয়াল ও আঠারোগ্রামের সাথে বিবাহসূত্রে বেশ যোগাযোগ রয়েছে। ঢাকার ছেলে বা মেয়েদের সাথে মাটিভাঙ্গা ছেলেমেয়েদের প্রায় দশটি বিয়ে ইতোমধ্যে সম্পাদিত হয়।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন

* পূর্বে লোকেরা গরীব ছিল; কিন্তু এখন গরীব বলতে কেউ নেই। অনেকেই চাকরিজীবি, দালান ঘর-বাড়ি, শিক্ষায় উন্নত: প্রায় দশজন এম.এ পাশ লোক আছে। উকিল, সমাজকর্মী ও চাকুরিজীবি অনেক।
* সবচাইতে বড়ো উন্নয়ন হচ্ছে নতুন একটি ধর্মপল্লী রূপে স্বীকৃতি পাওয়া।

আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক

* একবাক্যে সবাই স্বীকার করবে যে, অন্য ধর্মের মানুষের কাছে খ্রিস্টানরা শ্রদ্ধাভাজন, বিশেষ ভাবে তাদের নৈতিক জীবন, আচার আচরণ ও সম্পর্কের দিক থেকে।
* মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক খুবই ভাল। তারা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে মুসলমানদের ডাকে এবং মুসলমানরাও তাদের বিবাহ অনুষ্ঠানে পুরুষ খ্রিস্টানদের আহ্বান করে।
* কেউ কেউ বলে সমাজে আন্তঃকোন্দলের কারণে মুসলমান ডাকাতি ছাড়া ইতিহাসে মাত্র একবার মুসলমানরা গ্রামে গন্ডগোল করেছিল। আর কোন সময় নয়।
* ইদানিং কিছু হুজুররা মুসলমানদেরকে খ্রিস্টানদের সাথে মিশতে নিষেধ করে। এর বাইরে এখন পর্যন্ত কোন কিছু ঘটে নি।
* খ্রিস্টানদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় কোন দিন মুসলমানরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত না।

সাংস্কৃতিক জীবন

* সেমুয়েল হাওলাদার টপ্পা গানে খুবই দক্ষ ছিলেন। দেশান্তরকাঠি কানাই মৃধার সাথে তিনি টপ্পাগানের (ছন্দে ছন্দে ও গানে-গানে দুজনার মধ্যে তর্কাতর্কি, অনেকটা কবিগানের মতো) আসর বসাতেন মাটিভাঙ্গা ও দেশান্তরকাঠিতে।
* আরেকটি সংস্কৃতি হল "রূপবান" যাত্রা গান। খ্রিস্টানরাই এই যাত্রা গানের আসর করত।

(গ) মাটিভাঙ্গা পূর্ণাঙ্গ ধর্মপল্লী – ১৬ মে, ২০২১ খ্রি.

অনুমান করা যায় যে, মাটিভাঙ্গাতে খ্রিস্টান বসতি সূচনার অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই ছোট একটি গির্জা ঘর নির্মিত হয়েছিল। আমার স্মরণ হয় যে বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকে এই গির্জায় উপাসনা করেছি এবং ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু যেদিন স্বাধীন দেশের মাটিতে পা রাখলেন ঠিক সেই দিন এবং সেই মুহূর্তে শ্রদ্ধেয় বিশপ যোয়াকিম রোজারিও এবং আমি উপস্থিত ছিলাম এবং যাজক হিসেবে জনগণের সাথে প্রথম ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগ অর্পণ করলাম।

চট্টগ্রামের ধর্মপাল হিসেবে মাটিভাঙ্গাতে নতুন গির্জা ঘর নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করলাম এবং তা অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করলাম। সাথে ছিলেন ফাদার ইজ্জিও মাসকারেত্তি, পাদ্রীশিবপুরের পাল-পুরোহিত এবং আর্কিটেক্ট। গির্জা নির্মাণে ফাদার ইজ্জিও আর্থিক সহায়তাই বেশী ছিল। প্রায় একই সাথে ফাদার দুই তলা বিল্ডিং নির্মাণ করা হল সাইক্লোন সেন্টার হিসেবে যা স্কুল ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এই দুই তলা বিল্ডিংএর সম্পূর্ণ অর্থায়নের জন্য বিদেশী অনুদান আমি নিজেই সংগ্রহ করেছি। অতঃপর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে মহাসমারোহে আমারই পৌরহিত্যে গির্জাঘর ও নতুন দ্বিতল দালনটি আশীর্বাদ ও উদ্বোধন করা হল।

নবগঠিত বরিশাল ডাইয়োসিসের ধর্মপাল বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে পাদ্রীশিবপুরের অন্তর্গত মাটিভাঙ্গা উপধর্মপল্লীকে কোয়াজি ধর্মপল্লী রূপে প্রতিষ্ঠা করেন। তিন বছর অতিক্রম করার পর ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মে "শান্তি রাণী কাথলিক ধর্মপল্লী" নামে একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মপল্লী রূপে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠা করলেন। নতুন ধর্মপল্লীর প্রথম পালপুরোহিত হিসেবে শ্রদ্ধেয় ফাদার মুকুল আন্তনী মণ্ডল নিযুক্ত হন।

মাটিভাঙ্গা ধর্মপল্লীসহ পাদ্রীশিবপুরের জন্য এই নতুন ধর্মপল্লী প্রতিষ্ঠা একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এত দীর্ঘ বছর পর পাদ্রীশিবপুর থেকে একটি নতুন ধর্মপল্লী জন্ম নেওয়া এটা মণ্ডলীর মিশনকাজের প্রকাশ এবং অবদান। এর জন্য পাদ্রীশিবপুর অবশই গর্ব করতে পারে। যে সমস্ত এলাকা নিয়ে এই নতুন ধর্মপল্লী গঠন হয়েছে সেখানে পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর ফাদার-ব্রাদার-সিস্টার ও কাটেখিষ্টরা বিচরণ করেছেন, কাজ করেছেন, পালকীয় সেবাদান করেছেন। নতুন এলাকায় মিশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা ভবিষ্যত মিশনের জন্যও একটি আহ্বান।

এই উপলক্ষে *"মাটিভাঙ্গা শান্তির রাণী ক্যাথলিক ধর্মপল্লী: নবযাত্রা"* নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয় ১৬ মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে। উক্ত প্রকাশনায় মাটিভাঙ্গা সম্পর্কে অনেক তথ্য-উপাত্ত ও লেখা-রচনা রয়েছে সেখান থেকে অনেক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে।[২১]

বর্তমান গ্রন্থ রচনার উদ্দেশে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে গোড়ার দিকে, ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার মিন্টু সামুয়েল বৈরাগী সরজমিনে ধর্মপল্লীর যে তথ্য প্রদান করেছেন, সেই অনুসারে বর্তমান নতুন প্যারিশের লোকসংখ্যা নিম্নরূপ:

(ঘ) ধর্মপল্লী রূপে মাটিভাঙ্গার পরিচিতি

প্যারিশের মাটিভাঙ্গা কেন্দ্রে ১৩ টি বাড়ি রয়েছে। এই বাড়িগুলোতে ৩০ টি ঘর আছে যেখানে ৭২ টি পরিবার আছে। তবে মাটিভাঙ্গাতে স্থায়ী ভাবে যারা বাস করে তাদের সংখ্যা মাত্র ৭৩ জন। কিন্তু উৎসবকালে, যেমন বড়দিন, পুনরুত্থান এবং অন্যান্য উৎসবে যারা বাইরে থেকে আসে তাদেরকে নিয়ে ১৫৮ জন বা ততোধিক সংখ্যার লোকজন হয়।

মাটিভাঙ্গা প্যারিশের আওতাধীন আরও ছোট ছোট বসতি রয়েছে বিভিন্ন স্থানে যেমন: সোনাতলা, পটুয়াখালি, কুয়াকাটা মোর্নিং স্টার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (২০১৯), ইত্যাদি। তাদের বাড়ি ও ঘরের সংখ্যা একই, অর্থাৎ ১৫ টি। পরিবারের সংখ্যা ১৭ টি যাদের সদস্য-সংখ্যা ৬২ জন। এখান থেকে যারা অভিবাসী হয়ে অন্যত্র বসবাস করছে তাদের সংখ্যা ৯ জন।

অতএব মাটিভাঙ্গা প্যারিশের সর্বমোট পরিসংখ্যান হল: বাড়ি – ২৮, ঘর – ৪৫, স্থায়ী বাসিন্দা – ১৩৫ এবং উৎসবকালীন জনগণের সংখ্যা ১৬৭ বা ততোর্ধ।[২২]

মাটিভাঙ্গা ধর্মপল্লী থেকে কত লোক অন্যত্র অভিবাসী হয়ে চলে গেছে তা নিরূপন করা কষ্টসাধ্য। তবে যতটুকু তথ্য পাওয়া যায় সেই অনুসারে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯টি পরিবারে ৬৯ জন লোক ঢাকা (৯টি পরিবার); চট্টগ্রাম (৩টি পরিবার) পদ্রীশিবপুর (৩টি পরিবার), খুলনা (৩টি পরিবার), প্রবাসে (... পরিবার), স্থায়ী ভাবে গ্রামের বাইরে চলে গেছে।[২৩]

মাটিভাঙ্গা ধর্মপল্লী থেকে ধর্মীয় জীবনে আহ্বান পেয়ে দুজন সিস্টার হয়েছেন একজন বর্তমানে যাজকপ্রার্থী রূপে ডিকন আছেন। তারা হলেন: সিস্টার শ্যামলী এস.সি এবং সিস্টার শিউলী গোমেজ, এস.সি. এবং ডিকন টমাস রনি গোমেজ।

---

[২১] "মাটিভাঙ্গার ইতিবৃত্ত": নবযাত্রা - স্মরণিকা: মাটিভাঙ্গা শান্তির রানী ক্যাথলিক ধর্মপল্লী, ১৬ মে, ২০২১ খ্রি.

[২২] মাটিভাঙ্গা জরিপের বিস্তারিত জনসংখ্যা ১১শ অধ্যায়ে দেখুন

[২৩] সম্পাদনা কমিটির তথ্য-সংগ্রহ –২০২৪

মাটিভাঙ্গা নতুন ধর্মপল্লীতে আছে পাল-পুরোহিতের নির্দেশনায় পালকীয় পরিষদ এবং প্রয়োজনবোধে উপ-কমিটি করে নেওয়া যাবে। গোটা ধর্মপল্লীকে চারটি ওয়ার্ড বা ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ হিসেবে ভাগ করা হয়েছে। ওয়ার্ডগুলোর নাম: যিশু পাড়া, মারীয়া পাড়া, যোসেফ পাড়া এবং মাদার তেরেজা পাড়া (সোনাতলা)। এই ক্ষুদ্র সমাজের প্রতিটি কমিটিতে আছে ৯জন ব্যক্তি এবং প্রত্যেকের দায়িত্ব বণ্টণ করা হয়েছে ক্ষুদ্র সমাজের রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য যেমন: ওয়ার্ড প্রধান, সেক্রেটারি, কোষাধ্যক্ষ, এস.সি.সি পরিচালক, ন্যায় ও শান্তি, এস.ভি.পি, ওয়াই.সি.এস, শিশু মঙ্গল, ক্রেডিট ইউনিয়ন।

(৩) উপকেন্দ্র: রাজাবাড়িয়া (কালাদা)

(ক) রাজাবাড়িয়ার ইতিবৃত্ত ও বিশেষত্ব[২৪]

মাটিভাঙ্গা ধর্মপল্লীর মতো রাজাবাড়িয়াতেও পাদ্রীয়ান তালুকের অধীন 'শিকদার' শিরোনামের ব্যবস্থাপনায় জমিজমা রক্ষণাবেক্ষণ ও চাষাবাদের জন্য পাদ্রীশিবপুর থেকে কয়েকটি পরিবার 'কালাদা', অর্থাৎ রাজাবাড়িয়া এসে বসতি স্থাপন করে। পাদ্রীশিপবপুরের বাপ্তিস্ম রেজিষ্টার অনুসারে এটা নিশ্চিত যে এখানে খ্রিস্টানদের আগমন ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে বা তারও আগে ১৭৫-২০০ বছরের মধ্যে হয়েছিল।

"রাজাবাড়িয়া গ্রামটি পাদ্রীশিবপুর হতে ১৩ কি.মি. দূরে, উত্তর-পশ্চিম-কোণে অবস্থিত। এর উপজেলা নলছিটি, জেলা ঝালকাঠি।"

"প্রায় ১ কি.মি. দূরে বিষখালি নদী। নাম শুনলে বোঝা যায় কত ভয়ানক এবং সর্বগ্রাসী এই নদী। নদীটি গ্রামের পশ্চিম দিক দিয়ে দক্ষিণ উত্তর হয়ে ঝালকাঠি পর্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণে পাথারঘাটা থানা হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। এর একটি শাখা নিয়ামতি, চামটা হয়ে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে বাকেরগঞ্জ ও নলসিটির সীমানা নির্ধারণ করেছে। এই শাখা নদীর নাম 'মরা বিষখালি'। মরা বিষখালির একটি খাল দক্ষিণ হতে উত্তরে ধাবিত হয়েছে যা 'কালাদা' নামে খ্যাত হয়। এজন্য সবার কাছে ঐ গ্রামটি কালাদা নামে পরিচিত। এ খালের পশ্চিম পাড়ে ছোট একটি খ্রিস্টান ধর্মপল্লী। যেখানে মাত্র কয়েকটি পরিবার একসাথে হিন্দু-মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে বসবাস করে আসছে প্রায় দু' শতাব্দী ধরে।"

"এদের বসতি কখন কীভাবে এ এলাকায় গড়ে উঠেছে তা কেউ সঠিক ভাবে বলতে পারেনা। .... ওদের মধ্যে হতে বেশ কয়েকটি পরিবার বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে পাদ্রীশিবপুরে বসতি গড়েছে। তাদের মধ্যে প্রয়াত পিটার পল, মানবেল শিকদার এবং ফাদার লাজারুস কানুর পরিবার উল্লেখযোগ্য। স্থানীয়ভাবে কোনো বিদ্যালয় পূর্বে ছিলনা। তাই লেখাপড়ায় তারা অনগ্রসর। তবে বর্তমানে লেখাপড়ার দিকে ঝোঁক বেড়েছে এবং বেশ কিছু ছেলেমেয়ে শিক্ষিত হচ্ছে।

[২৪] মার্টিন সি. গোমেজ, শ্রীমন্ত তটে – ২০০৪ খ্রি.

"স্থানীয়ভাবে বুড়ো-বুড়িদের সাথে আলোচনা করে যতটুকু জানা যায় তাতে দেখা যায়, বুটন এবং জেরু (জেরোম) নামে দু'ব্যক্তি সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করে। জমি-জমা রক্ষণাবেক্ষণ, চাষাবাদ ও লবনের ব্যবসা ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তাদের নামের শেষে স্থানীয়রা 'শিকদার' ব্যবহার করে। বুটন শিকদারের চার ছেলে – ধনু, নিমাই, বাবু এবং ছাবু। জেরু শিকদারের তিন ছেলে – পালো (বুধাই), জিমি এবং তামি। এদের বংশ-বিস্তৃতির ফলে লোক সংখ্যা বাড়তে থাকে। এদের মধ্যে কিছু লোক ভারতে স্থায়ী হয়েছে।

"সবাই কৃষিজীবি। ধান, আখ, মানকচু, ডাল, মরিচ বিভিন্ন ফসল ফলায় কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উদয়-অস্ত পরিশ্রম করে। কোনো কাজে 'না' নেই। সব কাজেই পারঙ্গম । কথা বলার ধরণ রগচটা তবে আন্তরিক, যা বুঝে তাই বলে। অত্যন্ত অতিথিপরায়ন। নিজের ঘরে না থাকলেও অতিথিকে বুঝতে দেয়না।

"লেখা-পড়ায় অনগ্রসর হলেও জমিজমি-কাগজপত্র এবং চাষাবাদ বুঝার ব্যাপারে দক্ষ ছিল। মানকচুর চাষ ছিল প্রচুর। বাজারে নগদ পয়সায় বিক্রি হত বলে কাঁচা-পয়সার আমদানি ছিল এবং সংসার জীবনে ছিল সচ্ছল। কচু বিক্রি করত বলে অন্যেরা এদেরকে 'গাটি-বেচা-শিকদার' বলে তামাসা করতো। এখানে পূর্বে কোনো কবরস্থান ছিল না। ফলে জন্ম-মৃত্যুতে পাদ্রীশিবপুরে যেতে হতো।

"খ্রিস্টানদের সংখ্যা কম হলেও মণ্ডলীর যত্নে, ধর্মে-কর্মে বেশ আগ্রহী তা না হলে এতদিন তারা খ্রিস্টান হিসেবে টিকে থাকতো পারতনা।

"এ গ্রামে শ্রদ্ধেয় ফাদার রড্রিগ্স (১৯৪৫-১৯৫৫) পাল-পুরোহিত থাকাকালীন একটি ছোট গির্জাঘর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন। এই গির্জার নাম হল 'সাধু আন্তনীর গির্জা'। সময়ের পরিবর্তনে এবং লোক সংখ্যা বৃদ্ধি কারণে নতুন করে গির্জাঘর নির্মাণের একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু জমির স্থান সঙ্কুলান হয় না, কারণ জমির পরিমাণ মাত্র ০.১০ শতাংশ। এ নিয়ে বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করা হয়। পবিত্র আত্মার মহা অনুগ্রহে এক সময় দাতা পাওয়া গেল। দাতা রাজি হয়ে বিশপ মহোদয়ের নামে জমির দানপত্র করা হল। এভাবে তিনজন দাতা নতুন করে ০.১৩ শতাংশ জমি দান করেন। দাতাগণ হলেন: মি. এন্টনী গোমেজ, মি. আলবিন গোমেজ এবং মিসেস তেরেজা গোমেজ।

"এখানে বলা আবশ্যক যে, পাদ্রীশিবপুর "পথপ্রদর্শিকা কুমারী মারীয়া" গির্জা নির্মাণ তহবিল সংগ্রহ কমিটির অধীন একটি সাবকমিটি গঠন করা হয়। সাব-কমিটির গঠন নিম্নরূপ: ফাদার এজ্জিও মাসকারেত্তি, পিমে, সভাপতি, গাব্রিয়েল গোমেজ, লাজারুস গোমেজ, মোহন গোমেজ এবং মার্টিন সি. গোমেজ (সদস্য-সচিব)।

নবনির্মিত 'সাধু আন্তনীর গির্জা ৩১ ডিসেম্বর ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে শুভ উদ্বোধনী ও আশীর্বাদ করা হয়। মহাখ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি।[২৫]

[২৫] শ্রীমন্ত তটে – ২০০৪ খ্রি. PCWA, Dhaka

রাজাবাড়িয়ার একজন কৃতি সন্তান ফাদার লিটন গোমেজ।[২৬] তার কাছে রাজাবাড়িয়ার বিশেষ ব্যক্তিদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় অনুরোধ করেছিলাম। তিনি যে, তথ্য দিয়েছেন তা হুবহু এখানে সংযুক্ত করছি।

"মি. ভুডু গোমেজ (হিরোন গোমেজের বুড়া বাবা) তিনি পাদ্রীশিবপুর থেকে এসে কালাদা খালের পাড়ে বসতবাড়ি স্থাপন করেন। প্রায় আড়াইশত বছর আগে।

মি. ভুডু গোমেজ ও মি. কালু গোমেজ ভাই (মি. লাজারেজ গোমেজের বুড়া বাবা) তার ছেলে সীমাই গোমেজ সে জমিদার থেকে শিকদারি পরোয়ানা লাভ করেন। তখন সীমাই গোমেজ শিকদার পরিচিতি লাভ করে (মি. লাজারেজ ফকু গোমেজের তালই মশায়)।

রাজাবাড়িয়া খ্রিস্টান পল্লীতে প্রথম গির্জা নিমাণ করেন ফাদার রড্রিক্স। জমিদাতা: প্রথম হলেন জজ গোমেজ, তারপর দাতাগণ হলেন মি. যোসেফ গোমেজ গং, মি. নিকলাই গোমেজ গং।

বর্তমানে যার অবদান স্বীকার না করলেই নয়, তিনি হলেন মি. লাজারেজ ফকু গোমেজ। তিনি তার যুব বয়স থেকেই খ্রিস্টান পল্লীকে অক্লান্ত সেবা দিয়ে যাচ্ছেন, যা এখনও চলমান।"

সাক্ষাৎকার: লাজারুস ফকু গোমেজ[২৭]

সাক্ষাৎকার গ্রহণে: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি, এপ্রিল ৩, ২০২৪ খ্রি.

রাজাবাড়িয়ার (পূর্ব নাম কালাদা) গোড়াপত্তনের সময় সঠিক বলা যায় না। তবে প্রথমদিকে পর্তুগীজ আমলে পাদ্রীশিবপুর থেকে রাজাবাড়িয়াতে কিছু লোকের আগমন ঘটে।

জনশ্রুতি অনুসারে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১১ খ্রি.) চলাকালে এ এলাকায় একটি দুর্গ ছিল এবং এখানে খ্রিস্টানরা বাস করত। নিজের বংশাবলী বর্ণনা দিতে গিয়ে সাক্ষাৎদাতা বললেন: লাজারুস ফকু গোমেজ (৭৭ বছর এবং জন্ম হয় ১৯৪৭ খ্রি.), তার বাবা ছিলেন যোসেফ (১৯২২ খ্রি.) আর যোসেফের বাবা ছিলেন সিনাই গোমেজ (১৮৯৭ খি.) যারা ছিলেন চারভাই।

খ্রিস্টানদের পেশা ছিল প্রধানত কৃষিকাজ। তারা ধান, রবি শস্য, মানকচু, নারিকেল, সুপারি। বিশ্বযুদ্ধের সময় লোকেরা ধান-চালের ব্যবসা করত। ঐ এলাকায় জনগণ আখের চাষ করত এবং আখের প্রতি তাদের ভালবাসা ছিল অনেক। একটা কথা প্রচলিত আছে যে তারা "মাগ (স্ত্রীলোক) দেবে তো আউখ (ইক্ষু) দেবে না"। ওখান থেকে আখ এনে পাদ্রীশিবপুর লোকেরা সিরকা বানাতো।

খ্রিস্টান গ্রাম খুবই ছোট্ট; প্রতিবেশী হিসেবে হিন্দুরা ছিল চার ঘর; আর অধিকাংশ লোকেরা ছিল মুসলমান। পরস্পরের সাথে তেমন একটা মনোমালিন্য নেই; চুরি ডাকাতি কম। খ্রিস্টানদের মুরব্বি হিসেবে গ্রহণ করে এবং সালিশি করার দায়িত্ব খ্রিস্টানদের কাছে ন্যস্ত করে। অন্য ধর্মের লোকেরা খ্রিস্টানদের আদর্শ দেখতে পায়; ঈদ ও বড়দিনে পরস্পরকে নিমন্ত্রণ করে। সাধু আন্তনীর তীর্থের সময় অন্য ধর্মাবলম্বীরা যোগদান করে। বর্তমান মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা এখন অনেক ভাল। কথা প্রসঙ্গে বলা হল যে আজ পর্যন্ত তাদের জানামতে দুটো মেয়ে সমাজ ছেড়ে চলে গেছে।

[২৬] ফাদার লিটন গোমেজের লেখা

[২৭] সাক্ষাৎকার - লাজারুস ফকু গোমেজ: সাক্ষ্যাৎকারগ্রহণে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি।

খ্রিস্টান সমাজের মধ্যে মিলন ও ঐক্য আছে এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলে। সমাজের অনুমতি নিয়ে মদ্যপান করতে পারবে নতুবা না। শিক্ষার হার ১০০% এবং মাস্টার ডিগ্রি পাশ ২ জন। রাজাবাড়িয়া ঋণদান সমিতি আছে যার মূলধন ১৪/১৫ লক্ষ টাকা। জনগণের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল। মাত্র একটি পরিবার গরিব আছে।

ধর্মীয় জীবনে তারা নিয়মিত প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগে যোগদান করে। পাদ্রীশিবপুর থেকে ফাদার ও সিস্টারগণ নিয়মিত ভাবে পরিদর্শন করেন। প্রতি সপ্তাহে এখন খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়, যা পূর্বে নিয়মিত ছিল না। গর্বের বিষয় যে এই ছোট্ট গ্রামেই ফাদার লাজারুস কানু গোমেজ, ফাদার লিটন গোমেজ এবং সি প্রমিলা, সিএসসি-এর জন্ম।

প্রতি বছর ১৩ জুন, বরিশাল ধর্মপ্রদেশীয় প্রোগ্রাম হিসেবে রাজাবাড়িয়াতে সাধু আন্তনীর তীর্থ ঘটা করে পালিত হয়। এই তীর্থের প্রভাব নানাভাবে প্রতিবেশী ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও পড়ে বলে প্রকাশ পায়।

পরিশেষে রাজাবাড়িয়াা অবদান সম্পর্কে সাক্ষাতদাতা বললেন: এলাকায় খ্রিস্টীয় তীর্থের আদর্শ ও ভাবের সাক্ষ্যদান, পাদ্রীশিবপুরে জমিদান ও বিশেষ কয়েকজন স্মরণীতুল্য ব্যক্তিদের দান, মণ্ডলীতে ফাদার, সিস্টার এবং তীর্থভূমি দান, দেশের মধ্যে বৃক্ষরোপনের প্রেরণা।

(খ) রাজাবাড়িয়া উপকেন্দ্র সম্বন্ধে আরও তথ্য

রাজাবাড়িয়া উপকেন্দ্রের বর্তমান খ্রিস্টানদের জনসংখার তথ্য হচ্ছে: এখানে মূলত ৫ টি বাড়ি আছে: ঘরের সংখ্যা ২৫ টি যেখানে ২৭ টি পরিবার বাস করে। গ্রামের মধ্যে স্থায়ীভাবে বাস করে ৪২ জন। তবে উৎসব কালে পরিবারের অভিবাসী আত্মীয়স্বজনের আগমনে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ১০৬ জন, অথবা তারও বেশি।

রাজাবাড়িয়া থেকে কত লোক অন্যত্র, অর্থাৎ ভারতে, পাদ্রীশিবপুর গ্রামে, চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা প্রভৃতি স্থানে অভিবাসী হয়ে চলে গেছে তা নিরূপন করা কষ্টসাধ্য। তবে যতটুকু তথ্য পাওয়া যায় সেই অনুসারে বাংলাদেশে স্বাধীন হওয়ার পর ৪ পরিবার ভারতে গেছে; ৪ টি পরিবার এবং একক ব্যক্তি হিসেবে ১৯ জন ব্যক্তি স্থায়ী ভাবে গ্রামের বাইরে চলে গেছে।[২৮]

সাধু আন্তনীর তীর্থ স্থান: এই তীর্থস্থানটি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে ধর্মপ্রদেশীয় তীর্থস্থান বলে বরিশাল ডাইয়োসিসের ধর্মপাল বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাবর্ষে ইতালি পাদোয়া থেকে সাধু আন্তনীর পবিত্র দেহাবশেষের অংশ তীর্থের জন্য বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং ঐ সময়ে সাধু আন্তনীর সেই দেহাবশেষ রাজাবাড়িয়াতে কিছুক্ষণের জন্য "থান" বা স্থান দেওয়া হয়েছিল। ঐ সময়ে গ্রামে বিশপ, পুরোহিত, ব্রাদার ও সিস্টারসহ অনেক খ্রিস্টান জনগণ ডাইয়োসিসের বিভিন্ন জায়গা থেকে আগমন করে। এমন কি অন্য ধর্মাবলম্বীরাও অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসে। এ ঘটনাটি ঐতিহাসিক একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। এখানে প্রতিবছর ডাইয়োসিসের উদ্যোগে এবং স্থানীয় জনগণ ও অন্যত্র বসবাসরত অভিবাসীদের উদারতায় বার্ষিক তীর্থ পালিত হয়। সেখানে প্রায় ১২০০-১৫০০ শত লোক সমবেত হয় প্রার্থনা, ধর্মশিক্ষা ও খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠানে। দূরযাত্রীদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।

[২৮] সম্পাদনা কমিটির তথ্য-সংগ্রহ –২০২৪

স্কুল: সেন্ট আন্তনী প্রাইমারি স্কুল (প্রতিষ্ঠিত ২০০৯ খ্রি.)
যুব সংঘ: রাজাবাড়িয়া যুবসংঘ (প্রতিষ্ঠিত ২০০০ খ্রি.)
ক্রেডিট ইউনিয়ন: রাজাবাড়িয়া খ্রিস্টান ঋণদান সমবায় সমিতি (স্থাপিত ১৯৯৫ খ্রি.)
মারীয়া সংঘ: রাজাবাড়িয়া মারীয়া সংঘ (স্থাপিত ২০১৮ খ্রি.)

বিশেষ দ্রষ্টব্য
এই গ্রন্থের দ্বাদশ ভাগে শিকদার বংশ-তালিকায় রাজাবাড়িয়া ও পাদ্রীশিবপুর জনগণ কীভাবে সংযুক্ত তা বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৯]

দ্বিতীয় অধ্যায়: চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের প্রশাসনামল (১৯২৭-২০১৬)

পূর্বে যেমন বলা হয়েছে যে, পাদ্রীবিপুর ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত "পাদ্রোয়াদো" ব্যবস্থাপনায় মাদ্রাজের মাইলাপুর ডাইয়োসিসের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূর্বের সকল মিশনারিগণ ছিলেন আগষ্টিনিয়ান সম্প্রদায়ের ফাদার। তাদেরকে "কালো মিশন"-এর ফাদার বলা হত কেননা তারা কালো ক্যাসাক পরিধান করতেন। আগষ্টিনিয়ান ফাদারদের শেষ পালপুরোহিত ছিলেন ফাদার এ. মন্টারিও (১৯২৮-১৯৩০) খ্রি.। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে সদ্য প্রতিষ্ঠিত (১৯২৭ খ্রি.) নতুন ডাইয়োসিস চট্টগ্রামের সঙ্গে পাদ্রশিবপুর প্যারিশ যুক্ত হয়। তখন থেকে পাদ্রীশিবপুরে হলিক্রস ফাদারগণ কাজ করতে শুরু করেন। তারা সাদা ক্যাসাক পরিধান করতে বলে তাদেরকে "সাদা মিশন"-এর ফাদার বলে পরিচিত হতে লাগল।

॥ ক ॥ প্রথম ধর্মপাল: পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ আলফ্রেড ল্য পাইয়োর, সিএসসি (১৯২৭-১৯৫১)

চট্টগ্রাম ডাইয়োসিস ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাইয়োসিসের প্রথম বিশপ ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ আলফ্রেড ল্য পাইয়োর, সিএসসি। তৎকালীন চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের অন্তর্ভুক্ত ছিল বৃহত্তর চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, বরিশাল (গৌরনদী ও নারিকেলবাড়িসহ) এবং আসাম ও মিয়ানমারের কিয়দাংশ। চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের পালকীয় তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয় কানাডীয় পবিত্র ক্রুশ সংঘের হাতে। মাদ্রাজের মাইলাপুর ডাইয়োসিসের অন্তর্ভুক্ত পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের সঙ্গে যুক্ত হয়।

চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের সাথে যুক্ত হওয়ার পর থেকে পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের একটি নতুন যাত্রা শুরু হয়। পাদ্রোয়াদো ব্যবস্থানায় পাদ্রীশিবপুরের জন্য কী কী শুভ ফল পাওয়া গেছে তা আমরা বর্তমানকালে একদিকে মূল্যায়ন করতে অপারগ কারণ ঐ মুহূর্তে আমরা কেউ ছিলাম না। তবে ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে কিছু কিছু শুভ ফল দেখা যায় যেমন, খ্রিস্টানদের আগমন, মিশন প্রতিষ্ঠা, গির্জা নির্মান, বিদেশে গড়া খ্রিস্টীয় এতিহ্য ও ভাবধারা, ধর্মীয় জীবনের তত্ত্বাবধান, খ্রিস্টীয় লোকভক্তির প্রসার, জমিদারির সাথে ধর্মীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা, খ্রিস্টানদের স্বীকৃতি, প্যারিশের ব্যাপারে পুরোহিতদের একচ্ছত্র ক্ষমতা ইত্যাদি।

[২৯] ড. মেরী মনিকা গোমেজ, দ্বাদশ ভাবে - পরিশিষ্ট-৩

তবে ঐ সবকিছু আবার এমন ভাব জন্ম দিয়েছে যা বহু বছর ধরে পাদ্রীবপুরকে একঘরে করে রেখেছে, বাণী প্রচার জন্য মিশনারীরা অন্য মানুষের কাছে তেমন একটা যায় নি, জনগণ ঘেটো হয়ে গেছে বা নিজস্ব একটি গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল তারা, পুরোহিতের উপর নির্ভরশীলতা ছিল প্রায় সবকিছুর বিষয়ে; বাইরের সমাজের সাথে জমিদারির কারণে খ্রিস্টানরা ঈর্ষা ও হিংসার কারণ হয়ে উঠেছিল; সমাজের মধ্যে কোন্দল, পুরোহিতের বিরুদ্ধে জনগণের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ হয়েছে বেশ কয়েকবার। স্থানীয় পুরোহিত, ব্রাদার ও সিস্টারদের আহ্বানের কোন সুযোগ ছিলনা। জমিদারির মধ্য দিয়ে জাগতিক ক্ষমতা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে মন্ডলীকে সামন্তবাদের সাথে এক করে ফেলেছে। কান্দায়-কান্দায় কোন্দল ও বিবাদ, রাজতন্ত ও প্রজাতন্ত্রের ভাব সমাজে। অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষের সাথে এখন যে সুন্দর সম্পর্ক তা জমিদারি প্রথা অবলুপ্ত হওয়ার পর পঞ্চাশ ও ষাট দশকে তেমন একটা দেখা যায়নি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে কতো প্রতিহিংসামুলক হুমকি ও আচরণের ঘটনা ঘটেছে, জনগণের মধ্যে একটি উপনিবেশিক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে ইত্যাদি। যারা একটু চিন্তাশীল তারা অনেকেই মনে করেন যে, এ সব অনেকটা পর্তুগীজ পাদ্রোয়াদো ব্যবস্থাপনার কুফল। এটা হচ্ছে উক্ত ব্যবস্থাপনার মধ্যে অব্যস্থাপনা বা দুর্বলতা।

পাদ্রোয়াদো থেকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে বেরিয়ে আসা পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর উন্নয়নের জন্য এক বিরাট মাইলফলক হয়ে আছে।[৩০] আর এই মাইলফলকের স্থপতি ছিলেন শ্রদ্ধেয় বিশপ আলফ্রেড ল্য পাইয়র, সিএসসি. চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের প্রথম বিশপ। নতুন নতুন সেবাকাজের উদ্ভাবন এবং পবিত্র ক্রুশ সংঘের ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণকে পাদ্রীশিবপুরে নিয়ে আসা একটি স্বর্ণালী যুগের সূচনা। অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়তো তাৎক্ষণিক ভাবে দৃশ্যমান হয় নি। বহুদিনের গড়ে ওঠা সিস্টেম পরিবর্তন করা বহু দিনের প্রয়োজন হয়, দৃশ্যমান হতে সময়ের প্রয়োজন হয়।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে বিশপ আলফ্রেড ল্য পাইয়র, সিএসসি, প্রথমকারের মতো পালকীয় সফরে পাদ্রীশিবপুরে আসেন। পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রথম পুরোহিত, ফাদার লুইস ফিনো, সিএসসি-কে পাল-পুরোহিত হিসেবে নিয়োগদান করেন। ফাদার ফিনো সর্বশেষ আগষ্টিনিয়ান ফাদার মন্টেরোর কাছ থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পাদ্রীশিবপুরের জনগণ যারা ফাদার ফিনোকে দেখেছেন ও তার সেবা পেয়েছেন তারা জোরগলায় তাঁর প্রশংসা করেছেন। তিনি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন এবং বরিশালে সদর রোডে ইংলিশ কবরস্থানে শায়িত আছেন (১৯৩০-১৯৪২)। ফাদার ফিনো'র পর ফাদার জি.জি. লাপিয়ের, সিএসসি. পাল-পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেন (১৯৪২-১৯৪৭)। প্রথমবারের মতো একজন ধর্মপ্রদেশীয় ফাদার পাদ্রীশিবপুরে নিযুক্ত হন যার নাম ফাদার বাট্রাণ্ড রড্রিগ্স। তিনি ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাদ্রীশিবপুরের পাল পুরোহিত ছিলেন এবং একই সময়ে তিনি পাদ্রীয়ান তালুকের শেষ জমিদার ছিলেন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ থেকে জমিদারি প্রথা পাকিস্তান সরকার বাতিল করে দেয় এবং তা পাদ্রীশিবপুরে কার্যকরী হয় ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে শ্রদ্ধেয় বিশপ ল্য পাইয়র প্রথম পালকীয় সফরেই ঘোষণা দিলেন যে, পাদ্রীশিবপুরে পবিত্র ক্রুশ সংঘের ব্রাদারদের নিয়োগ দেবেন। শিক্ষাকাজে কিংবদন্তী ব্রাদার ডেনিস গডফ্রে, সিএসসি-কে হাই স্কুল করার দায়িত্ব দিয়ে পাঠাবেন এবং তার কাছে পাদ্রীয়ান তালুকের জমিদারির দায়িত্ব অর্পন করবেন।

[৩০] Bp. Alfred Le Pailleur, csc. Le District de Chittagng et Notre Mission Catholique, vol 1, 1943

পরিকল্পনা অনুসারে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ব্রাদার ডেনিস গডফ্রে, সিএসসি পাদ্রীশিবপুরের শ্রীমন্ত নদীর ঘাট দিয়ে আগমন করেন। সেন্ট আন্তনী স্কুল নামে যে প্রাইমারী স্কুলটি পূর্ব থেকে প্রচলিত ছিল সেই স্কুলটি ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে বিশপের নামানুসারে সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুল নামে প্রতিষ্ঠিত হয়, যার প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন ব্রাদার ডেনিস গডফ্রে, সিএসসি। হলি ক্রস ব্রাদারগণ ডি' সিলভা সাহেবদের কাছ থেকে একখণ্ড জমি ক্রয় করে সেখানে ব্রাদারদের জন্য বসতবাটি স্থাপন

করলেন এবং সেন্ট যোসেফ নামে খ্রিস্টান ছাত্রদের বর্ডিং স্থাপন করলেন। মুসলমান ছাত্রদের জন্য দক্ষিণের রাস্তার পূর্বপাশে শ্রীমন্ত নদীর তীরে "রহিমুদ্দিন মুসলিম বর্ডিং" চালু করা হয়। কলকাতা ইউনিভার্সিটির আওতায় ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট আলফ্রেড স্কুল থেকে প্রথমবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়া হয়। এ সব স্থাপনার বিষয়ে সপ্তম ভাগে বিশদ আলোচনা রয়েছে।

সেন্ট আলফ্রেড স্কুলের রজতজয়ন্তী পালিত হয় ১৯৫৮খ্রিস্টাব্দে। উক্ত জয়ন্তীর সময় আমি ৮ম শ্রেণির ছাত্র ছিলাম। অনেক কিছুই স্মরণে আসে। স্কুলের পঁচিশ বর্ষে পূর্তিতে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। সেখানে ১৯৩৭ থেকে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে কে কে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করেছে তাদের নাম বছর ওয়ারি লিখিত রয়েছে। এখানে বলা প্রাসঙ্গিক যে, চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসে তখন ছেলেদের জন্য একটি মাত্র বাংলা মিডিয়ামের হাই স্কুল ছিল যেখানে অন্য প্যারিশ থেকে ছাত্ররা এসে সেন্ট যোসেফ বোর্ডিং থেকে পড়াশুনা করত। স্মরণিকায় যে তথ্য দেওয়া হল তা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়:

১৯৩৭-১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যারা ম্যাট্রিক পাশ করেছে তাদের সংখ্যা ৪২৫ জন, অর্থাৎ গড়ে প্রতি বছর ১৭ জন।

মুসলমান পাশ করা ছাত্রদের সংখ্যা	২১০ জন = ৪৯%
হিন্দু পাশ করা ছাত্রদের সংখ্যা (২ জন বৌদ্ধ ছাত্রসহ)	৮৫ জন = ২১%
পাদ্রীশিবপুরের কাথলিক ছাত্রদের সংখ্যা	৫৪ জন = ১২%
ডাইয়োসিসের অন্য প্যারিশের কাথলিক ছাত্রদের সংখ্যা	৭৬ জন = ১৮ %

আমাদের বক্তেব্যে আরেকটি কথা বলা যায় যে, তৎকালীন সময়ে মোট কাথলিক ছাত্রদের সংখ্যা ছিল ১৩০ জন যা শতকরা ৩০ ভাগ এবং মুলসলমান ও হিন্দুদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৭০ ভাগ। যদিও পাদ্রীশিবপুরবাসী কাথলিকদের সংখ্যা আরও বেশি হতে পারত, তথপি আমার মনে হয় প্রথম পঁচিশ বছরে তৎকালীন সময়ে ৫৪ জন্য ম্যাট্রিক পাশ করা এটা কম সংখ্যক নয়। উপরুন্তু ঐ সময়ে অনেকে আবার কলকাতাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন যাদের ছেলেরা ওখানেই পড়াশুনা করত।

ধর্মবিশ্বাস-ওয়ারি ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ৫ম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণির ছাত্রদের মোট সংখ্যা ছিল: খ্রিস্টান ৭১ জন; মুসলমান ২৫৬ জন; হিন্দু ৮৫ জন; সর্বমোট ছাত্র সংখ্যা: ৪১১ জন।[৩১]

হলিক্রস ব্রাদারদের নিরলস প্রচেষ্টায় ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অঙ্গ হিসেবে "প্রাথমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" (জি.টি. স্কুল ও বোর্ডিং) যেখানে ধর্ম-নির্বিশেষে প্রাইমারী শিক্ষকদের জন্য ট্রেনিং এর ব্যবস্থা ছিল।

[৩১] সেন্ট আলফ্রেড স্কুল, রজত জয়ন্তী-১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৮-৪৩ এবং ১৫।

আরেকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারি কানাডীয় পবিত্র ক্রুশ সংঘের তিনজন সিস্টার পাদ্রীশিবপুরের মাটিতে প্রথমবারের মতো পদার্পণ করেন। বরিশাল থেকে লঞ্চ দিয়ে, সাহেবগঞ্জ থেকে মিশনের পানসি করে শ্রীমন্ত নদী দিয়ে পাদ্রীশিবপুরে আগনম করেন যেখানে ১৬০০ পাদ্রীশিবপুরবাসীর প্রতিনিধি হয়ে অনেক জনগণ গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের বাড়িতে গ্রহণ করা হয়। তিনজন সিস্টারের নাম: সিস্টার মারি দ্য স্যান্ত-জারমেঁ (সুপিরিয়র), সিস্টার স্যান্ত মারি দ্য স্যান্ত-ইউদালি, সিস্টার মারি দ্য স্যান্ত-লাওরা দ্য লা স্যন্ত-ক্রোয়া। তাদেরকে বরণ করে নেন ফাদার লুইস ফিনো, ব্রাদার ফ্লেবিয়ান এবং পরের দিন বিশপ ল্য-পাইয়োর, ফাদার লারোজ, ব্রাদার স্টিফেন, ব্রাদার আমব্রোজ, লিও এবং ফেরনান্ড। প্রথমবারের মতো জনগণ সিস্টারদের অপরিচিত পোশাকে দেখেন। খ্রিস্টানদের সাথে হিন্দু ও মুললমানরাও উপস্থিত ছিলেন। মিশার পর জনগণ বাজি ফুটিয়ে সিস্টারদের বরণ করে নেন। পরবর্তীতে পাদ্রীশিবপুরে নির্মিত কনভেন্টটি চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসে হলি ক্রস সিস্টারদের কেন্দ্রীয় কনভেন্ট বলে গণ্য হয়। শ্রদ্ধেয় সিস্টার ইউদালি, সিএসসি ফাতিমা স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন ১১ই মে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে। জানা মতে পাদ্রীশিবপুরে পূর্বে কোন সিস্টার সংঘ ছিল না। সিস্টারদের সেবাকাজ নিয়ে পরবর্তীতে সপ্তম ভাগে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

উনিষশত চল্লিশ দশকে ঘটে গেছে বিশ্বে ও নিখিল ভারতে বেশ কয়েকটি বিরাট ঘটনা যার প্রভাব পাদ্রীশিবপুর বাসীদের মধ্যে প্রচন্ডভাবে রেখাপাত করে গেছে। সর্বপ্রথম উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্ব মহা যুদ্ধ (১৯৪৩-১৯৪৭)। যুদ্ধের কারণে এসেছে অর্থনৈতিক মন্দা যার ফলে বঙ্গে দেখা দিয়েছে দুর্ভিক্ষ। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের এই দুর্ভিক্ষের নাম হয়েছে "পঞ্চাশের মনান্তর" (১৩৫০ বাংলাবর্ষকে ঘিরে)। পঞ্চাশের মনান্তরের সময়ে আমার জন্ম হয়। এ হেন সময়ে আবার চলছিল ভারতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা বা রায়োট। রায়োটের কথা শুনে যে ভয়ভীতির সঙ্কা জেগেছে তা স্মরণ করলে এখনও আমার শরীর শিহরিত হয়ে ওঠে। গুজব ছড়াচ্ছিল আড়াইবেকী থেকে হিন্দুদের হত্যা করতে করতে এগিয়ে আসছে দাঙ্গামাকারীরা আমাদের উত্তর কান্দার খ্রিস্টান গ্রামে। তবে তেমন কিছু হয়নি। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভক্ত দুটো জাতির সৃষ্টি হল: ভারত ও পাকিস্তান। ছোট বেলায় জনগণের মুখে শুনতাম, "হিন্দুদের আছে হিন্দুস্থান, মুসলমানদের আছে পাকিস্তান, আর খ্রিস্টানদের আছে কবরস্থান"। একদিকে খাদ্যাভাবে আবার অন্যদিকে জীবনের নিরাপত্তাহীনতায় খ্রিস্টানদেরকে কত ভুগতে হয়েছে তখনকার সময়ে।

পঞ্চাশের মনান্তর বা দুর্ভিক্ষ এবং ভারত ও পাকিস্তান পাদ্রীশিবপুর গ্রামে একটি দুর্বিসহ দুর্যোগ নিয়ে এসেছে। এই সময়ে পাদ্রীশিবপুরবাসী অনেকেই পশ্চিমবঙ্গে থাকত ও কাজ করত। ঐ সময়ে অনেককেরই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে তারা পশ্চিমবঙ্গে থাকবে না পূর্বপাকিস্তানে ফিরে আসবে। আগে কলকাতায় কাজ করে অনেকেই টাকা পয়সা বাড়িতে পাঠাতো। কিন্তু যারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতে থাকবে তারা তাদের পরিজন নিয়ে কলকাতা চলে গেছে এবং ওখানে স্থায়ী ভাবে বাস করতে শুরু করল, বাড়িতে টাকা পাঠানো প্রায় বন্ধ হয়ে গেল এবং পাদ্রীশিবপুর পরিবারগুলো চরম দারিদ্রের মধ্যে পড়ে গেল। আবার যারা পূর্বপাকিস্তানে ফিরে এসেছে তাদের অনেকেরই আবার তেমন কোন কর্মসংস্থান ছিল না। তারাও আবার পাদ্রীশিবপুর ছেড়ে কেই চট্টগ্রামে, কেউ খুলনা, কেই ঢাকা চলে গেছে। এভাবে পাদ্রীশিবপুর বাসী অনেকেই অভিবাসী হয়ে পাদ্রীশিবপুর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে।

১৯৫০ খ্রিঃ গুরু ট্রেনিং (Ecole des Cardes) নামে কাথলিক শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য ট্রেনিং স্কুল শুরু করা হয় এবং মাদার আলফোন্সকে নিয়োগ দেয়া হয়। অন্যান্য ধর্মপল্লীর কাটেখ্রিস্ট মাস্টারদের এখানে ট্রেনিং দেওয়া হতো।

উনিশশত পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে, মন্ডলীতে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়। এই কারণে পাদ্রীশিবপুরে হাই স্কুলের মেয়েদের জন্য বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় শুরু হয় এবং তাদের জন্য বোর্ডিং খোলা হয় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে। ডাইয়োসিসের বৃহত্তর প্রয়োজনে চট্টগ্রাম ও বরিশাল অঞ্চলের প্রয়োজনে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়টি বরিশালে স্থানান্তরিত হয়। আবার কয়েক বছরের মধ্যে হাই স্কুলের মেয়েদের পাদ্রীশিবপুরে নিয়ে আসা হয় এবং ছেলেদের সাথে একত্রে কো-এডুকেশন শুরু করা হয় (১৯৬৬)।

॥ খ ॥ পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ রেমণ্ড লারোজ, সিএসসি (১৯৫২-১৯৬৭)[৩২]

পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ রেমণ্ড লারোজ, সিএসসি ছিলেন চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের দ্বিতীয় বিশপ। বিশপ রেমণ্ড ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ধর্মপালের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিশপ লারোজের সময় যে সমস্ত পালকীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে সেই সমস্ত উদ্যোগের সাথে ডাইয়োসিসের একটি প্যারিশ হিসেব পাদ্রীশিবপুরও সম্পৃক্ত ছিল বিধায় সেই সমস্ত ঘটনাগুলো উল্লেখ করছি এবং নির্দিষ্টভাবে যে ঘটনাগুলো পাদ্রীশিবপুরে ঘটেছে তাও উল্লেখ করছি।

শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়ন: ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পাদ্রীশিবপুরে শুরু করা মেয়েদের হাইস্কুল "প্রভাতি ডমেস্টিক হাই স্কুল" নামে বরিশালে স্থানান্তরিত হয়। পূর্বের সেন্ট যোসেফ বোডিং, যা ছিল চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের সব প্যারিশের ছেলেদের জন্য উন্মুক্ত সেই "সেন্ট যোসেফ বোর্ডিং", নতুন নামে "সেন্ট যোসেফ অ্যাপোস্টলিক বোর্ডিং" ১৯৫৮ খ্রস্টাব্দে চালু করা হয় যেখানে কেবলমাত্র যারা ফাদার-ব্রাদার হতে চায় তাদের জন্য এবং যাদের মধ্যে সমাজে ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেওয়ার সম্ভাবনা আছে শুধু তাদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। প্রায় উনিশ শতকের পঞ্চাশ দশক থেকে বরিশালের দক্ষিণ অঞ্চলের রাখাইন সম্প্রদায়ের কিছুসংখ্যক ছেলেরা পাদ্রীশিবপুরে কয়েকটি বাড়িতে জাইগির থেকে সেন্ট আলফ্রেড স্কুলে পড়াশুনার সুযোগ গ্রহণ করেছে। পরবর্তীতে দীপ্তি হোস্টেলের সুযোগ নিয়ে অনেক মেয়েরা স্কুলে পড়াশুনার সুযোগ পেয়েছে।

উনিশশত পঞ্চাশ দশকে পাদ্রীশিবপুর সহ গোটা ধর্মপ্রদেশে সঞ্চয় ও সমবায় সমিতির আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোপারেটভ স্টোর, স্কুল সেভিংস ব্যাংক শুরু হয়। কোপারেটিভ ও ক্রেডিট ইউনিয়নের আন্দোলন স্কুলে ও সমাজে শুরু হয়ে যায়। শিক্ষকদের জন্য ঋণদান সমিতির প্রচলন ঘটে। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে হলি ক্রস সিস্টারদের দ্বারা "বাসন্তিকা মহিলা সমিতি এবং সেলাই সেন্টার" শুরু করা হয়।

---

[৩২] Chittagong Jubilee – 2000

উনিশ শত পঞ্চাশ ও ষাট দশকে পাদ্রীশিবপুর কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্র (এডিসি) প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে)। সেন্ট আলফ্রেড স্কুলটি কৃষি বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ব্রাদার কনস্টান সিএসসি এবং আলেক্স রাবানাল (একজন ফিলিপিনো যাকে সবাই 'দুদু' বলে এলাকার মানুষ ডাকতেন) কৃষিকাজে এক সবুজ বিপ্লবের জন্য অবদান রেখে গেছেন। এই সব বিষয়ে সপ্তম ভাগে আরও বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। প্রায় একই সময়ে দুই দশক ধরে কাথলিক অ্যাকশন আন্দোলন (১৯৫৮ খ্রি.) চালু করা হয় যার প্রকাশ স্বরূপ ওয়াই.সি.এম. যুব-আন্দোলন শুরু হয়। এ সময়ে গরিবদের সাহায্যার্থে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে এস.ভি.পি শুরু করা হয়।

চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসে, বরিশাল অঞ্চলে বিশপ লারোজের নেতৃত্বে এবং মাদার আলফন্স লীগরি, সিএসসি-এর সহযোগিতায়, মণ্ডলীতে "মণ্ডলীর ক্ষুদ্র সেবিকা সংঘ" নামে একটি ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে। মণ্ডলীকে দেশীয়করণ প্রক্রিয়ার অংশবিশেষ এই ধর্মসংঘটি স্থাপন করা হয়। সংঘটি শুরু করার সাথে সাথে পাদ্রীশিবপুরের বেশ কয়েকজন মেয়েরা সংঘে প্রবেশ করেন। পরবর্তীতে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবারের মতো পাদ্রীশিবপুরে একটি আশ্রম খোলা হয়। তারা তাদের উদ্দেশ্য ভাবধারা অনুসারে দক্ষিণের রাস্তায় বার্নাড স্যারের বাড়িতে আশ্রমটি শুরু করেন।

মণ্ডলীতে নবীকরণ ও পরিবর্তন: মণ্ডলীর নবীকরণের জন্য ১৯৬২-১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে রোম নগরীতে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মহাসভায় বিশপ রেমণ্ড লারোজ সিএসসি, সবগুলো অধিষ্ঠানে যোগদান করেন। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার আলোকে চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের মধ্যে নবীকরণের জন্য বরিশালে অরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয় (১৯৬০ খ্রি.) এবং নবীকরেণের বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার, কর্মশালা, প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় এবং একাডেমি অব অরিয়েন্টাল মিউজিক খোলা হয়।

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার নবীকরণ: উপাসনা, ধর্মশিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ক: বরিশালে শিক্ষ-সপ্তাহ (১৯৬২) আয়োজন করা হয়: আন্তঃধর্মপ্রদেশীয় সেমিনার আয়োজন করা হয় (১৯৬৪); চট্টগ্রামে উপাসনা-বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় (১৯৬৫): উপাসনা-অনুষ্ঠানের বঙ্গানুবাদ, দেশীয়করণ, উপাসনা সঙ্গীত রচনা ও শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। চট্টগ্রামে ধর্মশিক্ষা কোর্স (১৯৬৪); ধর্মশিক্ষা বিষয়ক আন্তঃধর্মপ্রদেশীয় সেমিনার (১৯৬৪); এই সমস্ত প্রোগ্রামে পাদ্রীশিবপুর সক্রিয়ভাব অংশগ্রহণ করে এবং নিজেদেরকে নবায়ন করে। বরিশাল ইসলামের উপর সেমিনার (১৯৬২); ধর্ম ও সমাজতন্ত্র বিষয়ক সেমিনার (১৯৬৪); ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষা-সপ্তাহ-করাচী সেমিনারীর অধ্যাপকদের দ্বারা পরিচালিত-বরিশাল (১৯৬৭)। ১৯৬২ খ্রি: নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ, বরিশাল: কুমিল্লা একাডেমিতে মিশনারীদের জন্য কোপারিটিভের উপর সেমিনার (১৯৬২); কুমিল্লা একাডেমিতে সমাজ-উন্নয়ন বিষয়ক সেমিনার (১৯৬৪)।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস: ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের প্রথম দিকে পাদ্রীশিবপুরসহ দক্ষিণাঞ্চল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের দুর্যোগে কবলিত হয়। উক্ত ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়েছিল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও ও গাব্রিয়েল মানিক গোমেজ (মাটিভাঙ্গা)। ম্যাট্রিক দেওয়ার পরপরই পাল-পুরোহিত ফাদার ফিলিপ পাইয়াঁ, সিএসসি এদের দু'জনকে, ব্যাপ্টিষ্ট মণ্ডলীর তেইশটি পরিবারের মধ্যে যে ষোলটি পরিবার

কাথলিক হতে চেয়েছিল তাদরকে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার জন্য বঙ্গোপসাগারের কাছে সোনাতলা নামক একটি গ্রামে পাঠিয়ে ছিলেন। ৮-১০ মে অনুষ্ঠিত জলোচ্ছাসে, ঘরের ভিতের উপর সমুদ্রের ডেউতে বিশ ফিট জল ওঠায় তারা একটি খেজুর গাছে ১২ঘন্টা আশ্রয় নেয়। ৫ দিন যাত্রার শেষে তারা জীবিত অবস্থায় পাদ্রীশিবপুরের ফিরে আসে। জলোচ্ছাসে ৫৬% লোক মারা যায়। খ্রিস্টানেদের মধ্যে যে পরিবারগুলো বেঁচে ছিল তারা তাদের বাসস্থান ত্যাগ করে পাদ্রীশবপুরে চলে আসে। তাদেরকে গ্রহণ করার জন্য বিশপ লারোজ পাদ্রীশিবপুরে আসেন। তাদেরকে পাদ্রীশিবপুরে এক এক বাড়িতে এক মাসের জন্য পুনর্বাসন করা হয়।

এই ঘূর্ণিঝড়ে পাদ্রীশিবপুরের গির্জার ওপরের সম্মুখভাগ ভেঙ্গে যায় যা পরে সংস্কার করা হয় এবং ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে গির্জা ভাঙ্গা পর্যন্ত তা স্থায়ী থাকে।

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের কারণে পাদ্রীশিবপুর গ্রাম থেকে বরিশাল শহরে হলি ক্রস সিস্টারগণ চলে যান।

সারসংক্ষেপ: বিশপ লারোজের সময়ে যে দিকগুলো বেশি গুরুত্ব পেয়েছে তা হল: সমাজচেতনা ও সমাজ-উন্নয়ন, শিক্ষার বিস্তার, মণ্ডলীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে নবীকরণের জন্য চেতনা, শিক্ষা ও গঠন, কাথলিক একশন নীতি অনুসরণ, ভক্তজনগণের অংশগ্রহণ, একসঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করার ভাব team spirit.

পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ রেমন্ড লারোজ, সিএসসি ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। কেন অবসর গ্রহণ করলেন? স্বাস্থ্যগত কারণ একটা থাকতে পারে, তবে তিনি ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কিন্তু বেঁচে ছিলেন। অব্যাহতি নেওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে আমার কাছে যা মনে হয় তা হল তিনি দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার শিক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে স্থানীয় একজনকে বিশপ নিয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই সিদ্ধান্তে তার চিন্তাধারা ও আধ্যাত্মিকতা সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়।

॥ গ ॥ পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি (১৯৬৮-১৯৯৪)[৩৩]

ঢাকার একজন হলি ক্রস ফাদার যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি, বিশপ পদে নিযুক্ত হয়ে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের বিশপপদে অভিষিক্ত হন। যদিও বিশপ যোয়াকিমের বাড়ি ঢাকা ডাইয়োসিসের শুলপুর ধর্মপল্লীর একজন ফাদার ছিলেন, তথাপি তিনি চট্টগ্রামের সাথে পুরোহিত হবার আগে থেকে পরিচিত ছিলেন। তিনি উনিশ শতকের পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে নোয়াখালিতে পবিত্র ক্রুশ সংঘে নভিশিয়েট করেন এবং বরিশালের সাগরদিতে অন্যদের সঙ্গে স্কলাষ্টিক হিসেবে পড়াশুনা করেন। এর কারণে তিনি অনেকের কাছে পরিচিত ছিলেন।

তিনি যখন বিশপ হিসেবে চট্টগ্রামের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন অনেকগুলো বিষয় প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করেছে। এই প্রেক্ষাপটগুলো বিশপের নিজের সেবাকাজ নির্ধারণ করতে সাহায্য করেছে এবং একই সময়ে পাদ্রীশিবপুরের জনগণকে পালকীয় সেবাদানে সাহায্য করেছে। এখানে সেই প্রেক্ষাপটটি সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

[৩৩] Chittagong Jubilee – 2000

(ক) পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর নবায়ন: দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার ঠিক পরবর্তীকালে মণ্ডলীর মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে এবং জনগণের মাণ্ডলিক জীবন নবায়নের জন্য অনেক নতুন দাবি এসেছে। এ গুলোর মধ্যে কিছু কিছু ছিল শুভ আবার কিছু কিছু ছিল অশুভ। নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ এসেছে, ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে নতুনকে গ্রহণ করার আহ্বান এসেছে, নতুনের পক্ষে-বিপক্ষে অনেক মতামত ব্যক্ত হয়েছে ইত্যাদি। সংক্ষেপে পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ যে বিষয়গুলোর সম্মুখীন হতে হয়েছে তা হল মণ্ডলীর চিন্তাভাবনার পরিবর্তন, ধর্মীয় জীবন ও সংস্কারীয় জীবনযাপনে পরিবর্তন, উপাসনা-অনুষ্ঠানে নিয়মকানন ও রীতি-নীতির পরিবর্তন, ল্যাটিন ভাষার পরিবর্তে বাংলাভাষা ব্যবহারের প্রচলন, যাজক-ব্রাদার-সিস্টারদের লাইফ-স্টাইল ও আচার-আচরণে পরিবর্তন, কয়েকজনার যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবন পরিত্যাগ, কোন কোন যাজক-ব্রাদার-সিস্টারদের প্রতি বিরূপ সমালোচনা ধর্মীয় জীবনে আহ্বানের অন্তরায় হয়ে জনগণের মধ্যে কাজ করেছে, জনগণের অংশগ্রহণের জন্য অনেক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে, অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে শুভ সম্পর্ক, আবার একই সময়ে উদ্বিগ্নতা ও মনোমালিন্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে মণ্ডলীর উদ্যোগ ও জনগণের সম্পৃক্ততা প্রভৃতি বিষয়গুলো তখনকার প্যারিশের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, ইত্যাদি।

(খ) ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরের প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসে দেশ ও চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের সাগর-তীরবর্তী এলাকার মানুষ ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়েছিল। ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ নিতে হয়েছে।

(গ) ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতার সংগ্রাম ও যুদ্ধ, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি ও মুক্তি যুদ্ধে পাদ্রীশিবপুরবাসীদের সম্পৃক্ততা, অংশগ্রহণ এবং স্বাধীনতা-উত্তর কালের ভয়াবহ পরিস্থিতি। ত্রাণ, পুনর্বাসন ও উন্নয়নের জন্য ধর্মপল্লী জড়িত হয়ে পড়ে। সবাই সমানভাবে সুযোগ-সুবিধা না পাওয়া, অন্য ধর্মের ও এলাকার মানুষের মধ্যে খ্রিস্টান সংস্থা, যেমন কোর (CORR) ও কারিতাস কাজ করা, ইত্যাদি মানুষের মনে অনেক প্রশ্ন তুলেছে।

পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ যোয়াকিমের আমলে নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠা করা হয়: (ক) পাদ্রীশিবপুর দীপ্তি হোস্টেল (১৯৬৯), (খ) ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে ব্রদার আলবেরিকের পরিকল্পনা ও পরিশ্রমে গিলবার্ট হুইটলি সাহেবের বাড়িতে দ্বিতল বিশিষ্ট নতুন স্কুল ভবন নির্মাণ করা হয়। (গ) পাদ্রীশিবপুর সেন্ট যোসেফ হোম (১৯৯২), (ঘ) ফাদার লিও ট্রাস্ট, (ঙ) জন-কল্যাণ সমিতি, (চ) নিউ মার্কেট প্রতিষ্ঠা (১৯৭৪)।

সারসংক্ষেপ: বিশপ যোয়াকিম দরিদ্রদের পক্ষ সমর্থন, স্থানীয় মণ্ডলী, আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃমাণ্ডলীক সংলাপ ও সম্পর্ক, যাজক ও সন্ন্যাসজীবনের গঠন, এল.এইচ.সি সংঘের নবায়ন, পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ীদের মধ্যে বাণী প্রচার, মণ্ডলীতে সকলের জন্য গঠন-প্রশিক্ষণের ওপর জোর প্রাবক্তিক ভূমিকা রেখে গেছেন।

॥ ঘ ॥ পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি (১৯৯৫-২০১০)[৩৪]

ধর্মপাল: ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ এপ্রিল মাসে বিশপ প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, সিএসসি, চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের দায়িত্বে অভিষিক্ত। এর পূর্বে তিনি রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল ছিলেন ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি পাদ্রীশিবপুরেরই একজন সন্তান। পাদ্রীশিবপুর থেকে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তিনি পবিত্র ক্রুশ সংঘে প্রবেশ করেছেন।

চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের বিশপ থাকাকালীন সময়ে ধর্মপ্রদেশে পালকীয় দিগদর্শনমূলক এবং পাদ্রীশিবপুরে যে সমস্ত কাজ সম্পাদিত হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

(ক) জুবিলী উদ্‌যাপন: মহান জুবিলী ২০০০ খ্রিস্টাব্দ: পঞ্চবার্ষিকী পালকীয় পরিকল্পনা (১৯৯৬-২০০০খ্রি) গ্রহণ ও মহান জুবিলী উদ্‌যাপন চট্টগ্রামের প্রথম গির্জা প্রতিষ্ঠার ৪০০ শত বর্ষ পূর্তি পালন (২০০০); ধর্মপাল বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি-এর যাজকীয় জীবনের রজত জয়ন্তী (১৯৯৭), চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের ৭৫তম বার্ষিকী (২০০২), মহান জুবিলী বর্ষ পালন; মণ্ডলীর ক্ষুদ্র সেবিকা সংঘের সুবর্ণ জয়ন্তী (২০০৬), সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুলের ৭৫তম জুবিলী (২০০৮)

(খ) পালকীয় সম্মিলনী: মিলন ও মিলন সমাজের অভিব্যক্তি, অনুশীলন ও অনুপ্রেরণা: পালকীয় সম্মিলনীগুলো ও অন্যান্য পালকীয় সমাবেশগুলো ধর্মপ্রদেশের পালকীয় দর্শন, পালকীয় মিশন, পালকীয় ফোকাস, পালকীয় কার্যক্রম ও পালকীয় সাংগঠনিক কাঠামো, এক কথায় পালকীয় নির্দেশনা ঠিক করে নিতে ধর্মপ্রদেশকে সাহায্য করছে। এই পালকীয নির্দেশনা অতীতের বহুজনের ও বহুদিনের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে নির্মাণ করা হয়েছে; বর্তমান বাস্তবতার প্রতি সাড়াদানের তাগিদে রচিত হয়েছে; এবং ভবিষ্যতের প্রতি নিষ্ঠাবান অঙ্গীকার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। আমাদের ধর্মপ্রদেশের এই পালকীয় নির্দেশনা ধর্মপ্রদেশব্যাপী সকল খ্রিষ্টবিশ্বাসীর ধ্যান, জ্ঞান ও আচরণের ফলশ্রুতি বলে আমি বিশ্বাস করি।

(গ) ধর্মপ্রদেশীয় পালকীয় নির্দেশনার সারসংক্ষেপ: বুনিয়াদী স্তর থেকে অর্থাৎ পরিবার, গ্রাম/পাড়া/প্রতিবেশী ভিত্তিক ক্ষুদ্র সমাজ এবং সংঘ-সংগঠন ভিত্তিক সমাজদল থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ে নতুন পদ্ধতিতে খ্রিস্টসমাজকে মিলন ও মিলনসমাজ রূপে গড়ে তোলা। খ্রিস্টবিশ্বাসী ভক্তজনের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায়।

(ঘ) ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মপল্লীর কার্যক্রম সম্বন্ধে নির্দেশনা: (১) প্রার্থনা, উপাসনা ও আধ্যাত্মিক বিষয়ক কার্যক্রম, (২) ধর্মশিক্ষা বিষয়ক উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম বিষয়ক কার্যক্রম, (৩) শিশু ও যুবদের গঠন প্রশিক্ষণ বিষয়ক কার্যক্রম, (৪) আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম, (৫) পরিবার বিষয়ক কার্যক্রম, (৬) ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ বিষয়ক কার্যক্রম, (৭) ভক্তজনগণের জীবন ও সেবাকাজ বিষয়ক কার্যক্রম, (৮) সেবাকারীদের (যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তসেবাকর্মী) আহ্বান, জীবন ও সেবা বিষয়ক কার্যক্রম, (৯) খ্রিস্টীয় ঐক্য (আন্তঃমাণ্ডলিক) বিষয়ক কার্যক্রম, (১০) আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক কার্যক্রম, (১১) খ্রিস্টবাণী-প্রচার বিষয়ক কার্যক্রম, (১২) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিষয়ক কার্যক্রম, (১৩) দয়া বিষয়ক কার্যক্রম, (১৪) মানব-উন্নয়ন এবং ন্যায় ও শান্তি বিষয়ক কার্যক্রম।

[৩৪] Chittagong Jubilee – 2000

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনা

* লরেটো সিষ্টারদের পাদ্রীশিবপুরে আগমন এবং সেন্ট আলফ্রেড স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ (২০০৫)।
* যাজকীয় অভিষেক: ফাদার টেরেন্স রড্রিগস্ (১৯৯৬) যার নানা বাড়ি পাদ্রীশিবপুর; ফাদার জেরোম রিংকু গমেজের অভিষেক (২০০১)
* বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও-র তীর্থ যাত্রা: চল্লিশ বছর পর বরিশালের দক্ষিণ অঞ্চলের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলো পরিদর্শন করেন: খেপুপাড়া, শোনাতলা, কুয়াকাটা, তালতলি, ইত্যাদি (২০০০)
* বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি, ঢাকার উত্তরসূরী আর্চবিশপ হিসেবে মনোনীত (২০১০)।

পালকীয় কমিশন: চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশীয় (চট্টগ্রাম+বরিশাল আঞ্চলিক) ১০টি পালকীয় কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয় যার প্রভাব ও কার্যক্রমে অংশগ্রহণ পাদ্রীশিবপুর সহ প্রতিটি ধর্মপল্লীতে চলমান থাকে। (১) উপাসনা-অনুষ্ঠান ও প্রার্থনা বিষয়ক (১৯৯৬); (২) ধর্মশিক্ষা ও বাইবেলীয় প্রৈরিতিক কাজ বিষয়ক (১৯৯৬); (৩) পারিবারিক জীবন বিষয়ক (১৯৯৬); (৪) ন্যায্যতা ও শান্তি বিষয়ক (১৯৯৬); (৫) আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃমাণ্ডলিক সংলাপ বিষয়ক (১৯৯৬); (৬) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিষয়ক (১৯৯৬); (৭) যুবা-সেবা বিষয়ক (১৯৯৬); (৮) ভক্তজনগণ বিষয়ক (১৯৯৬); (৯) স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক (২০০২); (১০) চট্টগ্রাম ও বরিশাল পালকীয় ও সমন্বয় কমিটি বিষয়ক (১৯৯৬)।

নিম্নোক্ত ঘটনাগুলো **পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে** সম্পাদিত হয়: গৌরনদী থেকে পাদ্রীশিবপুরে সেবকালয় -- হলি রোজারি সেমিনারী নামে স্থানান্তরিত হয় (২০০৩); পাদ্রীশিবপুর নতুন গির্জা উদ্বোধন (২০০৫), লরেটো সিস্টারদের ঘর (২০০৫), হলি রোজারি সেমিনারী (২০০৭), সেন্ট আলফ্রেড কলেজ ভবন, (২০০৯) মেয়েদের নতুন দীপ্তি হোস্টেল ভবন (২০১০), এল.এইচ.সি গৃহের সংস্কার (২০১০); দেশান্তরকাঠি: নতুন গির্জা ও স্কুল ঘর (১৯৯৬); রাজাপুর: গির্জাঘর ও ফাদারদের ঘর (২০০৪), মাটিভাঙ্গা: নতুন গির্জা ও স্কুল ঘর ও প্রাঙ্গণ সংস্কার (২০০৮)।

সোনাতলা ও রাখাইন সম্প্রদায়: সোনাতলা ও রাখাইনদের জন্য সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ: তালতলি (২০০৯), তাঁতি পাড়া (২০০৯); কবিরাজ পাড়া (২০০৯), আমখোলাপাড়া (২০০৯), পাখিয়াপাড়া (২০০৯), শোনাতলা খ্রিস্টান পাড়া (দুটো সেন্টার - ২০০৯), পটুয়াখালি শপিং কমপ্লেক্স (২০০৮); মাটিভাঙ্গার স্কুল সেন্টার।[৩৫]

২০০৬ থেকে ২০১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বরিশালকে নতুন ডাইয়োসিস করা এবং চট্টগ্রামকে আর্চডাইয়োসিসকে রূপান্তরিত করার বিষয়টি বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও উত্থাপন করেছিলেন এবং প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন।

[৩৫] জীবন চরিত, পৃ: ১২৪-১২৬

॥ ৬ ॥ পরম শ্রদ্ধেয় মজেস মন্টু কস্তা, সিএসসি (২০১১-২০১৬)[৩৬]

দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের বিশপ মজেস মন্টু কস্তা সিএসসি-কে (১৯৯৬ খ্রি.), চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের ৫ম ধর্মপাল রূপে ২০১১ খ্রিস্টাব্দে নিযুক্ত হন এবং সেই বছরে ২৭ মে তিনি ডাইয়োসিসে অধিষ্ঠিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

২০১৩ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশীয় পালকীয় সেবাদল-এর অফিস চট্টগ্রামের বিশপ ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়।

বিশপ মজেস কস্তার প্রশাসন আমলে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে ধর্মপ্রদেশের ১৫ টি কমিশন ও ডেস্কগুলি পুনর্গঠন করেন যাতে ধর্মপ্রদেশের সকল জনগণ সার্বিক ক্ষেত্রে পালকীয় সেবা লাভ করতে পারে। কমিশন ও ডেস্কগুলো হল: উপাসনা-অনুষ্ঠান ও প্রার্থনা, ধর্মশিক্ষা ও বাইবেল শিক্ষা, পরিবারের কল্যাণ, শিক্ষা, ন্যায় ও শান্তি, স্বাস্থ্যসেবা, খ্রিস্টীয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, সামাজিক যোগাযোগ কমিশন, যুবা, ভক্তজনগণ, সেমিনারি, যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী, খ্রিস্টবাণী প্রচার ও পিএমএস, অভিবাসী ও শরণার্থী, পেশাজীবন বিষয়ক।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো বিশপ মজেস কস্তা, সিএসসি-এর পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম ডাইয়োসিস থেকে বরিশাল অঞ্চল ও খুলনার গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, শরিয়তপুর ও রাজবাড়ি জেলাকে অন্তর্ভূক্ত করে নতুন বরিশাল ডাইয়োসিস হিসেবে রোম থেকে অনুমোদন লাভ করেন ২৯শে ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করা উচিত। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে ২ ফেব্রুয়ারি আমাদের মাতৃ চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসকে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান আর্চডাইয়োসিস রূপে রূপান্তর করা হয় এবং প্রথম আর্চবিশপ হিসেবে পরম শ্রদ্ধেয় মজেস কস্তাকে মনোয়ন দেয়া হয়।

পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মজেস কস্তা, সিএসসি ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে খ্রিস্টানদের আগমনের ৫০০ বছরের পূর্তি-উৎসব আয়োজন করেছেন এবং যেখানে আদি পর্তুগীজ খ্রিস্টানদের বসতি ছিল সেই দিয়াং-এ মহাসমারহে ঘটনাটি বাণীপ্রচারের উদ্দেশ্যে পালন করেছেন।

পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মজেস কস্তা, সিএসসি, কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়ে আকস্মিকভাবে ১৩ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যু বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মণ্ডলীকে গভীরভাবে বিস্মিত ও মর্মাহত করেছে।

[৩৬] স্মরণিকা – চট্টগ্রামকে আর্চডাইয়োসিসে উন্নতিকরণ, সেপ্টেম্বর ৮, ২০১৭ খ্রি.

তৃতীয় অধ্যায়: বরিশাল ধর্মপ্রদেশের প্রশাসনামল (২০১৬ --)[৩৭]

পূর্বেই যেমন বলা হয়েছে যে, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিক ভাবে নতুন প্রতিষ্ঠিত বরিশাল কাথলিক ডাইয়োসিস উদ্বোধন করা হয় এবং শ্রদ্ধেয় বিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার, সিএসসি, ডাইয়োসিসের প্রথম বিশপরূপে অধিষ্ঠিত হন। ডাইয়োসিসের মধ্যে নিম্নোক্ত জেলাগুলো: বরিশাল, বড়গুনা, ভোলা, ঝালকাঠি, পটুয়াখালি, গোপালগঞ্জ, মাদারিপুর, শরিয়তপুর, ফরিদপুর এবং রাজবাড়ি। বরিশাল ডাইয়োসিসের মধ্যে আছে পাদ্রীশিবপুরসহ এবং পাদ্রীশিবপুর থেকে পৃথক করে ২০২১ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত নতুন মাটিভাঙ্গা ধর্মপল্লীসহ মোট সাতটি ধর্মপল্লী এবং ২টি উপধর্মপল্লী।

॥ ক ॥ পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি (২০১৬-২০২২)[৩৮]

পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদারের সময়ে নতুন ডাইয়োসিসে যা কিছু করা হয়েছে তার সাথে পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর জন্যও করা হয়েছে। এই সকল কাজের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরছি বিশেষ করে পিউস ডি'কস্তার লেখা "বরিশাল কাথলিক ডাইয়োসিসের জন্ম, বৃদ্ধি ও উন্নয়ন" প্রবন্ধ থেকে।

"আধ্যাত্মিক ও পালকীয় ক্ষেত্রে: প্রাত্যহিক সকাল/বিকালের খ্রিস্টযাগে ভক্ত জনগণের নিয়মিত যোগদান, রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগে সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহ ও প্রেরণা দেওয়া হচ্ছে। অন্যান্য পর্বীয় ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে ভক্তদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মে মাস ও অক্টোবর মাস ছাড়াও প্রতিদিন বাড়িতে জপমালা প্রার্থনা, বিভিন্ন বাড়িতে প্রার্থনা সভা, মণ্ডলী কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন আত্মিক উদ্দীপনা সভায় অংশগ্রহণ হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালা, বার্ষিক সম্মিলনীতে অংশগ্রহণ এবং শিশু মঙ্গল, ওয়াইসিএস, বিসিএসএম, সেন্ট ভিনসেন্ট দ্য পল, মারীয়া সেনাসংঘ, যুব সংগঠন, প্যারিশ কাউন্সিলে অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য।

পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর রাজাবাড়িয়া (কালাদা) উপকেন্দ্রের সাধু আন্তনীর গির্জাকে ডাইয়োসিসের তীর্থস্থান হিসেবে ঘোষণা (২০১৭ খ্রি.)। সেখানে প্রতিবছর আধ্যাত্মিক অনুশীলন ও নিরাময় অনুষ্ঠান, পাপস্বীকার, নিশি জাগরণ, বিষয়বস্তুর উপর বক্তব্য, পর্বীয় খ্রিস্টযাগ, ধর্মীয় পালাগান (পদাবলী কীর্তন) উপস্থাপনে ডাইয়োসিস, তথা সমগ্র বাংলাদেশের বিশ্বাসী ভক্তগণ অংশগ্রহণে তাদের আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৩৯]

---

[৩৭] বিশপীয় অভিষেক ও অধিষ্ঠান: বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও, ১৯ আগস্ট, ২০২২ খ্রি. পৃষ্ঠা ২৮-৩০; উপরে উল্লেখিত

[৩৮] উপরে উল্লেখিত – পিউস ডি'কস্তা

[৩৯] উপরে উল্লেখিত - পিউস ডি'কস্তা, পৃ: ২৯

ডাইয়োসিসের পালকীয় সেবাদলকে নতুনভাবে সাজিয়ে ১৪টি কমিশন ও কয়েকটি ডেস্ক সৃষ্টি ক'রে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শান্তি, সংলাপ, নিরাপত্তা, যোগাযোগসহ নানাবিধ সামাজিক, সাংগঠনিক ও পালকীয় সেবা দেওয়া হচ্ছে। ধর্মপল্লীগুলোতে "সিনোডাল চার্চ" বা অংশগ্রহণমূলক মণ্ডলী, নতুনভাবে যাত্রা শুরু ও ভিত্তি গড়ে উঠছে। যার ফলে মিলনধর্মী খ্রিস্টীয় সমাজ ব্যবস্থা, পবিত্র আত্মার প্রেরণকাজ, একত্রে পথ চলার সংকল্প বর্তমান খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া ধর্মপল্লীর আধ্যাত্মিক, পালকীয় ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।"

আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে: এনজিওগুলো উন্নয়ন ক্ষেত্রে চলমান, কাথলিক ক্রেডিট ইউনিয়নের ওপর গুরুত্ব, গৃহহীনদের জন্য হাউজিং প্রকল্প, আর্তমানবতামূলক সেবা, কোভিড-১৯ উপলক্ষে গরিবদের সাহায্য দান, প্রত্যেক ধর্মপল্লীতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা।[৪০]

অবকাঠামোগত উন্নয়ন: অনেক পুরাতন অবকাঠামোর মেরামত, বিভিন্ন এলাকায় গির্জা ও স্কুল নির্মাণ, স্বাস্থ্য সেবার জন্য রোগীদের আশ্রয়কেন্দ্র ও হেলথ ক্যাম্প এবং দক্ষিণাঞ্চলে রাখাইন সম্প্রদায় এবং উত্তরাঞ্চলে বর্মন ও ত্রিপুরাদের এলাকায় বাণী প্রচারকেন্দ্র স্থাপন, সাক্রেকর মার্কেট নির্মাণ, পালকীয় সেবাকেন্দ্র স্থাপন, এলএইচসি-দের নতুন গঠন-গৃহ, মাটিভাঙ্গাকে পূর্ণাঙ্গ ধর্মপল্লীতে রূপান্তর এবং উপকেন্দ্রে কিছু অবকাঠামো নির্মাণ যেমন, কুয়াকাটা মর্নিং স্টার সেন্টার, গির্জা নির্মাণ, বেশ কয়েকটি কোয়াজী প্যারিশ স্থাপন, "সান্তাক্রুশ পদাবলী কীর্তন দল" ইত্যাদি।[৪১]

"পথ প্রদর্শিকা কুমারী মারীয়ার ধর্মপল্লীতে ফাদার বাড়ির টিনসেড ছাদ নির্মাণ, সেমিনারির পুকুর খনন, সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুলকে প্রথম মিশনারি কলেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা, রাজাবাড়িয়ার সাধু আন্তনির গির্জাকে ধর্মপ্রদেশের তীর্থস্থান হিসেবে ঘোষণা এবং তীর্থযাত্রীদের জন্য ২টি সেড ও ১টি পাকা ঘাট নির্মাণ ইত্যাদি।"[৪২]

কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি যে, পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি পাদ্রীশিবপুরে অবস্থিত "কার্ডিনাল-পরম্পরা" এবং "পরম্পরা সংরক্ষণাগার"-র সাথে ২০১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। "কার্ডিনাল-পরম্পরা" সমর্থন দিয়েছেন, যাত্রা করেছেন, অগ্রগতির বিভিন্ন ঘটনায় উপস্থিত থেকে আশীর্বাদ করেছেন।

চট্টগ্রামের আর্চবিশপের মৃত্যুর পর, আসন শূন্য হয়ে যাওয়ায়, পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি-কে পোপ ফ্রান্সিস আর্চবিশপ হিসেবে মনোনয়ন করেন। আর্চবিশপ সুব্রত হাওলাদার ৯ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে অধিষ্ঠিত হয়ে বরিশাল ডাইয়োসিস ত্যাগ করে যান।

---

[৪০] উপরে উল্লেখিত – পিউস ডি'কস্তা, পৃ: ২৯

[৪১] উপরে উল্লেখিত – পিউস ডি'কস্তা, পৃষ্ঠা, ৩০

[৪২] উপরে উল্লেখিত – পিউস ডি'কস্তা, পৃষ্ঠা, ২৯

॥ খ ॥ পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও (২০২২--)[৪৩]

সর্বকনিষ্ঠ বরিশাল কাথলিক ডাইয়োসিসের দ্বিতীয় বিশপ হলেন পরম শ্রদ্ধেয় ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও। বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও-এর জন্ম রাজশাহী ডাইয়োসিসের অন্তর্গত ফৈলজানা ধর্মপল্লীতে। বিশপ ইম্মানুয়েল ১৯ আগস্ট, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে বিশপীয় পুণ্যপদে অভিষিক্ত হলেন এবং বরিশাল ডাইয়োসিসের দ্বিতীয় বিশপ হিসেবে একই দিনে অধিষ্ঠিত হলেন।

বিশপ ইম্মানুয়েলের অভিষেক ঘিরে যে সাক্ষাৎকারটি তিনি দিয়েছিলেন সেখান থেকেই কিছু উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরছি। পাদ্রীশিবপুরের ফাদার জার্মেন সঞ্চয় গোমেজ বিশপকে প্রশ্ন করেছিলেন: "ধর্মপ্রদেশের জন্য আপনার পরিকল্পনা ও প্রাধান্যগুলো কী?" উত্তরে বিশপ ইম্মানুয়েল বললেন:

"হ্যাঁ, ইতোমধ্যেই যেমনটি বলেছি বরিশাল ধর্মপ্রদেশে ও এর বাস্তবতা সম্পর্কে আমার তেমন ধারণা নেই। আমার কাছে একেবারেই নতুন। মনে করি বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহামের মত আমারও আহ্বান হলো অজানাকে জানার এবং এই নতুনের নতুনত্বকে নতুনভাবে দেখার। তাই শুরুতেই থাকবে পারস্পরিক পরিচিতি। আলাপ-আলোচনা চেনা-জানা, দেখা, বাস্তবতাকে বুঝা এবং সেই আলোকে সকলকে নিয়ে কাজ করা। প্রকৃতপক্ষে সুনির্দ্দিষ্ট তেমন কোনো পরিকল্পনা এখনো করা হয়নি – তবুও কিছু বিক্ষিপ্ত চিন্তা তো অবশ্যই আছে। যেমন মণ্ডলীর একটা মুখ্য উদ্দেশ্যই হলো খ্রিস্টবিশ্বাসী ও অ-খ্রিস্টানদের মধ্যে মঙ্গলবাণী ঘোষণা করা। বরিশাল ধর্মপ্রদেশে এই বাণী ঘোষণার কাজটি আরও জোড়ালো করার চিন্তা রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের বর্তমান যে সময় – ডিজিটাল যুগ, গ্লোবালাইজেশনের যুগ – আর এই সময়ে মানুষের মধ্যে জাগতিকতা, আত্মকেন্দ্রিকতা এবং একাকী চলার একটি বড় প্রবণতা রয়েছে। এমতাবস্থায় বিশ্বাসের জীবন এবং মিলনের আধ্যাত্মিকতার একটা আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্য রয়েছে। বিশ্বাস-নির্ভর জীবনে একত্রে পথ চলার একটা প্রচেষ্টা থাকবে। তৃতীয়তঃ বরিশাল ধর্মপ্রদেশে যেহেতু রয়েছে অনেক মণ্ডলী ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির বৈচিত্র, সেহেতু লক্ষ্য হবে এই বৈচিত্রের সৌন্দর্য ও মহত্বগুলোকে সামনে নিয়ে আসা। আলাপ-আলোচনা ও বাস্তবধর্মী জীবন সংলাপের মাধ্যমে সেখানে একতা, সম্প্রীতি ও মিলনের কৃষ্টি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো। চতুর্থতঃ বরিশাল ছোট ধর্মপ্রদেশটিকে কিভাবে আকৃতি, মানবিকতায়, খ্রিস্টীয় মূল্যবোধে এবং গুণগত মানের দিক দিয়ে আরও বড় করা যায়, এবং আরও একটু জীবন্ত, প্রাণবন্ত ও গতিশীল করা যায় সেই বিষয়টিও চিন্তায় রয়েছে। পঞ্চমতঃ শিক্ষা বিস্তার ও সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করারও চেষ্টা থাকবে।"[৪৪]

---

[৪৩] স্মরণিকা – বিশপীয় অভিষেক ও অধিষ্ঠান: বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও, ১৯ আগস্ট, ২০২২ খ্রি. পৃষ্ঠা ২৮-৩০)

[৪৪] উপরে উল্লেখিত, পৃষ্ঠা ১৯

বিশপ ইম্মানুয়েল বরিশাল ডাইয়োসিসের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তিনি প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছেন সমস্ত এলাকা পরিদর্শন করা, জনগণের সাথে পরিচিত হওয়া, তাদের কথা শ্রবণ করা, যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মতামত শ্রবণ করা এবং তাদের সাথে আলোচনা করা। মেষপালকে চেনার জন্য সব ধর্মপল্লীতে একাধিকবার পালকীয় সফর করেছেন এবং বিভিন্ন গ্রামে বিশেষ উপলক্ষে উপস্থিত থাকছেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিচ্ছেন। অবশ্যই তাঁর নিজের চিন্তা ও পরিকল্পনা আছে যেমন তিনি সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন। তবে বর্তমানের মণ্ডলীর যুগলক্ষণ অনুসারে সিনোডাল পদ্ধতিতে মণ্ডলীকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে একসঙ্গে যাত্রা করে যাচ্ছেন এবং তার বাস্তবায়ন দৃশ্যমান হয়ে উঠবে সেটাই জনগণের প্রত্যাশা ও প্রার্থনা।

উপসংহার:

পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের এতিহ্যবাহী ইতিহাস ২৬০ বছরের। এই দীর্ঘ ইতিহাস গোড়াপত্তন থেকে শুরু নানাবিধ যুগ, অবকাঠামো, কার্যক্রম এবং ক্রম বিবর্তন তুলে ধরতে গিয়ে এই গ্রন্থে একটি বিরাট আকারের অধ্যায় রচিত হল। অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন জনার মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে অগ্রসর হতে হয়েছি বিধায় আকারে বড়ো হয়েছে ও কিছু তথ্যের পুনরুক্তি হয়েছে সন্দেহ নেই। তবে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। সকল ভুল-ভ্রান্তি ইচ্ছাকৃত নয় তবে ক্ষমার যোগ্য।

তৃতীয় ভাগ
পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের অধিবাসী ও অভিবাসী
সংগ্রহ ও সম্পাদনে: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

আলোচ্য বিষয়সূচির সারসংক্ষেপ

প্রথম অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে খ্রিস্টানদের বসবাস ও পরিসংখ্যান

(১) শিবপুর মিশনের সূচনা
(২) পাদ্রীশিবপুরে দীক্ষাস্নানের পরিসংখ্যান
(৩) বিভিন্ন জরিপে উল্লেখিত শিবপুর মিশনের জনসংখ্যা
(৪) ধর্মপল্লীর বাড়ি, ঘর ও জনসংখ্যার সারাংশ
(৫) বিবাহ সংক্রান্ত কিছু তথ্য
(৬) চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশীয় জরিপ – ১৯৯৩ খ্রি.

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ পাদ্রীশিবপুর-অভিবাসী

(১) পাদ্রীশিবপুর থেকে অন্যত্র অভিগমন
(২) প্রথম অভিবাসন থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিবাসন
(৩) পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টভক্তদের সামগ্রিক পরিসংখ্যানের সার-সংক্ষেপ
(৪) সম্পাদনা কমিটির জরিপ ও সীমাবদ্ধতা
(৫) পাদ্রীশিবপুর অধিবাসীদের অভিবাসন সম্পর্কে এফজিডি আলোচনায় প্রকাশিত অভিমত

তৃতীয় অধ্যায়: পশ্চিমবঙ্গে অবস্থানরত পাদ্রীশিবপুরবাসীদের পরিসংখ্যান ও মতামত

(১) ব্রিটিশ আমলে পাদ্রীশিবপুরবাসী খ্রিস্টান জনগণ
(২) পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণপুরে আলোচনা-সভার ফলাফল

অবতারণা

দ্বিতীয় ভাগে আমরা উল্লেখ করেছি যে, পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লী বলতে পাদ্রীশিবপুর কেন্দ্রের খ্রিস্টান জনগণ এবং আরও তিনটি উপকেন্দ্র, অর্থাৎ দেশান্তরকাঠি (পূর্বের প্রচলিত নাম টেংরাখালি), মাটিভাঙ্গা এবং রাজাবাড়িয়া (পূর্ব নাম 'কালাদা)-এর অন্তর্ভূক্ত খ্রিস্টান জনগণ।

প্রথম অধ্যায়ে পাদ্রীশিবপুর ও ধর্মপল্লীবাসীদের অবস্থান ও পরিসংখ্যান স্বল্প বিশ্লেষণসহ আলোচনা করাই মূল বিষয়বস্তু। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধর্মপল্লীবাসীর অভ্যন্তরীণ অভিবাসন নিয়ে আলোচনা করা হবে। পাদ্রীশিবপুর গ্রাম থেকে যারা বাংলাদেশের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে (যেমন, চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা ও অন্যত্র) স্থায়ীভাবে বসবাস করছে তাদের বিষয়ে প্রাপ্ত কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরা এবং এই অভিবাসনের প্রভাব তাদের জীবনে এবং পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীতে কীভাবে পড়েছে সে বিষয়ে তাদের মন্তব্য তুলে ধরা। তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে: পশ্চিমবঙ্গে অবস্থানরত পাদ্রীশিবপুবাসীদের পরিসংখ্যান ও মতামত। পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে কলকাতাতে যারা ভারত-বিভাগের সময় ছিলেন তারা কিন্তু অভিবাসী ছিলেন না। তারা তখন পাদ্রীশিবপুরবাসীদের মতো একই ভারতে কলকাতাতেই ছিলেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওখানেই থেকে যাওয়া। পরবর্তীতে কিছু লোক কলকাতাতে গেছে তাও একই কারণে। কলকাতাতে অবস্থানরত পাদ্রীশিবপুরবাসীদের অভিবাসী বলে প্রবাসী হিসেবে দেখতে

চাচ্ছিনা সেহেতু তাদের কথা আমাদের গ্রন্থের এই প্রসঙ্গে আলোচনা করছি। যারা প্রবাসী হয়ে বিদেশে (অর্থাৎ আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া ও এশিয়াতে রয়েছে তাদের বিষয়ে চতুর্থ ভাগে বিশদ ইংরেজিতে আলোচনা হবে।

প্রথম অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে খ্রিস্টানদের বসবাস ও পরিসংখ্যান

(১) শিবপুর মিশনের সূচনা

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পাদ্রীশিবপুরে খ্রিস্টানদের বসতি শুরু হয়েছে ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে, যখন চারজন খ্রিস্টানকে বিশেষ নিমন্ত্রণে আনা হয়েছিল পশ্চিম বঙ্গের হুগলি কাথলিক মিশন কেন্দ্র থেকে। হুগলি কাথলিক মিশন ছিল মাইলাপুর ডাইয়োসিসের অধীনে। অদ্যাবধি পাওয়া ঐতিহাসিক তথ্য অনুসারে সেটাই সত্য বলে মনে করি।

তবে একটি তথ্যসূত্র অনুসারে, পাদ্রীশিবপুরের শিকদার বাড়ি ডাঃ মিডিন গোমেজ নামে একজন ব্যক্তি যিনি পাদ্রীশিবপুর স্কুলে পড়াশুনা শেষ করে কলকাতাবাসী হয়েছেন এবং ডাক্তারি পাশ করেছেন, তিনি তার বংশ-তালিকা তৈরি করতে গিয়ে, জমিজমার কাগজপত্র দেখে এবং বংশানুক্রমণের হিসাব অনুসরণ করে যে তথ্য দিয়েছেন তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আনুমানিক সতেরো শতাব্দীর গোড়া থেকে তাদের বংশাবলীর বসতি শিবপুরে ছিল। এর মানে হচ্ছে ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দেরও পূর্ব থেকে শিকদার গোষ্ঠীর অবস্থান ছিল। এই তথ্যের সত্যতা প্রমাণ করার মতো তথ্য আমার জানা নেই; তবে প্রমাণাধীন গবেষণায় বিষয়টি থাকতে পারে।[১]

হেনরী বেভেরিজের লেখায় ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি অনুসারে শিবপুর পর্তুগীজ কলোনীতে মাত্র ৮০০ খ্রিস্টানদের সংখ্যা উল্লেখ রয়েছে, যে-তথ্য পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ১৭৬৩-১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ শিবপুর সূচনালগ্ন থেকে ১০৯ বছরে খ্রিস্টানদের সংখ্যা ছিল ৮০০ জন, গড়ে প্রতি বছর বৃদ্ধি পেয়েছে ৭.৩৩ জন করে।[২]

এ প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখ করা একান্তই প্রয়োজন। বর্তমান পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ অফিসে যে বাপ্তিস্ম রেজিস্টার বা বালাম পুস্তক আছে সেখানে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয়ে অদ্যাবধি খ্রিস্টানদের জন্ম ও বাপ্তিস্মের রেকর্ড লিপিবদ্ধ আছে। ১৭৬৪ থেকে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাপ্তিস্ম রেজিস্টারের কোন অস্তিত্ব নেই। কিছু কিছু লেখায় বলা হয়েছে যে, রেকর্ড হয়তো হারিয়ে গেছে, অথবা ঝড়-তুফানের কারণে হয়তো নষ্ট হয়ে গেছে অথবা মাইলাপুর আর্চবিশপ ভবনের আর্কাইভে আছে।

মাইলাপুরের আর্কাইভে যে তথ্য আছে সে বিষয়টি সত্য করে বলা যায় না। আমি নিজেও একাধিক ওখানকার আর্চবিশপদের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারা বললেন বাংলাদেশের মণ্ডলীর অফিসিয়াল কিছু তথ্য ছাড়া প্যারিশের তেমন কোন রেকর্ড সেখানে নেই। তথাপি বিগত ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরের ১৯ তারিখে মাইলাপুরের আর্চবিশপ ভবনে গিয়েছিলাম কিন্তু, ঐ সময়ে আর্চবিশপ হাউজ সংস্কারাধীন থাকায় আর্কাইভে সন্ধান করা সম্ভব হয়নি।

[১] দেখুন: শিকদার বাড়ির বংশতালিকা

[২] Beveridge, 231-232

পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টানদের উৎপত্তি কীভাবে হল সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন ধারণা নেই। চারজন খ্রিস্টানকে হুগলী মিশন থেকে অনুরোধ করে আনা হয়েছিল সে ব্যাপারে ইতিহাসের সাক্ষ্য স্পস্ট। জনমতে শোনা যায় ঐ চারজন খ্রিস্টান ছিলেন জাতিগতভাবে পর্তুগীজ। পরবর্তীতে তারা স্থানীয় জনগণের সাথে বিবাহ করে পরিবার গঠন করেছে এবং তাদের পরিবারের বংশানুক্রমে খ্রিস্টানদের সংখ্যা বেড়েছে। আবার কেউ বলে স্থানীয় হিন্দু ও মুসলিমদের সাথে খ্রিস্টানরা বিবাহ সম্পাদিত হওয়ায় খ্রিস্টানদের বংশবৃদ্ধি হয়েছে। আরও অনেকে বলে যে, খ্রিস্টবাণী প্রচার করে স্থানীয় ধর্মের মানুষদের খ্রিস্টান করা হয়েছে। তবে সকলের ধারণা খ্রিস্টান হওয়ার পেছনে উপরোক্ত কারণগুলো কমবেশী প্রায় সবগুলোই কাজ করেছে।

(২) পাদ্রীশিবপুরে দীক্ষাস্নানের পরিসংখ্যান

শিবপুরের গোড়াপত্তন ১৭৬৪ খ্রি. থেকে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোন তথ্য ও নথিপত্র পাওয়া যাচ্ছে না। তবে পূর্ববঙ্গে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি হিসেবে শিবপুর পর্তুগীজ কলোনীর খ্রিস্টানদের সংখ্যা তখন ৮০০ জন উল্লেখ করা হয়।

১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে নিয়মিত ভাবে বাপ্তিস্মের রেকর্ড আজ পর্যন্ত প্রামাণিক দলিল হয়ে আছে। এর সাথে আছে বিবাহের রেজিস্টার, মৃত ব্যক্তিদের রেজিস্টার। রেজিস্টারে যাদের নাম আছে তাতে তিনটি উপকেন্দ্রের নামও অন্তর্ভুক্ত।[৩] বিগত ১৬৮ বছরের বাপ্তিস্ম রেকর্ড থেকে যে তথ্য পেলাম তা নিম্নোক্ত ছকে সাজিয়ে প্রকাশ করছি:

১	২	৩	৪	৫
ব্রিটিশ আমল	বছর	বাপ্তিস্মের সংখ্যা	ক্রমিক সংখ্যা	গড় সংখ্যা
১৮৫৫-১৯২১ খ্রি.	৬৬	২৩৯৭	০০০১-২৩৯৭	৩৬.৩১
১৯২২-১৯৪৮ খ্রি.	২৭	১৫৫৯	২৩৯৮-৩৯৫৬	৫৭.৭৮
পাকিস্তান আমল				
১৯৪৯-১৯৫৭ খ্রি.	৯	৫৩০	৩৯৫৭-৪৪৮৬	৫৮.৮৮
১৯৫৮-১৯৭১ খ্রি.	১৪	৯১৪	৪৪৮৭-৫৪০১*	৬৫.২৮
			*ক্র.নং ভুলবশতঃ ৮৯০জন বেশি লেখা হয়েছে	
বাংলাদেশ আমল				
১৯৭২-১৯৯৯ খ্রি.	২৮	১৮৩২	৫৪০১-৭২৩৩	৬৫.৪২
২০০০-২০২৩ খ্রি.	২৪	৫৬১	নতুন ক্রমিক ০০১-৫৬১	২৪.৩৯
মোট:				
১৮৫৫-২০২৩ খ্রি.	১৬৮	৭৭৯৩	সর্বমোট ক্রমিক ৭৭৯৩	৪৬.৩৮

[৩] প্যারিশ অফিস: বাপ্তিস্ম রেজিষ্টার

বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়:

* বিগত ১৬৮ বছরের দীক্ষাপ্রাপ্ত লোকজনের সংখ্যা হচ্ছে ৭৭৯৩, অর্থাৎ জন্মগতভাবে প্রতি বছর গড়ে ৪৬.৩৮ জন খ্রিস্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে আসছে।
* প্রশ্ন করা যেতে পারে: ১৭৬৪ থেকে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৯০ বছরে, আনুমানিক হারে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রতি বছরের ৩৬.৩১ দীক্ষিতদের সংখ্যা গণনা করলে খ্রিস্টানদের সংখ্যা ঐ সময়কালে সম্ভাব্য ৩২৬৮ জন বা তার কিছু কম ছিল এ কারণে যে, মিশনের শুরুতে খ্রিস্টানদের সংখ্যা ততো ছিল না। অতএব ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীক্ষিত ব্যক্তিদের সংখ্যা কম বেশি ১১,০৬১ (৩২৬৮+৭৭৯৩) ছিল।
* উপরের ছকে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ১৯৫৮-১৯৯৯ খ্রি. সময়ে দীক্ষিতদের হার সবচাইতে বেশি, অর্থাৎ গড়ে প্রতি বছর ৬৫ জনার উর্ধে দীক্ষিতদের সংখ্যা ছিল। এর দুটো কারণ হতে পারে: প্রথমত, পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ করার চিন্তা হয়তো তখনও তেমন প্রচলিত হয়নি। আর দ্বিতীয়ত উল্লেখিত সময়ে অধিকাংশ পরিবার পাদ্রীশিবপুরেই বাস করত, অভিবাসীদের সংখ্যা তখনও তেমন একটা বৃদ্ধি পায়নি।
* পরিবার পরিকল্পনা ও অভিবাসনের প্রভাব যে কত পড়েছে তা ২০০০-২০২৩ বছরে খুবই স্পষ্ট। এই সময়ে গড়ে প্রতিবছর পাদ্রীশিবপুরে দীক্ষিতদের সংখ্যা বছরে মাত্র ২৪ জন, যা আগের বছরগুলোর তুলনায় ৩৭% কম।

(৩) বিভিন্ন জরিপে উল্লেখিত শিবপুর মিশনের জনসংখ্যা

১	২	৩	৪	৫	৬
খ্রিস্টাব্দ	এলাকা	তথ্য সূত্র	মোট জনসংখ্যা	খ্রিস্টান	কাথলিক
১৭৬৩	শিবপুর পর্তুগীজ কলোনী	ইতিহাস			৫ জন
১৮৭২	বরিশাল শহর	আদমশুমারি	১৩,৩৩২	১৫০	
১৮৭২	শিবপুর পর্তুগীজ কলোনী	আদমশুমারি			৮০০ জন
১৯১৯	পাদ্রীশিবপুর	কম্পোসের লেখা			১০০০ জন
১৯৭৩	পাদ্রীশিবপুর	কাথলিক ডিরেক্টরি			২৩০০ জন
২০২২	বরিশাল জেলা	আদমশুমারি	২,৫৪০,২৪৭	১১,১৩৯ সঠিক নয়	
২০২৩	**বরিশাল ডাইয়োসিস**				
২০২৩	পাদ্রীশিবপুর	কাথলিক ডিরেক্টরি			৩০১০ জন
২০২৩	মাটিভাঙ্গা প্যারিশ	কাথলিক ডিরেক্টরি			২৫৪ জন
২০২৩	পাদ্রীশিবপুর কেন্দ্র	বাসিন্দাদের জরিপ			৭২৭/১১২৪*
২০২৩	মাটিভাঙ্গা প্যারিশ	বাসিন্দাদের জরিপ			১৩৫/১৬৬*
২০২৩	দেশান্তরকাঠি	বাসিন্দাদের জরিপ			১৯৩/২০৪*
২০২৩	রাজাবাড়িয়া	বাসিন্দাদের জরিপ			৪২/১০৬*
২০২৩	পাদ্রীশিবপুর মোট	বাসিন্দাদের জরিপ			১১৩৭/১৬০১*

* ৬ নং কলামে শেষের দিকে প্রথম সংখ্যাটি: বর্তমানে যারা স্থায়ীভাবে বাড়িতে থাকে; দ্বিতীয় সংখ্যাটি: উৎসবের সময় যখন আত্মীয়স্বজন বাড়িতে আসে।[৪]

বিশেষ দ্রষ্টব্য

* পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের জনসংখ্যা উল্লেখ করতে গিয়ে বৃহত্তর এলাকারও প্রাপ্ত কিছু তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে তুলনামূলকভাবে দেখার সুযোগ থাকে।
* "বাসিন্দাদের জরিপ" বলতে সেই জরিপ বা তথ্য, যা "গ্রন্থ-সম্পাদনা কমিটি"র উদ্যোগে স্থানীয়ভাবে যে জরিপ করা হয়েছে।
* "গ্রন্থ-সম্পাদনা কমিটি"র দ্বারা আয়োজিত তথ্য সংগ্রহের জরিপ (গ্রন্থ-সম্পাদনা কমিটি – ২০২৩-২০২৪ খ্রি.)

৪) ধর্মপল্লীর বাড়ি, ঘর ও জনসংখ্যার সারাংশ[৫]

ধর্মপল্লীর নাম: পাদ্রীশিবপুর ওয়ার্ড নং – ১–৮ উপকেন্দ্র নং ১-৩

১	২	৩	৪	৫	৬
ওয়ার্ড নং	বাড়ির সংখ্যা	ঘরের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	নিয়মিত বসবাসকারীর সংখ্যা	উৎসবে বাড়তি সংখ্যা
১ নং	৭	১৯	২০	৪৯	১২৪
২ নং	১৩	১৭	১৭	৫০	১০৯
৩ নং	১৪	৪০	৪২	৪৯	২০২
৪ নং	২৫	৫৮	৬২	১৭৩	২০১
৫ নং	২৫	৪৬	৬০	১০৬	১৩৩
৬ নং	১৫	৩৩	৩৫	৯৫	৮৫
৭ নং	১৭	৪১	৩৬	১১১	৮৩
৮ নং	২১	৩৩	৩৫	৯৪	১৮৭
মোট ওয়ার্ড ৮	**১৩৭**	**২৮৭**	**৩০৭**	**৭২৭**	**১১২৪**
উপকেন্দ্র					
দেশান্তরকাঠি	৬	৭২	৭২	১৯৩	২০৪
রাজাবাড়িয়া	৫	২৫	২৭	৪২	১০৬
মাটিভাঙ্গা	১৩	৩০	৭২	৭৩	১৫৮
সোনাতলা	১৫	১৫	১৭	৬২	৯
মোট	*২৮*	*৪৫*	*৮৯*	*১৩৫*	*১৬৭*
উপকেন্দ্র-৪	**৩৯**	**১৪২**	**১৮৮**	**৪১০**	**৪৭৭**
সর্বমোট-১২	**১৭৬**	**৪৯২**	**৪৯৫**	**১১৩৭**	**১৬০১**

[৪] গ্রন্থ-সম্পাদনা কমিটি – ২০২৩-২০২৪ খ্রি.

[৫] গ্রন্থ-সম্পাদনা কমিটি – ২০২৩-২০২৪ খ্রি.

বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়:

* পাদ্রীশিবপুর গ্রামে সর্বশেষ জরিপ অনুসারে ১৩৭ টি বাড়ি উল্লেখ করা হয়েছে: কয়েকটি বাড়ি ছাড়া অধিকাংশ বাড়ির নাম জমিদারি প্রথায় পেশা বা দায়িত্ব বা পর্তুগীজ নাম অনুসারে নামকরণ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি বাড়ির নাম উল্লেখ করা হল: জমিদার বাড়ি (মিশন), নায়েব বাড়ি, দারোগা বাড়ি, মোক্তার বাড়ি, পঞ্চায়েৎ বাড়ি, শিকদার বাড়ি, পণ্ডিত বাড়ি, পিওন বাড়ি, পোস্টমাস্টার বাড়ি, পেদা বাড়ি, চাপারাশি বাড়ি, হাওলাদার (হালদার) বাড়ি, তালুকদার বাড়ি, চৌকিদার বাড়ি ইত্যাদি। অন্য শ্রেণির বাড়ির নাম: সাহেব বাড়ি, ডি'সিলভা বাড়ি, জোলা বাড়ি, পারের বাবুর বাড়ি, আলিচান বাড়ি, পবরী বাড়ি, সান্তামারীয়ার বাড়ি, ভক্ত বাড়ি, কৈলু বাড়ি, মিস্ত্রি (মেস্তারা অর্থাৎ ধর্মশিক্ষক/কাটিখিস্ট) বাড়ি, বোচার বাড়ি, ইত্যাদি।
* আজও প্রচলিত একটি ধারণা আছে যে পাদ্রীশিবপুরে রয়েছে ৩৬০ ঘর খ্রিস্টান। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে বাস্তব জরিপে দেখা যাচ্ছে যে ঘরের সংখ্যা ২৮৭ এবং পরিবারের সংখ্যা ৩০৭টি।
* ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের কাথলিক ডিরেক্টরীতে পাদ্রীশিবপুরের জনসংখ্যা ৩০১০ জন তা-ও আবার মাটিভাঙ্গা প্যারিশ বাদে। কিন্তু বাস্তবে সর্বদা স্থায়ীভাবে মাটিভাঙ্গা প্যারিশ এবং দেশান্তরকাঠি সহ পাদ্রীশিবপুরের কাথলিকদের সংখ্যা ১১৩৭ জন। আর যদি উৎসবের সময়ে যারা আসে তাদের গণনা করা হয় তাহলে সংখ্যা হবে ১৬০১ জন। অতএব দেখা যায় ৫০% এরও অধিক সংখ্যক অফিসিয়াল নম্বরে উল্লেখ করা হয়। এই বিভিন্নতার একমাত্র প্রধান কারণ পাদ্রীশিবপুরবাসীর একটি বিরাট অংশ দেশের ভেতরে ও বাইরে অভিবাসী হয়ে চলে গেছে। এই গতিধারার পরিবর্তন না হলে ভবিষ্যতে পাদ্রীশিবপুর জনপদের অবস্থা কী হবে?
* আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় যে পাদ্রীশিবপুর কেন্দ্রে সর্বদা স্থায়ী ভাবে যারা বাস করে তাদের সংখ্যা মাত্র ৭২৭ জন। আর যারা বড় বড় উৎসবে বাড়ি আসে তাদেরকে গোনায় ধরলে ১১২৪ জন সংখ্যাতে দাঁড়ায়।

(৫) বিবাহ সংক্রান্ত কিছু তথ্য[৬]

যারা জানতে আগ্রহী তাদের অবগতির জন্য উল্লেখ করছি যে, পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের বিবাহ রেজিস্টার অনুসারে

* ১৯৫১ – ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে, অর্থাৎ দশ বছরে সর্বমোট বিবাহ আশীর্বাদিত হয়েছে ১১১ টি; অর্থাৎ গড়ে প্রতিবছর ১১ টির মত বিবাহ রেজিস্টার হয়েছে।
* ২০১১ – ২০২০ খ্রিস্টাব্দে, অর্থাৎ দশ বছরে সর্বমোট বিবাহ আশীর্বাদিত হয়েছে ৯২ টি; অর্থাৎ গড়ে প্রতিবছর ৯ টির মত বিবাহ রেজিস্টার হয়েছে।
* পাদ্রীশিবপুরে বিবাহের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, কেননা আজকাল পাদ্রীশিবপুরবাসীদের বিবাহ অনেক সময় যেখানে তারা বাস করে সেখানেই তাদের বিবাহ সম্পাদিতে হচ্ছে।

[৬] প্যারিশ অফিস: বাপ্তিস্ম রেজিস্টার

(৬) চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশীয় জরিপ – ১৯৯৩ খ্রি.[৭]

বিশপ যোয়াকিম রোজারিও-এর আমলে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের অবস্থা জানার জন্য একটি জরিপ করা হয় ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে। পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর পরিবারের কিছু তথ্য এখানে উল্লেখ করছি:

* পরিবারের সংখ্যা ৩৩৬ টি; তার মধ্যে একক পরিবার ২৫৮ টি এবং যৌথ পরিবার ৫১ টি। *
* পরিবারে গড় সন্তান – ৪ জন
* কাথলিক মণ্ডলীতে বিবাহিত – ৩৬৪ (ক্রম-যুক্ত); মিশ্রবিবাহ – ২৬ টি; মণ্ডলীর বাইরে বিবাহ – ১৯; বিচ্ছেদিত পরিবার ৩৯ টি।
* জন্মনিয়ন্ত্রনকারী পরিবারের সংখ্যা ২৫৮; কৃত্রিম পদ্ধতি – ১৬৯; প্রাকৃতিক পদ্ধতি – ১১৬।
* পেশা জীবন: চাকরি – ৪৩১ জন; দেশের মধ্যে – ৪০৭ জন; বিদেশে – ২৪ জন। কৃষিজীবি – ১১৮ জন; বেকার ১৩৭ জন।
* ভূমিহীন – ১৩৬; পরিবারের মাসের গড় আয় – ২১০৭ টাকা
* শিক্ষা: স্কুলে অধ্যয়নরত – ৫৭৪ জন; কলেজে অধ্যয়নরত – ৩৪ জন; বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত – ৩১ জন।
* পরিবারের প্রধান সমস্যা: মদ তৈরী ও পান করা এবং মন্ডলীর বাইরে বিবাহ করা।
* ধর্মীয় জীবন: দৈনিক প্রার্থনা করে – ৪০২ পরিবার; খ্রিস্টযাগে নিয়মিত অংশগ্রহণ ৮০%; পালকীয় সম্মিলনী ও নভেনায় অংশগ্রহণ করে; ওয়ার্ডে বাইবেল সহভাগিতা ও বি.সি.সি সভা প্রতি সপ্তাহে।

*বিশেষ দ্রষ্টব্য: * চিহ্নিত পরিবারের সংখ্যা প্রধানত পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীতে যারা বাস করে। কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে অভিবাসী পরিবারের সংখ্যা ও জন সংখ্যা যোগ করা হয়েছে।*

[৭] চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশীয় জরিপ – ১৯৯৩ খ্রি

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ পাদ্রীশিবপুর-অভিবাসী

এখানে তথ্য হচ্ছে "গ্রন্থ-সম্পাদনা কমিটি"র দ্বারা আয়োজিত জরিপের ফলাফল। পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের বাসিন্দাদের দেওয়া তথ্য অনুসারে পাদ্রীশিবপুর-অভিবাসীদের যে তথ্য প্রদান করা হয়েছে তার সারসংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হল। দেখা গেছে পাদ্রীবপুর গ্রামের বাইরে বিভিন্ন ডাইয়োসিসে যে সংখ্যা দেয়া হয়েছে তার সাথে সব মিল নাও থাকতে পারে। বিভিন্ন স্থানে পাওয়া তথ্য নিয়ে সমন্বিত করে বা সত্যায়ন করে রচিত হয়নি।

(১) পাদ্রীশিবপুর থেকে অন্যত্র অভিগমন[৮]

ধর্মপল্লীর নাম: পাদ্রীশিবপুর, ওয়ার্ড নং: ১ – ৮; উপকেন্দ্র: তিনটি

ওয়ার্ড নং	পরিবারের সংখ্যা	পরিবারে সদস্য সংখ্যা	ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৭ পূর্বে	পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-১৯৭০)	বাংলাদেশ আমলে (১৯৭১ অদ্যাবধি)	কোথায় এখন বাস করছে উল্লেখ করুন
১ নং	২৬	৮১	০	০	২৬	ঢাকা-১৮; চট্টগ্রাম-৫; ভারত- প্রবাসী-২; অন্য-
২ নং	১২	৬০	০	৮	৪	ঢাকা-৭; চট্টগ্রাম-১; ভারত-৪ প্রবাসী-২; অন্য-
৩ নং	২১	৬৫	০	২	১৯	ঢাকা-১৬; চট্টগ্রাম- ; ভারত-২ প্রবাসী- ; অন্য-৩
৪ নং	৫০	১২৫+	১৪	৭	২৯	ঢাকা-১৪; চট্টগ্রাম-৮; ভারত-১৭ প্রবাসী-৭; অন্য-৪
৫ নং	১৪	৩৫ +	২	৪	৮	ঢাকা-৫; চট্টগ্রাম-২; ভারত-৩ প্রবাসী-৩; অন্য-১
৬ নং	১২	৩০ +	৭	১	৪	ঢাকা-৪; চট্টগ্রাম- ; ভারত-৭ প্রবাসী-১; অন্য-
৭ নং	১৫	৩২	৬	০	১০	ঢাকা-১; চট্টগ্রাম-৩; ভারত-৬ প্রবাসী-৩; অন্য-২
৮ নং	৬	১৩	০	০	৬	ঢাকা-১; চট্টগ্রাম-১; ভারত- প্রবাসী-১৮; অন্য-
দেশান্তর কাঠি	২৪	৯৯	৯	৯	১৫	ঢাকা-৫; চট্টগ্রাম-৩; ভারত-৯; প্রবাসী-২; অন্য-৫
রাজা বাড়িয়া	৪	১৯	০	১	৩	ভারত-৪
মাটি ভাঙ্গ	১৪	৫৪	০	০	১৪	ঢাকা-৭; চট্টগ্রাম-৩; প্রবাসী-১; পাদ্রী-২; খুলনা-১
সোনাতলা	৫	১৫	০	০	৫	ঢাকা-২; খুলনা-২; পাদ্রী-১
মোট	১৭৭	৫১০	৩৮	৩২	১২৪	ঢাকা-৭৭; চট্টগ্রাম-২৬; ভারত-৪৩; প্রবাসী-১৪; অন্য-২১

বিশেষ দ্রষ্টব্য: + গড় ধরে সংশোধন করা হল।

বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়:

* পাদ্রীশিবপুরবাসী লোকদের দেওয়া তথ্য অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে বিগত প্রায় একশত বছরে মোট ১৭৭ টি পরিবার যাদের সদস্য জনসংখ্যা ছিল ৫১০ তারা পাদ্রীশিবপুর ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করার জন্য চলে গেছে। তাদের মধ্যে ব্রিটিশ আমলে ছিল ৩৮/৪৩ জন, পাকিস্তান আমলে ৩২ জন এবং বাংলাদেশে আমলে ১২৪ (৬৩.২৬%) জন অভিবাসী হয়ে দেশের মধ্যে অন্যত্র চলে গেছে।

[৮] (গ্রন্থ-সম্পাদনা কমিটি – ২০২৩-২০২৪ খ্রি.)

* ইদানিং কালে ভারত অবশ্য অভিবাসীদের গন্তব্য স্থান মুখ্য ছিলনা, কেননা তারা ইতিমধ্যে অনেকেই অবস্থান করছিলেন। তবে বড়ো সংখ্যা ৭৭ জন (৪২%) ঢাকাতে এং ২৬ জন (১৪%) চট্টগ্রামে ২১ জন (১২%) দেশের মধ্যে এবং প্রবাসে চলে গেছে ১৪ (৮%) জন।
* আরেকটা বিষয় লক্ষণীয় যে, পাদ্রীশিবপুরের ৪ নং ওয়ার্ড থেকেই সবচাইতে বেশী সংখ্যক ৫০ জন (২৮%) অভিবাসী হয়েছে।

(২) প্রথম অভিবাসন থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিবাসন[৯]

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
পরিবার সংখ্যা	পাদ্রীশিবপুর অধিবাসী এবং অভিবাসী হয়ে গমন	প্রথম অভিবাসীদের সংখ্যা	ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৭-এর পূর্বে	পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-১৯৭১);	বাংলাদেশ আমলে (১৯৭১-অদ্যাবধি)	বর্তমান অধিবাসীদের সংখ্যা	অন্যত্র চলে গেছে
৯০	ভারতে পাদ্রীশিবপুর বাসী	১৫৪ ১১%	৬৪ ৫%	২৪ ২%	৭ ০.৫%	১৩৮৩ ১০০%	১৫৪ পাদীশিবপুর-বাসীন্দা ভারতে ১৩.%
২৩৬	চট্টগ্রামে অভিবাসী	১৭০৭ ১০০%	১১ ০.৬%	৯৭ ৬%	১২৪ ৭.৪%	১০২৮ + ৬৭৯ = (২৩২+৪৪৭)	২৩২ (৩৪%) বিদেশে; দেশের মধ্যে ৪৪৭ (৬৬%)
১৮	খুলনাতে অভিবাসী	৭৫	০	১৭	১	৫৭	১৮ অন্যত্র ১.২%
৩৮১	ঢাকাতে অভিবাসী	১৫২৪ ১০০%	৯ ০.৬%	৯৪ ৬%	১০৪ ৮%	১২৪০ ৮১%	২৮৪ বিদেশে ২৩%
৯৫ ৮০ ১৭৫	যুক্তরাষ্ট্র কানাডা মোট	১৭৩ ১৪৯ ৩২২	৮ ৯ ১৭	৬৫ ৫৪ ১১৯	২২ ১১ ৩৩	৩০৮ ২৫১ ৫৫৯	০ ০ ০
২৫	অষ্ট্রেলিয়া+এশিয়া মধ্যপ্রাচ্য+ইউরোপ	৭৪				৭৪	৭৪ বিদেশে ৬%
৯২৫	সর্বমোট	৩৮৫৬ ১০০%	১০১ ৩%	৩৩৪ ৯%	২৬৯ ৭%	৪৩১৪ + ৪০৫	১২০৯ অভিবাসী ১০০%

বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়

* ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগে, অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে পাদ্রীশিবপুরবাসী যারা কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতে বসবাস করছিলেন তারা কিন্তু অভিবাসী হয়ে সেখানে যায়নি। দেখা যাচ্ছে যে, কলকাতাতে পাদ্রীশিবপুর অধিবাসী পরিবারের সংখ্যা ছিল ৯০ টি এবং জনসংখ্যা ছিল ১৫৪ জন এবং তাদের জনসংখ্যা বর্তমানে হচ্ছে ১৩৮৩ জন। তবে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৬৪ জন (৫%) ব্রিটিশ আমলে কলকাতা অবস্থান করছিল; পাকিস্তান আমলে ২৪ (২%) জন এবং বাংলাদেশ আমলে ৭ জন (০.৫%) অভিবাসী। বাকীরা সবাই অর্থাৎ ১২৯২ (৯৩%) ভারতে জন্ম গ্রহণ করেছে (এর সবাই দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রজন্ম ও চতুর্থ প্রজন্মের সন্তান-সন্ততি)।

[৯] সম্পাদনা কমিটি – ২০২৩-২০২৪ খ্রি.

* পাদ্রীশিবপুর থেকে চট্টগ্রামে প্রায় ২৩৬ টি পরিবার অভিবাসনে চলে গেছে এবং জনসংখ্যায় তার ছিল ১৭০৭ জন। লক্ষণীয় বিষয় যে সেই সংখ্যা থেকে ৩৮৫ জন (৩২%) দেশের মধ্যে চলে যায়। আর চট্টগ্রাম ও ঢাকা যৌথভাবে ২৯৪ জন (২৪%) আবার দ্বিতীয় অভিবাসন করে প্রধানত আমেরিকা ও কানাডা চলে গেছে।
* পাদ্রীশিবপুর থেকে ঢাকাতে যারা অভিবাসী হয়ে চলে গেছে তাদের সংখ্যা ১৫২৪ জন কিন্তু তার মধ্য থেকে ২৮৪ জন (২৩%) বিদেশে চলে গেছে।
* লক্ষ্য করা যায় যে, পাদ্রীশিবপুর থেকে ১৮ টি পরিবার খুলনা ধর্মপ্রদেশের বাসিন্দা হয়েছে, যাদের মোট সংখ্যা ছিল ৭৫ জন। তাদের মধ্যে ১৮ জন লোক (১.২%) দেশের অনত্র চলে যায়)
* পাদ্রীশিবপুর ও চট্টগ্রাম থেকে ৩৮১ টি পরিবার ঢাকাতে অভিবাসন করে যাদের সংখ্যা ১৫২৪ জন। তাদের থেকে ২৮৪ জন (২৩%) প্রধানত বিদেশে চলে গেছে।
* বাংলাদেশে অবস্থানরত পাদ্রীশিবপুরবাসীদের মধ্য থেকে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে ১৭৫ টি পরিবার অভিবাসী হয়েছে; যাদের সদস্য সংখ্যা ৩২২ জন। বর্তমানে এই অভিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৫৯ জন।
* বাংলাদেশ থেকে ২৫ টি পরিবার বা একক ব্যক্তি যার সংখ্যা ৭৪ জন, তারা অষ্ট্রেলিয়া, এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপে চলে গেছে যারা ছিল পাদ্রীশিবপুরের আদি বাসিন্দা।

(৩) পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টভক্তদের সামগ্রিক পরিসংখ্যানের সারসংক্ষেপ

অভিবাসন বিশ্বের মধ্যে একটি প্রধান যুগলক্ষণ। মানুষ আর এক জায়গায় বসবাস করেনা। অভিবাসনের কারণে অনেক আদি বাসভূমি বা জনপদ আজ শূন্য হয়ে গেছে আবার সৃষ্টি হয়েছে অনেক নগর ও জনপদ। অভিবাসনের প্রভাব প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় এবং এই ক্ষেত্রে পাদ্রীশিবপুরের মতো একটা ঐতিহ্যবাহী জনপদও ব্যতিক্রম নয়।

(১) বিগত শতবর্ষের মেয়াদকালে ১৯২২-২০২৩ খ্রি.

পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের জনগণের কয়েকটি বিশেষ পরিসংখ্যান সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরছি:

* পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে বিগত একশত বছরের দীক্ষিতদের ক্রম-যুক্ত সংখ্যা: মোট ৫৩৯৬ খ্রিস্টভক্ত। অবশ্যই এদের মধ্য থেকে অনেকেই মৃতুবরণ করেছেন এবং অভিবাসী হয়ে যারা দেশে ও বিদেশে বাস করছে তাদেরও সন্তান-সন্ততি হয়েছে।
* পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে (মাটিভাঙ্গা প্যারিশ+দেশান্তরকাঠি+রাজাবাড়িয়াসহ) বর্তমানে (২০২৪ খ্রি) স্থায়ী বাসিন্দাদের সংখ্যা ১১৩৭ জন এবং কেবলমাত্র পাদ্রীশিবপুর বাস করছে ৭২৭ জন।

(২) পাদ্রীশিবপুর থেকে অভিবাসীদের অবস্থান ও পরিসংখ্যান:

প্রথম অভিবাসন	অভিবাসীদের পরিবার সংখ্যা	অভিবাসীর জনসংখ্যা	বর্তমান সংখ্যা অভিবাসীদের প্রজন্মসহ
ভারতে অবস্থান/গমন	৯০	১৫৪	১৩৮৩ (+১২২৯ নতুন জন্ম)
চট্টগ্রামে অভিগমন	২৩৬	১৭০৭	১০২৮ (-৬৭৯)+(জন্ম); (−) মৃত্যু ও দেশে-বিদেশে গমন)
ঢাকাতে অভিগমন পাদ্রিশিবপুর + চট্টগ্রাম থেকে	৩৮১	১৫২৪	১২৪০ (-২৮৪) : +(জন্ম); (−) মৃত্যু ও দেশে+বিদেশ গমন)
খুলনাতে অভিগমন	১৮	৭৫	৫৭
যুক্তরাষ্ট্র	৯৫	১৭৩	৩০৮
কানাডা	৮০	১৪৯	২৫১
মোট	১৭৫	৩২২	৫৫৯
অস্ট্রেলিয়া+মধ্যপ্রাচ্য+ইউরোপ +এশিয়া	২৫	৭৪	৭৪
মোট: পাদ্রীশিবপুর থেকে অভিগমন	৯২৫	৩৮৫৬	৪৩৪১ (+৪৮৫)

(৩) পাদ্রীশিবপুর-বাসিন্দা ও অভিবাসীদের পরিসংখ্যান

পাদ্রীশিবপুর-নিবাসী ও অভিবাসী	বর্তমান জনসংখ্যা - ২০২৪	শতকরা (%)
পাদ্রীশিবপুর বংশোদ্ভূত: ভারতে অবস্থান	১৩৮৩	২৫%
পাদ্রীশিবপুর বংশোদ্ভূত: দেশে অবস্থান (চট্টগ্রাম+ঢাকা+খুলনা+বাংলাদেশের অন্যত্র)	২৩২৫	৪২%
পাদ্রীশিবপুর বংশোদ্ভূত: প্রবাসে অবস্থান	৬৩৩	১২%
পাদ্রীশিবপুরে বর্তমান বাসিন্দাদের সংখ্যা *	১১৩৭	২১%
সর্বমোট পাদ্রীশিবপুরবাসীদের সংখ্যা	**৫৪৭৮**	**১০০%**

*মাটিভাঙ্গা প্যারিশ, দেশান্তরকাঠি ও রাজাবাড়িয়াসহ

সংক্ষিপ্ত আকারে কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয় উল্লেখ করছি: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের জন্য অভিবাসন একটি বাস্তবতা: পাদ্রীশিবপুর বংশোদ্ভূত খ্রিস্টানদের মধ্যে বিগত শতবর্ষের মধ্যে পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে স্থানীয়ভাবে বাস করছে মাত্র ২১% খ্রিস্টান এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করছে ৪২% পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টান জনগণ; অর্থ্যাৎ দেশের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করছে ৬৩%। আর ৩৭% দেশের বাইরে ভারতে ও প্রবাসী হয়ে বাস করছে। ভবিষ্যৎ সকল চিন্তা ভাবনার মধ্যে এই বাস্তবতা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে।

(৪) সম্পাদনা কমিটির জরিপ ও সীমাবদ্ধতা

* সামাজিক যে-কোন জরিপে ধরে নেওয়া হয় যে, ১০% তথ্যের মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে। গ্রন্থ-সম্পাদক কমিটি দ্বারা সম্পাদিত জরিপে কিছু ভুল-ভাল, অসম্পূর্ণতা, বাদ পড়ে যাওয়া, ইত্যাদি থাকতেই পারে যা আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি।
* গ্রন্থ-সম্পাদক কমিটি তথ্য সংগ্রহ করার মেয়াদকাল ছিল বিগত সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রি. থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কিন্তু পাদটিকা বা নির্দেশনা উল্লেখের জন্য "গ্রন্থ-সম্পাদনা কমিটি – ২০২৪" ব্যবহার করা হয়েছে।
* তথ্যসূত্র: তালিকাটি এই ভাগের শেষের দিকে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৫) পাদ্রীশিবপুর অধিবাসীদের অভিবাসন সম্পর্কে এফজিডি আলোচনায় প্রকাশিত অভিমত[১০]

তথ্য সংগ্রহ করার জন্য "গ্রন্থ-সম্পাদক কমিটি -২০২৪ খ্রি." দলগতভাবে আলোচানার জন্য এফজিডি প্রশ্ন-উত্তরের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। অভিবাসন বিষয়ে ছয়টি প্রশ্ন রাখা হয়েছিল এবং তার উপর দলগত আলোচনান্তে যে প্রতিবেদন তারা দিয়েছে তা সাধারণ সম্পাদনা ব্যতিরেকে প্রায় হুবহু উত্তর এখানে পরিবেশন করা হল:

১) পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লী থেকে অনেকে অভিবাসী হয়ে (ভারত/চট্টগ্রাম/ঢাকা/খুলনা/দেশের মধ্যে অন্যত্র/প্রবাসে) স্থানান্তরিত বা দেশান্তরিত হয়েছেন। কী কারণে?

ঢাকার অভিবাসীদের মতামত

* জীবন ও জীবিকার তাগিদে, উচ্চ শিক্ষা, সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, শহরের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার জন্য, বিদেশের সুযোগ সুবিধা ও উন্নত জীবনের আশায় অভিবাসী হয়েছে।
* পাদ্রীশিবপুরে বর্তমানে মাত্র স্কুলে কাজের সুযোগ আছে। সেখানে প্রয়োজনাতিরিক্ত বেশী কর্মী আছে। ফলে গ্রাম ছেড়ে কাজের খোঁজেই ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে এবং কেহ কেহ দেশের বাহিরে চলে যায়।
* অনেকেই আবার বিদেশে তাদের স্থায়ী নিবাস করেছে। যেমন ভারত, আমেরিকা, কানাডা ইত্যাদি
* গ্রামে কর্মসংস্থান নেই বলে দেশের মধ্যে বা বাইরে চলে গেছে।
* এলাকায় উচ্চ শিক্ষার জন্য ভালো কোন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় নাই তাই শিক্ষার জন্য লোকেরা তাদের সন্তানদের ঢাকা বা অন্য শহরে পাঠায়।
* কিছু কিছু পরিবার ঢাকা বা অন্য শহরের লোকদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।
* অনেকে পারিবারিক সমস্যা এড়ানোর জন্য বাড়ি ছেড়ে শহরে আসে।

[১০] (তথ্যসূত্র: গ্রন্থ-সম্পাদনা কমিটি – ২০২৩-২০২৪ খ্রি.)

চট্টগ্রাম অভিবাসীদের মতামত

তৎকালে পাদ্রীশিবপুরে কর্মসংস্থানের খুব একটা সুযোগ ছিল না। মূলত ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যই পাদ্রীশিবপুরের মানুষ দেশের বিভিন্ন এলাকায় অভিবাসী হয়েছে। কেউ কেউ বদলিজনিত কারণে হয়েছে অভিবাসী, যারা মূলত সরকারী চাকুরিজীবি ছিলেন। উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যেও একটি বড় অংশ অভিবাসী হয়েছে বলে মনে করি। কারিগরী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে এসে চট্টগ্রামেই থেকে গিয়েছেন, এমন সংখ্যাও আছে। আবার কেউ কেউ বিভিন্ন মিশনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করার উদ্দেশ্যেও চট্টগ্রামে এসেছেন। যে সময়টায় ব্যপকহারে অভিবাসন ঘটেছে, তখন চট্টগ্রামে কর্মসংস্থানের সুযোগ এমনকি ঢাকার চাইতেও বেশী ছিল। এ'কারণে এই এলাকায় অনেক অভিবাসন হয়েছে। বর্তমান সময়ে অভিবাসন চট্টগ্রাম নয়, ঢাকামুখী।

২) পাদ্রীশিবপুর থেকে অভিবাসী হওয়ায় কী কী সুফল ও কুফল দেখা যাচ্ছে?

ঢাকার অভিবাসীদের মতামত

* সুফল: উন্নত জীবন, পরিবারকে সহায়তা, জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি, অন্যত্র সমাজের সাথে সুসম্পর্ক
* কুফল: পুরুষ শূন্য হয়ে পড়েছে, পরিবারের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গেছে, পারিবারিক অশান্তি দেখা দিচ্ছে

চট্টগ্রাম অভিবাসীদের মতামত

সুফল: শিক্ষার হার বৃদ্ধি, আর্থিক উন্নতি, বৃহত্তর ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের সুযোগ, জীবন-যাত্রার উন্নতি।
কুফল: দেশে অনেক বাড়ী শূণ্য পড়ে আছে, যৌথ পরিবার বিলুপ্তি, আত্মীয়তার বন্ধন শিথিল, নতুন প্রজন্ম সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সম্পর্কে জানে না, যাতায়াত না থাকায় অনেকে বাড়ীতে কৃষি জমি হারাচ্ছে, গ্রামীণ আন্তরিকতা হ্রাস, দেশের বাড়ীতে আনাগোনা কম, প্রভৃতি।

৩) নিজস্ব এলাকায় অভিবাসীদের মধ্যে কী কী সংগঠন রয়েছে? তা কী? এবং তাদের কাজ কী কী?

ঢাকার অভিবাসীদের মতামত

* ঢাকাস্থ পাদ্রীশিপুর খ্রিস্টান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন, পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান যুবসংঘ, প্রার্থনা দল।
* মাটিভাঙ্গা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, মাটিভাঙ্গা যুব সংঘ, দেশান্তরকাঠি যুব সংঘ, রাজাবাড়িয়ার সাধু আন্তনীর কমিটি।

কাজসমূহ:

* ঢাকাস্থ এবং পাদ্রীশিবপুরের লোকদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা করা।
* সঞ্চয়ী মনোভাব তৈরি করা; সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক উন্নতি করা।
* স্বনির্ভরতার জন্য ব্যবসা ও বাসস্থানের জন্য উৎসাহিত করা।
* দরিদ্রদের আর্থিক সহযোগিতা দান করা।
* মানুষের দরিদ্রতায়, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কোন বিশেষ সমস্যায় আর্থিক সাহায্য দান করা।
* রোগীদের সেবা ও হাসপাতাল ভিজিট করা।

চট্টগ্রাম অভিবাসীদের মতামত

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে 'পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টিয় সমাজ সংঘ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শুরুতে সংগঠনটি খুবই সক্রিয় ছিল। কিন্তু বর্তমানে এর কার্যক্রম নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে ৫-৬ বছর যাবত। এই সংগঠনটি সক্রিয় থাকাকালে পাদ্রীশিবপুর পরিবারের তালিকা প্রণয়ন ও তাদের সাথে যোগাযোগ, বড়দিনের কীর্তন, ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি পালন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রামুর পালা, বার্ষিক পুনর্মিলন অনুষ্ঠান, ইত্যাদি নিয়মিত আয়োজন করতো।

৪) পাদ্রীশিবপুরের ভবিষ্যৎ-উন্নয়নের জন্য অভিবাসীদের ভাবনা কী? অভিবাসীদের কী করণীয় আছে?

ঢাকার অভিবাসীদের মতামত

* ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ দিক চিন্তা করে শিক্ষা গ্রহণের দিক নির্দেশনা দেওয়া, গ্রামে ও শহরের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা। পাদ্রীশিবপুরে নিজস্ব জায়গা কিনে খ্রিস্টানদের জমিজমা রক্ষা করা।
* শহর ও গ্রামের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে যৌথভাবে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা।
* পাদ্রীশিবপুরের বিভিন্ন সংগঠনের সাথে ঢাকার সংগঠনের যোগাযোগ ও সমন্বয় সংরক্ষণ করা।
* পাদ্রীশিবপুরের পালক পুরোহিতের সাথে যোগাযোগ রেখে প্যারিশের প্রয়োজনে সহায়তা দান করা।
* তাদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার, বিশেষ করে কারিগরি প্রশিক্ষণ দরকার যাতে চাকরি নির্ভর না হয়ে নিজে কিছু করতে পারে।
* উচ্চশিক্ষার জন্য দেশে ও বিদেশে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ঋণ প্রদান করা।

চট্টগ্রাম অভিবাসীদের মতামত

বর্তমানে শোনা যাচ্ছে যে স্থানীয় খ্রিস্টভক্তরা জায়গা সম্পত্তি নিয়ে পরস্পরের সাথে মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ছে। আদালতে না গিয়ে স্থানীয়রা যদি বিষয়গুলো স্থানীয় ন্যায় ও শান্তি কমিটির মাধ্যমে সমাধান করে, খুব ভাল হয়। নয়তো সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য হারিয়ে যাবে যা আমাদের সমাজের একটি অলঙ্কার ছিল।

অভিবাসীদের করণীয়: কেউ যখন জমি বিক্রি করে, তারা যদি একটু আর্থিক ক্ষতি হলেও খ্রিস্টানদের কাছে বিক্রি করে তাহলে আমাদের সমাজের মাঝে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রবেশটা বন্ধ হবে। কোন ধরনের বিরোধ উদ্ভূত হলে স্থানীয়ভাবে মীমাংসার চেষ্টা করা।

৫) যারা অভিবাসী হয়ে চলে গেছে তারা কী পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের সাথে এবং পাদ্রীশিবপুরে অবস্থানরত পরিবারের সাথে সম্পর্ক রাখে? কীভাবে রাখে?

ঢাকার অভিবাসীদের মতামত

* যোগাযোগ ও সম্পর্ক রাখে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে নয়
* অর্থনৈতিক সহযোগিতা, তথ্য আদান-প্রদান, কুশলাদি বিনিময়, বিকাশের মাধ্যমে লেনদেন করেন।
* ঢাকায় যারা থাকেন তাদের বেশীরভাগই কোন না কোন ভাবে গ্রামের আত্মীয়স্বজনের সাথে প্রায়ই যোগাযোগ রাখেন। এবং সংগঠনগুলো নিয়মিত পালক পুরোহিতের সাথে যোগাযোগ রাখেন।
* নাড়ীর টানেই শহরের মানুষ বড়দিন, ইস্টার ও বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গ্রামে যায়।
* ব্যক্তিগত ও পারিবারিকভাবে যোগাযোগ রাখে সকলেই বর্তমানে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন।

চট্টগ্রাম অভিবাসীদের মতামত

যাদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা পাদ্রীশিবপুরে তারা অভিবাসী হলেও মূল হতে ছিন্ন হয়নি, নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। আত্মীয়-স্বজনদের খবর নেয়া, তাদের বিপদে-আপদে সাহায্য করা এবং উৎসব পার্বণে স্বপরিবারে পাদ্রীশিবপুরে উপস্থিতির মাধ্যমে তারা এই যোগাযোগটা রাখছে।

৬) অভিবাসীদের সন্তানেরা যারা পাদ্রীশিবুপরে জন্ম গ্রহণ করেনি, তারা পাদ্রীশিবপুরের সাথে কোন যোগাযোগ রাখে? কীভাবে?

ঢাকার অভিবাসীদের মতামত

* যোগাযোগ রাখে কিন্তু যথেষ্ট না। পিতামাতার ও আত্মীয় স্বজনের সাহায্যে যোগাযোগ রাখে।
* বয়স্করা বিভিন্নভাবে যোগাযোগ রাখছে। তা পারিবারিক প্রয়োজনে, ফাদারের সাথে আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে এবং জমিজমার জন্যও বিভন্ন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ রাখছেন।
* ঢাকায় এ সমস্যা আছে। তাদের গ্রামের প্রতি টান কম।

চট্টগ্রাম অভিবাসীদের মতামত

যাদের বাবা-মা বেঁচে আছে, বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজন বেঁচে আছে ও তাদের সাথে সম্পর্ক রাখে, দেশে ঘরবাড়ী আছে তারা যোগাযোগটা কম হলেও রাখছে। কিন্তু যাদের বাবা-মা বেঁচে নেই, দেশে ঘরবাড়ী নেই, নিকটাত্মীয় বেঁচে নেই বা পরিচয় নেই– তারা পাদ্রীশিবপুরের সাথে যোগাযোগ রাখার ব্যাপারে তেমন কোন আগ্রহ অনুভব করে না।

তৃতীয় অধ্যায়: অবস্থানরত পাদ্রীশিবপুরবাসীদের পরিসংখ্যান ও মতামত

(১) ব্রিটিশ আমলে পাদ্রীশিবপুরবাসী খ্রিস্টান জনগণ

ভূমিকা স্বরূপ মি মার্টিন গোমেজের একটি লেখা থেকে কিছু বিষয় উল্লেখ করছি। মি মার্টিন গোমেজকে মোক্তারবাড়ির মার্টিন হিসেবে কলকাতা এবং পাদ্রীশিবপুরের অনেকের কাছে পরিচিত। তিনি কল্যাণপুরে বাস করে ওখানেই মৃত্যুবরণ করেন। লোকমুখে শোনা যায় যে তিনি একজন গেজেটেড অফিসার ছিলেন এবং সরকারি চাকরি করতেন। তিনি "ইন্ডিয়ান খ্রিস্টিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল"-এর প্রাক্তণ সেক্রেটারি ছিলেন। ভারতে, পাকিস্তানে ও বাংলাদেশের খ্রিস্টানদের অধিকারের বিষয়ে তিনি অনেক লেখালেখি করেছেন।

মিস্টার মার্টিন গোমেজ THE SHIELD নামক একটি লেখায় পাদ্রীশিবপুরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেন। সেই ইতিহাস আমরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি এই গ্রন্থের প্রথম দুই ভাগে। শিবপুর খ্রিস্টানদের ব্যাপারে তিনি যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন তা এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে করি। তিনি বলেন:

* শতাব্দী ধরে পাদ্রীশিবপুরে খ্রিস্টানরা বাবুর্চি ও টেবিল বয় হিসেবে কাজ করত। কেউ ছিলেন শিকারী এবং দক্ষ ও অদক্ষ কর্মী। কেউ রেলওয়েতে, পুলিশ প্রশাসনে, পোস্ট অফিসে ও অন্যান্য সরকারি অফিসে কাজ করত। অনেকে জাহাজে কাজ করত, কেউ আবার শিক্ষকতা, নার্স, কৃষিকাজ করত। গ্রামে দুই জন মোক্তার এবং দুইজন ডাক্তার ছিলেন। কয়েক জন যাজক ছিলেন এবং "১৯২০ খ্রিস্টাব্দে সিস্টার হিসেবে ধর্মসংঘে যোগদান করেছে।" লেখকের মতে যতদূর বুঝা যায় তারা মাদ্রাজে সিস্টার হতে গেছেন।
* মিস্টার মার্টিন বলেন যে, "পাদ্রীশিবপুরে আনুমানিক প্রায় ১০০% পরিবারের মধ্যে ৮০% লোক কলকাতায় কাজ করছে"। এর কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন যে, বিট্রিশরা ক্ষমতায় আসার পর গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হ্যাটিংস-এর আমলে (১৯১১ খ্রি.) কলকাতার গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়, অনেক সাহেবরা এখানে বাস করতে থাকেন এবং পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টানরা সাহেবদের অধীনে কাজ করার বিশেষ সুযোগ পায়।
* আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে, আগে গ্রামের নাম ছিল "শিবপুর"। এটা হিন্দু অধ্যুষিত এলাকার ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রদত্ত "শিব" দেবতার নাম অনুসারে। পরবর্তীতে পর্তুগীজ পাদ্রীদের আগমনের ফলে পাদ্রীশিবপুর নাম হয়েছে। তবে এ নামটি সরকারিভাবে স্বীকৃত হয়েছে কেননা পোস্ট অফিসের নামও পাদ্রীশিবপুর পোস্ট অফিস করা হয়েছে।[১১]

---

[১১] Martin Gomes, THE SHIELD, Calcutta, April 3, 1976

ব্রিটিশ আমলে পাদ্রীশিবপুরবাসী যারা কলকাতায় বাস করত তারা অধিকাংশই মুর্গিহাটা (১৭৯৭ খ্রি.), বৈঠকখানা (১৮১০ খ্রি.), মলালীর সেন্ট তেরেজা আভিলার গির্জা (১৮৯৭ খ্রি.) ধর্মতলা (১৯৩৪ খ্রি.) এবং বউবাজার (১৯০০ খ্রি.) এলাকায় বাস করত। গ্রন্থ লেখার উপলক্ষে তথ্য জানার জন্য ২রা জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে মুর্গিহাটা গির্জা ও বৈঠকখানা গির্জা পরিদর্শন করলাম। এই সংক্ষিপ্ত পরিদর্শন এবং সেখান থেকে কিছু ফটো তুলে আনার সুযোগ হওয়ায় ইতিহাসের প্রেক্ষাপট আরও স্পষ্ট হল। এ সমস্ত জায়গার সঙ্গে পাদ্রীশিবপুর ও তার বাসিন্দাদের সম্পর্ক আরও স্পষ্ট ধারণা পেলাম।

মুর্গিহাটা গির্জাটি ১৭৯৭ খ্রি. প্রথমে একটি চ্যাপেল এবং পরবর্তীতে পবিত্র জপমালা রাণীর মারীয়ার গির্জা নির্মাণ করা হয় যা আজ অবধি কোলকাতা আর্চডাইয়োসিসের কাথিড্রাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রথম দিকে আগষ্টিনিয়ান ফাদারগণ দায়িত্বে ছিলেন। ঠিকানা: ১৫ পর্তুগীজ চার্চ স্ট্রিট, কোলকাতা – ৭০০০১। বর্তমানে এখানে প্যারিশের জনসংখ্যা মাত্র ৪৫০ জন।

বৈঠকখানা গির্জাটির শোকার্ত জননী কুমারি মারীয়ার গির্জা। গির্জাটি আশীর্বাদিত হয়েছিল ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে এবং পর্তুগীজ পাদ্রোয়াদোর অধীনে আগষ্টিনিয়ান ফাদাদের তত্ত্বাবধানে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পরিচালিত ছিল। পাদ্রীশিবপুরও একই বছর পাদ্রোয়াদো ছেড়ে পোপাগাণ্ডার অধীনে গিয়ে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়। পাদ্রীশিবপুর থেকে আসা অনেকে বৈঠকখানা গির্জার এলাকায় বাস করতেন এবং এই গির্জায় উপাসনা করতেন। জনশ্রুতিতে আছে পাদ্রীশিবপুরের চারজন মহিলা মাদ্রাজের মাইলাপুরস্থ একটি সিস্টারদের ধর্মসঙ্গে যোগ দেন এবং তার জনই ঐ সংঘেই আজীবন সন্ন্যাসব্রতী হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাদের নাম এই গ্রন্থের অষ্টম ভাগে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এই গির্জায় পুণ্য সপ্তাহের যে অনুষ্ঠানগুলো হত, ঠিকই একই ভাবে পাদ্রীশিবপুরেও পুণ্য সপ্তাহের অনুষ্ঠানগুলো হতো উনিশ শতকের পাঁচ দশক পর্যন্ত যেমন, ক্রুশের পথ, মৃত যিশুর দেহের মুর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হত। তাছাড়া পর্তুগিজ আমলের বেদী, বেদীর দিকে মুখ করে মিশা উৎসর্গ ও অন্যান্য শৈল্পিক স্থাপত্য যা পাদ্রীশিবপুরে ছিল কিন্তু সংরক্ষিত করা হয় নি, সে সব কিছু এখনও বৈঠক খানা গির্জায় সংরক্ষিত রয়েছে। বিগত ১৯৫০ দশক অবধি পাদ্রীশিবপুরে যেরূপ গির্জা ছিল তা স্মরণ করার জন্য ও তুলনা করার জন্য বেশ কতকগুলি ফটো এই গ্রন্থের নবম ভাগে যুক্ত হয়েছে।[১২]

(২) পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণপুরে আলোচনা-সভার ফলাফল[১৩]

কলকাতায় বসবাসরত পাদ্রীশিবপুর জনগণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য এফজিডি প্রশ্নপত্রের ওপর ভিত্তি করে দলগত আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয় কল্যাণপুরে ২৮ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে। এই আলোচনা পরিচালনা করেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও। আলোচনা প্রতিবেদনটি লিখেন যোয়াকিম অসীম কাম্পু। তারই দেওয়া প্রতিবেদন স্বল্প সম্পাদনা করে এখানে উপাস্থাপিত হল।

[১২] Catholic Archdiocese of Dhaka: Directory -2022

[১৩] যোয়াকিম অসীম কাম্পু, আলোচনা সভার প্রতিবেদন

(১) কলকাতস্থ পাদ্রীশিবপুরবাসীদের পরিসংখ্যান

পাদ্রীশিবপুর অভিবাসীরা মূলত পরিবারসহ কোথায় বাস করে ? সংখ্যা অনুপাতে গুরুত্ব নির্ধারণ করতে হবে।

ক্রমিক	অঞ্চল বা এলাকা	পরিবারের সংখ্যা	জনসংখ্যা
১	কলকাতার তালতলা ও অন্যান্য	১৫	
২	কল্যাণপুর ও বারুইপুর	৩৫	
৩	দমদম	৮	
৪	ঠাকুরপুকুর	১৫	
৫	বাটা নগর	১০	
৬	ব্যারাকপুর	৪	
৭	তাহেরপুর	৭	
৮	রাণাঘাট	৮	
৯	জামসেদপুর	৩	
১০	রৌড়কেল্লা	১	
	মোট	**১০৬ পাদ্রীশিবপুরবাসী পরিবার**	**১৩৮৩ পাদ্রীশিবপুর -বাসী পরিবারের সদস্য সংখ্যা ***
	বিভিন্ন সময়ের শাসনকালে অভিবাসন *		
	ব্রিটিশ আমলে	৬৪	
	পূর্ব পাকিস্তান আমলে	২৪	
	বাংলাদেশ আমলে	৭	
	মোট	৯৫টি পাদ্রীশিবপুর পরিবার	১৫৩ জনের জন্ম পাদ্রীশিবপুরে

বিশেষ দ্রষ্টব্য: * চিহ্নিত অংশে পরিসংখ্যানগুলো, কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও কর্তৃক কলকাতায় (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রি.) সফরকালে প্রায় সর্বমোট ১৫-২০ জন ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করে সংগ্রহ করেছেন যার চূড়ান্ত সংখ্যা এখানে উল্লেখ হল। পূর্ণ তালিকাটি দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ রয়েছে।[১৪]

(২) কলকাতায় অবস্থান ও আসার কারণগুলো কি ?

প্রথমত জীবিকা অজর্ণের জন্য। যেমন কোন চাকুরীর বিনিময়ে অর্থ আয় করা এবং নিজের পেট চালানো এবং পরিবারকে সহযোগিতা করা। এছাড়া বেশ কিছু মানুষ কলকাতায় রয়ে গেছেন বা এসেছেন উন্নত মানের শিক্ষা গ্রহণের জন্য। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন যাদের পিতারা বা নিকট আত্মীয়রা এই কলকাতায় চাকুরি করতেন; তাই তাদের সন্তানদের এই কলকাতায় কোন আবাসিক শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি করে পড়াশোনা করাতেন।

[১৪] (কার্ডিনাল প্যাট্রিক – কলকাতা পরিসংখ্যান সংকলন, ২০২৩ খ্রি.

আবার কিছু কিছু অভিভাবক তাদের সন্তানদের বিবাহ প্রদানের জন্য এই ভারতবর্ষে তথা কলকাতায় এসেছিলেন। আবার কেউ কেউ বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে এই কলকাতাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

এক শ্রেণির মানুষ সুচিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসতেন বা এখনও আসেন। পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ আমলে যারা ভারতবর্ষে এসেছেন এনাদের মধ্যে সেই সময় বেশিসংখ্যক মানুষই ভারতবর্ষে তথা কলকাতাতে বিনা পাসপোর্টে প্রবেশ করেছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, বাংলাদেশ স্বাধীনতার আগে বা স্বাধীনতার পরেও সমাজে মহিলাদের নিরাপত্তার অভাব ছিল। সেই কারণে অনেক মহিলারাও বা তাদের অভিভাবকগণ তাদের কন্যা সন্তানদের এই পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে এসে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখেছিলেন।

৩) কলকাতায় অবস্থান বা অভিবাসন কীভাবে গ্রহণ করেছে , এর শুভ বা অশুভ দিকগুলো কি কি ছিল? চ্যালেঞ্জগুলো কি কি ?

কলকাতায় এসে আয় করে অর্থ সঞ্চয় করা, বা অর্থ সঞ্চয়ের একটি নির্ভরযোগ্য সুযোগ থাকা, পরিবারে আর্থিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে পরিবারের দুর্দশা মোচন করা, পরিবারের প্রয়োজনে আর্থিক সঙ্গতি প্রদান করা এবং পরিবারের ব্যয় মেটানোর সম্ভব, ইত্যাদি শুভ দিক বলা যেতে পারে।

পরিবারের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়েছে, পারিবারিক বন্ধন ও ঘনিষ্ঠতা ক্ষুন্ন হয়েছে, দূরে থাকার জন্য পারিবারিক সম্পর্ক হ্রাস হয়েছে। এমনকি কিছু সংখ্যক ব্যক্তি কলকাতায় বা ভারতের বিভিন্ন অংশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার ফলে বাংলাদেশের নিজ পরিবার বা আত্মীয়স্বজন থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে । এই সকল কিছু অশুভ দিকও লক্ষ্য করা গেছে।

তবে ভিটে মাটি ছেড়ে ভারতবর্ষে বা কলকাতা এসে থাকা বা সঠিক চাকরি পাওয়া বা ন্যায্য মজুরি পাওয়া এবং সংযত জীবন যাপন করা, এই সকল বিষয়গুলি বেশ চ্যালেঞ্জেরই ছিল। যারা দেশ ভাগ হওয়ার সময়ে যারা ভারতে রয়ে গেছে তাদের একটা বিরাট ত্যাগস্বীকার করতে হয়েছে। জমিজমা ও সম্পত্তির সব হারিয়েছে; নিজেদেরকে শূন্য থেকে শুরু করতে হয়েছে। তাদের সবকিছু পাদ্রীশিবপুরে রেখে যাওয়া এবং কোন অধিকার দাবি না করাটা ছিল তাদের আপন আপন পরিবারের প্রতি বিরাট ত্যাগস্বীকার ও অবদান।

৪) সংস্কৃতি, ভাষা ইত্যাদিতে কি কোন পরিবর্তন দেখা গেছে ? সর্বপ্রধান অভাব কি কি অনভুব করেছেন তারা?

ভারতে থেকে-যাওয়া বা সকল আগত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তেমন কোনো সংস্কৃতি বা ভাষাগত পরিবর্তন লক্ষণীয় নয়। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশ নিজেদের সংস্কৃতি বা ভাষা এই ভারতবর্ষের মাটিতে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় বজায় রেখেছেন। এই ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ও বাংলাদেশের বরিশাল জেলার পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লী থেকে আগত এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের ভাষা এবং সংস্কৃতিকে প্রথম দিকে খুব একটা ভালো নজরে গ্রহণ করতেন না, বা একটু

অশ্রদ্ধার চোখেই দেখতেন এবং হয়তো এখনও দেখেন। এই বিষয়টি শুধু খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে নয়, এই বিষয়টি এপার বাংলা এবং ওপার থেকে আগত বাঙালী সম্প্রদায়ের মধ্যে শুরুতে যেমন আজও তেমনি কিছুটা ভাষাগত ও সংস্কৃতির পার্থক্য রয়েই গেছে। প্রথমত আগত অধিকাংশ মানুষই পশ্চিমবঙ্গ বা এই কলকাতার ভাষার সাথে সেই ভাবে সরগরম হতে পারেনি বা এখানকার প্রচলিত বাংলা ভাষার মতো তাদের ভাষা ছিল না। এই ব্যাপারটি তাদের জন্য একটু অসুবিধা সৃষ্টি করেছিল। স্থানীয় বসবাসকারীরা এই সকল আগত মানুষদের "বাঙাল" বলেই সম্বোধন করত বা একটু অশ্রদ্ধার নজরে দেখত বা এখনো দেখে। তৎকালীন সময়ে পূর্ববঙ্গের বাসিন্দাদের মধ্যে শিক্ষকতার হার কম ছিল। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিরা দলগতভাবে নিজেদের সংস্কৃতি এবং ভাষা বজায় রাখতেন বা এখনো রেখেছেন।

৫) অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ জীবন কি রূপ: পেশা জীবন, শিক্ষা জীবন, সামাজিক জীবন, ধর্মীয় জীবন ও ধর্মীয় সেবা জীবন

অতীতে (ব্রিটিশ শাসন চলাকালীন, পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ শাসনামলে) জনগণ এসে এই কলকাতায় জীবিকা এবং বাসস্থানের সন্ধান করতে হয়েছে, অনেক কষ্ট সহকারে তাদের জীবন যাপন করতে হয়েছে। বর্তমানের সেই সময়কার মানুষ খুবই কমই জীবিত আছেন এবং যারা রয়েছেন তারা ভারতবর্ষের নাগরিক হয়ে কলকাতাতে স্থায়ীভাবে বাস করছেন। কিছু মানুষ এখানে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পরে বাংলাদেশে চলে গিয়েছিল। যারা রয়ে গেছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই স্বচ্ছল ভাবে জীবন-যাপন করছেন এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের সন্তান-সন্ততিরা শিক্ষা দীক্ষা এবং জীবিকার মান উন্নত করতে সক্ষম হয়েছে এবং কলকাতায় বা ভারতের বিভিন্ন স্থানে তারা মর্যাদার সাথে বসবাস করছেন।

পশ্চিমবঙ্গে বা কলকাতায় বসবাসকারী বা ভারতীয় রূপে তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের তেমন কোন অভাব নেই। এনাদের মধ্যে অধিকাংশই ভারতবর্ষে, কলকাতার তালতলা, ইন্টালী, ট্যাংরা, ঠাকুরপুকুর, কেওড়াপুকুর; উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দমদম, ব্যারাকপুর; দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কল্যাণপুর, বারুইপুর, বাটানগর; নদীয়া জেলার অন্তর্গত তাহেরপুর, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, ইত্যাদি স্থানে, এমনকি মুম্বাই, দিল্লি, ব্যাঙ্গালুরু, প্রভৃতি অঞ্চলে বাড়ি নির্মাণ বা ফ্লাট ক্রয় করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছেন এবং বর্তমানে তারা ভালই আছেন।

৬) পাদ্রীশিবপুরবাসীদের কোন সংগঠন ছিল বা এখনো আছে কি ? ঐ সংগঠনের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম কী ছিল?

কলকাতায় পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর অন্তর্গত পল্লীবাসীদের একটি সংগঠন ছিল তার নাম "পাদ্রীশিবপুর কাথলিক অ্যাসোসিয়েশন" এই সংগঠনটি আনমুানিক ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদস্য সদস্যাগণ মূলত পাদ্রীশিবপুর গ্রামের প্রভাবশালী ও বিত্তশালী পরিবারবর্গ ছিলেন। এছাড়া মাটিভাংগা, দেশান্তরকাঠি ও কালাদা গ্রাম থেকে আসা কিছু কাথলিকও সদস্য বা সদস্যা ছিলেন।

এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীবাসীদের মধ্যে যোগাযোগ, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখা। তাদের যে কার্যক্রম ছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করা, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন করে নেতৃবৃন্দদের নির্ণয় করা, বাৎসরিক একটি মিলনোৎসব ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা, বার্ষিক একটি নাটক বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করা, পাদ্রীশিবপুর-এর দক্ষিণ ও পশ্চিম গ্রাম দুটির ছেলেদের দুটি ভাগে ভাগ করে ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজন করা, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া, বড়দিন উৎসবকালে বাড়ি বাড়ি ঘুরে কীর্তন গান পরিবেশন করা, পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর পরিবার থেকে যাজকবরণ প্রার্থীদের সম্বর্ধনা প্রদান করা হত, (শেষ সম্বর্ধনাপ্রার্থী যাজক ফাদার দীপক গমেজ, সাল ১৯৮১), এমনকি পাদ্রীশিবপুর গ্রাম থেকে বিশিষ্ট ও গুণী ব্যক্তিদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হত (যেমন ফাঃ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও ১৯৭২, মাননীয় শ্রী পিটার পল গোমেজ মহাশয় ১৯৭৬)।

এই সংগঠনটি পাদ্রীশিবপুর গ্রামের সংখ্যা-গরিষ্ঠতার জন্য পাদ্রীশিবপুর কেন্দ্রের পরিবারের সদস্যারাই গুরুত্ব পেত বেশী। পরবর্তীকালে ১৯৮৫ সালে কল্যাণপুরে পাদ্রীশিবপুরবাসী জনগণের সমন্বয়ে "সেন্ট স্টিফেন অ্যাসোসিয়েশন" শিরোনামে একটি সংগঠন শুরু হয়। এই সংগঠনটি পাদ্রীশিপুরবাসীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল যাতে তারা কল্যাণপুরে এসে জমি ক্রয় করে এবং ঘর তৈরী করে। এই কাজে সংগঠনটি যে স্বার্থক ছিল তা কল্যাণপুরে পাদ্রীশিবপুরবাসী পরিবারের সংখ্যাই প্রমাণ করে। ধর্মপল্লী হিসেবে কল্যাণপুরকে একটি নতুন ধর্মপল্লীরূপে গড়ে তোলার জন্য সংগঠনটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। ওই সংগঠনের প্রথম সভাপতি ছিলেন মাননীয় শ্রী সেবাস্তিয়ান গমেজ ও সম্পাদক ছিলেন মাননীয় শ্রী সিলভারা গমেজ মহাশয়। তবে এই সংগঠনটিতে স্থানীয় কিছু ব্যক্তিবর্গও সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন।

শুরুতে এই সংগঠনটি প্যারিশ পাস্টরাল কাউন্সিল-এর মতোই কল্যাণপুর ধর্মপল্লীতে সেবা প্রদান করত। পরবর্তী কালে অনেকটা সেন্ট ভিনসেন্ট দ্য পল সমিতি মতোই সেবা প্রদান করা শুরু করেছিল।

৭) কলকাতায় পাদ্রীশিবপুরবাসীদের অবদান কী কী এবং ও কোন কোন ক্ষেত্রে ?

পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর এক ধর্মীয় পরিবেশ থেকে উঠে আসা এই সকল ব্যক্তিসমূহদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মানুষ ভারতবর্ষের মূলত কলকাতায়, নদীয়া জেলার রাণাঘাট, তাহেরপুর , কল্যাণপুর, ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মপল্লীগুলির ধর্মীয় সংগঠনগুলিতে নেতৃত্ব প্রদান এবং সহযোগিতা প্রদান করতেন (যেমন Catholic Association of Bengal, Sodality মারীয়া সংঘ, Christian Life Community – খ্রীষ্টীয় জীবন সংঘ, Legion of Mary-মারীয়া সেনা সংঘ; এই সংঘগুলোতে পাদ্রীবিপুরবাসীরা আজো সক্রিয়।

এ ছাড়া যীশুসংঘ সম্প্রদায়ে (Jesuits-Calcutta Province) চারজন পুরোহিত: ফাদার তপন গোমেজ, এস.জে, (former Prefect of St. Lawrence High School), ফাদার দীপক নোয়েল গোমেজ, এস.জে (former Prefect of St. Lawrence High School), ফাদার অনিল মিল্টন গোমেজ, এস.জে (গণিতে প্রাক্তন অধ্যাপক সেন্ট জেভিয়ারস মহাবিদ্যালয়, কলকাতা এবং বর্তমানে Assistant

Controller of Examination, ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ফাদার মলয় ডি'কস্তা, ফাদার তুষার গোমেজ, এস.ডি.ভি, সিস্টার স্বপ্ন বেনেডিক্টা, আইবিভিএম, এবং সিস্টার আগ্নেস ইভন গোমেজ আইবিভিএম।

কথিত আছে যে, পাদ্রীশিবপুর থেকে চারজন মেয়ে কলকাতা বৈঠকখানায় কিছু সময় পড়াশুনা করে, চেন্নাই মাদ্রাজের একটি ধর্মসংঘের সিস্টার ছিলেন। তাদের তালিকা এই গ্রন্থের অষ্টম ভাগে উদ্বৃত হয়েছে।[১৫]

তবে যদিও আলোচনার মধ্যে সামাজিক ক্ষেত্রে ও অর্থনৈতিক অবদানের কথা উল্লেখযোগ্যভাবে আলোচিত হয় নি। তবে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে মাননীয় শ্রী নরম্যান (নরু) গোমেজ মহাশয়ের মাল পরিবাহিত গাড়ীর ব্যবসা ছিল। পাদ্রীশিবপুর থেকে আগত ব্যক্তিদের মধ্যে ষাটের দশকে কলকাতায় বসবাসকারীদের মধ্যে তিনি একজন অন্যতম ধনী ব্যক্তি ছিলেন।

৮) কলকাতায় জীবন যাপন করতে পাদ্রীশিবপুরবাসীদের কি কি সমস্যার সম্মখীন হতে হয়েছে ?

প্রথমত উপযুক্ত বাসস্থানেরর অভাব, যোগ্য কর্মসংস্থান, অধিকাংশ মানুষ মেস-বাড়ীতে থাকতেন। এছাড়া তদানিন্তন পশ্চিমবঙ্গের মানুষজন পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষদের খুব ভালো নজরে দেখত না। সেই সময় পূর্ববঙ্গ থেকে আসা অধিকাংশ মানুষই বাবুর্চি বা দিনমজরী – এই ধরনের কাজ করে আয় করতেন। এদের মধ্যে যারা কিছু শিক্ষিত ছিলেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রিটিশ পরিচালিত বা ব্রিটিশ কোম্পানি যেমন লরেন্স কোম্পানি, মার্টিন বার্ণ, বাটা, উসা, জেসপস, আই সি আই ইন্ডিয়া লিমিটেড, ইত্যাদি সংগঠনগুলিতে বা সরকারি চাকরি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। আবার কিছু মানুষ জল-জাহাজে ও শ্রমিক রূপে কাজ করতেন। তিন জন ব্যক্তি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে স্থল বিভাগে যোগ্যতার সাথে কাজ করেছেন।

৯) পাদ্রীশিবপুরের সঙ্গে যোগাযোগঃ আত্মীয়স্বজনের সাথে যোগাযোগ বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে আছে কি? কি রূপ? তাদের প্রত্যাশা কি? ভবিষ্যতের জন্য কি কি সুযোগ-সুবিধা আছে ও কি কি সুপারিশ করা যেতে পারে ?

অতীতে যোগাযোগ অনেকটা নিয়মিত ছিল তবে বর্তমানে অধিকাংশ পরিবারের সাথে বাংলাদেশে নিকট আত্মীয়দের সাথে যোগাযোগ তেমন ভাবে লক্ষণীয় নয়। তবে কিছু কিছু পরিবার আছে তাদের সাথে যোগাযোগ এখনো রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবারের কিছু সন্তান-সন্ততিরা ভারতে বা তথা পশ্চিমবঙ্গের এই কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করে। এদের পরিবারের একটা অংশ রয়ে গেছে বাংলাদেশে। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের অধিকাংশ মানুষের সাথে যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে গেছে। যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা নিজের ইচ্ছা ও চাহিদার উপর নির্ভর করে।

[১৫] Martin Gomes, SHIELD, Calcutta, April 3, 1976

তবে এ কথা সত্য যে, প্রথমদিকের যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা একসময়ে খুবই কমে গিয়েছিল। কিন্তু বিগত দুই দশক ধরে দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন কারণে এপার ও ওপার বাংলার মধ্যে আসা-যাওয়া বেড়েছে, ছুটি কাটাতে আসা-যাওয়া হয়, সুচিকৎসা লাভের উদ্দেশ্যে আসা-যাওয়া হয়, পরস্পরের বড়ো বড়ো উৎসবে উপস্থিত থাকে। সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে যোগাযোগ অনেক বেড়েছে। (লেখকের সংযোজন)

১০) পাদ্রীশিবপুরের বংশোদ্ভূত ভারতে প্রয়াত হয়েছেন এমন বিশেষ ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচিতি রচনা করা।

এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করার প্রক্রিয়া চলছে। তবে প্রয়াত যাদেরকে শ্রদ্ধার সাথে অনেকে স্মরণ করে তারা হলেন: শ্রী মার্টিন গোমেজ (মোক্তারবাড়ি – কথিত আছে তিনি পাদ্রীশিবপুরের প্রথম গ্যাজেটেড অফিসার, প্রাক্তণ সেক্রেটারি, "ইন্ডিয়ান খ্রিস্টিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল"), শ্রী যোসেফ গমেজ, শ্রী আর.ই. গমেজ, শ্রী মার্টিন গমেজ (বিসাইবাড়ি), শ্রী মার্টিন গমেজ (পন্ডিত বাড়ি), শ্রী সেবাস্তিয়ান গমেজ, শ্রী সিলভেরা গমেজ, শ্রী প্যাট্রিক হ্যারী ডি'রোজারিও, শ্রী নরম্যান নরু গোমেজ, শ্রী রেজিনাল্ড ডি'রোজারিও, শ্রী নর্বাট গমেজ, শ্রী ডা. মিডিন শিকদার, শ্রী এরিক গমেজ, শ্রী হ্যানেসি গমেজ (পাদ্রীশিবপুরবাসীদের যিনি প্রথম এম.এস পাশ করেছেন), শ্রী রাফায়েল গমেজ, বেনেডিক্ট গমেজ, তপন গমেজ, মাইকেল নিঙ্গাল ডি'রোজারিও প্রমূখ।

এই আলোচনা-সভাটি স্বর্গীয় হ্যারী ডি'রোজারিও-এর বাসায় ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রি. অনুষ্ঠিত হয়। যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হচ্ছেন: শ্রী জেমস তপন গমেজ, কল্যাণপুর (পা. দিঘীর পাড়), শ্রী যোসেফ গমেজ, রাণাঘাট (পা. পন্ডিত বাড়ি), শ্রী মাইকেল মুকুল গমেজ, বারুইপুর (পা. দেশান্তরকাঠি), শ্রীমতি যোসেফিন বেবী ভট্টাচারিয়া, ঠাকুরপুকুর (বিসাই বাড়ি), শ্রীমতি মৌসুমি ডি'রোজারিও, কল্যাণপুর, নমিতা গমেজ কল্যাণপুর, শ্রীমতি রুফিনা গমেজ, কল্যাণপুর (পা. দেশান্তরকাঠি), শ্রীমতি লিডিয়া কৃষ্ণা গমেজ, দমদম এবং বাংলাদেশ থেকে আগত শ্রী বার্নাড পংকজ ডি'রোজারিও উপস্থিত ছিলেন।[১৬]

তথ্যসূত্র :[১৭]

১) পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের জরিপ ও আলোচনা: ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রি।
২) দেশান্তরকাঠি, রাজাবাড়িয়া ও মাটিভাঙ্গা: অক্টোবর ২০২৩ থেকে ১৬ই এপ্রিল, ২০২৪ খ্রি.।
৩) মাটিভাঙ্গা ধর্মপল্লী (সোনাতলাসহ) ১৩/০৪/২০২৪: পালপুরোহিত ফাদার মিন্টু কর্তৃক সংগৃহীত।
৪) যোয়াকিম অসীম কাম্পু, আলোচনা সভার প্রতিবেদন, কল্যাণপুর, ২৮শে ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রি.
৫) গ্রন্থ-সম্পাদনা কমিটি: ঢাকস্থ জরিপ ও আলোচনা সভা, ২৫ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রি.।
৬) গ্রন্থ-সম্পাদনা কমিটি: চট্টগ্রামস্থ জরিপ ও আলোচনা সভা, ১লা ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি.।
৭) গ্রন্থ-সম্পাদনা কমিটি: খুলনা জরিপ ২৫ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রি.।

[১৬] যোয়াকিম অসীম: কাম্পু সেক্রেটারি এবং প্রতিবেদক

[১৭] পাদটিকায় তথ্যসূত্র: গ্রন্থ-সম্পাদনা কমিটি – ২০২৩-২০২৪ খ্রি.

PART FOUR:
EXTERNAL MIGRATION OF THE PADRISHIBPURIANS

Writer: Dr. Mary Monica Gomes

An Introduction:

External migration of the Padrishibpurians is dedicated to understanding the phenomenon of external migration of the people from Padrishibpur, the factors contributing to it and how it has affected the village, the migrants, and future generations. Chapter 1 will focus on the external migrants of Padrishibpur who have settled in Canada and USA. It is based on: (i) two major Surveys conducted on large samples of the Padrishibpurian migrants, one with those who settled in the USA, and the other in Canada, (ii) five Focus Group Discussions, three in Canada and two in USA, held with migrants with different living experiences in their new country, such as the Early Migrants, Young Established Adults, and New Generations, and (iii) several in-depth Interviews with representatives of the different age and experience groups. Based on these tools and the information gathered, this chapter will analyze and discuss the following aspects of external migration of the Padrishibpurians:

a) pattern and history of migration from Padrishibpur,
b) how migrants view their ancestry, traditions, festivities and changes over time,
c) how migrants are adjusting to their new land, culture and lifestyle,
d) how they are preserving traditions and ties with Padrishibpur, and
e) how the new generation views diversity of values and new perspectives

Part Four will include the following chapters:

- Chapter 1: External Migrants of Padrishibpur: Canada and USA
- Chapter 2: Statistical information of migrants in USA with Padrishibpur roots and heritage
- Chapter 3: Statistical information of migrants in Canada with Padrishibpur roots and heritage
- Chapter 4: Deceased Persons who made contribution
- Chapter 5: Interviews of Migrants in USA and Canada
- Chapter 6: Brief Statistical Information of Padrishibpur Migrants in Australia, Asia, Middle East and Europe

Chapter One: External Migrants of Padrishibpur: Canada and USA

1. Introduction: A brief history of Padrishibpur as an early Christian settlement in southern Bengal

'Srimonto-Bate Padrishibpur: Legacy of Christian Inhabitants' is the narrative of the historical Christian settlement of Padrishibpur that grew up on the banks of the river Srimonto over the past three hundred or more years ago. The book looks at how this community was established, how it developed key institutions, systems and traditions to grow and flourish, and how its people lived and maintained their unique lifestyle and heritage. As time passed, the people from this land dispersed and spread to other regions within the country and beyond. This chapter will look at the migrants from Padrishibpur who traveled to distant lands, their lives in their new country, and their memories and ties with their homeland.

Padrishibpur, the village that is considered as the 'roots' or original home of several thousand Christian Bengalis in Bangladesh, is situated 22 kilometers from Barishal, the main municipal city, 5 kilometers from Bakerganj, its district, and is situated on the Srimonto river. In early times, this area was called Shibpur and because it was later granted to the missionaries it came to be known as Padrian Shibpur, and later as Padrishibpur. Padrishibpur was a village and Post Office, but now it has become a Union where local government offices are located. Since more than 300 years, Padrishibpur and its surroundings has been a settlement of Christians, mostly Catholics, in southern Bengal. In a land where Muslims and Hindus formed the major demographic groups, Padrishibpur is quite unique in being an enclave with more Christians living together there. According to official data, Christians make up 0.3 percent of the nation's population, roughly 5 lakh Christians.

A brief history of the Christians in Padrishibpur is displayed on a plaque in the new Church of Padrishibpur, built in 2005. According to different sources, Bakla is the name of the first settlement of early Christians and Portuguese, situated in present-day Bauphal, in District Patuakhali. The first Christian settlement was established there in 1596, and in 1599 the first Priest to visit the settlement was Fr. Melchior De Fonseca.

In 1763, four Portuguese Christians arrived in Padrishibpur. The first Church was built in 1764 by Pedro Gonsalves, and the first Priest was Fr. Raphael Das Anjous. During that period Padrian Talluk or zamindari system was set up by the Church and they owned much of the land in and around Padrishibpur. The second Church was built in 1823, financed by Domingo De Silva (d. 1821), and built by Manuel De Silva. Padrishibpur was annexed to Chittagong Diocese in 1930. Before that it was under the Mylapore Diocese (South India). The Church of Our Lady of Guidance in

Padrishibpur underwent several renovations (1934, 1959, 1964, 1993) and finally the present Church was built in 2005. (Source: Bp Patrick D'Rozario csc. (2005). Early history of Padrishibpur, March 2000. Our Lady of Guidance Church opening Souvenir).

2. Pattern and history of migration from Padrishibpur to urban centers and other countries (based on Survey)

Migration and dispersion of local inhabitants from Padrishibpur to other cities and urban centers have occurred throughout its history. When traveling was difficult and modes of transport were few and slow, people only went as far as cities and urban centers which were close-by or within the country. But, with the expansion of modern means of transport, population dispersion and migration happened more widely.

Surveys conducted on Padrishibpurians (people with origins or roots in Padrishibpur) currently living in Canada and USA have shown that most of them are second or third generation migrants, whose parents or grandparents were the original migrants who travelled out of their village home in search of better opportunities in jobs, education or living standards in cities within or outside the country such as Dhaka, Chittagong (Chattogram), Khulna and Calcutta (Kolkata). Families who made the internal migrations in earlier periods are featured in the preceding chapter. Many family members from these groups later moved to other countries, particularly to USA and Canada. This section will portray the views, patterns of migration, how they are adapting to a new land and culture, and future visions of these migrants. Their interviews and group discussions revealed the impact and aspirations of the migrants from their new life abroad.

2.1 Survey information highlights – Canada Migrants

2.1.1 Migration history of families and 'baris' in Padrishibpur:

• Family heads having origins in Padrishibpur, names of 'bari' or homesteads they belong to, and number of family members living in Canada

In order to understand the pattern and history of migration from Padrishibpur to different cities and towns in Bangladesh and India, and later to overseas countries such as Canada and USA, the survey traced the journey of the migrants and their families out of Padrishibpur.

The survey obtained detailed information from 80 Canadian resident/citizen family heads that had direct roots or origins in Padrishibpur, being either son/daughter or grandson/granddaughter of their parents or grandparents originally residents of Padrishibpur. Along with their spouses, children, children's spouses and

grandchildren, these families have increased to 251 members living in Canada (mostly in Toronto, Montreal & other places).

- Total No. of family heads who are currently residents = 80
- Total No. of family members of migrants now (family head, spouse, children, children's spouses, grandchildren) = 251
- Total No. of original migrants (family head, spouse, children) = 149

Information was collected about the name of the family head & bari (or homestead) who first migrated out of Padrishibpur to Dhaka/ Chittagong/ Barisal/ Khulna/ Kolkata/ other places. Among the bari or homesteads from where these family heads migrated are the following:

1. Ashirbad Bhavan – Oliver Gomes, Cecilia Romola Rozario, Clinton Bulbul Gomes, Alphonse Kala Gomes and their families = 45 members
2. Jola Bari – Isaac Gomes and family = 5 members
3. Bochar Bari – Ivan D'Rozario and family = 9 members
4. Sarker Bari & Stephen Sir er Bari – Pinku Anthony Sarker, James Dipok Gomes and families = 7 members
5. Santa Maria & Panchayat Bari – Constant Bhanu Gomes, Pearl Anthony, Carolyn Jennifer Penheiro, and others = 18 members
6. Shikdar Bari – Dr. Monica Gomes, Christina Rozario, Rupert Gomes, Anjan Gomes and others = 24 members
7. Fr. Leo Gomes Bari – Noreen Mercer and family = 7 members
8. Halder Bari – Romola Gomes, Janet Dias, Sylvia Gomes and families = 9 members
9. Chokidar Bari – Alistair Gomes, Sharon Gomes and families = 10 members
10. George Nelson Bari – Lloyd Nelson, Richard Nelson, Rose Nelson and families = 16 members
11. Benir Bari – Maclean Belasso, Ophelia Belasso, Sophia Gomes and families = 13 members
12. Nobu Shaheber Bari – Yvonne Pereira, Mildred Thomas, Terrance Polacco, Daryl Polacco and families = 30 members
13. Paschimer Santa Bari – Rebecca Gomes, Babu Gomes, Baby Gomes and families = 16 members
14. Matibhanga, Tangrakhali migrants (Ranu Rozario, Lazarus Gomes, Shantona and Dilip Gomes) and those living in Montreal, Winnipeg and other provinces of Canada = 42 members

2.1.2 Migration history in numbers and data

a) Period of migration from Padrishibpur and their destinations

From among those who migrated out of Padrishibpur, the data was categorized in the following manner:

- o A = those who left Padrishibpur during British period (before 1947) = 10 families
- o B = those who left Padrishibpur during Pakistan period (1947-1971) = 56 families
- o C = those who left Padrishibpur since Bangladesh (after 1971) = 14 families

b) Place where family head migrated to, from Padrishipbur

- o Dhaka = 44
- o Chittagong = 25
- o Barisal, Khulna, Padrishibpur = 5
- o Calcutta = 6

c) Migration to Canada – how long they have resided in Canada

- o A= 30 years & above = 42 families
- o B= 10 years & above = 23 families
- o C= less than 10 years = 15 families

d) Different generations of migrants in Canada

- o No. of 1st generation migrants = 9
- o No. of 2nd generation migrants = 43
- o No. of 3rd generation migrants = 27
- o No. of 4th generation migrants =1 (mostly living with parents)

First generation migrants in Canada are those who came to Canada directly from Padrishibpur. The survey found only 9 residents who were first generation migrants in Canada. While 4 of them migrated here more than 30 years ago, the others came to Canada more recently. However, it should be noted that first generation migrants out of Padrishibpur were mostly those who settled in different urban centers in Bangladesh and India (Dhaka, Chittagong, Khulna, Calcutta) during the Pakistan period. Among the migrant families in Canada, 56 had ancestors or family members who left Padrishibpur during Pakistan period and settled mostly in Dhaka (44 families) and Chittagong (25 families). During Bangladesh period most of them migrated to Canada, USA and other places.

Second generation migrants are those whose parents migrated out of Padrishibpur and settled in different cities and urban centers in Bangladesh or India, and their children migrated to Canada. Second generation migrants are also children of the first generation migrants in Canada who either migrated with their parents or grew up here. The number of 2nd generation migrants in Canada was the largest group of 43 family heads. Most of the second generation migrants have been here for more than 10 years, while many are here for 30 years or more. They migrated here during the Bangladesh period.

Third generation migrants are those whose grandparents migrated out of Padrishibpur and settled in different cities and urban centers in Bangladesh or India, their parents lived in these cities in Bangladesh/India – Dhaka, Chittagong, Khulna, Calcutta – and then the grandchildren migrated to Canada. Children of 2nd generation migrants who migrated with their parents or grew up here are also 3rd generation migrants. The number of 3rd generation migrant family heads in Canada is 27.

2.2 Survey information highlights – USA Migrants

2.2.1 Migration history of families and 'baris' in Padrishibpur:

a) Family heads having origins in Padrishibpur, names of 'bari' or homesteads they belong to, and number of family members living in USA

The survey showed that 95 family heads who were USA residents/citizens had direct roots or origins in Padrishibpur, being either son/daughter or grandson/granddaughter of their parents or grandparents originally residents of Padrishibpur. Along with their spouses, children, children's spouses and grandchildren, these families have increased to 308 members living in USA (New York, Connecticut, Maryland, Virginia, California & other places).

- Total No. of family heads who are currently residents = 95
- Total No. of family members of migrants now (family head, spouse, children, children's spouses, grandchildren) = 308
- Total No. of original migrants (family head, spouse, children) = 173

Information was collected about the name of the family head & bari (or homestead) who first migrated out of Padrishibpur to Dhaka/ Chittagong/ Barisal/ Khulna/ Kolkata/ other places. Among the bari or homestead from where these family heads migrated to USA are the following:

1. Shikdar Bari – Mabel Gomes, Mary Gomes, Raphael Gomes, Capt. John Gomes (late), Jacinta Gomez, Lucia Gomes, Rita D'Cruze, Bermadette Aloysius and their families = 79 family members
2. Santa Maria Bari – Jerry Gomes, Roney Gomes (late), Juliet Jui Gomes, Richard Ricky Gomes and family members = 22 members
3. Sarker Bari – Jhorna Sarker, Juliet Lipi Sarker and families = 6 members
4. Peon Peter Bari – Angelina Monkhushi D'Rozario, Rufina Shabitri D'Rozario, Lucky D'Rozario, Elvis Gomes and their families = 21 members
5. Deben Daktarer Bari – Arati Adhikari, David Ashish Adhikari, Minoti Adhikari Frazier, and their families = 23 members
6. Nayeb Moshair Bari – Promilla Victoria Gomes, Jennifer Ratna Quiah, Patro Gomes, and their families = 22 members
7. George Nelson Bari – Pearl Nelson, Delphi Nelson, Candida Nelson, Pierette Nelson, Karen Nelson, Jackie Nelson and their families = 19 members

8. Lovely D'Costar Bari – Nomi D'Costa, Ripon D'Costa and their families = 5 members
9. Benir Bari – Carl Rana Gomes, Diena Alexandra Gomes and their families = 8 members
10. Bhela Pedar bari, Halder Bari, Fr. Leo Gomes Bari – Charles Swapon Penheiro, Linda Josephine Gomes, Lydia Mercer and families = 7 members
11. Daroga Bari – Samuel Gomes, Bernadette Gomes and families = 5 members
12. Julu Majhir Bari, Chowkidar Bari, Babu Bari – Vincent D'Costa, Juliana D'Rozario, Tapati Gomes and families = 13 members
13. Jarmen Gomes Bari – Rosemary D'Costa, Theotonius Gomes, David Gomes and families = 36 members
14. Pankhaala Bari – Nixon Dias, Nelson Dias and families = 20 members
15. Joseph Baburchir bari – Nancy Gomes, Poplin Gomes, Leonard Gomes and their families = 15 members
16. Mistiri Bari – Karen Gomes and family = 7 members

2.2.2 Migration history in numbers and data

a) Period of migration from Padrishibpur and their destinations

From among the families who migrated out of Padrishibpur, the data was categorized in the following manner:

- o A = those who left Padrishibpur during British period (before 1947) = 8 families
- o B = those who left Padrishibpur during Pakistan period (1947-1971) = 65 families
- o C = those who left Padrishibpur since Bangladesh (after 1971) = 22 families

b) Place where family head migrated to, from Padrishipbur

- o Dhaka = 69
- o Chittagong & Noakhali = 22+1
- o Khulna & Kolkata = 2 + 1

c) Migration to USA – how long they have resided in USA

- o A= 30 years & above = 27 families
- o B= 10 years & above = 51 families
- o C= less than 10 years = 17 families

d) Different generations of migrants in USA

- o No. of 1st generation migrants = 12
- o No. of 2nd generation migrants = 39
- o No. of 3rd generation migrants = 44

In USA, as in Canada, the number of first generation migrants who came to USA directly from Padrishibpur was comparatively very low, only 12 members.

On the other hand, second generation migrants whose parents migrated out of

Padrishibpur and settled in different cities and urban centers in Bangladesh or India, and their children migrated to USA was quite high with 39 members.

The third generation migrants are mostly the grandchildren of the first migrants who left Padrishibpur and settled in different cities and urban centers in Bangladesh or India. Their parents lived in Dhaka, Chittagong, Khulna, Calcutta from where they migrated to the USA. This generation constituted the largest group of migrants with 44 members.

3. Life in Padrishibpur: How migrants view their ancestry, traditions, festivities and changes over time (based on FGDs and Interviews)

3.1 Reasons why they left their homeland and migrated to a new land and future

The early migrants came to Canada and the USA mostly in the 1970s and 1980s. Among the reasons they cited for migrating to a foreign land were: i) better life and job opportunities, ii) education and future of next generation, iii) civil unrest, political upheaval and war in Bangladesh, iv) religious-based discrimination against Christians and minorities. Others mentioned the deteriorating conditions and situation in the village including economic hardships, breakup of village-based life and social structure, and loss of hope in a better future. During periods of hardship, a big group moved from Padrishibpur to cities like Dhaka, Chittagong and Calcutta for jobs and better life. There was a trend to leave the village for better life after obtaining education with hopes of getting office jobs.

Females in many cases were among the first in the family to move or migrate to other countries through marriage bonds with people from other districts, and later migrated to USA, Canada etc. There are several examples of girls in the family sponsoring their parents and siblings to the western countries.

3.2 How migration affected the village and its people

Usually when one family member migrated and settled down in the new land, they were able to provide support and sponsorship to other members of his/her family who were interested to migrate also. In this way, many families from Padrishibpur brought their near and dear ones and built a supportive network of family members in the urban cities or foreign land. We can see this pattern of migration from different 'baris' or homelands in Padrishibpur in section no. 2 above (survey highlights). Those who migrated and improved themselves were able to send some economic help to their relatives they left behind.

There is no doubt that during the early period of migration from Padrishibpur village to larger cities, it left many households empty and weak. There was more political and social rivalry and insecurity. Laws such as Enemy Property Act weakened the

Christian families and many had legal trouble to save their lands when family members migrated to outside countries. As those who left the village were mostly the educated and better off, only the weak members of the community were left behind to fight for their rights and opportunities.

There was also some reverse or inward migration from other Christian villages in Bangladesh to Padrishibpur. The survey found that some of the inhabitants of Padrishibpur were non-locals who had migrated there from surrounding villages of Faridpur and Barisal districts, while some came from Dhaka district, and settled there for teaching or other jobs or through marriage relationships with Padrishibpur families. These non-Padrishibpur residents bought land and settled there and developed good relationships with their neighbours and local people. Similarly, some of the women from families in Padrishibpur moved to other districts through marriage with non-Padrishibpur families, though this was very rarely done in the olden days.

3.3 What has changed in Padrishibpur in recent years?

Like the rest of Bangladesh, recent years have seen much development and prosperity in villages like Padrishibpur. Houses and roads have improved, electricity came, and jobs are available in the village also. In earlier times, the Convent sisters helped by giving small jobs to women, teaching handiwork, providing elementary education, and some of the less educated women were also given quality midwifery training. The ADC or agriculture development centre was doing improvement of crops and created interest in farming and other agricultural work. Now much of the development work is being done by the government and NGOs. Before, people depended mostly on agriculture, now jobs in other sectors are available and the economic situation is better.

Education has improved vastly; there are many SSC passed students, many are getting scholarships, parents are motivated, and the system has changed. The missionaries were a strong influence in this improvement of education and its institutions.

3.4 How was life in Padrishibpur in the olden days?

Life in Padrishibpur in the olden days came out in the stories told by the migrants when asked about the history of Padrishibpur, its older generations, their way of living, their culture and values. Those who had left behind their village home and their native country had a lot of nostalgic memories of life, festivities, traditional celebrations and rituals that reaffirmed that the migrants had a very strong bond and link with their roots and culture. They talked of their heritage and history that they would like to uphold and pass on to the next generation.

The migrants, particularly the first and second generation migrants, recounted oral history about Padrishibpur and how this Christian settlement was founded more than three hundred years ago. They mentioned that several Portuguese

explorers/colonizers/timber merchants first came into these forest regions seeking new lands and opportunities and set up small trading posts. They recruited local people to help them and in this way started the Portuguese settlement in and around Padrishibpur and other areas, such as Kalada. Later Christian missionaries came and established the mission and built the Church. Some of the earliest Portuguese persons/families who are reported to have settled here had surnames such as Gomes, D'Costa, D'Rozario, D'Silva, Coelho, Campo, and these surnames are still being used by most present day families in Padrishibpur. Undoubtedly, there was intermarriage with local population and conversion of different religious and ethnic groups that lead to the increase and stability of these settlements into small communities that grew into the Christian settlement of Padrishibpur.

Describing life in Padrishibpur in the olden days, people's dressing showed their uniqueness. Men wore dhuti-punjabi, while the women wore sarees. But they dressed well when coming to Church and wore nice clothes. Women wore sarees with borders and many put on a lace veil on their head when coming to church, while some women wore dresses. Some of the men wore pant shirts and put on shoes and socks. There was quite a difference in their clothes from the other local communities.

In those days, there was a big class difference, and high and low class did not sit or eat together. High status was maintained by men working in important jobs, such moktar (lawyer), or nayeb (tax collector) etc. but they helped poor Christians and Muslims too who came to work. At that time, the feudal system or 'jamidar protha' was very much entrenched. Some Christian families owned a lot of land from where they collected rent and tax. Their tenants or 'projas' were mostly Muslims, and when the Zamindar or feudal lord walked down the road the projas would step back to show respect. They removed their shoes when walking in front of the zamindar's house. Some of these families with lot of land had very big size clay vessels or 'motkas', or special storage room (gudam ghar) or underground space for preserving grain throughout the year, or strong safes or 'shinduk' to keep valuables, which they still have as souvenirs of that era. Others have old guns and swords that were used to protect land and property or used in hunting. The sad story of one of the village women attacked and killed by a tiger at the back of her house while she was picking some sort of spinach or 'dheki shag' (she was a close relative of some of the migrants) showed how vulnerable life was in those forested areas of Padrishibpur in those days.

The people of Padrishibpur were open-minded, but also conservative. Gender relations were not very restrictive, but neither was romance and free-mixing encouraged. Girls were kept at home after dark, but girls' education was encouraged for those who were intelligent and they were sent to boarding school. The people in the olden days were also very caste conscious and thought of themselves as superior due to their history of Portuguese inter-racial marriages and did not like mixing with

Christians from other surrounding villages such as Faridpur, Narikelbari, Barisal. They called the Christians of these other villages as "Nomo Chrishtan" (referring to their conversion from lower caste Hindus) and did not intermarry with them. They married their daughters within their families.

In terms of entertainment and festivities, the people of this community loved and encouraged singing, dancing and other cultural activities. Often, men and women danced together but more in tribal or local fashion rather than European or western dancing. During weddings and other joyous celebrations, families danced freely with their relatives and neighbours. Some women dressed up for such events and entertained everyone with their merry-making and dancing. Drinking and use of alcohol was quite common during such festivities.

Lot of cultural activities were done at Christmas and other events where dramas, dance dramas, and movies were shown. Among the special religious events were 'Pala gaan' or folk songs narrating the lives of saints that were performed by traditional folk singers or 'kirtan' groups which were solemnly witnessed by the villagers. 'Ramur Pala' depicting the life of Jesus and his death and sufferings which was composed and performed by Ramuel Gomes, one of the elders of the village, and his group was very popular among the villagers and was hosted during the Lenten season. Another notable contribution to the cultural base was made by Sylvester Gomes Sir who wrote and gave music to the song 'Srimonto Tote'. These are part of the heritage of Padrishibpur that the migrants felt should be preserved, recorded and shared widely.

Although the community members did not involve themselves in political affairs or happenings, there was active participation in the Liberation War in 1971. Among the migrants, there were two freedom fighters, Ivan Robi D'Rozario and Clinton Bulbul Gomes. Other freedom fighters from Padrishibpur were Flavian Gomes, Jonas D'Costa, Orlando, Cabot. Christians supported the Liberation War wholeheartedly and provided help to Freedom Fighters and Hindus who were persecuted by the military, by hiding them in their house and giving other support.

4. Migrants adjusting to a new land, culture and lifestyle

4.1 Struggles and challenges versus achievements and new ways of living

In small group discussions, the migrants shared their feelings and emotions, struggles and challenges that they faced and described how they adjusted to their new country, culture, and living style and achieved new skills, qualifications, ways of living and new aspirations.

a) Struggles and sacrifices:

The migrants shared what they had to sacrifice in making their lives successful in their new country. Their biggest sacrifice was to leave their parents, family and home, and having lived in one land and culture they had to start from zero in a new land. This thought raises lot of feelings, nostalgia and is very emotional for them. Many had to live in difficult circumstances such as living in basements, cramped quarters, sharing apartments, doing odd jobs in order to establish themselves. Most migrants lived near public transportation systems as they did not own cars or know how to drive. They lived in apartment buildings which housed many of their known people, or they lived in localities where most of the migrants live (like Jackson Heights and Queens in New York, or Scarborough in Toronto). They lived in areas where ethnic grocery shops and other social and medical facilities were available for migrants.

The early migrants in Canada and USA mentioned that they had to struggle in the beginning as they did not know French (important in Quebec, Canada), many did not know English, faced discrimination due to ethnicity and skin color, and as they were not from this country they had problem in getting jobs. So they had to gain Canadian or American job experience, skills training, language skills and other qualifications. There wasn't a supportive environment in the beginning, especially in Quebec, Canada and in the USA Midwest, but some facilities were provided by the government for training, language skills and day care (in Canada). Migrants therefore mostly settled in the urban centres on the East and West Coasts (such as in New York, Maryland, California, Toronto) where they were able to enter odd jobs and restaurants and hospitality business.

The early migrants feel that they have adjusted to this new land and ways of living, but they have not moved up. Views have changed over the decades and now there is more acceptance of cultural diversity and there are government efforts to make you proud of your culture (e.g. in Canada). Refugees and low income migrants were provided with some government and social services. But the elderly and the women did not join the workforce due to language barriers and household responsibilities. Some were able to get certain social benefits.

Among their struggles the migrants cited the bitter cold winters and hard life, having no household help or extended family to share in the housework, and competing in the workforce with local people who were better equipped with education and skills. Socially, our lifestyle is different e.g. going to bar or restaurant for enjoying is not acceptable or affordable. As Christians we were familiar with drinking, but not the pub culture. Although the migrants worked with the whites and other racial groups, their daily lives did not mingle. Cultural barriers and different norms prevent freely mixing with other groups. Migrants prefer to mix and socialize with their own groups, though they also learn new behaviors and values.

Among their sacrifices they mentioned that sometimes parents are too preoccupied with jobs and earning money that they cannot look after their children and adolescents to give them the proper guidance and care. As a result, there is the problem of drug addiction among the young. And the race to go high up on the social ladder often leads to too much competition, greed and show-off behavioral traits, which has detrimental social consequences.

b) Achievements and aspirations:

The migrants felt that their biggest achievement was being able to come to a new land, being part of a developed world lifestyle, having access to clean water and air, having security, no political unrest. They had a feeling of a sense of security in social welfare opportunities and facilities, having rights, having a voice. They felt that if you get proper education and skills, there are job opportunities and you don't need influence like in Bangladesh, but you have to work hard, be on time, and work ethics has to be good. There is some racism here, but in Bangladesh they had to face discrimination due to their religion and other forms of political and social insecurities.

The young adult migrants who have now established themselves in Canada and USA described that with appropriate education, skills training, and job experience many have moved to management positions with job satisfaction and comfortable lives. They were able to settle down and build and support their new family life. Their goals are that their new generation gets good education in different fields and jobs that will lead to better life. Their aspirations are mostly to lead a stable job and comfortable life and for their future generation to be successful too.

These migrants described how they had limited opportunities back in their homeland, and had to struggle to enter a good educational institution or get a good job. They felt stuck there and they ventured into this new land with hope of opportunities to improve their life conditions with better jobs and other facilities. They expressed satisfaction with their new lifestyle and the opportunities they have to go further and higher with more education, experience and ambition. New technology such as social media plays a part in the new generation's bright future.

However, comparing themselves with new migrants from other countries, they were of the view that we might not have high achievement motivation – few of us go into the political field, or go further. First the migrants have to give a lot of work to establish themselves, and often they become fatigued and don't want to do anymore. The struggle here is more but they feel that their next generation got a leg up, they can have higher ambitions. For migrants just settling here is a big achievement, starting from zero. Some expressed the view that our religion places less importance on riches, so our people are satisfied with less wealth. But they keep alive festivities such as Pohela Boishakh, which bring back feelings of comfort and belonging to their own culture.

4.2 New behavior, attitudes, skills, knowledge, and values they acquired that are different from their homeland

While describing their new life here and new values, attitudes and behaviors they had to adopt, the migrants mentioned some of these key differences:

a) **Clothing and attire:** They have to wear different clothes that are culturally and weather appropriate, not wearing sarees or shalwar kameez, or lungi, but wearing pant, shirt, dress.

b) **Food habits:** At home they mostly ate their own cuisine and took longer time to adjust to western food. While children and young ones prefer fast food and eating outside with friends, the older generations prefer to cook their own recipes and dishes and eat at home.

c) **Language skills:** At home, the elderly and women mostly spoke their own mother-tongue Bangla, but outside they had to use English or French, which was very difficult for communication.

d) **Driving and work related skills:** Women also had to learn skills such as driving cars, which was not a luxury but a necessity.

e) **Religious practices:** They kept all religious practices and traditions, but they could not pray in their mother-tongue. When a Bengali priest came, they arranged services in their home or in the church. This is more prevalent in recent years. The role of the Church is becoming less prominent, and many are not able to attend regular religious services.

f) **Social etiquette:** They learned new etiquette such as taking permission from a person before going to their home; back home they could visit anyone's home without seeking prior permission. They learned not to invade privacy – there is a line that you don't cross, which is considered as intrusion – they had to learn not to intrude, e.g. had to learn what to say to their children's friends. From observing others they learned new etiquettes from people of different cultures.

g) **Parenting:** They learned to have lots of patience and acceptance. and different forms of discipline. Children speak up and express their wills. If they don't want to accompany their parents to different social gatherings, you can't force them. Children tell them not to invade their freedom, and parents have the fear that they will tell their teacher or call police if forced or if parents hit children or threaten them. Children are mostly confined in their homes to play games with internet and devices. They are not encouraged to go out and play. The trend now is that children do not participate in communication; they rather sit and interact with their mobiles or devices.

h) **Office culture:** Learning office culture which is different from our country, work ethics is rigourously followed, system of hierarchy in the office is less, there is more equal manager-worker relationship, power distance is less, and there is emphasis on planning and organizing.

i) **Social policies:** Taxation policies have to be followed, often there is quite a high tax based on their income. Health insurance is also a practice that they have to follow, without which they cannot go to the doctors or get medical service. Through insurance, they got good health services. Sometimes to get legal residence in their new country, they had to know legal policies which are often difficult and expensive to implement or attain.

j) **Home and family:** Families prefer to have less children; most have only one or two children as it is very expensive to raise children in this country. Back in their country they mostly had servants who helped them, while here they have to do all household activities themselves. The family support system is disappearing. In Bangladesh this was a strong part of their lives, now each one has to look after his/her own liabilities. Thus, families like to live independently, they don't like to take the burden of parents or siblings, only take their own responsibility. They may give some financial help but not take their responsibility. At the same time, the extended family system is not being continued or followed as the govt. facilities allow the older generation to live on their own, or in home care service, or in a nursing home.

k) **Women's role:** Now women have a bigger say in decision making in the home: before the men would take all the family decisions. They also work both at home and in office, and do most of the grocery shopping etc. Although many did odd jobs, there is no stigma attached to it. Women enjoy more mobility and freedom of choice in this country.

l) **Young generation:** The young generation starts earning at an early age and can help parents. However, once children become older, they become independent and usually don't listen to their parents. There is a loan service available to them for higher education (in USA & Canada) and they can return the loan after they get a job; people with low income jobs can also apply for loans. This enables the young generation not to become a burden on their parents for their education.

m) **Older generation:** The older generation showed appreciation for social security measures and medical help provided by government, which help them to not be dependent on their children; they can live self-sufficiently with the govt. benefits. Some states such as New York provide better social security benefits than other states.

n) **Modern and liberal ideas and values:** The migrant families are becoming accustomed to new social norms and behaviors. Their children are marrying from other cultures and countries, which is becoming more prevalent and acceptable, often from different religious groups. They are more open to accepting issues of divorce, remarriage, living together without marrying, which are no longer frowned upon or rejected. They are sensitive not to openly criticize or condemn homo-sexual and LGBTQ relationships, while civil marriages or unions are more commonly accepted as legal.

4.3 Generational difference in cultural assimilation

In describing about their future generations and their aspirations from them, there came up the generational gap and how behavioral norms are changing. Parents noticed that it is hard to convince children when they grow up, they want to live independently, and they are straightforward, telling parents 'don't cross the line'. They don't spend time with parents and they follow the norms of this country, they maintain a distance. Parents feel that as they are seeing two cultures, so they are confused, and they follow this culture. Now they are established, got education, job, or maybe cultural difference creates these problems. Children don't need or use Bangla, they also have less friendliness. Some felt that the children are not so involved in their family and culture, because we don't involve them in our culture. There is a trend among the next generation not to want to visit Bangladesh, rather they prefer to go for vacation to other countries.

On the other hand, the younger generation's views about their parents' generation are discussed under Section 6: Voice of the new generation of migrants.

5. Preserving ties with Padrishibpur and activities to promote village welfare

5.1 Padrishibpur's special dialect and terminology that are still valued and remembered with fondness

Padrishibpur's language has a unique flavor and earthiness that only those who use it can experience fully. The migrants recalled with nostalgia many of these words that describe special food items, events, festivities, and daily activities. When asked to describe their feelings and emotions about what they miss most from their homeland, the early migrants who had lived for a longer period in their village home mentioned the local food items and special dishes such as vindaloo, morich tanga, temporado, dolma, kaldo, amrar midatanga and pithas such as dodol, biski, dhupi pida, birinkha, bhoudda, events such as kundubath, ga-dhoani (gaye holud), poishabar (marriage eve), jhar bati with dance and wedding songs, fulhajja, dara shinni (marriage rituals). They missed the special way of talking in the village (Barishailla language mixed with certain words or terms derived from Portuguese) calling sister mana, sister-in-law quenda, kitchen osshaghar, verandah aitna, backyard kainaddi. This special way of addressing different relations and household parts is no longer in use. Some words that are still used are hakka ('shako'), bussna (bamboo basket for fish catching) used in the baer or canals next to the home, 'sabi' a fishing net with stick and cloth to catch fish in the pond and baer, deurra (kupi light stand), daur er ghar (house for wood) . Some traditions were mentioned such as special fasting on the occasion of the Holy Spirit, known as 'Ispiritu Sanctus Roza', followed by mostly women and widows, praying and cooking in groups, where special vegetarian food is made. On Good Fridays, a

food item known as allyan-rooti, is made which consists of rice flour flatbreads and a halua-type sweet dish made of rice flour, coconut milk and jaggery. Many of these traditions, food items and way of talking and naming things still exist in and among the Padrishibpurians, both at home and abroad.

5.2 Maintaining ties with their village homeland

When asked about how well the migrants have maintained connections with Padrishibpur, they mentioned that person to person communication with family is done regularly, they go to the village to join family functions such as marriage, priestly ordination, contributed to make the new church, contribute to parish needs, they collect funds for education of children in the village and support them till SSC. Padrishipurians in Canada and their relatives have formed a social cultural group that meets regularly, organizes events such as picnics, Christmas, Easter and family events, and supports education in their village home Padrishibpur. In present-day good telecommunication and WiFi system, the interaction and support system with the village has become better. In USA, the Padrishibpurians are more dispersed and meet mostly during family celebrations such as weddings or other big events. They too maintain links with their family members back home and provide support to events in the village like 'Kalada's Pilgrimage', or publication of magazine or Souvenir by the Padrishibpur Chrishtio Samaj Sangha in Dhaka.

Many still have ancestral lands back home and in future want to make further developments there. With new infrastructure developments in the rural areas and the construction of the Padma bridge, migrants see a lot of new opportunities opening up, with scope for investments for the future where the village can develop further, and the new generation can be inspired to take up new ventures. Eco-tourism and rural tourism are some of the opportunities back home that can be attractive options for the migrants to engage in the future.

5.3 Values, norms and traditions from their homeland that they want to pass on to their next generations

Being a Padrishibpurian or having roots or heritage in that village and culture featured very prominently to most of the migrants, including the young generation. They were very proud of their heritage, upbringing and other attributes through which they could mix easily with other cultures, and communicate with people. The women from this background are brave and outgoing, good cooks and housewives. Most of the migrants maintain ties with their home, some visit in the summer, while some are not really much connected with village. The younger generation has heard a lot of stories of life back home, and while they are exposed to the special foods of Padrishibpur, they may have only heard all these stories from their father, mother, or grandparents, as traveling to Padrishibpur was rather difficult. Some younger generation members who

went and saw Padrishibpur said that they loved it, especially the rivers, ponds, 'khal' or stream, the tide and ebb that flows through the shallow canals around each homestead known as 'baer'. The migrants love the special dialect, tone and way of talking in the village. Although they no longer use it in their daily usage, they prize the mythical nature of this spoken language which reminds them of the good old days. Most of the migrants who have lived in Bangladesh for a considerable period speak standard Bangla at home, while the new generation is more comfortable in using English.

Comparing the value systems of the two cultures in their lives, the migrants highlighted those that they feel are needed in the modern days and would like to see their next generation carry them on:

- Family values: From their motherland the migrants carry strong family values that they want to pass on. They value the connectivity, friendliness and hospitality values of our culture.
- Bangla language and culture: The migrants cherish their own Bangali culture and history, festivities, songs, instruments, Bangla Mass and choir, Christmas pithas, kirton, dodol. They feel that their children are deprived of Bangla culture, and this will create a vacuum in their minds of all that their ancestors had learned throughout the ages and passed on to them. They speak Bangla with children in the homes to teach them their language.
- New values they appreciate: In their new country, the migrants cherish their freedom, having a voice, traveling freely, especially women's freedom. Our culture values maintaining bond, connection with family, but places less emphasis on women's rights and freedom. In this country, diversity is appreciated and accepted and this value should be promoted.

6. Voice of the new generation of migrants: Diversity of values and new perspectives (based on FGD and Interviews with New Generation)

6.1 How they view their migrant heritage and adaptation in the new culture

The new generation views their parents as people who migrated from the village, went to Dhaka or elsewhere, and were seen as a beacon of hope, to build a base of skills and education for a better life, and in future to venture out into the world for even better opportunities. The new generation sees their new home as a land of much more opportunities, as a world leader, where people have access to more opportunities, new knowledge, different sciences, different habits, different knowledge. The older generation did not have these new benefits and diverse knowledge. As a migrant, they can take advantage of different affirmative actions, diversity action, scholarships, and other systematic advantages/support programmes built for migrants.

The young generation of migrants is more attracted to the new values, attitudes and lifestyles and adapt to these more easily than their parents. Their foundation is based

on the strengths of the previous generation but they are becoming something new with benefits and opportunities from their new country. The older generations do not want to adapt to the new environment and want to hold on to their traditional values, language and lifestyle. But in order to make better opportunities for their children, their parents made sacrifices. Still many in this generation are afraid of change, relocation, though moving maybe a good venture. The young people feel free to share their culture and food with people of different regions (like Dhaka) and other countries. Some of their foods are of different recipes, like 'vindaloo' or 'morich tanga'.

Canada and USA are culturally diverse, with a variety of cultures and so it makes it easier for the youth to fit in and feel accepted. In the areas where the migrants from Padrishibpur live, and the schools they attend, there are many South Asians who are not that different from our culture. They make friends with other young people from South Asia, so they don't feel different. Moreover, there are a lot of other advantages and opportunities, such as technology, in these countries which the young people highly prize.

6.2 Connectivity with Padrishibpur roots and heritage

Most of the young generation of migrants have heard stories about Padrishibpur and exposed to its special food items like 'dodol,' 'vindaloo'and 'morich tanga', although many didn't know it was Padrishibpur food. Some still have ties with relatives from Padrishibpur, but have never gone there themselves and are less familiar with its culture and traditions.

But they are more connected to Bangladeshi culture as a whole and appreciate Bangla music, particularly the modern music that is more exploratory and much more meaningful. The celebration of Bangla culture during events such as Pohela Boishakh is kept alive in these countries and the young generation participate and enjoy that.

Regarding connectivity with their roots, one young migrant expressed her views as, "when we were younger and with family and Bengali friends, our experience was different, we participated in Bangla dances and programmes. Later we moved away and our friends are more of an influence now. But, we still hang on to some of our heritage like songs, dances, marriage celebrations like mehendi, holud, wear sarees, like Bangla cuisine even in this country. Many girls of this culture appreciate dances of our culture and feel interested, wear sarees and shalwar kameez and even in intermarriage celebrations, they hold on to gaye holud, mehndi night; they know and appreciate Pohela Boishakh celebration. Knowing Bangla is now seen as an asset especially in dealing with migrant community patients or other clients".

6.3 Views about cultural and religious values and norms, clash of values, emerging new perspectives and fusions

The young generation appreciate that the people from Padrishibpur are very connected, community-based and family-based, and stays in touch with each other. The Bengali Christians are strong believers in church and stay connected with religious leaders. In Canada, the Padrishibpur community is still very observant of religious and social functions and events and the younger generation are associated with these. Thus, the young generation wants to keep these values, carry on these traditions for the future, and build on them from their own experience.

But, there they see a clash of traditional values and norms with new ones. From the religious angle, they are losing the practice of going to Church regularly. Culture is different here than Padrishibpur. There is so much diversity here, so many perspectives, and the young migrants mix with so many people, and they are questioning more. But they see that questioning is not accepted by their older generation. There is a conflict from interacting with others and dealing with other opinions.

However, the young generation feels that it is important to keep the community base and connections; you have to have a community, otherwise it is depressing. Community provides lots of help and surroundings. Another important value they appreciate is being hard-working, going to work for family, and being goal-oriented.

As to how they deal with the clash of religious and traditional values with modern ones, one young migrant described their views very openly in the FGD, "I want to sacrifice for family, also keep religion, though I have my disagreement with them, religious values are important and should be there, but we have to ask the 'whys' and get explanations. Religion provides much needed break from ordinary life and work, you see and interact with your community, building community in Church, finding peace – these important factors of going to church are not explained to us, but expect blind obedience from everyone and being submissive to religion, to God, to church – not questioning, no answers to why, seems hypocritical".

Another clash of values they mentioned is the emphasis and pressure placed on achievement. Christian families are not very successful, nor are they very high achieving. But high achieving goals are valued more in Canada and USA, and even Muslims here are high achieving, while many of our people are stagnant and satisfied with their situations. However, most families are hard working who don't ask for help or handouts, or use their situation as excuse for help. But, many from other cultures become dependent on aid.

One young generation high achiever (in USA) explained, "I wanted to go to a prestigious school, I had high achievement motive, but my parents didn't know the system, so I had to find out more about the possibilities from school counselors. Our parents don't want us to go away to dorms for school, this is the norm here, but parents don't want, they want us to go to local, less elite school, but for high status jobs you need to attend the ivy league or top tier schools".

Describing how they are adjusting to this new culture, one of them explained, "When I was younger I used to feel embarrassed with Bangla language or food, but now it is acceptable, now I appreciate my background, because the community here is more acceptable and encourages us to be proud of our culture. Maybe it is 'cool' to be different – I did not go to Catholic school, so I have less knowledge of religion and its different impacts". Someone else described the differences in cultural norms, "I share a room with my brother, in the beginning this was taken very negatively, now we get respect for sharing, before it was a cultural shock".

6.4 Visioning a new future: New values and attitudes, new perspectives

When they first came to their new country, the young generation felt out of place, they needed to fit in, psychologically. At that time they shed their own culture and tried to assimilate the new culture. Later, they felt a change. Their new country encouraged diversity of cultures and being proud of one's own roots. The different cultures living here were each made to feel welcome. They felt more comfortable and not embarrassed any longer. Now they actively want to learn more about their culture and roots, their music, traditional clothes, and festivities. They are also more interested in the different cultures of their friends and others they interact with.

The young generation has developed a new vision for their future that blends some of their traditional values with new attitudes, skills and viewpoints. They are placing more emphasis on getting higher incomes, openness to entrepreneurship, the skill and ability to understand humans, and to understand the 'why' behind everything. They want to have high aspiration, to develop better skills and to do better. However, they also placed importance on being happy and having better mental health along with material wealth.

In Bengali culture the emphasis is on family, community and norms to please others – but American culture stresses on own independence and life and what it needs to be happy and gain their own goals. The emphasis is on immediate family, not extended family, and friends become more a priority than extended family. When the family moves away, the connections become less important. Geographical proximity with one's own cultural groups also influences this. Inter-cultural marriage also brings in the influence of other cultures and makes the importance of own culture less highlighted.

Regarding how they form new perspectives and attitudes, one of them explained, "We usually make friends with Asian or other minority groups, who have similar experience, but not with white or majority community who have different experience. I went to a specialized, gifted and talented high school, where I met diverse children and gained high achievement motive. This helped me in better education and job opportunities. Usually, parents send their children to local schools which have more ordinary level children, hence their perspectives and motivation remain at that level".

Another field which they feel needs to be encouraged in the future is that they should venture into political leadership. In Bangladesh due to their minority status, Christians were not interested to join active politics. But the young generation feels that they should give their voice to politics or take a stance in issues that are important for the social good. Though it takes a long time to shine in politics, there is less risk here in terms of violence.

In conclusion, some of the cultural, religious, and humanitarian values that are important and relevant for this generation are:

- Balance of religious values with freedom to question blind obedience to different practices, getting better at praying and religion, make connections through church with others, it is important to keep these values
- Want their kids to know Bangla, introduce religion to them and explain to them the importance of that and grow up with that, to know their roots, or background, and to be proud of it from the beginning, and not be embarrassed
- Parents need to build trust and listen more to what their children have to say; parents may want to guide, but they may not have all the answers, just because it was done like that
- New social norms and attitudes like openness to entrepreneurship, which is much lower in our culture, should be encouraged
- Ability to take multiple things from different sources, ability to think critically, take the best thing from every school of thought, and make a meaningful life, not being afraid to move, change and try new places, meet new people, new perspectives
- Need to understand about different political and humanitarian issues and views that are more relevant and valued now, such as gender and women's rights, equity, and do something about them
- Cherish freedom, being mentally and financially independent, provide and protect themselves and their near ones
- Stay healthy, happy and connected with family and friends

The young generation recognizes that they are a community of migrants from another culture, and it takes time to accept that some of their values are different. However, the sense of community is very important to them. While they bask in the freedom of a new country and opportunities, they are equally determined to work hard, blend into the culture that accepted them, accept norms and values that are needed for a modern lifestyle. But, their grounding in the values of their homeland culture, and their appreciation of their traditional food, clothing, festivities and rich heritage, give hopes that the migrants will continue to enrich their new land with a blend of their traditional values and lifestyle and new modern era perspectives and knowledge. They hope for a bright future for the coming generations!!

7. Conclusion

From the far distant land of 'Srimonto-Bate Padrishibpur' to the most modern and developed countries in the world, Canada and USA, with their vast land masses, natural and man-made resources and wonders, cultural diversity, and new heights of knowledge and technology, the migrants have experienced a life-changing metamorphosis that is evident from their feelings and outpourings during this study on the life journey and learning experiences of the migrants from Padrishibpur to their new countries in the West, Canada and United States of America. While they faced many challenges in adjusting to this new lifestyle, they met all the adversities with a brave spirit and determination to succeed. Amid all this, the fire that kept them going was the heritage of their homeland and the values that were inculcated in them through their religion, culture, and their strong family bonds of collective strength and unity while moving ahead in life. The optimism and willingness to discover and explore, witnessed in the migrants, especially the new generation, is the foundation upon which the migrants have successfully accepted and adjusted to a new life in distant lands, while holding dear all the wonderful values and memories they brought with them from their dear motherland. It is a vastly encouraging thought to look ahead to, which gives us hope for a bright future for the migrants that will also keep alive the ties that bind us to our past rich heritage!

Chapter 2: Statistical information of Migrants in USA with Padrishibpur roots & heritage

USA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Name of the resident (family head) who migrated to Canada/ USA (having origins in Padrishibpur)	Name of the family head (& bari) who migrated from Padrishibpur to Dha/Chitt/Khul/Kolkata/others	Place where family head migrated to, from Padrishibur	Period of migration from Padrishibpur A= British B= Pakistan C=Banglad esh	Migrated to Canada/ USA A= 30 years & above B= 10 years & above C= less than 10 years	Number of Adult Persons migrated from Bangladesh /other places	Number of family members increased = children & spouses + grandchildren & spouses + others	Total members of the migrated family (persons migrated + children & spouses + grandchildren & spouses + others	Total family members living with resident/or counted with resident family	Number of original migrants in the family who came together
		Shikdar bari (William Gomes)						Total migrants of the family in USA=	47	30
1.	Mabel Gomes + Rowland Quiah (d/o William Gomes) – 2nd	William Gomes (Shikdar bari)	Dhaka	B	A	2	Children 3 + spouses = 6 Grandchildren=5	2+6+5=13	2	2+2=4
2.	Florence Quiah + Byron Folgar (gd/o William Gomes) – 3rd	William Gomes (Shikdar bari)	Dhaka	B	A	2	Children 2	2+2 = 4-1=3	3	x
3.	Samuel Quiah (late)+Devjani (gs/o William Gomes) – 3rd	William Gomes (Shikdar bari)	Dhaka	B	A	2	Children 2	2+2 = 4-1=3	3	x
4.	Dr. Angelina Gomes +Raybel Batista (gd/o William Gomes) – 3rd	William Gomes (Shikdar bari)	Dhaka	B	A	2	Children 1	2+1= 3	3	x
5.	Mary Gomes + John Gomes (late) (d/o William Gomes) – 2nd	William Gomes (Shikdar bari)	Dhaka	B	B	2	Children 6 + spouses = 10 Grandchildren=3	2+10+3=15-1=14	1	2+3=5
6.	Lynda Gomes +Babul Gomes (gd/o William Gomes) – 3rd	William Gomes (Shikdar bari)	Dhaka	B	A	2	Children 1	2+1=3	3	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Chester Gomes + Rani (gs/o William Gomes) – 3rd	William Gomes (Shikdar bari)	Dhaka	B	B	2	Children 1	2+1=3	3	1
8.	Alan Gomes + Liza (gs/o William Gomes) – 3rd	William Gomes (Shikdar bari)	Dhaka	B	C	2	Children 1	2+1=3	3	2+1=3
9.	Christer Gomes + Maria (gs/o William Gomes) – 3rd	William Gomes (Shikdar bari)	Dhaka	B	B	2	Children 0	2	2	x
10.	Levi Gomes (gs/o William Gomes) – 3rd	William Gomes (Shikdar bari)	Dhaka	B	B	1	Unmarried	1	1	x
11.	Pamela Sarah Gomes (gd/o William Gomes) – 3rd	William Gomes (Shikdar bari)	Dhaka	B	B	1	Unmarried	1	1	x
12.	Raphael Gomes +Olivia (s/o William Gomes) – 2nd	William Gomes (Shikdar bari)	Dhaka	B	B	2	Children 3 + spouses = 5 Grandchildren 2	2+5+2=9	2	2+3=5
13.	Sylvia Gomes + Faizan Ghani (gd/o of William Gomes) – 3rd	William Gomes (Shikdar bari)	Dhaka	B	B	2	Children 2	2+2=4	4	x
14.	Charles Gomes (gs/o of William Gomes) – 3rd	William Gomes (Shikdar bari)	Dhaka	B	B	1	Unmarried	1	1	x
15.	Carolina Gomes + Stefan Bruno (gd/o of William Gomes) – 3rd	William Gomes (Shikdar bari)	Dhaka	B	B	1	Children 0	1+ spouse 1= 2	2	x
16.	Jacinta Gomez + Jude Gomez (d/o William Gomes) – 2nd	William Gomes (Shikdar bari)	Dhaka	B	A	2	Children 1	2+1=3	3	2
17.	Lucia Gomes + Arthur Gomes (d/o William Gomes) – 2nd	William Gomes (Shikdar bari)	Dhaka	B	B	2	Children 1	2+1=3	3	2+1=3
18	Capt John Gomes (late) + Rebecca (s/o William Gomes) – 2nd	William Gomes (Shikdar bari)	Dhaka	B	B	2	Children 2+ spouse=3 Grandchildren 1	2+3+1=6 -1=5	2	2+2=4
19.	Stella Gomes + Ankur Sharma (gd/o William Gomes) 3rd	William Gomes (Shikdar bari)	Dhaka	B	B	2	Children 1	2+1=3	3	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Elizabeth Bianca Sarker + Luke Pretzie (gd/o William Gomes) 3rd	William Gomes (Shikdar bari)	Dhaka	B	C	1+1		2	2	1
		Shikdar Bari (Aloysius Gomes)						Total migrants of the family in USA=	32	16
21.	Rita Aloysius (d/o Aloysius Gomes) + Nicholas D'Cruze – 2nd	Aloysius Gomes (Shikdar Bari)	Ishurdi, Dhaka	B	B	1	Migrated alone	1	1	1+2=3
22.	Lima D'Cruze + Norman Apu Gomes(late) (gd/o Aloysius Gomes) – 3rd	Aloysius Gomes (Shikdar Bari)	Ishurdi, Dhaka	B	B	2	Children 3	2+3 = 5 - 1=4	4	2
23.	James D'Cruze + Pushon Gomes - ex. (gs/o Aloysius Gomes) – 3rd	Aloysius Gomes (Shikdar Bari)	Ishurdi, Dhaka	B	B	2-1	Children 1	1+1 = 2	2	x
24.	Jacob Ranjit D'Cruze + Rupali (gs/o Aloysius Gomes) – 3rd	Aloysius Gomes (Shikdar Bari)	Ishurdi, Dhaka	B	B	2	Children 2	2+2 = 4	4	x
25.	Noman Buro Rahman + Affifa Munawar (gs/o Aloysius Gomes) – 3rd	Aloysius Gomes (Shikdar Bari)	Ishurdi, Dhaka	B	A	1+1	Children 2	2+2 = 4	4	1
26.	Lisa Rahman + Pappu Rozario (gd/o Aloysius Gomes) – 3rd	Aloysius Gomes (Shikdar Bari)	Ishurdi, Dhaka	B	A	2	Children 2	2+2 = 4	4	2
27.	Sylvia Simla Rahman+ Nelson Eric (Nipu) (gd/o Aloysius Gomes) – 3rd	Aloysius Gomes (Shikdar Bari)	Ishurdi, Dhaka	B	A	2	Children 2	2+2 = 4	4	2
28.	Julia Lila Mittal + Sanam Mittal (gd/o Aloysius Gomes) – 3rd	Aloysius Gomes (Shikdar Bari)	Ishurdi, Dhaka	B	A	2	Children 2	2+2 = 4	4	1
29.	Connie Kona Aloysius (d/o Clifford Aloysius) – 3rd	Aloysius Gomes (Shikdar Bari)	Ishurdi, Dhaka	B	C	1	Children 2 (still in BD)	1	1	1
30.	Eric Francis (late) + Panna (s/o Pricilla Quentella Gomes + Charles Bhura) 2nd	Pricilla Quentella Gomes (Shikdar Bari)	Dhaka Atharo gram	A	B	2 (-1)	Children = 3	1+3=4	4	2+2=4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Santa Maria Bari						Total migrants of the family in USA=	= 22	15
31.	Jerry Gomes + Polin (s/o Vincent Gomes) – 2nd	Vincent Gomes (Santa Maria bari)	Chitta gong	B	B	2	Children 2+ spouses=4 Grandchildren=2	2+4+2=8	2	2+1=3
32.	Juliet Jui Gomes + Swapon Gomes (gd/o Vincent Gomes) – 3rd	Vincent Gomes (Santa Maria bari)	Chitta gong	B	B	2	Children 2	2+2=4	4	2+1=3
33.	Rossie Rudolph Gomes + Tithi (gs/o Vincent Gomes) – 3rd	Vincent Gomes (Santa Maria bari)	Chitta gong	B	C	2	Children 0	2	2	x
34.	Roney Gomes (late) + Juliana (s/o Vincent Gomes) – 2nd	Vincent Gomes (Santa Maria bari)	Chitta gong	B	A	2	Children 3 + spouses=5 Grandchildren=2	2+5+2=9 –1= 8	1	2+3=5
35.	Ray Savio Gomes+ Cecilia (gs/o Vincent Gomes) – 3rd	Vincent Gomes (Santa Maria bari)	Chitta gong	B	A	1+1	Children 0	2	2	x
36.	Ryan Stuart Gomes + Rose Poly (gs/o Vincent Gomes) – 3rd	Vincent Gomes (Santa Maria bari)	Chitta gong	B	A	2	Children 2	2+2 = 4	4	x
37.	Rory Shawn Gomes (gs/o Vincent Gomes) – 3rd	Vincent Gomes (Santa Maria bari)	Chitta gong	B	A	1	Unmarried	1	1	x
38.	Richard Ricky Gomes + Yvette Augley (gs/o Vincent Gomes) – 3rd	Vincent Gomes (Santa Maria bari)	Chitta gong	B	A	2	Children 2	2+2=4 -1 = 3	3	1
39.	Jonathan D'Silva + Jacklin (gs/o Robin Gomes) 3rd	Renu Gomes (Robin Gomes, Santa Maria bari)	Chitta gong	B	C	2	Children 1	2+1=3	3	2+1=3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sarker Bari						Total migrants of the family in USA=	6	5
40.	Jhorna Sarker + Rafiq Uddin (d/o Cynthia & Augustine Subas Sarker) – 2nd	Cynthia & Augustine Subas Sarker (Sarker Bari)	Dhaka	B	B	2	Children 2	2+2 = 4	4	2+2=4
41.	Juliet Lipi Sarker + Elvis D'Cruze (d/o Cynthia & Augustine Subas Sarker) – 2nd	Cynthia & Augustine Subas Sarker (Sarker Bari)	Dhaka	B	C	1+1	Children 0	2	2	1
		Peon Peter Bari						Total migrants of the family in USA=	21	11
42.	Angelina Monkhushi D'Rozario + Rex Augley (d/o Richmond D'Rozario) 1st	Angelina Monkhushi D'Rozario (Peon Peter Bari)	Dhaka	C	B	2	Children 2 + Spouses 2 = 4 Grandchildren= 4	2+4+4= 10	2	2+2=4
43.	Warren Augley + Val Iqbal (s/o Angelina Augley) 2nd	Angelina Monkhushi D'Rozario (Peon Peter Bari)	Dhaka	C	B	2	Children 2	2+2+4	4	x
44.	Yvette Augley + Marvyn Gomes (d/o Angelina Augley) 2nd	Angelina Monkhushi D'Rozario (Peon Peter Bari)	Dhaka	C	B	2	Children 0	2	2	x
45.	Rufina Shabitri D'Rozario + Noel Polacco (d/o Richmond D'Rozario) 1st	Rufina Sabitri D'Rozario (Peon Peter Bari)	Chitta gong	C	B	2	Children 1 + Spouses =2	2+2=4	4	2+1=3
46.	Lucky D'Rozario + Tultul Dewri (d/o Richmond D'Rozario) 1st	Lucky D'Rozario (Peon Peter Bari)	Chitta gong	C	B	2	Children 2	2+2=4	4	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Elvis Gomes (s/o Claude Gomes & Teresa Gomes) + Hilda – 2nd	Claude Gomes (Nobu Shahebe r Bari, Teresa Gomes is from Peon Peter bari)	Dhaka	B	B	2	Children=3	2+3=5	5	2
		Deben Daktarer Bari						Total migrants of the family in USA=	23	14
48.	Arati Adhikari + Alfred Tushar Dewri (d/o Debendra Nath Adhikari) 1st	Arati Adhikari (Deben Daktar Bari)	Dhaka	B	A	2	Children 3 + Spouses = 6 Grandchild ren=4	2+6+4 = 12	2	2+3=5
49.	Swapon Dewri + Deepa (Arati's 2nd son) (gs/o Debendra Nath Adhikari) 2nd	Arati Adhikari (Deben Daktar Bari)	Dhaka	B	A	2	Children 1	2+1=3	3	x
50.	Dipon Dewri + Mary (Arati's 3rd son) (gs/o Debendra Nath Adhikari) 2nd	Arati Adhikari (Deben Daktar Bari)	Dhaka	B	A	2	Children 1	2+1=3	3	x
51.	David Ashish Adhikari (s/o Debendra Nath Adhikari) 1st	David Ashish Adhikari (Deben Daktar Bari)	Dhaka	B	A	2	Migrated as couple	2	2	2
52.	Minoti Adhikari + Martin Frazer (d/o Debendra Nath Adhikari) 1st	Minoti Adhikari (Deben Daktar Bari)	Dhaka	C	B	1	Migrated alone	0	1	1
53.	Anney Frazer + Subir Biswas (gd/o Debendra Nath Adhikari) 2nd	Minoti Adhikari (Deben Daktar Bari)	Dhaka	C	A	2	Children 4	2+4=6	6	2
54.	Angel Frazer +Runu (gs/o Debendra Nath Adhikari) 2nd	Minoti Adhikari (Deben Daktar Bari)	Dhaka	C	C	2	Children 2+ Spouses= 3 Grandchild 1	2+3+1=6	3	2+2=4
55.	Alex Rupu Frazer + Michelle (gs/o Minoti Adhikari) 3rd	Minoti Adhikari (Deben Daktar Bari)	Dhaka	C	C	2	Children 1	2+1=3	3	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nayeb Moshair Bari						Total migrants of the family in USA=	22	16
56.	Promilla Victoria Gomes + Milton Montu Quiah (d/o Avelyn Gomes) 1st	Promilla Victoria Gomes (Nayeb Moshai Bari)	Dhaka	C	B	2	Children 1	2+1=3	3	2+1=3
57.	Christella Nelly Quiah + Stanley Dipu Majumdar (d/o Promilla Victoria Gomes) 2nd	Promilla Victoria Gomes (Nayeb Moshai Bari)	Dhaka	C	C	2	Children 2	2+2=4	4	2+2=4
58.	Jennifer Ratna Quiah + Franklin Quiah (d/o Joannah Gomes) 2nd	Joannah Gomes (Nayeb Moshai Bari)	Dhaka	C	B	2	Children =2	2+2=4	4	2
59.	Rita Gomes + Julian Quiah (d/o Provati & Clarence) 2nd	Provati Gomes (Nayeb Moshai Bari)	Dhaka	C	B	2	Children 2	2+2=4	4	2
60.	Patro Gomes (d/o Avelyn Gomes) 1st	Patro Gomes (Nayeb Moshai Bari)	Chitta gong	C	C	1	Migrated alone	1	1	1
61.	Champa Gomes + Ranjan (d/o Patro Gomes) 2nd	Patro Gomes (Nayeb Moshai Bari)	Chitta gong	C	A	2	Children 2 + Spouses= 4	2+4=6	6	2+2=4
		George Nelson Bari						Total migrants of the family in USA=	19	7
62.	Pearl Nelson + Roger Reimer (d/o Wilfred Nelson) 3rd	George Francis Nelson(Gomes) (**Bari)	Dhaka	A	A	1+1	Children 2 + spouse = 4 grandchildren =2	2+4+2=7	7	1
63.	Delphi Nelson + Timothy Nelson (d/o Wilfred Nelson) 3rd	George Francis Nelson(Gomes) (**Bari)	Dhaka	A	B	1+1	0	2	2	1

64.	Candida Nelson + Lawrence Howlader (d/o Wilfred Nelson) 3rd	George Francis Nelson(Gomes) (**Bari)	Dhaka	A	B	1+1	Children 1	2+1=3	3	1
65.	Pierette Nelson + Andre Bastien (d/o Clarence Nelson) 3rd	George Francis Nelson(Gomes) (**Bari)	Dhaka	A	B	2	0	2	2	2
66.	Karen Nelson + Jeff Marty (d/o Clarence Nelson) 3rd	George Francis Nelson(Gomes) (**Bari)	Dhaka	A	A	1+1	Children 1	2+1=3	3	1
67.	Jackie Nelson + David Miller (d/o Clarence Nelson) 3rd	George Francis Nelson(Gomes) (**Bari)	Dhaka	A	B	1+1	0	2	2	1
		Lovely D'Costar Bari						Total migrants of the family in USA=	5	6
68.	Nomi D'Costa (d/o Benedict D'Costa) – 2nd	Benedict D'Costa (Lovely D'Costa Bari)	Khulna	B	B	2	Children=2	2+2=4	3	2+2=4
69.	Ripon D'Costa (s/o Benedict D'Costa) – 2nd	Benedict D'Costa (Lovely D'Costa Bari)	Khulna	B	B	1	Children=1	1+1=2	2	1+1=2
		Benir Bari						Total migrants of the family in USA=	8	3
70.	Carl Stanford Rana Gomes + Misty Huck-Gomes (s/o Arnold Arun Gomes) (gds/o Peter Paul Gomes) 3rd	Peter Paul Gomes (Benir Bari)	Chittagong	B	B	1+1	Children=3 -1=2	1+ Spouse 1 + 2 = 4	4	1
71.	Diena Alexandra Gomes (Kakon) (d/o Arnold Arun, gd/o Peter Paul Gomes) + Monzur Khan Rohan – 3rd	Peter Paul Gomes (Benir Bari)	Chittagong	B	B	2	Children=2	2+2=4	4	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bhela Pedar bari, Halder Bari, Fr. Leo Gomes bari						Total migrants of the family in USA=	7	3
72.	Charles Swapon Penheiro (s/o Pushpo Penheiro) – 2nd	Pushpo Gomes (Bhela Pedar Bari)	Noakh ali	B	B	1	0	1	1	1
73.	Linda Josephine Gomes + Linus Roy (Janet's sister) (d/o Lazarus Gomes) 2nd	Lazarus Gomes (Halder Bari)	Dhaka	B	B	1+1	Children=1	2+1=3	3	1
74.	Lydia Mercer + Kelly Hey (d/o Noreen Mercer, (gd/o of Bro Sebastian Gomes) 3rd	Bro Sebastia n Gomes (Nora Gomes) Fr. Leo Gomes Bari	Chitta gong	B	C	1+1	Children=1	2+1=3	3	1
		Daroga Bari							5	3
75.	Samuel Gomes (Daroga bari) + Jennifer Prapti (d/o Vicki Dias) 2nd	Daroga Bari	Chitta gong	C	C	1+1	0	2	2	1
76.	Bernadette Gomes (Samuel's sister) + Debangshu Hore - Michigan – 2nd	Daroga bari	Chitta gong	C	C	2	Children =1	2+1=3	3	2
		Julu Majhir bari, Chowkid ar bari, Babu bari							13	8
77.	Vincent D'Costa + Shoma Gomes (s/o Cyprian D'Costa, gs/o Justin D'Costa) 3rd	Justin D'Costa (Julu Majhir bari, West Padrishib pur)	Chitta gong	B	C	2	Children = 2	2+2=4	4	2

78.	Juliana D'Rozario + Victor Biswas (d/o Francis Foru D'Rozario & Agnes Mira Rozario) (gd/o Philip D'Rozario) – 3rd	Philip D'Rozario (Chowkidar bari, Araibeki (Pascal Biswas's mother in law Pricilla Gomes is Foru's elder sister)	Dhaka	B	B	2	Children =1	2+1=3	3	2+1=3
79.	Tapati Gomes + Albert D'Cruze (d/o Maria Gomes, Sr. Lilian's sister) – 1st	Tapati Gomes (Babu Bari) (Maria Gomes +Alexandar Jhantu Mesho, bro is Pintoo)	Dhaka (married in Atharogram)	C	C	2	Children = 2 Daughter married and brought her here		2 (lives with daughter)	1
80.	Dina Gomes (d/o Tapati Gomes) + Joel Gomes (Sylvia D'Costa's bro in law) – 2nd	Tapati Gomes (Babu Bari)	Dhaka (married in Atharogram)	C	B	1+1	Children =2	2+2=4	4	2
		Jarmen Gomes bari							36	16
81.	Rosemary + Anthony Subash D'Costa (d/o Pricilla & Walter Gomes) – 2nd	Pricilla Gomes (d/o Clarice Gomes + Jarmen Gomes)	Dhaka (Luxmibazar Convent	B	A	2	Children 3 + Spouses = 6 Grandchildren = 2+2+2=6	2+6+6=14	6	2+3=5
82.	Steven D'Costa + Krystal (gs/o Pricilla Gomes) – 3rd	Pricilla Gomes	Dhaka	B	A	1+1	Children =2	2+2=4	4	x
83.	Sylvia D'Costa + William Gomes (gd/o Pricilla Gomes) 3rd	Pricilla Gomes	Dhaka	B	A	1+1	Children=2	2+2=4	4	x
84.	Theotonius Thinu Gomes (s/o Pricilla Gomes) + Shelley 2nd	Pricilla Gomes	Dhaka	B	B	1+1	Children =2	2+2=4	4	1

85.	David Gomes (s/o Pricilla Gomes) +Christina 2nd	Pricilla Gomes	Dhaka	B	B	1+1	Children =2	2+2=4	4	1
86.	Thomas Montu Gomes (s/o Pricilla Gomes) + Jacinta 2nd	Pricilla Gomes	Dhaka	B	B	2	Children = 3	2+3=5	5	2+3=5
87.	Jonas Jhontu Gomes (s/o Pricilla Gomes) + Veronica 2nd	Pricilla Gomes	Dhaka	B	B	1+1	Children = 1	2+1=3	3	1
88.	Roselyn Sheila Gomes (d/o Pricilla Gomes) + James (d) 2nd	Pricilla Gomes	Dhaka	B	B	1	Children =2 Spouse 3 Grandchildren=2	1+3+2=6	6	1+2=3
		Pankhaala bari							20	6
89.	Damian Nixon Dias (s/o Ruthmary + Emil Dias) 2nd	Ruthmary Gomes (Pankhaala Bari)	Chittagong	B	B	1 (wife ex.)	Child in BD	1	1	1
90.	Nelson Dias +Evon Dias (s/o Ruthmary + Emil Dias) 2nd	Ruthmary Gomes (Pankhaala Bari)	Chittagong	B	C	2	Children = 2 Spouse = 4 Grandchildren=2	2+4+2 =8	8	2+2=4
91.	Gertrude Henrietta Dias + Patwari (d/o Ruthmary + Emil Dias) 2nd	Ruthmary Gomes (Pankhaala Bari)	Chittagong	B	B	1+1	Children =2 Spouse =4 Grandchildren = 5	2+4+5=	11	1
		Joseph Baburchir Bari							15	10
92.	Nancy Gomes + James Boiragi (d/o Albert Sir Gomes) – 1st	Nancy Gomes Joseph Baburchir Bari	Dhaka	C	B	2	Children=2 Spouses =4 Grandchildren=2	2+4+2=8	8	2+2=4
93.	Poplin Gomes + Gabriel Baroi (d/o Albert Sir Gomes) -1st	Poplin Gomes Joseph Baburchir Bari	Dhaka	C	B	2	Children=2	2+2=4	4	2+2=4
94.	Leonard Gomes+ Mita 1st (s/o Albert Sir Gomes) – 1st	Leonard Gomes Joseph Baburchir Bari	Dhaka	C	C	2	Children=1	2+1=3	3	2
		Mistiri Bari							7	4

95.	Karen Gomes + Stephen Ferdinands (gd/o Peter Gomes, Mistiri Bari-Kolkata, d/o Hugh Gomes) – lives in New York – 3rd	Peter Gomes (Mistiri Bari)	Kolkata & UK	A	A	2	Children 3 + Spouses = 4 Grandchildren = 1 Mother (Dolly Collen Gomes) =1	2+4+1+1 =7	7	2+2=4
	Total family heads = 95		Migration to:	Period of migration	Period of residence in USA				Total family members = 308	Original migrants = 173
	No. of 1st generation migrants = 12		Dhaka = 69	A = 8 B= 65 C= 22	A= 27 B= 51 C= 17					
	No. of 2nd generation migrants = 39		Chittagong & Noakhali = 22+1							
	No of 3rd generation migrants = 44		Khulna & Kolkata = 2+1							

Chapter 3: Statistical information of Migrants in Canada with Padrishibpur roots & heritage

Canada

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Name of the resident (family head) who migrated to Canada/ USA (having origins in Padrishibpur)	Name of the family head (& bari) who migrated from Padrishibpur to Dha/Chitt/Khul/Kolkata/others	Place where family head migrated to, from Padrishipbur	Period of migration from Padrishibpur A= British B= Pakistan C=Banglade sh	Migrated to Canada/ USA A= 30 years & above B= 10 years & above C= less than 10 years	Number of Adult Persons migrated from Bangladesh/ other places	Number of family members increased = children & spouses + grandchildren & spouses + others	Total members of the migrated family (persons migrated + children & spouses + grandchildren & spouses + others	Total family members living with resident /or counted with resident family	Number of original migrants in the family who came together
		Ashirbad Bhavan						Total migrants of the family in Canada =	45	14
1.	Cecilia Romola + Raphael Rozario (late) (d/o Sylvester Gomes) -1st	Cecilia Romola Rozario (Ashirbad Bhavan)	Dhaka	B	A	2	Children 3 + spouses = 6 Grandchildren 10 + spouses = 14-1= 13 + 1=14	2+6+13 +1= 22	1	2+3=5
2.	David Rozario +Sandra Rozario (gs/o Sylvester Gomes) – 2nd	Cecilia Romola Rozario (Ashirbad Bhavan)	Dhaka	B	A	2	Children 3 (-1)	2+2 =4	4	x
3.	Jane+Nank Chatterpaul (gd/o Sylvester Gomes) – 2nd	Cecilia Romola Rozario (Ashirbad Bhavan)	Dhaka	B	A	2	Children 3+ spouse = 4 Grandchildren 1 = 4+1	2+4+1= 7	4	x

4.	Jacqueline Chatterpaul + Raheel (ggd/o Sylvester Gomes) – 3rd	Cecilia Romola Rozario (Ashirbad Bhavan)	Dhaka	B	A	1+1	Children = 1	2+1=3	3	x
5.	John Rozario +Daisy (gs/o Sylvester Gomes)– 2nd	Cecilia Romola Rozario (Ashirbad Bhavan)	Dhaka	B	A	2	Children 4+ spouse = 7 Grandchildren 3	2+7+3 = 12	2	x
6.	Aaron Rozario (ggs/o Sylvester Gomes) – 3rd	Cecilia Romola Rozario (Ashirbad Bhavan)	Dhaka	B	A	1+1	Children =1	2+1=3	3	x
7.	Alex Rozario (ggs/o Sylvester Gomes) – 3rd	Cecilia Romola Rozario (Ashirbad Bhavan)	Dhaka	B	A	1+1	0	2	2	x
8.	Ashley Maria Rozario (ggd/o Sylvester Gomes) – 3rd	Cecilia Romola Rozario (Ashirbad Bhavan)	Dhaka	B	A	1+1	Children =1	2+1=3	3	x
9.	Emelia Rozario (ggd/o Sylvester Gomes) – 3rd	Cecilia Romola Rozario (Ashirbad Bhavan)	Dhaka	B	A	1		1	1	x
10.	Clinton Bulbul Gomes + Himani (s/o Sylvester Gomes) -1st	Clinton Bulbul Gomes (Ashirbad Bhavan)	Dhaka	B	A	1+1	Children =2 + Spouses = 3 Grandchildren = 2	2+3 +2= 7	3	2+1=3
11.	Louisa Gomes + Christian (gd/o Sylvester Gomes) – 2nd	Clinton Bulbul Gomes (Ashirbad Bhavan)	Dhaka	B	A	1+1	Children=2	2+2=4	4	x
12.	Alphonse Kala Gomes + Sheila (s/o Sylvester Gomes) - 1st	Alphonse Kala Gomes (Ashirbad Bhavan)	Dhaka	C	A	2	Children =3	2+3=5	5	2+1=3
13.	Oliver Gomes (late) + Iris Gomes (late) – 1st	Oliver Gomes (Ashirbad Bhavan)	Chittagong	B	A	2	Children =3	2+3=5-2=3	0	2+1=3
14.	Linda Gomes (d/o Oliver Gomes) 2nd	Oliver Gomes (Ashirbad Bhavan)	Chittagong	B	A	1+1	Children=2 + Spouse =3 Grandchildren =1	2+3+1 = 6	6	x
15.	Brian Gomes (s/o Oliver Gomes) 2nd	Oliver Gomes (Ashirbad Bhavan)	Chittagong	B	A	1		1	1	x

16.	Sandra Gomes (d/o Oliver Gomes) 2nd	Oliver Gomes (Ashirbad Bhavan)	Chittagong	B	A	1+1	Children =1	2+1=3	3	x
		Jola Bari						Total migrants of the family in Canada =	5	3
17.	Isaac Gomes + Lila (s/o Clement Gomes) 1st	Isaac Gomes (Jola Bari)	Dhaka	C	B	2	Children =1 + Spouse = 2 Grandchildren=1	2+2+1= 5	2	2+1=3
18.	Hira Gomes + Chloe (s/o Isaac Gomes) 2nd	Isaac Gomes (Jola Bari)	Dhaka	C	B	1+1	Children = 1	2+1=3	3	x
		Bochar Bari						Total migrants of the family in Canada =	9	4
19.	Ivan Robi D'Rozario + Mira (s/o Stephen D'Rozario) 2nd	Stephen D'Rozario (Bochar Bari)	Chittagong	B	A	2	Children 2 + Spouses =4 Grandchildren=3	2+4+3= 9	2	2+2=4
20.	Noel D'Rozario + Romona (gs/o Stephen D'Rozario) 3rd	Stephen D'Rozario (Bochar Bari)	Chittagong	B	A	1+1	Children=2	2+2=4	4	x
21.	Lisa D'Rozario + Vishal Chopra (gd/o Stephen D'Rozario) 3rd	Stephen D'Rozario (Bochar Bari)	Chittagong	B	A	1+1	Children=1	2+1=3	3	x
		Sarker Bari & Stephen Sir er Bari						Total migrants of the family in Canada =	7	6
22.	Pinku Anthony + Champa Sarker (s/o Cynthia & Augustine Subas Sarker) – 2nd	Cynthia & Augustine Subas Sarker (Sarker Bari)	Dhaka	B	B	2	Children 2	2+2=4	4	2+1=3
23.	James Dipok Gomes (s/o Stephen Gomes) 2nd	Stephen Gomes (Stephen Sir er Bari)	Barisal	B	C	2	Children 1	2+1=3	3	2+1=3
		Santa Maria & Panchayat Bari						Total migrants of the family in Canada =	18	12

24.	Constant Bhanu + Shuma Gomes (s/o Robin Gomes) -2nd	Robin Gomes (Santa Maria bari)	Dhaka	C	C	2	Children =1	2+1=3	3	2+1=3
25.	Sumon Gomes + Lisa (gs/o Robin Gomes) – 3rd	Robin Gomes (Santa Maria bari)	Dhaka	C	B	1+1	Children =2	2+2=4	4	2
26.	Carolyn Jennifer + Peter Penheiro (gd/o Vincent Gomes) – 3rd	Vincent Gomes (Santa Maria bari)	Chittagong	B	B	2	Children = 3	2+3=5	5	2
27.	Rajoshree Gomes +Jerome Rodrigues (d/o Bertin Kanu Gomes – 2nd	Bertin Kanu Gomes (Santa Maria Bari)	Dhaka	C	B	2	Children =1	2+1=3	3	2
28.	Pearl Anthony Rozario (d/o Irene Gomes) – 2nd	Irene Gomes (Panchayat Bari)	Dhaka	B	C	1	Children 2	1+2=3	3	1+2=3
		Shikdar bari						Total migrants of the family in Canada =	24	17
29.	Dr. Monica Gomes + Capt Leonard Sanu Gomes (late) (d/o William Gomes) – 2nd	William Gomes (Shikdar bari)	Dhaka	B	C	1	Migrated alone	1	1	1
30.	Christina Tina + Ronnie D'Rozario (gd/o William Gomes) – 3rd	William Gomes (Shikdar bari)	Dhaka	B	B	2	0	2	2	2
31.	Rupert Gomes + Sue (s/o Benjamin Gomes) – 2nd	Benjamin Gomes (Shikdar Bari)	Kolkata	A	A	2	Children =3 + Spouses 1=4 Grandchildren=1	2+4+1=7	4	2+1=3
32.	Anjan Gomes + Shondhya (s/o Benjamin Gomes) – 2nd	Benjamin Gomes (Shikdar Bari)	Kolkata	A	A	2	Children =2 + Spouses=3	2+3=5	3	2+2=4
33.	Christine Gomes + Melroy De Souza (gd/o Benjamin Gomes) – 3rd	Benjamin Gomes (Shikdar Bari)	Kolkata	A	A	1+1	Children =1	2+1=3	3	x
34.	Richa Gomes (gd/o Benjamin Gomes, d/o Anjan Gomes) – 3rd	Benjamin Gomes (Shikdar Bari)	Kolkata	A	A	1+1	Children=0	2	2	x
35.	Diana Gomes + (gd/o Stanislaus Gomes) – 3rd Edmonton	Stanislaus Gomes (Shikdar Bari)	Kolkata	A	B	2	Children = 1	2+1=3	3	2+1=3

36.	Molly Aloysius (d/o Clifford Aloysius) + Lucas Sarker (British Columbia) 3rd	Aloysius Gomes (Shikdar Bari)	Dhaka	B	B	2	Children = 2 + Spouse =3 Grandchildren 1	2+3+1 = 6	6	2+2=4
		Fr. Leo Gomes Bari						Total migrants of the family in Canada =	7	4
37.	Noreen Gomes + Eugene Mercer (d/o Bro Sebastian Gomes) 2nd	Bro Sebastian Gomes (Nora Gomes) Fr. Leo Gomes Bari	Chittagong	B	A	2	Children 3 + Spouses=4 Grandchildren=1	2+3+1= 6	6	2+2=4
38.	Karen Mercer (gd/o of Bro Sebastian Gomes) 3rd	Bro Sebastian Gomes (Nora Gomes) Fr. Leo Gomes Bari	Chittagong	B	A	1	0	1	1	x
		Halder Bari						Total migrants of the family in Canada =	9	5
39.	Romola Gomes (w/o Lazarus Gomes) 1st	Lazarus Gomes (Halder Bari)	Dhaka	B	C	1	Migrated alone	1	1	1
40.	Janet Gomes +Probin Dias (d/o Lazarus Gomes) 2nd	Lazarus Gomes (Halder Bari)	Dhaka	B	A	2	Children =2	2+2=4	4	2
41.	Sylvia Gomes +Romano Penheiro (d/o Lazarus Gomes) 2nd	Lazarus Gomes (Halder Bari)	Dhaka	B	C	2	Children = 2	2+2=4	4	2
		Chokhidar bari						Total migrants of the family in Canada =	10	9
42.	Alistair Gomes + Jenny (s/o Cecilia Gomes) – 2nd	Cecilia Gomes (Chokhidar bari)	Chittagong	B	C	2	Children = 3	2+3=5	5	2+3=5
43.	Sharon Gomes + Joseph Gonsalves d/o Cecilia Gomes – 2nd	Cecilia Gomes (Chokhidar bari)	Chittagong	B	B	2	Children = 3	2+3=5	5	2+2=4

		George Nelson Bari						Total migrants of the family in Canada =	16	10
44.	Lloyd Nelson + Diana (s/o Wilfred Nelson) 3rd	George Francis Nelson(Gomes) (George Nelson Bari)	Dhaka	A	B	2	Children 3+ Spouse = 4 Grandchildren 1	2+4+1= 7	4	2+3=5
45.	Davina Nelson + Edward (gd/o of Wilfred Nelson) 4th	George Francis Nelson(Gomes) (George Nelson Bari)	Dhaka	A	B	2	Child =1	2+1=3	3	x
46.	Richard Nelson + Elizabeth (s/o Clarence Nelson) 3rd	George Francis Nelson(Gomes) (George Nelson Bari)	Dhaka	A	A	1+1	Children 0	2	2	2
47.	Rose Nelson + Arnold Anthony (d/o Clarence Nelson) 3rd.	George Francis Nelson(Gomes) (George Nelson Bari)	Dhaka	A	A	2	Children 1+ Spouse = 2 Grandchildren 3	2+2+3 =7	7	2+1=3
		Benir Bari						Total migrants of the family in Canada =	13	9
48.	Maclean Belasso +Natasha (gs/o Peter Paul Gomes) – 3rd Montreal	Peter Paul Gomes (Benir Bari)	Chittagong	B	A	2	Children 2	2+2=4	4	2
49.	Ophelia Belasso + Anthony (gd/o Peter Paul Gomes) – 3rd Montreal	Peter Paul Gomes (Benir Bari)	Chittagong	B	A	2	Children 2	1	1	2
50.	Sophia Gomes Chowdury (Moushumi) (d/o Arnold Arun) + Shak Shalin Chowdury Milton ON – 3rd	Peter Paul Gomes (Benir Bari)	Chittagong	B	B	2	Children 3 + Spouse =4 Grandchildren=2	2+4+2= 8	8	2+3=5
		Nobu Shaheber Bari						Total migrants of the family in Canada =	30	15

51.	Yvonne Gomes (d/o Claude Gomes) + Stanford Pereira 2nd	Claude Gomes (Nobu Shaheber Bari)	Dhaka	B	C	1	Migrated alone	1	1	1
52.	Aaron Pereira (gs/o Claude Gomes) 3rd	Claude Gomes (Nobu Shaheber Bari)	Dhaka	B	C	2	Children =2	2+2=4	4	2+2=4
53.	Avila Pereira (gd/o Claude Gomes) 3rd	Claude Gomes (Nobu Shaheber Bari)	Dhaka	B	C	1		1	1	1
54.	Mildred Gomes (d/o Claude Gomes) +Allen Thomas 2nd	Claude Gomes (Nobu Shaheber Bari)	Dhaka	B	B	2	Children = 3	2+3=5	5	2
55.	Clotilda Gomes (late) (d/o Claude Gomes) + Derrick Gonsalves 2nd	Claude Gomes (Nobu Shaheber Bari)	Dhaka	B	B	2	Children=1	2+1=3-1=2	2	2
56.	Terence Polacco (s/o Betty Polacco) – 2nd	Betty Gomes Polacco (Nobu Shaheber Bari)	Chittagong	B	A	1		1	1	1
57.	Darryl Polacco + Lisa (s/o Betty Polacco) – 2nd	Betty Gomes Polacco (Nobu Shaheber Bari)	Chittagong	B	A	1+1	Children = 2	2+2=4	4	1
58.	Bernadine Polacco (d/o Betty Polacco) – 2nd	Betty Gomes Polacco (Nobu Shaheber Bari)	Chittagong	B	A	1+1		2	2	1
59.	Richard Polacco + Barbara (s/o Betty Polacco) – 2nd	Betty Gomes Polacco (Nobu Shaheber Bari)	Chittagong	B	A	1+1	Children = 3	2+3=5	5	1
60.	Angelique Polacco (d/o Betty Polacco) – 2nd	Betty Gomes Polacco (Nobu Shaheber Bari)	Chittagong	B	A	1+1	Children = 2 + Spouse = 3-1 Grandchildren=1	2+2+1=5	5	1

		Paschimer Santa Bari						Total migrants of the family in Canada =	16	10
61.	Rebecca Gomes (w/o Jerome Gomes) 1st	Jerome Gomes (Paschimer Santa Bari)	Chittagong	B	A	2 (-1)	Children 4 + Spouses 3 = 7 Grandchildren = 5	1 +7+5=13	1	2+3=5
62.	Babu Benedict Gomes+Teresa (s/o Jerome Gomes) 2nd	Jerome Gomes (Paschimer Santa Bari)	Chittagong	B	A	1+1	Children 1+	2+1=3	3	x
63.	Baby Florence Gomes+Maybert Gomes (d/o Jerome Gomes) 2nd	Jerome Gomes (Paschimer Santa Bari)	Chittagong	B	A	2	Children 2	2+2=4	4	2
64.	Collins Michael Gomes (s/o Jerome Gomes) 2nd	Jerome Gomes (Paschimer Santa Bari)	Chittagong	B	A	1		1	1	x
65.	Mark Richard Gomes +Jennifer (s/o Jerome Gomes) 2nd	Jerome Gomes (Paschimer Santa Bari)	Chittagong	B	A	2	Children =2	2+2=4	4	x
66.	Rocky Gomes (s/o Lyon Gomes) + Shelley 2nd	Lyon Gomes (Paschimer Santa Bari)	Khulna	B	B	2	Children 1	2+1=3	3	2+1=3
	Montreal, Winnipeg & other places							Total migrants of the family in Canada =	42	31
67.	Ranu Rozario (d/o Benedict Gomes) w/o Sushil (Montreal) 1st	Benedict Gomes Tangrakhali	Dhaka	C	B	2	Children 2	2+2=4	4	2+2=4
68.	Lazarus Gomes (Matibhanga) +Teresa 1st	Lazarus Gomes Matibhanga	Padrishibpur	C	B	2 (-1)	Children 3 + Spouses =6 Grandchildren = 5	1+6 +5=12	1	2+2=4
69.	Shantona Gomes (d/o Lazarus Gomes) + Solomon Gomes 2nd	Lazarus Gomes Matibhanga	Dhaka (she sponsored her family	C	A	2	Children =2	2+2=4	4	2+2=4

70.	Dilip Gomes (s/o Lazarus Gomes) + Julie -Matibhanga 2nd	Lazarus Gomes Matibhanga	Padrishibpur	C	B	2	Children=2	2+2=4	4	x
71.	Bondona Gomes (d/o Lazarus Gomes) + Louis- 2nd	Lazarus Gomes Matibhanga	Padrishibpur	C	B	2	Children=1	2+1=3	3	x
72.	Ricky James D'Costa (s/o Eric D'Costa) 2nd (Manitoba)	Eric D'Costa (Lovelyr Bari)	Dhaka	B	C	2	0	2	2	2
73.	Tipu Michael Rozario (s/o Francis Foru D'Rozario) + Jacqueline Tina Gomes (d/o Buli & Rosemary), gs/o of Philip D'Rozario 3rd – (London ON)	Philip D'Rozario (Chowkidar bari, Araibeki	Dhaka	B	C	1+1	Children=1	2+1= 3	3	2
74.	Apurbo Gregory Rozario (s/o Foru) + Lita Florence Costa gs/o of Philip D'Rozario 3rd – (Yellow Knife, CA)	Philip D'Rozario (Chowkidar bari, Araibeki	Dhaka	B	B	1+1	Children=2 + Spouse = 3	2+3=5	5	2+2=4
75.	Disha Gomes (d/o Dipesh Gomes, Mistiri Bari) + Shoshi Sylvester Peris - Winnipeg – 2nd	John Leo Gomes (Mistiri Bari)	Dhaka	C	C	2	0	2	2	2
76.	Mary Christina Gomes (d/o Rita Coelho) + Julius Gomes –Winnipeg – 2nd	Rita Coelho + Bro. Bernard Gomes (Coelho bari, Krishnokati)	Dhaka	C	C	2	Children = 1	2+1=3	3	2
77.	Boniface Gomes (s/o Rita Coelho) + Catherina Gomes – Winnipeg – 2nd	Rita Coelho + Bro. Bernard Gomes (Coelho bari, Krishnokati)	Dhaka	C	B	2	Children =2	2+2=4	4	2
78.	Polash Das + Pola (s/o Philomena Gomes+Anil Das, Faridpur) Montreal – 2nd	Philomena Gomes Matibhanga (Dhollar Bari)	Dhaka	B	B	2	Children=2	2+2=4	4	2
79.	Anik Maximillian Gomes (s/o Linus Gomes, gds/o Ferdinand Gomes) + Jui Vancouver) – 3rd	Ferdinand Gomes (Lal John Sir Bari)	Dhaka	B	C	1+1	0	2	2	2

80.	Francine McIntyre Wheatley (d/o Gilbert Wheatley & Irene) gd/o Robert Paul Wheatley – 3rd	Robert Paul Wheatley (Wheatley house, next to Church) Gilbert Wheatley (son) lived in Padrishibpur	Kolkata	A	A	1 (single)	0	1	1	1
	Total family heads = 80		Migration to:	Period of migration	Period of residence in Canada				Total family members = 251	Original migrants = 149
	No. of 1st generation migrants = 9		Dhaka = 44	A = 10 B= 56 C= 14	A= 42 B= 23 C= 15					
	No. of 2nd generation migrants = 43		Chittagong = 25							
	No of 3rd generation migrants = 27		Barisal, Khulna, Padrishibpur = 5							
	No of 4th generation = 1		Calcutta = 6							

Chapter Four: Deceased Persons who made contribution

1. George Francis Nelson (father of Rev. Fr. Bertram Nelson)

Written by Lloyd Nelson (grandson of George Francis Nelson)
Toronto, Canada

George Francis Nelson, my late grandfather was born in 1908 in the village of Padrishibpur parish, Bakerganj UZ, Barisal District. Padrishipur was an old Catholic diocese that begun in 1764 in a rural area of Barisal district, Bangladesh. My grandfather, like his father before him, was born into a farming family and like his father Late George Pinky Gomes was a handsome looking man, fair complexioned with grey colored eyes. The family claimed Portuguese ancestry which was the reason for the light eyes and fair skin color. As far as I know he had three brothers and two sisters, and his father had passed away when George was quite small. His big brother was a farmer in his mid-forties and ran the family.When George was in his teens due to his rebellious nature and constant scrapes he got into, to maintain peace in the family, the Catholic priest at that time took George when he was 16 to Kolkata (then called Calcutta). He worked there for some time with a Canadian Priest and became his chauffeur. He also learned to read and write English. Later he joined the British Indian Railway where he progressed to be "Guard" and changed his name to George Francis Nelson. Due to his good looks, height and fair skin, he blended very well with the Anglo Indian community who dominated the British Indian Railways and also got on well with his English bosses. He also picked up Hindi and had the opportunity to travel the breath of India in this role.

He married my grandmother, Rosie Ann Gomes who was also from the same village, Padrishibpur in his early twenties and they had seven children – 5 sons and two daughters. They moved to the old railway colony in Dhaka at that time and his sons went to St. Gregory's School. My grandfather did not enjoy family bliss long as unfortunately, Rosie Ann passed away when her youngest son Frank was a year old due to snake bite poisoning. A telegram was sent to my grandfather who was away but by the time he arrived back it was too late. My grandfather was devastated and kept young Frank in the village with his family to look after him. Unfortunately, baby Frank passed away when he was two. As there was no one to look after the 6 children, my grandfather for some time kept all his children with him in a rail wagon which was hooked to whichever train he was travelling in India with and which they used as a rolling home. He never married again. According to my aunties and uncles, this was some of the great times they remember of being all together. At one point, he admitted his 4 sons (Mark, Clarence, Wilfred and Bertram) into Goethals Memorial School, Kurseong, India and 2 daughters (Florence and Myrtle) into a convent school in Assam, India.

When British India broke up into India, East Pakistan and West Pakistan, my grandfather joined the then East Pakistan Railway. He retired as a Transshipment Foreman from the East Pakistan Railways in the 1960s. On retirement he bought a home near Bishop's Place, Sonadanga Main Road, Khulna and lived there for many years with his son Clarence and his family. Later he moved to Dhaka and bought a property in Kafrul, Dhaka where he lived until he passed away at the age of 72 (in 1980).Two of his daughters emigrated, Florence to Canada and Myrtle to Germany. His eldest son Mark Nelson worked as a teacher at St. Placid's school, Chittagong, Wilfred Nelson worked as a teacher and later became Vice Principal of Dawood Public School, Jessore and later opened a private school in Banani, Dhaka. Clarence worked in the LMD at Ctg. and Khulna and later with SGS. His youngest son, Bertram Nelson, born on 16/05/1934, joined Holy Cross Congregation, became a Catholic priest on 27/02/1963 and served many parishes in Chittagong Diocese untill his death on 03/05/2008. He was burried in Chittagong Cemetery. All his children have now passed away with the exception of Aunty Florence who is living in Mississauga, Toronto. He is survived by three grandsons Fernando, Richard and myself Lloyd Nelson and two great grandsons Frank and Kevin Nelson. Frank's son Frederick is the youngest Nelson boy.

George Francis Nelson had travelled to many countries, but I know for certain that he travelled to Italy for the Ordination of his son, Rev. Bertram as a priest in Rome on 17th February 1963. He spent time with his youngest daughter Aunty Myrtle in Germany and his daughter Aunty Florence in Montreal, Canada. He was a very social man and had a very wide circle of friends and acquaintances. All the neighbors knew him, and people were always dropping into his Khulna and Dhaka residences to see him. He had a bicycle and would always be visiting friends and acquaintances in Old Dhaka. He was very close to the Catholic Church and planted most of the coconut trees that you see on the campus of Holy Spirit Major Seminary, Banani, Dhaka. My grandfather knew many of the priests at the seminary and always had a very good relationship with the clergy. He was very particular on saying the rosary with the family and as children I remember, that when we were together, we said the rosary every evening. I remember that in Khulna he went to morning mass every day and in Dhaka he visited the Banani Seminary often. He never failed to say the angelus. A memorable experience was when we cousins were going with grandfather to Padrishibpur by launch from Barisal, he made us all say the rosary in the launch while the Muslim people watched in amazement. One of them invited my grandfather to stay the night at his house. The next day we took another launch to Padrishibpur. This was in 1974.

As a person he was always interested in inventions. He was very patriotic and loved what is now Bangladesh. He would sing Dhano Dhanye Pushpo Bhora. He was a very independent and proud man. To me and my cousins he will remain a "most unforgettable character".

2. Benjamin Franklin Gomes (Shikdar Bari, Padrishibpur)

Written by Rupert Gomes (s/o Benjamin Gomes) Toronto, Canada

Benjamin Franklin Gomes was the seventh child of Manuel and Virginia Gomes. He was born on November 18, 1919 in Padrishibpur, Barisal, Bangladesh. After completing his schooling in Padrishibpur and passing Matriculation in 1940 from St. Alfred's High School, he moved to Calcutta (now Kolkata) to study at St. Xavier's College.

Thereafter, he decided to settle in Calcutta with his parents and brothers Albert and Medlicot who also moved to Calcutta. They lived in Creek Lane. In 1946, he married Daisy Veronica Perris in St. Teresa's Church, Calcutta. They had four children - Mabert Arun, Rupert Ranjit, Herbert Anjan and Egbert Swapan.

Benjamin joined the West Bengal Police department as a Sub-Inspector of Police. During his service in the Police Department, he was posted as Officer-in-Charge of various police stations mostly in the Purulia district. Around 1970, he was promoted to Inspector of Police and posted as Officer-in-Charge of the West Bengal Police Control Room situated in Writers' Building, Calcutta where he served until his retirement in 1979. In his work life, he served as a principled and dedicated officer in the police force, and was a pride to his family.

Although he lived in Calcutta, India for most of his life, he always kept close link with his family members in the then East Pakistan, especially with his brothers Aloysius, George, William, and Sylvester Regin. After the independence of Bangladesh, many of the family members visited Calcutta and renewed their bonds with the family members who had settled there. One of his important legacies is that he kept alive some of the traditional delicacies of his homeland Padrishibpur, such as 'dodol' which he made during Christmas and even taught his daughter-in-law the process of making this unique Padrishibpur 'pitha'. 'Elish mach' was another specialty that reminded him of his own village and his life there in southern Bengal with its big rivers.

In 1985, Benjamin travelled to Canada to visit his son Rupert Ranjit and his family. During this time he also visited Montreal, Ottawa and New York and met many of his extended family and then returned back to Calcutta after a year. He peacefully passed away in 1988, and left behind a legacy of strong family bonds, a lover of culture and sports, and an inspirational role model to his younger generations.

3. Dr. Bartholomew Medlicot Gomes (Shikdar Bari, Padrishibpur)

Written by Jude Pijush Gomes (s/o Dr. Medlicot Gomes), Hong Kong

Dr. Bartholomew Medlicot Gomes, known as Medin by his family members, was the youngest among the ten children of Manuel and Virginia Gomes of Shikdar Bari, Padrishibpur. He was born on 7 June 1929 in Padrishibpur and studied in St. Alfred's high school. He passed his Matriculation in first division from St. Alfred's high school in 1945 and went on to St. Xavier's College in Calcutta where he did his ISc (Intermediate of Science). He studied medicine at RG Kar Medical College, Calcutta and got his MBBS degree from there in 1956. He married Leena Gomes, daughter of Christopher Gomes from Dhaka Atharogram on 27 December 1961. They had three sons, Christopher Tapash, Gerald Subroto and Jude Pijush.

Late Dr. Bartholomew Medlicot Gomes, a pioneering spirit and beacon of hope, was the first doctor from his village of Padrishibpur, Barisal. Growing up in a village where basic healthcare facilities were almost non-existent, he witnessed first-hand the dire consequences of inadequate medical care. This ignited his passion for medicine. Despite numerous obstacles including lack of educational colleges, mobility limitation, loss of his father at a young age, and financial constraints, he went on to pursue medical studies, which was funded mostly by his brother Albert Gomes and himself, and excelled academically. His journey of becoming a doctor was not just a personal triumph but also a monumental breakthrough for his village. This achievement was a source of immense pride for the entire family and an inspiration for many others in the community to pursue education with renewed vigor. Late Dr. Gomes contributed immensely to serving the society, working in the rural parts of Central India, which were bereft of minimal basic necessities. He worked in Madhya Pradesh, as well as Calcutta, Assam and Uttar Pradesh, serving mostly in the remotest parts of India, often living all by himself in solitude. His relentless pursuit of education led him to acquiring a specialization in Leprosy, late in his career. Though a dreaded disease with social stigma, his unwavering commitment led him to working with this secluded and outcast community of lepers, and healing them.

Despite a life of solitude, Late Dr. Gomes was a very humorous soul, extremely well read man with varied interests. He was equally passionate about sports, general knowledge, geography, world history, space exploration as well as movies. Despite the absence of access to encyclopedias and libraries where he lived, he penned extremely informative and interesting note books on his subjects of interests, which were a gem of knowledge. He was an avid traveler, had a good hand in driving, a connoisseur of great food and an extremely talented chef! He died on 7 June 1994 in Calcutta and was buried in his family grave at Tullyganj cemetery. Late Dr. Gomes's journey from a small village boy to a revered doctor is a testament to the power of determination and altruism. His contributions have not only improved the lives of the

communities he served, but also paved the way for a brighter, healthier future for generations to come. His life's work remains a source of inspiration and a guiding light for his family and his erstwhile village. His relentless pursuit of education and unwavering commitment to serving others, specially the economically downtrodden, transformed the lives of countless individuals he served and interacted with.

Chapter Five: Interviews of Migrants in USA and Canada

1. Interview: Cecilia Romola Rozario (Toronto, Canada)

1.1 Discuss the reasons you left your homeland and came to a new land and future? You can refer to migrating either from the urban cities or from the village of Padrishibpur.

My elder brother sponsored me, he came 10 years earlier; he was brought here by a lay missionary Miss Yolanda. I came in 1970 with my husband and 3 children. The sponsorship helped for my immigration process. Before coming to Canada, I left Padrishibpur and came to Dhaka for marriage. I lived in Dhaka for 6 years with my husband and children and then came to Canada. I first came to Quebec, because my brother and his family lived there. After quite a long while, my family and I shifted to Toronto.

At first, I felt less happy in this new land, I was sad because I left my homeland and missed home. First we stayed in an apartment and did not really like this life. Later when we bought our own apartment, and started mixing with people, then I liked this land. About why I came to this country, I did not too many expectations; just that my children will be able to study here in a good country. The cold climate was very difficult; especially to dress up the children was very problematic when they wanted to go out in the winter to play. I had to go to French school to study French, and did class for 5 months, but learned only little, it is a difficult language.

1.2 Can you describe the pattern of migration in your family, places family migrated to, period of migration, how migration affected your family, home, lands, new generation?

My elder brother Oliver sponsored me and Bulbul, then I sponsored Dominic and Kala, and later Kala & Sheila sponsored Isaac & Lila. The sponsorship process requires us to show assets that we can take care of them for 10 years. Most of us came to Canada directly from either Dhaka or Padrishibpur.
About how it affected our families back home, those who came to Canada gave POA to those family members in BD for our ancestral land and house, but it was sold and the money was not used properly: maybe they should have invested in something else instead of using it up. Those who remained in the village are neither well off nor in poor condition.

1.3 Describe how you see yourself as a senior migrant, what is your situation and what do you expect from your life here?

I am satisfied, involved with church, have good relations with newcomers from BD, have several groups and my time is well spent. The money I get from the govt. helps me; I can spend plus help others. My children are established, and I am satisfied with them. I get good support for my health, my health is fine, no depression, I maintain my own home, stay by myself quite well independently, get govt. pension, it covers in maintaining my home, living by myself plus vacation. No fear or anxiety about old age, but have a feeling it will be good.

1.4 Share your feelings and emotions, struggles and challenges that you faced and describe how you adjusted to your new country, culture, and living style.

For learning language, both English and French, I had to struggle; I worked in jewelry manufacturing as quality control, learned on the job experience, I had job satisfaction, it was not a suppressing environment, they respected me as a good worker. I never had conflict with neighbors, no problem in the workplace. But we had to go to work, both husband and wife, early in the morning, children went to school by themselves, I was worried about children whether they got in the bus properly, from work they allowed me to call the children and take their information. The company where I worked in Montreal, they brought me to Toronto. That's how I moved here.

The weather forced me to change my traditional clothes, had to wear pants and jackets, not sarees, but continued to wear sarees for evening wear, festivals etc. everyone appreciated, went to parties with my husband wearing sarees, they really like it. Sometimes I wore saree to my work in summer, they were amazed how we drape one piece of cloth. I had to demonstrate how to wear this saree, it is a beautiful art.

1.5 What new behavior, attitudes, skills, knowledge, and values did you learn or acquire in your new land and how were they helpful or hindering for your future and for your new generations?

I like the food of this country – pizza, MacDonald, steak, Italian meal. I like to follow the rules and discipline of this society, that's why I can live independently. I have a secure future – getting govt. benefits as a senior, I feel secure – this is the golden age.

1.6 What do you see as your achievements, what helped make your lives successful, and what you had to sacrifice or compromise on?

I had to work hard, I had to sacrifice, husband and children had to sacrifice, do hard work, perseverance. Leaving behind my homeland was the biggest compromise I had to make. Now I have my own home, children have their own homes; these are my achievements in coming to a foreign country.

In my family life – I had struggles, had to compromise, learned how to handle children in this culture, cooking cleaning in a different way, learned all this from friends, how to mix, talk, behave – my friend circle was quite top level, I learned a lot from them, coming from the village. I was not involved with any groups, but learned from my friend circle.

1.7 What do you miss most from your homeland, Padrishibpur & why? How do you ensure that your traditional values, language, culture, religious and moral values and identity are preserved and passed on to the new generation?

I like hosting and cooking – and still make dodol, vindaloo, malai curry, temporadu, morich tanga which are traditional dishes from Padrishibpur. I like paying respect to the elders, not to argue with elders – I taught this to my children, but this is missing in this culture; not calling the elders by their names, which is done here; my children learned our way, to address our elders as mashi, pishi, kaku, jetha, and not by their first names like in this culture. My children also wear and love our costumes and outfits, like sarees, punjabis etc, joining Pohela Boishakh festivities.

1.8 What do you know of the history of Padrishibpur, its older generations, their way of living, their values, their vision and goals for their future generations? Can you share some of the stories and examples you have heard or seen of life in Padrishibpur in the olden days?

I had heard of Gomes Shaheb house near the church, they were very wealthy, and spent lavishly. They went hunting, they used to welcome guest with ceremony, they used big boats with drums and singing, food etc. Christians used to live proudly, and Muslims used to respect them, now this has changed due to the times. No drums or music was allowed near the church, people had to walk with respect, no singing or drums was not allowed.

1.9 What does 'being a Padrishibpurian' mean to you? In what ways do you identify and maintain ties with your village home, people of Padrishibpur and its culture and values?

I am proud to be a Padrishibpurian, they are hospitable and kind, like to serve people, and I want to keep this way of interacting with others. I hang on to the special foods, pithas of our village.

1.10 Do you have any suggestions on how Padrishibpur can remain a strong basis of your cultural and family identity and how the future of Padrishibpur can shine brighter?

I want that they should put stress on education, though some cannot afford. And I advise the young group not to smoke or drink, but take care of their health and future.

2. Interview: Clinton Bulbul Gomes (Toronto, Canada)

2.1 Discuss the reasons you left your homeland and came to a new land and future?

I was sponsored by my brother Oliver in 1975. At that time I was working in WHO for small pox eradication programme. Sheikh Mujib was killed at that time, though I was not involved in politics. not in active politics at any time. I came to Quebec, Montreal. As a young student during the movement of 1969-70, I was in Notre Dame college. During 1971, the college closed and I came back to the village. Due to the 1970 tornado, CORR had lot of work in that area, so I also worked in this relief work. At that time, I heard Shadhin Betar radio; the military had come to these areas, so the Hindus came to Padrishibpur as refugees. I wanted to do something, and together we (4 friends) decided to go and join Mukti Bahini. From our village several of us including me participated as a member of the Mukti Bahini. After independence, I went back to Notre Dame college and gave my 2nd year intermediate.

I felt very bad when leaving my country, but the main reason why I came to this country was that the economy of the country was very bad at that time (after independence), so many young people started to leave BD for middle east, India, so I asked dada to sponsor me and came here.

When I first came here, I had to do odd jobs as I had no training. Then I learned car maintenance and got a decent job.

2.2 Can you describe the pattern of migration in your family, places family migrated to, period of migration, how migration affected your family, home, lands, new generation?

My father, Sylvester Gomes was from Bhawal Dhaka, and after his studies in Calcutta, he came to Padrishbpur with his friends and my grandfather arranged for him to marry my mother. After marriage my father stayed in Calcutta, but after partition in 1954-55, he came back to BD and settled in Padrishibpur, where we were born and studied there. My eldest brother went to Ctg after matric, from Ctg he came to Canada. A lay missionary Miss Yolande sponsored him and his wife, and he sponsored me. I was not so eager to come here, but decided to follow my family.

2.3 Describe how you see yourself as a senior migrant, what is your situation and what do you expect from your life here?

You can be successful by your work or education on your own, no one can put you down, you can make yourself better and be successful, no barriers. I had some family problems, but I am very happy, my son is successful, my daughter is happy. My health is still good, but I get many types of benefits that we would not get in BD, like getting medicine free, pension, home mortgage paid off, I enjoy life more. Though I don't visit much anymore, I miss my culture, was fully involved before, now I have some family commitments like looking after grandchildren, but enjoy doing this.

2.4 Share your feelings and emotions, struggles and challenges that you faced and describe how you adjusted to your new country, culture, and living style.

For me this was a new country. new culture. Back home I enjoyed every night, but here it was limited, only on weekends. With family life, enjoyment and gatherings were less, we had lot of responsibilities, very few BD families, our friends also had family. We did not have free mixing with whites, except missionaries, children had white friends and neighbours, but we never got discrimination from the whites, not even in job; in top level there was some discrimination, in our level we had to be good to succeed; in schools, training, we got support from teachers and friends. I had to struggle, for two years, did odd jobs, did training on auto mechanics from technical school, then got apprenticeship, and later a full-fledged mechanic. I did this job for nearly 50 years, it helped me to live life comfortably. I stayed in Montreal, then in 1985 came to Ontario; my children studied here, went to Catholic schools, studied in English medium.

2.5 What new behavior, attitudes, skills, knowledge, and values did you learn or acquire in your new land and how were they helpful or hindering for your future and for your new generations?

It takes lot of time to study to become a doctor, or engineer, here if you do technical schools, then you can get mechanical jobs, and do good jobs with less time, but you can't do higher education, so our people did not like to do technical education. Parents have to look after their children. especially girls, not let them go astray, not do drugs, there is also help for children with problems; there is this problem here too among Toronto Christian families. In BD we know about our children, here we have to keep our mind and eyes open.

2.6 What do you see as your achievements, what helped make your lives successful, and what you had to sacrifice or compromise on?

My family, especially my dada Oliver, my sister Romoladi and bro in law Raphael, taught us how to do things, like maintaining time and courtesy, how to do some things, and I passed it on. God has made me successful, but I had to struggle when we bought my home, but also got help from the family. My aspiration was to be car mechanic. Education is very important in this country, whatever education I brought with me from BD was helpful, otherwise I couldn't do mechanic work; I had friends who were engineers, they helped me get good jobs.

2.7 What do you miss most from your homeland, Padrishibpur & why? Mention what you have preserved from your homeland in this new land and why.

I miss my Padrishibpur society, would get together, sing together, company of my friends, relatives. I miss my deshi food, all types of vegetables, bhorta, fish. I miss my

culture, song, music; everyday, we would sit with signing, miss cultural shows, organizing shows, my wife was not much cultural, so we could not involve children in music. I put them in Bangla language school, but could not continue.

2.8 What do you know of the history of Padrishibpur, its older generations, their way of living, their values, their vision and goals for their future generations? Can you share some of the stories and examples you have heard or seen of life in Padrishibpur in the olden days?

I studied upto matric in Padrishibpur, so I have some knowledge of the older generations. Before partition Christians were powerful, and Muslims were respectful towards us, priests were landlords, Christians were employed by priests, Nayeb moshai collected tax, Guru moshai was teacher in govt primary school there, Peda (messenger), Peon Gregory, Post master Philip D'Costa, Manuel Shikdar were jamindars of limited land (7-8 projas), Ali Chand (Alexander) mohori (who writes dalil), Moktar (worked in judge court, small lawyer), daktar bari (homeo doctor), govt doctor was also there (Hindu doctors). During the Pak period zamindar system was abolished, missionaries released the lands, feudal lands were abolished, Fazlul Huq abolished this system. During British period people went to Calcutta and Ctg for work, most worked in restaurants, courtesy jobs, some worked as cooks in ships. One group worked in railways, Mr Brown worked as wireless operator in ship, Moktar bari Martin was PA of Gov., Philip (Mistiri bari) owned European style restaurant in Calcutta.

Near the church, there were two old cannons, Fr. Lecavalier sold them off, maybe it was a fort. Christians at one time were called 'bordar' (borkundas – irregular soldiers, mercenaries, during war they used to be called, they had guns (with gunpowder) went to kill wild pigs or to protect or fight for land. Muslims would call us by this name – 'bordar naki'? During Pak period when zamindar protha was dismantled, Christians became weak, so they went out for jobs. The Canadian missionaries came here and high school was started in 1933, and many students went for higher education to Calcutta.

In those days there was 'Ramur pala'which was actually named 'Jesur Shorgorohon geeti natyo' written by a Hindu priest or thakur – Kaliproshonno Chakrovorty, the music or sur was given by another Hindu thakur also Kaliproshonno – and it was sponsored by Philip D'Costa (Romola di's Nana), a handwritten song book was given by Ramu dadu to Bulbulda, which is preserved here in Romoladi's house, though in very poor condition and the writing is blurred due to time and use.

2.9 What does 'being a Padrishibpurian' mean to you? In what ways do you identify and maintain ties with your village home, people of Padrishibpur and its culture and values?

For me it means 'gaan bajna', old songs, have to sing and keep them alive, such as the song of 'Srimonto' written by and music given by Sylvester sir, to record it and post it so others know it, he wrote it in 1958 for silver jubilee of St Alfred school, and it was sung for other jubilees, it is published in magazines, and it should be preserved. I want more people to be graduates, we should hold on to our culture and specialty such as, wedding culture, songs, festivities, everybody joining together, this should be kept, express our voice together.

2.10 Do you have any suggestions on how Padrishibpur can remain a strong basis of your cultural and family identity and how the future of Padrishibpur can shine brighter?

We should keep link with our village and culture, don't know if the 2nd generation will keep it, we support education there, our goal is to promote education to at least up to high school, we support the poor families. We tell our kids to continue, but not sure who will continue this practice. We also need to do Ramur pala, kirton, borodiner gaan, we would do before, but now can't do, as we need practice.

3. Interview: David Rozario (Toronto, Canada)

3.1 Discuss the reasons you left your homeland and came to a new land and future?
We left East Pakistan in July 1970 with our family of five and migrated to Montreal, Quebec. We left primarily with the hopes for a better life in Canada that provided better opportunities for a good life such as a better education and career opportunities, better health care, and a stable economy. My Uncle, Oliver Gomes and his wife, Iris Gomes, (both born in Pardishibpur) were the first in our family to leave East Pakistan and settle in Montreal, Canada and they sponsored us to live in Canada. My father once told me that one of the reasons we left Bangladesh was because there was prejudice, racism and numerous disadvantages of being a Christian in Bangladesh- a predominantly Muslim country. He told me how as an employee he was often overlooked for a promotion due to him being Christian. We also left East Pakistan due to political unrest with West Pakistan which became a full out war just a year after we migrated to Canada. My Uncle, Clinton Bulbul Gomes, who lived in Pardishibpur at the time, was a freedom fighter in the war against West Pakistan. He too left what became Bangladesh and migrated to Canada shortly after their independence in 1971.

3.2 Can you describe the pattern of migration in your family, places family migrated to, period of migration, how migration affected your family, home, lands, new generation?

First in Canada was my mother's eldest brother Oliver Gomes, his wife Iris Gomes, his children. They sponsored our family in 1970 and shortly after we sponsored my Uncle Clinton Gomes and members of my Father's family who were from the Nagori district. We all lived in the Montreal area until the recession of 1982 when my mother's employer moved to Toronto, Ontario. Hence, we all moved and lived in the Toronto area and have lived here since 1982. Over the years we sponsored many of our family members including those from Pardishibpur such as my Uncle Alphonse Gomes and his family. From that point the majority of the migration of our family from Bangladesh went primarily to Toronto.

The first generation of family from Padrishibpur, fully continued their cultural and religious traditions. The language, food, and family gatherings were all maintained here in Canada. However over time, the newer generations were increasingly assimilated into western Culture. For example, the younger generations were speaking less Bengali, engaged in less of the cultural activities and sadly even the strong religious devotion. Among the newer generations, there seems to be a decrease in knowledge of the homeland and our origins although the older generation is currently maintaining the awareness and practice alive to the newer generations. Hopefully this will be carried on to some capacity to future generations. The newer generations are also marrying spouses of different religions, cultures and races and moving away from our traditional past. Some are not marrying in the Church and there is less participation in Church and religious traditions.

3.3 Describe how you see yourself as a young migrant, what are your goals and aspirations and how do you visualize your future in this new country.

Arriving in Canada I was five years old and didn't speak any English. But I quickly adjusted to the new country and began to make friends of various cultures. I had very simple and basic goals of finishing my education, getting married and having children.

3.4 Share your feelings and emotions, struggles and challenges that you faced and describe how you adjusted to your new country, culture, and living style.

It was very easy for me to adjust to Canadian living since I came to Canada at the very young age of five. My Christian, Bengali culture was maintained by my parents and extended family.

3.5 What new behavior, attitudes, skills, knowledge, and values did you learn or acquire in your new land and how were they helpful or hindering for your future and for your new generations?

I certainly adapted to much of Western culture. Perhaps I became more open to western thinking and less of some of the stricter traditional thinking as I was mixing with people of different cultures, religions, and races. I welcomed all the different people and I believe this exposure has enabled me to be more diverse.

The downside appears to be in that newer generations seem to be losing the richness of their Bengali heritage, the knowledge of its cultural practices. Again, their devotion and practices of our Catholic faith and strong family values appears to have diminished.

3.6 What do you see as your achievements, what helped make your lives successful, and what you had to sacrifice or compromise on?

Strong family values have been the primary factor in enabling me to a more successful life- the high level of commitment and dedication to the immediate and extended family as well as religious and spiritual factors. Adopting the Christian objective to love God and others has been a very strong factor in shaping my life and in sacrificing for others especially for my family.

Given we live in a capitalistic society, it required hard work and compromise of financial and material things for the greater good of the family and to live a better quality of life. Happiness and creating a loving family atmosphere were a priority over trying to amass excessive wealth and materialism. I believe the ultimate factor that has helped my family be "successful" is our Christian tradition in the belief in God and our desire to love Him and one another. This fostered and generated great spirituality in our family and helped foster a greater love for God and for each other.

3.7 What do you miss most from your homeland, Padrishibpur & why? Mention what you have preserved from your homeland in this new land and why. How do you ensure that your traditional values, language, culture, religious and moral values and identity are preserved and passed on to the new generation?

I miss the love of all our extended family in Padrishbpur. They always opened their hearts and homes to us and there was always a very strong family bond among both my family and my in laws' families. The beautiful feeling in the environment, the beautiful nature, the simple lifestyle of Padrishibpur and the relaxed environment was always so enjoyable and I will always have fond memories. Visiting my Grandfather's home and my Mother in laws' home gave me a strong sense of belonging to very rich heritage and ancestry. Their deep devotion to God and commitment to prayer and religious rituals remains strong today.

I was blessed to have married into a family of Padrishibpurians through my wife Sandra. Both her mother and father were from Padrishbpur : Claude Gomes and Theresa D'Rozario. I was blessed to be able to bring my family including my wife and three children to Padrishibpur in 2012. This was a wonderful opportunity for them to see and experience Padrishibpur first hand. These memories will live on for the rest of our lives.

We can ensure preserving our traditions and culture through continuing the traditions from back home and living the family values that were passed on to us from past generations. Large extended family gatherings, celebrating all the major sacraments and events of the Church and visiting our homeland, will also ensure preserving our culture and heritage.

3.8 What do you know of the history of Padrishibpur, its older generations, their way of living, their values, their vision and goals for their future generations? Can you share some of the stories and examples you have heard or seen of life in Padrishibpur in the olden days?

I know that the Portuguese brought Christianity to Padrishipbpur from Chittagong and the church in Padrishibpur is one of the oldest in the country. Their way of living was predominantly simple village living with strong family values and devotion to their Catholic faith. They had high ideals for education, careers, and prosperity for their children and the passing on of good family values and traditions.

My memories of Padrishibpur include family gathering with great song, dance and cheer. I remember how elaborate the events surrounding weddings and all holy days especially Christmas. I remember the strong bond and spending joyful time with all my family members especially with my cousins.

3.9 What does 'being a Padrishibpurian' mean to you? In what ways do you identify and maintain ties with your village home, people of Padrishibpur and its culture and values?

Being Padrishibpurian means that I am a descendant of a strong and beautiful ancestry rich in culture and traditions. I belong in a strong spiritual line deeply devoted to God with an abundance of blessings. I am a part of a people so deeply devoted to family life including a deep commitment for extended family.

I maintain my ties with my village home by staying close to all my family and my in laws from Padrishibpur. I continue to participate and remain involved with family members from Padrishibpur here in Canada. I try to financially support family from Padrishibpur and some charitable causes.

3.10 Do you have any suggestions on how Padrishibpur can remain a strong basis of your cultural and family identity and how the future of Padrishibpur can shine brighter?

Padrishibpurians should try their best to pass on the history and cultural practices to their children and grandchildren. Show family pictures, home movies and even YouTube videos of Padrishibpur. Continue to participate in family gathering with family members of Padrishibpur descent. Continue to expose our children to Padrishibpur by visiting there whenever possible. Through social media such as Facebook, keep updated on news from Padrishibpur and organize special events that can be celebrated on a regular basis.

4. Interview: Jerry Basil Gomes (Connecticut, USA)

4.1 Tell us something about your ties and links to Padrishibpur and Bangladesh.

I was born and raised in Bangladesh and lived there nearly my whole life, upto 2011. My father Vincent Gomes (DIB) and my mother Philomena Gomes are both from Padrishibpur and their ancestors are all from Padrisibpur, so my root is from Padrishibpur. I had a very soft corner for Padrishibpur and would go there quite often, in my childhood as well as when I grew up. My wife Paulina is also from Padrishibpur, so I have very strong links with this village.

4.2 Describe why you left Bangladesh and came to USA, what was the process that you can share

My daughter Juliet Jui Gomes who married Swapon Cornelius Gomes, settled in USA and later she sponsored our family to come and settle here. My wife and I came here first, later followed by my son Rudolph Rossie and daughter-in-law Tithi Halder. We are here mainly for a better future for our children and grandchildren, and for our own good medical care and treatment.

4.3 How is your life here – work, family, social life; your struggles and achievements?

I worked here in a retail store named Target as a Cashier for seven years and then retired due to my ill health and Covid pandemic. I currently live with my wife, son and daughter-in-law in Connecticut and am involved in many Church-related voluntary services such as Knights of Columbus, and as an Usher. I love cultural activities and join in the various functions organized by different clubs, play musical instruments such as tabla, khol and dhol. We had a small cultural group known as Mon Pobon in California where we lived before. I have a very active social life, and was director of a small Sangha named BCFC (Bangladesh Christian Fellowship of California) where we organized functions on different occasions such as Christmas, Pohela Boishakh and Ekushe February, Easter, and Kirtons.

When you come first as a migrant you have to struggle to get proper IDs, job training and jobs, housing facilities, medical insurance and services, learning how to drive and operate a computer, dealing with the cold weather and other such challenges. In plain words, I had to start a new life, starting from zero. But, thanks to God, I have dealt with all of these challenges and problems and have now managed to settle comfortably in this new land.

4.4 What do you see as the future of our generations here in USA?

We hope for a bright future for my son and future generations. Already, I see that my grandchildren from my daughter are getting good education and achieving high quality skills which will help them to get good jobs and a bright future. My grandson has completed his graduation in Bio-engineering which is a new field with lot of opportunities. Here in this country our children and grandchildren are getting these advantages in this country, which we did not have in Bangladesh.

4.5 What changes do you notice in yourself, in your life as a migrant?

My life has changed for the better, especially in terms of health, I am getting very advanced types of medicine and treatment. There is also abundant good food, where care is taken to see that the meat, fish, vegetables are fresh and not mixed with any impurities or insecticides or formalin. The air here is fresh and clean and the surroundings are also kept very clean and healthy. So, life is more valued here. But, I miss the hospitality and friendship of my relatives and friends back home, especially in Padrishibpur.

4.6 How do you keep links with Padrishibpur and Bangladesh?

I always try to visit Bangladesh frequently and during each time I also visit Padrishibpur. I have close contacts with all my friends and relatives through phone, Facebook and Messenger. I have a keen interest in what is happening in Bangladesh and Padrishibpur. While I was in Bangladesh, I helped Fr. Ezgio Mascaretti, parish priest in Padrishibpur, to raise funds for building the new Church in 2005 from the Padrishibpur people living in Dhaka and Chittagong. I coordinated the group of 5 or 6 persons (Arnold Arun, Shyamol, Tapon, Pankoj, Proshanto, Alexander and others) who actively led this fund-raising activity.

4.7 How would you like to see Padrishibpur in the next 10 years?

Our family has developed our ancestral lands in Padrishibpur and built a home for the new generation, especially those who live now in foreign lands, so that they can visit Padrishibpur frequently, appreciate our culture and heritage and maintain links with our homeland. In this way we have high hopes that in future Padrishibpur will return to its past bright days and the future generations will take active interest in going there and improving our village further.

4.8 Compare your life here with that in Bangladesh. What do you miss most?

I miss vindaloo, dodol, morich tanga, temporadu, fresh fish from the pond and fresh vegetables from the garden, summer fruit such as mango, jackfruit, kalajam, taal et. Here the food, especially the fish and vegetables are frozen and not very tasty like in Bangladesh. I also miss the village life, meeting and gossiping with people in the market, haat, drinking hot tea and snacks with friend, going visiting in the evening and meeting people. Here the people can rarely be found in their house, while in Bangladesh there are always some people in the house. I miss the friendly community life in Bangladesh.

4.9 How do you keep alive the heritage, traditions and values you brought with you from your homeland?

During my son's wedding we followed all the Bengali traditional wedding festivities such gaye holud, mehndi shandhya, colorful sarees, punjabis, ornaments and special food items such as tehari, nobanno, pithas. We invited all our relatives from near and far and many joined in to celebrate. This is an important tradition that we try to include all close relatives to such ceremonies. In this way, we maintain our close family bonds. We also have a strong religious tradition, saying our rosary and other prayers regularly, going to Church and maintaining respectful relationship with the priests and clergy, and observing feast days such as St. Anthony's feast, devotion to Mother Mary. We encourage our children and grandchildren to go to Church and be respectful to parents and elders.

4.10 Any message you want to give to the readers in conclusion?

I extend my prayers and good wishes to all those in Padrishibpur and Bangladesh and hope for a peaceful and prosperous land for the future Bangladeshis.

5. Interview: Juliet Lipica Sarker (New York, USA)

5.1 Tell us something about your ties and links to Padrishibpur and Bangladesh

My parents are from Bangladesh, my mother Cynthia Gomes (Sarker) was born and raised in Padrishibpur. My father Augustine Subash Sarker's family is from Kotalipara, Gopalganj, but they settled in Padrishibpur during the Pakistan period. My parents married in 1965 in Padrishibpur, and then moved to Dhaka, where my father was working at that time. My mother's side ancestors are from Padrishibpur, her father was Charles Gomes (Gurumoshai, Nayeb bari). Although I was born in Dhaka and lived there with my parents, I frequently visited Padrishibpur as a child with my grandmother (Thakur) and stayed for some days each time. So I have lots of memories of the village life, my family and cousins there, and all the traditions and ways of life in the village.

During my job as a Women Development Officer in Caritas, I was posted in Barisal in 1999-2001 and during that time I would visit Padrishibpur quite frequently. After that also, whenever I visited the field of Barisal for my work, I used to go to my village. Later on, I visited Padrishibpur with my mother during Christmas, and also for the wedding of my cousin. Before coming to USA, I went for Christmas there for the last time. So I have very strong family links and good memories of life in Padrishibpur.

5.2 Describe why you left Bangladesh and came to USA, what was the process that you can share

I was doing a good job in Bangladesh, and did not need to come here, but after my mother's death I felt lonely and depressed. Especially, as I had some health problems which need constant treatment and follow-up, so I decided to come to USA, where my elder sister and her family had settled.

In September 2015, I came to the USA. Immigration is a very complicated process and I had to do all the procedures by myself. I came here as a single family member on my own merits. My elder sister Jhorna Sarker provided me with accommodation and support when I first came here. Later, I obtained work permit, job and other basic facilities. In 2017, I met Elvis D'Cruze through family members and we married and settled down as a family.

5.3 How is your life here – work, family, social life; your struggles and achievements?

In the beginning I had to struggle a lot. I searched for jobs in different stores, even worked in a local grocery shop for a short while. Later I got a job in a Bengali multiservice store as Office Assistant for a few months. I was not very happy with the work environment which was not respectful. For more than a year, I struggled to get a good stable, respectful job. From Bangladesh I had done my Masters in Geography, here I evaluated my certificate and got a graduation level credential. Later, through my sister in law, I got a job in a health service agency known as VNS Health. I did this job as a temporary worker for 2 years, now this is a permanent job. In my social life also I had to struggle, in the beginning I stayed in a one-room apartment, I was alone. Facing all these troubles, my family suggested me to get married. I was lucky to find a very warm and understanding in-law family and a life partner.

My biggest achievement is that I am settled now with a very nice family. Now I have a settled job and a home, where I feel secure and comfortable. For our social life, we participate in different cultural programmes, outings and picnics, and Bangla Mass.

5.4 What do you see as the future of our generations here in USA?

I sometimes feel sad when I see the new generation of our community here. Their parents have sacrificed so much to come here and establish themselves, but the children are not fulfilling the dreams and aspirations that their parents have for them. Many do not complete education, some take drugs and get involved in problematic behavior. They seem to be confused in the two cultures – our traditional culture from back home and the modern, western culture here, and often they take what are negative values and behaviors from this culture.

However, some well established families are able to guide their children in the proper direction and the results are good education, jobs and social acceptability. When new families arrive here they face issues in settling down or getting jobs, and cannot give the required attention to their children's education and welfare. But those who have already settled here can give more attention to their children and their children go to good schools and get a good education. If parents cannot give guidance to their children, they are more attracted towards western culture and values.

Family bonding has become weak as parents often have to do two jobs to make ends meet, and so can't give time to children. They have to do all the work, so children spend time with outside friends and often learning problematic behaviors and becoming vulnerable to negative influence. Now our value system is also changing, our people are accepting new forms of family relationships and norms, like divorce, remarriage, open marriage like living together, being gay or lesbian (which is happening quite frequently), so the norms and values are changing. People no longer question or judge these behaviors or relationships.

5.5 How do you keep links with Padrishibpur and Bangladesh?

Through Facebook, Messenger and phone, I keep in touch with my family and friends back home. I get information from the Facebook page on Padrishibpur. I have regular contact with family members. Since coming to the US I have not gone back to Bangladesh, but I feel like going there right now!

5.6 How would you like to see Padrishibpur in the next 10 years?

Padrishibpur is a very beautiful and developed village, very well organized with its roads and facilities, and I feel proud when I hear people admiring it. But the education in this region needs to be improved further. The high school and college need to provide good quality education for both boys and girls, and inspire the passion in them to be highly educated.

I found that agriculture is not very developed in Padrishibpur as compared to other rural areas in that region. The Christian families are not attracted to farming and do not

give attention to developing this sector. This should be further improved. Our people only plant small vegetable gardens near their house for own consumption, but do not do this as a business enterprise, although we have all the facilities including market system, buyers, good and easy transport.

Enterprises need to be set up in the rural areas, because the young people need job opportunities to settle in the village. After education, the youth take jobs in the towns, as they don't get jobs in their own village. So if attention is given to this, and new business and markets are developed with job opportunities, then there is much scope for our village to retain their youth.

Padrishibpur is a land full of natural beauty, and also has a lot of modern facilities. It is ideal to create jobs in tourism and attractions. For the future of Padrishibpur and for the new generations, these openings and possibilities must be further developed.

5.7 Compare your life here with that in Bangladesh. What do you miss most?

Here in New York where I live, I do not miss the Bangla food, they are available here; but I miss the people and friend and colleagues, my family in BD, miss my parents' graves. I live near a mosque and I hear the 'azaan' in the morning, so it feels like Bangladesh. But I miss my own people.

5.8 How do you keep alive the heritage, traditions and values you brought with you from your homeland?

Since I live in a Bengali area, I follow our culture 100%. We mainly wear sarees, except when going to work we wear western clothes, jeans and tops. We observe festivities such as Pohela Boisakh, Pohela Falgun, Ekushey February, Independence Day, we have different programmes on these occasions. We also have picnics and get-togethers with Bengali people, we always listen to Bangla songs and music. We try to encourage the children to speak in Bangla, give them sarees as gifts, or punjabis to wear, so they know these are our traditions.

5.9 Any message you want to give to the readers in conclusion?

I want everyone to give more attention to our dear homeland and village. We could not give much attention when we were there, but there is scope for so much more to do to improve our land and the people and I wish everyone contributes to this process. When I return to Bangladesh I want to see a beautiful and happy land!

6. Interview: Prof. Mabel Mary Gomes (New York, USA)

6.1 Tell us something about your ties and links to Padrishibpur and Bangladesh

My father, William Albin Gomes was born in Padrishibpur, as was his ancestry. I was born in Dhaka, but went to Padrishibpur a number of times. I feel very connected to Padrishibpur since my father was very proud of his education there and his ties with his birthplace and told us many stories of his life there. My culture, cooking style with coconut milk and vindaloo are very special as I learned it from my father, which is also a heritage from Portuguese times. My children love these special dishes along with the stories I have told them about the history of Padrishibpur cooking, wedding songs particular with that region, and family history and diaspora challenges and integration.

6.2 Describe why you left Bangladesh and came to USA/Canada, what was the process that you can share

I left Bangladesh in May 1982 for higher studies and opportunities in the USA. I had to face many hurdles and challenges. My MA and BA Honors was evaluated as a BA here in the education system and so I had to repeat my Masters in Public Administration again here. I excelled in my studies and was offered teaching here in John Jay College of Criminal Justice, City University of New York. I have taught over 27 years in this college teaching Public Administration, Criminal Justice, International Studies, Police Leadership, Correction and a variety of subjects. I have taught many students who were in the FBI, CIA, police, and Fire Department and Correction Department over the years. There are a lot of Bangladeshi students in this college and I was the Faculty Advisor to their Bangladeshi Club and advised and participated in many of their activities, including raising funds for the Sidr Cyclone in Bangladesh in 2007.

6.3 How is your life here – work, family, social life; your struggles and achievements?

My life here in the USA, NY, has been very challenging as I did not have any knowledge of life living as an immigrant here. I didn't have any relatives or friends here then who could guide me. I worked part-time and studied. I had left my children back in Bangladesh and when they joined me here, my daughter was nine years and son was 4 and half years. I had to teach them English speaking at home and adjust to this new environment and culture. Slowly over the years, the Bangladeshi Christians living here in NY formed an organization, Probashi Bengali Christian Association, of which I was an advisor. Engaging with their activities and involving my children with their cultural activities strengthened our ties with Bangladesh culture and Christian families from different regions of Bangladesh. These cultural activities have helped me to guide my children and other youth to be able to integrate with the diverse cultures here in the US, and instill ambitions for higher studies and professions, while still upholding the culture and values of being a Bengali.

6.4 What do you see as the future of our generations here in Canada/USA?

I see a very bright future for the new generations here in the USA as quite a few of them have become doctors, lawyers, engineers, pharmacists, etc. and can see a better future for themselves because of these higher education opportunities. They are becoming role models for the younger generation of Bangladeshis here too.

6.5 What changes do you notice in yourself, in your life as a migrant?

In my life as a migrant, my biggest challenge was to be able to integrate with the diverse cultural and religious norms and values of the various immigrants living in New York; especially since I have been teaching in College, I had to be very sensitive to this diversity.

6.6 How do you keep links with Padrishibpur and Bangladesh?

I keep link with Padrishibpur through my visits there which I cherish. I was in Padrishibpur last in 2013 and Bangladesh in 2023. I have close friends and relatives who keep me updated on what is happening in Bangladesh.

6.7 How would you like to see Padrishibpur in the next 10 years?

I would like to see Padrishibpur develop more in sectors which are still underdeveloped and become more mainstream without losing their unique cultural heritage and norms.

6.8 Compare your life here with that in Bangladesh. What do you miss most?

I miss most the closeness we used to have within family and relatives because we are dispersed here in the US and Canada and don't get to see each other often because of the geographical distances. However, we are able to be in touch via internet and social media. Everyone is very busy with their own lives and family responsibilities and cannot at will visit each other as heart desires.

6.9 How do you keep alive the heritage, traditions and values you brought with you from your homeland?

I keep alive my heritage, traditions and values by speaking Bangla at home with my children, and grandchildren a little bit. I have taught them Bangla songs, still cook Bengali style dal, bhaat, bhorta, shutki. They love vindaloo and shrimp malai curry. I love cooking and so keep our traditional cooking tempting and alive.

6.10 Any message you want to give to the readers in conclusion?

Life is a journey filled with unforeseen changes and challenges. But life has been given to us to accept these challenges and opportunities. Embrace each day with gratefulness and never forget to honor the sacrifices that our ancestors have given so that we could, and can enjoy a better future!

FGD - USA





FGD - USA





FGD - USA





FGD - CANADA





FGD - CANADA





FGD - CANADA





FGD - CANADA





Chapter Six: Statistical information of Padrishibpur migrants in Australia Asia, Middle East and Europe

By SBP Editing Committee Members

Australia, Asia and Middle East

1	2	3	4	5
	Name of the resident (family head) who migrated	Name of the family head (& bari) who migrated to ,,,,,	Period of migration from Padrishibpur A= British B= Pakistan C=Bangladesh	Total members of the migrated family
1	Christian Gomes, W/o David Shaheb. Adeline, etc.	Padrishibpur	Padrishibpur	5
	Dickie Rodrigues (Gracy's son)	Padrishibpur	Padrishibpur	3
2	Naomi D'Rozario -Aust.	Dhaka	Bangladesh	3
3	Natali D'Rozario -Aust.	Dhaka	Bangladesh	1
4	Gloria Subhra D'Rozarion - Aust.	Dhaka	Bangladesh	4
5	Patrick Sourav D'Rozario- Aust.	Dhaka	Bangladesh	2
6	Albina Mou Gomes -Aust.	Dhaka	Bangladesh	1
7	Anthony Dio Gomes -Aust.	Dhaka	Bangladesh	1
8	Arel Pranto Gomes -Aust.	Dhaka	Bangladesh	1
9	Sunny Gomes -Aust.	Dhaka	Bangladesh	3
10	Sumi Bridget Gomes -Aust.	Dhaka	Bangladesh	3
11	Angi Quiah -Aust.	Dhaka	Bangladesh	4
12	Uttory Bashu -Aust.	Dhaka	Bangladesh	1
13	Joseph Oliver Gomes -Aust.	Dhaka	Bangladesh	3
14	Momota Koilheu -Aust.	Dhaka	Bangladesh	3
15	Babul Gomes – Aust.	Dhaka	Bangladesh	2
13	Santa Maria Gomes Aust.	Dhaka	Bangladesh	2
14	Hima Bashu -Bangkok	Khulna	Bangladesh	3
15	Charles Tapan Gomes	Dhaka	Bangladesh	3
16	German Tarun Gomes – Qatar	Dhaka	Bangladesh	4
17	Shiltu D'Rozario - Japan	Dhaka	Bangladesh	1
18	William Brian D'Roz Japan	Dhaka	Bangladesh	1
18	**Total**		**Bangladesh 20**	**57**

EUROPE

1	Joyanti Gomes -Italy	Dhaka	Bangladesh	3
2	Rupali Gomes – Italy	Padrishibpur	Bangladesh	3
3	Daughter of Martin Gomes	Chittagong	Bangladesh	1
4	Priscilla Gomes - Portugal	Dhaka	Bangladesh	3
5	Bimol Gomes - Denmark	Dhaka	Bangladesh	**3**
6	Wilbert Dipu Gomes - Denmark	Dhaka	Bangladesh	**1**
7	..... France	Dhaka	Bangladesh	1
7	**Total**		**Bang. - 5**	**15**
	Grand Total		**Bangladesh - 25**	**72**

পঞ্চম ভাগ:
পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান জনগোষ্ঠী: ধর্ম, ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি
লেখক: যোসেফ ডি'রোজারিও

আলোচ্য বিষয়সূচির সারসংক্ষেপ
প্রথম অধ্যায়: জাতিগত ও ধর্মীয় পরিচয়
॥ ক ॥ আমরা বাঙালি
॥ খ ॥ ধর্মীয় পরিচিতি
দ্বিতীয় অধ্যায়: জনগণের ভাষা ও সঙ্গীত
॥ ক ॥ পাদ্রীশিবপুরের আঞ্চলিক ভাষা
॥ খ ॥ পাদ্রীশিবপুরে ব্যবহৃত পর্তুগীজ শব্দ ও নাম
॥ গ ॥ পাদ্রীশিবপুরের সঙ্গীত
তৃতীয় অধ্যায়: বসত বাড়ি, জমি-সম্পত্তি ও জীবন-স্টাইল
॥ ক ॥ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বের বসত বাড়ি
॥ খ ॥ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরবর্তী বসত-বাড়ি
॥ গ ॥ ভূ-সম্পত্তি
॥ ঘ ॥ জীবন-স্ট্যাইল
চতুর্থ অধ্যায়: সামাজিক ও কৃষ্টিগত আচার-অনুষ্ঠান
॥ ক ॥ সামাজিক ও সাংস্কারিক আচার-অনুষ্ঠান
॥ খ ॥ খাদ্য সামগ্রী ও খাদ্যাভ্যাস ও রান্নাবান্না
॥ গ ॥ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
পঞ্চম অধ্যায়: ধর্মীয় জীবন: বিশ্বাস ও আচরণ
॥ ক ॥ ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মশিক্ষা: স্বর্গদ্বার পুস্তক প্রধান
॥ খ ॥ ধর্মসংস্কার পালন ও ধর্মীয় অনুশীলন

ভূমিকা

পাদ্রীশিবপুর নামের সাথেই একাকার হয়ে আছে যে জনগোষ্ঠী তার নাম খ্রিস্টান জনগোষ্ঠী। অন্য কথায় বলা যায় এই জনগোষ্ঠীর পরিচিতির আদিতেই বিদ্যমান তাদের ধর্মীয় পরিচয়। ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে এই সুপরিচিত ও মার্জিত জনপদের যাত্রা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল, যখন পর্তুগীজ মিশনারীদের আগমন ঘটে। এ এলাকায় বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যে পর্তুগীজ বণিকদের আনাগোনা ও ব্যবসা-বানিজ্য আরও আগে থেকে চলমান ছিল। একটি কথা সর্বজনবিদিত যে কয়েক দশক পর থেকে পাক-ভারত উপমহাদেশের সামগ্রিক ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের সাথে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সুদৃঢ় এবং সুগভীর প্রভাব বিদ্যমান। প্রিয় গ্রাম পাদ্রীশিবপুর, শ্রীমন্ত নদীর তীরে সবুজ শ্যামল একটি গ্রাম, যেন পটে আঁকা একটি ছবির মতোই। ইতিহাসের আলোকে আলোচনা করলে দেখা যায় এই খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর সুচনা হয়েছে বিদেশী মিশনারীদের দ্বারা। খ্রিস্টান মিশনারীদের আগমনের পূর্বে এই জনপদে দু'টি ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলঃ একটি ইসলাম এবং অপরটি সনাতন ধর্ম বা হিন্দু ধর্ম। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে এই দুটি ধর্ম ছাড়া আর কোন ধর্মের কথা শোনা যায়নি। এই গ্রামটি একটি

খ্রিস্টান জনপদ হয়ে ওঠার একটি বিশাল ইতিহাস রয়েছে। আমি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিস্তারিত আলোচনায় যাব না কারণ ইতোমধ্যেই তা আলোচিত হয়েছে। তবে অত্র এলাকার জনগোষ্ঠীর ধর্ম, ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির কথা আলোচনা করতে গিয়ে ইতিহাসের অতি সংক্ষিপ্ত এবং প্রাসঙ্গিক বিবরণ তুলে ধরা সঙ্গত মনে করছি।

পর্তুগীজদের বাংলাদেশে (বেঙ্গল) আগমনের পরে এক পর্যায়ে ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে রাজা প্রতাপাদিত্যের ছেলে, রাজা রাজবল্লভ সেনের অনুরোধে পাদ্রীশিবপুর অঞ্চলে ৪ জন পর্তুগীজ বণিক আগমন করেন। কর আদায়ের জন্যেই বণিকগণ নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাদের দেখাশুনা এবং আধ্যাত্মিক পরিচর্য্যাসহ সার্বিক পরিচালনা করার জন্য ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে একজন ফাদারকে পাদ্রীশিবপুরে প্রেরণ করা হয়। তাঁর নাম ছিল রেভারেন্ড ফাদার রাফায়েল দ্য আঞ্জোস। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তখনকার সময়ে ফাদারগণ পাদ্রী নামেই পরিচিত ছিলেন। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে এই পাদ্রীর আগমন এবং এই এলাকার দায়িত্ব তাঁর উপরে ন্যস্ত হবার পরে কোন এক সময়, কথিত আছে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের দিকে, শিবপুরকে পাদ্রীশিবপুর বলে আখ্যায়িত হয়। আর এলাকাটির নাম হয় পাদ্রীয়ান তাল্লুক (জমিদারী)। সময়ের বিবর্তনে এবং এলাকার প্রয়োজনে ক্রমে ক্রমান্বয়ে পাদ্রীগণের সাথে এলাকার জনগোষ্ঠির একটি সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। জমিদারীর কাজ সুষ্ঠুভাবে করা একজন বা দু'জন পাদ্রীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ জন্য স্থানীয়দের সহযোগিতা নেয়া হয়। পাশাপাশি এলাকার জনগণ এই ফাদারদের জীবনাচরণ ও শিক্ষাদীক্ষায় আকৃষ্ট হয় এবং দু'একজন করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। সময়ের বিবর্তনে তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর এই জনগোষ্ঠি পাদ্রীদের কাজের সহযোগী হিসেবে ভূমিকা পালন করতে শুরু করেন। যতদিন যায় এবং পাদ্রীদের সাথে স্থানীয় জনগণের হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায় ততই এলাকাটিতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। পরশ পাথরের সংস্পর্শে যেমন ধাতব পদার্থ সোনায় রূপান্তরিত হয় তেমনি অত্র এলাকার জনগণও পাদ্রীদের সংস্পর্শে এসে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে অধিকতর আগ্রহী হয়ে ওঠে। আর কালক্রমে দু'এক পরিবার করে করে অনেক পরিবার খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়। আর এভাবেই যে জনপদটি আত্মপ্রকাশ করে তার নাম পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান জনপদ। এই জনপদটি সারা বাংলায় একটি আদর্শ খ্রিস্টান জনপদ হিসেবে সুপরিচিত। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী খ্রিস্টান জনপদগুলির একটি অন্যতম প্রাচীন খ্রিস্টান জনপদ পাদ্রীশিবপুর। এই জনপদটি গড়ে উঠেছে শ্রীমন্ত নদীর তীরে। গ্রামের বিবেচনায় এটি বেশ বড় এবং উন্নত গ্রাম। যদি ধর্মপল্লীর বিবেচনা করি তবে এটি একটি আদর্শ ধর্মপল্লী। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকেও এখানকার অবস্থান যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এখানে জলপথ এবং সড়কপথ উভয় পথেই যাতায়াতের সুবিধা বিদ্যমান প্রাচীনকাল থেকেই। আর একটি কথা বলতেই হয় যেহেতু বিদেশী মিশনারীদের হাতে এই জনপদটি গড়ে উঠেছে, সেহেতু এখানে সবকিছুই অনেক আগে থেকেই উন্নত এবং পরিশিলীত ছিল।

প্রথম অধ্যায়ঃ জাতিগত ও ধর্মীয় পরিচয়

॥ ক ॥ আমরা বাঙালিঃ

বাংলাদেশে বসবাসকারী নাগরিক হিসেবে আমরা সবাই বাংলাদেশী। এ দেশের নাগরিক হিসেবেই আমাদের নাগরিকত্ব; আর ভাষাগত দিক বিবেচনায় আমরা বাঙালি। আমরা আমাদের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করি আমরা বাঙালি। তবে এই জনগোষ্ঠী ঔপনিবেশিক শাসন আমলে ছিল ভারতবর্ষের সকলের মতোই পরাধীন। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হবার পরে আমাদের পরিচয় বা জাতীয়তা ছিল পাকিস্তানি। আর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পরে আমাদের জাতীয়তা বাংলাদেশী। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, আমাদের নাম ও ধর্মের কথা শুনলে অনেকেই আমাদের বাংলাদেশী বা বাঙালি হিসেবে বিবেচনা করেন না। নিকট অতীতেও বৃহত্তর সমাজ আমাদের সাহেব সবাই মনে করতো।

হ্যাঁ, তবে এটা সত্য যে, বিদেশ থেকে আসা প্রথম চারজন পর্তুগীজ যারা পাদ্রীশিবপুরে আগমন করেছে তারা স্থানীয় জনগণের সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে পরিবার গঠন করেছে। এটা অনেকেই স্বীকার করেন যে, পাদ্রীশিবপুর জনগণের দিকে তাকালে, তাদের অনেকের গঠন, শারীরিক অবয়ব ও চেহারা, আকৃতি স্থানীয় জনগণের মতো নয়। তাদের মধ্যে বিদেশী চেহাড়ার ছাপ এখনও রয়েছে। আবার আমাদের আদি পুরুষ অনেকেই ইসলামিক, আবার অনেকেই হিন্দু ঐতিহ্য ও কৃষ্টি থেকে পরম্পরাগত ভাবে এসেছেন। খ্রিস্টানদের কথা ও ভাষার মধ্যে এই ইঙ্গিত স্পষ্ট। আমাদের আদি পুরুষরা চাচা-চাচি, নানা-নানি, দাদু-দিদি বলেই সম্বোধন করত। পরবর্তী প্রজন্মে কাকা-কাকিমা, ঠাকুরদাদা ও ঠাকুরমা, ইত্যাদি ব্যবহার শুরু হয়। তবে সর্বদাই তারা স্থানীয় ও দেশীয় বলে পরিচয় দিয়েছে।

আমরা এই দেশে জন্মগ্রহণ করেছি, এখানকার পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথেই আমরা বেড়ে উঠেছি। সরকার গঠনে আমরাও প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করি। তাই আমাদের প্রথম পরিচয় আমরা বাঙালি বা বাংলাদেশী। আমাদের জাতিগত পরিচয় নিশ্চয়ই আমাদের জন্যে গর্বের। সকলের সাথে যখন আমরা গেয়ে উঠি ''আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'', তখন গর্বে আমাদের বুক ভরে যায়। বাংলাদেশ যখন বিশ্বের দরবারে কোন কিছুতে বিশেষ অবদান রাখে তখন আমরাও বিশেষভাবে আমোদিত হই। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে আমরা ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি একটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। সেই সে মহান ভাষা আন্দোলনের ফসল ২১ ফেব্রুয়ারি, যা আমাদের শহীদ দিবস, তাকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায় ইউনেস্কো। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদায় ভূষিত হয়। সেই সে অর্জন আমাদেরকেও উজ্জীবিত করেছে। সেইদিন সারাদেশের বাঙালিদের সাথে আমরাও অনেক সম্মান ও গর্ববোধ করেছি। যেমনটি কবি বলেছেন:

''সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালবেসে।
জানিনে তোর ধনরতন আছে কিনা রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে ॥''[১]

তাই আমাদের জাতিগত পরিচয় আমরা বাংলাদেশী। আর এই বাংলাদেশী জাতীয়তার মর্যাদা সমুন্নত রাখা আমাদের একান্ত কর্তব্য। পৃথিবীতে যেখানেই বাঙালি আছে, সেখানেই আমাদের দেশ, আমাদের ভাষা, আমাদের সংস্কৃতি সমুন্নত। তাই বাঙালিরা যখন কোন কিছু অর্জন করে তখন আমরা অতিশয় আনন্দ অনুভব করি। যেমন আমাদের নারী ফুটবলদল যখন এশিয়া কাপ জয় করলো, যখন পুরুষ ফুটবলদল সাফ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ান হলো বা ক্রিকেটে যখন আমাদের দল কোন অর্জন করে তখন সারা বাংলার জনগণের সাথে আমরাও উল্লসিত হই, আমাদের আনন্দ ও গর্বের শেষ থাকে না। আমাদের আর্ন্তজাতিক অর্জন খুব বেশী নেই। তবু ও ড. মহাম্মদ ইউনুস যখন ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন তখন মনে হয়েছিল সারা বাঙালি যেন সেই সে পুরস্কার পেয়েছে। সমগ্র জাতি সেদিন অতিশয় আনন্দিত ও গর্বিত হয়েছিল। এরই এই উল্লাস আমাদের জাতীয়তাবোধের প্রকাশ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করতে চাই যে, বাংলাদেশ তথা সমগ্র বাঙ্গালিদের একমাত্র কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি মহোদয় যেদিন এই পদে মনোনীত হয়েছিলেন তখন বিশ্বের সকল বাঙালি খ্রিস্টান সম্প্রদায় যেমন আনন্দ প্রকাশ করেছে তেমনি আমাদের জাতীয় পর্যায়েও বাংলাদেশ সরকার তাঁকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছেন। আর এমনটি ঘটেছে তিনি বাংলাদেশী, তিনি একজন বাঙ্গালি। আসলেই যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই হোকনা কেন যখন বাংলাদেশ বা বাঙালি কোন কিছু অর্জন করে তা আমাদের আমোদিত করে। আর এই যে আনন্দের প্রকাশ তা কেবলই আমরা জাতি হিসেবে বাংলাদেশী এবং ধারণা লালন করি বলেই। একজন খাঁটি বাংলাদেশী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরা ও এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে আমাদের জাতিগত পরিচয় নিয়ে আমাদের গর্বিত হওয়া প্রয়োজন। এখানে একটি কথা আমাদের মনে রাখা একান্ত আবশ্যক যে, এদেশে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই আমরা বাংলাদেশী। এটাই আমাদের প্রথম ও প্রধান পরিচয় হওয়া দরকার। রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও আমাদের বাংলাদেশী হিসেবেই মর্যাদা দান করা হয় এবং আমরা সকলেই এদেশের নাগরিক হিসেবেই বাংলাদেশী জাতীয়তা নিয়েই পরিচিতি লাভ করি।

[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ খ ॥ ধর্মীয় পরিচিতি

পাদ্রীশিবপুর জনপদটির নামের সাথেই এই জনপদের জনমানুষের ধর্মীয় পরিচিতি প্রকাশ পায়। পাদ্রীশিবপুরের জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় পরিচয় তারা খ্রিস্টান। এই পরিচয়টি সুপ্রাচীন। কারণ এই জনপদে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সূচনা হয় ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দেই। তখন থেকেই আমাদের আদর্শ হয়ে উঠেছেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র যীশু খ্রিস্ট। আমরা তাঁরই অনুসারী। ফলে জাতিগত পরিচিতির পাশাপাশি আমাদের জীবনে অন্য একটি পরিচয় আমরা লাভ করেছি ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণেই। অর্থাৎ আমরা খ্রিস্টান। এই জনপদটি প্রাচীন খ্রিস্টান জনপদ হওয়াতে আদর্শিক ও আচরণগত দিক থেকেই আমাদের একটি অনন্য মর্যাদা রয়েছে। পাদ্রীশিবপুর এলাকায় অন্য ধর্মের জনগণের সাথে সহাবস্থানের কারণে আমাদের যে আদর্শিক স্বকীয়তা আছে এবং আমাদের মাঝে যে প্রতিনিয়তই খ্রিস্টীয় মনোভাব বিরাজ করে তা আমাদের কাজে, কথায় ও আচরণে প্রকাশ পায়। পাদ্রীশিবপুরে আমাদের প্রতি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর রয়েছে সুদৃঢ় আস্থা। এক সময়ে পাদ্রীয়ান তাল্লুকের দায়িত্ব আমাদের মিশনারী ফাদারগণ পালন করতেন এবং এর সাথে খ্রিস্টান জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছেন বলেই আমাদের একটি ভিন্ন মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় খ্রিস্টান সমাজকে সকলেই বিশেষ সমীহ করে।

আমাদের প্রতি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আস্থাও প্রবল। অনেক আগে থেকেই এই এলাকায় যেকোন মানুষের সামাজিক বা অন্য কোন সমস্যা দেখা দিলে তারা খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দের সমাধানকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। কেবল তাই নয় এই এলাকায় বিশেষ করে মিশনারিদের প্রতি তাদের আস্থা ছিল সুদৃঢ়। তাইতো আমরা দেখতে পাই যে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধের সময় হিন্দু, মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকেই তাদের মূল্যবান গহনা ও অর্থ মিশনের কাছে গচ্ছিত রাখতে সাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। এমন কি ঐ সময়ে খ্রিস্টানদের বিভিন্ন ঘরে থাকতে তারা নিরাপদ মনে করেছেন এবং অবস্থান করেছেন। এই যে আচরণ এর থেকে স্পষ্ট হয় যে, আমাদের সমাজের মানুষকে তারা বিশ্বাস করেন। তারা আমাদের জীবনে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখতে পেয়েছেন, আমাদের মাঝে খুঁজে পেয়েছেন নির্ভরতার আস্থা। আমরা খ্রিস্টান বলেই তা সম্ভব হয়েছে। নিকট অতীতেই আমরা দেখেছি কোন খ্রিস্টান ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি কেহ থানায় মামলা রজ্জু করতে যেতো তখন তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলা হতো যেন তাদের অভিযোগটি ফাদারের কাছে জানানো হয়। ফাদার যদি অনুমতি দেন তবেই থানা তা অভিযোগ আকারে গ্রহণ করবে। এই কথাগুলো বললাম এজন্যে যে, আমরা জগতে আলো হয়ে বিরাজ করি, আমরা লবনের মতোই সকলকে সুস্বাদ দান করি। আর এটি সম্ভব হয়েছে আমাদের জীবনে খ্রিস্টীয় আদর্শের কারণেই।

এই জনপদে আমাদের খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশাল অবদান রেখে চলেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সেবার আদর্শে প্রতিষ্ঠানগুলো জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে সুদূর অতীত থেকেই। নির্বিবাদী এবং শান্তিকামী মানুষ হিসেবে এলাকায় আমাদের বিশেষ সুনাম রয়েছে। আবার সারা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আমরা দেখতে পাই আমাদের এই খ্রিস্টান জনপদটি প্রাচীন খ্রিস্টান জনপদ। তাই বাংলাদেশের যেকোন প্রান্তে বসে (বিশেষ করে খ্রিস্টান এলাকায়) পাদ্রীশিবপুরের নাম উচ্চারণ করলে সকলেই এই গ্রামটিকে চিনতে পারেন, আর একান্ত প্রত্যক্ষভাবে চিনতে না পারলেও এই জনপদটির নাম তাদের জানা রয়েছে এমনটি ফুটে ওঠে।

আমাদের ধর্মীয় পরিচয় একদিনে গড়ে ওঠেনি। শত শত বছর ধরে আমাদের গ্রামের লোকেরা সুদৃঢ় বিশ্বাস ও ঐকান্তিক ভক্তির সাথেই ধর্মীয় জীবন অনুশীলন করে আসছেন। ফলে বংশানুক্রমে সকলেই ধর্মের প্রতি যথাযত অনুরাগ প্রদর্শন করছেন। ধর্মীয় বিশ্বাসের ও শিক্ষার কারণেই খ্রিস্টান সমাজ মিথ্যের আশ্রয় নেয় না এমন একটি ধারণা আমাদের বৃহত্তর সমাজে রয়েছে। এছাড়াও খ্রিস্টানগণ কোন ধরনের অন্যায়ের সাথেও নিজেদের জড়ায় না এমন একটি সুন্দর মনোভাব আমাদের এলাকার হিন্দু-মুসলমান ভাইবোনেরা পোষণ করেন। কেবল তাই নয় তাদের সাথে সহাবস্থানের ফলে এবং আমাদের সাথে তাদের সুসম্পর্ক থাকাতে আমরাও আমাদের ধর্মীয় পরিচয় দিতে কখনো কুণ্ঠিত হই না। বরং আমরা গর্ববোধ করি। এই খ্রিস্টান জনপদটি কেবল প্রার্থনা এবং উপাসনার মাধ্যমেই নয় বরং তাদের জীবনাচরণে ও সেবার মাধ্যমে ধর্মীয় চর্চা করে আসছে। এখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মকান্ড খ্রিস্টকে প্রকাশ করেছে যুগ যুগ ধরেই। পাদ্রীশিবপুর গ্রামটিতে জনসংখ্যার বিবেচনায় আমরা কেবল আমাদের গ্রামের সীমিত পরিসরে সংখ্যা-গরিষ্ঠ, তবে আশেপাশের এলাকাসহ বিবেচনা করলে আমরা সংখ্যায় অনেক কম বা সংখ্যা-লঘিষ্ঠ। কিন্তু আমাদের জীবনাচরণ দ্বারা আমরা একটি প্রদীপের মতোই বৃহত্তর সমাজে আলো দিয়ে যাচ্ছি। আমরা নিরবধি লবনের মতোই স্বাদ বিতরণ করে সকলের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছি। ফলে পারস্পরিক সহাবস্থান আমাদের দিয়েছে ভিন্নমাত্রা। সকলের সাথেই আমাদের সুসম্পর্ক, সকলেই আমাদের সাথে একাত্ম – আমরা মিলে মিশে এক হয়ে বসবাস করছি। তবে এতো কিছুর পরেও আমাদের রয়েছে কিছু স্বকীয়তা যা অন্যদের থেকে আমাদের আলাদাভাবেই চিহ্নিত করে। যেমন আমাদের নামে ভিন্নতা আছে। তেমনি আমাদের মর্মমূলে যেহেতু খ্রিস্ট সর্বদা বসবাস করেন সেহেতু আমাদের বিশ্বাস-জীবন, আমাদের কথাবার্তা ও জীবনধারন, স্ট্যাইল যেন সকলের অলখেই আমাদের একটু ভিন্ন করে রাখে। আর এই যে ভিন্নতা তা আমাদের জীবনকে একটি অনন্য সাধারণ জীবন হিসেবেই সকলের কাছে উপস্থাপন করে, যা সকলকে আকৃষ্ট করে এবং আমাদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে তা প্রকাশ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ জনগণের ভাষা ও সংগীত

আমরা বাংলাদেশের অধিবাসী, আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। এই ভাষা আমাদের প্রাণের সাথে মিশে আছে। তবে অঞ্চলভেদে ভাষার ব্যবহার ও প্রকাশে থাকে ভিন্নতা। বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলভেদে ভাষার ব্যবহারে পার্থক্য রয়েছে অর্থাৎ অঞ্চলভেদে আঞ্চলিক ভাষা বিদ্যমান। আমাদের গ্রাম তথা আমদের এলাকায়ও আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার ব্যাপকভাবে রয়েছে। একদিকে বরিশাল অঞ্চলে আমাদের বসবাস বিধায় এখানকার জনমানুষের আঞ্চলিক ভাষা ব্যাপকভাবে আমরা ব্যবহার করি। সেই সাথে খ্রিস্টান হিসেবে এতিহ্যগত ভাবে আমরা আমাদের কথাবার্তায় ভিন্ন শব্দ কিছু শব্দও আমরা ব্যবহার করে থাকি, যেমন পর্তুগীজ, কানাডা, গোয়া, কোলকাতাসহ বিভিন্ন এলকার ভাষার শব্দ। কেবল তাই নয় আমাদের ধর্মীয় দিক বিবেচনা করেও কিছু শব্দ আমরা ব্যবহার করে থাকি।

একটি কথা আমাদের স্বীকার করতেই হয় যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে আঞ্চলিক ভাষার উপস্থিতি তা প্রধানতঃ কথ্য ভাষা হিসেবেই বহুল প্রচলিত। তবে, এই কথ্যভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাথেও মিশে গেছে। এমন কি বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তার কবিতায় বরিশাল অঞ্চলের ''মোরা'' শব্দটি অনেকবার ব্যবহার করেছেন।

॥ ক ॥ পাদ্রীশিবপুরের আঞ্চলিক ভাষা

আমাদের জেলা বরিশাল তাই পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টান জনগণও ব্যাপকভাবে বরিশালের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে থাকে। বরিশালের আঞ্চলিক ভাষা সারাদেশে বেশ সমাদৃত। সব মিলিয়ে আমাদের ধর্ম, কৃষ্টি, জীবনাচরণ এবং প্রাত্যহিক ব্যবহারের জিনিষপত্র আমাদের এলাকার শব্দের মাঝেই বিকশিত হয়েছে। আমাদের আঞ্চলিক ভাষার রয়েছে নিজস্ব বিশাল শব্দভান্ডার। এই বিশাল শব্দ ভান্ডার সংগ্রহ করে প্রকাশ করা সত্যি কঠিন ও দূরহ কাজ। তবে যতটা সংগ্রহ করা গেছে তা উপস্থাপন করছি।

(১) ঘর সম্পর্কে আঞ্চলিক শব্দ

ক্রম নং	আঞ্চলিক শব্দ	শুদ্ধ বাংলা অর্থ
১.	হাইত্না	ঘরের সামনের বারান্দা
২.	ওসসা ঘর	খাবার ঘর
৩.	কাইনাডি	ঘরের পিছন
৪.	এহাচালা	রান্না করার ঘর
৫.	ছাইচ	ঘরের সামনের অংশ
৬.	পিড়া	পিড়ি
৭.	ওডা	ঘরের সিড়ি
৮.	উডান	উঠান
৯.	গোরবাট	কাঠের ঘরের সামনে সিড়ি আগে যে কাঠ লাগানো হয়।
১০.	খৈইল্লান	উঠানের পরে যে খালি জায়গা থাকে ।
১১.	চুলাহাল	ঘরের বাহিরে, শুকনার সময় যেখানে রান্না করা হয়।
১২.	বেড়া	বেড়া
১৩.	ছেতখানা	পায়খানা ঘর
১৪.	আইংঙ্গা	সীমানা চিহ্নিত করার বেড়া
১৫.	ব্যাড়	বাড়ির সীমানা-বেষ্টনি ছোট খাল

*আঞ্চলিক শব্দ সমূহ সংগ্রহে যাদের অসামান্য অবদান রয়েছে: লিপন গোমেজ ও লিপিকা গোমেজ, শ্রীমন্ত-তটে ২০০৩ খ্রি. পৃ: ৫৪-৫৭: ইভন ডি'রোজারিও (ছিলু), মেরীলিন গোমেজ, রোজ গোলাপী গোমেজ ও ফ্লোরিন্ডা ডি'রোজারিও

(২) ঘরের ব্যবহৃরিত আসবাপত্র-এর আঞ্চলিক শব্দ

ক্রম নং	আঞ্চলিক শব্দ	শুদ্ধ বাংলা অর্থ
১	ফিরা	বসার জন্য ছোট কাঠ দিয়ে দুইটি পায়া দিয়ে তৈরী করা
২	দৈউরা	কাঠ দিয়ে তৈরী বাতি রাখার স্ট্যান্ড।
৩	মাচা	ঘরের পাটাতন
৪	চ্যারাগ বাতি	কাঠ দিয়ে তৈরী পাত্র, যার মধ্যে তুলার সলতে এবং সরিষা তেল দিয়ে বাতি জ্বালানো হয়।
৫	চকি	খাটিয়া
৬	মসীর	মশারী
৭	বিচান	বিছানা
৮	আতা	হাতা
৯	হরা	ঢাকনি
১০	পাইলা	পাতিল
১১	চিমটা	আগুনের অঙ্গার ধরার যন্ত্র
১২	চেরা	খুনতি
১৩	কুপা বাতি	কেরোসিনের বাতি (ছোট)
১৪	খোরা	তরকারী রাখার বউল/ভাত খাওয়ার পাত্র
১৫	ওক্কা কলকি	তামাক খাওয়ার সামগ্রী
১৬	খাদা	হাত ধোয়ার বউল
১৭	আউততা	ভাতের মার ফেলতো
১৮	জলচৌহি	কাঠের তৈরী বসার টুল
১৯	বেলনি	নারিকেলের আইচা দিয়ে তৈরী যা দিয়ে ডাল,এবং তাল বেড়ে দেয়া হত; রুটি বানাবার বেলনি
২১	দসমৌল	লুসনী
২২	হিতান	শোয়ার পর মাথা পিছনের জায়গা

(৩) সর্ম্পক সম্বন্ধে আঞ্চলিক শব্দ

ক্রম নং	আঞ্চলিক শব্দ	শুদ্ধ বাংলা অর্থ
১	মুনুভাই	দেবর
২	বভাই	বড় ভাই
৩	রাঙ্গা ভাই	মেজো ভাই
৪	নানা ভাই	সেজো ভাই
৫	মানা	দিদি

৬	কুইন্দা	বৌদি
৭	দুদু ভাই	চাচা
৮	হুবু	পিসি
৯	খালা	মাসি
১০	পাপু / পুতু	বাবা
১১	বোনদিদি	বড় দিদি
১২	রাঙ্গাদিদি	মেজো বোন
১৩	মুই	আমি
১৪	মোগো	আমাদের
১৫	হগোলে	সবাই

(৪) খাদ্য সম্বন্ধে আঞ্চলিক শব্দ

ক্রম নং	আঞ্চলিক শব্দ	শুদ্ধ বাংলা অর্থ
০১	হব্রি/গৈয়া	পেয়ারা
০২	নাহোইল	নারিকেল/নারকেল
০৩	পোম্বা	পেঁপে
০৪	ট্যাংগা	তেতুল
০৫	রাওয়া	মোরগ
০৬	উশ্যি	শিম
০৭	কইতোর	কবুতর
০৮	মুরহা	মুরগী
০৯	শালুন	রান্নাকরা তরকারী
১০	কালদো	তরকারীর ঝোল
১১	কদু	লাউ
১২	হোয়া	শসা
১৩	মিডা	গুর
১৪	চ্যাংমাছ	টাকিমাছ
১৫	কউর-রা-ত্যাল/কড়ু ত্যাল	সরিষার তৈল
১৬	আদার	হাঁস/মুরগীর খাবার
১৭	বিন্দালু	ভিন্দালু - রাঁধা কারি
১৮	ডাইল	ডাল
১৯	দোদল	বড়দিনের জন্য তৈরি নারিকেলের দুধের বিশেষ পিঠা
২০	আল্লান	হালুয়া (পুণ্য শুক্রবারে বিশেষ করে এই আয়োজন হয়।)

২১	আন্ডা	ডিম
২২	কাডাল	কাঠাঁল
২৩	হবরি ক্যালা	সবরি কলা
২৪	বই	কচুর লতি
২৫	রেহা	চিচিংগা
২৬	লেমু	লেবু
২৭	হুবারী	সুপারী
২৮	রামমিডা	চিটাগুর
২৯	ফ্যান	ভাতের মার
৩০	নুন	লবন
৩১	উরুম	মুড়ি

(৫) বিবিধ আঞ্চলিক শব্দ

০১	বিলোই	বিড়াল
০২	হাতোর	সাঁতার
০৩	বোগদা	বোকা
০৪	ভোম্বা	বোকা
০৫	কোলা	ধান ক্ষেত
০৬	নাওয়া	স্নান করা
০৮	পিছা	ঝাটা/ঝাড়ু
০৯	গেদু	শিশু
১০	মুনু	শিশু
১১	দ্যাওই	বৃষ্টি
১২	বেইন্নাহাল	সকাল
১৩	বিহাল	বিকেল
১৪	দুহাইর-রা-কাল	দুপুর বেলা
১৫	হাইঞ্জাকাল	সন্ধ্যাকাল
১৬	আইল্লাডি	কৃষিকাজ/ চাষাবাদ
১৭	পালা পই-র-রান	দাঁড়িপাল্লা
১৮	কেরেসত্যাল	কেরোসিন তেল
১৯	গুতা দেওয়া/কেনু	মাইর দেয়া
২০	ভুর	ভেলা
২১	কাহোই	চিরুনী
২২	হিওইন	সর্দি

২৩	ছ্যাপ	থুতু
২৪	এ্যাক্কালে	একেবারে
২৫	হরলেন	করলেন
২৬	আইচা	নারকেলের মালা
২৭	আন্নে	আপনি
২৮	ওসার	বালিশের কভার
২৯	কোম্মে	কোথায়
৩০	ওম্মে	ওদিকে
৩১	দেউড়া	বাতিদানি
৩২	ব্যাহাংড়া	অতিশয় দুষ্ট
৩৫	পাডাপুতা	শিলনোড়া
৩৬	পুহইর	পুকুর
৩৭	চঙ্গা	মই
৩৮	হাক্কা	শাঁকো
৩৯	আনাডা	দুষ্ট
৪০	ভ্যাদর	কাদামাটি
৪১	কুড়াল	কুঠার
৪২	পোতা	ঘরের ভিত
৪৩	ঠ্যাংগা	ঘরের দরজা বন্ধ রাখার জন্য কাঠের সাপোর্ট
৪৪	আউপরা	ঘাঁস-মুরগী আটকানোর জন্য বাঁশের বড় টুকরী
৪৫	হোগলা	পাটি
৪৬	হবিরে	তাড়াতাড়ি
৪৭	ঠিলা	কলস
৪৮	বাইননাল	নিমা
৪৯	আন্দু	মাকরসার ঝুল
৫০	ছ্যামরা	ছেলে
৫১	ছ্যামরি	মেয়ে
৫২	মাতারি	মহিলা
৫৩	পয়সাবার	বরযাত্রি
৫৪	বাইয়া	বানলেখা/নামলেখা
৫৫	তেলবাতি	বড়দিনের পূর্ব সন্ধ্যা উৎসব
৫৬	উদলা গা	খালি শরীর
৫৭	ড্যাম	কলাগাছের চারা
৫৮	খিরকী	জানালা
৫৯	র‍্যাজবার	শ্রাদ্ধ
৬০	হুন্দইল	ফানেল

৬১	খাইভডা	কাঠের চপিং বোর্ড
৬২	বাসুন	খাবারের প্লেট
৬৩	পাহা	হাতপাখা
৬৪	কোডা	রুম
৬৫	পয়দা	জন্ম
৬৬	রাবিদ	সম্পর্ক
৬৭	ঠোস	ফোসকা
৬৮	কেউচ্চা	কেঁচো
৬৯	হগুন	শকুন
৭০	কাউয়া	কাক
৭১	উহুন	উঁকুন
৭২	মাগনা	বিনেমূল্যে
৭৩	হগলডি	সবাই
৭৪	ডুলি	মিটসেপ
৭৫	ইজরী	কাঠের তৈরি বড় চামচ
৭৬	খাডাল	ঘরের মেঝ
৭৭	সুরিদ	সুসম্পর্ক
৭৮	বেবাক	সমস্ত
৭৯	আইল্লা	হালচাষ করার জন্য কর্মী বা কামলা
৮০	এ্যাকছের	খুববেশী
৮১	হুবারী	সুপারি
৮২	মোরা	আমরা
৮৩	হ্যারা	তারা
৮৪	হ্যাগো	তাদের
৮৫	রামমিডা	চিটাগুর
৮৬	চান্দা	ঘরের পার্শ্ব(বাহির দিকে)
৮৭	খয়রাতি	ভিক্ষুক
৮৮	খাদিমদার	খাবার পরিবেশক (বিবাহ বা বড় কোন খাবার অনুষ্ঠানে)
৮৯	অতীত	মেহমান
৯০	ঘেরান	ঘ্রান
৯১	ম্যালাহরা	রওনা দেয়া
৯২	ঠাডা	বজ্রপাত
৯৩	উন্দুর	ইঁদুর
৯৪	ছাতা	এয়লা (শরীরের জমে থাকা ময়লা)
৯৫	হিদলা	শ্যাওলা

৯৬	হাস্তা	সস্তা
৯৭	হোংঙ্গে	সামনে
৯৮	তেলাচোরা	তেলাপোকা
৯৯	গুরাগারা	ছোট ছোট ছেলেমেয়ে
১০০	বিছরাইন্না	খোঁজা
১০১	আচুক্কা	হঠাৎ
১০২	বেইন্নারাইত	ভোররাত
১০৩	গিদার	নোংরা
১০৪	প্যানাপোডা	অতিরিক্ত কথাবলা
১০৫	মুইড়াপিছা	পুরাতন ক্ষয় হয়ে যাওয়া ঝাড়ু
১০৬	মানের	মানুষের
১০৭	আউত্তা	মাটির খাদা
১০৮	মাশা	মশা
১০৯	দাউর	লাকড়ি
১১০	ধলা	ফর্সা
১১১	আতাল	গরুর ঘর
১১২	হাউরী	শ্বাশুড়ী
১১৩	ঢুপ	কচুরীপানা
১১৪	ল্যাম	কুপিবাতি
১১৫	ছুতা	অজুহাত
১১৬	খামার	গালিগালাজ
১১৭	আলিস্যা	অলস
১১৮	গুরমুই-র-রা	পাঁয়ের গোড়ালী
১১৯	নুন	লবন
১২০	আতরাপ	পাড়া/এলাকা
১২১	গোঙ্গা	বোকা
১২২	হুমইর দেয়া	ডাকে সাড়া দেয়া
১২৩	নাও	নৌকা
১২৪	বরি	বরশি
১২৫	ব্যারাম	অসুস্থ
১২৬	উরুম	মুড়ি
১২৭	দাউর	লাকড়ি
১২৮	ইসপিরিসান্ত রোজা	পবিত্র আত্মার পর্বের পূর্ব দিবসের উপবাস
১২৯	উন্নিকাল	শুকনোকাল
১৩০	বোচন	নিষেধ করা

৬) আঞ্চলিক ভাষায় কথোপকথন : "রঙ্গ রসের প্যাচাল"[৩]

রচনায়: প্রয়াত লরেন্স গোমেজ (স্যার) ও রাণী গোমেজ

[মোদের জন্মের পর থেকে যেসব শব্দ ও কথামালা দ্বারা মোরা প্রথম মোদের প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে যোগাযোগ করেছি সে শব্দমালা যতই গ্রাম্য হোক, যতই হোক আঞ্চলিক কথ্য, সেগুলো আজও মোদের মনে সুরের মূর্ছনা তোলে বারে বারে। এরা যে মিশে আছে রক্তের সাথে, তাই ভুলতে পারিনা এগুলোকে। এ শব্দগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার মাধ্যমেই প্রকাশ করলাম মোদের মনের কিছু গুঞ্জন।]

এ বাড়ির মানুষজন গেলে কই? এ পাশে দেহি কেউ নাই। আরে চান্দার ঢেহিডারে এমন হইরা থুইছ আডোনই যায় না। তোমরা বেবাক্কে দেহি চুলাহালে আগুন পোহাইতে আছ। আরে, কুইন্দা দেহি ঠান্ডায় কুহুরিন্দা গেছ, যে ঠান্ডা পড়ে। আইজগো বেইন্নাকালে বার্তে আইছি। এ পোতে ঠান্ডায় আত-পাও হাইত্তাদ্যা গ্যাছেলে। নাহের মাতায় তো বোতই আছেলে না। এট্টু জিরাইয়াই তোমাগো বার্তে আইলাম। এ চুলাহালে অনেকদিন পর বইলাম। চুলাডা তো তুমি খুব সুন্দর ব্যার দেছ। তোমার আতের মাডিকাম আগের নাহানই সুন্দর আছে, তয় গাতিডা এট্টু বেশী অইছে। উডানে দেকলাম চলা হুগা দেওয়া। হাঙ্গো বচ্ছর কি চলাইদ্যা রান্দো? এমনে দাউড়-কুডাও বা কোতায় পাবা। তয় এহন এই খরা হুগনার দিনে ঘইঠই দেতে পারবা। তোমাগো বার্তে তো ক্যালাগাছ নাই, এতো ফ্যার্তা পাইলা কই? চুলাহালে কয়েকখান ফ্যার্তা টাঙ্গাইয়া লইও। চান্দায় যে ঢেহি থুইছ, হেডা কি আর পাতপা? এ্যাহোন তো কোনহানে ঢেহিও নাই, কাইওলও নাই। আগে তোমাগো ঢেহিতে মায় কত বারা বানছে, মুইতো হে সোমায় ছোড। তিত্তাসনে যেকালে আইছালাম, ঐতো যে বচ্ছর খোন্দ ভালো অইছেলে, হেই বচ্ছর তোমাগো ধানের পালায় উডান ভরা আচেলে। মুইতো একটা মেইও লইয়া গ্যাছালাম, তুমি আবার খইয়া ধান দেলা।

মোগো কাগায় ক্যামন আছে? হ্যার গুড়াগাড়াগুলা আর মানুষ অইলেনা, এ্যাহাকটা এ্যাহাক পদের অইছে। মাইজ্জাডাতো এহানে ওহানে ফ্যাচাং বাজাবার তালে থাহে, আর ঘরের মইদ্দ্যেতো হগল সোমায় ক্যাচোর-ম্যাচোর লাইগ্‌গাই রইছে। গ্যাছে বচ্ছর বড়ডারে ঢাহা নিয়া একটা কামে দেছালাম। হে আবার মিন্নাতের কাম হরবে না। শ্যাষম্যাষ চুরিচামারি হইর্‌রা পলাইয়া আইছে, এহোনতো মুই মুখ দেহাইথারিনা। আর হরবেডাও বা কি? প্যাডে এট্টু বিদ্যা-বুদ্ধি না থাকলে আইজকাইল কোনহানেই খাড়ান যায় না, এ কতাডা এহনও মোরা ভালো হইর্‌রা বুজি না। অন্যান্য দিগের মানুষ ল্যাহাপড়া হিক্কা আইজকাইল বড় বড় কাম হরে আর মোরা ফাইভ পাস কইর্‌রাই এহোনও দাড়োয়ানগিরি হরার লইগ্যা ঢাহা যাই। দ্যাশে আইলে হ্যাগো ঠ্যালা দ্যাহে কেডা। আর যেগুলা দ্যাশে থাহে হেগুলায় লেহাপড়ি তো হেহেই না হুদা মদ-গাজা খাইয়া নিজেরা নিজেরা বাজাবাজি হরে। মোরা বাপ মায়রা ছোডোকালে আল্লাদ দিয়া এগুলারে মাতায় উডাইয়া থুই, শ্যাষে আর কতা হুনান যায় না। এহোনও সোমায় আছে, মোরা হজাগ না অইলে শ্যাষে টিক্কা থাহাই মশকিল অইবে।

[৩] লরেন্স গোমেজ (স্যার) ও শ্রী রাণী গোমেজ, শ্রীমন্ত-তটে ২০০৩ খ্রি. পৃ: ৫৩।

থাউক এসব কতা। আরে চা দেছো ভালো কতা, চডা লাগবে না। কত দিন পর মিডার চা খাইতেআছি। তোমার মাইয়া-পোলায় খাইছে? তোমার মাইয়াডারে দেকলাম আতাল ছাপ কইর‍্যা পুহইর পাড়ে গ্যালে, ওতো অনেক বড় অইয়া গ্যাছে। হুনছি ল্যাহাপড়ায়ও ভালো, ও যদ্দুর পড়তে চায় ওদ্দুর পড়াইও।

ভান্ডোবাডি লইয়া পুহইরপাড়ে যাবা? লও মুইও যামু আনে। তোমাগো পুহইরডা কাডাইছ ভালোই অইছে, আগেতো এ্যাক্কালে চতলা আছেলে। আগের চাইয়াও কি গবিন হরছো ? ঝাউওতো ফালাইছো দেহি। নতুন মাডিতে দেহি গাছ লাগাইয়া ভইর‍্যাহালাইছো ? পোলায় যে টাহা পাডায় হেইদ্দা তো ভালো কামই হরতে আছে। আইজগো দুহাইর‍্যাকালে তোমাগো পুহইরে নাইতে আমু আনে। নতুন মাডিতে উস্যি আর বরডি তো ভালোই অইছে। তোমার মাইয়ারে ঐ ছোড টুনিদ্যা মোর লইগ্যা কয়েকটা উস্যি আর বরডি পাইররা আইতনায় হাজির মইদ্যে থুইয়া দেতে কইয়ো। মুই সোমায়মত নিমু আনে। তোমাগো চডানে দেহি পাইয়া কাইভডা গাছও লাগাইছো। এই চডান আগে কত নিচা আছেলে, বইষ্যাকালে পানিতে ডুইব্বা যাইতে। হেই পানিতে ছোডোকালে কত ঝাপুডি খ্যালাইছি ।

তোমার লগে গপ্পো মারলে কাম অইবে না, মোর মাছ কেনা লাগবে, লও দেহি রাস্তার মাতায় কিছু পাই নাহি। ছোডো পুডিমাছ পাইলে পাতখোলা খাওন যাইবে আনে। তুমি কইলাম মোরে একদিন কচুরহাগের ঘোন্ডা খাওয়াবা। তোমার মোনে আচে, এই খালডা আগে এ্যাক্কালে ব্যারের নাহান ছোড আছেলে, শীতকালে তো এ্যাক্কালে হুগাইয়া যাইতে। ওপারের ঐ কাদের ভিডায় বইয়া কত খ্যালাইছি। বিহাল অইলেই গেরামের বেবাক পোলাপান ঐহানে যাইতে। দাইড়াবান্দা, চু-চু, ছিয়াবুড়ি, গুইয়া-গুইয়া, বন্দি-বন্দি, পলাপোলি কত রহম যে খ্যালা খ্যালাইছি। এহন গুড়াগাড়ায় এসব খ্যালা জানেই না। আরে চ্যাঙ্গর গুড়াগাড়াগুলায় হরতে আছে কি? নাড়াকুডার মইদ্যে ঐরহম গৈরাইলে গা খাউজানিতে দেহি টেকতে হারবে না। এহোনও দেহি কোন মাছ আলা আয় না। চাইচালাম দুহইর‍্যাকালে ভাত খাইয়া এট্টু ঘুমামু। কাইল হাঙ্গ রাইত উজাগর আছালাম। মোর লগে যেডায় আছেলে হেডায় নিদাউত অইয়া ঘুমাইছে, মোর আবার লঞ্চে ঘুমাইন্না ইস্তিমিল নাই। বেইন্নারাইতে লঞ্চের পিছের দিকে আচুক্কা হুনি এক মাতারিকুহইল দিয়া কান্দে, মুই তো অটাস। পরে হুনি চোরে বোলেহ্যাগো ব্যাবাক ছাফ কইর‍্যা নেছে। ভালোতো মুই ঘুমাই নাই। তোমার মাতায় দেহি একছের বাতখৈস, মোরও আগে আছেলে। অনেক বিচরাইয়া একটা বালো দাওই পাইছি, লাগলে তুমিও নিও। তোমার চুল এরহম আউল্যান্না ক্যা? আগে দেহি সুন্দর হইররা মেরিগাত্তা। ও ব্যাডার আডু, কেনুর ছাল গ্যাছে ক্যামনে? মোনে অয় পাচাড় খাইছেলে, নিশির পইর‍্যা রাস্তাঘাট থাহে পিছলা অইয়া।

ঐ বুজি মোরে বার্তে গোনে বোলায়, মুই এ্যাহোন যাই, মাছ তো পাইলাম না। তোমার মাইয়ারে উস্যি আর বরডিগুলা মোগো বার্তে এট্টু দিয়াইতে কইয়ো। কাইলগো ব্যানে তোমারে লইয়া একখানে যামু। জোগাড় অইয়া থাইক্কো, বোলামু আনে। সোমায় পাইলে সন্দার সোমায় যাইও। মোগো বার্তে আইজগো বোলে আবার দোদল, বিরইন পিডা বানাইবে। তোমার লগে হেইকালে গপ্পোও মারা অইবে আনে আর পিডা বানাইন্না জোগাইল্লাও দেওন অইবে আনে। তোমাগো কোরানিডা লইয়া যাইও। আচ্ছা মুই গেলাম, পুহইরে নাইতে আমু আনে।

॥ খ ॥ পাদ্রীশিবপুরে ব্যবহৃত পর্তুগীজ শব্দ ও নাম[৪]

বাংলা	পর্তুগীজ
আচার	Achar
আয়া	Aia
আলমোছা	Almoco (সকালের নাস্তা)
আলতার	Altar
আলকাতরা	Alkacatrão
আলপিন	Alpinet
আমেন	Amen
আনারস	Ananas
আরমারি/আলমারি	Armario
বাসন	Bacia
ভাপ(বাস্প)	Bafo
বালতি	Balde
বাপ্তিস্ম	Baptismo
বিন্দালো/বিন্দালু	Bindalhoo (Vino de alho)
বিনজার (আশীর্বাদ)	Binjar
বিশপ	Bispo
বইয়োম (বোতল)	Boiãm
বোতাম	Botão
বোতল	Botelha
বাস (যথেষ্ট)	Bus
কেদারা	Cadeira
কামরা	Camara
কামিজ	Camisa
কাম্পু	Campoo (camp)
কান্দি/কান্দা	Candaho (Village)
কাঞ্জি ((ভাতের)	Canjee
কারি (তরকারি)	Caril
কাকাতোয়া	Catatua
চা	Chaw
চাবি	Chabee
চুন	Chun

[৪] J. J. A Campos, History of the Portuguese in Bengal, First Published Calcultta 1919, Asian Educational Services Reprint: New Delhi 1998. মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, কাম্পোসের গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছেন।

কোমপাদ্রি	Compadre
কোমাদ্রি	Comadre
কাটিখিজম	Catecismo
কাথলিক	Catolico
ছাপ (ছাপানো)	Chapa
কমূনিয়ন	Comunhão
কপিশাখ	Couve
ক্রিজম	Crisma
খ্রিস্টান	Cristão
ক্রুশাকৃতি	Cruz
কুইনদো	Cunhado (brother-in-law)
কুইনদা	Cunhada (sister-in-law)
দেসবই-নতে	Deus Boi noite (ঈশ্বরের শুভরাত্রি)
খোদার সবদি – খোদার সুস্থতা	Saude
ইঞ্জালু (জানুপাত)	Em Joelhos
ইসপিরিতু সান্তু	Espirito Sancto
স্পঞ্জ	Esponja
ফিতা	Fita
গুদাম	Gudão
হস্তিয়া	Hostia
গির্জা	Igreja
ইনসেন্স	Incenso
জগরি	Jagra
জানালা	Janela
জুলাপ	Jalapa
জুয়া (খেলা)	Jogar
নীলাম	Leilão
লেবু	Limão
মাদি (ধর্মমাতা)	Madrinha
মানা (বড় দিদি)	Mana
মুনু (ছোট ভাই)	Mano
মন (ওজন)	Mão
মাস্তুল	Mastro
মিশন (মিশনবাড়ি)	Missão

মিশনারি	Missionario
মিস্ত্রী	Mistry
নওয়াব	Nababo
নভেনা	Novena
পাদ্রী(যাজক)	Padre
পাদ্রোয়াদো (পর্তুগীজ মিশনারি ব্যবস্থা)	Padroado
পাদু (ধর্মপিতা)	Padrinho
পেপে	Papaia
পিয়ন	Peão
পিপা	Pipa
পিরিছ (কাপ পিরিছ)	Pieres
পবরি (মিশন কর্মী)	Pobre
সাবান	Sabão
সাগু	Sago
সাক্রামেন্ত	Sacramento
সাক্রিস্টান	Sacristão
ছায়া (পোশাক)	Saia
ছালাদ	Salad
সবদি (স্বাস্থ্য)	Saude (খোদার সবদি)
সিপাহী	Seepoy
টেম্পোরাদো	Temporado
তামাক	Tobaco
তুফান	Tufãa
তুম্বা	Tumba
মেস্তারা (মিস্ত্রী)	Mestaro (Catechist)
বারান্দা	Verandah
বেহালা	Viola

যে সমস্ত পর্তুগীজ নাম পাদ্রীশিবপুরে পরিবারের পদবী হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তার কয়েকটির উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলঃ

কস্তা, ডি'কস্তা, গোমেজ, কৈলু, কাম্পু, হুইটলি,
রোজারিও, ডি'রোজারিও, সিলভা, ডি' সিলভা, ব্রিটো, বিতু

উপরে বর্ণিত মাত্র দশ/এগারোটি পর্তুগীজ পারিবারিক নাম পাদ্রীশিবপুরের পরিবারের মধ্যে পাওয়া যায়। অবাক হতে হয় যে, আরও অনেক পারিবারিক নাম আছে (যেমন, পিনেরু, ফেরানানদেস, ক্রুশ, সালগাদো, পিউরিফিকেশন, কোড়াইয়া.....) যা নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ভাওয়াল ও আঠারোগ্রাম ও ঢাকা শহরে পাওয়া যায়। কিন্তু পাদ্রশিবপুরে তার প্রচলন নেই।

অভিবাসনের ফলে কয়েকটি নাম পাদ্রীশিবপুরে প্রচলিত হয়ে আসছে যেমন: সরকার, মধু, অধিকারী, বাড়ৈ, ভট্টাচার্য (ব্যারেল)।

পর্তুগীজ পারিবারিক নামধারীরা যে, পর্তুগীজদের বংশধর তা সঠিক করে বলা যাবে না। পাদ্রীশিবপুরে "ডি' সিলভা" পরিবারগুলো হয়তো প্রথমে পাদ্রীশিবপুরে এসেছিল তাদের বংশধর বলা যেতে পারে। যারা চারজন প্রথমে পাদ্রীশিবপুরে এসেছিলেন তারা স্থানীয় লোকদের মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে আন্তঃবিবাহ হয়েছে। প্যারিশের পালপুরোহিতগণ প্রথম থেকে উপরোক্ত নামগুলো বাপ্তিস্মের সময় দেয়া হয়েছে, এবং তাদের থেকে বংশানুক্রমে ব্যক্তি ও বাড়ির নাম অনুসারে চলে আসছে।

॥ গ ॥ পাদ্রীশিবপুরের সঙ্গীত

অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ চিত্ত বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে সঙ্গীতকে বেছে নিয়েছে। বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠান ও নিত্যকার জীবনের ঘটনাবলী এই সকল সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। পাদ্রীশিবপুরের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সঙ্গীতের সাথে সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় চর্চার একটি নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। এই বিষয়টি আমাদের জনজীবনে উৎকৃষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। শিল্প সাংস্কৃতিক চর্চায় পাদ্রীশিবপুরের বিশেষ সুনাম রয়েছে। যুগযুগ ধরে চলে আসা এই শিল্প সংস্কৃতির নিজস্ব ভান্ডার আধুনিকতার স্পর্শে বেশ পরিবর্তিত হয়েছে এবং আমাদের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক বিষয়াদির চর্চা ক্রমে ক্রমান্বয়ে সীমিত হয়ে আসছে।

কিছু কিছু গান ইতোমধ্যেই হারিয়ে গেছে। কারণ সামাজিক অনুষ্ঠান-নির্ভর এসকল গান ছিল মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত। কোন লিখিত দলিল অবশ্য পাওয়া যায় না। বিশেষ করে পাদ্রীশিবপুরের হয়লার গীত বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায়। এই সব গানের শিল্পী এখন খুবই কম। আবার যারাও আছেন তারাও সবগান এবং গানের কথামালা সঠিকভাবে জানেন না। কোন কোন গানের আংশিকমাত্র তাদের জানা আছে। তবে এর বিষয়াদি ছিল নিতান্তই জীবন ও জীবিকার সাথে এক হয়ে থাকা ঘটনাবলীর। এ বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে বর্তমানে যারা এই সঙ্গীত চর্চা করেন তাদের কয়েকজনের সাথে আলাপ হয়েছে। তবে কখন, কিভাবে বা কাদের মাধ্যমে এই সঙ্গীত চর্চা শুরু হয়েছিল তা সঠিক করে কেউই বলতে পারেননি।

সামাজিক অনুষ্ঠান-নির্ভর এই সঙ্গীত সমূহের মধ্যে রয়েছে নবজাত শিশুর জন্মের জন্য আনন্দ সঙ্গীত। পাদ্রীশিবপুরের কোন পরিবারে নতুন শিশু জন্ম নিলে গ্রামের মহিলাগণ বিশেষ আনন্দ সঙ্গীত পরিবেশন করতেন এবং এসময় নবজাত শিশুর দাদা-দাদী এবং নানা-নানীদের নিয়ে হাস্যরসে মেতে উঠতেন। এছাড়া বিবাহ নিয়ে প্রচুর গান ছিল। বিবাহ-সম্বন্ধ ঠিক করতে গিয়ে গান, বান লেখায় গান, গায়ে

হলুদের গান, জল ভরতে গিয়ে গান, পয়সাবারের গান, কনে উঠিয়ে আনার গান, বিবাহের গান, নতুন কুটুম বরণের গান, কুন্ডবাত ছাড়ানোর গান ইত্যাদি। এই গানগুলিই হয়লার গান হিসেবে সুপরিচিত। নিম্নে এ ধরনের কিছু গান তুলে ধরা হলো:[৫]

(১)

রাধা কৃষ্ণেরে কয়, কৃষ্ণ মুই কইলম
যমুনার জল আনতে যাই, (২)
ওগো ভরা কলসি খালি না কইররা রে
যমুনায় জল আনতে যাই
দাদা মুই কইলম যমুনার জল আনতে যাই
রাধা কৃষ্ণ কয় দাদা বউ কইলাম
যমুনার জল আনতে যায়।
দেওরা পশ্চিমের রাস্তায় হারমনী বাজায় গো
কণ্যা ফিইরা ফিইরা ফিইরা চায়
দাদা বউ কইলম যমুনার জল আনতে যায়,
কালা কৃষ্ণ কয় দাদা বউ কইলো
যমুনায় জল আনতে যায় ॥

(২)

ও শ্যাম কানাইরে (২)
শ্যাম পিরিতে পাগল করলি মোরে
ও শ্যাম কানাইরে ত্যালের বাডি গামছা দে
স্নান করি যমুনার ঘাটে
কলসি ভাসাইয়া নিলো স্রোতেরে

ওশ্যাম কানাইরে
আমি নারী একেলা, বাড়াবান্দি অবেলা
কান্দে মুছিবো ও শ্যাম শাড়ীরে
ওশ্যাম বেয়াইরে
শ্যাম পিরিতে পাগল করলি মোরে ॥

(৩)

এসো এসো প্রাণের বন্ধু
কাছে এসো না,
তোমার লইগ্গা লাইচ্ছা থুইছি
ফুলের বিছানা ॥
ঘটি ভরা জল আছে
পা দু'খানি ধো,
পা দু'খানি ধুইয়া বেয়াই
ফুল বিছানায় শো ॥
বাটা ভরা পান আছে
কৌটা ভরা চুন,
সিথানেতে ওক্কা কলকি
উনানে আগুন ॥
এসো এসো প্রাণের বেয়াই
কাছে এসো না,
তোমার লইগ্গা লাইচ্ছা থুইছি
ফুলের বিছানা।

[৫] ইভন ছিলু ডি'রোজারিও'র সংগ্রহ

(৪)

উইড়া উইড়া পরে ময়ুর
পইররা প্যাগাম ধরে,

ও শাশুড়ী গো
ওকি ময়ুর ভালো নাচে। (২)
একটু জাগা দেও শাশুড়ী
ময়ুর খেলিবারে
ও শাশুড়ী গো
ওকি ময়ুর ভালো নাচে।

একটু জাগা দাও ননদি
ময়ুর খেলিবারে
ও ননদী গো
ওকি ময়ুর ভালো নাচে।
একটু জাগা দাওনা চাচী
ময়ুর খেলিবারে
ও চাচী গো
ওকি ময়ুর ভালো নাচে।

(৫)

গোস্যা অইয়া যাইওনা বেয়াইরা
গোস্যা অইয়া যাইওনা বেইনেরা
আমরা তোমাগো হরছি কী
হাউসের বেয়ানগো লইগ্গা রান্দন চড়াইছি,
গাছের একটা আমড়াইদ্দা
কোলার একটা দামরাইদ্দা
রান্দন চড়াইছি ॥
গোস্যা অইয়া যাইওনা না বেইনেরা

আমরা তোমাগো হরছি কী
হাউসের বেয়ানগো লইগ্গা রান্দন চড়াইছি,
ছাইছের একটা কেউচ্চাইদ্দা
গাছের একটা বাইগুনদ্দা
রান্দন চড়াইছি ॥
গোস্যা অইয়া যাইওনা পুত্রারা
আমরা তোমাগো হরছি কী
হাউসের পুত্রাগো লইগ্গা
সিন্নি চড়াইছি ॥

(৬)

সুজনী লো দেখে যাও
এত রাইতে চরকার গুনগুনি
কোন খোয়ারী বলে গো আমার
চরকায় নাই মোর হিয়া,
সেই চরকার দৌলতে আমার
সাড়ে সাতটা বিয়া রে
নাগর আলী কুমকুম, চাককুম,
লারা দে, চাড়া দে, খালে নাইমমা গড়া দে
ওক্কা কলকি
এত রাইতে চরকার গুনগুনি ॥

মাঝ কোলাতে চিল বইসাছে
গরু ওঠছে গাছে
সেই গরু খাইবার আশে

ঘুইর্‌রা ঘুইর্‌রা নাচেরে,
নাগর আলী কুমকুম, চাককুম, চুককুম
লারা দে, চাড়া দে
খালে নাইমমা গড়া দে, ওক্কা কলকি
এত রাইতে চরকার গুনগুনি ॥

কোন খোয়ারী বলে গো আমার
চরকায় নাই মোর হিয়া,
সেই চরকার দৌলতে আমার
দরজায় বান্দা হাতী লো,
নাগর আলী কুমকুম, চাককুম, চুককুম
লারা দে, চাড়া দে,
খালে নাইমমা গড়া দে, ওক্কা কলকি
এত রাইতে চরকার গুনগুনি ॥

(৭)

জলের ঘাটে বাশিঁ বাজে গো কমলা
আমরা জলে যাই (২)
কারো কাখে লোডাঘডি, কারো কাখে ঝাড়ি
কমলা সুন্দরীর কাখে, ও কমলা সুন্দরীর কাখে
হীরাররো কলসি লো কমলা আমরা জলে যাই (২)
আগে সখি পাছেও সখি জল ভরিতে যায় (২)
মধ্যের সখি নিলাম্বরী পবনে উড়ায় (২)
গো কমলা আমরা জলে যাই
জলের ঘাটে--------
নদীর ঘাটে বাঁশি বাজায় শ্যাম নাম ধরিয়া (২)
বাঁশির সুরে মন যে আমার (২)
ঘরে রাখা দায় ও কমলা আমরা জলে যাই (২)
বন্ধু আমার মন ভ্রমরা কিবা যাদু জানে (২)
আমারে পাগল বানাইয়া (২)
দূরে বইস্যা টানে গো কমলা , আমরা জলে----
রাত দুপুরে বন্ধু এসে আমারে জ্বালায় বন্ধু
আমারে জ্বালায় (২)
হঠাৎ করে চমকে উঠি, বন্ধুরে না পাই ,
ওগো কমলা আমরা জলে যাই ॥ (সংগৃহ

হয়লার গীতের ভান্ডার অনেক বড়। এখানে কেবল কয়েকটি দেয়া হয়েছে। এই গানগুলো আমাদের গ্রামের একেবারে নিজস্ব এবং সকলের হৃদয়ে আবেদন সৃষ্টিকারী। যুগ যুগ ধরে এই গান চলে আসছে। তবে বর্তমানে সঠিকভাবে এই সমস্ত গান সংগ্রহ করা অনেক কঠিন। আমাদের গ্রামের বিবাহের দিনেও কিছু গান পরিবেশন করা হয়। নিম্নে তার কিছু উল্লেখ করা হলোঃ[৬]

(১)

কত ভালোবাসা জানা গেল প্রাণনাথ
নিশি হলো অবসান, এলে না (২)
সারা নিশি জাগিয়া কত সখিগণ (২)
কুঞ্জে এলো না মদন মোহন, (২)

কত ভালোবাসা----------
আগে যদি জানিতাম, তবে কী প্রেম করিতাম(২)
রাখালের সনে প্রেম সাজে না (২)
কত ভালোবাসা----------
পড়ানে পড়ানে যদি মেলে দুজনে (২)
সুখের সীমা থাকে না (২)

(২)

জোংলা পাখি পোষ না মানে
জোংলা পোষা বড়ই দায় (২)
পাখি পুষে এই হইলো
যা ছিল মোর সবই গেলো (২)
আপন বাসা পরকে দিয়ে
পরের বাসায় যেতে চায়।
আবার পরের বাসায় যেতে চায়
সে পরের বাসায় যেতে চায় (৩)

জোংলা পাখি----------
ডাকে পাখি গাছের ডালে
বাঁজায় বাঁশি রাধা বোলে
আপন বাসা পরকে দিয়ে
পরের বাসায় যেতে চায়।
আবার পরের বাসায় যেতে চায়
সে পরের বাসায় যেতে চায় (৩)

[৬] বিবাহের গানগুলি সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন মেরীলিন গোমেজ মীরা

(৩)

আর কতকাল ডাকবে বনের পাখি
বউ কথা কও বউ কথা কও (২)
কাইন্দা পাখি অন্ধ হলো
বন্ধ নাওয়া খাওয়া
কইলো না সেই কথা বউ
কবে যাবে পাওয়া,
আবার ডাকলে কথা কইবো
এই জ্বালা আর কত সইবো
আমার মরা গাঙ্গে ভরা জোয়ার
ক্যামনে দু'কুল রাখি
বউ কথা কও---------- ॥

(৪)

আমি ভেবে ভেবে সারা হই
আমার প্রেমের পাগলা কই ॥ (২)
একবার যদি পাই তাহারে
আদর করে রাখতাম হৃদয় মাঝারে
আর ছাড়িব না, ছাড়িতে দেবো না,
ভেবে ভেবে সাড়া হই ॥ (২)
একবার যদি পাই তাহারে
আদর করে রাখতাম হৃদয় মাঝারে
আর কাঁদিব না, কাঁদিতে দেবো না
ভেবে ভেবে সাড়া হই ॥ (২)

(৫)

যমুনায় জল আনতে যাচ্ছ
ওগো যমুনায় জল আনতে যাচ্ছ
সঙ্গে নাই তো কেউ
তুমি কাদের কুলের বউ গো
তুমি কাদের কুলের বউ ॥ (২)
যাচ্ছ তুমি হেসে হেসে
কাঁদতে হবে অবশেষে (২)
আরে কলসি তোমার যাবে ভেসে (২)
ঐ লাগলে জলের ঢেউ
ঐ লাগলে প্রেমের ঢেউ (২)
তুমি কাদের কুলের বউ।

সামাজিক গানের আরও একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে বরিশালের পরিচয়বহনকারী গান। বিশেষ করে বরিশালকে কেন্দ্র করে বেশকিছু গান এখন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এগুলোর সাথে আমাদের জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও দৈনন্দিন জীবনের স্পর্শ রয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই যে ''হয়লার গান'' ''বরিশালের আঞ্চলিক গান'' এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করার কারণ হলো– যাতে আগামী প্রজন্ম বুঝতে ও জানতে পারে যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ কতটা আমুদে ছিলেন। আমাদের শিল্প-সংস্কৃতির ভান্ডার যথেষ্ট কতটা সমৃদ্ধ। বরিশালকে কেন্দ্র করে অনেকগুলো সঙ্গীত রয়েছে তার কিছু গান এখানে তুলে ধরা হলো:

(১)

কইলজা আলা মানু মোরা
নদীর দ্যাশের ঝানু পোলা
বাড়ি বারিশাল,
ধানের দ্যাশের মানু মোরা
বালাম চাউলে ভরা গোলা
বাড়ি বরিশাল,
মোগো দ্যাশে বইয়া গ্যাছে
একছের নদী খাল
ম্যা ভাই বরিশাল, বরিশাল মোগো বরিশাল
মোগো দ্যাশে বইয়া গ্যাছে
একছের নদী খাল ॥
কীর্তন খোলা বইয়া গ্যাছে
পাশে মোগো শহর
চইররা শান্তি, দ্যাইখ্যা শান্তি
মোগো লঞ্চের বহর;
দুর্গা সাগর, ঘুইট্টা মরজিদ
মোগো দ্যাশে আছে
বইষ্যাহালে হাপলার বিলে
লাল হাপলা ফুল ভাসে
ডিস গোডাইন বিবির পুহইর
কীর্তন খোলার পাড়
হগল মাইনস্যে ঘুইররা পায়রে শান্তি চিরকাল ॥
ম্যা ভাই বরিশাল, বরিশাল মোগো বরিশাল
মোগো দ্যাশে বইয়া গ্যাছে
একছের নদী খাল ॥
মোগো দ্যাশের আমড়া ভালো
খাইতে ভালো গৈয়া,
ভ্যাজাল ছাড়া খাডি জিনিস
গ্যালাম কইলো কইয়া,
আগইলঝাড়ার রস মঞ্জুরী
গৌরনদীর খাডি দই,
জন্মের মজা মোগো ইলিম
হগলডি হ্যা পাইবে কই?
বানরীপাড়ার চাউল ভালো
সুবারী আর নাহইল
হাঁচরা মাছে ভরা যে বিল
ভরা মোগো খাল ॥
ম্যা ভাই বরিশাল, বরিশাল মোগো বরিশাল
মোগো দ্যাশে বইয়া গ্যাছে
একছের নদী খাল ॥
ধানে চাউলে ভরা যেমন
বরিশাইল্ল্যা গোলা
জীবনানন্দ, শেরে বাংলা
মোগো দ্যাশের পোলা,
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গা
ফেব্রুয়ারির সেই গান
কথা সুর সৃষ্টি হইররা
রাখছে মোগো দ্যাশের মান
মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর
বীর শ্রেষ্ঠ চিরকাল
মোগো দ্যাশের মেজর জলিল
মুক্তিযুদ্ধে ধরছে হাল ॥
ম্যা ভাই বরিশাল, বরিশাল মোগো বরিশাল
মোগো দ্যাশে বইয়া গ্যাছে
একছের নদী খাল ॥

[১] কথা ও সুর আরিফ হোসেন বাবু

(২)

বরিশালে আইয়ো বন্ধু
আইয়ো মোগো বাড়ি
আদর আন্তিক হরমু আনে
মোরা যদ্দুর পাড়ি।
মোডা চাউলের ভাত খাওয়ামু
খোপের রাওয়া দিয়া
দুর্গা সাগর, ঘুইড্ডার মরজিদ
দেহামু ঘুরাইয়া।
কীর্তন খোলা নদীডারে
সুগন্ধিয়া নদীডারে
নওয়ে দিমু পাড়ি ॥
বরিশালে আইয়ো বন্ধু
আইয়ো মোগো বাড়ি
আদর আন্তিক হরমু আনে
মোরা যদ্দুর পাড়ি।
মেয়া বাড়ির মরজিদ আছে
আছে অক্সফোর্ড মিশন
পুলাইন্না আর চৌধুরী বাড়ি
দেহারই মতোন,
লাকুটিয়ায় জমিদার বাড়ি
চাখার যাদুঘর
রব সেইরনাবাদ সেতু আছে
বড়োই মনোহর,
মুক্তিযোদ্ধা পার্ক- বদ্ধভূমি
বঙ্গবন্ধু উদ্যান
তোমার মনডা নেবে কাড়ি।
বরিশালে আইয়ো বন্ধু
আইয়ো মোগো বাড়ি
আদর আন্তিক হরমু আনে
মোরা যদ্দুর পাড়ি।
বিবির পুহইর পাড়ে খামু
ভাজা পোড়া যত,
হাপলার বিল, পেয়ারা বাগান
ঘুরমু মোনের মতো
গুনাই বিবির পালা দেহামু
বইলার রয়ানী হুনামু
আরও হুনমু জাড়ি।
বরিশালে আইয়ো বন্ধু
আইয়ো মোগো বাড়ি
আদর আন্তিক হরমু আনে
মোরা যদ্দুর পাড়ি।[৮]

পাদ্রীশিবপুরের সঙ্গীতের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে উপাসনা সঙ্গীত। এর ভান্ডার বেশ সমৃদ্ধ। আমরা শিশুকাল থেকেই এই সঙ্গীতের সাথে পরিচিত। তবে বর্তমান প্রজন্মের মাঝে এই সঙ্গীত চর্চার কেমন যেন ঘাটতি দেখা যায়। তারা এই সঙ্গীতের সাথে তেমন একটা পরিচিতও নয়। বর্তমান আকাশ সংস্কৃতির প্রতি অতিশয় আকর্ষণ আমাদের নতুন প্রজন্মকে শিকরের এই সব গান থেকে দূরে সড়িয়ে রেখেছে। আমরাও তাদের সঠিক পথ দেখাতে পারিনি।

আমাদের উপাসনা সঙ্গীতের দু'টি বিশেষ দিক রয়েছে। প্রথমত: প্রভু যীশু খ্রিস্টের যাতনাভোগকালে বা তপস্যাকালে দলগতভাবে প্রতিটি পরিবারে জপমালা প্রার্থনা অনুষ্ঠান করা হয়। এসময় কিছু সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় যা একান্তই আমাদের পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান সমাজের গান। তবে অনেক আগ থেকে পরিবেশিত এই সঙ্গীতের ইতিহাস আমরা সঠিকভাবে জানিনা। জানিনা এর সুরকার বা গীতিকারের নামও। কেবল বলতে পারি এই গানের কথামালা "স্বর্গদ্বার" নামক প্রার্থনা পুস্তককে অনুসরণ করেই রচিত হয়েছে। আর সেদিকের বিবেচনায় এই সকল গান বহু আমল থেকেই চলে আসছে এমনটিই ধারণা করা হয়। এই গানের সাথে আমাদের হৃদয়ের ভক্তি শ্রদ্ধা ও ধর্মীয় অনুভূতি মিশে আছে। আরও উল্লেখ করা যায় যে, পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টান লোকজন যেখানেই বসবাস করছেন, যেমন ঢাকা, চট্টগ্রাম

[৮]কথা ও সুর: জহুরুল ইসলাম

ও খুলনা শহরে তপস্যাকালে এই প্রার্থনা ও গান প্রতিবছরই প্রতি পরিবারে অনুষ্ঠিত হয়ে থকে। নিম্নে এই গানগুলো যা সংগ্রহ করা গেছে তা তুলে ধরা হলো:[৯]

(১)

নির্মলা উজ্জ্বলা উত্তমা মাতা
প্রণমী তোমায় জননী ॥
তুমি স্বর্গের রাণী যীশুর জননী
পাপ বিনা গর্ভধারিণী ॥
তংহি মাতঃ শান্তি দায়িনী
পাপীগণে তুমি সহায়কারিণী
কর মা দয়া ধন্যা মারীয়া আমাদের জীবনে
কৃপা কর গো মা
চাহ মা করুণা নয়নে
আশীষ দিবা রজনী।
মরণকালে চরণতলে
স্থান দিও মাগো আমার সকলে
যীশুর কষ্টের গান বাসনা মনে
কৃপা কর গো মা
শ্রীপদ ধরি সাধনা করি
আমরা দিবা রজনী ॥

(২)

শোন ভাইগণ অপূর্ব বচন প্রভু যীশুর কৃপা মহিমা;
মানব রূপেতে যে দয়া দেখাইলেন
জগতে নাই তার উপমা ॥
পাস্কারই ভোজন করি সমাপন হস্তেতে রুটি লইয়া
করি আর্শীবাদ, অতি প্রেমবাদ
বলেন সব শিষ্যেরে ডাকিয়া
ধর এই লও সকলেতে খাও আমার শরীর জানিয়া
পানপাত্র লইয়া আর্শীবাদ করিয়া
দিলেন নিজ রক্ত বলিয়া ॥
নজ ব্যবস্থায় শরীর রক্তময় দিলাম পাপ মোচনের তরে
উঠি দয়াময় নম্রতা দেখায়
পাও ধোয়ায় শিষ্যেরে আদরে ॥
প্রভু যীশু পরে বলেন সব শিষ্যেরে
তোমাদের মধ্যে একজন,
শত্রুগণ করে, সঁপিবে আমারে
বলিলাম সব ঠিক বচন ॥
শুনি শিষ্যগণ অতি দুঃখমন
যীশুকে জিজ্ঞাসা করে,
বল দয়াময় আমরা কে তোমায়
দিব হে শত্রুদের করে?
প্রভু তখনে বলে শিষ্যগণে
শোন বলি সেই বিবরণ,
আমার থালায় যে হাত ডুবায়
সমর্পণ করিবে সেই জন ॥
যীহুদাস পাপী বলে হে রাব্বী
আমি কি করিব এমন?
বলিতেছ তুমি কি বলিব আমি
এই কথা হবে আমেন ॥
যীশু দয়াময় শিষ্যগণে কয়
রজনী আসিবে যখন
বাঁধা পাইবে আমায় ত্যাজিবে
তোমরা সব শিষ্যগণ ॥
করি অহংকার বলিছে পিতর
শোন গুরু তুমি দিয়া মন,
অন্য সকলে তোমায় ছাড়িলে
আমি না ছাড়িব কখন ॥
শুনি দয়াময় পিতরেরে কয়
শোন পিতর বলি তোমায়,
মোরগ ডাকিবার আগে তিনবার
তুমি অস্বীকার করিবে।
প্রভু তখনে বলে শিষ্যগণে
রহ সবে জাগরণে,
আমি এখনে গেৎসিমানি বনে
যাব প্রার্থনার কারণে ॥

[৯] যাতনা ভোগের গানগুলো সংগ্রহে জন গোমেজ, পল তপন গোমেজ ও মেরীলিন গোমেজ

(৩)

গেৎসীমানি বনে শোকাকুল মনে বইসাছেন ও যীশু
প্রার্থনার কারণে।।
উবুর হইয়া ভূমিতে পড়িয়া ঈশ্বরকে ডাকিয়া
বলেন দুঃখ মনে (২)
যদি সম্ভব হয় সরে যেন যায়
এই পানপাত্র, অন্যকোন স্থানে ॥
কিন্তু দয়াময় মম ইচ্ছা নয়
পূর্ণ যেন হয়, যাহা তব মনে ॥
নরের পাপভার শিরেতে তাঁহার
কাঁপে থর থর অঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে ॥
রক্ত ঘর্মময় বাহির হইয়া যায়
এত দুঃখ সয় পাপীদের কারণে ॥

(৪)

প্রার্থনা শেষ করিয়া শিষ্যদের কাছে আসিয়া
দেখে তারা আছে ঘুমের ঘোরে ॥
উঠ উঠ উঠহে সবে শত্রু আসিবে এবে
আমাকে ধরিবার তরে ॥
যীহুদীর সৈন্যচয়, হেনকালে উপস্থিত হয়
ঢাল তলোয়ার মশাল হাতে করে ॥
যীহুদা সঙ্গে ছিল সঙ্কেতে বলিয়া দিল
গুরু বলি প্রণমী যীশুরে ॥
যীশু মিত্র বলি তারে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে
এলে মিত্র কিসের খাতিরে ॥
যে জন্য আসিয়াছ, শাস্ত্রপূর্ণ করিয়াছ
ইহারা তালাস করে কারে?
যীহুদীর সৈন্যের একজন পিতর করে কর্ণ ছেদন
যীশু তখন বলেন উচ্চ স্বরে,
খর্গ রাখ স্বস্থানে খর্গ মারে যেই জনে
খর্গের আঘাত পাইবে সে পরে ॥
চাহিলে পিতা এই স্থানে আসিতো দূতগণে
আমাকে রক্ষা করিবারে,
তা হইলে কিবা মতে শাস্ত্র পূর্ণ হবে জগতে
পাপমোচন হবে কেমন করে ॥
পিতরকে ইহা বলিয়া কাটা কর্ণ হাতে লইয়া
জোড়াইয়া দিলেন সেই সৈন্যেরে ॥
যীহুদীর সৈন্যগণে যীশু বলে তখনে
যীশু আমি হই ধরে লও আমরে ॥
যীশু ইহা বলিল সৈন্যগণ কম্পিত হইল
বেহু হইয়া পড়ে ভূমি পড়ে ॥
যীশু তাদের হাত ধরিয়া ভূমি হইতে উঠাইয়া
বলেন ভয় নাই ধরে লও আমারে ॥
যীহুদীর সৈন্যগণ যীশুকে ধরিয়া তখন
হস্তেতে বাধিল স্বজোরে ॥
যীশুকে ছাড়িয়া তখন
পালাইল সব শিষ্যগণ ॥
যীশুকে লইয়া তখন
চলে যায় কাইফাসের দরবারে ॥
পিতর সঙ্গেতে গেল গোপনে যাইয়া রহিল
কাইফাসের প্রাচীরের বাহিরে ॥
কাইফাসের বাড়ি যাইয়া মিথ্যা স্বাক্ষী বানাইয়া
যীশুকে দোষী ধার্য্য করে ॥
পিতর বাহিরে ছিল আগুন পোহাইতে ছিল
কতক লোক বসিয়া একত্রে ॥
কাইফাসের দাসী একজন
পিতরকে বলে তখন,
তুমি কি চিন হে যীশুরে?
পিতর বলে চিনি নাই
কি বল তুমি আমায়
আমি কভু দেখি নাই তাহারে ॥
সঙ্গীর লোক একজন পিতরকে বলে তখন
তার সঙ্গে দেখিয়াছি তোমারে ॥
পিতর দিব্য করি কয়, কভু তারে দেখি নাই
মিথ্যা কথা বল কি প্রকারে?
এইরূপে তিনবারে, যীশুকে অস্বীকার করে
গালি দেয় যে জিজ্ঞাসা করে ॥

হেনকালে মোরগ ডাকিল, যীশুর বাক্য মনে পড়িল
কান্দে পিতর দুঃখিত অন্তরে ॥
রাত্রি প্রভাত হইল, যীশুকে লইয়া গেল
শাসনকর্তা পিলাতের দরবারে ॥
পিলাত বিচার করিল, যীশু দোষী না হইল
পিলাত তখন বলিছে যীহুদীরে ॥
যীহুদীগণে কয়, যদি তুমি ছাড় ইহায়
জানাইবো রাজা সিজারেরে ॥
পিলাত চিন্তিত হইলো, মনে এক বুদ্ধি করিল
শাস্তি কিছু দিবহে যীশুরে ॥
পিলাত বলে সৈন্যগণে, শোন হে তোমরা সকলে
কোরার প্রহার কর হে যীশুরে ॥

(৫)

ভীষণ যাতনা যীশু সহিলেন পিলাতের ঘরে,
থামে বান্দি সেনাগণে কোরার প্রহার করে ॥
কন্টকের মুকুট মাথে কি বিষম যাতনা তাতে,
রুধির ধারা বহে অঙ্গে দেখিয়া মোর প্রাণ বিদরে ॥
কেহ তারে চড় মারে, থুথু দেয় তার মুখ পরে
পাপীগণ উদ্ধারিতে প্রভু ইহা সহ্য করে ॥
এই রূপে কষ্ট দিয়া থাম হইতে নামাইয়া
এখন মুক্ত করি ইহায় বলে পিলাত যীহুদীরে ॥
বিচারেতে দোষী নয় সে, কি করিব বল ইহারে?
যীহুদীর সৈন্যগণে, বলে মার ক্রুশ পরে ॥
বারব্বাস সে পাপী শ্রেষ্ঠ, নির্দোষী এই যীশু খ্রীষ্ট,
এই দুইজনের মধ্যে বল মুক্ত আমি করি কারে?
বারাব্বাসকে মুক্ত কর যীশুকে ক্রুশেতে মার
যীহুদীর সৈন্যগণে, বলে ইহা উচ্চস্বরে ॥
পিলাত হস্ত ধুইয়া বলে, শোন হে তোমরা সকলে,
নির্দোষীর রক্তের দায় নাহি কিছু আমাপরে ॥
বলে তখন যীহুদীগণ এই রক্তের দায় যেমন
চিরকাল ব্যাপী রহে আমাদের বংশপরে ॥
চাকুরীর ভয় মনে হইল, প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিল,
শাসনকর্তা পঞ্চপিলাত ধর্মভয় নাহি করে ॥

(৬)

১। পিলাত আজ্ঞা দিল বধিবারে
শুনিয়া প্রাণ বিদরে ॥
২। তারা যীশুকে লইয়া চলে হে
তারা কালভেরিয়ার পাহাড়ে ॥
৩। যীশুর ক্রুশ কাষ্ট স্কন্ধে দিল হে
যীশু পরে যায় ভূমি পরে ॥
৪। তাহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ হইল হে
দেখে মাতার হৃদয় বিদরে ॥
৫। দেখ শিমনকে বেগার ধরে হে
যীশুর ক্রুশ বহিবার তরে ॥
৬। ভেরোনিকা সাধ্বী স্ত্রীলোক হে
দেখে দয়া হইল অন্তরে ॥
তোয়াইল্লা আনিয়া দিল হে
যীশুর মুখ মুছিবার তরে ॥
ও তার ভক্তিতে মুখের ছবি হে
উঠলো তোয়াইল্লার উপরে ॥
৭। যীশু চলিতে অশক্তি হইলো হে
প্রভু তিনবার ভূমিতে পড়ে ॥
৮। নানান কষ্ট দিয়া সৈন্যগণ হে
নিল কালভেরিয়া পাহাড়ে ॥
৯। যীশুর গায়ের কাপড় খুলে নিল হে
সবে নিল গুলিবাট করে ॥
দেখ শাস্ত্র বচন পূর্ণ হইলো হে
যাহা লেকা পুরান শাস্ত্রেতে ॥
১০। ক্রুশ কাষ্ঠ স্থাপন করলো হে
যীশুর হস্ত বিস্তার করে ॥
১১। ও তার মাতার সাক্ষাতে যীশুকে
তারা ক্রুশ বিদ্ধ করে ॥

১২। ক্রুশ কাষ্ঠ খাড়া করলো হে
রাখে দুইজন চোরকে দুইধারে ॥
যীশু সৎ চোরকে স্বর্গে নিল হে
কেবল তার বিশ্বাসের জোরে ॥
১৩। যীশু দেখায় আশ্চর্য্য দয়া হে
ক্ষমা করে ঘাতকেরে ॥
১৪। প্রভুর পিপাসা হইল ভারী হে
তারা সিরকা খেতে দেয় তারে ॥
১৫। ও তার মাতাকে সমর্পন করে হে
শিষ্য যোহনের করে ॥
১৬। উচ্চস্বরে ডাকে পিতাকে
যীশু শেষে প্রাণত্যাগ করে ॥
১৭। জগত অন্ধকার হইলো হে
হইলো ভূমিকম্প সজোরে ॥

(৭)
ক্রুশতলে যীশুকোলে মারীয়া
করে রোদন দুঃখিত মন বিদরে তাহারো হিয়া ॥
পুত্রের মরণ শত্রুর হাতে
নিষ্ঠুর রূপে ক্রুশেতে
মায় কী ইহা পারে সইতে
কান্দে পুত্র কোলে লইয়া ॥
কোথায় গেলি ও বাছাধন
না হেরী তোমারই বদন
কিরূপে বাঁচিবে জীবন
তোমাকে বাপ হারাইয়া ॥
পাপীদের পাপের তরে
মর তুমি ক্রুশ পরে
দেখিয়া মোর প্রাণ বিদরে
ডাকরে বাপ মা বলিয়া ॥

(৮)
যীশুর কবরে অতি কাতরে মাতা কেন্দে বলে
কোথায় যাইরে ॥
একমাত্র পুত্র যীশু বাছাধন
সেই ধনে আমি হারাই এখন
কিরূপে ধরিব জীবন
আমার যীশু বিনে কেহ নাইরে ॥
মায়ের সাক্ষাতে পুত্রের মরণ
দেখিলে কি মাতার বাঁচে জীবন
মা বলে বাছা জুড়া এ জীবন
আমায় মা বলিতে কেহ নাই রে ॥
কবরেতে বাপ রাখিয়া তোমায়
চলিলাম গৃহে নির্দয়া হৃদয়
নিজ বাক্যমত উঠ পুণঃরায়
তোমায় দেখে প্রাণ জুড়াইরে ॥

(৯)
পাপেরত মন সদা কুপথে গমন
পরকালের চিন্তা নাইরে ॥
ভাবিতেছ সদা আমারই আমার
অসার সংসারে কিছু নাই তোমার
দুই চক্ষু মুদিলে জগৎ অন্ধকার
ভবে তোমার বলতে কিছু নাইরে ॥
দারা পুত্র আর ভাই ও বন্ধুগণ
যেমন পথিকে পথিকে পথের আলাপন
এদেহ ছাড়িয়া যাইবে যখন
তখন সম্পর্কে আর কিছু নাই রে ॥
রাজ্য আর সম্পত্তি আছে যত ধন
পড়িয়া রহিবে রতন কাঞ্চন
এ সংসার ছাড়িয়া যাইবে যখন
কিছু সঙ্গে নিবার সাধ্য নাইরে ॥

শ্বতবর্ণ হইলো শ্যামবর্ণ চুল
তথাপি হে তোমার নাহি গেল ভুল
কাল সমন আসিয়া ধরিবে যখন
তখন কাঁদলে কোন উপায় নাই রে ॥

পরকালের ধন না করি অর্জন
মায়ার কুহকে ভুলে রইলো মন
কি উপায় হইবে মরিবে যখন
তখন যীশু বিনা কেহ নাই রে ॥

(১০)
কৃপা কর দয়াল যীশু
আমরা সবে লোভী নরে ॥
যেন মোদের কঠিন প্রাণ
লোভ হইতে আসে ফিরে ॥
যীহুদাস পাপী হৃদয় কিছুতে ফিরিল না
আমরা সবে তাহার মতো মত্ত আছি চরাচরে ॥

আমরা সকল বিষয়বোগী
ধনেতে অনুরাগী
নম্র কর মোদের হৃদয়
তুমি যীশু নিজগুণে।।
মহা বিচারের দিনে থাকি যেন দক্ষিণে
তোমার প্রিয়পাত্র হয়ে
যেতে পারি স্বর্গপুরে ॥[১০]

পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টান সমাজের উপাসনা সঙ্গীতের বড় একটি অংশ জুড়ে রয়েছে ধর্মীয় কীর্তন গান। এই সঙ্গীত বিশেষতঃ বড়দিনকে কেন্দ্র করেই পরিবেশিত হয়। এই সঙ্গীত বড়দিনের কীর্তন হিসেবেই পরিচিত। পাদ্রীশিবপুর গ্রাম, ঢাকা শহর ও চট্টগ্রাম শহরে এই সঙ্গীত পরিবেশিত হয় বড়দিনের পূর্বের রাতে। তবে শহরে তা কয়েকদিন পূর্বেই পরিবেশিত হয় এজন্য যে পাদ্রীশিবপুরের বেশিরভাগ লোকই বড়দিন অনুষ্ঠানে গ্রামের বাড়িতে যায়। কিছু কীর্তন গান নিম্নে তুলে ধরা হলো[১১] এই গানগুলো রামুয়েল গোমেজের পালাগানের যীশুর জন্ম পর্ব থেকে সংকলিত

(১)
প্রেম কে নিবিরে আয়, প্রেমের লহর বয়ে যায়
প্রেমের লহর বয়ে যায় ॥ (২ বার)
আয় আয় পাপী, আয় আয় তাপী
অন্ধ খঞ্জ কে কোথায়
পাপীতাপী তড়াইতে যীশু এল এ ধরায় ॥

পিতা পুত্র পবিত্র আত্মা, তিন এক কভু ভিন্ন নয়
যীশুর চরণ কর স্মরণ, পাপ তাপ সব দূরে যায়।
হেন রামু বলে অন্তিমকালে স্থান দিও ঐ রাঙ্গা পায়।
যীশুর নামটি গাওরে সবে, মানব জনম বৃথা যায়
হিপ হিপ হুররে বল সকলে
যীশুর জনম পালা হল সার ॥

(২)
আয়রে ওভাই আয়রে সবাই প্রেমানন্দে যাই
তালে তালে পাটি ফেলে যীশুর নামটি গাই।
পাপী তাপী তরাইতে আরত কেহ নাই-

ত্রাণকর্তা এসেছে ভবে আয়না ছুটে যাই ॥
পুঁজবো তারে সোহাগ ভরে চলনা সবে ভাই ॥

[১০] যাতনাভোগের গানগুলো সংগ্রহে জন গোমেজ, পল তপন গোমেজ ও মেরীলিন গোমেজ
[১১] এই গানগুলো রামুয়েল গোমেজের পালাগানের যীশুর জন্ম পর্ব থেকে সংকলিত

(৩)
মোরা এসেছি পুঁজিতে তোমারে
মন কুসুম লয়ে ভক্তি চন্দন দিয়ে
প্রীতি স্নেহ প্রেম উপহারে ॥

দীন দরিদ্র মোরা, কিছুতো নাহি সম্বল
চরণ ধোয়াতে প্রভু রেখেছি নয়ন জল
সতত হৃদয় মাঝে, নব প্রেম অনুরাগে
বসাইতে হৃদয় মাঝারে।[১০]

পাদ্রীশিবপুরের ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীতের মধ্যে রয়েছে ''মৃতুঞ্জয়ী প্রভু যীশুর পালা গান'' যা রামুপালা হিসেবেই সকলের কাছে পরিচিত। এই পালার বিষয়ে প্রথমেই বলতে হয় কীর্তনীয়া র‍্যামুয়েল ফ্রান্সিস গোমেজ এই পালাগান প্রথম পরিবেশন করেন। যা আজও চলে আসছে। এই পালাগান আলাদাভাবে এই পুস্তকের দ্বাদশ ভাগে: পরিশিষ্ট-২ অংশে উপস্থাপন করা হল। এই পালাগানের ঐতিহ্য ও ইতিহাস সকলের জ্ঞাতার্থে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

বরিশাল ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত বাখেরগঞ্জ উপজেলার পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীতে রামুর পালা নামে যে পদাবলী কীর্তন প্রচলিত আছে; তার রচয়িতা শ্রী কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন একজন হিন্দু পুরোহিত। তাঁর বাড়ি ছিল বর্তমান ঝালকাঠি জেলা (তৎকালীন বাখেরগঞ্জ) শহরের উত্তরপূর্বে অবস্থিত সুতালড়ী গ্রামে।

শ্রী কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী কলিকাতায় পড়াশুনা করেছিলেন। তিনি বহু বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তিনি নিজে কীর্তন রচনা করতেন, সুরারোপ করতেন এবং পরিবেশন করতেন। শোনা যায়, তিনি বহু ভাষায়ও পারদর্শী ছিলেন। পাদ্রীশিবপুরের শ্রীমন্ত নদীর পূর্ব পার্শ্বের গ্রাম কৃষ্ণকাঠির হাওলাদার বাড়ির সাথে তাঁর আত্মীয়তা ছিল। হাওলাদারবাড়ি এ অঞ্চলে পাটনী বাড়ী নামেও সুপরিচিত ছিল। এ বাড়িতে তিনি মাঝে মাঝে গানের আসর বসাতেন ও পূজা অর্চনা পরিচালনা করতেন।

তৎকালে কোন পূজা-আরাধনায় উপস্থিত থাকতে খ্রিস্টানদের তেমন উৎসাহ দেয়া হত না। কিন্তু পাদ্রীশিবপুরের দক্ষিণ কান্দায়, দীঘির পাড়ের পোষ্ট মাষ্টার বাড়ির ফিলিপ ডি' কস্তা; যিনি এ অঞ্চলে পোষ্ট মাষ্টার হিসেবেই অধিক পরিচিত ছিলেন, তাঁকে তাঁর চাকুরির জন্য এ অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় থাকতে হতো এবং এ সমস্ত পূজা পার্বণে তাঁর বন্ধু বান্ধবদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্যে তাদের বাড়িতে যেতে হতো। তখনকার দিনে পূজা-পার্বণ উৎসবে গ্রাম বাংলায় এধরনের কীর্তন প্রায় সবখানেই অনুষ্ঠিত হতো। ফিলিপ ডি'কস্তা এরকম অনেক কীর্তন আসরে যোগদান করতেন।

যদিও কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী একজন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, তথাপি তিনি খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে তেমন কিছু জানতেন না। তাই খ্রিস্টধর্ম তথা যীশুর জীবনী আয়ত্বে আনার জন্যে তিনি সর্বপ্রথম 'স্বর্গদ্বার' নামে একটি ধর্মপুস্তক সংগ্রহ করেন। পুস্তকখানি তৎকালে ক্যাথলিক ধর্মশিক্ষার অন্যতম প্রধান পুস্তকরূপে পরিচিত ছিল। তিনি পুস্তকটি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং সেই ধর্মপুস্তকের ওপর ভিত্তি করে যীশুকে কেন্দ্রীয় বিষয় করে ধর্মীয় পালাগান রচনা করেন। র‍্যামুয়েল গোমেজ (রামু) গুরু

কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী থেকে কীর্তন গান শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং একজন দক্ষ ও সুনিপুন কীর্তনীয়া হওয়ার জন্য প্রথম থেকেই যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। সমস্ত কীর্তনটি শিখতে তাঁর প্রায় এক বছরকাল সময় লেগেছিল।

সর্বপ্রথম যুবক রামু ফিলিপ ডি'কস্তার বাড়িতে কীর্তন পরিবেশন করেন। সেখানেই ফিলিপ ডি'কস্তার বাড়িতে কীর্তন পরিবেশন করেন। এরপর থেকে বিভিন্ন সময়ে র‍্যামুয়েল ও কালীপ্রসন্ন কীর্তন পরিবেশন করতেন। ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন বাড়ি থেকে তাঁদের নিমন্ত্রণ আসতো এবং গ্রামের সবাই এ কীর্তন শোনার জন্যে উদগ্রীব থাকতো। এমনকি হিন্দু-মুসলমানগণ খ্রিস্টানদের এধরনের গান শুনতে পেয়ে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে যেতো এবং তারাও কোথাও গানের আসর হলে সেখানে উপস্থিত হতো। পাল পুরোহিত রেভাঃ ফাদার এফ ফিনো সিএসসি-এর সময় সর্বপ্রথম গির্জা বাড়িতে এই পালাকীর্তন পরিবেশন করা হয়।

এই গ্রন্থের ত্রয়োদশ ভাগে পরিশিষ্ট -১: "রামুর পালা" শিরোনামে ফাদার জীবন গোমেজ কর্তৃক তথ্য সংগ্রহ করে এবং যোসেফ ডি'রোজারিও-এর সম্পাদনায় ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত "মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রীষ্ট" ধর্মীয় পালা গান পুস্তিকাটি হবহু পুনঃমুদ্রিত হয়েছে।[১২]

এছাড়াও আমদের গ্রামে কৃষিকাজ নিয়ে, মাছ ধরা নিয়ে এবং ফসল সংগ্রহ নিয়েও অনেক গান আছে যা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তবে আমাদের সঙ্গীত তথা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল যে বিস্তৃত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

[১২] ''মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিষ্ট'', তথ্য সংগ্রহে ফাদার যোসেফ জীবন গোমেজ এব সম্পাদনায় যোসেফ ডি'রোজারিও, ১৯৯৩ খ্রি.

তৃতীয় অধ্যায় ঃ বসতবাড়ি, ভূ-সম্পত্তি ও জীবন স্টাইল

পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান জনবসতির দিকে লক্ষ্য রেখে বসতবাড়ি, জমি সম্পত্তি ও জীবন স্টাইল নিয়ে আলোকপাত করতে হলে আমাদের অতীতের দিকে তাকাতে হয়। কারণ বিষয়টি সময়ের সাথে সাথে বিবর্তিত হয়েছে। তবে অনেক পিছনে না গিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বে এবং স্বাধীনতার পরে মানুষের বসতবাড়ি, জমি সম্পত্তি ও জীবন স্টাইল নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

॥ ক ॥ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বের বসত বাড়ি

পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান জনপদটি তুলনামূলকভাবে অত্র এলাকার তথা ইউনিয়নের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর চেয়ে সবসময়ই উন্নত ছিল এবং বর্তমানেই তেমনটিই আছে। বসত বাড়ির বিবেচনায় আমরা দেখতে পাই পাকিস্তান আমলের প্রথম দশক পর্যন্ত অধিকাংশ খ্রিস্টান লোকজনের বসত বাড়িতে ছিল মাটির ভিতের উপরে কাঠের বা বাঁশের অবকাঠামোর উপরে গোলপাতার ছাউনী এবং ঘরের দেয়াল (আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় ব্যাড়া) ছিল মলি বাঁশের বুননী দিয়ে তৈরি। এই অবস্থাটি খ্রিস্টান সমাজের ৯০% লোকের বাড়িতেই ছিল। তবে সীমিত ঘর ছিল টিন সেড । এই ঘরগুলি ছিল এলাকার অভিজাত পরিবারের বসতবাটি। আবার দু'একটি পাকা বাড়িও ছিল। টিনের ঘরগুলির আবার দোচালা, চৌচালা, কোনটি আবার দোতলাও ছিল। কোন কোন টিনের ঘরের শোভা বৃদ্ধির জন্য টিনের ঝালর ছিল। ঘরের কাঠের দরজায় ও জানালার কপাটে বিভিন্ন কারুকার্য করা ছিল। কারো কারো বাড়িতে কাঠের কারুকার্য খচিত সিন্ধুকও ছিল। এই ঘরগুলো মূলত অভিজাত পরিবারের ছিল। এর মাধ্যমে আমাদের এলাকার কাঠের শিল্পীদের শিল্পকর্ম সম্পর্কে আমরা ধারণা লাভ করতে পারি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন দু'তিনটি পাকা ঘর ছাড়া বাকী টিনের ঘরের ভিত ছিল মাটির।

যদিও মাটিরঘরে বসবাসকারী লোকজনের সংখ্যা বেশী ছিল তবুও এসকল বসত বাড়ির বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রতিটি বাড়িতেই প্রবেশ পথ আছে যা মূল সড়কের সাথে সংযুক্ত। তবে সকল পথই ছিল মেঠোপথ। বর্ষাকালে হাঁটার সুবিধার্থে সুপারি গাছ বা তাল গাছ দিয়ে শাকোর ব্যবস্থা করা হতো। প্রতিটি বাড়ীর সীমানা নির্ধারণের জন্য বাড়ির চারিদিকে ব্যার (নালা) ছিল। প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই পুকুর ছিল। এই পুকুর বা ব্যারের পানি দিয়ে রান্নাবান্না, স্নান করা, কাপড় চোপর ধোয়া ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা হতো। আর এই সব পুকুরে প্রচুর মাছ পাওয়া যেতো। তখনকার দিনে মাছ চাষের কোন প্রয়োজন ছিল না, খাল ও নালা দিয়ে মাছ এমনিতেই পুকুরে প্রবেশ করতো। মাছের বসত করার সুবিধার জন্যে প্রতিটি পুকুরে ঝাউ (গাছের ডালপালা) দেয়া হতো।

বসত বাড়ির মূল ঘরের প্রায় প্রতিটিতেই কমপক্ষে একটি বারান্দা (আইত্না) ছিল। ঘরে ওঠার জন্যে মাটির পোতা (সিড়ি) ছিল। ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করার জন্য ঠ্যাংগা (বাঁশের বা কাঠের লম্বা টুকরা) ব্যবহার করা হতো। প্রতিটি ঘরেই কমবেশী মাটির হাড়ি-পাতিল তথা তৈজসপত্র ছিল। মূল ঘরের সাথে লাগোয়া একটি ছোট ঘর ছিল। এই ঘরটি ওশ্যাঘর হিসেবে সুপরিচিত ছিল। এই ঘরটিকে খাবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এই ওশ্যাঘরের সাথে আরও ছোট্ট আকারের এহাচালা (একচালা বিশিষ্ট) ঘর ছিল। এই ঘরে রান্নাবান্না করা হতো। রান্না করা হতো মাটির উনুনে (চুলা)। গ্রামের মহিলাগণ নিজেরাই এই চুলা তৈরি করতো।

ঘর মাটির হলেও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে সবাই সচেতন ছিলেন। কারো কারো বাড়িতে ধান মজুদ রাখার জন্যে গোলাঘর ছিল। পরিবারের সদস্যদের খাবারের চাল (চাউল) সংরক্ষণ করার জন্যে মটকা ব্যবহার করা হতো। মাটির কলসিতে পানীয় জল রাখা হতো। এই জল পাদ্রীশিবপুরের ফাদার বাড়ি (মিশন) সংলগ্ন কাচারি পুকুর এবং দীঘির পাড় (দক্ষিণ)-এর দীঘি পানীয় জলের উৎস। এই সময় কোন টিউবওয়েল বা পানীয় জলের অন্য কোন উৎস সোর্স ছিল না। তবে বর্ষার সময় বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করে তা পান করা হতো।

প্রতিটি বাড়ির সাথেই সরাসরি রাস্তার সংযোগ রয়েছে। তাই বাড়ির পথটুকু পেড়িয়েই মূল রাস্তায় ওঠা যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় সকল রাস্তাই ছিল মাটির। কেবল ফাদার বাড়ি সংলগ্ন এলাকা, সিস্টার বাড়ি, এডিসি, স্কুল এলাকায় ছিল ইটের রাস্তা। আর ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে, সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলের নতুন ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হলে, ঐ স্থানের পুরাতন দালানের ইট সুরকি দিয়ে ফাদার বাড়ি থেকে পশ্চিম দিকের রাস্তাটি পশ্চিম-কান্দা খ্রিস্টান গ্রামের বর্তমান সীমানা পর্যন্ত ইটের পাকা রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল। বসত বাড়ির প্রতিটি বাড়িতেই ঘরের সামনে একটি উঠান আছে, অতীতেও এমনটি ছিল। যে সকল বাড়িতে একাধিক ঘর ছিল তা উঠানের এক প্রান্তে নির্মাণ করা হতো যাতে ঘরের সামনে বেশ কিছু জায়গা খোলামেলা থাকে। এর পিছেনে একটি বড় কারণ ছিল ধান রাখার জন্যে, ধান মাড়াই করার জন্যে এবং ধান শুকানোর জন্যে এই উঠান ব্যবহার করা হতো। প্রতিটি বাড়িতেই কমবেশী ফলজ বৃক্ষ ছিল। এগুলো বাড়ির চারিদিকে রোপন করা হতো আবার বাড়ির পিছন দিকে খালি জায়গাতেও এই বৃক্ষ রোপন করা হতো। বৃক্ষগুলির মধ্যে নারকেল, সুপারি, আম, জাম, পেয়ারা, চালতা, গাব, জামরুল, তাল, বড়ই, ডউয়া, তেতুল, বাংলা আমরা, ইত্যাদি গাছ ছিল। যেহেতু মাটির চুলায় রান্না করা হতো তাই জ্বালানী হিসেবে লাকড়ী ব্যবহার করা হতো। আর এজন্যে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই এক বা একাধিক রেন্ডি (রেইনট্রি) গাছ ছিল। ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি বিশালাকার রেন্ডি গাছের বড় বড় ডালপালা কেটে লাকড়ীর ব্যবস্থা করা হতো। তখনকার বাড়িতে উঠান শুকনো মৌসুমে গোবর দিয়ে লেপন করা হতো। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই এক বা একাধিক গবাদি পশু ছিল। বিশেষ করে গাভী লালন পালন করে ঘরের সদস্যদের পুষ্টির চাহিদা মিটানোর পাশাপাশি দুধ বিক্রয় করে সাংসারিক খরচও নির্বাহ করা হতো। ঘরের ভিত (পোতা) যেহেতু মাটির ছিল সেজন্যে ঘরের সামনের ওডা, পিড়া, ঘর ও বারান্দার খাডাল মাটি দিয়ে লেপন করা হতো। এই লেপনের কাজে তালপাতার ডাটা ব্যবহার করা হতো, কেহবা মোটা চিরুনীও ব্যবহার করতো। এদের সাহায্যে লেপনের কাজে কারুকার্য ফুটিয়ে তোলা হতো। গ্রামের নারীদের কাছে এই লেপনের কাজ ছিল একটি আর্ট। সুন্দর করে ডিজাইন করার একটি প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতাও ছিল। প্রকৃতপক্ষেই লেপনের কারুকাজের মাধ্যমে ঘরের গৃহিণীর সৌন্দর্য দক্ষতা প্রকাশ পেতো। বেশীরভাগ ঘরেই মাটিতেই এই হোগলা বা পাটি বিছিয়ে ঘুমের আয়োজন করা হতো। তবে তুলনামূলক অবস্থা সম্পন্ন পরিবারে পাটির ব্যবহারও হতো। খুব কম সংখ্যক পরিবারে চৌকির ব্যবস্থা বা খাটের ব্যবস্থা ছিল। প্রতিটি ঘরেই ছিল একটি ফুলমাচা। এখানে যত্ন করে বিছানার সামগ্রী রাখা হতো। তবে বর্তমানে এই ফুলমাচা আর নেই।

প্রতিটি বাড়িতেই শয়নের জন্য ব্যবহার করা হতো হোগলা। রাতে প্রদীপ জ্বালানোর ব্যবস্থাও ছিল একটু আলাদা ধরনের। কুপি বাতির প্রচলন ছিল ব্যাপক আর এই কুপিবাতি রাখার জন্য দেউড়া ব্যবহার করা হতো। এই দেউড়াও আবার সুন্দর করে ডিজাইন করা হতো। দেউড়া কাঠ দিয়ে তৈরি করা হতো। আবার কুপি বাতি ফানুসের মধ্যে নিয়ে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি যাওয়া হতো।

পাদ্রীশিবপুর গ্রামটি যেহেতু একদিকে প্রাচীন অন্যদিকে তুলনামূলকভাবে উন্নত, তাই লৌকিকতা বা লোকাচারের দিকে থেকে প্রতিটি বাড়ির লোকেরাই ছিলেন যত্নশীল। ঘরে অতিথি বা আত্মীয়স্বজন এলে তাদের সামর্থ অনুসারে আপ্যায়নের চেষ্টা করা হতো। এই সব অতিথিদের বসার জন্যে জলচৌকি দেয়া হতো। প্রতিটি বাড়িতেই পিতলের বাটি, গ্লাস, বাসন ব্যবহার করা হতো। আর অতিথিদের এই সব পিতলের পাত্রেই খাবার পরিবেশন করা হতো। আমাদের গ্রামে অতিথি আপ্যায়নে প্রাচুর্য না থাকলেও প্রতিটি ঘরেই পান তামাকের ব্যবস্থা ছিল।

বসত বাটির কথা বিবেচনা করলে এরও একটি দিক উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমাদের এলাকাটি কৃষিপ্রধান এলাকা। প্রায় প্রতিটি পরিবারেরই কমবেশী কৃষি জমি আছে। তাই প্রতিটি বাড়িতেই ধানের আঁটি উঠানে সারিবদ্ধভাবে রাখা হতো। কোন কোন পরিবার সরাসরি কৃষি কাজে সম্পৃক্ত ছিল। তাদের উঠানে ধানের পরিমাণ বেশী থাকতো। আমন ধানের সময় এই ধান উঠানেই গরুর সাহায্যে মাড়াই করা হতো। আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় এই কাজকে বলা হয় ধান মলাই। আবার ধানের পরিমাণ কম হলে লোকেরা পা দিয়ে এই মাড়াই কাজ সম্পন্ন করতো। ফসলের কথা বিবেচনা করলে আমরা দু'টি ফসল পেতাম। আমন ধান এবং আউশ ধান। আউশ ধান শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে কাটা হতো। এসময় বর্ষাকাল বিধায় এই ধান উঠানে রাখা সম্ভব হতো না। তাই তা ঘরের বারান্দায় রাখা হতো। এই ধান মাড়াইয়ের কাজ লোকেরা নিজেদের পা দিয়েই ঘরের ভিতরে করতো। ধান শুকানোর জন্যে তখন বেশ কষ্ট করতে হতো। যেসকল পরিবার নিজেরা কৃষিকাজে নিযুক্ত ছিল না তারা অধিকাংশই বর্গাচাষীদের মাধ্যমে তাদের জমি চাষাবাদ করাতো। তবে ধান ঠিকই জমির মালিকের বাড়িতেই জমা করা হতো এবং মাড়াই করার পরে সমান দুইভাগে ভাগ করে চাষী ও গৃহস্থ স্ব স্ব অংশ বুঝে নিতো। ধান জমা করে রাখার জন্যে বড় বড় ডোলা ব্যবহার করা হতো। আর ধান বা চাল মাপার জন্যে ব্যবহার করা হতো পুড়া। গ্রামের প্রতিটি বাড়িতেই উঠানের এক প্রান্তে ছিল খড়ের গাঁদা বা কুড়। এই খড় গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতো।

॥ খ ॥ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরবর্তী বসত-বাড়ি

গ্রামের বসত-বাড়ির অবস্থান বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে যা ছিল স্বাধীনতা লাভের পরেও তেমনটিই রয়ে গেছে। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পূর্ব থেকে প্রথম দশকের বসত বাড়ির ঘর দুয়ারের অবস্থা ইতোমধ্যেই তুলে ধরা হয়েছে। তবে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে বসত-বাড়ির ব্যাপক পরিবর্তন হতে শুরু করে। এর অন্যতম প্রধান কারণ পাদ্রীশিবপুরের অনেক বাড়ি থেকেই পুরুষেরা খুলনা, চট্টগ্রাম ও কোলকাতায় বিভিন্ন পেশায় কাজ করতে শুরু করেন। ফলে এই সময় কৃষির উপর নির্ভরতার পরিবর্তে চাকুরী করে রোজগার করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। চাকুরীর কারণেই অনেক পরিবারে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আসে। আমাদের গ্রামের বেশ কয়েকজন লোক জাহাজেও

চাকুরীতে গিয়েছেন। তাই তাদের আর্থিক উন্নতির সাথে সাথেই ঘর-দুয়ারের উন্নতি ঘটতে থাকে। ফলে মাটির ভিতের উপরে কাঠের অবকাঠামোর সাথে টিনের চালা দিয়ে ঘর নির্মাণ করা হয়। পাদ্রীশিবপুরের মাটির ঘরের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। হাতে গোনা দুচারটি ঘর ছাড়া সকল ঘরই টিনের চালা দিয়ে তৈরি হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে আশির দশকে আরও পরিবর্তন সূচিত হয়। অনেকেই মাটির ভিতের স্থলে পাকা ভিত এবং ভিতের চারিদিকে ইটের দেয়াল দিয়ে ঘর তৈরি করে। এর ফলে এক সময় গ্রামের অনেক বাড়িতেই সিঁধ কেটে যে সিঁধেল চোরেরা চুরি করতো তা বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ অধিকতর নিরাপত্তা বোধ করে। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সমগ্র পাদ্রীশিবপুরে টিনের ঘর নির্মিত হয়। আমাদের গ্রামের যারা ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের পরে জন্মগ্রহণ করেছে তারা কুঁড়ে ঘর বা গোলপাতার ছাউনি দেয়া ঘর দেখতে পায়নি। তবে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বেসরকারী সাহায্য সংস্থা "কোর"-এর মাধ্যমে পাদ্রীশিবপুরের যাদের কুঁড়েঘর ছিল তাদের টিনের ঘরের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। ফলে ছোট আকারের হলেও টিনের ছাউনি দিয়ে নির্মিত ঘর সমগ্র পাদ্রীশিবপুরেই দেখা যেতো।

সাম্প্রতিক কালের কথা যদি বিবেচনা করি তবে দেখা যায় ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান পর্যায় পর্যন্ত অনেক বাড়িতেই বড় বড় আধাপাকা ও এক/দ্বিতলা দালান গড়ে উঠেছে। একতলা বা দোতলা দালান ঘর এখন প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই দেখা যায়। আবার অন্যদিকে প্রতিটি ঘরেই পল্লীবিদ্যুতের সহায়তায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে। ফলে রাতের পাদ্রীশিবপুর এখন আলোকিত পাদ্রীশিবপুর। তবে একথা বলা দরকার যে পল্লীবিদ্যুতের পূর্ব থেকেই সীমিত এলাকায় ডেসার বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল। তারও আগে বৃটিশ আমল থেকেই মিশন এলকায় ফাদার বাড়ি, স্কুল, সিস্টার বাড়ি, ফাতিমা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বোর্ডিং, কমিউনিটি হল এই এলকায় জেনারেটরের সাহায্যে বিজলীবাতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সময়টা ১৮৬৫ সালের পর কোন একটি সময়ে।

বর্তমানে প্রতিটি বাড়িতেই আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। মাটির উনুনের জায়গা দখল করেছে গ্যাসের চুলা। জলচৌকির স্থলে চেয়ার বা সোফাসেট ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রতিটি বাড়ির রাস্তাই এখন পাকা। গ্রামের চলাচলের রাস্তাঘাট পাকা হয়ে গেছে। যানবাহনের আধিক্য বেড়েছে। এখন সহজেই ইঞ্জিন চালিত রিক্সা বা অটো রিক্সায় করে গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত এমনকি উপজেলা সদরেও যাতায়াত করা যায়।

তবে চিরচেনা গ্রামের বাড়িগুলো যেন পল্লীর মর্যাদা হারিয়ে শহুরে আদল লাভ করেছে। খড়ের গাঁদা বা কুড়, মটকা, ফুলমাচা, একচালা এবং ওশ্যাঘর এখন কল্পনার রাজ্যে বাস করছে। আগের দিনে প্রতিটি বাড়িতে অতিথি আপ্যায়নের জন্যে ফিকা চা, চাউলভাজা, মুড়ি, গুড় ইত্যাদিসহ পান সুপারীর আয়োজন এখন নাই বললেই চলে। তবে কিছু কিছু পরিবারে পান সুপারির আয়োজন আজও আছে। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে অতিথি আপ্যায়নে রকমারী সিরামিকের তৈজসপত্র ব্যবহার সকরা হয়। এখন চা বা কফির সাথে বিস্কুট, কেক বা পিঠা পরিবেশন করা হয়। তামাকের প্রচলন নেই বললেই চলে। সে স্থানটি দখল করেছে বিভিন্ন ব্রান্ডের সিগারেট। প্রতিটি বাড়িতেই ডিস সংযোগসহ রঙ্গিন টেলিভিশন রয়েছে। মোবাইল ফোনসহ আধুনিক মিডিয়ার সাথে গ্রামের প্রায় সবাই সুপরিচিত। বাড়ির

নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে অনেক বাড়িতেই সিসি ক্যামেরা সংস্থাপন করা হয়েছে। পাদ্রীশিবপুরে প্রবেশ করলে, বিশেষ করে খ্রিস্টান গ্রামে মনে হয় এযেন আলোর ঝলমল কোন শহরতলী। মানুষজন বেশ আরাম আয়েশে জীবন-যাপন করছে। সেই সাথে সবুজের সমারোহ হারিয়ে যেতে বসেছে। ফলজ বৃক্ষ এখন খুবই কম। বাড়িতে বাড়িতে দেখা যায় না ধানের আঁটির স্তুপ, নেই গোয়াল ঘর বা গোয়াল ঘরের গরু। সকল বাড়িই যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা। বাড়িগুলিতে দালান কোঠা হলেও সদস্য সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। বিশেষ করে পুরুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে।

॥ গ ॥ ভূ-সম্পত্তি

পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জমিজমার পরিমাণ সীমিত, কয়েকটি পরিবারে বেশী। আর বাকীদের কিছু কিছু জমিজমা রয়েছে। এক সময় আমাদের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের কেহ কেহ জমিদার ছিলেন। তাদের ভূসম্পত্তিও ছিল ব্যাপক। কিন্তু কালক্রমে অনেকেই জমিজমা বিক্রি করে দিয়েছেন, আবার যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবার হওয়াতে জমিগুলোও ভাগ হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। যাদের জমি আছে বা আগেকার সেই জমিদার শ্রেণীর লোকজনও নিজেরা জমি চাষাবাদ করে না। অধিকাংশ জমির মালিকই তাদের জমি বার্ষিক চুক্তিতে টাকার বিনিময়ে অন্য কৃষকদের চাষাবাদ করেতে দেয়। আবার কিছু কিছু পরিবার আছে যারা নিজেরা চাষাবাদ না করলেও বর্গা চাষীদের দিয়ে জমি চাষ করিয়ে ফসলের ভাগ গ্রহণ করে। অতীতে প্রায় সকল বাড়িতেই বাড়ি সংলগ্ন ভিটেবাড়ি ছিল যেখানে বাগান করে সবজি উৎপাদন করা হতো, সেই জমিতে এখন ঘরবাড়ি নির্মিত হয়েছে। এটিও যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবার হবার একটি ফল। বর্তমানে যৌথ পরিবারের সংখ্যা নিতান্তই নগন্য। ফলে ছোট ছোট পরিবার তাদের নিজস্ব বসবাসের জন্যে আলাদা আলাদা গৃহ নির্মাণ করেছে। ফলে বসত-ভিটা ভাগ হয়ে খন্ড খন্ড হয়ে গেছে। চাষযোগ্য জমির অবস্থাও অনেকটা সেরকমই।

পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টান সমাজের সদস্যদের একটি বড় অংশ দেশের বিভিন্ন শহরে কাজের প্রয়োজনেই অবস্থান করে। এইসব শহরে অনেকেই স্বপরিবারেই বসবাস করছে। আবার কিছু কিছু পরিবার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রবাস জীবন যাপন করছে। এই শ্রেণীর লোকদের গ্রামের জমিজমার প্রতি উদাসীনতা লক্ষণীয়। বিগত দিনে অনেকের সম্পত্তিই অর্পিত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। ফলে তাদের এসকল জমিজমা নিয়ে বিশেষ জটিলতা দেখা দিয়েছে।

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ আমাদের লোকদের মধ্যে জমি বিক্রির একটি প্রবণতা দেখা দিয়েছে। কেবল যে ফসলী জমি তারা বিক্রি করছে তা নয়, বসত-বাড়ি পর্যন্ত বিক্রি করে শিকরের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলছে। তাদের যারা অংশীজন তাদের কাছে তারা জমি সম্পত্তি বিক্রি না করে অপরের কাছে বিশেষভাবে অখ্রিস্টানদের কাছেও বিক্রি করে দিচ্ছে। ফলে একই জমিতে একাধিক ধর্মের লোকদের মালিকানা দেখা দিয়েছে এবং এনিয়ে মাঝে মাঝেই জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। এই জমিজমা বিক্রির প্রবণতা পেছনে কারণ হচ্ছে যে, যারা শহরে বা বিদেশে স্থায়ী নিবাস করেছে তারা আর গ্রামে ফিরতে রাজি নয় এবং যেহেতু পৈত্রিক সম্পত্তিতে তাদের অংশ রয়েছে সেহেতু তা বিক্রি করে নগদ অর্থ প্রাপ্তির একটি লোভ তাদের মধ্যে দেখা যায়।

পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টান জনগণের জমি-সম্পত্তির বিষয়ে আরও একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেশীরভাগ জমিসম্পত্তিই উত্তারাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। ফলে শত শত বছর ধরে প্রজন্মের পর প্রজন্ম জমি ভোগ দখল করে আসছে। কিন্তু সেই জমির প্রকৃত রেকর্ড রয়ে গেছে পূর্বপুরুষদের নামে। ফলে বর্তমানে যারা জমির মালিক তাদের অনেকের নামেই জমির কোন রেকর্ড নেই। এই সকল জমি খারিজ না হওয়াতে বিশেষ সমস্যা হচ্ছে। বিশেষ করে জমি বিক্রি বা হস্তান্তরে জটিলতা দেখা দিচ্ছে। আবার অনেক পরিবার আছে তাদের পূর্ব পুরুষদের জমির বিষয়ে এতটাই উদাসীন যে, কোন কোন মৌজায় তাদের জমি আছে তা তারা জানে না। অনেক আগে থেকেই তাদের পূর্ব পুরুষগণ যাদের মাধ্যমে চাষাবাদ করাতেন তাদের দখলেই তা আছে। এভাবে অনেক জমি বেহাত হয়ে গেছে। আর নিজেদের নামে জমির রেকর্ড না থাকাতে পারিবারিক কিছু কিছু অশান্তিও দেখা দিচ্ছে। এই দিকে এখনই বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন অন্যথায় আরও অনেক সম্পত্তি বেহাত হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা আছে। এছাড়াও বিগত সরকারগুলির ভূমি দপ্তরের নির্বিচারে জমি তপসিলীকরণের ফলে প্রকৃত মালিক গ্রামে বা বাংলাদেশে অবস্থান করা সত্বেও অনেক জমি অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভূক্ত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জমি এভাবে খ তপসীলে তালিকাভূক্ত হবার কোন যৌক্তিকতাই নেই।

পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টানদের কিছু কিছু পরিবার একসময় জমিদার ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তাদের অনেকেই তাদের জমিজমা হারিয়ে সম্পত্তিহীন হয়েছে। যারা এখনও কিছু জমির মালিক তারা নগদ টাকায় লগ্নি করে দিয়ে থাকেন। আবার একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, যুগের পর যুগ এই ব্যক্তির কাছে লগ্নি দেয়া হয়ে থাকে। ফলে এই সকল জমির দখল বা নিয়ন্ত্রণ আর প্রকৃত মালিকের কাছে থাকে না। কখনো যদি জমির মালিক দুর্বল হয় তখন সেই জমি তাদের কাছ থেকে ঠকিয়ে নেয়ার সমূহ-সম্ভাবনা থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমনটি হয়েছেও।

আমাদের সমাজ বর্তমানে চাকুরী নির্ভর অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। ফলে জমি বা সম্পত্তি নিয়ে তাদের চিন্তা চেতনা খুব কম। নতুন সম্পত্তি ক্রয়ের আগ্রহ আছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা একেবারেই নগন্য। তবে আশার কথা এই যে, বর্তমানে বেশ কিছু পরিবার নিজ নিজ বাড়িতে দালান কোঠা নির্মাণ করছে, আবার কেহ কেহ ভিটে বাড়ি ক্রয় করে বসবাসের জন্য গৃহ নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছে। এই দিকটা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক।

সবমিলিয়ে যেটুকু বলা যায় সীমিত জমি-সম্পত্তি নিয়েই আমাদের এলাকার খ্রিস্টান জনগোষ্ঠি সন্তুষ্ট রয়েছে। এই যে সীমিত সম্পত্তি তারও আবার দলিল পত্র হালনাগাদ নেই। বিশেষ করে স্ব স্ব নামে জমি খারিজ করা ও নিজের নামেই খাজনা প্রদানের রেকর্ড রাখা একান্ত প্রয়োজন। জমি-জমা স্থাবর সম্পত্তি তাই এর সঠিক কাগজপত্র সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। যাদের নামে এখনও জমি খারিজ হয়নি তাদের এখনই অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। আরও একটি বিষয় আমাদের বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন যে, যারাই জমি বিক্রি করছে তারা আমাদেরই ভাই। তাদের ন্যায্য পাওনা বা মূল্য দিয়ে জমি যদি নিকট আত্মীয় স্বজন ক্রয় করতে পারে তবে তা আর বেহাত হবার কোন সম্ভাবনা থকে না। আমাদের খ্রিস্টানদের জমিজমা রক্ষায় প্যারিশের Land Committee বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। যদিও এই কমিটি কেবল মিশনের সম্পত্তি নিয়েই বেশী কাজ করছে,

তারপরেও আমাদের খ্রিস্টান ভাই মানুষের সম্পত্তি রক্ষায় তারা অবদান রাখতে পারলে তা আমাদের সমাজের জন্যে কল্যাণ বয়ে আনবে। অপরদিকে যারা একান্ত বাধ্য হয়েই তাদের জমিজমা বা বসত-বাড়ি বিক্রি করতে আগ্রহী তাদেরও এবিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে। তারা এই কমিটির কাছে তাদের জমিবিক্রির আগ্রহ প্রকাশ করলে এই কমিটি তাদের কৌশল ব্যবহার করে খ্রিস্টান ক্রেতার ব্যবস্থা করতে পারবে। আবার যারা জমি ক্রয়ে আগ্রহী তারাও যদি তাদের এই ইচ্ছা বা আগ্রহের কথা Land Committee এর কাছে ব্যক্ত করে তবে এই কমিটি তাদেরও সহায়তা দিতে পারবে। পাশাপাশি আমাদের রয়েছে একাধিক সমবায় সমিতি। খ্রিস্টানদের জমিজমা রক্ষায় তারাও অবদান রাখতে আগ্রহী। বিশেষ করে ঢাকাস্থ পাদ্রীশিবপুর খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: এবিষয়ে আগ্রহী এবং জমি ক্রয় করে তা সদস্যদের মাঝে বিতরণের বিষয়ে তাদের আগ্রহ আছে। এই সুযোগ সুবিধা আমাদের খ্রিস্টান সম্পদায়ের লোকদের গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু একান্তই পরিতাপের বিষয় এই যে আমাদের সমাজে কিছু কিছু ব্যক্তি আছে যারা যুগের পর যুগ গ্রামের সাথে কোন সম্পর্ক রাখেন না এবং এক সময় এসে তাদের নিজেদের প্রয়োজেন গোপনে তাদের জমি বিক্রি করে দেন। ফলে তাদের যে আত্মীয়-স্বজন আছে তারা সমস্যার মাঝে পতিত হয়। এদিকটা পরিহার করা একান্ত আবশ্যক। আমাদের সমাজে যারা তুলনামূলকভাবে বিত্তশালী আছেন তারা যদি এদিকটায় একটু নজর দেন তবে আমাদের সমাজে অনাকাঙ্ক্ষিত অনুপ্রবেশ থেকে মুক্ত রাখা যাবে। তা না হলে অনাগত আগামীতে পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যাওয়ার একটি সম্ভাবনা রয়েছে।

॥ ঘ ॥ লাইফ-স্ট্যাইল

আমাদের খ্রিস্টান জনগণ সবসময় একটি স্ট্যান্ডার্ড জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। আধুনিকতার স্পর্শে আমাদের লোকজনদের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং কথাবার্তাসহ সবকিছুতেই ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এখন আগেকার মতো সহজ সরল, সাদাসিধে জীবনযাপনের কোন চিহ্নই নেই। মোট কথা একাবিংশ শতাব্দির আধুনিকতার স্রোতে আমাদের গ্রামবাসীদের জীবন-স্ট্যাইল এখন অনেক বেশী উন্নত। বিলাস-বহুল জীবনে আমরা এখন প্রায় সবাই অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

আমরা যদি পাকিস্তান আমালের কথা বিবেচনা করি তাহলে একেবারে ভিন্ন চিত্র দেখতে পাই। তবে এখানে একটি কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের এলাকার অন্যান্য জনগণের তুলনায় আমাদের চলাবলা, জীবন-যাপনের ধরন সবসময়ই তুলনামূলকভাবে উন্নত ছিল। আবার নিজেদের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই পাকিস্তান আমলে বর্তমানের তুলনায় আমাদের জীবন-যাপন ছিল অনেকটাই সহজ-সরল ও সাদামাঠা। তখন বেশীরভাগ মানুষই অতি সাধারণ বেশভূষা ব্যবহার করতো। পুরুষেরা ছোট ধুতি বা বড় গামছার উপরে বানিয়াল (কুর্তি) ব্যবহার করতো। কিছু সংখ্যক পুরুষ লুঙ্গিও ব্যবহার করতো। আবার যারা জমিজমা চাষাবাদ করতো তারা খালি গায়ে একটি গামছা পড়ে কৃষিকাজ করতো। কৃষিকাজে ব্যবহার করা হতো হাতে বানানো কৃষি যন্ত্রপাতি (লাঙ্গল, জোয়াল, পাচওইন ইত্যাদি)। বলদ গরু দিয়েই জমি চাষের কাজ চলতো। নারীগণ সুতির এক রঙ্গা চিকন পাড়ের শাড়ি ব্যবহার করতো।

খাবারের আয়োজনের দিক যদি আমরা দেখি তাহলে সকালে ফিকে চা যা গুড় দিয়ে কখনোবা কোন কোন পরিবারে লবন দিয়ে তৈরি হতো আর সাথে এক মুঠো চাইল বা ক্ষুদ ভাজা এই ছিল ব্রেকফাস্ট। আর দশটা এগারটার দিকে অল্পকিছু পান্তাভাত অনেক পানি দিয়ে লবন, মরিচ সহযোগে খাওয়া হতো। দুপুরে একটির বেশী তরকারী খুব কম পরিবারেই রান্না করা হতো। মোটা চাউলের ভাত আর তরকারী। কৃষকদের জন্য এই ভাত তরকারী জমিতেই নিয়ে দেয়া হতো। আরও একটি কথা মনে আসে দুপুরে ভাতের মাড় না খেয়েছে এমন পরিবারের সদস্য সংখ্যা নিতান্তই কম। দুপুরে যে তরকারী রান্না করা হতো তার সবজি আসতো বাগান থেকে আর মাছ ধরে নিয়ে আসতো খাল থেকে। এই মাছ জাল বা বরশি দিয়ে ধরা হতো। বর্ষাকালে ছাবি, বুছনা, চাই, খুচইন ইত্যাদি দিয়েও মাছ ধরা হতো। তবে যাদের পুরুষগণ শহরে বা বিদেশে চকুরী করতো তারা মাছ বিক্রেতার কাছ থেকে দু'চার আনার মাছ কিনে রান্না করতো।

তখনকার পোশাকাদির সম্পর্কে যদি আমরা দেখি, বাড়িতে অতি সাধারণ পোশাক ব্যবহার করা হতো। পুরুষেরা ধুতি বানিয়াল, ছেলেরা হাফ প্যান্ট খালি গা আর মেয়েরা ফ্রক ব্যবহার করতো। তবে এসবই ছিল অতি সস্তাদামী কাপড় দিয়ে তৈরি। মহিলারা চিকন পাড়ের এক রঙ্গা সুতি কাপড় ব্যবহার করতো। তার সাথে সেমিজ ব্যবহার করতো। তবে রবিবারে খ্রিস্টযাগে যাওয়ার জন্যে যার যতটুকু ভালো কাপড় ছিলো তা ব্যবহার করতো। পুরুষেরা একটা ভালো মানের ধুতি ব্যবহার করতো তার সাথে শার্ট যা ছিল অনেকটা কাবুলি স্টাইলের। মহিলাগণ গির্জায় বা কোথাও আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে গেলে, বিবাহ উৎসবে ছাপা শাড়ি ব্যবহার করতো।

বর্তমানে সকলের আর্থিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তনের সাথে সাথেই জীবন ধারা (স্ট্যাইল) পরিবর্তন ঘটেছে। এখন সবাই স্মার্ট পোশাক ব্যবহার করে। শার্ট, প্যান্ট, পোলো, টি-শার্ট ইত্যাদি কমবেশী সব বয়সের পুরুষেরাই ব্যবহার করে। মহিলারা বাহারি দামী শাড়ি এবং অনেকেই স্ট্যান্ডার্ড সালোয়ার কামিজ ব্যবহার করে। কোন উৎসব বা নিমন্ত্রণে গেলে সবাই দামী পোশাক এমনকি শীতকালে পুরুষেরা কমপ্লিট স্যুট এবং মহিলারা বেনারসি শাড়ি এবং চটকদার গহনা ব্যবহার করে।

আধুনিক বিজ্ঞানের ছোঁয়া আমাদের সমজেও ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান ডিজিটাল যুগে আমাদের গ্রামের সবাই এর সাথে মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। এখন সবাই এলইডি টিভি বা স্মার্ট টিভি ব্যবহার করে এবং এর সাথে ক্যাবল নেট সংযোগও রয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির সবকিছুই আমাদের গ্রামের মানুষের জীবনে এখন অপরিহার্য সামগ্রী। প্রতিটি পরিবারেই এক বা একাধিক স্মার্ট মোবাইল ফোন সেট আছে। তারা এখন প্রতিনিয়তই শহরের বা বিদেশের স্বজনদের সাথে এই ডিভাইস ব্যবহার করে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। ফলে তাদের জীবনেও এসেছে পরিবর্তন। স্বজনদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ থাকায় অনেক সিদ্ধান্ত সহজেই নিতে পারছে। পারিবারিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এখন আর চিঠি বা সরাসরি এসে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা তেমন একটি নেই।

যাতায়াতের কথা বিবেচনা করলে দেখা যায় বর্তমানে আমাদের খ্রিস্টান সমাজের অনেকেরই মটর বাইক রয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন যানবাহন মানুষ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। বিশেষত: ব্যাটারি চালিত যানবাহন মানুষ প্রতিনিয়তই ব্যবহার করছে। এখন বাজার ঘাট, আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যাওয়া, স্কুল-কলেজে যাতায়াতে এই ইঞ্জিন চালিত যানবাহন ব্যবহার করা হয়। আবার যাদের নিজস্ব মটর গাড়ি আছে এমন লোকও বেশ কয়েকজন আছে, তারা ঢাকা বা চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি সড়ক পথে নিজস্ব মটরযান ব্যবহার করেই বাড়ি পর্যন্ত যেতে পারছে। ফলে গ্রামের মানুষের চলাচলে গতি এসেছে।

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মানুষের জীবনধারা (স্ট্যাইল) পরিবর্তনের সাথে সাথেই আচরণগত পার্থক্যও প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষ করে আগেকার দিনে সীমিত সুযোগ সুবিধা ও সম্পদ থাকলেও মানুষের মাঝে আন্তরিকতা ছিল একান্তই মধুর। কিন্তু বর্তমানে মানুষ কেমন যেন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে অপেক্ষকৃত ধনী সম্প্রদায় এমন আচরণও করে যে, গরিব, নিকট-আত্মীয়ের সাথে তাদের যোগাযোগ তেমন থাকে না বা নেই আর থাকলেও দেখা যায় নিকট আত্মীয়দের যেন তারা করুণা করছে তেমন একটি ভাব প্রদর্শিত হয়। আবার অনেকেই আত্মীয় জনদের উপরে প্রভুত্ব করার কেমন যেন একটি অশুভ কর্মকান্ডে নিজেদের নিযুক্ত করেছে। ফলে এখন একটি কথা বলা যায়, ''বিজ্ঞান আমাদের এনে দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ''। এমনটির পরিবর্তন না হলে আগামীতে অনেক পরিবারেই অশান্তি দেখা দিবে। যা আমাদের সমাজের জন্যে কোন মঙ্গল বয়ে আনবে না।

যতই ইতিবাচক বা নেতিবাচক দিক থাকুক না কেন, আমাদের খ্রিস্টান সমাজের লোকজন তুলনামূলকভাবে অন্যদের চেয়ে পরিশীলিত জীবন যাপন করছে। তাদের রুচিবোধ, চালচলন ও কথাবার্তা এখনও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আগেকার সময়ের মিশন বা ফাদারের উপর নির্ভরতা এখন আর নেই বললেই চলে। এমন এক সময় ছিল যখন মানুষ যেকোন সমস্যা এমনকি নিজের ঘরের অতি সাধারণ সমস্যা নিয়েও ফাদারের কাছে ছুটে যেতো। বিগত কয়েক দশক ধরে মানুষের জীবনের এই দিকটির পরিবর্তন ঘটেছে। এখন সমাজের মানুষ অনেক সচেতন। নিজেদের যেকোন সমস্যা নিজেরাই সমাধান করে থাকে। বর্তমানে আরও একটি বিশেষ দিকে আমাদের সমাজের মানুষের জীবন স্ট্যাইলে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে, তা হলো সমবায় সমিতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এখন গৃহ নির্মাণে, শিক্ষায় এবং ব্যবসায় সমবায় সমিতিগুলো সদস্যদের যথেষ্ট সহযোগিতা করে। ফলে আগেকার সেই মহাজন বা কোন ব্যক্তি বিশেষের কাছে দায়বদ্ধ থাকার দিন ফুরিয়ে এসেছে। সমবায় সমিতিগুলি যদি এভাবেই সদস্যদের সহায়তা করে তবে এর মাধ্যমেই স্বনির্ভরতা আসবে। আর আমাদের জীবন-যাপন একটি সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই সে সোনালী দিনের প্রতীক্ষায় আমাদের সমাজ এখন প্রতীক্ষমান।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ সামাজিক ও কৃষ্টিগত আচার-অনুষ্ঠান

সমাজে কৃষ্টি বা সংস্কৃতি একটি প্রাচীন ধারণা। মানব সমাজে সংস্কৃতি সামাজিক জীবন যাত্রার দিক নির্দেশ করে থাকে। তাই মানব সমাজের একটি অন্যতম উপাদান হল সংস্কৃতি বা কৃষ্টি।

সংস্কৃতি মানব সমাজের অনন্য বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর প্রতিটি সমাজের বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতি মানুষের তৈরি বিভিন্ন নিয়ম-নীতি বা সমাজে প্রচলিত ধারাকে বুঝায়। সংস্কৃতির মাধ্যমে কোন মানব সমাজের গতি প্রকৃতি কিরূপ ছিল তা পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়। তাই সমাজে মানুষের জীবনযাত্রার সূচিত করে সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি হল মানব সমাজের একটি অনন্য দিক। অর্থাৎ সংস্কৃতি হল জীবন ধারার পথ। যেটি মানব সমাজকে চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। তাই প্রতিটি মানব সমাজের আলাদা আলাদা সাংস্কৃতিক ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়। সুদূর প্রাচীনকাল থেকে মানব সমাজে সংস্কৃতির জন্ম হলেও আধুনিক ক্ষেত্রে প্রতিটি মানব সমাজ নিজ নিজ সাংস্কৃতিক ভাবধারায় বিশেষভাবে প্রভাবিত।

পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান জনপদেরও রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি বা কৃষ্টি। সাহিত্য ও সঙ্গীত, নৃত্য, গণমাধ্যম রন্ধন, সামাজিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া, লোক ও কারুশিল্প ইত্যাদির মাঝে আমাদের নিজস্ব কৃষ্টিগত দিক প্রস্ফুটিত হয়। গ্রাম বাংলার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হলো অলিখিতভাবে চলে আসা পরম্পরা থেকে পরম্পরায় চলে আসা সাহিত্য ও সঙ্গীত। আমাদের বেলাতেও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। সাহিত্যের দিক থেকে বিবেচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের লোকদের গল্পবলা। একেবারে হৃদয় থেকে উঠে আসা বিভিন্ন কাহিনী নাতি-নাতনীদের সাথে দাদা-দাদী বা নানা-নানী সহভাগিতা করতেন। এই সকল গল্পকে বলা হতো পড়ন কথা। আবার পুণ্যিকথাও ছিল। এটা ছিল এক রকম ধাঁধার মতো। এর জটিল অর্থ বের করা যেমন কঠিন ছিল তেমনি ছিল রহস্যময়। অথচ এর মধ্য দিয়ে নির্মল চিত্তবিনোদন হতো।

॥ ক ॥ সামাজিক ও সাংস্কারিক আচার-অনুষ্ঠান

পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান জনগণের রয়েছে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান। আমাদের জীবনের শুরু অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠান একেবারেই আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে প্রকাশ করে। এর মাঝে আছে আমাদের নিজস্ব আচারনিষ্ঠতা, ধ্যান-ধারণা ও কৃষ্টি।

শিশুর জন্ম

যখন কোন পরিবারে একটি নবযাত শিশুর আগমন ঘটে তখন প্রথমতঃ পাড়াপ্রতিবেশীরা আনন্দ প্রকাশ করে থাকে। কেবল শিশুর জন্মের সংবাদ পেলেই হলো; গ্রামের মহিলাগণ নিজ থেকেই সেই শিশুর পরিবারে যায় এবং নৃত্য-গীতে মেতে ওঠে। ২১ দিন পর্যন্ত নবযাত শিশুর জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। এই সময়টিকে আমাদের অঞ্চলে আওইজ্জাকাল হিসেবে অভিহিত করা হয়। নবজাত শিশুর মা এসময় গৃহান্তরে থেকে শিশুর বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যা করেন।

দীক্ষাস্নান বা বাপ্তিস্ম

প্রায়শই দেখা যায় যে, মাসাধিককাল অতিক্রম হতে না হতেই শিশুটির নামকরণসহ দীক্ষাস্নান বা বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এদিনটি একটি নবজাত শিশুর পরিবারের জন্যে একান্ত পবিত্র এবং অত্যন্ত আনন্দের দিন। ধর্মীয় বিবেচনায় দিনটি বিশেষ তাৎপর্যবাহী এজন্যে যে, খ্রিস্টান পরিবারে একজন সদস্য আনুষ্ঠানিভাবে সংযুক্ত হলো। দিনটিকে বিশেষভাবে পালনের জন্যে শিশুটিকে বাদ্য-বাজনা সহকারে আত্মীয়-স্বজন ও শিশুটির পিতামাতা, ধর্মপিতামাতা গির্জায় নিয়ে যায়। পুরোহিত আনুষ্ঠানিকভাবে শিশুটিকে দীক্ষাস্নান সংস্কার প্রদান করেন। এসময় শিশুটির হয়ে শিশুটির ধর্মপিতা-মাতা এবং উপস্থিত সকলে পুরোহিতের সাথে বিশ্বাসের মন্ত্র উচ্চারণ করে। আর এই অনুষ্ঠানের পরেই আবারো ঢোলবাদ্য সহকারে নৃত্য-গীতে আনন্দম করতে করতে শিশুটির বাড়িতে সকলে ফিরে আসে। যুগ যুগ ধরেই এই অনুষ্ঠান চলে আসছে। তবে এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দীক্ষাস্নান সংস্কারের আনুষ্ঠানিকতা প্রতিটি শিশুর জন্যই এক হলেও বাহ্যিকতা বা আনন্দ অনুষ্ঠান শিশুটির পরিবারের সামর্থ্য অনুসারেই হয়ে থাকে। কেহ বা ঢোলবাদ্য সহকারে আনন্দ করে আবার কারো পক্ষে সেই ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হয়না। তবে শিশুটির বাড়িতে বিশেষ করে মহিলাগণ গান বাজনা করে থাকে। আপ্যায়নের একটি ব্যবস্থাও থাকে, সেই আপ্যায়ন শিশুটির পরিবারের সামর্থ্য অনুসারে আয়োজন করা হয়। বাড়িতে আসার পরে শিশুটিকে গ্রামবাসী ও আত্মীয় স্বজন আর্শীবাদ করেন ও উপহার দান করেন।

বিবাহ ধর্ম সংস্কার ও পরবর্তী অনুষ্ঠান

সারাবিশ্বের জনমানবের মতোই পাদ্রীশিবপুরেও বিবাহ সংস্কার একটি বড় ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান। দু'টি পরিবারের মানব-মানবীর এই নবজীবনের শুভ লগ্নে বিশেষ কয়েকটি সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

কনে দেখা (সম্বন্ধ ঠিক করা)

কোন পরিবারের ছেলেকে বিবাহ জীবনে প্রবেশের জন্যে একটি কনের প্রয়োজন হয়। পাদ্রীশিবপুরে কোন বিশেষ কনেকে ছেলের জন্যে প্রাথমিকভাবে পছন্দ হলে, কনের পরিবারের সম্মতি নিয়ে একটি নির্ধারিত দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে ছেলে পক্ষের লোকজন কনের বাড়িতে যায় এবং সম্বন্ধ স্থির করে। এ অনুষ্ঠানে উভয় পক্ষের বয়স্ক নিকট আত্মীয় স্বজন এবং গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ উপস্থিত থকেন। এসময় কনেকে বিশেষ আর্শীবাদ দান করা হয়। পাত্র পক্ষ থেকে পাত্রের মা বা মাতৃস্থানীয় কেহ কনেকে অঙ্গুরীয় পড়িয়ে দিয়ে এই সম্বন্ধ ঠিক করে থাকে। এদিন ছেলে পক্ষ থেকে মিষ্টি ও পান সুপারি নিয়ে কনে পক্ষের বাড়িতে যায়। আবার কনে পক্ষ তাদের পক্ষে যথাসম্ভব আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে থাকে। এদিনেই বিবাহপূর্ব প্রয়োজনীয় অন্যান্য অনুষ্ঠানের এবং বিবাহের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। পাদ্রীশিবপুরের সংস্কৃতি অনুসারে ছেলেপক্ষ থেকে তেমন কোন লেনদেনের দাবী করা হয়না। অর্থাৎ যৌতুকের বিষয়টি আমাদের সমাজে নেই বললেই চলে।

বান লেখা বা নাম লিখানো

খ্রিস্টান ধর্মের বিধিবিধান অনুসারেই স্থানীয় মণ্ডলী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন অনুসারে নির্দিষ্ট দিনে (আমাদের এলাকায় বিশেষত এই অনুষ্ঠানটি শনিবারে হয়ে থাকে) ছেলে ও মেয়ে বান লেখা বা নাম লিখার অনুষ্ঠানটি করা হয়। এসময়ে ছেলে ও মেয়ের পরিবারের আত্মীয়স্বজন যোগদান করে থাকেন। এদিনটিকে আনন্দময় করে রাখার জন্যে ঢোল-বাদ্য নিয়ে গির্জায় যায়। মাণ্ডলিক নিয়মানুসারে ছেলে ও মেয়ে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে উভয়ে উভয়কে জীবনসাথী করার প্রাথমিক সম্মতি দান করে। এই নাম লিখার অনুষ্ঠানের পরে ছেলে নিজের আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে মেয়ের বাড়িতে যায়। মেয়ে পক্ষ তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে থাকে। এদিন গ্রামের মহিলারা তাদের বিশেষ গান (হয়লার গীত) করে থাকে। এই গান আমাদের সংস্কৃতির একেবারে নিজস্ব অংশ। ইতোমধ্যেই এই গানের বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এই নাম লেখা অনুষ্ঠানের পরেই মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ তিনটি রবিবারে এই ছেলেমেয়ের বান প্রকাশ করে থকে। এর অর্থ হলো মণ্ডলীর সকল সদস্যকে বিষয়টি অবহিতকরণ ও তাদের বিবাহ সংস্কার গ্রহণে কোন সমস্যা আছে কিনা তা নিশ্চিত করা। বেশকিছুকাল আগ থেকেই ছেলে ও মেয়েকে বিবাহ সংস্কারের গুরুত্বের উপরে বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয় এবং বর-কনে এই শিক্ষামূলক ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য।

গায়ে হলুদ (কুন্ডাবাদ)

বিবাহ অনুষ্ঠানের পূর্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের নাম গায়ে হলুদ দেয়া যা আমাদের গ্রামে কুন্ডাবাদ ছাড়ানো নামে বিশেষভাবে পরিচিত। পাদ্রীশিবপুরে অনেক আগ থেকেই এই গায়ে হলুদ দিবার অনুষ্ঠানটি জাঁকজমক সহকারে পালন করে আসছে। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিশেষ গান করা হয়। গায়ে হলুদ দেবার জন্যে হলুদ, মেথি ইত্যাদি বাটার সময় বিশেষ গান করা হয় আবার গায়ে হলুদ দিবার পরে স্নান করানোর জন্যে জল আনার জন্যে কাছাকাছি পুকুরে যাওয়া, সেখানে মঙ্গলঘট এবং বিশেষ গীত পরিবেশন করা হয় যা একেবারেই আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির অংশ। এই অনুষ্ঠানটি ছেলের বাড়ি ও মেয়ের বাড়ি আলাদা আলাদাভাবে করা হয়ে থাকে। পাদ্রীশিবপুরে বিবাহ অনুষ্ঠানের পূর্বের বৃহস্পতিবারে এই গায়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথমে ছেলের বাড়িতে ছেলেকে গায়ে হলুদ দেয়া হয়। এসময় ঢোলবাদ্য থাকে এবং সকলেই আনন্দগান করে থাকে। এই আনন্দ আরও বাড়িয়ে দেয়ার জন্যে ছেলের ভাইয়ের বৌদের, দাদা-দাদী ও নানা-নানী স্থানীয়দেরও স্নান করানো হয়। আর যাদের এসময় গায়ে পানি দেয়া বা স্নান করানো হয় তাদের পরিধানের জন্যে নতুন কাপড় দেয়া হয়। এটিও আমাদের এলাকার একান্ত নিজস্ব আচারিক অনুষ্ঠান। ছেলের বাড়ির অনুষ্ঠান শেষে ছেলের বাড়ির আত্মীয় স্বজন মেয়ের বাড়িতে যায় এবং একই আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে মেয়ের গায়ে হলুদদানের অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করে থাকে। কুন্ডাবাদ ছাড়ানো বলতে গ্রামের মানুষ শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠানকেই বুঝতো। এসময়ে কনে পক্ষ বর পক্ষকে সাধ্যমত আপ্যায়ন করে থাকে। তবে বর্তমানে অনেকেই বিবাহ সংস্কারের পূর্বদিনে এই অনুষ্ঠান করে থাকে। ঐতিহ্যের বিবেচনায় আগেকার গায়ে হলুদ বা কুন্ডাবাদ ছাড়ানোর অনুষ্ঠান অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এখানে যেমন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজনে আনন্দ হতো তেমনি আত্মীয় স্বজনদের সাথে আন্তরিকতার বন্ধনও অনেক মধুর হতো।

পয়সাবার

পাদ্রীশিবপুরের বিবাহপূর্ব অনুষ্ঠানমালার একটি ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান পয়সাবার। এই অনুষ্ঠানটি বিবাহের পূর্বরাতে হয়ে থাকে। (বর্তমানে দিনের বেলাতে হয়) এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ঝারবাতি। এটি তৈরি করা হয় অনেকদিন চেষ্টার পরে। সবাই এটি তৈরি করতে পারে না। কিছু বিশেষ শিল্পী আছে যারা এই কাজ নিষ্ঠার সাথে করে থকেন। এটি একটি বিশেষ ঝাড়বাতি যা বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়। একটি বাঁশের সাথে পাঁচটি বাঁশের চাতকী সংযোজন করা হয়। চাতকীগুলোকে ঝালর দিয়ে সুন্দর করে সাঁজানো হয়। সাথে মশাল বাতিও সেট করা হয়। ঝাড়বাতির মাথায় বা চূড়ায় উড়োজাহাজ, তারকা, ময়ুরপাখি এর যেকোন একটি সেট করা হয়। পয়সাবারের আর একটি প্রধান আকর্ষণ হলো পান ফুলের সাঁজি। এই সাঁজিটিকেও রঙ দিয়ে সাঁজানো হতো এবং এই সাঁজিতে বিশেষ ডিজাইন করা থাকতো এবং ত্রিভূজাকৃতির এই ডিজাইন করা হতো। এই ত্রিভূজ সমূহের উপরে ফুল দিয়ে সাঁজানো হতো। এই সাঁজিতে কনেকে বিয়ের জন্যে সাঁজানোর সকল কাপড়চোপর ও প্রশাধনী সামগ্রী থাকতো। আর বিশেষ করে একটি সিরাপের বোতল দিতে হতো। একটি আলদা ডালায় পান-সুপারি সাঁজিয়ে দেয়া হতো। এছাড়াও এক ঘটি দুধ, মিষ্টি (বাতাসা) নেয়া হতো। ছেলের বাড়ি থেকে পয়সাবারের যাত্রা শুরু হতো রাত আনুমানিক ৮টার দিকে। বিশেষ করে শীতকালেই এই বিবাহ অনুষ্ঠান বেশী হতো। পয়সাবারকে আধুনিক বরযাত্রী বলা যেতে পারে। পয়সাবারের আয়োজনে বিশাল ঢোল বাজনা, বেশ কয়েকটি বাঁশি যার মধ্যে সানাইও থাকতো, বাঁজানো হতো। প্রথমেই দু'জনে ঝাড়বাতি বহন করতো এবং তা সকলের আগে আগেই নিয়ে যাওয়া হতো। এর পরেই থাকতো বাজনার দল এবং নারীপুরুষেরা বাঁশির সুরের সাথে সাথে গান গেয়ে ও নেচে নেচে মেয়ের বাড়ির দিকে যেতো। এই দলের পিছনে ছেলে পক্ষের অন্যান্য আত্মীয় স্বজন চলতে থাকতো। আমাদের গ্রামের বাড়িতে বরের বাড়ি থেকে কনের বাড়ি খুববেশী হলে ১মাইলের মতো দূরত্বে অবস্থিত ছিল। এই পথটুকু যেতে ৩ থেকে ৪ ঘন্টা সময় লেগে যেতো। ধনী লোকেরা পয়সাবাড়ে হাওইবাঁজি, কলকে বাঁজি ফুটানো হতো । এই কাজটিতে ধোপাবাড়ির মনিমোহন সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এই যে আয়োজন সে কেবলই আমাদের নিজস্ব। এর সাথে বাংলাদেশের কোন এলাকার এমনকি আমাদের এলাকার অখ্রিস্টান সম্প্রদায়েরও কোন মিল নেই। যার জন্যে যুগ যুগ ধরে পয়সাবার আমাদের খ্রিস্টান জনপদে একটি আকর্ষনীয় অনুষ্ঠান। কনের বাড়িতে যাওয়ার পরে ঝাড় বাতির মশালগুলো জ্বালিয়ে দেয়া হতো এবং ঝাড়বাতি নিয়ে অনেকক্ষণ নৃত্যসহ আনন্দকরা হতো। এবং যাতে মশালের আগুনে কোন কারো ক্ষতি না হয় সেই দিকে লক্ষ রেখে কনের বাড়ির পুকুরে ঝাড়বাতিটি ফেলে দেয়া হতো। এরপরে ছেলে পক্ষ ও মেয়ে পক্ষ প্রীতিভোজে অংশগ্রহণ করতো। প্রীতি ভোজের আয়োজন ছিল মাটিতে চট বা পাটি বিছিয়ে কলাপাতায় খাবার পরিবেশন করা হতো। তরকারী পরিবেশনের জন্যে মাটির পাতিল এবং তা বন্টনের জন্যে নারিকেলের আইচা ব্যবহার করা হতো। বরপক্ষের তথা নতুন কুটুমদের বসার জন্যে পাটির উপরে শাড়ি বিছিয়ে দিয়ে বিশেষ সম্মান জানানো হতো। তবে বর্তমানে সেই কলাপাতায় খাবার পরিবেশন আর করা হয় না। এখন ডাইনিং টেবিল ও চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রীতি ভোজের পরে অধিকাংশ লোকই যার যার বাড়িতে ফিরে যায়। যারা কনেকে সাঁজানোর কাজে নিয়োজিত থাকতো সেই মহিলাগণ এবং যারা পয়সাবারের

হয়লার গান করতো তারা সারা রাত কনের বাড়িতে অবস্থান করতো। সকালে বিবাহ সংস্কার গ্রহণের জন্যে বর পক্ষের অভিভাবকগণ কনেকে নিয়ে যেতে আসতেন। এসময় কনের পিতামাতাসহ বয়োজেষ্ঠ আত্মীয়স্বজন কনেকে আর্শীবাদ করে বিদায় জানাতো। আর মহিলাগণ কনে বিদায়ের গান পরিবেশন করতো। কনেকে গির্জায় নেয়ার জন্যে বাদ্যযন্ত্রও থাকতো বিশেষ করে বংশীবাদকগণ এসময় করুণসুরে বিদায়ের গান তুলতেন। এভাবেই কনেকে গির্জায় নেয়া হতো। অপরপক্ষে বর নিজেই তার নিকটতম আত্মীয়ের সাথে গীর্জায় আসে।

বিবাহ সংস্কার

বিবাহ সংস্কার গ্রহণের ধর্মীয় রীতি অনুসারে যাবতীয় অনুষ্ঠান গির্জাঘরেই হয়ে থাকে। এজন্যে বিবাহের বিশেষ খ্রিষ্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। এই ধর্মীয় সংস্কারিক অনুষ্ঠানে ছেলে ও মেয়ে পক্ষের আত্মীয় স্বজনসহ গ্রামের অনেক খ্রিষ্টভক্তই উপস্থিত থকেন। বিবাহের প্রতীজ্ঞাসহ সার্বিক অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকেন উপস্থিত খ্রিষ্টভক্তগণ। তবে ছেলে ও মেয়ে পক্ষের একজন করে সাক্ষী রেজিষ্টার বহিতে স্বাক্ষর করেন। ধর্মীয় রীতি অনুসারে বিবাহ সাক্রামেন্ত গ্রহণের পরে বাদ্যবাজনা সহকারে প্রথমে ছেলে পক্ষের কোন নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে বর-কনে দুএক ঘন্টা বিশ্রাম নেয়। এর পরেই তাদের ছেলের বাড়িতে নিবার জন্যে আত্মীয়স্বজন ঢোলবাদ্যসহকারে এগিয়ে আসে। এসময় আমাদের এলাকার স্থানীয় বিবাহ সঙ্গীতের সাথে সাথে নৃত্য পরিবেশন করা হয়। আর এই আনন্দ করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে পথে প্রচুর সময় ব্যয় হয়। ছেলের বাড়িতে প্রবেশের পথে একটি গেইট সাঁজানো হয় এবং এখানে ছেলের বৌদিরা,দাদা-দাদী, নানা-নানী, ছোট ভাইবোনেরা গেইট আটকিয়ে তাদের ভিতরে যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এটিও একটি মজার অনুষ্ঠান। অনেক মজা ও দাবীদাওয়ার পরে একসময় একটি সমঝোতা হয় এবং বর সেই চাহিদা মিটিয়ে তারপরে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে।

গৃহে প্রবেশ করার জন্যে আমাদের এলাকায় ছেলের মা বা মাতৃস্থানীয় একজন অথবা গৃহের বয়োজেষ্ঠা নারী ছেলে-মেয়েকে বরণ করে। এসময় বরণ কুলায় ধান, দূর্বা ও আমপরাতি রাখা হয় এবং বর-কনের মাথার উপরে রেখে তাদের ঘরে তোলা হয়। এই বরণের সময়েও মহিলাগণ আমাদের স্থানীয় বিশেষ সঙ্গীত পরিবেশন করে। ঘরে নিয়ে যাওয়ার পরে বর-কনেকে ঘরের মেঝেতে বিছানো চাদরের উপরে রাখা বালিশের উপরে বসতে দেয়া হয় এবং তাদের দুধমিঠা দিয়ে আপ্যায়ন করানো হয়। এই আপ্যায়ন করানোতে বরের মা, বাবা, কাকা-কাকীসহ মুরুব্বিগণ অংশগ্রহণ করেন। এসময়েও মহিলাগণ হয়লার গীত পরিবেশন করে।

অপরদিকে কনের আত্মীয়-স্বজন সরাসরি বরের বাড়িতে প্রবেশ না কারে কাছাকাছি একটি স্থানে জড়ো হন। তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে বর পক্ষের লোকজন বরণ করে বাড়িতে নিয়ে যান। এসময়ে তাদের সম্মানে বাদ্যবাজনা ও নৃত্যগীত পরিবেশন করা হয়। আমাদের গ্রামে নারীগণ কেহ কেহ এসময় গাছের ডালপালা নিয়ে নৃত্য করে। বিশেষ করে নতুন বেয়াই-বেইনদের নিয়ে একত্রে নৃত্য করতেও দেখা যায়। আর এই আনন্দের মাধ্যমে দুটি পরিবারের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে একটি মিলনের প্রকাশ পায়।

খাবার পরিবেশন যথারীতি কলাপাতায় হয়ে থাকে। বসার আয়োজন এবং পরিবেশনের আয়োজন পয়সাবারে মেয়েদের বাড়িতে যেভাবে আয়োজন করা হয়েছিল সেই ভাবেই হয়ে থাকে। নতুন কুটুমদের যথারীতি শাড়ি বিছিয়ে সম্মান দিয়ে বসানো হয়। প্রথমেই খাবার পরিবেশনের পূর্বে বর-কনে বিবাহভোজে আসা সকল অতিথিদের কাছ থেকে আশীর্বাদ গ্রহণ করে। একাজটি সকলের কাছে গিয়ে করতে হয়। এসময় আগত অতিথিগণ আশীর্বাদপূর্বক উপহার সামগ্রিও দিয়ে থাকেন। এটি ছিল আমাদের ঐতিহ্য। বর্তমানে দিন বদলের হাওয়া লেগেছে, বর-কনে এখন ছোট একটি মঞ্চে সোফায় বসা থাকে। অতিথিগণ গিয়ে তাদের আশীর্বাদ করেন এবং উপকার সামগ্রী প্রদান করেন। আর বর্তমানে অতিথিদের ডাইনিং টেবিলে খাবার পরিবেশন করা হয়। যেভাবে শহরের বিভিন্ন কমিউনিটি সেন্টার বা হোটেলে করা হয়ে থাকে। আমাদের বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রায় সব বাড়িতেই খাবারের শেষ আইটেম থাকে সিন্নি (পায়েস)। এটা যেমন কলাপাতায় খাবার পরিবেশনের সময় ছিল তেমনটি বর্তমানেও আছে।

বিবাহের পরের দিন

আমাদের গ্রামে স্মরাণাতীত কাল থেকেই বিবাহের পরের দিন বর-কনে কনের বাড়িতে যায়। এসময় বরের ছোট ভাইবোন এবং বৌদিরা থাকে। মূলতঃ জামাইকে আলাদাভাবে শ্বশুর বাড়িতে এটাই প্রথম আপ্যায়ন। কনেপক্ষ তাদের সাধ্য অনুসারে বর এবং তার সাথে আসা আত্মীয়স্বজনকে যথা সম্ভব আপ্যায়ন করে থাকে। তবে কনে এদিন তার পৈত্রিক বাড়িতে থাকে না। তারা আবার বিকেলের মধ্যেই ছেলের বাড়িতে ফিরে যায়।

ফুলসঁজ্জা-দাড়াসিন্নি

বিবাহ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আমাদের এলাকায় বিভিন্ন আনন্দ আয়োজনের একটি ফুলসঁজ্জা (ফুলাইজ্জা)-দাড়াসিন্নি। এটি একেবারে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি। অনুষ্ঠানটি ছেলের বাড়িতে হয় এবং এখানে মেয়ে পক্ষের আত্মীয়-স্বজনও নিমন্ত্রিত থকে। এই অনুষ্ঠানে আসার সময় কনে পক্ষ থেকে এক কাডি সাইজের সাঁজি ভরে মেয়ের বাড়ি থেকে সিন্নি (পায়েস) আনার প্রচলন অনেক আগে থেকেই ছিল। এই সিন্নি বহন করার দায়িত্ব মেয়ের ভগ্নিপতি পালন করতো। এসময় মেয়ের বাড়ি থেকে মেয়ের ব্যবহারের কাপড়চোপরসহ বিভিন্ন সামগ্রী, কিছু নতুন কাপড়, অনেক সময় কনে পক্ষের উপহার সামগ্রী ছেলের বাড়িতে নিয়ে আসা হতো। আমাদের গ্রামে এই রাতের খাবারকে বলা হয় বৌভাত। কারণ এই সন্ধ্যায়ই প্রথম নববধু শ্বশুর বাড়িতে তার রান্নার সুচনা করে। যদিও সম্পূর্ণ রান্না তাকে করতে হয় না, কেবল রান্না করা পাতিলে একটু (চামচ বা হিজরী দিয়ে) নাড়া দেয়। আর এজন্যেই মনে করা হয় নতুন বৌ রান্না করেছে। এই অনুষ্ঠানেও যথারীতি হয়লার গীত পরিবেশন করা হয়। এই রাতে খাবার পরে নববধুকে আবার নতুন করে সাঁজানো হতো এবং তার পরেই বাসরঘরে তথা ফুলসঁজ্জায় পাঠানো হতো।

কাদামাটি খেলা

ফুলসজ্জার পরের দিন বিশেষ করে ছেলের ভগ্নিপতি, দাদা-দাদী, নানা-নানী, বৌদিরা বিশেষ একটি অনুষ্ঠান করে থকে। এটির শুরু হয় আংটি খোঁজার মধ্যদিয়ে। আংটি খোঁজার খেলাটি বর-কনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এখানেও বেশ মজা করা হয়। উঠানের মাঝামাঝি কোন একটি স্থানে একটি পুকুরাকৃতির ছোট গর্ত করা হয়। সেই গর্ত পানি দিয়ে ভর্তি করা হয় এবং সেখানে একটি আংটি লুকিয়ে রাখা হয়। বর-কনেকে এই আংটি খুঁজতে বলা হয়। তাদের দুজনকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে ছেলের বৌদি এবং ভগ্নিপতি সম্পর্কীয় লোকাজন। এভাবে লুকোচুরির এক পর্যায়ে বর বা কনে আংটি পেয়ে যায়। এর পরে চলে উদ্যাম আনন্দ। বরের দাদা-দাদী, নানা-নানী, ভগ্নিপতি, বৌদিরা এসময় উঠানে প্রথমে বর কনেকে ভিজিয়ে দেয়, উঠানে পানি ঢেলে দিয়ে কর্দমাক্ত করে তোলে এসময় বলতে গেলে একজন আর একজনকে ভিজানোর এবং উঠনে ফেলে দিয়ে কাদামাটিতে গড়াগড়ি দেওয়ানোতে একটি আলাদা আনন্দ পেতো। এই অনুষ্ঠানটি নিছক আনন্দ লাভের জন্যেই করা হতো।

অন্তিমলেপন সংস্কার

কাথলিক মণ্ডলীর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হলো অন্তিমলেপন বা রোগী লেপন সংস্কার। এই সংস্কারটি বিশেষ করে কোন মরণাপন্ন রোগী বা প্রবীণ ব্যক্তিদের দেয়া হয়ে থাকে। ধর্মপল্লীর একজন পুরোহিত রোগীর বা প্রবীণ ব্যক্তির বাড়িতে বা হাসপাতালে গিয়ে এই সাক্রামেন্ত দিয়ে থাকেন। যেহেতু পাদ্রীশিবপুর একটি গ্রাম এখানে ফাদারগণ রোগী বা মরণাপন্ন ব্যক্তির বাড়িতে গিয়েই এই সংস্কার দিয়ে থাকেন। এসময় বিশেষ পবিত্র তেল রোগীর কপালে লেপন করা হয় এবং বিশেষ প্রার্থণা করা হয়। একজন মরণাপন্ন ব্যক্তি এই সংস্কার লাভ করেন এবং তিনি নিজেকে মরণের জন্য সর্বদা প্রস্তুত রাখেন। এবিষয়ে পরিবারের লোকজন বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি মানুষের জীবনে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা থাকে। জন্ম হলে মরণ হবেই এটা চিরন্তন সত্য। যেকোন বয়সের মানব সন্তান মারা গেলেই কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়। আমাদের গ্রামে কেহ মারা গেলে গ্রামের প্রায় সবাই তাকে দেখতে আসে এবং তার জন্যে প্রার্থনা করে। মৃতদেহকে শেষবারের মতো স্নান করানো হয় এবং তার সবচেয়ে ভালো পোশাকটি পড়িয়ে দিয়ে তাঁকে অন্তেষ্টক্রিয়া অনুষ্ঠানের জন্যে প্রস্তুত করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত গির্জার দিকে যাত্রা না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত মৃতদেহের মাথার কাছে মোমবাতি, আগরবাতি জ্বালিয়ে রাখা হয় এবং সেই সাথে পবিত্র ক্রুশের মূর্তি এবং পবিত্র ধর্মগ্রন্থও রাখা হয়। সাথে সাথে চলতে থাকে মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণে বিশেষ প্রার্থনা। আমাদের গ্রামে প্রায় সকল মৃতদেহই কফিনে করে গির্জায় নেয়া হয়। গ্রামের লোকজন এবং আত্মীয় স্বজন এই কফিন বহন করেন। প্রায়শইঃ মৃতব্যক্তির আত্মার কল্যাণে বিশেষ খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করা হয় এবং এর পরে পুরোহিত অন্তেষ্টক্রিয়া অণুষ্ঠান পরিচালনা করেন। এসময়ে অন্তেষ্টক্রিয়ার বিশেষ প্রার্থনা করাম হয়। এর পরিই সমৃতদেহ সমাধিস্থলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সমাধিস্থল আর্শীবাদসহ প্রার্থনা করে মৃতদেহ সমাধিস্ত করা হয়।

র‍্যাজবার

পাদ্রীশিবপুরে কেহ মৃত্যুবরণ করলে ৩দিন বা ৫দিন যেদিন হবে সেই দিন মৃত লোকের আত্মার কল্যাণে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। এদিন পরিবারের লোকজন এবং নিকট আত্মীয়-স্বজন নিরামিশ ভঙ্গ করেন। এদিন আমাদের ধর্মল্লীতে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান করা হয়, যার নাম র‍্যাজবার অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে একটি মোরগ বিশেষ পদ্ধতিতে রান্না করা হয় এবং গ্রামের বিশেষ একজন এই র‍্যাজবার দিতে পারেন। (আমাদের এলাকায় যতটুকু দেখেছি নিঙ্গাল সাধু, মেলকাম ডি'কস্তা বা ভক্ত বাড়ির কেহ) এই র‍্যাজবার দিয়ে থাকেন। ঘরের খাডালে বসে একটি ডাবের জলের কিছুটা নিচে ঢেলে দেয়া হয়। মনে করা হয় এই পানি মৃতের আত্মাকে শান্ত করবে এবং তার অশরীরি আত্মা আর ঘরের কাছে আসবে না। মোরগের বিশেষ তরকারীটি যথাসম্ভব সকলের মধ্যেই পরিবেশন করা হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই র‍্যাজবারের আগ পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির ঘরের চুলায় আগুন দেয়া হয় না বা রান্না করা হয় না। এসময় নিকট আত্মীয়স্বজন এই মৃতব্যক্তির পরিবারের লোকজনদের প্রয়োজনীয় খাবার সরবরাহ করে থাকে। আমাদের গ্রামে এই নিয়মটি যুগের পর যুগ চলে আসছে। আর এই র‍্যাজবারের মধ্য দিয়েই মৃত ব্যক্তির জন্যে আনুষ্ঠানিকতার সমাপ্তি ঘটে।

॥ খ ॥ খাদ্য সামগ্রী ও খাদ্যাভ্যাস ও রান্নাবান্না

আমাদের সামাজিক অনুষ্ঠানমালার কথা বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে সুদীর্ঘ আলোচনা করতে হয়। তবে আমদের কৃষ্টির সাথে মিশে আছে এমন কিছু বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই। প্রথমেই আসে আমাদের রান্নার বিষয়। পাদ্রীশিবপুরের বেশকিছু রান্না আছে যা আমাদের সকলের কাছে একান্ত প্রিয়।

ছেছকীঃ কদু তথা লাউপাতার ছেছকী আমাদের এলাকার একটি বিশেষ তরকারী। লাউপাতা-ডাট, আলু, বেগুন ইত্যাদি দিয়ে এই বিশেষ রান্নটি করা হয়ে থকে। এটি প্রধানতঃ নিরামিশ খাবার । আমাদের গ্রামে এমন কি আমাদের লোকেরা যে স্থানেই বসবাস করুক না কেন, যাতনাভোগকালে প্রতি শুক্রবার এই ছেছকী রান্না করে থাকে। কেবল তাই নয় সাধু আন্তনীর প্রতি ভক্তির জন্যে উপবাস রাখলে, মামারীয়ার প্রতি ভক্তির জন্যে উপবাস এবং ইসপিরিতু সান্ত-এর রোজা বা উপবাসের দিনে এই ছেছকী প্রধান আকর্ষণ।

মরিচট্যাংগাঃ মরিচ ট্যাংগা পাদ্রীশিবপুর বাসীর একটি প্রিয় রান্নাকরা খাবার। সাধারণত চিংড়ি মাছ, ইলিশ মাছ, কৈ মাছ, ডিম, বেলে মাছ (বড়) ইত্যাদি মাছ বিশেষভাবে মরিচ এবং তেতুল বা সিরকা দিয়ে ঝাল করে ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য মশল্লা (পেয়াজ রসুন) দিয়ে এই রান্না করা হয়। এই রান্নায় ঝাল ও টকের আধিক্য থাকায় এর নাম মরিচ ট্যাংগা।

পাতখোলাঃ যেকোন মাছ পেয়াজ, রসুন, হলুদ, মরিচ, লবন ও কাঁচা সরিষার তেল দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে কলাপতায় মুড়িয়ে কম তাপে রান্না করা হয়। এই পাতখোলায় সামান্য টকও ব্যবহার করা যায়। তবে কলাপাতাটি হতে হয় নরম কচি পাতা। আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কচুরলতি, চিংড়ি মাছ, নারিকেল বাটা দিয়ে পাতখোলা এবং নারিকেল বাটা দিয়ে চিংড়ি মাছ পাতখোলা পাদ্রীশিবপুরবাসীদের একটি জনপ্রিয় খাবার।

ওলমাকারীঃ এই কারি মূলতঃ বড় শৌল মাছ দিয়ে রান্না করা হয়। সম্ভবত পতুর্গীজদের থেকে এই রান্নার প্রচলন আমাদের এলাকায় হয়েছে। এই রান্নার প্রণালী শৌল মাছটি ছোট ছোট চারকোনা টুকরা করে কাটতে হয়। এই মাছ আদা বাটা, রসুন বাটা, পেয়াজ বাটা, জিরা বাটা, ধনে বাটা, মরিচ বাটা, সামান্য হলুদ বাটা, গোটা গরম মশল্লা, অল্প বাটা গরম মশল্লা, সামান্য চিনি, তেজপাতা, অল্প সরিষার তেল দিয়ে মেখে আধাঘন্টা পরিমান সময় রেখে দিতে হবে। সরিষার তেলে গোটা গরম মশল্লা ফোরন দিয়ে, পেঁয়াজকুচি বেরেস্তা করে মাখা মাছ তেলে ছেড়ে দিয়ে কম তাপে ধীরে ধীরে রান্না করতে হয়। এই রান্নায় তেলের পরিমাণ একটু বেশী লাগে।

বিন্দালু (ভিনদালু) ঃ গরুর মাংস, শুকরের মাংস, বড় মুরগী/মোরগের মাংস, বাইন মাছ, কচ্ছপ ইত্যাদির বিন্দালু (ভিনদালু) রান্না করা হয়। এই রান্নায় সিরকা/তেতুল এবং টালা মরিচ ব্যবহার করা হয়। এ রান্নায় অবশ্যই সরিষার তেল ব্যবহার করতে হবে। এটিও সম্ভবত পর্তুগীজ থেকে এসেছে।

হোয়া ট্যামপেরাদুঃ বড় শসা, নারিকেলের দুধ, কাডালী ডিমভরা চিংড়ি মাছ, গুর বা চিনি এবং প্রয়োজনীয় মশল্লা দিয়ে রান্না করা হয়। এটিও পর্তুগীজ খাদ্য থেকে এসেছে।

কাকরোলের দোলমাঃ বড় কাকরোল (আস্ত), চিংড়ি মাছ, নারকেলের দুধ, গরম মশল্লা, পেয়াজ, তৈল, তেজপাতা ইত্যাদি দোলমা রান্নার উপকরণ।

ফ্যানেফ্যানেঃ আমাদের পাদ্রীশিবপুরে আউশের চাউল দিয়ে ফ্যানে ফ্যানে রান্না করা হয়। এতে নারিকেল কোড়া, লবন দিয়ে পায়েসের মতো রান্না করা হয়। এটিও আমাদের ঐতিহ্যবাহী খাবার এবং এটির স্বাদ লবনাক্ত হয়ে থাকে।

দোদলঃ পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর ঐতিহ্যবাহী এবং অতি প্রিয় একটি বড়দিনের পিঠার (খাবার) নাম দোদল। যথাসম্ভব এই দোদল তৈরির প্রচলনটি পর্তুগীজদের হাত ধরেই এসেছে। পাদ্রীশিবপুরে বিশেষ পদ্ধতিতে এই দোদল তৈরি করা হয় এবং এটি তার স্বাদের জন্যে সকলের কাছে সমাদৃত। এর রন্ধন প্রণালী তুলে ধরা হলোঃ

উপকরণঃ ১ কেজি সিদ্ধ চালের গুড়া, ঝুনা ২০টি নারিকেলের দুধ, চিনি ২ কেজি গুড়/চিনি, ভাঁজা চিনাবাদম গুড়া করে (আধাভাঙ্গা), এলাচি গুড়া ৪টা। প্রথমে নারিকেল শিলপাটায় আধাবাটা করা ব ব্লেন্ডারে ব্লেন্ডকরে, হালকা গরম পানি দিয়ে নারকেলের দুধ বের করতে হবে। এর পরে বড় একটি সসপ্যান বা পাতিল/কড়াইএ নারিকেলের দুধের সাথে চালের গুড়া ভালো করে মিশাতে হবে। পাতিলটির এক তৃতীয়াংশ খালি রাখতে হবে। এই চালের গুড়া ও নারকেলের দুধের মিশ্রনটি চুলায় বসিয়ে অনবরত নাড়তে হবে যাতে পাতিলের তলায় জমাট না বাঁধে। এই দোদল তৈরির মিশ্রনটি তাপ ও নাড়ার ফলে ঘন হয়ে আসবে। এভাবে ২/৩ ঘন্টা জ্বাল দেবার পরে তৈল বের হবে। আরও ঘন্টা খানেক পরে চিনি দিতে হবে এবং সতর্কতার সাথে নাড়তে হবে। যত সময় যাবে ততই তেল বের হবে এবং ঐ তেলে আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভাঁজতে হবে। এভাবে আরও প্রায় একঘন্টা জ্বাল দিলে নাড়ানির (কাঠের তৈরি বড় চেরা) সাথে হালুয়ার মতো মিশ্রনটি উঠে আসতে শুরু করবে এবং এর রঙ হাল্কা বাদামী হয়ে যাবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যখন থেকে তেল বের হবে তখন থেকেই

চুলায় কম আচেঁ জ্বাল দিতে হবে। এবং মোট সাড়ে চার ঘন্টা থেকে পাঁচ ঘন্টার মতো সময় লাগতে পারে এবং উঠানোর ২০ মিনিট আগে বাদাম ও এলাচের গুড়া ছড়িয়ে দিয়ে নেড়ে নেড়ে মিশাতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, উপরের দিকে যে তেল ভেসে উঠবে তা পাত্র থেকে উঠিয়ে আলাদাভাবে রাখতে হবে। উঠনোর পুর্বে জ্বাল দেয়া বন্ধ করে দিতে হবে। গরম গরম উঠিয়ে প্লেটে বা ট্রেতে রাখতে হবে এবং কলাপাতা দিয়ে উপরের অংশ সমান করে নিতে হবে। এভাবে দোদল তৈরি হয়ে যাবে। ইহা এক রাত রেখে দিয়ে পরের দিন পিস পিস করে কেটে নেয়া যাবে। এবং তা আপ্যায়নের জন্যে সংরক্ষণ করা যাবে। ভালো করে ভাঁজতে পারলে ১৫/২০দিন ফ্রিজ ছাড়াই শীতের দিনে সতেজ থাকবে। ফ্রিজে সংরক্ষণ করলে তা প্রায় ১ বছর পর্যন্ত ভালো থাকবে। চাউলের পরিমাণ কম/বেশী করলে ঐ অনুপাতে অন্যান্য উপকরণ নির্দ্ধারণ করে নিতে হবে।

এছাড়াও, চিংড়ি ভাপা, ইলিশভাপা, ভৌদ্দা, বিসকী, খুদেরপানি (মলিদার পানি), গড়গইর্‌রা, পাতপিঠা, আমড়াসিদ্ধ, বিরইন পিঠা, সেয়ই পিঠা, ছড়া পিডা, পাস্তইল (ময়দার পিঠা), দোদল, পাপড়ী, খেজুর পিঠা, আল্লান-রুটি, আল্লান-রুটি, খোলায় ভাজা পিঠা, (কাটাপিঠা) মিডই, রাইত্তা সিন্নি, মুইড্ডা পিঠা, বিরিংকা পিঠা, সিরকা, ঢেকির শাক, কাকড়া, ভোমরালী শাক, তাল-খান্ডা, কচ্ছপ, আগড়া, ভাপাদু ইত্যাদি।[১৩]

॥ গ ॥ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আমাদের এলাকার সংস্কৃতির সাথে মিশে আছে বেশকিছু খেলাধুলা। এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু খেলা অন্যসব এলাকাতেও হয়ে থাকে। তবে আমাদের এলাকায় এই খেলাগুলো বেশ জন প্রিয়। এর মধ্যে কিছু কিছু আছে যা আমাদের একান্তই নিজস্ব। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য খেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

দাঁড়িয়াবান্দাঃ দাঁড়িয়াবান্ধা আমাদের এলাকার একটি প্রাচীন ও পরিচিত খেলা। খোলাটি বাংলাদেশের আরও অনেক এলাকাতেই হয়ে থাকে। আমাদের এলাকায় বিশেষভাবে শুকনা মৌসুমে খেলাটি অনুষ্ঠিত হতো। পাকিস্তান শাসন আমলে খেলাটি আমাদের এলাকায় বেশ প্রচলিত ছিল। স্কুলের মাঠ ছাড়াও বিশেষ করে মাঘ-ফাল্গুন মাসে যখন আমাদের ধানের কোলা(ক্ষেত) খালি পড়ে থাকতো তখন এই খেলাটি ঐসব ধানের কোলাতেও অনুষ্ঠিত হতো। খেলাটি টেনিস কোর্টের মতোই ঘর কেটে আয়োজন করা হতো তবে এ খেলার জন্যে ৫টি বা তার চেয়ে অধিক ঘর কেটে খেলার মাঠ প্রস্তুত করা হতো। ৫ ঘরের খেলা হলে প্রতি দলে ৬ জন করে মোট ১২ জন খেলোয়ার নিয়ে এই খেলা অনুষ্ঠিত হতো।

পলাপলি (লুকোচুরি)ঃ আমাদের এলাকায় পলাপলি খেলাটি শিশুদের জন্য বেশ আনন্দের খেলা। এই খেলায় কয়েকটি শিশু একত্র হয়ে খেলে থাকে। তারা টসের মাধ্যমে একজনকে বেছে নেয় এবং তার দায়িত্ব থাকে অন্যেরা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পালিয়ে যাবে এবং সময় শেষ হয়ে গেলে সে তাদের খুঁজে বেড়াবে। তাদের মধ্যে প্রথমে যাকে খুঁজে পাওয়া যাবে সে আবার একই নিয়মে অন্যদের খোঁজার কাজটি করবে। এই খেলাটি অতি প্রাচীন কাল থেকে বর্তমানেও ব্যাপক প্রচলিত আছে।

---

[১৩] রান্না ও খাদ্য বিষয়ক তথ্য: সৌজন্যেঃ মেরীলিন গোমেজ মীরা

পাশাখেলাঃ পাদ্রীশিবপুর গ্রামে এক সময় বয়স্কদের মাঝে পাশা খেলার প্রচলন ছিল। যতদূর মনে পড়ে যারা কোলকাতা চাকুরী করতো তারা গ্রামের বাড়িতে এলে এই খেলা খেলতেন। খেলাটি সন্ধ্যা থেকে রাত ৮/৯টা পর্যন্ত চলতো। তবে বর্তমানে এই খেলাটি অবলুপ্ত প্রায়। অনেকটা লুডু খেলার মতো করেই গুটি চাল দিয়ে এই খেলা করা হতো। তবে এর গুটি এবং খেলার কোর্ট ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।

কড়িখেলাঃ আমাদের এলাকার ছেলে মেয়েদের মাঝে আরও একটি জনপ্রিয় খেলা ছিল কড়ি খেলা। এক সময় কড়ি বেশ পাওয়া যেত এমনকি কিনতেও পাওয়া যেতো। এই খেলাটি ছেলে মেয়ে উভয়েই খেলতো।

এক্কাদোক্কাঃ মেয়েদের একটি প্রিয় খেলার নাম এক্কাদোক্কা খেলা। এ খেলাটিও লম্বা ঘর কেটে তা দাগ দিয়ে উঠানে খেলা হতো।

বৌচিঃ পাদ্রীশিবপুরে বিশেষ করে মেয়েরা এই খেলা খেলতো। এই খেলাটিকে পাদ্রীশিবপুরে ছিয়াবুড়িও বলা হয়। এই খেলাটি হাডুডু খেলার মতোই। একই নিয়মে খেলা হতো। তবে এই খেলা মেয়েরা উঠানে খেলতো।

রান্নাবান্নাঃ বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই পাদ্রীশিবপুরেও রান্নাবান্না খেলা হতো। এই খেলায় ছোট ছোট খেলার পাতিল ব্যবহার করা হতো। ছোট চুলা ব্যবহার করা হতো। তবে রান্নাবান্নার কাজটি নিতান্তই মিছেমিছি করা হতো। এই রান্নায় কোন আগুন জ্বালানো হতো না। সবই করা হতো। মাটির চাল, লতাপাতা ইত্যাদি দিয়ে।

কুমির কুমিরঃ আমাদের এলাকায় একটি প্রচলিত খেলা ছিল কুমির কুমির খেলা। এই খেলায় একজন একটু উচুঁ স্থানে বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে বলতো ''এ গাঙ্গে তো কুমির নাই, ঝাপুর ঝুপুর নাইয়া যাই'' আর একজন নিচের দিকে থেকে তার পা ধরতে চেষ্টা করতো। আর তার থেকে রক্ষা পাবার জন্যে লাফ দিয়ে উপরের ছেলে বা মেয়ে সড়ে যেতো। নিচের ছেলে বা মেয়েকে কুমির বিবেচনা করা হতো।

কানামাছিঃ কানামাছি খেলাটি সারা বাংলাদেশের মতোই আমাদের এলাকাতেও জনপ্রিয় ছিল। একজনকে কাপড় বা গামছা দিয়ে চোখ বেঁধে দিয়ে কানামাচির ভূমিকা পালন করতে দেয়া হতো। চারিদিকে অন্য ছেলে-মেয়েরা বলতো ''কানামাছি ভোঁ ভোঁ যারে পাবি তারে ছোঁ।'' আর যাকে ছুঁয়ে দিতে পারতো তাকে আবার কানামাছির কাজটি করতে হতো।

ওপেনটি বাইস্কোপঃ এই খেলাটিও বেশ মজার খেলা। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা এই খেলাটি এখনও খেলে থাকে। এই খেলায় কোন নিদিষ্ট সংখ্যক সদস্য নেই। তাই অনেকেই খেলতে পারে। তবে খেলাটির মজা হলো এর কথাগুলি। বলা হয় ''ওপেনটি বাইসকোপ, লাইনটানা টেইস (নাইন টেইন টেইস্কোপ) কোপ, চুল টানা বিবি আনা, সাহেব বাবুর বৈঠক খানা, সাহেব বাবু বলেছে (আজ বলেছে) জেতে পান সুপারি খেতে, পানের আগায় মরিচ বাটা, ইসপিরিং এর চাবি আটা, যার নাম রেনুমালা, গলায় দিলাম মুক্তার মালা।''

চাড়াখেলাঃ পাদ্রীশিবপুরের ছেলেরা নির্দ্ধারিত দূরত্বে কিছু মাটির পাত্রের বা কলসের চাড়া (ভাঙ্গা অংশ) কয়েকটি সাঁজিয়ে রাখতো। এর পরে এক জন করে ঐ চাড়ার স্তুপটি একটি বল দিয়ে ভেঙ্গে দিতো। আর বাকীরা ঐ চাড়াগুলো সংগ্রহ করে আবার সাঁজাতো। এসময় যে বল দিয়ে মেরে ঐ চাড়ার স্তুপ ভেঙ্গেদিত। সে বলটি সংগ্রহ করে বাকী খেলোয়ারদের টার্গেট করে ছুড়ে মারতো। যদি কারো গায়ে লাগতো তবে সে আবার স্তুপ ভাঙ্গার কাজটি করতো।

ডান্ডাগুটিঃ ডান্ডাগুটি খেলাটি আমাদের এলাকার একটি জনপ্রিয় খেলা। এই খেলাটি অতি পরিচিত এবং সারা দেশে ডানগুলি হিসেবে সুপরিচিত।

পাদ্রীশিবপুরের সংস্কৃতি অনেক আগ থেকেই সমৃদ্ধ। বলতে গেলে আমাদের এলাকার মানুষ সংস্কৃতিবান। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রয়াত সিলভেস্টার স্যারের কথা। তিনি নিজে গান রচনা করতেন এবং সুরারোপ করে তা পরিবেশন করতেন। তার সন্তানেরা বিশেষ করে শোভা ডায়েস, বুলবুল গোমেজ আমাদের গ্রামের ছেলেমেয়েদের সংস্কৃতিবান করে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন। বুলবুল গোমেজ অনেক বছর গীর্জায় উপাসনা সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। কেবল তাই নয় পাদ্রীশিবপুর গ্রামের ছেলেমেয়ে এবং যুবক-যবতীদের এই গান শিখাতেন। কেবল তাই নয় অনেক আগে থেকেই কিছু অনুষ্ঠান আমাদের গ্রামে চলে আসছিল। বর্তমানে তা কম হলেও এখনও হারিয়ে যায়নি।

বিচিত্রানুষ্ঠানঃ গান, নাচ, কমিক, মুকাভিনয় ইত্যাদি নিয়ে আমাদের গ্রামের ছেলে-মেয়ে এবং যুবক-যুবতীদের মাধ্যমে বিভিন্ন কারণে বিচিত্রানুষ্ঠান করা হতো। যেমন;- পাল পুরোহিতকে বরণ, পাল পুরোহিতের বিদায়, প্যারিশের পার্বন, কোন বিশপের আগমন, কোন বিদেশী বা দেশী যাজককে বরন, স্বাধীনতা দিবস, শহীদ দিবস, বড়দিন, ছোটদিন ইত্যাদি। এই বিষয়ে কারো নাম উল্লেখ করতে চাই না কারণ অনেকেই বিভিন্ন সময়ে এই নাচ, গানের তালিম দিতেন। আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, স্থানীয় পাল পুরোহিত এবিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন এবং পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

নাটকঃ পাদ্রীশিবপুরে বড়দিনের সপ্তাহে কমপক্ষে ২টি নাটক হতো। বিশেষ করে যুব সংঘের আয়োজনেই এই নাটক উপস্থাপন করা হতো। অনেকের মধ্যে এই নাট্য পরিচালনায় পাদ্রীশিবপুর হাইস্কুলের শিক্ষক বাবু অনিল চন্দ্র, অরুন গোমেজ, ভিক্টর চার্লস গোমেজ, ফ্র্যাবিয়ান গোমেজ, প্রমুখ এবং আমিও কিছু নাটক পরিচালনা করেছি। এছাড়াও আমার রচিত বিভিন্ন একাঙ্কিকা বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে অভিনীত হয়েছে।

গীতি-নকসাঃ পাদ্রীশিবপুরের আর একটি সাংস্কৃতিক আয়োজন ছিল গীতি-নকসা। এর দু'টি দিক ছিল প্রথমত: বড়দিনে যীশুর জন্ম কাহিনী নিয়ে এই গীতি নকশা রাতের খ্রিষ্টযাগের আগে হতো। এছাড়া বিভিন্ন উদ্দেশ্যে যেমন কোন বিশেষ দিবস বা ব্যক্তির উপরেও এই গীতি নকসা রচিত এবং পরিবেশিত হতো।

জারিগানঃ আমাদের এলাকায় বেশ কিছু শিল্পী জাড়িগান গাইতেন। তাদের কথা বিস্তারিত লেখা সম্ভব নয় এজন্যে যে তাদের আমল ছিলো অনেক আগেকার। তবে যতটুকু স্মরণ করতে পারি বিশেষ করে পাকিস্তান আমলে ১৪ ডিসেম্বর স্কুলে জারিগানের প্রতিযোগিতাও হতো। এছাড়া পাদ্রীশিবপুরে যাজক বরণ হলে তার জন্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তার উপরে রচিত বিশেষ জারিগান পরিবেশিত হতো।

শ্যামানৃত্যঃ পাদ্রীশিবপুরের সংস্কৃতির কথা বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের শ্যামানৃত্যের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। একবছর পাদ্রীশিবপুরে সঙ্গীত শিক্ষার আয়োজন করেছিলেন শ্রদ্ধেয় ফাদার ডেমার্স। সেসময় শ্রদ্ধেয় সুশীল বাড়ৈ, কল্যাণ বাড়ৈ এবং রীতা বাড়ৈ পাদ্রীশিবপুরে এসে গান এবং নাচ শিখিয়েছেন। বিশেষ করে প্রয়াত প্রধান শিক্ষক ভেনানসিও ডি'কস্তার মেয়ে ইলা কস্তা নৃত্যে পারদর্শী ছিলেন। কানাডার মিশনারি ফাদার গী মনেট রবীন্দ্রনাথের ১২টি গান নিজস্ব কণ্ঠ দিয়ে যবনিকার আড়ালে থেকে বজ্রসেনের চরিত্রে গান করেছিলেন। তিনি একটি নাচের দল নিয়ে শ্যামানৃত্য পরিবেশন করেছিলেন।

ভজন নৃত্যঃ পাদ্রীশিবপুরে ভজন নৃত্য নিয়ে আসেন তখনকার রেভারেন্ড ফাদার প্যাট্রিক ডি'রোজারিও (বর্তমান কার্ডিনাল)। ছোট ছোট মেয়েদের নিয়ে, সিস্টার আরতির পরিচালনায়, তিনি এই ভজন নৃত্য প্রথমে পাদ্রীশিবপুরে পরবর্তীতে বরিশালে পরিবেশন করেন। যা তখনকার দিনে বিশেষ আলোড়ন তুলে।

নৌকা বাঁইচঃ পাদ্রীশিবপুরের অন্যমত একটি সংস্কৃতি ছিল নৌকা বাঁইচ। আমরা ছোট বেলাতে এই বাঁইচ প্রতিযোগিতা দেখেছি শ্রীমন্ত নদীতে। ১৪ আগষ্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করতো সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুল। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতো হাইস্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্ররা। তবে এই প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে সমগ্র পাদ্রীশিবপুরে একটি সাঁজ সাঁজ রব পড়ে যেতো। গ্রামের প্রায় সবাই এই বাঁইচ দেখতে আসেতা। স্কুল থেকেই এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার দেয়া হতো।

যাত্রাপালাঃ পাদ্রীশিবপুরের বুকে একসময় যাত্রপালা ছিল খুবই জনপ্রিয়। বিশেষ করে উমেষ হাওলাদার (পাটনি), লালজন স্যার, ডা: ফ্রান্সিস, অনিল স্যার, রাজেন স্যারসহ আরও অনেকেই এই যাত্রাপালায় অভিনয় করেছেন। মজার বিষয় হলো এই যাত্রগানের আসর আমাদের মিশনে চত্তরেই অনুষ্ঠিত হতো। সেই যাত্রাপালায় ছেলেরা বা পুরুষেরা নারীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ ধর্মীয় জীবন; বিশ্বাস ও আচরণ

স্মরণাতীতকাল থেকেই পাদ্রীশিবপুরের লোহকজন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মাঝেই বসবাস করে আসছে। আমাদের ধর্মীয় জীবন কখনোই কারো কারণে বিঘ্নিত হয়নি। বরং আমাদের সাথে সহাবস্থানে থেকে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায় যথেষ্ট আন্তরিকতার সাথেই ধর্মীয় বিষয়াদি সহজভাবে এবং নির্বিঘ্নে পালনে সহায়তা করে আসছেন। আমাদের এলাকায় ধর্মীয় জীবন: বিশ্বাস ও আচরণ সম্পর্কে বলতে গেলে আমরা প্রথমেই যেকথাটি গর্বের সাথে উচ্চারণ করতে পারি তা'হলো- ধর্মীয় জীবন ও তাপালনে আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন।

আমাদের এলাকায় তিনটি ধর্মের লোকজন বসবাস করেন। খ্রিস্টান, মুসলমান ও হিন্দু। খ্রিস্টান সম্প্রদায় বসবাস করে আসছে মুলতঃ তিনটি এলাকায়। পাদ্রীশিবপুর, রাজাবাড়িয়া (কালাদা) ও মাটিভাঙ্গা এবং এই তিনটি গ্রামের খ্রিস্টান লোকজনদের নিয়েই পাদ্রীশিবপুর কাথলিক ধর্মপল্লী গঠিত। তবে সাম্প্রতিক মাটিভাঙ্গা পৃথক ধর্মপল্লী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং তারা আলাদাভাবে তাদের প্যারিশের কাজ পারিচালনা করছে। আমাদের ধর্মীয় জীবন একেবারেই পরিশীলিত। অনেক আগে থেকেই আমাদের জীবন খ্রিস্টান ধর্মের সাথে মিশে আছে। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দ থেকেই আমাদের পরিচয় আমরা খ্রিস্টান। আর আমাদের জীবন যাপনের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণ। আমাদের জীবনে যেসকল ধর্মীয় আচরণ করে থাকি তা নিম্নে অতি সংক্ষেপে তুলে ধরছি ঃ-

॥ ক ॥ ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মশিক্ষা: স্বর্গদ্বার পুস্তক প্রধান

পাদ্রীশিবপুর একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী খ্রিস্টান জনপদ। এই জনপদে যুগে যুগে বিশেষ করে হলিক্রশ ফাদারগণ তাদের সেবাকর্ম সম্পাদন করেছেন। মানুষের মাঝে খ্রিষ্টকে প্রকাশ ও প্রচার করার জন্যে তাদের ছিল প্রানান্ত প্রচেষ্টা। ফলে সকলের কাছে খ্রিষ্টকে তুলে ধরার জন্যে তাঁরা তাঁদের সর্বাত্মক শ্রম, মেধা ও সময় দিয়েছেন। ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে পবিত্র বাইবেল মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। পবিত্র বাইবেল যখন বাংলা ভাষায় সহজলভ্য ছিল না, তখন খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে স্বর্গদ্বার নামে একটি ধর্মীয় পুস্তক ব্যবহার করা হতো। আবার একথাও সত্য যে এই স্বর্গদ্বার পুস্তকখানা সহজলভ্য ছিল না। খুব সীমিত লোকের কাছে এই ধর্মপুস্তকটি ছিল। তবে একথা সথ্য যে এই স্বর্গদ্বার পুস্তকের মাধ্যমেই আমাদের জনপদে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারিত হয়েছে অনেক কাল। এর মাধ্যমেই যীশুর জীবন, কর্ম ও শিক্ষা আমাদের মাঝে তুলে ধরা হয়েছে। বৃটিশ আমল থেকে শুরু হয়ে পাকিস্তান আমলের একটি বড় অংশজুড়ে এই ধর্মপুস্তকটি ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তীতে পবিত্র বাইবেল যখন বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং তা সহজলভ্য হয় তখন ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে বাইবেল মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তবে এর পুর্বে স্বর্গদ্বার বাইবেলের পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছে।

॥ খ ॥ ধর্মসংস্কার পালন ও ধর্মীয় অনুশীলন

পাদ্রীশিবপুর কাথলিক ধর্মপল্লীর মানুষের জীবনে ধর্মীয় সংস্কার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। ধর্ম সংস্কার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচান করা হলো:

দীক্ষাস্নান সংস্কারঃ একটি নবজাত শিশু যখন কোন পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তখন পিতামাতা প্রধমেই তার দীক্ষাস্নান বা বাপ্তিস্ম নিয়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আমাদের এলাকায় খ্রিষ্ট বিশ্বাসীগণ একটি বদ্ধমূল ধারণা পোষণ করেন যে, যখন কোন শিশু জন্মগ্রহণ করে তার সাথে আদিপাপ থাকে। তাই যতশীঘ্র বাপ্তিস্ম সংস্কার দেয়া যায় তত শীঘ্রই শিশুটি শয়তানের প্রভাব মুক্ত হয়। একটি একটি বিশ্বাস যা প্রতিটি পরিবারকে নবজাত শিশুকে খ্রিস্টান হিসেবে দীক্ষিত করা হয়। আর যখন একটি শিশু এই সংস্কার গ্রহণ করে তখন সেই দিনটি ঐ পরিবারে বিশেষভাবে পালন করা হয়। এই সংস্কারকে কেন্দ্র করে পরিবার সামর্থ্য অনুসারে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। পরিবারের একজন সদস্য খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ করা হয়। যাদের সামর্থ্য আছে তারা বাদ্যবাজনা সহকারে আনন্দ প্রকাশ করে। শিশুটির ধর্মপিতামাতা এবং আত্মীয় স্বজনকে আপ্যায়িত

করা হয় এবং সকলেই শিশুটিকে আর্শীবাদ করে। এর মধ্য দিয়ে এই দীক্ষাস্নান সংস্কার যে কাথলিক পরিবারের জন্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তা প্রকাশ পায়।

পাপস্বীকার সংস্কারঃ আমাদের এলাকায় একটি শিশুর বয়স যখন ০৮-১০ বছর হয় এ সময় তার পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণের জন্যে তাকে প্রস্তুত করা হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রথম খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণের পূর্বে এই পাপস্বীকার সংস্কার প্রদান করা হয়। এই সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবনের জন্যে একটি শিশুকে বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়। এই প্রস্তুতির কাজে পিতামাতা, স্কুলের শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ এবং সিস্টারগণ মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। এই সময়ে প্রথম খ্রিষ্টপ্রসাদ গ্রহণের জন্যে নিজেকে আত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ করার জন্যে প্রভুযীশু খ্রীষ্ট যে পাপ স্বীকার সংস্কার স্থাপন করেছেন তা শিশুদের ভালো করে বুঝিয়ে দেয়া হয়। পবিত্র খ্রীষ্টপ্রসাদ পবিত্র অন্তকরণে গ্রহণের জন্যে পাপস্বীকার গুরুত্বপূর্ণ। যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে, তারা যাদের পাপ ক্ষমা করবেন স্বর্গীয় পিতাও তাদের পাপ ক্ষমা করবেন। এই শিক্ষা থেকেই পাপস্বীকার সংস্কারের যাত্রা শুরু। একটি শিশু যখন ৮-১০ বছর বয়স্ক হয় তখন তার মাঝে ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বুঝার মতো একটি মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। আর কারো বিরুদ্ধে যেকোন অন্যায় করা যে পাপের জীবনে প্রবেশ করা এই অনুভবটি শিশুটির মাঝে জেগে ওঠে। তাই এই সময় মনে প্রাণে অনুতপ্ত হয়ে নিজের পাপের ক্ষমা পাবার জন্যে ফাদারের কাছে গিয়ে পাপস্বীকার করা এবং ভবিষ্যতে পাপের সংস্পর্শ হতে দূরে থাকার অঙ্গীকার করার জন্যেই পাপস্বীকার সংস্কার মানব জীবনে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টান সমাজ এই পবিত্র সংস্কারটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এবং এজন্যেই পরিবারের শিশুদের নিজেরা এই সংস্কার সম্পর্কে অবহিত করেন। সেই সাথে তাদের প্রস্তুতির জন্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খ্রিস্টান শিক্ষিকাগণ ও সিস্টারগণ বিশেষ শিক্ষার আয়োজন করে থকেন। এই শিক্ষার বিষয়টি অবশ্য বাংলাদেশের প্রতিটি ধর্মপল্লীতেই হয়ে থাকে। সাধারণত প্রথমবার খ্রিষ্টপ্রসাদ গ্রহণের পূর্বের দিবসে বা তার একদিন আগে প্রথমবার পাপস্বীকার সংস্কার প্রদান করা হয়। বা বলা যায় একটি শিশু প্রথমবার পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে আজীবন এই সংস্কার বার বার গ্রহণের মাধ্যমে নিজের আত্মার পরিশুদ্ধি করে থাকে।

পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কারঃ পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণের পরের দিনই আমাদের গ্রামের ছেলে-মেয়েদের জন্যে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ। আগেই যেমনটি উল্লেখ করেছি পাপস্বীকার সংস্কারের জন্যে বিশেষ শিক্ষার আয়োজনের কথা। এই শিক্ষার আয়োজন মূলতঃ পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ বা প্রথম কমুনিয়ন গ্রহণকে ঘিরেই হয়ে থাকে। এই সংস্কারটি গ্রহণের জন্যে শিশুদের আগ্রহেরও শেষ থাকে না। কারণ তারা ছোট বেলা থেকেই বড়দের খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করতে দেখে। আর এই দেখা থেকেই তাদের মধ্যে উক্ত খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এই কমুনিয়ন গ্রহণের মাধ্যমে যে যীশুকেই আমরা রুটির আকারে গ্রহণ করি তা শিশুদের সুন্দর করে বুঝিয়ে দেয়া হয় এবং তাদের আধ্যাত্মিকভাবে প্রস্তুত করা হয়। এর আরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে যে, ধর্মপল্লী থেকে প্রতি বছরই এই সংস্কার অনেক শিশুকে একত্রে দেয়া হয়ে থাকে। আর সবাই মিলে প্রভুযীশুকে গ্রহণ করার মাধ্যমে তাদের মাঝেও একটি মিলনের মেলবন্ধন সৃষ্টি হয়। আর একটি দিক

সত্যই আমাদের আশান্বিত করে যে, পাদ্রীশিবপুরের প্রতিটি পরিবার যাদের শিশুরা প্রথমবার খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করবে তাদের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে। তাদের নিয়মিত ধর্মশিক্ষা ক্লাসে পাঠানো থেকে শুরু করে তাদের সাদা পোশাক ও প্রয়োজনীয় যাকিছু তার ব্যবস্থা করে থকেন। এর থেকে একটি বিষয়ে শিশুরা ছোট বেলা থেকেই অনুধাবন করে যে, তারা যে কমুনিয়ণ গ্রহণ করতে যাচ্ছে তার অনেক গুরুত্ব বিদ্যমান। আবার বাহ্যিকভাবেও এইদিনে শিশুটির প্রথম কমুনিয়ন গ্রহণের দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে পারিবারিক ভাবে যথাসাধ্য আয়োজন করা হয়। কেহবা অনেক আত্মীয়স্বজন নিয়ে একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করে, কেহবা বাদ্যযন্ত্র সহযোগে শিশুটিকে আনন্দ করতে করতে বাড়িতে নিয়ে আসে। যাদের সামর্থ্য কম তারাও নিকট আত্মীয়দের নিয়ে দুপুরে বা রাতে প্রীতি ভোজের আয়োজন করে। এর মাধ্যমে শিশুটিও বুঝতে পারে যে, তার জীবনে এই সংস্কার গ্রহণের দিনটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সেই সাথে যে সামগ্রিকভাবে বুঝতে সক্ষম হয় যে, পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কারের মাধ্যমে স্বয়ং যীশু খ্রিস্ট তার অন্তরে প্রবেশ করেছেন এবং তিনি তার মধ্যে বাস করেন। ফলে এই কমুনিয়ন যা এক সময় শিশুটি কেবল খাবার জন্যে আগ্রহী বা কৌতুহলী থাকতো সে তা আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করার পরে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে, প্রভুযীশু তার মাঝে রুটির আকারে এসেছেন এবং তার মধ্যে বাস করছেন। এই সংস্কার গ্রহণের মাধ্যমে একজন খ্রিস্টান হিসেবে তার মাঝে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। এভাবেই সে বেড়ে ওঠে দেহে-মনে-আত্মায়।

পবিত্র হস্তার্পণ সংস্কারঃ একজন খ্রিস্টান মানুষের জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন সংস্কার গ্রহণের ফলে তার আধ্যাত্মিকতা পরিপুষ্ট হয়। পাদ্রীশিবপুরে হস্তার্পন সংস্কার একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার। এই সংস্কারটি ১২ বছর বা তার চেয়ে বেশী বয়সী শিশু-কিশোর বা যুবক-যুবতীদের দেয় হয়ে থাকে। এই সংস্কার গ্রহণের জন্যেও প্রস্তুতি ক্লাস নেয়া হয়। তবে এই সংস্কারটি আগেকার দিনে বেশ কয়েক বছর পর পর দেয়া হতো। কারণ হস্তার্পন সংস্কার প্রদানের কর্তৃপক্ষ প্রভুবিশপ। আর যখন পাদ্রীশিবপুর মাইলাপুর বা চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের অধীনে ছিল তখন প্রতিবছর প্রভুবিশপের পক্ষে প্রতিটি ধর্মপল্লীতে গিয়ে হস্তার্পন সংস্কার প্রদান সম্ভব হতো না। তবে বর্তমানে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এখন প্রতিবছরই এই সংস্কার প্রদান করা হয়। এই সংস্কার গ্রহণের জন্যে একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। কারণ এই সংস্কারের মাধ্যমে পবিত্রআত্মাকে একটি শিশু বা যুবা গ্রহণ করে। তাই পবিত্রআত্মা সম্পর্কে তাদের বুঝতে ও জানতে পরিণত বয়স প্রয়োজন। এই সংস্কার গ্রহণের মাধ্যমে একজন খ্রিস্টান যীশুর সৈনিক হবার গৌরব অর্জন করে। প্রভুবিশপ হস্তার্পণপ্রার্থীর মাথায় হস্ত প্রসারিত করেন এবং গালে হালকা চড় মারেন এটা বুঝাতে যে ঐ প্রার্থী এখন থেকে পবিত্র আত্মার শক্তিতে শক্তিমান এবং পবিত্রআত্মা তাকে পরিচালিত করবেন এবং সেই শক্তিতেই সে আজীবন একজন আদর্শ খ্রিস্টান হিসেবে জীবন যাপন করবে। এই সংস্কারটি গ্রহণের জন্যেও প্রথম কমুনিয়ন গ্রহণের মতোই বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। এই সংস্কারটির গুরুত্ব বুঝাতে ধর্মপল্লী পর্যায়ে এবং পরিবারে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রতিটি সংস্কারই মানুষকে একজন খ্রিস্টান হিসেবে তথা কাথলিক খ্রিস্টান হিসেবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে।

বিবাহ সংস্কারঃ দুটি পরিবারের দুজন, একজন নর এবং এবং একজন নারী একটি পরিবার গঠনের লক্ষ্যে যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন তাদের এই ইচ্ছার পরিপূর্ণতা লাভ করে যে সংস্কারের মাধ্যমে তার নাম বিবাহ সংস্কার। পরিবার গঠনের জন্যে বিবাহ সংস্কারের কোন বিকল্প নেই। পূর্ণ বয়স্ক একজন খ্রিস্টান পুরুষ এবং নারী যখন পরস্পরকে বিবাহ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাদের এই বাসনাকে বাস্তবরূপ দিতে সহয়তা করে প্রথমত তাদের পরিবার এবং বিশেষভাবে মাতামণ্ডলী। মাতামণ্ডলী বিবাহ সংস্কার স্থাপন করেছেন যেন এর মাধ্যমে খ্রিস্টান পরিবারের বিকাশ সাধন হয়। এই সংস্কার গ্রহণের জন্যে প্রথম: নর এবং নারীর সম্মতিতে দুটি পরিবারের স্বীকৃতিতে প্রথমে পরিবার গঠনের নিমিত্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তুতিতে যেমন থাকে বাহ্যিকতা তেমনি থাকে আধ্যাত্মিকতা। ধর্মপল্লীর পুরোহিত মাণ্ডলিক নিয়ম অনুসারেই বিবাহ প্রার্থী বর-কণেকে প্রস্তুত করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। বিবাহ সংস্কারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, পরিবার গঠন এবং সেই পরিবারকে লালন পালন করা ইত্যাদি এই শিক্ষায় গুরুত্ব পায়। আর যখন এই মাণ্ডলিক নিয়ম কানুন সম্পূর্ণভাবে পালন করা হয়, তখন একটি নব দম্পতিকে বিবাহ সংস্কার প্রদান করা হয়। বিবাহ সংস্কার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একটি খ্রিস্টান পরিবারের যাত্রা শুরু হয় এই সংস্কারের মাধ্যমে। এখানে পারস্পরিক সমঝোতা একান্ত প্রয়োজন। সেই সাথে পরিবারিক দায়দায়িত্ব পালন ও খ্রিষ্টের আদর্শ অনুসরণ করে একটি পরিবার গঠনের প্রতিজ্ঞাও এই সংস্কারের বিশেষ দিক। বিবাহের বিষয়ে ইতোমধ্যেই বিষদ আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে একে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার কথা ইতোমধ্যেই আলোচিত হয়েছে।

যাজক বরণ সংস্কারঃ আমাদের প্রভুযীশুখ্রিষ্ট মহাযাজক। তিনি তাঁর অন্তিমভোজের সময় একটি বিশেষ সংস্কার স্থাপন করেছেন। আর এই সংস্কারটির দ্বারা প্রভুযীশু পৃথিবীতে খ্রিষ্টমন্ডলীকে স্থাপন করলেন। পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীতে যাজকবরণ সংস্কার বেশ কয়েকটি হয়েছে। এই সংস্কারটির মাধ্যমে একজন খ্রিস্টান যুবক আজীবন কুমার থাকার ব্রত গ্রহণ করে। মূলত মণ্ডলী পরিচালনার জন্যে ব্রতীয় জীবন-যাপন এবং সকল সংস্কারকে বাস্তবায়নের মহান দায়িত্ব তারা লাভ করেন। সংসার ত্যাগী হয়ে তারা সর্বসাধারণের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেন। এই সংস্কারের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রভু যীশুখ্রিষ্ট মণ্ডলী স্থাপন করেছেন। এবং তিনি যাজকদের মাধ্যমে যুগে যুগে এ জগতে মানব সমাজকে ঐশ্ববাণী অনুসারে জীবনযাপন করতে অনুপ্রাণিত করে থাকেন। তিনি প্রবক্তা হিসেবে ঐশ্ববাণী প্রচার করেন এবং সেই বাণীর শিক্ষা অনুসারেই মণ্ডলী পরিচালনা করেন।

অন্তিমলেপন/রোগী লেপন সংস্কারঃ এপৃথিবীর মায়াবন্ধন ত্যাগ করে সকলকেই এক সময় পরলোকে গমন করতে হয়। তাই বিশেষ করে শেষ বয়সে বা কোন মারাত্নকরোগে রোগাগাক্রন্ত রোগীদের একটি সাক্রামেন্ত প্রদান করা হয় যা অন্তিমলেপন বা রোগীলেপন হিসেবে পরিচিত। এই সময়ে পবিত্র তৈলদ্বারা রোগীকে কপালে লেপন করা হয় এবং তার জন্যে বিশেষ আর্শীবাদ প্রদান করা হয়। আমাদের বিশ্বাস অনুসারে এই সাক্রামেন্ত গ্রহণ করার ফলে একজন মানুষ নিজেকে মৃত্যুর জন্যে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত রাখে। আর এই সংস্কার লাভের মাধ্যমে জীবনের সকল পাপের থেকে মুক্তির বিষয়টিও প্রাধান্য পায়।

নৈতিক জীবন ও মূল্যবোধঃ পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান জনপদের একটি বিশেষ দিক হলো তাদের জীবনাচরণে সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য পায় নৈতিকতা। একজন খ্রিস্টান হিসেবে জীবন যাপন করতে গিয়ে নৈতিকতাকে সমুন্নত রাখার বিষয়টি প্রায় সকল খ্রিস্টানই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। ফলে আমাদের এলাকায় অন্যধর্মের লোকেরা খ্রিস্টানদের তুলনামূলকভাবে বেশী বিশ্বাস করে। কারো সাথে প্রবঞ্চনা বা অন্যায়ভাবে কারো সাথে কোন বিষয়ে আচরণ করা থেকে খ্রিস্টান সম্প্রদায় নিজেদের সযত্নে দূরে রাখে। বিশেষ করে কথা ও কাজের মাঝে খ্রিস্টানদের মিল আছে বা পাওয়া যায় এবিষয়টি সকলেই জানে। মিথ্যে বলা এই এলাকার লোকজনদের স্বভার বিরুদ্ধ। অনৈতিক কাজ করা থেকে খ্রিস্টানগণ দূরে থাকেন। তবে এর ব্যতিক্রম যে নেই তা বলা যাবে না। বেশীরভাগ মানুষই তাদের জীবনে খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধ ধারণ করে। অপরের উপকার করার একটি সুন্দর প্রবণতা তাদের মধ্যে সব সময় দেখা যায়। সেবাকাজে তারা সকলের অগ্রবর্তী থাকেন। কারো বিপদ হলে তাকে সাহায্য করার জন্যে তারা এগিয়ে যান। একাজে কখনো জাতিধর্মবর্ণ তারা বিচেনায় আনে না। তাদের মাঝে রয়েছে পারিবারিক ও মাণ্ডলিক শিক্ষা যা তাদের যেকোন মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। এজন্য দেখা যায় যে খ্রিস্টান সম্প্রদায় স্থানীয় অন্য সম্প্রদায়ের কাছে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। তার উজ্জ্বল প্রমাণ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেকেই খ্রিস্টানদের কাছে তাদের মূল্যবান সম্পদ জমা রেখেছেন কোন প্রমাণক ছাড়াই। এবং যুদ্ধের পরে সবাই তাদের গচ্ছিত সম্পদ ফিরে পেয়েছেন কারণ কারো বিরুদ্ধে এবিষয়ে কোনরূপ অভিযোগ পাওয়া যায়নি। কেবল তাই নয় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা সকলের সাথেই সুন্দর ব্যবহার করেন। ফলে সমাজের মাঝে অন্য সম্প্রদায়ের যারা রয়েছেন তারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি সুন্দর আবহে জীবন যাপন করছেন। এখনও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ে নিজেদের মধ্যে কোন অমিল বা প্রভেদ দেখা দিলে সমাজের কাছে বা প্যারিশ কাউন্সিলের কাছে সমাধান আশা করেন এবং প্যারিশ কাউন্সিলও তা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে সুসম্পন্ন করেন। আর এই যে সুন্দর আচরণ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এটাই প্রকাশ করে আমরা খ্রিস্টীয় মুল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত। আমাদের কাজে, কথায় এবং আচরণে আমরা এই মূল্যবোধ ধরে রাখি বলেই আজও পাদ্রীশিবপুর গ্রামে আমরা সবাই মিলেমিশে মাথা উচুঁ করেই বেঁচে আছি।

আধ্যাত্মিক চর্চা ও ধর্মীয় অনুশীলনঃ পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টান সমাজ ২৬০ বছর বিশ্বাসের জীবন অতিক্রম করছে। আমাদের জীবনে আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন ব্যাপক ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশীলনে সমৃদ্ধ। পাদ্রীশিবপুর এমন একটি ধর্মপল্লী যেখানে এককভাবে ক্যাথলিক খ্রিস্টান জনগণ বসবাস করেন। আর আমাদের আধ্যাত্মিক চর্চা ও ধর্মীয় অনুশীলনও তাই ক্যাথলিক মণ্ডলীর আদর্শ অনুসারেই হয়ে আসছে। এই ধর্মীয় অনুশীলন যা আমরা যুগের পর যুগ করে আসছি তা আমাদের আধ্যাত্মিক চর্চার সুললিত ফসল। আমাদের এলাকায় খ্রিস্টান ধর্মের আলোকবর্তিকা হয়ে এসেছিলেন পবিত্রক্রুশ সম্পদায়ের ফাদারগণ। আর আজও সেই ধারাবাহিকতা বিদ্যমান। যদিও কোন কোন সময় অন্যান্য সংঘের ফাদারগণও এখানে পালক পুরোহিত ছিলেন তবে তা নিতান্তই কম সময়ের জন্যে। তাই আমাদের জীবনের আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মীয় অনুশীলন গভীরভাবে পবিত্রক্রুশ সম্পদায়ের ফাদারদের দ্বারা প্রভাবিত। আমাদের ধর্মীয় চর্চায় যে বিষয়গুলো প্রাধান্য পায় তার কয়েটি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

পবিত্র খ্রিস্টযাগঃ আমাদের এলাকার খ্রিস্টানগণ প্রতিদিন না হলেও রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগে অধিকাংশই অংশগ্রহণ করেন। এটি আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছে সেই প্রথম থেকেই। তবে আগে রবিবারে বলতে গেলে সবাই পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতেন। বিগত দুতিন দশক ধরে এই ক্ষেত্রে কিছুটা উদাসীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষ করে পুরুষগণ যেন পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশ নিতে কুণ্ঠাবোধ করেন। অবশ্য আরও একটি কথা স্বীকার করে নিতে হয় যে, জীবন ও জীবিকার জন্যে অনেক পুরুষই গ্রামের বাইরে অবস্থান করেন। তবে তার পরেও যারা গ্রামে আছেন তাদের মধ্যেও কেহ কেহ রবিবারে খ্রিস্টযাগে যোগদান করেন না। এদিক দিয়ে আমাদের গ্রামের মহিলাগণ নিয়মিত এই খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। তবে বড়দিন ও ইস্টারের সময় সকলেই খ্রিস্টযাগে যোগদান করেন। পাদ্রীশিবপুরের লোকজন দেশের বিভিন্ন শহরে এবং প্রবাসে যেখানেই আছেন তারা পবিত্র খ্রিস্টযাগে যোগদান করে থাকেন। যদি কাজের কারণে রবিবারে সম্ভব না হয়, তারা শনিবারে সুযোগ নিয়ে এই খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন।

পারিবারিক প্রার্থনাঃ পাদ্রীশিবপুর গ্রামের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকজন পারিবারিক প্রার্থনার চর্চা করে থকেন। বিশেষ করে সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা ও পবিত্র জপমপলার প্রার্থনা পারিবারিকভাবে করা হয়ে থকে। এর যে ব্যতিক্রম নেই তা বলা ঠিক হবে না। তবে বেশীরভাগ পরিবারই এখনও এই প্রার্থনার চর্চা ধরে রেখেছেন। কেবল তাই নয় খাবার পূর্বের প্রার্থনা, রাত ৮ টার সময় মৃতলোকদের জন্যে প্রার্থনা, দুপুর ১২ টা, সন্ধ্যা ৬ টা ইত্যাদি সময় দূত সংবাদ বা স্বর্গের রাণী প্রার্থনা করার প্রচলন আমাদের সমাজে রয়েছে। একই ভাবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল ও কোলকাতায় অবস্থানরত পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা ও পবিত্র জপমালা প্রার্থনা করে থাকেন।

নভেনাঃ পাদ্রীশিবপুরবাসী পথ প্রদর্শিকা মা মারীয়ার পর্বকে কেন্দ্র করে নভেনা পালন করা হয়। আর এই নভেনা বর্তমানে গ্রামের সবাই পালন করেন। তবে এই পার্বণ অতি সম্প্রতি আগের মতো করে পালন করা হচ্ছে না। এর পূর্বে খ্রিস্টরাজার পর্বের পূর্বে নভেনা পালন করা হতো। এই নভেনায় বিশেষ খ্রিষ্টযাগ উৎসর্গ করা হতো এবং ৯ দিন ৯ জন যাজক ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে সহভাগিতা করতেন। এই সময় যথাসম্ভব সবাই পবিত্র খ্রিস্টযাগে যোগদান করতেন। আর পর্বের দিনে বিশেষ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হতো। এই পার্বণের দিনটি আমাদের গ্রামের সকলের জন্যে খুবই আনন্দের দিন। বর্তমানে কিছুটা শিথিলতা আসলেও ঐতিহ্যগতভাবে পালন করে আসা পার্বণও নভেনা এখনও আছে।

প্রায়শ্চিত্তকালীন পারিবারিক প্রার্থনাঃ প্রতি বছর ভস্মবুধবার থেকে শুরু করে পুণ্যবৃহস্পতিবার পর্যন্ত দলগতভাবে গ্রামের ঘরে ঘরে গিয়ে জপমালা প্রার্থনা ও যীশুর যাতনাভোগ নিয়ে রচিত ধর্মীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। যা বর্তমানেও চালু আছে। আমাদের গ্রামের পাশাপাশি এই প্রার্থনা ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় যেখানেই আমাদের গ্রামের লোকজন বসবাস করেন সেখানেই প্রচলিত আছে।

সাধু যোসেফের পার্বণঃ প্রতিবছর ১৯ মার্চ তারিখের মণ্ডলীর প্রতিপালক সাধু যোসেফের পার্বন পালন করা হয়। এদিন সকালে সেমিনারিতে সাধু যোসেফের মঠের প্রাঙ্গণে পবিত্র খ্রিষ্টযাগ উৎসর্গ করা হয় এবং সেই খ্রিস্টযাগে প্রায় সকলেই অংশগ্রহণ করে থাকেন। এই খ্রিস্টযাগটি অনেক আগ থেকেই এই চত্তরে হয়ে আসছে। এ সকল প্রার্থনা অনুষ্ঠান ও খ্রিস্টযাগ ছাড়াও মৃত লোকদের জন্যে বিশেষ প্রার্থনা, রোগীদের জন্যে প্রার্থনা, বিভিন্ন পারিবারিক দিবসে প্রার্থনা করার প্রবণতা ব্যক্তিগতভাবে বা ওয়ার্ডের সকলে মিলে আমাদের সমাজে রয়েছে।

সাধু আন্তনীর পার্বণ পালন (রাজাবাড়িয়া)ঃ প্রতি বছর অনেক ভাবগাম্ভীর্যের সাথেই পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর উপধর্মপল্লী রাজাবাড়িয়াতে সাধু আন্তনীর পার্বণ জাঁকজমক সহকারে পালন করা হয়। এজন্যে ৯দিন ব্যাপি নভেনার আয়োজন থাকে এবং পর্বদিনে অনেক লোকের সমাগম ঘটে। বর্তমানে বরিশাল ডায়োসিসের মাধ্যমে এই পার্বণটি ধর্মপ্রদেশীয় তীর্থ হিসেবে পালন করা হচ্ছে। ফলে কেবল আমাদের ধর্মপল্লী নয় সমগ্র ডায়োসিসের খ্রিস্টানগণ এই পাবর্নে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থকেন। তবে এর মূল উদ্যোগটি পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লী থেকেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

মা মারীয়ার পার্বণ (দেশান্তর কাঠি)ঃ কুমারী মারীয়ার সকল পর্বগুলিই আধ্যাত্মিকভাবে পালন করা হয়। পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর উপধর্মপল্লী দেশান্তরকাঠি যা পূর্বে টেংরাখালি নামে সমধিক পরিচিত ছিল, রক্ষাকারিণী কুমারী মারীয়া নামে বিশেষভাবে পার্বণটি পালন করা হয়। দেশান্তরকাঠির খ্রিস্টান ভক্তগণ এই পাবর্ণের সাথে নতুন গির্জা-আশীর্বাদ দিবস এবং উপধর্মল্লীর পার্বণ হিসেবে পালন করা হয় নভেনা করে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির মাধ্যমে।

লোকভক্তি ও লোকবিশ্বাসঃ উপরোক্ত ধর্মীয় চর্চা ছাড়াও আমাদের ধর্মপল্লীতে লোকভক্তি ও লোকবিশ্বাসের কারণে কিছু কিছু ধর্মীয় চর্চা বিদ্যমান। যেমনঃ মা মরীয়াকে বাড়িতে নিয়ে স্থান দেয়া এবং নিশিজাগরণ করে প্রার্থনা করা। এই প্রার্থনা করা হয় বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বা কোন মানতের জন্যে। একইভাবে সাধু আন্তনীর কাছেও বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হয়। এসব প্রার্থনা গ্রামের কিছু লোক নিয়ে দলবদ্ধভাবে করা হয়ে থাকে। এর আগে আমরা এক সময় দেখেছি, মা মারীয়া ও সাধু আন্তনীর মূর্তি নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা বা প্রসেশন করা। বিশেষভাবে অনাবৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে এই প্রার্থনাসহ শোভাযাত্রা করা হয়ে থাকে। আর আমাদের স্থানীয়রা বিশ্বাস করে যে ভক্তিভরে মা মারীয়া বা সাধু আন্তনীর কাছে যা চাওয়া হয় তা পাওয়া যায়। একই ভক্তির কারণেই অনেকেই মা মারীয়ার ও সাধু আন্তনীর মূর্তির সামনে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করে, পুষ্পার্ঘ অর্পণ এবং পুষ্পমাল্য দান করে। আবার কেহবা মা মারীয়ার পার্বণে, মা মারীয়াকে পরানোর জন্যে কাপড় দান করেন। কেহবা বেদীর কাপড় বা উপাচার দান করেন। এতে যেমন তাদের ভক্তি থাকে তেমনি থাকে বিশেষ উদ্দেশ্যে মানত। আর যুগের পর যুগ মানুষ এমনটি করে মা মারীয়া বা সাধু আন্তনীর কৃপায় ফল পেয়েছেন বলেও সাক্ষ্য দান করেন।

কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতাঃ পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টান সম্প্রদায় কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতায় বিশ্বাস করে না। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কুসংস্কার যে নেই তা বলা ঠিক হবে না। বিশেষ করে কোন কোন রোগের কারণে এমনটিও বিবেচনা করা হয় যে কারো নজর লেগেছে বা কোন কারণে ভয় পেলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পানি পড়া বা কখনো কখনো তাবিজ ব্যবহার করা। কোন কোন সময় ছিল বেদেনীদের ছলনায় পরে তাদের দেয়া ঔষধ বা সুতা ব্যবহার করা হতো। তবে এ কথা সত্যি যে বর্তমানে এমনটি আর নেই। শিক্ষার হার যত বৃদ্ধি পেয়েছে ততটাই কুসংস্কার দূর হয়ে গেছে। তবে ধর্মীয় বিষয়ে কিছুটা বেশী ভক্তি আছে। তাকে ভিন্ন অর্থে ধর্মান্ধতাও বলা যায়। লোকজন রোগ নিরাময়ের জন্যে সাধু আন্তনীর কাছে বা মা মারীয়ার কাছে মানত করে বা অন্য কিছুর জন্য মানত করে। আর সেই ফল তাদের কাছ থেকেই লাভ করে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। তবে একথা সত্য যে এই শ্রেণীর লোকজন আমাদের গ্রামে অনেক হ্রাস পেয়েছে।

ষষ্ঠ ভাগ:
পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ: অতীত ও বর্তমানের সেবাপ্রতিষ্ঠান
লেখক : মি. যোসেফ ডি'রোজারিও

আলোচ্য বিষয়সূচির সারসংক্ষেপ

প্রথম অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের অবকাঠামোগত প্রতিষ্ঠানসমূহ

॥ ক ॥ প্যারিশের জনগণ ও সেবাদানের মৌলিক প্রতিষ্ঠান

॥ খ ॥ প্রশাসনিক কাঠামো ও ধর্মীয় জীবনে গঠন-প্রশিক্ষণ

দ্বিতীয় অধ্যায়: প্যারিশ নিবাসী ও অভিবাসীদের মধ্যে সেবাকাজ

॥ ক ॥ খ্রিস্টান জনগণের জন্য কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক সেবাকাজ

॥ খ ॥ প্যারিশ অংগ-সংগঠন, সেবামূলক সংঘ ও কার্যক্রম

॥ গ ॥ পাদ্রীশিবপুরে ধর্মপ্রদেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রথম অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের অবকাঠামোগত প্রতিষ্ঠানসমূহ

ভূমিকা:

পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে অনেক সংঘ-সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান আছে যা খ্রিস্টভক্তদের সেবাদান করছে। সেবাদানের জন্য আছেন পুরোহিতগণ, সিস্টারগণ এবং অন্যান্য ভক্তজন যার সেবাকর্মী। এই অভ্যন্তরীণ সেবা, সেবাপ্রতিষ্ঠান ও সেবাকর্মীর বিষয় এই অংশে আলোচনা করা হচ্ছে। প্যারিশে আবার অনেক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা আছে যা শুধু খ্রিস্টবিশ্বাসীদেরই সেবা দান করে না। সেগুলো এলাকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য সেবা দিয়ে যাচ্ছে এবং খ্রিস্টান সেবাকর্মীরা নিয়োজিত আছেন। সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির বিষয়ে সপ্তম বিভাগে আলোচন করা হয়েছে।

॥ ক ॥ প্যারিশের জনগণ ও সেবাদানের মৌলিক প্রতিষ্ঠান

পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের মধ্যে আছে খ্রিস্টভক্তজনগণ যারা স্থানীয়ভাবে বর্তমানে ৮টি ওয়ার্ডে ৩০৭টি পরিবারে বসবাস করছেন। এছাড়াও প্যারিশের সূচনা থেকে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনটি উপকেন্দ্র ছিল: মাটিভাঙ্গা (২০২১ খ্রিস্টাব্দে নতুন প্যারিশ রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে) দেশান্তরকাঠি ও রাজাবাড়িয়া যেখানে ১৮৮ পরিবারে, যা পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের ৩৬% খ্রিস্টভক্ত বর্তমানে বসবাস করছেন এবং প্রতিটি কেন্দ্রে রয়েছে মিশন কম্পাউন্ড ও গির্জাসহ কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান।

এই ভাগে আমরা বিশেষ করে প্যারিশের অভ্যন্তরীণ সংঘ, সংগঠন ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রম আছে তার উল্লেখ করছি মাত্র। উপকেন্দ্রের আপন আপন সেবাপ্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে।

(১) গির্জা-ঘর

পাদ্রীশিবপুরে পথ প্রদর্শিকা কুমারী মারীয়ার গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে। পতুর্গীজ নাবিকদের সাথে আগমনকারী পাদ্রীগণ এই গির্জার গোড়াপত্তন করেন ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে। এই গির্জাটি নির্মাণের পরে উপাসনার কাজে ব্যবহৃত হয়। তবে সময়ের পরিক্রমায় গির্জাটি একসময় ব্যবহারের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়। তাই ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে পুরাতন গির্জাটি ভেঙ্গে নতুন করে গির্জার দালান নির্মাণ করা হয়। ১৮২৩ থেকে ২০০৪ খ্রি. সুদীর্ঘ সময় এই গির্জাঘরটিতেই পাদ্রীশিবপুরবাসী উপাসনা করেছে। সময়ের বিবর্তনে এই গির্জাকে দু'তিন বার সংস্কারও করা হয়েছে। কিন্তু ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে দেখা যায় যে গির্জাটি ব্যবহার করা ঝুঁকিপূর্ণ তাই তখনকার চট্টগ্রামের মাননীয় বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি স্থানীয় পালক পুরোহিত, প্যারিশ কাউন্সিল এবং পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, ঢাকা এর দায়িত্বে থাকা নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করেন এবং একটি নতুন গির্জাঘর নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ফাদার এজ্জিও মাসকারেত্তি, পিমে এই গির্জার আর্কিটেক্ট হিসেবে ও নির্মাণ তদারকী কাজে প্রভূত সহায়তা করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে স্থানীয় খ্রিস্টভক্তগণ তাদের সামর্থ্য অনুসারে এই গির্জা নির্মাণে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়। বাকী টাকা মাননীয় বিশপ মহোদয় ব্যবস্থা করেন। আর এই গির্জাটি ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল বাংলা নববর্ষের দিনে উদ্বোধন করেন চট্টগ্রামের মাননীয় বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি এবং ঢাকার মহামান্য আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও ডি.ডি.[১]

(২) কবরস্থান

পাদ্রীশিবপুর পথপ্রদর্শিকা গির্জার পূর্বপার্শ্ব উত্তর দক্ষিণ দিকে লম্বা এবং পূর্ব-পশ্চিম দিকে প্রস্থসম্পন্ন একটি বড় কবরস্থান রয়েছে। এই কবরস্থানেই সমাহিত আছেন প্রায় আড়াই শত বছর ধরে পরলোকগমণকারী আমাদের ধর্মপল্লীর খ্রিষ্টভক্তগণ। আমাদের গির্জাটি তিনবার নির্মিত হয়েছে। আর প্রতিবারেই এর সম্প্রসারণ ঘটেছে চারিদিকেই। ফলে কিছু কিছু কবর প্রতিবারেই গির্জার নিচে চাপা পড়েছে। ঐসকল কবরের উপরে যাদের প্রস্তরফলক ছিল তা বর্তমান গির্জার আগের গির্জার দেয়ালে এবং ফ্লোরে সংরক্ষিত ছিল। বর্তমান কবরস্থানটি কয়েক বছর আগের তুলনায় ছোট ছিল। তাই পূর্বদিকের জায়গা পরিস্কার করে তা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টভক্তদের সংখ্যা অনুপাতে কবর স্থানটি এখনও যথেষ্ট বড় নয়। এর আরও সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

(৩) ফাদার বাড়ি

পাদ্রীশিবপুরবাসীদের জন্যে ফাদার বাড়ি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাড়ি। বলা যেতে পারে এই বাড়িকে কেন্দ্র করেই সমগ্র খ্রিস্টান পরিবারগুলির আধাত্মিক জীবন পরিচালিত হয়। এই ফাদার বাড়ির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে। এখানে বসেই প্রথম পাদ্রীয়ান তালুক পাদ্রীগণ পরিচালনা করতেন। তাদের বাসস্থান এবং উপাসনারগৃহ এখানেই ছিল। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে এর অবকাঠামো ছিল ছোট। বর্তমানে প্যারিশের অফিসটিই ফাদারদের আদি বসত-বাটি। তৎকালীন সময়ের প্রযুক্তি অনুসারে ঘরের নিচের অংশ ফাকা রাখা হতো যাতে বাতাস চলাচল করতে পারে এবং ঘর স্যাতসেতে না হয়।

---

[১]গির্জার অবস্থান কোন সময় কিরূপ ছিল তার বর্ণনা পাওয়া যাবে দ্বিতীয় ভাগে

পুরোহিতরা ওখানেই বাস করতেন, অফিস ও সাক্ষাৎ করতেন এবং খাওয়া-দাওয়া করতেন। গত শতাব্দীর পঞ্চদশকের দিকেও দেখা যেত সামনের দরজার সামনে দুটো কামান বসানো। প্রশ্ন করেছেন অনেকে কিন্তু উত্তর পাওয়া যায় নি: কেন, কোথেকে এবং কী কারণে এখানে রাখা হয়েছে। বর্তমানের দ্বিতল বিশিষ্ট ফাদার বাড়ি নির্মিত হয় ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে। এই দালানের নিচের তলায় প্যারিশের ছেলে ও মেয়েদের জন্য সাধারণ শিক্ষার এবং ধর্মশিক্ষার ক্লাস চলে আসছিল বহু কাল থেকে। সময়ের সাথে সাথে এর পরিবর্তন ঘটেছে। তবে একথা ঠিক যে ফাদারদের বাসস্থান বিধায় এর নামকরণ হয়েছে ফাদার বাড়ি।

(৪) সিস্টার বাড়ি

পাদ্রীশিবপুরে হলি ক্রস সিস্টারদের আগমন ঘটেছিল ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে তবে তাদের কনভেন্ট নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে। ইতিহাসে প্রথম যে প্যারিশে সিস্টারদের আগমন ঘটে। তাদের দ্বারাই প্রথম ফাতেমা স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়। মিশনের কাজে ফাদারদের সহযোগিতার পাশাপাশি হলি ক্রস সিস্টারগণ স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকতেন। এছাড়াও মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে তারা সহায়তা দান করতেন। হলিক্রস সিস্টারগণ গরিব মেয়েদেরকে নানা হস্তশিল্প শিক্ষা দেন, সেলাই কাজ শিক্ষা দেন, এই উদ্দেশ্যে "বাসন্তিকা সংঘ" প্রতিষ্ঠান করেন। প্রাথমিকভাবে তারা বর্তমান ফাতেমা স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই কাজ করতেন। রাজনৈতিক নিরাপত্তার কারণে, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে হলি ক্রস সিস্টারগণ বরিশালে চলে যান এবং নবগঠিত এলএইচসি সিস্টার সংঘ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে পাদ্রীশিবপুরে আসেন। প্রথমে স্বর্গীয় বার্নার্ড ডি' রোজারিও (স্যার)-এর বাড়িতে এলএইচসি সিস্টারগণ বাস করতেন। এর পরে পাকিস্তান আমলের শেষ দিকেই তারা বর্তমান সিস্টার বাড়িতে আসেন। সেখানে বসবাসের সময় প্রথমতঃ ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে তাদের জন্যে নতুন করে ঘর তৈরি করা হয় এবং ঐ ঘর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে আবার সংস্কার করা হয়। পরবর্তীতে হলি ক্রস সিস্টারদের পুরনো ঘর সংস্কার করে বর্তমানে এল.এইচ.সি সিস্টারগণ একই ঘরে অবস্থান করছেন।

ভারত থেকে লরেটো সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে পাদ্রীশিবপুরে আসেন এবং সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাদের থাকার জন্যে পূর্ব-পরিত্যক্ত বাসন্তিকা ক্লাবের মহিলা সমিতির ঘরটি সংস্কার করে ব্যবহার করতেন। পরবর্তীতে নবনির্মিত ঘরে বাস করতে থাকেন ২০০৮-২০০৯ খ্রিস্টাব্দের দিকে।

(৫) ব্রাদার বাড়ি

পাদ্রীশিবপুরে সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্যই ব্রাদারদের আগমন ঘটে। কানাডা থেকে হলি ক্রস ব্রাদারগণ পাদ্রীশিবপুরে আসেন। তাদের বসবাসের জন্যে বর্তমানে যেখানে হলি রোজারি সেমিনারী আছে সেখানে একটি একতলা একটি ঘরে বসবাস করেন। সেন্ট আলফ্রেডস্ স্কুলের ক্লাস তখন সাবেক এডিসির যেখানে ছিল সেখানেই লম্বা টিন সেড ঘরে নেয়া হতো। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ব্রাদারগণ সবসময়ই ঐ বাড়িতেই অবস্থান করতেন। এই বাড়িতেই সেন্ট যোসেফস্ বোর্ডিং ছিল এবং

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্ররা এখানে বসবাস করে তাদের লেখাপড়া করতো। বিগত শতাব্দীর সত্তর দশকে, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রাদারগণ সংখ্যাল্পতার কারণে স্কুলের দায়িত্ব হস্তান্তর করেন চলে যান। বিভিন্ন এলাকায় স্কুল চালু হলে বোর্ডিং এর বিলুপ্তি ঘটে। এক সময় ব্রাদার কনষ্ট্যান্টের প্রচেষ্টায় এবং স্থানীয় পালক পুরোহিত এবং জনগণের সহায়তায় এখানে এডিসি (কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্র) চালু হয়। এবিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এডিসি বিলুপ্ত হলে এখানে একসময়ে সেন্ট যোসেফ হোম ছিল এবং পরবর্তীতে, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে হলি রোজারি সেমিনারী চালু হয়। হলি রোজারি সেমিনারির বর্তমান দ্বিতল ভবনটি ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে, বিশপ প্যাট্রিকের আমলে নির্মাণ করা হয়।

(৫) সাধু যেসেফের মঠঃ

সাবেক এডিসির প্রবেশ পথের বাম দিকেই একটি পুরাতন মঠ রয়েছে। কথিত আছে যে সিসিল ডি'সিলভাদের মাধ্যমেই এই মঠটি তৈরি হয়। তাদের পরিবারের কোন সদস্যের সমাধিক্ষেত্রকে বিশেষ মর্যাদা দানের জন্যেই এই মঠটি তৈরি হয়। তবে পরবর্তীতে তা ধর্মপল্লীর সম্পত্তি হলে কোন এক সময়ে এখানে সাধু যোসেফের প্রতিমূর্তি এই মঠে স্থাপন করা হয়। শ্রমিক সাধু যোসেফের পর্বদিনে ১৯ মার্চ প্রতিবছর এখানে বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়।

॥ খ ॥ প্রশাসনিক কাঠামো ও ধর্মীয় জীবনে গঠন-প্রশিক্ষণ

পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লী একটি গঠনতন্ত্র অনুসরণ করেই খ্রিষ্টভক্তদের সেবাকার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। আমাদের ধর্মপল্লীকে ৮টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ডেই রয়েছে একজন করে ওয়ার্ড চেয়ারম্যান যারা সরাসরি ঐ ওয়ার্ডের খ্রিষ্টভক্তদের দ্বারা নির্বাচিত। এই ওয়ার্ড কমিটির সদস্যদের প্রতিনিধি, পালক পুরোহিত, সিস্টারদের প্রতিনিধি, উপাসনা কমিটি ও বিভিন্ন উপকমিটির প্রতিনিধি, সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি কাজ করে যার নাম ''পালকীয় পরিষদ''। এই পালকীয় পরিষদের পরামর্শ অনুসারেই ধর্মপল্লীর সমস্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ধর্মপল্লীর কাযক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্যে রয়েছে কয়েকটি অঙ্গ-সংগঠন। এর মধ্যে রয়েছে মা মারীয়ার সেনা সংঘ, শিশুমঙ্গল সংঘ, সেন্ট ভিনসেন্ট দ্য পল সোসাইটি (ডাইয়োসিসে শুরু হয় ১৯৬১ খ্রি.), ওয়াই. সি. এম. ওয়াই.সি.এস দল, বিসিএসএম, সেবক-সেবিকা, যুব সংঘ, বেদীর সেবক-সেবিকা, ওয়ার্ড - ৮ (বি.সি.সি দল ১৯৮৩) ইত্যাদি। অবকাঠমোতে আমাদের ধর্মপল্লীর রয়েছে ২টি উপকেন্দ্র একটি দেশান্তরকাঠি (টেংরাখালি) এবং অপরটি রাজাবাড়িয়া (কালাদা)। এই উপকেন্দ্রে কাটিখিষ্টগণ খ্রিষ্টভক্তদের আধ্যাত্মিক যত্ন নেন এবং পাদ্রীশিবপুর থেকে যাজকগণ গিয়ে পবিত্র খ্রিষ্টযাগ উৎসর্গ করে থাকেন। এছাড়াও আরও একটি উপকেন্দ্র শত শত বছর ধরে আমাদের সাথে ছিল। সেটা হলো মাটিভাঙ্গা উপকেন্দ্র। সম্প্রতি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে এই উপকেন্দ্রটি একটি পৃথক ধর্মপল্লীতে উন্নীত হয়েছে। এছাড়াও বৃহত্তর বরিশালের দক্ষিণাঞ্চলে ও সোনাতলায় আমাদের যাজকগণ বিশ্বাস বিস্তারে কাজ করে যাচ্ছেন, তবে এখন মাটিভাঙ্গা ধর্মপল্লীর আওতাভুক্ত।

(১) ধর্মীয় উপাসনা ও প্রার্থনা

পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান জনপদ গড়ে ওঠার প্রথম থেকেই মিশনের যাজকগণ খ্রিস্টভক্তগণের ধর্মীয় উপাসনার জন্যে সচেতন ছিলেন এবং বর্তমানেও আছেন। নিয়মিত খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণে আমাদের জনগণ খ্রিস্টের সাথে একাত্ম হয়ে পথ চলেন। সেই সাথে ধর্মীয় উপাসনায় আমাদের সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের অংশগ্রহণও রয়েছে। তারা নিয়মিত শাস্ত্রপাঠ, ধর্মীয় সঙ্গীত পরিবেশন, দান সংগ্রহ, বেদীতে সেবাদান, বিভিন্ন পার্বণ এবং উৎসবে সাঁজসজ্জার বিষয়ে সকলেই যার যার ক্ষেত্র থেকে সহযোগিতা করে থাকেন। এই উপাসনার ক্ষেত্রে শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত নিয়মিত সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। উপাসনার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে রয়েছে একটি উপাসনা কমিটি যারা নিয়মিত আলোচনা সভা করেন এবং প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেন। বিশেষভাবে প্রথম খ্রিষ্টপ্রসাদ, হস্তার্পণ ও বিবাহ সংস্কার গ্রহণের জন্যে উপাসনা কমিটি বিশেষ দায়িত্ব পালন করে এবং তা সুন্দর ও সার্থকভাবেই করে থাকেন। উপাসনার কাজে মা মারীয়ার সেনা সংঘ, যীশুর সেবক-সেবিকা ও ওয়াইসিএস সংগঠনগুলোও সহযোগিতা করে থাকে।

আমাদের ধর্মপল্লীর মানুষ প্রার্থনাশীল। এখানে একটি কথা স্মরণ করতে হয় যে, আগেকার দিনে অর্থাৎ আধুনিক প্রযুক্তির যখন অবাধ প্রচলন ছিল না তখন আমাদের ধর্মপল্লীতে পারিবারিক প্রার্থনার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথেই সবাই বিবেচনা করতো এবং নিয়মিত প্রার্থনা করতো। বর্তমানেও সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা বেশীরভাগ বাড়িতেই হয়ে থাকে। কেহ কেহ বা ব্যক্তিগত প্রার্থনাও করেন। তবে তাদের সংখ্যা খুব একটা বেশী নয়। পাদ্রীশিবপুর পথপ্রদর্শিকা গির্জা সংলগ্ন গ্রটোতেও খ্রিষ্টভক্তগণ প্রার্থনা করে থাকেন। বিশেষ করে মৃত আত্মীয় স্বজনদের জন্যে কবরস্থানে প্রায় প্রতিটি পরিবারের সদস্যগণই যখনই সময় সুযোগ পান তখন প্রার্থনা করেন। এছাড়াও মা মারীয়ার ও সাধু আন্তনীর প্রতি বিশেষ ভক্তি প্রদর্শনের জন্যে আমাদের গ্রামের বিভিন্ন পরিবারে প্রার্থনা করা হয়ে থাকে। আরও স্মরণ করা যেতে পারে যে, যাতনাভোগকালে প্রতিদিন সন্ধ্যায় গ্রামের লোকেরা একত্রে প্রতিদিন বিভিন্ন পরিবারে জপমালা প্রার্থনা করে থাকে। এই ধারাটি পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টান সদস্যগণ যে সমস্ত শহরে বেশী সংখ্যায় বসবাস করেন সেখানেও হয়ে থাকে।

(২) ধর্মশিক্ষা

পাদ্রীশিবপুরে একটি বড় সুবিধা ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন। সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুল, বা যদি তার আগে থেকে বলতে চাই সেন্ট আন্তনী মাইনর স্কুল, সেন্ট যোসেফস্ গার্লস স্কুল এর সবগুলিতেই সবসময় ধর্মশিক্ষা ক্লাস নিয়মিত হয়ে আসছে। ফলে আমাদের খ্রিস্টান ছেলেমেয়েরা শিশুকাল থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় শিক্ষায় সুগঠিত হবার সুযোগ লাভ করেছে। এই ধর্মীয় শিক্ষাদানে, পালক, সন্ন্যাসব্রতী ও খ্রিস্টান শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছেন। এছাড়াও সিস্টারগণ আলাদাভাবে শিশুদের ধর্ম শিক্ষা দান করে থাকেন। বিশেষ করে প্রথম খ্রিষ্টপ্রসাদ প্রার্থী, হস্তার্পন প্রার্থী এবং বিবাহ প্রার্থীদের জন্যেও ভিন্ন ভিন্ন ধর্মশিক্ষার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এবিষয়ে উপাসনা কমিটি বিশেষ দায়িত্ব পালন করেন। হলিক্রস সিস্টারগণ যখন পাদ্রীশিবপুরে ছিলেন তখন তাদের নির্ধারিত দায়িত্বের পাশাপাশি বিকেল বেলা সাইকেল চালিয়ে গ্রাম পরিদর্শন করতেন। তাদের সাইকেলে ছোট মেয়েদেরও নিয়ে যেতেন। সিস্টার লিলিয়ানও মাঝে মাঝে যেতেন।[২]

[২]সিস্টার আরতি, এলএইচসি

প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রামের মেয়েদের স্কুলমূখী করার উদ্দেশ্যে হলিক্রস সিস্টারগণ সিস্টার লিলিয়ানের দিদিমাকে নিয়োগ করেন। তাকে বলা হতো "মেস্তারা" – পর্তুগীজ ভাষায় বলা হত ধর্মশিক্ষক/কাটেখিস্ট। তিনি বাড়ী বাড়ী গিয়ে অভিভাবকদের কাছ থেকে মেয়েদের স্কুলে নিয়ে আসতেন এবং স্কুল শেষে পুনরায় অভিভাবকদের কাছে মেয়েদের ফিরিয়ে দিতেন।[৩]

(৩) গঠন-প্রশিক্ষণ

আমাদের ধর্মপল্লীতে বিভিন্ন সময়ে সভা সেমিনার হয়ে থাকে। একজন আদর্শ খ্রিস্টান হবার জন্যে প্রতিটি খ্রিস্টভক্তকে গড়ে তোলার জন্যে গঠন-প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই গঠন-প্রশিক্ষণ দুভাবে হয়ে থাকে। প্রথমতঃ পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর উদ্যোগে এবং দ্বিতীয়ত কোন সংঘ সংগঠনের উদ্যোগে। প্যারিশে খ্রিস্টভক্তদের জন্যে আধ্যাত্মিক পরিপুষ্টি এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের উপরে গঠন-প্রশিক্ষণ প্রতিবছরই হয়ে থাকে। এছাড়া যুবকদের গঠনের জন্যে বিভিন্ন সময়ে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপরে গঠন-প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে পাদ্রীশিবপুর যুব সংঘ, ঢাকা প্রতি বছরই কমপক্ষে একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। এছাড়াও অতীতে দেখা গেছে "পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, ঢাকা"-এর উদ্যোগেও গঠন-প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। অতীতেও আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে এই গঠন-প্রশিক্ষণে। নার্সদের জন্য ট্রেনিং স্কুল (১৯৪৯) ছিল আমাদের ধর্মপল্লীতে। এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ লাভ করে আমাদের অনেক নারী স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অবদান রাখার সুযোগ পেয়েছে। বিশেষ করে ধাত্রী প্রশিক্ষণ লাভ করাতে বেশ কয়েকজন ধাত্রী পাদ্রীশিবপুরে অনেক বছর সেবা দিয়েছেন। এছাড়াও কিছু নারী নার্স ট্রেনিং দিয়ে আমাদের ফাতিমা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেবা দান করেছেন। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে পাদ্রীশিবপুরে হলি রোজারি মাইনর সেমিনারী করা হয়। এই সেমিনারীতে হাই স্কুল জীবন থেকেই যাজক হবার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

(৪) সেবক-সেবিকা: যাজক, সন্ন্যাসব্রতী, খ্রিস্টবিশ্বাসী ভক্তজনগণ

পাদ্রীশিবপুর ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদে আশীর্বাদিত। মিশনারিদের সংস্পর্শে আসাতে শিশুকাল থেকেই আমাদের ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় গঠন সুন্দররূপে হয়েছিল। প্রাইমারি স্কুলে অধ্যয়ন করার সময় ছেলে-মেয়েদের একটি শিশু সংগঠন ছিল। যার নাম যীশুর সেবক-সেবিকা। তাদের প্রশিক্ষণ দিতেন সিস্টারগণ এবং প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষিকাগণ। তাদের নিয়মিত প্রার্থনা, রবিবারে গির্জায় যোগদান, এছাড়া সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট দিনে তাদের একটি খ্রিষ্টযাগে বাইবেল পাঠ, গান, প্রার্থনার উদ্দেশ্য ইত্যাদি পরিচালনা করতে হতো। আর বিভিন্ন খ্রিষ্টযাগে তারা বেদী সেবকের দায়িত্ব পালন করতো। এমনকি রোগীদের বাড়ি পরিদর্শন, তাদের বাড়িতে প্রার্থনা করা এমনকি সম্ভাব্য ক্ষেত্রে রোগীর সেবাও করা হতো।

আমাদের শিশুকাল থেকে এই ধর্মীয় অনুশীলন পরবর্তী জীবনে বিশেষ করে ব্রতীয় জীবনে আহ্বানের পথে অনেক অনুপ্রাণিত করেছে। তাইতো দেখি ফাদার লিও গোমেজ থেকে শুরু করে অনেকেই যাজকীয় জীবনে প্রবেশ করেছে এবং মেয়েদের কেহ কেহ সিস্টার হিসেবে ব্রত গ্রহণ করে এখনও মণ্ডলীর সেবা করে যাচ্ছেন। এই দিকে আমরা ভাগ্যবান এজন্য যে আমাদের গ্রাম থেকেই সমগ্র বাংলাভাষা ভাষীদের প্রথম ও একমাত্র কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোরিওকে ঈশ্বর আমাদের দান করেছেন।

---

[৩]সিস্টার আরতি, এলএইচসি

আমাদের গ্রামটি খ্রিস্টান অধ্যুষিত। ফলে এখানে আমাদের জীবন খ্রিস্টান মিশনারিদের কল্যাণেই খ্রিস্টের আদর্শে গড়ে উঠেছে। আমাদের বিশ্বাসের মূল ভিত্তি খ্রিস্ট। তবে আমাদের ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ মা মারীয়া ও সাধু আন্তনীর প্রতি বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করে থাকে। যদি এখন থেকে ৫০/৬০ বছর আগেকার দিনে ফিরে তাকাই আমরা দেখতে পাই তখন প্রতিদিনের খ্রিষ্টযাগে অনেকেই যোগদান করতেন নিয়মিত। তাঁদের মধ্যে এই মুহূর্তে মনে পড়ছে দক্ষিন গ্রামের লাভলী ডি'কস্তা, কাথারিনা ডি'কস্তা, মেলকাম ডি'কস্তা, জিতা গোমেজ, লালজন গোমেজ, যোসেফ গোমেজ, ডা. ফ্রান্সিস গোমেজ, বেনেডিক্ট গোমেজ, মেটিল্ডা গোমেজ, আইরিচ গোমেজ, চার্লস গোমেজ (গুরুমহাশয়), রামুয়েল গোমেজ এবং পশ্চিমের লিও গোমেজ, ক্লেমেন্ট গোমেজ, মাইকেল ডি'রোজারিও (নিঙ্গাল সাধু), উর্চ্ছি গোমেজ (সি. অনুর মা) বির্জিয়ানা ডি'কস্তা (ভেনাসসিও স্যারের মা) মার্গারেট গোমেজ (ফাদার কানুর মা) গ্রেসি গোমজ, আইরিণ গোমেজ, মালগারিনা গোমেজ-সহ আরও কিছু বয়োঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি নিয়মিত প্রতিদিনের খ্রিস্টযাগে যোগদান করতেন। এসময়ে পারিবারিক প্রার্থনার উপরে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হতো। তাই প্রতিদিন সকাল, দুপুর, সন্ধ্যাবেলা দূত সংবাদ প্রর্থনা ছিল আবশ্য করণীয়। উল্লেখ করা যেতে পারে এই সময়গুলিতে গীর্জা থেকে নিয়মিত ঘন্টা বাজানো হতো। ফলে ঘন্টা ধ্বনি শুনে যে যেখানেই থাকতো সেখানেই এই প্রার্থনা তাৎক্ষণিকভাবে করতো। এছাড়া বাড়িতে বাড়িতে নিয়মিত জপমালা প্রার্থনা করা হতো। ফলে একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে আমাদের জনগণের জীবন ছিল প্রাচীনকাল থেকেই সুগঠিত। সময়ের পরিক্রমায় বর্তমানে প্রাত্যহিক খ্রিস্টযাগে যোগদানের লোকের সংখ্যা দিন দিন কমে আসছে। তবে আমাদের ধর্মপল্লীর খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জীবনযাত্রা বর্তমানেও তুলনামূলকভাবে অনেক ভালো।

দ্বিতীয় অধ্যায়: প্যারিশ নিবাসী ও অভিবাসীদের মধ্যে সেবাকাজ

॥ ক ॥ খ্রিস্টান জনগণের জন্য কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক সেবাকাজ

প্রাচীন খ্রিস্টান জনপদ হবার সুবাদে আড়াই শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে খ্রিস্টানদের সেবার দিকটি মিশন বা পালক পুরোহিত কেন্দ্রিক ছিল। বর্তমানেও পালক-পুরোহিত খ্রিস্টভক্তদের ক্ষেত্র বিশেষে সেবা দিয়ে থাকেন। তবে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে এই ধর্মপল্লীতে বিভিন্ন সংগঠন সেবা দিয়ে আসছেন। এর মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে এডিসির কথা। পাকিস্তান আমল থেকে শুরু করে বাংলাদেশের জন্মের পরেও বেশ কয়েক বছর এই এডিসি খ্রিস্টানদের সেবা দিয়েছে উল্লেখযোগ্য হারেই। বিশেষ করে আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি, ইরি ধানের চাষ, শাক-সব্জির বাগান করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এডিসির অবদান ছিল প্রশংসনীয়। কেবল তাই নয় এটি একটি উন্নত মানের কৃষি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করেছে। এখানে চাকুরী করেছে অনেক গ্রামবাসী। ফলে তাদের বেকারত্ব বিমোচন হয়েছে। তারা প্রশিক্ষণ পেয়েছে কিভাবে ট্রাক্টর চালাতে হয়, জমিতে সারের ব্যবহার, কীটনাশক ব্যবহার এবং সেচ ইত্যাদি যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছে এডিসি। যার ফলে বর্তমানেও কৃষকগণ ঐ একই পদ্ধতি ব্যবহার করছে। যদিও এডিসি এখন আর নেই। তবে দক্ষিণবঙ্গে এই এডিসি এক সময় একটি উন্নত কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্র হিসেবেই স্বীকৃত ছিল।

আমাদের ধর্মপল্লীতে সংঘ-সংগঠনের উপস্থিতি সবসময়ই লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে যুব সংঘ ছিল পাদ্রীশিবপুরের জন্য একটি বড় সংগঠন। ধর্মপল্লীর সাথে একাত্ম হয়ে এই সংঘ কাজ করতো। সেবার কাজে তাদের অবদান ছিল প্রচুর। গ্রামের রাস্তাঘাটের পাশে আগাছা পরিস্কার করা, কোন দরিদ্র লোকের জন্য বিনা মজুরীতে পুকুর খনন করে দেয়া, গরীবের ঘর মেরামত করে দেয়া ইত্যাদি কাজ তারা স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমেই করতো। কেবল তাই নয় উপাসনায় গান পরিচালনা করা, বড় বড় অনুষ্ঠানে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং বড়দিন, ইস্টার ও ধর্মপল্লীর পার্বনে নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করাসহ নানা কাজে যুবকদের সবসময় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে দেখা যেতো। তবে বর্তমানে ধর্মপল্লীতে এই যুব সংগঠনের আর কোন কার্যক্রম দেখা যায়না। কিন্তু পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান যুব সংঘ, ঢাকা এখনও প্রশংসনীয় কাজ করে যাচ্ছে।

পাদ্রীশিবপুরে অনেক আগ থেকেই ঋণদান সমবায় সমিতি ছিল। বিশেষ করে স্কুল ভিত্তিক সমবায় সমিতি বা সঞ্চয় সমিতি ছাত্রদের ছোটবেলা থেকেই সঞ্চয়ী হতে স্কুল বিশেষভাবে সহায়তা দান করেছে এবং সেই সমিতির মাধ্যমে কো-অপারেটিভ সপ চালু হয়েছিল এবং অনেক বছর তা সচল ছিল।

পরবর্তীতে নারীদের হাতের কাজ এবং পাশাপাশি সঞ্চয় সমিতি গঠন হয়েছিল পাকিস্তান আমলেই। এর সাথে সংযুক্ত ছিল ধর্মপল্লীর কর্তৃপক্ষ। ফলে এই সঞ্চয় সমিতিগুলো গ্রামের মহিলাদের স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করেছে প্রচুর পরিমাণে। তাদের মধ্যে কেহ কেহ সেলাই মেশিন কিনে সেলাইয়ের কাজ করেছে এবং এজন্যে সমিতি তাদের সহায়তা দান করেছে। সেই সাথে পাটের কাজ যারা করতেন তাদের পাটের তৈরি বিভিন্ন হস্তশিল্প বিপননে সমিতি সহযোগিতা করতো। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, একসময়ে নারী পুরুষ উভয়েই এই সমিতির সদস্য হবার সুযোগ পেয়েছে। তবে এক পর্যায়ে তার বিলুপ্তি ঘটে।

বাংলাদেশ হবার পরবর্তীতে কারিতাসের মাধ্যমে মাইক্রোক্রেডিট চালু হয়। এই প্রকল্প ঋণদান সমবায় সমিতির মতোই কাজ করে। বিশেষ করে কারিতাসের ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প আমাদের এলাকায় অনেকেরই গৃহ নির্মাণ, গাভি বা হালের বলদ ক্রয়সহ নানা কাজে এই ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হতো। বর্তমানে এই প্রকল্পটি মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রামের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রকল্পে কেবল খ্রিস্টান নয় হিন্দু মুসলমানগণও সংযুক্ত।

পাদ্রীশিবপুর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ বর্তমানে সচল আছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমবায় মন্ত্রনালয়ের নিবন্ধন প্রাপ্ত এই সমিতিতে পাদ্রীশিবপুরের ১৮ বছরের উর্ধ্বে যেকেহ সদস্য হতে পারে। সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত বিধিবিধান দ্বারা পরিচালিত হয়। সমিতিতে রয়েছে সমবায় অধিদপ্তর অনুমোদিত উপ-আইন। এই উপ-আইনের আলোকেই সমিতির কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং এর পাশাপাশি সমবায় আইনও প্রতিপালন করতে হয়। এই সমিতিতে পাঁচ শতাধিক সদস্য-সদস্যা রয়েছেন যার সিংহভাগই খ্রিস্টান। অল্প কিছু হিন্দু মুসলমান সদস্যও রয়েছেন। সমিতিটি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে।

পাদ্রীশিবপুর ক্রেডিট ইউনিয়ন এই সমিতিটি তুলনামূলকভাবে পুরাতন। এই সমিতিও সমবায় অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধনকৃত। এই সমিতিতে প্রায় এক হাজার সদস্য সদস্যা রয়েছেন। সমিতিতে রয়েছে সমবায় অধিদপ্তর অনুমোদিত উপ-আইন। এই উপ-আইনের আলোকেই সমিতির কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং এর পাশাপাশি সমবায় আইনও প্রতিপালন করতে হয়। সমিতির কার্যক্রম নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। এই সমিতি সদস্য-সদস্যাদের গৃহনির্মাণ, ব্যবসা, জমিক্রয় এবং শিক্ষার জন্যে ঋণ প্রদান করে থাকে।

বর্তমানে কেবলমাত্র কাথলিক খ্রিস্টানদের জন্যে একটি সমবায় সমিতি পাদ্রীশিবপুরে চালু আছে। এই সমিতির নাম পাদ্রীশিবপুর কাথলিক খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনিয়ন। এই সমিতিটি এখনও সমবায় অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধিত নয়। নিজস্ব উপ-আইনের আলোকে বর্তমান কার্যক্রম চালু আছে। যেহেতু ধর্মপল্লী এর সাথে সংযুক্ত আছে সেহেতু সদস্য-সদস্যাগণ এখানে সঞ্চয় করতে কোন দ্বিধা করেন না। বর্তমানে এই সমিতিতে তিন শতাধিক সদস্য-সদস্যা রয়েছেন।

॥ খ ॥ প্যারিশ অংগ-সংগঠন, সেবামূলক সংঘ ও কার্যক্রম

সেবাকর্মী গঠন সংক্রান্ত: নার্সদের জন্য ট্রেনিং স্কুল (১৯৪৯), বর্তমানে বিলুপ্ত; সম্পৃক্ত যারা ছিলেন: মালতি, আগ্নেশ হালদার; ধর্মীয় সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান কনফ্রেটারনিটি অব দ্য চার্চ অব আওয়ার লেডি অব গাইডেন্স – মাইলাপুরের বিশপ দ্বারা স্বীকৃত: মারীয়ার সেনা সংঘ: সেন্ট ভিনসেন্ট দ্য পল সোসাইটি (ডাইয়োসিসে শুরু ১৯৬১); শিশুমঙ্গল সংঘ ; সেবক-সেবিকা, যুব সংঘ, বেদীর সেবক, ওয়ার্ড - ৮ (বি.সি.সি দল ১৯৮৩)।

লিজন অব মেরী: অথবা মারীয়ার সেনাসংঘ মহিলা ও পুরুষ সদস্য-সদস্যা নিয়ে লিজন অব মেরী গঠন করা হয়। প্রার্থনার পাশা-পাশি রোগীর সাক্ষাৎ, অবৈধ সন্তান রক্ষা করা, ভ্রুণ হত্যা প্রতিরোধ, পরিবারে শান্তি ফিরিয়ে আনা ইত্যাদি কাজ করতেন। একবার যখন ফাদারকে (ফা: সেন্ট পিয়ার) অপমান করার জন্য গির্জাঘর বন্ধ করা হয়, তখন লিজন অব মেরী সদস্য-সদস্যাগণ সিস্টারবাড়ী সহ গ্রামের বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রার্থনা করেছিল।

সেবা প্রতিষ্ঠান: ফাদার ফিলিপ ডি'রোজারিও কর্তৃক প্রতিবন্ধীদের কেন্দ্র ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়; জনকল্যাণ সমিতি বিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন আকার ধারণ করেছে। গোলপাতার দ্বারা নির্মত গোল ঘর যেটা খ্রিস্টান ওয়াই.সি.ম, খ্রিস্টান স্কাউট ও কাব দের জন্য ব্যবহৃত হতো কিন্তু এখন বিলুপ্ত। চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের মধ্যে পাদ্রীশিবপুরেই মহিলা সমবায় সমিতির প্রথম বীজ বপন করা হয় (১৯৫৬); পাদ্রীশিবপুর ক্রেডিট সমবায় সমিতি ১৯৮৩ খ্রি.; পাদ্রীশিবপুর কাথলিক ক্রেডিট ইউনিয়ন ২০১৮: টিচার্চ কোয়ার্টার: এখানে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টান ৫ টি পরিবার ছিল। চিত্ত স্যার, রফিক স্যার, অনিল স্যার, সুশীল সরকার ও সিলভেষ্টার স্যারের পরিবার। নির্মাণ করা হয়েছিল ব্রাদারদের বাড়ির পশ্চিম দিকে আড়াইবাকী রাস্তার ওপারে। সরকারি ডাক্তারখানার পশ্চিম দিকে, দক্ষিণের খাল ঘেসে ৪ টি পরিবারের জন্য টিচার্চ কোয়াটার ছিল, সেখানে শতীষ স্যার, নগেন স্যার, চিত্তরঞ্জন হাওলাদার প্রমুখ শিক্ষকগণ ওখানে বাস করতেন।

গুরু ট্রেনিং: ১৯৫০ খ্রি: গুরু ট্রেনিং (Ecole des Cardes) নামে ক্যাথলিক শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য ট্রেনিং স্কুলে মাদার আলফোন্সকে নিয়োগ দেয়া হয়। অন্যান্য ধর্মপল্লীর কাটেখ্রিস্ট মাষ্টারদের এখানে ট্রেনিং দেওয়া হতো।

দরিদ্রদের জন্য সেবা-ব্যবস্থা: পাদ্রীশিবপুরে দরিদ্রদের জন্যে প্রথমত: ধর্মপল্লীর পুরোহিতগণ প্রথম থেকেই সাহায্য সহযোগিতা করে আসছে। সেই সাথে প্যারিশ কাউন্সিল বা সাবেক জনকল্যাণও দরিদ্রদের যথাসাধ্য সহযোতিা করছে। তবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যারা দরিদ্রদের জন্যে বিশেষভাবে কাজ করছেন তারা হলো সেন্ট ভিনসেন্ট দ্য পল সোসাইটি। তারা প্রতিবছরই অন্ততঃ ইস্টার এবং বড়দিনে দরিদ্রদের বিশেষ সাহায্য দান করে থাকেন। পাশাপাশি পাদ্রীশিবপুর ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, ঢাকা, পাদ্রীশিবপুর সমাজ সংঘ, চট্টগ্রাম এবং পাদ্রীশিবপুর যুব সংঘ, ঢাকা দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার জন্যে বিশেষ শিক্ষা সহায়তা দিয়ে থাকে।

ওয়াই. সি. এম: "সেবাই ভালোবাসা ছিল সি.ওয়াই.এম-র মূলমন্ত্র: আমাদের দেশের যুবকদের ভিতর এক নবযুগ আনায়নকল্পে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে রেভারেণ্ড ব্রাদার মভেন ব্যাপ্টিস্ট কর্তৃক ওয়াই.সি.এম. প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়।

এই প্রতিষ্ঠানটির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো প্রথমে নিজেকে গঠন করা এবং দ্বিতীয়তঃ স্বীয় সৎকর্ম দ্বারা অপরকে অনুপ্রাণিত করা। যেকোন যুবকই এই প্রতিষ্ঠানে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী যোগদান করিতে পারে। কাহাকেও জোর জুলুম করে এই প্রতিষ্ঠানভূক্ত করা হয় না। অধিকন্তু এই প্রতিষ্ঠানের একজন সভ্যকে তাহার গুরুজন নির্বাচিত নেতা, পরিচালক ব্রাদার এবং পালক পুরোহিতের বাধ্য থাকা, ক্লাবের আইনানুসারে অবশ্য কর্তব্য। এবং প্রত্যেক সদস্যকে সকালে ও সন্ধ্যা প্রার্থনা, দিনে তিনবার দূত সংবাদ এবং মাসের প্রথম শনিবার কুমারী মারীয়ার মুর্ত্তি নিয়া শোভাযাত্রা, প্রভৃতি অবশ্য পালনীয়। তাছাড়া প্রত্যেক সদস্যকে প্রত্যেক শনিবার ১ ঘন্টা পরোপকারার্থে উৎসর্গ করা বিধেয়। প্রথম অবস্থায় এই প্রতিষ্ঠানের কার্যাদি চালাইবার বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান বা গৃহ ছিল না। কিন্তু ঈশ্বরের অপার করুণায় অতি শীঘ্রই একখানা ঘর মিলে যায়।

রেভারেণ্ড ব্রাদার এম. ব্যাপ্টিস্ট, সিএসসি চলে যাওয়ার পর রেভারেণ্ড ব্রাদার লরেন্স ডায়েস, সিএসসি এই প্রতিষ্ঠানটির ভারপ্রাপ্ত হন। তিনি মাত্র ৩/৪ মাস এই কাজের জন্যে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁহার পরে রেভারেণ্ড ব্রাদার হিরলাল মন্ডল, সিএসসি এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় এই আন্দোলনটি ক্রমান্বয়ে উন্নতির পথে এগিয়ে চলছে। এই বৎসর তিনি ''ছাত্র জীবন ও তার কর্তব্য'' নিয়ে যুবকদের ভিতর কাজ করিতেছেন। আশা করি তাঁহার এই মহৎ উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে ছাত্রদের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। কারণ ছাত্র জীবনই হচ্ছে ছাত্রদের প্রধান বস্তু।

এই আন্দোলনের কোন সদস্য যদি নিয়মিতভাবে সভায় যোগদান না করে বা পরিচালক, ব্রাদার, ফাদার এবং নেতাদের কথা অমান্য করে তা'হলে তাহার নাম আন্দোলন হতে কাটা হয়।

আমি আমাদের পাকিস্তানি কাথলিক যুবকদের জন্য প্রার্থনা করিতেছি যেন তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে ঠিকভাবে বুঝতে পারে এবং নবযুগে সাড়া দিতে তারা যেন অবহেলা না করে।"[৪]

ফাদার লিও ওয়ালফেয়ার ট্রাস্ট: মার্টিন সি. গোমেজের লেখা অনুসারে নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত তথ্য তুলে ধরা হচ্ছে: পাদ্রশীবপুরের স্বনামধন্য প্রথম পুরোহিত ফাদার লিও গোমেজ, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে ৪ঠা আগষ্ট তারিখে, "ফাদার লিও ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট" নামে একটি ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। ট্রাস্টের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৭ জন। উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে: "দরিদ্র ছাত্রদের উচ্চবিদ্যালয় শিক্ষা সমাপন করতে সাহায্য করা। বার্ষিক আয়ের ৭% টাকা জরুরী চিকিৎসার জন্য ব্যয় করা। দুর্যোগ, বন্যা, জালোচ্ছাস, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য ট্রাষ্টের বোর্ড কর্তৃক সিদ্ধান্ত ক্রমে সাহায্য করা।"

১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে তখন ট্রাষ্টের কার্যক্রম শুরু হয়, তখন নগদ ক্যাশ ছিল ৩৭৪ টাকা এবং ব্যাংকে জমা ছিল ৩০,১৯৬ টাকা। সিডিউল বর্ণিত জমির পরিমাণ ছিল ২১.০৪ শতাংশ। সেখান থেকে প্রতিষ্ঠাতা নিজেই প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ (৭ একর) ভাল বড় দাগের জমি ছেড়ে দিয়েছেন। তখন পর্যন্ত ৬.১৬ শ: ছাব-কবলা জমি ছেড়ে দিয়ে টাকা ব্যাংকে রাখা হয়েছে, যার পরিমাণ ৫০০,০০০ টাকা।

তখন প্রস্তাবাকারে বলা হয়েছিল সুদক্ষ ও আগ্রহী ব্যক্তিদের ট্রাস্টের সদস্য করে যেন ভালভাবে ট্রাস্টটি পরিচালনা করা হয় হয়। ২০০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ট্রাস্ট কী অবস্থায় আছে তা আমাদের কাছে জানা নেই।[৫]

কার্ডিনাল পরম্পরা সংরক্ষণাগার: ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে যাত্রা শুরু করে কার্ডিনাল পরম্পরা সংরক্ষণাগার। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি শ্রদ্ধেয় বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার (বর্তমান চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ) আনুষ্ঠানিকভাবে এই কার্ডিনাল পরম্পরা সংরক্ষণাগার আর্শীবাদ করেন। তবে সেই স্থানটি ছিল সাময়িকভাবে পশ্চিম গ্রামে সাধুর বাড়িতে নেপোলিয়ান ডি'রোজারিও এর বাসভবনের পূর্বদিকের বারান্দায়। পরবর্তীতে কার্ডিনাল পরম্পরা কমিটি গঠন করা হয় এবং সেই কমিটি একটি স্থায়ী সংরক্ষণাগার নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কার্ডিনাল পরম্পরা সংরক্ষণাগারের নামে একখন্ড জমি রেজিস্ট্রেশন করার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়। এই জমি ক্রয়ের প্রক্রিয়ার পাশাপাশি সংরক্ষণাগার নির্মাণের কার্যক্রমও চালু থাকে। এই সংরক্ষণাগারের খরচ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি মহোদায়ের ভাইবোনদের পরিবার এবং কয়েকজন সুহৃদ দাতার টাকায় নির্বাহ করা হয়। যাদের নামের তালিকা সংরক্ষণাগারে প্রতিস্থাপিত রয়েছে। এই সংরক্ষণাগার কার্ডিনাল পরম্পরা কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হয়। এর জন্য রয়েছে একটি উপ-আইন এবং বিধি বিধান। সেই আলোকে এবং নির্ধারিত কিছু নীতিমালা অনুসরণ করেই এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি নবনির্মিত এই সংরক্ষাণাগারটি আর্শীবাদ ও উদ্বোধন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ, চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদারসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশের বিশপগণ, অনেক যাজক, সিস্টার, বিভিন্ন এলকার

[৪] নিকোলাস শিকদার (শিক্ষার্থী ১০ম শ্রেণী-১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ), সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুলের রজত জয়ন্তী- ১৯৫৮

[৫] দ্রষ্টব্য: শ্রীমন্ত-তটে, ২০০০, পৃ: ১৭-১৮

খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় প্রশাসনের নেতৃবৃন্দ, পরম্পরা পরিবারের সদস্য-সদস্যাগণ এবং গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন। কার্ডিনাল মহোদয় এবং আর্চবিশপগণ সংরক্ষাণাগারটি আশীর্বাদ ও উদ্বোধন করেন। ইতোমধ্যেই সংরক্ষণাগারের জমি রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। এই সংরক্ষণাগারে মূলত কার্ডিনাল মহোদয়ের ব্যবহৃত দ্রবাদি, প্রাপ্ত উপহার সমূহ এবং পাড়ের বাবুর বাড়ির সদস্য-সদস্যাদের স্মৃতিবিজড়িত জিনিসপত্র সংরক্ষিত আছে এবং ভবিষ্যতেও তার ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষণ করা হবে। এই কার্ডিনাল পরম্পরা সংরক্ষণাগারের তহবিল থেকে সামান্য পরিমাণে দরিদ্রদের সেবা দান করা হয়ে থাকে। এখানে রয়েছে স্থানীয় খ্রিষ্টভক্তদের প্রার্থনা করার সুযোগ। দেশ বিদেশের অনেকেই এই সংরক্ষণাগার পরিদর্শন করেছেন এবং সকলেই এর প্রশংসা করেছেন। কার্ডিনাল পরম্পরা কমিটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করেই এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে।

পাদ্রীশিবপুর খ্রীষ্টান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, ঢাকা: পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর একটি সংগঠন ''পাদ্রীশিবপুর খ্রীষ্টান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, ঢাকা।'' এই সংগঠনটি ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথমভাগে আত্মপ্রকাশ করে। প্রয়াত লুকাস ডি'রোজারিও এর বাসভবনে ৩২ নং পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা এই ঠিকানায় এর কার্যক্রমের সুচনা হয়। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন মি. লুকাস ডি'রোজারিও, প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি ছিলেন মি. মিলিগেন ডি'রোজারিও। তবে এই কার্যকরী কমিটির সদস্যদের বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য ১৯৮০ খ্রিস্টাবে অনুসন্ধান করেও পাওয়া যায়নি। তবে মি. লুকাস ডি'রোজারিও এর সহধর্মিনীর কাছ থেকে জানা যায় যে ঐ সময়ে তাদের স্থায়ী নিবাসে মাঝে মধ্যেই পাদ্রীশিবপুরের লোকজন আসতো। তাদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে চায়ের আড্ডায় বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা হতো। এই আলোচনায় মি. রক ফার্ডিন্যান্ড গোমেজ, প্রফেসর গাব্রিয়েল মানিক গোমেজ, কখনো কখনো মি.বেনেডিক্ট গোমেজ, মি. উইলিয়াম গোমেজ অংশ নিতেন। পাদ্রীশিবপুর থেকে মাঝে মাঝে লোকজন ঢাকাতে আসতো বিভিন্ন কাজে। কেহবা চাকুরীর খোঁজে কেহবা পড়াশুনা করার জন্যে। প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের কিছুটা সহায়তারও প্রয়োজন হতো। কিন্ত পাদ্রীশিবপুরের কোন সাংগঠনিক ভিত্তি না থাকাতে ব্যক্তি পর্যায়ে যার যেমন সামর্থ্য তাদের সহযোগিতা করতেন। এই অবস্থা থেকে কিছুটা উত্তরণ ঘটানোর প্রয়াসেই প্রাথমিকভাবে মি. লুকাস ডি'রোজারিও এর বাসভবনেই পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের জন্ম হয়। উপরে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তারা সবাই প্রাথমিক পর্যায়ে এই এসোসিয়েশনের সাথে সংযুক্ত ছিলেন। কালক্রমে ঢাকাতে পাদ্রীশিবপুরের লোকজনের সমাগম ঘটে। এর মাঝেই দায়িত্বেরও পালাবদল হয় বেশ কয়েকবার। তবে ১৯৭৭ সনে প্রফেসর গাব্রিয়েল মানিক গোমেজের নেতৃত্বে এই সংগঠনের জাগরণ সৃষ্টি হয়। এ সময় ১১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটির সুত্রপাত হয়। এর সাথে সে সময়ে মি. আরনল্ড সি. গোমেজ, মি. সিলভেস্টার ডি'রোজারিও, মি. পল শিকদার, মি. কনস্ট্যান্ট ভানু গোমেজ, মি. পিটার গোমেজ, মি. রক ফার্ডিন্যান্ড গোমেজ, মি. উইলিয়াম গোমেজ, মিসেস ছিন্থিয়া সরকারসহ আরও কয়েকজন ছিলেন। এসময় থেকেই পাদ্রীশিবপুরের গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান কর্মসূচি চালু হয়। এর পাশাপাশি রোগীদের সেবা এবং চিকিৎসার জন্যে সহযোগিতা করার বিষয়টিও এখান থেকেই শুরু হয়। সংগঠনটি প্রথম থেকেই সদস্যদের স্বেচ্ছাদান ও সদস্য চাঁদার উপর নির্ভরশীল। এই তহবিল থেকেই পাদ্রীশিবপুরে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হতো। কেবল তাই নয় প্যারিশের প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে আর্থিক ও পরামর্শ দান করা হতো। এবং এই সময় থেকেই পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ থেকে এই এসোসিয়েশনকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে মি. আরনল্ড সি. গোমেজ এই

এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। তার পরিষদ প্রথমবারের মতো পাদ্রীশিবপুরে একটি বৃক্ষরোপন অভিযান করে এবং দিন ব্যাপী কৃষির উপরে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারে পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টভক্তগণ অংশগ্রহণ করেন।

এই সেমিনারের রিপোর্ট প্রকাশের প্রয়োজন দেখা দিলে একটি ম্যাগাজিন বড়দিনের সময় প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এবং এর নামকরণ করা হয় "শ্রীমন্ত-তটে"। একটি ছবি থেকে এর প্রথম প্রচ্ছদটি নেয়া হয়। পরের বছর ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে এর একটি সুদৃশ্য প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন মি. বাবলু ডি'কস্তা, যা পরবর্তী কয়েক বছর চালু ছিল। এই ম্যাগাজিন এসোসিয়েশনরে একটি তহবিল গঠনে সহায়ক উৎস হয়ে ওঠে। এই ম্যাগাজিনে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকেই অনেক আয় হতে শুরু করে। এর সাথে তো সদস্য চাঁদা ও অনুদান ছিলই। ফলে প্রতি বড়দিনে গরীবদের মধ্যে চাল ও কাপড় বিতরণ শুরু হয়। যা অনেক বছর চালু ছিলো। ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে অত্র এসোসিয়েশনের সুবর্ণ জয়ন্তি পালন করা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুলের সমস্যা সমাধানে, পাদ্রীশিবপুরে বেড়িবাঁধ নির্মাণে বাধা দিয়ে, পথ প্রদর্শিকা কুমারী মারীয়ার গির্জা নির্মাণে, রাজাবাড়িয়া এবং মাটিভাঙ্গা গির্জা নির্মাণে, বিভিন্ন সামাজিক কাজে, সভা সেমিনার আয়োজন করে, রামুর পালা আয়োজনে এই এসোসিয়েশন সর্বদা সহযোগিতা করে আসছে। বর্তমানেও ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি এই এসোসিয়েশন পরিচালনা করছে যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন মি. জেভিয়ার গোমেজ।

॥ গ ॥ পাদ্রীশিবপুরে ধর্মপ্রদেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ[৬]

পাদ্রীশিবপুরে ব্রাদার ও সিস্টারদের অবস্থান ও তাদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান থাকার সুযোগে ধর্মপ্রদেশীয় কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান এখান থেকে শুরু হয়েছে। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে সেন্ট যোসেফ বোর্ডিং প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ধর্মপল্লীর ছেলেরা এসে স্কুলে পড়াশুনা করত। বেশ কয়েকটি ধর্মপল্লীতে হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে বোর্ডিংটির নাম করা হয় হয় **"সেন্ট যোসেফ অ্যাপোস্টলিক বোর্ডিং"**, যা ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বহাল থাকে এবং পরে বন্ধ হয়ে যায়। যারা ভবিষ্যতে ফাদার ব্রাদার ও কাটিখিস্ট ও মণ্ডলীর সেবাকাজে যারা সরাসরি জড়িত থাকবে তাদের জন্য বোর্ডিংটি উন্মুক্ত ছিল। ঐসময়ে বোর্ডিং প্রায় ৬০ জন ছাত্র থাকত। হলি ক্রস ব্রাদারগণ স্কুলের সাথে সাথে বোর্ডিংটিও পরিচালনা করতেন। গত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাট দশকে প্রায় ৬-৮ জন হলি ক্রস ব্রাদার পাদ্রীশিবপুরে কাজ করতেন। ব্রাদারদের থাকার জন্য একতলা একটি ঘর আর তার সংলগ্ন পশ্চিম দিকে সেমি পাক্কা ঘর ছিল হলিক্রস ব্রাদারদের ঘর হিসেবে গণ্য হত। পুরনো ঘরের মধ্যে পশ্চিম দিকে বর্তমানে মাত্র একটি লম্বা ঘর এখনও আছে । এই ঘরটি ছিল সাধু যোসেফ বোর্ডিং এবং ব্রাদারদের চ্যাপেল। সত্তর দশকের মাঝামাঝি, অর্থাৎ ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে হলিক্রস ব্রাদারগণ পাদ্রীশিবপুর থেকে চলে যান। শেষ হলি ক্রস ব্রাদার ছিলেন ব্রাদার মভেন ব্যাপ্টিস্ট, সিএসসি, যিনি স্কুলের সেক্রেটারি হিসেব দায়িত্ব পালন করতেন এবং ফাদারদের সাথে ১৯৭৪ খ্রি. পর্যন্ত পাদ্রীশিপুরে ছিলেন।[৬]

---

[৬] তথ্যসূত্র: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও

এই একই প্রাঙ্গণে পরবর্তীতে **"কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্র"** প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে, যা ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে বিলুপ্ত হয়ে যায়। পুরনো ব্রাদারদের ঘরে "সেন্ট যোসেফ হোম" নামে অনাথদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান শুরু করা হয় যা আবার গৌরনদীতে স্থানান্তরিত হয় ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে। ভবিষ্যত যাজক ও ব্রাদার প্রার্থীদের গৃহ গৌরনদী থেকে পাদ্রীশিবপুরে স্থানান্তরিত হয়।

বর্তমানে একই প্রাঙ্গণে, গৌরনদীতে অবস্থানরত যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী ফাদার ও ব্রাদারদের প্রার্থীদের জন্য স্থাপিত "সেবকালয়"টি স্থাপিত হয়েছিল ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে সেবকালয়টি পাদ্রীশিবপুরে স্থানান্তরিত হয় ধর্মপ্রদেশীয় মাইনর সেমিনারি – **"হলি রোজারি সেমিনারি"** নাম ধারণ করে। প্রথমে পুরনো ব্রাদার বাড়ি, পরে পুরনো চ্যাপেলে প্রার্থীদের রাখা হয়। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান ত্রিতল বিশিষ্ট দালানটি হলি রোজারিও সেমিনারী হিসেবে পরিচিত লাভ করে এবং ব্রাদারদের পুরনো ঘর ভেঙ্গে সামনের দিকে খোলা আঙ্গিণা তৈরী করা হয়। বর্তমানে সেমিনারিটি ধর্মপ্রদেশীয় হলি রোজারি সেমিনারি রূপে অবস্থান করে আসছে।

দীপ্তি হোস্টেল: এটিও মূলত ধর্মপ্রদেশীয় প্রতিষ্ঠান। সময় কখনো থেমে থাকে না। সেই ধারাবাহিকতায় সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলও থেমে থাকেনি। সময়ের পরিক্রমায় পরিকল্পনা করা হয় কেবল পাদ্রীশিবপুরের মেয়েদের শিক্ষার আয়োজন করলেই যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশে বিশেষ করে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশে আরও কয়েকটি ধর্মপল্লী আছে যেখানে মেয়েদের পড়াশুনার যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা নেই। কেবল তাই নয় বাংলাদেশের যেকোন প্রান্তের মেয়েদের জন্য সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলে শিক্ষার সুযোগ করে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু দূর দুরান্ত থেকে মেয়েরা পাদ্রীশিবপুরে এলে তাদের আবাসিক একটি ব্যবস্থা থাকা দরকার। সেই পরিকল্পনায় ১৯৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান সিস্টার বাড়িতে মেয়েদের জন্যে একটি হোস্টেল খোলা হয়। তখন পাদ্রীশিবপুরে ছিলেন রেভারেণ্ড ফাদার জার্মেন, সিএসসি। তিনি এবিষয়ে প্রচুর সহযোগিতা প্রদান করেছেন। হোস্টেলটির নামকরণ করা হয় দীপ্তি হোস্টেল। এলএইচসি সিস্টারগণের উপরে এই হোস্টেল পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন করা হয়। আর দেখা যায় বরিশাল, গৌরনদী, নারিকেলবাড়ি, ঢাকা, নোয়াখালি এবং রাখাইন সম্প্রদায়ের মেয়েরাও এখানে এসে থেকে পড়াশুনার সুযোগ গ্রহণ করে। দীপ্তি হোস্টেলের জন্য ২০১০ খ্রিস্টাব্দে একটি নতুন দালান নির্মাণ করা হয়। বর্তমানেও এই হোস্টেলটি চালু আছে এবং মেয়েরা এখানে অবস্থান করে সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলে পড়াশুনা করছে। আরও একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই দীপ্তি হোস্টেলের মেয়েদের মাধ্যমে সারা দেশে সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলের সুনাম সারা দেশে ছড়িয়ে পরেছে। যেমনটি সেন্ট যোসেফস্ বোর্ডিংএর ছাত্রদের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের প্রথম দিকে এই সুনাম বাংলাদেশের বা তৎকালীন পাকিস্তানের সর্বত্র ছড়িয়ে পরেছিল। দীপ্তি হোস্টেলটিও ধর্মপ্রদেশের একটি প্রতিষ্ঠান যা এল.এইচ.সি সিস্টারগণ পরিচালনা করেন।

সপ্তম ভাগ

পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ: বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য সেবাপ্রতিষ্ঠানসমূহ

লেখক: যোসেফ ডি'রোজারিও

আলোচ্য বিষয়সূচির সারসংক্ষেপ

প্রথম অধ্যায়: শিক্ষা সেবা প্রতিষ্ঠান:

॥ ক ॥ শিক্ষা সেবা সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ

॥ খ ॥ সেন্ট আলফ্রেড উচ্চ বিদ্যালয় – প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি

॥ গ ॥ সেন্ট আলফ্রেড উচ্চ বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী (১৯৩৩-১৯৫৮ খ্রি.)

॥ ঘ ॥ সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ব্রাদার ডেনিস গডফ্রে, সিএসসি-এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

॥ ঙ ॥ সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী – ১৯৮৩ খ্রি.

॥ চ ॥ সেন্ট আলফ্রেড স্কুলের প্লাটিনাম জুবিলী - ২০০৮ খ্রি.

॥ ছ ॥ নারী শিক্ষা সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুলটি কলেজে উন্নীতকরণ : ২০২১ খ্রি.

দ্বিতীয় অধ্যায়: স্বাস্থ্য-সেবা : ফাতিমা স্বাস্থ্য কেন্দ্র

তৃতীয় অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুর কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্র (পি.এ.ডি.সি)

চতুর্থ অধ্যায়: ত্রাণ, পুনর্বাসন ও সমাজ-উন্নয়ন ও অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ

ভূমিকা:

বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের একটি প্রাচীন জেলা বরিশাল। তবে এই জেলাটির নাম এর পূর্বে বাকেরগঞ্জ ছিল। জেলার নামটি বরিশাল হবার পরবর্তীতে বাকেরগঞ্জকে থানা করে বরিশালের দক্ষিণাঞ্চলের একটি নির্দ্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত করা হয়। বাখেরগঞ্জ পরবর্তীতে উপজেলায় উন্নীত হয়। বর্তমানে এই উপজেলার একটি ইউনিয়ন ১৩ নং পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়ন।

বাকেরগঞ্জ উপজেলার অধীনে পাদ্রীশিবপুর একটি খ্রিস্টান জনপদ হলেও এখানে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টান সকল ধর্মের লোকজনই সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মিলেমিশে যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসছে। এই সুন্দর সহাবস্থানের পিছনে ছিল প্যারিশের দ্বারা পরিচালিত বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান যা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এলাকার এবং দূর থেকে আগত এলাকায় বসবাসকারী মানুষের সেবা করে খ্রিস্টীয় জনপদটি অতীতের ন্যায় আজও বিশাল অবদান রেখে যাচ্ছে।

প্রথম অধ্যায়: শিক্ষা সেবা প্রতিষ্ঠান:

॥ ক ॥ শিক্ষা সেবা সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ[১]

১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে পর্তুগীজ পাদ্রীগণ অত্র এলাকায় জমিদারি লাভ করেন এবং কর আদায়কারী হিসেবে কাজ করেন। অত্র এলকায় কাজ করতে গিয়ে তারা উপলব্ধি করেন যে, এলাকাটি শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। তাই অত্র এলাকায় খ্রিস্টধর্ম প্রচারের পাশাপাশি শিক্ষা বিস্তারের জন্যে তারা এগিয়ে আসেন।

[১] দ্র: সেন্ট আলফ্রেড স্কুল: রজত জয়ন্তী স্মরণিকা – ১৯৫৮ খ্রি.

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একটি ক্ষুদ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা-সেবা শুরু হয়। আনুমানিক ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে, পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর তৎকালীন পালক পুরোহিত রেভাঃ ফাদার পিও প্রথমে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই বিদ্যালয়টির শিক্ষাদানের মাধ্যম ছিল ইংরেজি। তাই এই বিদ্যালয়কে ইংরেজি স্কুল হিসেবে অভিহিত করা হতো। প্রথমে ঐ সময়ে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের জন্যে এমন বিদ্যালয় খুব কমই ছিল। প্রথমে কেবল খ্রিস্টান ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিদ্যালয়টি কাজ করেছে। রেভারেণ্ড ফাদার পিওর পরবর্তী ফাদারগণের মধ্যে লোরেণ্ড ফাদার লবু জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্যে আগ্রহী হন এবং তিনি সেই অনুসারে সকলের জন্যে বিদ্যালয়টি উন্মুক্ত করে দেন। এভাবে বেশ কয়েক বছর ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত এই ইংরেজি স্কুলটি শিক্ষা বিস্তারের কাজ করে। তখন বিদ্যালয়টির নাম ছিল সেন্ট এন্থনী হাই স্কুল। এই স্কুলটির কার্যক্রম তখন বর্তমান ফাদার বাড়িতেই সম্পন্ন হতো।

॥ খ ॥ সেন্ট আলফ্রেড উচ্চ বিদ্যালয় – প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে যখন চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের সঙ্গে পাদ্রীশিবপুর যুক্ত হয় তখন থেকে হলি ক্রস বিশপ, ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণ সংগঠিতভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ-উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত হতে থাকেন। এ ধরনের সেবার প্রথম ও প্রধান উদ্যোগ ছিল একটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করা, যা ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট আলফ্রেড নাম ধারণ করে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে রেভারেণ্ড ফাদার ফিনোর আমলে, চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার ব্রাদার ইটিয়েন, সিএসসি কর্তৃক বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়টি যেখানে আছে সেখানেই প্রথমত: হাই স্কুল ভবন নির্মিত হয়। চট্টগ্রামের পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ স্বর্গীয় আলফ্রেড লেপারিয়ার সিএসসি, ডিডি সেন্ট এন্থনী মাধ্যমিক ইংরেজি বিদ্যালয়টির নাম পরবর্তীতে পাদ্রীশিবপুরের ফাদার এবং ব্রাদারগণের অনুরোধে নিজের নাম অনুসারে নামকরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মহামান্য প্রভু বিশপ উপলব্ধি করেন যে, কোন সাধুর নাম অনুসারেই স্কুলটির নামকরণ হওয়া প্রয়োজন। চট্টগ্রামের পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ স্বর্গীয় আলফ্রেড লেপারিয়ার সিএসসি, ডিডি-এর প্রতিপালক সাধু আলফ্রেডের নাম অনুসারেই স্কুলের নামকরণ করা হয়। এবং সেই অনুসারে তিনি স্কুলের নামকরণ করেন ''সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুল''। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর রেভারেণ্ড ব্রাদার গডফ্রে প্রধান পরিচালক নিযুক্ত হন। সহকারী হিসেবে আসেন ব্রাদার ফ্লেভিয়ান লাপ্লান্ত, সিএসসি। তাঁদের সাথে রেভারেণ্ড ব্রাদার আমরোজও আসেন। তাদের এই আগমন ছিল পাদ্রীশিবপুরবাসী এবং স্কুলের জন্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাই তাদের বিশেষ সম্মান দিয়ে জাহাজ ঘাট থেকে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পাল-পুরোহিত ফাদার ফিনো, সিএসসি-এর নির্দেশনায় তাদের নিয়ে আসার এই দায়িত্বটি পালন করেন মি. যোসেফ গোমেজ। পরবর্তীতে তিনি ব্রাদারদের সহযোগিতার জন্য স্কুল ও বোর্ডিং কাজে সম্পৃক্ত হন। তিনি এই ব্রাদারগণকে তারাবুনিয়া স্টিমার ঘাটে অভ্যর্থনা দিয়ে পাদ্রীশিবপুরে নিয়ে আসেন। তিনি পাদ্রীশিবপুর মিশনে এবং স্কুলে অনেক বছর নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। পাদ্রীশিবপুরের সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুলের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন। ঐ সময়ে প্রকাশিত রজত জয়ন্তী ম্যাগাজিনে তাকে কেন্দ্র করে একটি লেখা ছাপা হয়। যা এই রচনার এক পর্যায়ে তুলে ধরা হবে।

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মাত্র ৪ জন ছাত্র নিয়ে ৭ম শ্রেণি খোলা হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে হাই স্কুলের কার্যক্রম আরম্ভ হয়। তখনকার বিদ্যালয় এবং মিশন কর্তৃপক্ষ ছিলেন বিচক্ষণ ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। তারা ভেবে দেখলেন বাংলাদেশের তথা ঐ সময়কার পূর্ব পাকিস্তানে খ্রিস্টান এলাকায় বা পাদ্রীশিবপুরের কাছাকাছি এলাকায় ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য পাদ্রীশিবপুরের মতো আর তেমন কোন বিদ্যালয় নেই। তাই যাতে সমগ্র দেশ থেকে আগ্রহী ছাত্ররা এখানে এসে শিক্ষা লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। এই প্রয়োজনবোধ থেকেই বিভিন্ন ধর্মপল্লীর খ্রিস্টান ছাত্রদের জন্য একটি কাথলিক বোর্ডিং স্থাপন করা হয়। পরের বছর জুন মাসে রেভারেন্ড ব্রাদার গডফ্রের স্থলে রেভারেণ্ড ব্রাদার ফ্লেবিয়ানকে স্কুলটির পরিচালক নিযুক্ত করা হয়। তিনি ৪ বছর ৬ মাস স্কুলটি পরিচালনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তবে স্কুলটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা ছিল নিতান্তই কঠিন কাজ। বিশেষ করে স্কুলটির খরচ বহনের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। ফলে এক পর্যায়ে তিনি শোচনীয় আর্থিক সমস্যায় পতিত হন। এই সময় রেভারেণ্ড ব্রাদার গডফ্রে এগিয়ে আসেন এবং চট্টগ্রাম থেকে টাকা সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন এবং স্কুলটিকে ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা করেন।

একটি বিদ্যালয় চালাতে হলে সরকারের শিক্ষা বিভাগের কাছ থেকে অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় স্কুলটি সাময়িক অনুমোদন লাভ করে। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে এই স্কুল থেকে সর্বপ্রথম ২ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। আর এই দুইজন ছাত্রই কৃতিত্বের সাথে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। প্রথম বছরই স্কুলটি ১০০% পাশের গৌরব অর্জন করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তখনকার সিলেবাস অনুসারে প্রবেশিকা পরীক্ষা ছিল যথেষ্ট কঠিন এবং চ্যালেঞ্জিং। তার উপরে একটি নতুন স্কুল থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এটাও ছিল একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। ঐ সময়ের দু'জন কৃতি ছাত্র, বৃহত্তর বরিশালের ধর্মপল্লী থেকে আসা বোর্ডিং-এর ছাত্র পিটার হালদার ও দীনবন্ধু বাড়ৈ উভয়েই এই চ্যালেঞ্জ সার্থকভাবে মোকাবেলা করে দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এর পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ৮ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সকলেই উত্তীর্ণ হয়। ফলে স্কুলটির সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

অতপর রেভারেণ্ড ব্রাদার মার্টিন ও রেভারেণ্ড ব্রাদার এলড্রিক প্রত্যেকে দুই বছর করে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। তারাও নিতান্ত আন্তরিকতার সাথেই তাদের দায়িত্ব পালন করেন এবং এজন্যই স্কুলটির প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফল সবসময়ই সন্তোষজনক হয়। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে রেভারেণ্ড ব্রাদার গডফ্রে পুনরায় পাদ্রীশিবপুরে আগমন করেন এবং স্কুলটির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি স্কুলটিকে এতই ভালোবেসেছেন যে তিনি এর উন্নতির জন্যে কঠোর পরিশ্রম করেন। বিশেষভাবে স্কুলটির প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফল যাতে সবসময় সমুন্নত থাকে সেজন্য তিনি শিক্ষকদের যেমন অনুপ্রাণিত করেন তেমনি ছাত্রদেরও তিনি সযত্নে পরিচর্যা করেন। আর এজন্যই স্কুলটির অগ্রগতির পথে আর তেমন কোন বাধা বিঘ্ন আসেনি। তাঁরই প্রচেষ্টায় স্কুলটি ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ী অনুমোদন লাভ করে। একথা অনস্বীকার্য যে ব্রাদার গডফ্রের জন্যই স্কুলটি পর্যায়ক্রমে উন্নত করতে সক্ষম হয়। এ সময়ে তাঁকে রেভারেণ্ড ব্রাদার এমরোজ যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। ব্রাদার এমরোজ ছিলেন একজন সুদক্ষ কর্মী। তিনি ইংরেজি ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রাদার গডফ্রে অনাথ আশ্রম ও জমিদারী সেরেস্তার কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে, স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব রেভারেণ্ড ব্রাদার পলের হাতে অর্পণ করা হয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়, তিনি নিরতিশয় কষ্ট স্বীকার করে স্কুলে এবং স্থানীয় সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সক্ষম হন। বিশেষ করে স্কুলের অগ্রগতিতে কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটতে দেন নাই। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে রেভারেন্ড ব্রাদার রবার্ট স্কুলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রথমবারের মতো সেন্ট যোসেফ বোর্ডিং-এ জেনারেটরের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা, খেলাধুলা ও ব্যায়ামের জন্যে প্রচুর সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং তাতে সহপাঠক্রম কার্যাবলী বিস্তৃতি লাভ করে। তিনি এসময় আরও একটি বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। রেভারেণ্ড ব্রাদার ফ্লেবিয়ান যখন স্কুলটির দায়িত্বে ছিলেন তখন দক্ষিণ গ্রামে মৌলভী মকবুল আহমেদ মিঞা একখন্ড জমি দান করেন। আর রেভারেণ্ড ব্রাদার রবার্ট সেই জমিখন্ডে ''রহিম উদ্দীন মুসলিম হোষ্টেল'' স্থাপন করেন।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে রেভারেণ্ড ব্রাদার হ্যামেল, সিএসসি, প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ হতে হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় স্কুলের কলেবর সর্বাংশে উন্নতি লাভ করে। তিনি একজন শিল্পী ও সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন। স্কুলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি সাধনে, শান্তি ও শৃঙ্খলা সংস্থাপনে তিনি ছিলেন নিতান্তই সচেতন এবং সেদিকটি লক্ষ্য করেই তিনি স্কুলটিকে সুন্দর করে গড়ে তুলেন। তিনি সকল কাজ নিখুঁতভাবে করতে পছন্দ করতেন। তাই তাঁর সময়ে স্কুলটির সৌন্দর্য সমৃদ্ধ হয়।

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে রেভারেণ্ড ব্রাদার হ্যামেল চট্টগ্রামে বদলী হন। এবং তাঁর স্থলে ব্রাদার কনরাড ওজে, সিএসসি, স্কুলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি হলেন পবিত্র ক্রুশ সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃসংঘের নবম প্রধান শিক্ষক। ঐ বছরই স্কুলটি বরিশাল কাথলিক শিক্ষাকেন্দ্রের অর্ন্তভূক্ত হয়। এইরূপে অন্যান্য মিশন স্কুলের ন্যায় এই স্কুলও শিক্ষাকেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত হয়। এই শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ উল্লেখিত আছেঃ

''একতাই মহাবল, দুর্বলের বল
বল বল হীন বল বিভেদে কেবল।''

এই যে বাণী এর সত্যটি উপলব্ধি করেই সকল খ্রিস্টান মিশনারী স্কুল পরিচালিত হবে এবং সকলে মিলে একত্রে যেকোন সমস্যা মোকাবেলা করবে। শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়তায় স্কুলের শিক্ষকগণের বেতন বৃদ্ধি ও স্কুলের নিজস্ব পতাকা অঙ্কিত হয়। একটি স্কুল সঙ্গীতও রচিত হয়। সঙ্গীতটি সে সময়ে স্কুলের সকল ছাত্র প্রতিদিন পরিবেশন করতো। স্কুল সঙ্গীতটি নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ[২]

(১)
প্রভু তাঁহাকে রক্ষা করুন,
যে তাঁর সম্মুখে নত হন,
যে নবীন, নব জীবন আনন্দে আনন্দ,
শক্তিশালী, বুদ্ধিমান, গুণগ্রাহী ও জ্ঞানী
ন্যায়বান ভগবান তাঁদের রক্ষা করুন।

(২)
মোদের দেহের শক্তি বৃদ্ধি হউক,
মনের কল্পনা-শক্তি বাড়ুক,
বন্ধুদের প্রেম আমাদের চিত্তপূ রণ করুক।
নব জীবনের আনন্দ আমাদের চরিত্রে

[২]দ্রঃ সেন্ট আলফ্রেড স্কুলঃ রজত জয়ন্তী স্মরণিকা – ১৯৫৮ খ্রি.

(৩)

এসো মোরা সবাই মিলে,
সাধু আলফ্রেডের মঙ্গলে
আমরা একত্রিত চিত্ত শুচি করি,
জগতে ভগবানের প্রশংসা করি
জীবনের অন্ধকার দূরীভূত হতে।

॥ গ ॥ সেন্ট আলফ্রেড উচ্চ বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী (১৯৩৩-১৯৫৮ খ্রি.)[৩]

রজত জয়ন্তী সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে। এই সংখ্যায় আরও উল্লেখ করা হয় যে চট্টগ্রামের প্রভু বিশপের বদান্যতায়, খ্রিস্টান বোর্ডিংয়ের পশ্চিম দিকে একখন্ড জমি ক্রয় করা হয়। এই জমিতে শিক্ষকগণের জন্য বাসোপযোগী ছয়টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছিল। এর কারণ ছিল এই যে, যেসকল শিক্ষক স্থানীয় তারা যেন বসবাস করে বিদ্যালয়ে তাদের সেবাকর্ম করতে পারেন। এই পরিকল্পনার ফলে সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুলে পাদ্রীশিবপুরের বাইরে থেকেও বেশ ক'জন শিক্ষক স্কুলটিতে সেবা দিয়েছেন এবং তাঁদের আন্তরিক সেবার জন্যে স্কুলটির শিক্ষার মান উন্নত হয়েছিল। স্কুলের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এমনটিও হয়েছে যে স্কুলের আসনের তুলনায় ভর্তি প্রত্যাশী ছাত্রদের সংখ্যা অধিক হয়েছে এবং এজন্যে প্রাইমারী এবং হাই স্কুল বিভাগে অনেক ছাত্রকে ফিরিয়ে দিতে হয়েছে। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের ফলাফল খুবই সন্তোষজনক ছিল। স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠাতা, স্কুল সম্বন্ধে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, ব্রাদার ও শিক্ষকগণের সহযোগিতায় তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ঐ সময়ে এই রচনাটির লেখক (অজ্ঞাত) বলেছেন স্কুলের ভবিষ্যত খুবই উজ্জ্বল। আগামী ২৫ বছরে উন্নতির পথ আরও উন্মুক্ত রয়েছে।

(১) সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুলের শিক্ষকগণ (১৯৫৮ খ্রি.)

১। রেভারেণ্ড ব্রাদার ওজে, সিএসসি (প্রধান শিক্ষক)
২। রেভারেণ্ড ব্রাদার জেরার্দ, সিএসসি
৩। রেভারেণ্ড ব্রাদার নাদো, সিএসসি
৪। রেভারেণ্ড ব্রাদার লরেন্স ডায়েস, সিএসসি
৫। রেভারেণ্ড ব্রাদার হিরলাল মণ্ডল, সিএসসি
৬। মি. সিলভেস্টার গোমেজ
৭। বাবু রাজেন্দ্র মোহন নাথ
৮। মৌলভী আব্দুর রাজ্জাক
৯। বাবু চিত্ত রঞ্জন হাওলাদার
১০। মোহাম্মদ মাহাতাব আলম
১১। মি. ভেনানসিও ডি'কস্তা
১২। বাবু সুশীল কুমার সরকার
১৩। মোহাম্মদ রফিক উদ্দীন আহম্মদ
১৪। বাবু অনিল চন্দ্র দাস
১৫। মি. আগষ্টিন গোমেজ
১৬। মোহাম্মদ সৈয়দ আহম্মদ
১৭। মোহাম্মদ মঞ্জিল হুসাইন
১৮। মোহাম্মদ আব্দুল মোতাজ্জিম বিল্লা
১৯। মৌলভী হাতেম আলী

[৩] সেন্ট আলফ্রেড স্কুল: রজত জয়ন্তী স্মরণিকা – ১৯৫৮ খ্রি.

(২) সেন্ট আলফ্রেড প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকগণ - ১৯৫৮ খ্রি.

শ্রদ্ধেয় ব্রাদার জেরার্দ, সিএসসি, (প্রধান শিক্ষক) ,
মি. নির্মল হাওলাদার (এ্যাসস্ট্যান্ট হেডমাস্টার),
মি. নেপিয়ার ডি'কস্তা,
মি. ক্লেমেন্ট গোমেজ,
মি. এস্কান্দার আলী,
মি. ফ্রান্সিস গোমেজ,
মিসেস বেনেডিক্ট গোমেজ,
মিস্ ভেরোনিকা গোমেজ,
মিস্ রুথমেরী ডি'রোজারিও,
মিস্ রুথমেরী গোমেজ,
মিসেস ইউজিন গোমেজ
মিসেস নেপিয়ার ডি' কস্তা।

(৩) রজত জয়ন্তী সঙ্গীত

রজত জয়ন্তী উপলক্ষে একটি রজত জয়ন্তী সঙ্গীত রচনা করা হয়। এই সঙ্গীতটি রচনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক মি. সিলভেস্টার গোমেজ। তিনিই এই সঙ্গীতটির সুরারোপও করেন। নিম্নে সঙ্গীতটি তুলে ধরা হলোঃ

ধীরে ধীরে শ্রীমন্ত তীরে–
ধীরে জাগেরে ॥
জাগিল ধীরে– নাশিল তিমিরে
বিদ্যামন্দিরে ॥

২। ফুটিল কত-শত ফুল
জুটিল গন্ধে অলিকুল–
সান্ধ্য সমীরে অন্দরে বাহিরে,
গন্ধ বিতরে ॥

১। লঙ্ঘিয়া সাগর বারি
মন্দিরে এলো পূজারী
ত্যাজী এ জগতে পরহিত ব্রতে
স্বার্থ ত্যাগীরে ॥

৩। পূর্ণ করি পঞ্চবিংশতি,
নন্দিত রৌপ্য জয়ন্তী–
হরষিত চিতে শ্রদ্ধাঞ্জলী দিতে
স্বাগত শিবপুরে ॥

(৪) মি. যোসেফ গোমেজ এর রজতজয়ন্তী

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যোসেফ গোমেজ যেহেতু স্কুলের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই কর্মরত ছিলেন সেহেতু এই বছর স্কুলের সাথে সাথে তাঁরও কর্ম জীবনের রজত জয়ন্তী বছর ছিল। স্কুলের রজত জয়ন্তী সংখ্যায় মি. যোসেফ গোমেজকে সম্মান জানিয়ে একটি লেখা প্রকাশ করা হয়। যা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

"আমাদের যোসেফ, সত্যই আমাদের। কেই তাকে ম্যানেজার বলি বা ইঞ্জিনিয়ার বলি আবার অনেকেই তাকে যোসেফ বাবুর্চি বলে ডাকি। সঠিক পদটি দেয়া বড়ই মুশকিল। আজকের কথা নয়, সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর আগেকার কথা। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে হাই স্কুল ও সাধু যোসেফ বোর্ডিং আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে তাকে প্রথম দেখি আমাদের বোর্ডিং এর ছোট বাবুর্চিরূপে। অত্যন্ত সাধাসিধে লম্বা চেহারার মানুষটি। ব্রাদারগণ বাংলা জানতেন না। বাধ্য হয়ে তাকেও হাতে মুখে ইংরেজি বলতে হতো। মনে পড়লে এখনও হাসি পায়। কত তামাসা করেছি তার সেই সরলতা ও ইংরেজি বলার সুযোগ নিয়ে কেউ

ভাবিনি যে তার মধ্যে এত কর্মশক্তি লুকায়িত ছিল। তিনি এখন আর বাবুর্চি কাজ করেন না। তবুও আজও তিনি সেই বাবুর্চি নামেই পরিচিত। এতটুকু কুণ্ঠা নেই সেই জন্য তার।

এই সুদীর্ঘ ২৫ বছরে কত পরিবর্তন, কত রদবদল হয়েছে। কত ব্রাদার, কত কর্মচারীর পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু আমাদের যোসেফের একটুকুও নড়চড় হয়নি। তার বিশ্বস্ততা, কর্মের প্রতি তার একান্ত নিষ্ঠা তাকে সকলের প্রিয় করেই রেখেছে। তাকে না হলে আমাদের কোন কাজই যেন চলে না। কখনও খেলার মাঠে, কখনো বোর্ডিংয়ে, কখনো স্কুল ঘরে, কখনো শিক্ষকদের ঘরে, কখনো রাজের কাজে, কখনো মিস্ত্রির কাজে আবার কোন সময় কাঠের নৌকায় দেখতে পাই। কোন দ্বিধা নেই, তার কোন কাজে। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে এমন ধৈর্য্য, এমন নিষ্ঠা ও বিস্তৃতার সাথে কাজ করার দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল। ৯ টি ছেলে ও একটি মেয়ের বাবা তিনি। একটি ছেলে এবারে মেট্রিক পাস করেছে। তিনি বেশ সুখে ও শান্তিতে পারিবারিক জীবনযাপন করছেন। তার কাজের পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। তাকে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

(৫) রজত জয়ন্তী উপলক্ষে শুভেচ্ছা বাণী

স্কুলের রজত জয়ন্তী সংখ্যায় বেশ কয়েকজন মাননীয় ব্যক্তির শুভেচ্ছা বাণী প্রকাশ করা হয়েছে। সেই সকল বাণী থেকে কয়েকটি উপস্থাপন করা হলোঃ

শুভেচ্ছা বাণী: পরম শ্রদ্ধেয় রেমণ্ড লারোজ সিএসসি, চট্টগ্রামের বিশপ

পবিত্র ক্রুশ সম্প্রদায়ের ব্রাদারগণ পদ্রীশিবপুর এসে উচ্চ বিদ্যালয় খুলে আমাদের সম্প্রদায়ের ও তদ্রূপ হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের ছাত্রদিগকে যেরূপ সুশিক্ষাদানে গড়ে তুলেছেন, এ নিমিত্ত ''রজত-জয়ন্তী'' উপলক্ষে আমি ব্যক্তিগতভাবে ও এলাকাস্থ সকল পুরোহিতদের নামে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সাধু আলফ্রেড উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নতি-কল্পে যাহারা পরিশ্রম, অনুরাগ ও দক্ষতা দেখিয়েছেন, তাহাদিগকে আমি আমার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও তাহাদের অনুগামীগণ, বর্তমান ব্রাদার ও শিক্ষকবৃন্দ এবং পুরাতন ছাত্র যাহারা এই স্কুলের গৌরব উজ্জ্বল করেছে এবং তদ্রুপ বর্তমান ছাত্রগণ যাহাদের উপর আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ আশা অর্পিত, তাহাদিগকে আমি আমার পরম স্নেহপূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।
ঈশ্বরের অমূল্য আর্শীবাদ তোমাদের উপর বর্ষিত হউক।

শুভেচ্ছা বাণী: ফাদার পাইয়া, সিএসসি, পাল-পুরোহিত
প্রিয় প্রাক্তণ ছাত্রগণ, আপনাদের উপর পূর্বকার বড় ফাদারদের যে সমস্ত আশা-আকাঙ্খা ছিল, যেমন দেশের ও দশের উন্নতি করা, যৌবনের অজ্ঞতার পরিবর্তে জ্ঞানালোক বিস্তার করা– আমার আশা আকাঙ্খাও আপনাদের উপর ঠিক তদ্রুপ।

আজ আপনাদের কুশল ও উন্নতি দেখিয়া, আমরা আপনাদিগকে অভিনন্দন জানাইতেছি। আমাদের কামনা সম্পূর্ণরূপে ফলবতী না হইলেও প্রচুর পরিমান সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

পরিশেষে ব্রাদার ও শিক্ষকবৃন্দ যাহারা এই পঁচিশ বৎসর যাবৎ ''সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুলের'' নাম উজ্জ্বল করিবার নিমিত্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন ও যাইতেছেন তাহাদের মধ্যে উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকলকে ''রজত জয়ন্তী'' উপলক্ষে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।
প্রিয় ছাত্রগণ, আপনাদের উপস্থিতিতে আজ আমি অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করিতেছি। আমাদের মধ্যে যে সমস্ত বন্ধন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল, তাহা যেন আজ থেকে পরস্পরের মধ্যে শক্ত ও জীবন্ত অবস্থায় থাকিতে পারে এই আমার কামনা।

শুভেচ্ছা বাণী: ব্রাদার কনরাড ওজে, সিএসসি, প্রধান শিক্ষক ও সেক্রেটারি
পুরাতন ও বর্তমান ছাত্রবৃন্দ এবং প্রিয় অভিভাবকগণ, এই স্কুলের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে আমি আপনাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। পরম করুণাময় পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি, কারণ তিনি গত ২৫ বৎসর যাবত এই বিদ্যালয়টি দৃশ্যভাবে আর্শীবাদ করিয়া ক্রমাগত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিতেছেন।

অভিভাবকদিগকে ধন্যবাদ যাহারা আমাদের উপর অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, সন্তানগণকে দেশের প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়িয়া তুলিতে আমাদের তত্ত্বাবধানে প্রেরণ করিয়াছেন।
পুরাতন ছাত্রদিগকে ধন্যবাদ, যাহারা এই স্কুল ও ইহার শিক্ষকগণকে তাহাদের জীবনের উন্নতির মূল কারণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

বর্তমান ছাত্রদিগকেও ধন্যবাদ, যাহারা শিক্ষকগণের প্রতি বাধ্যতা ও কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করিতে আসিয়াছে।

পবিত্র ক্রুশ-সংঘের ভ্রাতৃ সম্প্রদায়কে ধন্যবাদ, যাহারা ছাত্র মণ্ডলীর শিক্ষার্থে, তাহাদের অমূল্য জীবন ভগবানের পাদপদ্মে উৎসর্গ করিয়াছেন।

অবশেষে আমার প্রিয় শিক্ষকগণকে ধন্যবাদ, যাহারা আমার মনের শ্রেষ্ঠ বাসনা পুরণার্থে, শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রগণকে পাকিস্তানের প্রকৃত নাগরিক করিয়া গড়িয়া তুলিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন।

(৬) সেন্ট আলফ্রেড হাইস্কুলের কার্যক্রম

সেন্ট আলফ্রেড হাইস্কুলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য প্রথম থেকেই ছিল একজন ছাত্রকে পরিপূর্ণ আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। সেজন্য প্রচুর সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর আয়োজন ছিল। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন খেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়মিত হতো। এর পাশাপাশি কিছু গঠনমূলক দলীয় শিক্ষাও তাদের দেয়া হতো। সেগুলির মধ্যে যা সংগ্রহ করা গেছে বা প্রথম ২৫ বছরের মধ্যে যে সমস্ত কার্যক্রম চালু ছিল তা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

(ক) ''সেভিংস ব্যাঙ্ক'' – আব্দুর রাজ্জাক (১০ম শ্রেণি–১৯৫৮)

আমাদের জগত আজকাল ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু এর মূলে রয়েছে অগাধ সহানুভূতি, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অপরিসীম আয়। এই তিনটি পরস্পরের উপর পরস্পর নির্ভরশীল

এবং ইহার উপর জগতও নির্ভরশীল। কিন্তু প্রচুর আয়ের জন্য নানা শাখা-প্রশাখা আছে। সেভিংস ব্যাঙ্ক এর মধ্যে অন্যতম। বর্তমানে পৃথিবীর খরচ বহনের জন্য সেভিংস ব্যাঙ্কের দান অতুলনীয়। আমাদের দেশ পাকিস্তানে এর দান যে কত অনুপম তা বলা বাহুল্য। ইহার আয়ের দ্বারা অনেক কাজ চলতে পারে, তাহা পাঠকগণ নিজে নিজে বুঝতে চেষ্টা করবেন। বাস্তবিক সেভিংস ব্যাঙ্কের আয়ের সাহায্যে জগৎ ক্রমোন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হয়েছে। কারণ সেভিংস ব্যাঙ্ক স্কুল, শহর, নগর কিংবা অন্য যেকোন স্থানে গঠিত হতে পারে এবং ইহাতে ৯/১০ বছরের বালক-বালিকা হতে আরম্ভ করে বৃদ্ধ পর্যন্ত টাকা জমা করতে পারে। এইরূপে বাল্যকাল হতে ছেলেদের ভিতর এক মিতব্যয়িতার অভ্যাস থেকে যায় এবং এর ফলে প্রথম থেকেই আর্থিক উন্নতির পথে পদক্ষেপ গ্রহণ করে দিন দিন অধিকতর উন্নতি করতে পারে। ভবিষ্যতে এর উন্নতি আরও অধিক হবে। আশা করি আমাদের দেশের প্রত্যেক নাগরিক ভাইদের মনের মধ্যে এইরূপ আশা আছে বা থাকবে। এবং এইরূপে তাহারা দেশকে জগতের মাঝে আলোর ন্যায় গড়ে তুলবে।

মাত্র ছয়জন সদস্য নিয়ে এই ব্যাঙ্ক গঠিত হয়। একজন প্রেসিডেন্ট, একজন সহকারী প্রেসিডেন্ট, একজন প্রচারক, একজন খাজাঞ্জি, একজন হিসাব রক্ষক এবং একজন প্রতিনিধি।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার রেভারেণ্ড ব্রাদার হ্যামেল, সিএসসি সর্বপ্রথম পাশবহির প্রচলন করেন। বছরের শেষভাগে প্রচলন হওয়ায় আমানতকারীর সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে হেডমাষ্টার রেভারেণ্ড ব্রাদার ওজে, সিএসসি এর সময়ে এক নতুন রূপ ধারণ করে এবং ক্রমে ক্রমে আমানতকারীর সংখ্যা এবং আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে আমাদের স্কুলের ছাত্র সংখ্যার প্রায় তিন চতুর্থাংশ আমানতকারী এবং আমানতের পরিমাণ প্রায় এক হাজার টাকার উর্ধ্বে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে, আমাদের স্কুলের প্রায় সমস্ত ছাত্রই আমানতকারী হিসেবে গণ্য হবে।

সেভিংস ব্যাঙ্ক জাতীয় জীবনে উন্নতির অন্যতম পন্থা। সুতরাং সকলেরই ইহার প্রতি সমান লক্ষ্য থাকা উচিৎ।

(খ) সাধু আলফ্রেড বিদ্যালয়ের বয়স্কাউট দল: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস১৯৪২-১৯৪৬ খ্রি.

নভেম্বর ৮, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে দল গঠন করা হয়। ২৬.০৪.১৯৪৩ ঃ '' দি ফার্স্ট পাদ্রীশিবপুর আওয়ার লেডী অফ্ গাইডেন্স'' উপাধিসহ দক্ষিণ ভারতীয় কাথলিক স্কাউট ফেডারেশনের অধীনে রেজিষ্ট্রেশন করা হয়। প্রথম চ্যাপলেইনঃ রেভারেণ্ড ফাদার জি, ল্যাপিয়ার, সিএসসি (পালক পুরোহিত); প্রথম প্রেসিডেন্টঃ রেভারেণ্ড ব্রাদার গডফ্রে, সিএসসি (প্রধান শিক্ষক); স্কাউট মাষ্টারঃ রেভারেণ্ড ব্রাদার গেস্টিন, সিএসসি; ট্রুপ লিডারঃ এভেলিন গোমেজ, (পাদ্রীশিবপুর)

১৯৪৭-১৯৪৮ খ্রি: ২৩ শে আগস্ট ১৯৪৭ খ্রি. দ্বিতীয় স্কাউট মাষ্টার নিযুক্ত হন রেভারেণ্ড ব্রাদার পল, সিএসসি; চ্যাপলেইনঃ রেভারেণ্ড ফাদার বি. রড্রিগ্স, ট্রুপ লিডারঃ ক্লেমেন্ট গোমেজ (পাদ্রীশিবপুর)

১৯৪৮-১৯৫২ খ্রঃ ঃ স্কাউট আন্দোলনে স্থিতাবস্থা দেখা দেয়।

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ঃ মোহাম্মদ ছালাম মিঞা (শিক্ষক) কর্তৃক পুনর্গঠিত হয়; ট্রুপ লিডারঃ এরিক গনছালভেস

১৯৫৪ খ্রি. ১৬.০২.১৯৫৪ঃ রেভারেণ্ড ব্রাদার লরেন্স ডায়েস, সিএসসি কার্যভার গ্রহণ করেন এবং ''১২ নং বরিশাল, সাধু আলফ্রেড হাইস্কুল দল পাদ্রীশিবপুর'' উপাধিসহ পূর্ব পাকিস্তানের বয়স্কাউট সমিতির অধীনে রেজিষ্ট্রেশন করা হয়।

প্রেসিডেন্টঃ রেভারেণ্ড ব্রাদার হ্যামেল, সিএসসি (প্রধান শিক্ষক); ট্রুপ লিডারঃ মিলিগান ডি'রোজারিও (পাদ্রীশিবপুর); কাব মাষ্টারঃ রেভারেণ্ড ব্রাদার লরেন্স ডায়েস, সিএসসি; সিনিয়র মাস্টার নিকোলাস শিকদার

১৯৫৮ খ্রি. : প্রেসিডেন্টঃ রেভারেণ্ড ব্রাদার ওজে, সিএসসি (প্রধান শিক্ষক); গ্রুপ স্কাউট মাষ্টারঃ রেভারেণ্ড ব্রাদার লরেন্স ডায়েস, সিএসসি; সহকারীঃ মিলিগান ডি'রোজারিও; কাব মাষ্টারঃ রেভারেণ্ড ব্রাদার জেরাল্ড, সিএসসি; সহকারী মাষ্টারঃ মোহাম্মদ মাহাবুব আলম(শিক্ষক); ট্রুপ লিডারঃ এমব্রুজ দাস; সিনিয়র মাস্টার সুশীল দেবনাথ

উপরের বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে, প্রতিষ্ঠার পর থেকেই স্কুলটিতে একটি সুশৃঙ্খল স্কাউট গ্রুপ তৈরি করা হয়েছিল যাতে করে ছাত্রগণ শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিজেদের দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। স্কাউট আন্দোলনের মাধ্যমে ছাত্রগণ বিভিন্ন বিষয় প্রশিক্ষণ লাভ করে যা তাদের পরবর্তী জীবনে সহায়ক হয়। আর আমরা দেখতে পাই যে, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ থেকেই সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুল এই বিষয়ে যথেষ্ট আন্তরিক ছিল। এই কাজে স্কুল কর্তৃপক্ষের আন্তরিক অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা ছিল। ফলে এক পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানের বয়স্কাউট সমিতির নিবন্ধন লাভ করতেও তেমন কোন সমস্যা হয়নি।

(৭) প্রবেশিকা পরীক্ষা (বা ম্যাট্রিক) পাশ করা ছাত্রদের নাম (১৯৩৭-১৯৫৮)

সেন্ট আলফ্রেড হাইস্কুলের যাত্রা শুরু হয় ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে এবং তখন ৭ম শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তির মাধ্যমে মাধ্যমিক শাখার কার্যক্রম শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ শুরু হয়। সেই থেকে রজত জয়ন্তী পালনের সময় পর্যন্ত বিভিন্ন বছরে যারা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের তালিকা পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হলোঃ

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ ঃ (১) পিটার হালদার (২) দীনবন্ধু বাড়ৈ

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ ঃ (১) অমিক রায় (২) অতুল চন্দ্র দাস (৩) বজলুর রহমান (৪) শ্যাম চক্রবর্ত্তী (৫) ভিনসেন্ট গোমেজ (৬) বিপিন চন্দ্র দাস (৭) সত্যেন্দ্র রায়

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ ঃ (১) বার্নার্ড ডি' রোজারিও (২) চিত্তরঞ্জন হাওলাদার (৩) দিবাংশু চক্রবর্ত্তী (৪) এনায়েত হেসেন (৫) স্টিফেন গোমেজ (৬) হেমেন্দ্র রত্ন (৭) মানিকর রহমান (৮) যোসেফ গোমেজ (৯) রিচমণ্ড ডি'রোজারিও (১০) আলী আকবর (১১) ফণি ভূষণ নাথ (১২) স্টিফেন গোমেজ

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ ঃ (১) আব্দুল মতিন (২) চিত্ত হাওলাদার (৩) নরেন্দ্র মণ্ডল (৪) অমূল্য চ্যাটার্জী (৫) বেঞ্জামিন গোমেজ (৬) আব্দুল খালেক (৭) ফজলুল করিম

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ ঃ (১) আলবিন গোমেজ (২) দানিয়েল বালা (৩) মাহবুব আলম (৪) বিজয় চৌধুরী (৫) ফজলুল করিম (৬) সিরাজ উদ্দীন (৭) নির্মল সরকার

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ ঃ (১) ওয়াজেদ আলী (২) আবদুল রহমান (৩) হাবিবুর রহমান (৪) মনোরঞ্জন বাড়ৈ (৫) টোবায়েস গোমেজ (৬) ধীরেন্দ্র বৈদ্য (৭) নির্মলেন্দু নাথ (৮) সুধীর চক্রবর্তী (৯) অতুল চন্দ্র সরকার (১০) নারায়ন চন্দ্র পাল (১১) টমাস হালদার (১২) জেরোম মধু (১৩) বিজয় চৌধুরী (১৪) সিরাজউদ্দীন

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ ঃ (১) জগদীশ খাসকেল (২) ফিল্টন ডায়েস (৩) মুকুন্দ দাশ (৪) চিত্ত রঞ্জন হালদার (৫) গিলবার্ট হুইটলী (৬) শিমন বৈদ্য (৭) পিটার ডি'কস্তা (৮) টমাস দাশগুপ্ত (৯) আলবার্ট ডায়েস (১০) আবদুস সত্তার (১১) বজলুল হক (১২) নূর আহম্মেদ হাওলাদার (১৩) আব্দুল মজিদ

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ ঃ (১) এস. আগস্টিন গাইন (২) ম্যাথিও বাড়ৈ (৩) লুকাস ডি'রোজারিও (৪) সিলভেস্টার গোমেজ (৫) হিমাংশু কুমার চক্রবর্তী (৬) সত্য রঞ্জন দত্ত (৭) গাব্রিয়েল ফলিয়া (৮) সলিল কুমার বিশ্বাস (৯) এভেলিন গোমেজ (১০) জন হেনরী গণসালভেস (১১) আন্দ্রীয় বিনয় বাড়ৈ (১২) হারকেস যোসেফ গনসালভেস (১৩) ক্লিফোর্ড এলভারিচ পারছি (১৪) মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান (১৫) এইচ. এম. রহমাতুল আলম (১৬) মকবুল আহম্মেদ (১৭) সিরাজুদ্দিন আহম্মদ (১৮) মোহাম্মদ আব্দুল উল্লাহ (১৯) আব্দুল আজিজ খান (২০) মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আলম (২১) আব্দুল আজিত খাঁন (২২) এ.কে.এম. মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ (২৩) আব্দুস সাত্তার মিঞা

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ ঃ (১) সিলভেষ্টার গোমেজ (২) ম্যাথিউ রায় (৩) পিটার পাস্কাল ফলিয়া (৪) নিত্যানন্দ দাস (৫) পল ম্যাকফিল্ড গোমেজ (৬) বিমল চন্দ্র (৭) সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী (৮) সেবাস্টিয়ান গোমেজ (১০) বার্থেলেমেয় গোমেজ (১১) এভেলিন এন্টনী গোমেজ (১২) এলবার্ট গোমেজ (১৩) হিমাংশু চক্রবর্তী (১৪) মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৫) এ.কে. মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ খান (১৬) এ.কে. মোহাম্মদ আব্দুল মাজেদ (১৭) জবেদ আলী গাজী (১৮) আব্দুল সাত্তার খান (১৯) মোহাম্মদ সাত্তার মিঞা

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ ঃ (১) ফজলুল হক (২) আইউব আলী খান (৩) হেমায়েত উদ্দীন মিঞা (৪) মোহাম্মদ আজাহার উদ্দীন আহম্মেদ (৫) মজিবুর রহমান (৬) নবাব উল্লাহ মিঞা (৭) মোহাম্মদ ইসরাইল মোল্লা (৮) সৈয়দ আব্দুল মান্নান (৯) এথেল ডি'রোজারিও (১০) সুধীর রঞ্জন সরকার (১১) ভবরঞ্জন সাহা (১২) মানিকলাল সমাদ্দার (১৩) সুখরঞ্জন সাহা (১৪) রাফায়েল জর্জ পাড়ৈ (১৫) লুকাস মেন্ডিস (১৬) মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন (১৭) পল ম্যাকফিল্ড (১৮) মার্টিন গোমেজ (১৯) সরজ কুমার দাসগুপ্ত (২০) নিত্যানন্দ দাস (২১) নিখিল চন্দ্র দাস (২২) দিলীপ কুমার বন্দোপাধ্যায় (২৩) কমলাকান্ত অধিকারী (২৪) সদানন্দ কুন্ডু (২৫) উপেন্দ্রনাথ খাসকেল (২৬) নারায়ন চন্দ্র ঘোষ (২৭) উসা রঞ্জন ঠাকুর

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ ঃ (১) লক্ষী নারায়ন কর্মকার (২) আগষ্টিন গোমেজ (৩) কুমুদ রঞ্জন হালদার (৪) লুকাস মেন্ডিস (৫) অবনী মোহন দাশ (৬) নারায়ন চন্দ্র ঘোষ (৭) সুধীর রঞ্জন সরকার (৮) নারায়ন

প্রসাদ দাস (৯) নেপিয়ার ডি'কস্তা (১০) সুভাষ রঞ্জন হালদার (১১) নিখিল চন্দ্র দাস (১২) বেনেডিক্ট গোমেজ (১৩) সদানন্দ কুন্ডু (১৪) এম. ডি. আজাহার উদ্দীন আহম্মদ (১৫) এম.ডি. ফারুখ আলম মজুমদার (১৬) খোন্দকার বজলুর রহমান (১৭) এম. ডি. আলতাফ হোসেন (১৮) এম.ডি. ফিরোজ আলম মজুমদার (১৯) সৈয়দ মীর মোশারফ হোসেন (২০) এম.ডি. শাহাবুদ্দিন তালুকদার (২১) এম.ডি. নবাবউল্লাহ্ মিঞা (২২) মোল্লা এম.ডি. জহুরুল ইসলাম

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ ঃ (১) ফিলিপ হালদার (২) সুশীল দাস (৩) নিত্য নাথ (৪) বিজয় চক্রবর্তী (৫) সত্যরঞ্জন দাশ (৬) ফকরুদ্দিন (৭) আব্দুল বারেক (৮) রেজাউল করিম (৯) আলাউদ্দিন আহম্মেদ (১০) আব্দুর রহিম (১১) নজরুল ইসলাম (১২) হাতেম আলী (১৩) আনোয়ার উদ্দীন (১৪) মকিম আলী

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ ঃ (১) সাহাদাৎ ইসলাম (২) সুধীর নাথ (৩) মজিবুর রহমান (৪) মাহবুব আলম (৫) মোর্ডাজিৎ বিল্লাহ (৬) ওমর আলম (৭) ক্লেমেন্ট গোমেজ (৮) মুকছেদ আলী (৯) বেনেডিক্ট গোমেজ (১০) আগষ্টিন গোমেজ (১১) আব্দুল গনি হাওলাদার (১২) আব্দুল মজিদ (১৩) রবীন্দ্র দাশ (১৪) আবদুল রাজ্জাক (১৫) মং সেন হলাইন (১৬) আলতাফ হোসেইন (১৭) নুরুল ইসলাম হাওলাদার (১৮) মোজাম্মেল হক (১৯) বাসুদেব মুখার্জী (২০) আরমান পিনারু (২১) রাফায়েল ফার্নান্ডেস।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ ঃ (১) আব্দুল মন্নান (২) আবু ইউসুপ (৩) বজলুর রহমান শিকদার (৪) বেনেডিক্ট পল ডি'কস্তা (৫) সিজার জন পল গোমেজ (৬) ফজলুর রহমান (৭) হাবিবুর রহমান (৮) মহেন্দ্র চন্দ্র পাল (৯) মোয়াজ্জেম হোসেন মোল্লা (১০) মুঞ্জেল হোসেন (১১) রত্নেশ্বর চক্রবর্তী (১২) মং ছু লুউইন (১৩) মোহাম্মদ মজিবর রহমান (১৪) মোহাম্মদ মোতাজিদ বিল্লাহ (১৫) ওমর আলী (১৬) মোহাম্মদ ফকরউদ্দীন (১৭) উপেন্দ্রনাথ দাস

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ ঃ (১) ননী গোপাল দাস (২) মুহাম্মদ আশরাফ আলী খান (৩) আব্দুল ওয়াজেদ (৪) আব্দুল ওহাব খান (৫) আবু ইউসুপ মুহাম্মদ আলী (৬) মুহাম্মদ আবুল কাশেম খান (৭) আবু মজিদ মুহাম্মদ আব্দুল মন্নান শিকদার (৮) সৈয়দ মোশারফ হোসেন (৯) আব্দুল হাকিম মিঞা (১০) মুহাম্মদ সৈয়দউদ্দীন খান (১১) মোল্লা শফিউল ইসলাম (১২) মুহাম্মদ আব্দুল হাকিম (১৩) গৌর চন্দ্র নাথ (১৪) ব্রজবাসী গাইন (১৫) ফ্রান্সিস বৈদ্য (১৬) এডমন্ড ডায়েস (১৭) দেবাংশু সরকার (১৮) মোহনবাসী গাইন (১৯) শিশুরঞ্জন মণ্ডল (২০) আজাহার আলী (২১) আবদুল গনি খান (২২) কাসারমোহন পল গোমেজ (২৩) মোয়াজ্জেম হোসেন মোল্লা

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ ঃ (১) আবুল মনসুর মোহাম্মদ আবুল হালিম (২) এমরুস ডি'কস্তা (৩) আরমান্ড রয় (৪) হিরালাল বিশ্বাস (৬) ক্যানেট ব্রাউন (৭) মিল্টন গোমেজ (৮) সায়ফুল ইসলাম (৯) মুহাম্মদ আব্দর রশিদ হাওলাদার (১০) মুহাম্মদ আবদুস সোবাহান মিঞা (১১) মোহাম্মদ আবদুস কাসেম খান (১২) মুহাম্মদ আক্কাস আলী (১৩) বজলুর রহমান (১৪) মুহাম্মদ ফজলুর রহমান (১৫) লুৎফর রহমান (১৬) মুহাম্মদ মাজেদ আলী খান (১৭) মুহাম্মদ মুসলেম আলী (১৮) পল হালদার (১৯) রেজিন ম্যাকফিল্ড (২০) সুকুমার ঠাকুর

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ ঃ (১) সিছিল ডায়েস (২) এ.এইচ. অধিকারী (৩) সুবোধ চন্দ্র ব্যাপারী (৪) মতিলাল দাস (৫) যোসেফ ডি'কস্তা (৬) বেঞ্জামিন পালমা (৭) লিও গনছালভেস (৮) এ.বি. জহিরুল আলম

ফরজ মিঞা (৯) আহম্মদ আলী খান (১০) মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন (১১) মোহাম্মদ জয়নাল আবেদিন (১২) গবিউদ্দীন আহম্মেদ (১৩) মোহাম্মদ আব্দুল মোতালেব (১৪) এ.বি.এম. আব্দুল রাজ্জাক (১৫) আলী আকবর (১৬) এ.কে. মোহাম্মদ আব্দুল ওহাব (১৭) মোহাম্মদ ওয়াস্কেচ আলী (১৮) এ.এফ.এম হুমায়ুন করিম (১৯) শান্তি রঞ্জন মুখার্জী (২০) মোহাম্মদ আবুল হোসেন (২১) নরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য (২২) মোহাম্মদ শামছুল হুদা (২৩) প্রফুল্ল কুমার দাস (২৪) মোহাম্মদ ইউনুস মিঞা (২৫) মোহাম্মদ মোখছেদ আলী খান (২৬) মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম মিঞা (২৭) মোহাম্মদ মোতাহার মিঞা (২৮) এম.ডি. আবুল ইসলাম খান

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ ঃ (১) হরিসাধন দাস (২) পিটার রয় (৩) পল বাড়ৈ (৪) রেমন্ড হালদার (৫) স্বর্ণ বিমল নাথ (৬) সুশীল কুমার সরকার (৭) অলিভার রণজিৎ গোমেজ (৮) স্টিফেন গোমেজ (৯) পল গোমেজ (১০) মোহাম্মদ ফজলুর রহমান খান (১১) আলী আকবর হালদার (১২) আব্দুল কাদের হাওলাদার (১৩) মোহাম্মদ মৌজে আলী মিঞা (১৪) শামসুদ্দীন আহম্মদ (১৫) মোহাম্মদ জয়নাল আবেদিন হাওলাদার (১৬) মোহাম্মদ আব্দুল খালেক হাওলাদার (১৭) মোহাম্মদ আবদুস সালেম খান (১৮) রফিকউদ্দীন আহাম্মদ (১৯) মোহাম্মদ আব্দুল কাদের মিয়া (২০) আহাম্মদ আলী খান (২১) এ. কে. এম আব্দুল মিরেকান (২২) মোহাম্মদ আব্দুল খালেক মিঞা (২৩) মোহাম্মদ আব্দুল করিম (২৪) মোহাম্মদ আইউব আলী সিকদার (২৫) মোহাম্মদ আলী আকবর মিঞা (২৬) নুরুউদ্দীন আহম্মদ (২৭) আলী আকবর (২৮) মোহাম্মদ মিঞা (২৯) মোহাম্মদ মুতাজি মোল্লা

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ ঃ (১) ব্লিন গনছালভেস (২) এরিক গনছালভেস (৩) তিতুস ডি'কস্তা (৪) আলেকজান্ডার প্যারেরা (৫) লুডুবিক বালা (৬) স্টিফেন গোমেজ (৭) আলফ্রেড ডি'কস্তা (৮) যোসেফ সরকার (৯) ফ্রান্সিস রায় (১০) নরবার্ট গোমেজ (১১) পৌল বাড়ৈ (১২) ধীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য (১৩) বিবেকানন্দ নাথ (১৪) অহীন্দ্র কুমার রায় (১৫) এ.বি. এম সিদ্দিক মিয়া (১৬) মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন গাজী (১৭) মোহাম্মদ আবুল ওয়াসেম (১৮) আহম্মদ আলী খান (১৯) মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন মিয়া (২০) মোহহাম্মদ আলাউদ্দীন মিঞা (২১) মোহাম্মদ ফজলুল হক মিঞা (২২) আব্বাসীর মোহাম্মদ খালেদ (২৩) মোহাম্মদ আব্দুর রব (২৪) মোহাম্মদ আলী আকবর (২৫) মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক মিঞা (২৬) মোহাম্মদ আক্কাস আলী মিঞা (২৭) মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ (২৮) মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ (২৯) মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম (৩০) আবদুর রব শিকদার

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ ঃ (১) লাওনেল গোমেজ (২) নারায়ন দাস (৩) সুলতান আহম্মদ (৪) আব্দুস সাত্তার (৫) আলফ্রেড রায় (৬) গৌরাঙ্গ দাস (৭) সুশীল বোস (৮) আলী আকবর (৯) স্টিফেন গোমেজ (১০) ফিলিপ ডি'রোজারিও (১১) আব্দুর রব (১২) মণীন্দ্র থেটা (১৩) ধীরেন্দ্র নাথ সরকার (১৪) ললীত হালদার (১৫) হাবিবুর রহমান (১৬) লাজারেচ গনছালভেস (১৭) তারক সেন (১৮) আন্দ্রীয় বিশ্বাস (১৯) গৌরাঙ্গ পাল (২০) আজহার আলী (২১) আব্দুল এল. মুন্সী (২২) আলী আকবর শিকদার (২৩) আবদুল রহমান (২৪) শামসুল হক (২৫) সুলতান মিয়া (২৬) মোফাজ্জল হোসেন (২৭) মোহাম্মদ আবছারুদ্দিন (২৮) ওয়াজেদ আলী (২৯) যোগেন্দ্র নাথ (৩০) সিরাজুল ইসলাম (৩১) সুশীল কুমার সরকার

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ ঃ (১) আলী আকবর শিকদার (২) মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন (৩) মোহাম্মদ এস্কেন্দার বিশ্বাস (৪) তাজেম আলী খলিফা (৫) কুমচান আলী (৬) মোহাম্মদ হোসেন আলী খান (৭) আব্দুল খালেক (৮) মোহাম্মদ ফজলুর রহমান (৯) আব্দুল জলিল (১০) মোহাম্মদ মতিয়ার খান (১১) দেওয়ান হাবিবুল্লাহ (১২) এ.বি.এম. সিদ্দিক মিয়া (১৩) নূর মোহাম্মদ খান (১৪) আলাউদ্দিন আহমেদ (১৫) আবদুল লতিফ মুন্সী (১৬) মোহাম্মদ আব্দুস সত্তার (১৭) দুলাল চন্দ্র রায় (১৮) সাধন চন্দ্র বড়ুয়া (১৯) সুশীল কুমার বসু (২০) সুশীল কুমার সরকার (২১) জন পিটার গনছালভেস (২২) প্যাট্রিক হালদার (২৩) ইউজিন জলদাস (২৪) সুবল চন্দ্র দাস (২৫) দীজেন্দ্র লাল বিশ্বাস

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ ঃ (১) সুধীর কুমার ঘোষ (২) ফনিন্দ্রলাল দাস (৩) মোহাম্মদ শাহজাহান শিকদার (৪) খান হাবিবুর রহমান (৫) মোহাম্মদ বশীর আব্দুস সত্তার (৬) মোতাহার আলী হাওলাদার (৭) ফকরুদ্দিন আহম্মদ (৮) রামকান্ত গাঙ্গুলী (৯) আবদুল কালাম আজাদ খান (১০) মোহাম্মদ মুসলিম আলী খান (১১) চিত্তরঞ্জন দাস (১২) লিও পল হাওলাদার (১৩) প্লাসিড কুইয়া (১৪) কিরণ দাস (১৫) যোসেফ হালদার (১৬) রক ফার্ডিন্যান্ড গোমেজ (১৭) মোহাম্মদ খোরশেদ আলম (১৮) আলতাফউদ্দীন চৌধুরী (১৯) মোহাম্মদ আতাহার আলী হাওলাদার (২০) আলবার্ট গোমেজ (২১) যোসেফ মধু (২২) সিরাজুল ইসলাম।

(৮) সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুলের ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে অধ্যয়নরত ছাত্রদের শ্রেণি ওয়ারী তালিকা

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুলে অধ্যয়নরত ছাত্রদের তালিকা এখানে তুলে ধরতে চাই এজন্য যে তারা যখন ঐতিহাসিক পুস্তকটি পাঠ করবে তখন তারা তাদের মধুর স্মৃতি রোমান্থন করার সুবর্ণ সুযোগ পাবে। আবার ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাদের মধ্যে যারা ইতোমধ্যেই ধরাধাম ত্যাগ করেছেন তাদের সন্তানগণ এই পুস্তকে তাদের প্রিয়জনের নাম দেখে অবশ্যই গর্ববোধ করবেন।

দশম শ্রেণিঃ (১) আব্দুল আজিজ (২) আব্দুল হাই (৩) আব্দুল হাফিজ (৪) আবদুল মাজেদ (৫) আবদুল মান্নান (৬) আবদুল হাশেম মৃধা (৭) আবদুর রহিম খান (৮) আবদুস সত্তার(১) (৯) আবদুস সত্তার(২) (১০) অনিল চন্দ্র দাশ (১১) আনসার আলী (১২) আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (১৩) আতাহার আলী খান (১৪) আতাহার আলী শরীফ (১৫) ফজলুর রহমান (১৬) ফ্রান্সিস রড্রিক (১৭) যোসেফ ফলিয়া (১৮) লরেন্স গনছালভেস (১৯) মিলিগেন ডি'রোজারিও (২০) মোশারফ হোসেন (২১) মুসতাফিজুর রহমান (২২) মোহাম্মদ মীর ইসাক (২৩) নরেন্দ্র লাল হাওলাদার (২৪) নিকোলাস শিকদার (২৫) প্যাট্রিক ডি'রোজারিও (২৬) প্রফুল্ল চন্দ্র দাস (২৭) রমেশ চন্দ্র নাথ (২৮) সাদাত হোসেন (২৯) শৈলেন কুমার ভট্টাচার্য্যি (৩০) শামসুদ্দীন আহম্মদ (৩১) শের আলী মল্লিক (৩২) শামসুদ্দীন খান (৩৩) সৈয়দুল ইসলাম

নবম শ্রেণিঃ (১) আগষ্টিন পাড়ৈ (২) আন্দ্রিয় ঢালি (৩) অতুল চন্দ্র মণ্ডল (৪) আব্দুল খালেক(১) (৫) আবদুল মোতালেব (৬) আইউব আলী (৭) যুধিষ্ঠির দেবনাথ (৮) কাজী মাসুম (৯) কাজী মোতাহার হোসেন (১০) লাজারেচ গোমেজ(১) (১১) লাজারেচ গোমেজ(২) (১২) লুৎফর রহমান শিকদার (১৩) আব্দুল হালিম (১৪) এ.বি.এম সুলতান শাহআলম (১৫) অনিল মৃধা (১৬) আব্দুল হালিম(১)

(১৭) আব্দুল হালিম(২) (১৮) আবদুল রাজ্জাক (১৯) আব্দুল খালেক(২) (২০) আব্দুল খালেক(৩) (২১) আব্দুল বারেক (২২) আতিকুর রহমান (২৩) বিরেন্দ্র নাথ হাওলাদার (২৪) চিত্ত রঞ্জন দাশ (২৫) ডেভিড গুদা (২৬) ফকরুদ্দিন আহমেদ (২৭) গোলাম কবীর (২৮) হাবিবুর রহমান (২৯) আইজেক ডি'রোজারিও (৩০) আইজেক গোমেজ (৩১) জালাল হুসেন খান (৩২) মনিন্দ্র চন্দ্র দাশ (৩৩) মিল্টন গোমেজ (৩৪) মোতাহার হোসেন (৩৫) মার্টিন গোমেজ (৩৬) মোহাম্মদ ফজলুল হক (৩৭) নুরুল হুদা (৩৮) ডমিনিক দাশ (৩৯) নিমাই চন্দ্র দাশ (৪০) কামরুজ্জামান (৪১) রণজিৎ রায় (৪২) সুধীর ব্যাপারী (৪৩) সুনীল গোলদার (৪৪) সুকুমার রায় (৪৫) শাহজাহান খান (৪৬) শান্তি রঞ্জন পাল (৪৭) শাহাদাত ইসলাম (৪৮) তোফাজ্জল হুসেন (৪৯) যোতিন্দ্র নাথ কীর্ত্তনীয়া

অষ্টম শ্রেণি ''ক বিভাগ'': (১) আবদুল মন্নান মিয়া (২) আব্দুল মন্নান খান (৩) আব্দুল মন্নান হাওলাদার (৪) অনিল সরকার (৫) আব্দুল খালেক(১) (৬) আব্দুল খালেক(২) (৭) আব্দুল খালেক(৩) (৮) আহমদ হোসেন (৯) গডফ্রে এন্ড্রু গুদা (১০) জন কাম্পু (১১) কাজী মোখলেছুর রহমান (১২) লুৎফর খলিফা (১৩) লুৎফর রহমান (১৪) মহবত আলী আকন (১৫) নুরুল ইসলাম (১৬) নারায়ন চন্দ্র শীল (১৭) আতাহার হোসেন (১৮) আজাহার আলী হাওলাদার(১) (১৯) আজাহার আলী হাওলাদার(২) (২০) আব্দুর রশিদ হাওলাদার (২১) আবদুল বাশার (২২) আব্দুল বারেক মিঞা (২৩) বেঞ্জামিন গোমেজ (২৪) বিমল আনন্দ নাথ (২৫) বজলুর রহমান (২৬) ক্লিফোর্ড গনছালভেস (২৭) এডুয়ার্ড গোমেজ (২৮) ফ্রান্সিস গোমেজ (২৯) নিকুঞ্জ বিহারী মণ্ডল (৩০) নিত্যদেব মণ্ডল (৩১) পিজুস কান্তি দাস (৩২) রেমন্ড হাওলাদার (৩৩) রফিউল করিম (৩৪) সোহরাব আলী (৩৫) সাহেব আলী (৩৬) শাহ আলম (৩৭) শঙ্কর মিত্র (৩৮) উইলসন গোমেজ (৩৯) মোহাম্মদ আলী (৪০) জাকি আহম্মদ চৌধুরী

অষ্টম শ্রেণি ''খ বিভাগ'': (১) আলবার্ট গোমেজ (২) আবদুল মজিদ (৩) আনছার আলী খান (৪) আবদুল হামিদ (৫) আব্দুল হাই (৬) আমজেদ হোসেন (৭) আবদুল গফুর হাওলাদার (৮) আব্দুল বারেক (৯) আব্দুল খালেক (১০) আব্দুল আজিজ শিকদার (১১) আব্দুল রাজ্জাক (১২) আতাহার উদ্দীন আহম্মদ (১৩) আবদুর রব (১৪) আবদুল খালেক (১৫) আবদুস সাত্তার (১৬) জ্যোর্তিময় হালদার (১৭) মোস্তাফিজুর রহমান (১৮) মোতাহার উদ্দীন খান (১৯) নুরুল ইসলাম হাওলাদার (২০) নাসিরুদ্দিন মুন্সী (২১) প্যাট্রিক ডি'রোজারিও (২২) পল আন্তনী গোমেজ (২৩) রমেশ চন্দ্র সরকার (২৪) রাধেশ্যাম সিকদার (২৫) সুশীল কুমার ব্যাপারী (২৬) সৈয়দ শাহজাহান (২৭) শৈলেস চন্দ্র দাস (২৮) শাহজাহান হাওলাদার (২৯) বিজয় কৃষ্ণ দেবনাথ (৩০) দক্ষিণারঞ্জন দাস (৩১)ফনিন্দ্রলাল সরকার (৩২) গাব্রিয়েল গোমেজ (৩৩) গিয়াসউদ্দীন সিকদার (৩৪) সুখ রঞ্জন দাস (৩৫) সিরাজউদ্দীন হাওলাদার (৩৬) ইসাহাক আলী সিকদার (৩৭) রত্নেশ্বর সাহা

সপ্তম শ্রেণি ''ক বিভাগ'': (১) আনসার আলী আহমেদ (২) আবদুল বারেক (৩) আবেল গোমেজ (৪) আবদুল হাশেম হাওলাদার (৫) আবদুল কালাম আজাদ (৬) আবদুল লতিফ খান (৭) আবদুল মান্নান মিয়া (৮) বঙ্কিম চন্দ্র দে (৯) সেলেষ্টিন গোমেজ (১০) চিত্তরঞ্জন হাওলাদার (১১) এনায়েত হোসেন (১২) গৌরাঙ্গ চন্দ্র শীল (১৩) গনেশ চন্দ্র সাহা (১৪) হাবিবুর রহমান খান (১৫) হাবিবুর

রহমান হাওলাদার (১৬) হাতেম আলী খান (১৭) জলিলুর রহমান (১৮) জন ডি'রোজারিও (১৯) জয়নাল আবেদিন (২০) কৈলাশ চন্দ্র দাস (২১) কার্ত্তিক চন্দ্র দাস (২২) খলিলুর রহমান (২৩) ললিত শিকদার (২৪) মোতাহার আলী জোমাদ্দার (২৫) মোতাহার উদ্দীন আহমেদ (২৬) পঙ্কজ কান্তি কর্ম্মকার (২৭) ফিলিপ গোলদার (২৮) সিকান্দার আলী (২৯) সাহাদত হোসেন (৩০) সুধীর চন্দ্র দাস (৩১) তাজউদ্দীন আহমেদ (৩২) ইউকিং মঙ (৩৩) ওয়াজেদ আলী খান (৩৪) ইউসুপ আলী হাওলাদার (৩৫) হুসাইন আলী খান।

সপ্তম শ্রেণি ''খ বিভাগ'': (১) আবদুর রশিদ (২) আবদুল বারেক (৩) আবদুল লতিফ হাওলাদার (৪) আকবর আলী মিয়া (৫) আবদুল খালেক (৬) অমল চন্দ্র শীল (৭) বিজয় আনন্দ নাথ (৮) ধীরেন্দ্র চন্দ্র হাওলাদার (৯) ইউনুস মিয়া (১০) ফজলুর রহমান (১১) জয়নাল আবেদিন (১২) খগেন্দ্র লাল চক্রবর্ত্তী (১৩) ক্ষীরদ চন্দ্র মিস্ত্রী (১৪) খলিলুর রহমান (১৫) মতিয়ার রহমান শিকদার (১৬) মোশারফ হোসেন শিকদার (১৭) মতিয়ার রহমান খান (১৮) মোহাম্মদ নুরুজ্জামান (১৯) নুরুল ইসলাম (২০) নজরুল ইসলাম (২১) পল শিকদার (২২) ফিলিপ গোমেজ (২৩) রত্নেশ্বর সাহা (২৪) সোহরাব আলী (২৫) শাহ আলম (২৬) শের আলী গাজী (২৭) শওকত হোসেন (২৮) সুকুমার দাশ (২৯) সেলিম গাজী (৩০) জালাল আহমেদ (৩১) মিডিন ডি'রোজারিও (৩২) সেকেন্দার আলী (৩৩) নুরুল হক (৩৪) রুস্তম আলী

ষষ্ঠ শ্রেণি ''ক বিভাগ'': (১) আবদুল জব্বার (২) এন্টনী গোমেজ (৩) আব্দুল লতিফ(১) (৪) আবদুল সত্তার (৫) আবদুল মোতালেব (৬) আবদুল হামিদ (৭) আবদুল লতিফ (২) (৮) যুধীষ্ঠির চন্দ্র সাহা (৯) জুরানেশ্বর সাহা (১০) জালাল আহমদ (১১) কেরামত আলী (১২) মোজাম্মেল হোসেন (১৩) মুহম্মদ মহসীন (১৪) মোজাম্মেল হক (১৫) আব্দুস সত্তার (১৬) আবদুল বশির খান (১৭) আলতাফ হোসেন (১৮) আগষ্টিন গোমেজ (১৯) আরব আলী (২০) অতুল চন্দ্র হাওলাদার (২১) আসরাফ হোসেন (২২) বাদল গোমেজ (২৩) দেলোয়ার হোসেন (২৪) বার্টিন গুদা (২৫) দীলিপ কুমার দাস (২৬) ইসমাইল গাজী (২৭) মুহম্মদ রতন হোসেন (২৮) মুহাম্মদ হানিফ হাজরা (২৯) পুনরুদ্দান গুদা (৩০) প্রফুল্ল কুমার শীল (৩১) রমনী কান্ত শীল (৩২) রঞ্জিত কুমার দাশ (৩৩) সুশীল দেবনাথ (৩৪) সাখায়েত হোসেন (৩৫) শামছুল হক (৩৬) মুকুন্দ চন্দ্র দাস (৩৭) আবদুল মোতালেব আকন

ষষ্ঠ শ্রেণি ''খ বিভাগ'': (১) আবদুল কাদের (২) আবদুল লতিফ (৩) আবদুল মুতালিব (৪) আবদুল সোবাহান (৫) আবদুল কাশেম হাওলাদার (৬) আলবার্ট গোমেজ (৭) আলতাফ হুসাইন (৮) আনসার আলী (২) (৯) আতাহার আলী হাওলাদার (১০) আগষ্টিন বাড়ৈ (১১) দলিল উদ্দীন গাজী (১২) ধীরেন্দ্র নাথ দাস (১৩) দীলিপ কুমার দত্ত (১৪) ইউসুপ আলী খান (১৫) গনেশচন্দ্র সাহা (১৬) হরিপদ দাস (১৭) কাঞ্চন আলী খান (১৮) মোহাম্মদ আব্দুল মন্নান (১৯) মোহাম্মদ আনসার আলী হাওলাদার (২০) মোহাম্মদ ইউনুস মিঞা (২১) মমিন রশিদ (২২) নাজেম আলী খলিফা (২৩) নিতাই লাল দাস (২৪) নাসিরউদ্দীন আহম্মদ (২৫) প্রদীপ কুমার দত্ত (২৬) পুলিন কুমার ভট্টাচার্য্য (২৭) রাজেল হক (২৮) শাহজাহান আলী (২৯) ষ্টিফেন গোমেজ(১) (৩০) ষ্টিফেন গোমেজ(২) (৩১) সৈয়দ ফকরুদ্দিন (৩২) উইলফ্রেড গোমেজ (৩৩) আব্দুল মন্নান

পঞ্চম শ্রেণি ''ক বিভাগ'': (১) অনিল চন্দ্র মণ্ডল (২) আব্দুল খালেক (৩) আবদুল মোতালেব হাওলাদার (৪) আবদুল হামিদ হাওলাদার (৫) আইউব আলী খান (৬) আবদুস সাত্তার শিকদার (৭) আবদুর রশিদ মৃধা (৮) আলতাফ হোসেন (৯) আবদুল লতিফ (১০) আবদুস সোবাহান শিকদার (১১) আবদুল কাদের খান (১২) আশুতোষ মণ্ডল (১৩) আব্দুল আলী মীর (১৪) আবদুল মন্নান (১৫) আবদুস সোবাহান খান (১৬) বিরাজ চন্দ্র ব্যাপারী (১৭) ক্যামিল ডি'কস্তা (১৮) ক্লাউডিন এ্যালেক্স গোমেজ (১৯) দেলোয়ার হোসেন (২০) ধীরেন চন্দ্র শীল (২১) ধীরেন চন্দ্র সাহা (২২) ফিল্টন গোমেজ (২৩) ফিডালিস গোমেজ (২৪) গোলাম মুস্তফা(১) (২৫) গোলাম মুস্তফা(২) (২৬) গিলবার্ট গোমেজ(১) (২৭) গিলবার্ট গোমেজ(২) (২৮) গাব্রিয়েল ডি'রোজারিও (২৯) গোপাল চন্দ্র শীল (৩০) কামিনী মোহন দাস (৩১) হরি নারায়ন বসু (৩২) কাঞ্চন আলী (৩৩) কৃষ্ণকান্ত শীল (৩৪) মুহাম্মদ রাজা চৌধুরী (৩৫) মার্টিন গোমেজ (৩৬) মুহম্মদ আলতাফ হোসেন (৩৭) নুরুল হক (৩৮) নুর মোহাম্মদ (৩৯) প্রিয়লাল দাস (৪০) রাজেশ্বর সাহা (৪১) পরিমল দাস (৪২) রাধ্যেশ্যাম মালাকার (৪৩) রত্নেশ্বর কর্মকার (৪৪) শান্তি রঞ্জন দাস (৪৫) সাহেব আলী (৪৬) শাহজাহান আলী খান (৪৭) সতীস চন্দ্র সাহা (৪৮) সুলতান আহম্মদ

পঞ্চম শ্রেণি ''ক বিভাগ'': (১) আকবর আলী (২) আকবর আলী হাওলাদার (৩) আবদুল লতিফ হাওলাদার (৪) আবদুল মালেক খান (৫) আবদুল রশিদ মিঞা (৬) আবদুল মন্নান খান (৭) আব্দুল আজিজ খান (৮) আব্দুল মজিদ মোল্লা (৯) আবদুল রশিদ হাওলাদার (১০) আবদুল খালেক (১১) আবদুল হোসেন মোল্লা (১২) আবদুল সাত্তার (১৩) আবদুস সোবাহান (১৪) আবু ইউনুস (১৫) আলাউদ্দীন খান (১৬) আবদুর রহমান (১৭) আলী হোসেন (১৮) আমীর হোসেন (১৯) অনিল চন্দ্র সাহা (২০) ক্লারেন্স গোমেজ (২১) ডেনিস গোমেজ (২২) আনসার আলী (২৩) ফজলুর রহমান (২৪) হরেন চন্দ্র শীল (২৫) হরেন চন্দ্র নাথ (২৬) সাহাদর আলী (২৭) হোসেন আহাম্মদ (২৮) মোহাম্মদ মোতালেব আলী খান (২৯) মোহাম্মদ মকবুল আলী হাওলাদার (৩০) মোহাম্মদ মজিবর আলী রহমান (৩১) মোহাম্মদ মোজাফর হোসেন (৩২) মোহাম্মদ মোকলেশ্বর ররহমান (৩৩) মার্টিন গোমেজ (৩৪) নুরুল হোসেন(১) (৩৫) নুরুল হোসেন(২) (৩৬) পিটার গোমেজ (৩৭) রুস্তম আলী (৩৮) রাখাল বিশ্বাস (৩৯) বিনোদ বিহারী দাস (৪০) সুধাংশু কুমার নাথ (৪১) সেলিম জোমাদ্দার (৪২) সুশীল চন্দ্র দাস (৪৩) সাহাবুদ্দিন হাওলাদার (৪৪) সুধীর ব্যাপারী (৪৫) থিওডর গোমেজ (৪৬) ওরাবেন গোমেজ (৪৭) জেভিয়ার ডি'রোজারিও (৪৮) মিডিন কাম্পু।

সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুলটি প্রথম থেকে কেবল বালকদের জন্যে শিক্ষার আয়োজন করে। সেজন্যেই আমরা দেখতে পাই যে কোন শ্রেণিতেই বালিকা বা ছাত্রী ছিল না। তখন পাদ্রীশিবপুর গ্রামের মেয়েরা যে লেখাপড়া করেনি এমনটি নয় তারা বিভিন্ন গুরুগৃহে তাদের শিক্ষা অর্জন করতো। এজন্যই আমরা গুরুমহাশয়, পন্ডিত ইত্যাদি পরিবারের পরিচয় পাই। বিষয়টি নিয়ে প্রচুর গবেষণা প্রয়োজন রয়েছে। তবে পাকিস্তান শাসন আমলেরই কোন এক সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তি করা হয়। অন্য কথায় বলা যায় ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও যাতে শিক্ষার আলো পেতে পারে তার জন্যে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত কো-এডুকেশন সিস্টেম চালু করা হয়েছিল। ফলে আমাদের গ্রামের অনেক মেয়েই প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। পাদ্রীশিবপুরে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে বরিশালে প্রভাতী স্কুলে লেখাপড়া

করতো। আমাদের গ্রামের অনেক মেয়েই বরিশাল থেকেই এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাশ করে এবং পরবর্তীতে তাদের মধ্যে কেউ কেউ পাদ্রীশিবপুর সেন্ট আলফ্রেড স্কুলে শিক্ষকতাও করেছেন। এবিষয়ে স্কুলের ইতিহাসের পরবর্তী অংশে বিশদ তুলে ধরা হবে।

১। ব্রাদার গডফ্রে, সিএসসি - প্রধান শিক্ষক
২। ব্রাদার ফ্লেবিয়ান, সিএসসি-শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক
৩। নিকোলাস ডি'কস্তা-শিক্ষক
৪। হর প্রসন্ন চক্রবর্তী - শিক্ষক
৫। সতীস চন্দ্র ঘোষ - প্রধান শিক্ষক
৬। আব্দুল হাসেম মোল্লা - শিক্ষক
৭। লালজন গোমেজ -শিক্ষক
৮। কেশব চন্দ্র চক্রবর্তী -শিক্ষক
৯। মৌলভী আব্দুর রাজ্জাক - প্রধান মৌলভী
১০। রেভারেণ্ড ব্রাদার এমরোজ, সিএসসি - শিক্ষক
১১। রেভারেণ্ড ব্রাদার লেপ্, সিএসসি- শিক্ষক
১২। বাবু বিনয় রঞ্জন সেন - শিক্ষক
১৩। মি. পল গুদা - শিক্ষক
১৪। মি. জন গোমেজ -শিক্ষক
১৫। ব্রাদার জি. মাটিন, সিএসসি - প্রধান শিক্ষক
১৬। বাবু রাজেন্দ্র মোহন নাথ - শিক্ষক
১৭। বাবু দেবদাস মুখার্জী - শিক্ষক
১৮। নূর মোহাম্মদ শিকদার - শিক্ষক
১৯। ব্রাদার এলড্রিক, সিএসসি-প্রধান শিক্ষক
২০। ব্রাদার এডোয়ার্ড, সিএসসি- শিক্ষক
২১। বাবু হরিদাস মুখার্জী - শিক্ষক
২২। ব্রাদার গিলবার্ট, সিএসসি -শিক্ষক
২৩। মি. শলমন হালদার - শিক্ষক
২৪। বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত - শিক্ষক
২৫। মি. পিটার সাহা - শিক্ষক
২৬। ব্রাদার গেস্টিন, সিএসসি- প্রধান শিক্ষক
২৭। মি. পিটার পল গোমেজ - শিক্ষক
২৮। মি. কে.বি. সমাদ্দার - শিক্ষক
২৯। মি. টি. এম. সিদ্দিক - শিক্ষক
৩০। বাবু হরলাল ব্যানার্জী -শিক্ষক
৩১। বাবু গনেশ চন্দ্র ঘোষ - শিক্ষক
৩২। মি. আব্দুল আলী - শিক্ষক
৩৩। বাবু প্রিয়লাল ব্যানার্জী - শিক্ষক
৩৪। মি. চিত্ত রঞ্জন হাওলাদার - শিক্ষক
৩৫। বাবু জিতেন্দ্র বোস - শিক্ষক
৩৬। মি. মনিকুর রহমান - শিক্ষক
৩৭। বাবু দিনেশ চন্দ্র ব্যানার্জী - শিক্ষক
৩৮। ব্রাদার পল, সিএসসি - প্রধান শিক্ষক
৩৯। বাবু জিতেন্দ্র বোস - শিক্ষক
৪০। ব্রাদার রিচার্ড, সিএসসি - শিক্ষক
৪১। মি. এডোয়ার্ড এম.সি. ইনারনি - শিক্ষক
৪২। ব্রাদার রবার্ট, সিএসসি - প্রধান শিক্ষক
৪৩। ব্রাদার লিও, সিএসসি- শিক্ষক
৪৪। বাবু বিনয় ভূষন দেবনাথ - শিক্ষক
৪৫। ব্রাদার ম্যাডোর, সিএসসি - শিক্ষক
৪৬। ব্রাদার জর্লাথ, সিএসসি - শিক্ষক
৪৭। মোহাম্মদ মাহবুব আলম - শিক্ষক
৪৮। বাবু লক্ষী কুমার দাস - শিক্ষক
৪৯। বাবু নগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস - শিক্ষক
৫০। মৌলভী মোতাসিম বিল্লহ্ - শিক্ষক
৫১। মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার - শিক্ষক
৫২। মি. সিলভেস্টার গোমেজ - শিক্ষক
৫৩। ব্রাদার মবেন ব্যাপ্টিস্ট, সিএসসি - শিক্ষক
৫৪। মৌলভী মোরছের রহমান - শিক্ষক
৫৫। মি. সামছুল হক - শিক্ষক
৫৬। মৌলভী আলাউদ্দিন - শিক্ষক
৫৭। ব্রাদার হ্যামেল, সিএসসি - সহকারী প্রধান শিক্ষক
৫৮। বাবু সুখেন্দ্র মুখার্জী - শিক্ষক
৫৯। মৌলভী হাতেম আলী - শিক্ষক
৬০। মি. আলফ্রেড হালদার - শিক্ষক
৬১। ব্রাদার গ্রান্ডমন্ড, সিএসসি - শিক্ষক
৬২। ব্রাদার লরেন্স ডায়েস, সিএসসি - শিক্ষক
৬৩। মি. ফজলুর রহমান - শিক্ষক
৬৪। মি. রেমন্ড হালদার - কেরাণী

৬৫। বাবু রসিক লাল বাড়ৈ- শিক্ষক
৬৬। মি. ফ্রান্সিস সরকার - শিক্ষক
৬৭। মি. ভেনানসিও ডি'কস্তা - কেরাণী
৬৮। মি. আব্দুল গনি - শিক্ষক
৬৯। বাবু সুশীল সরকার - কেরানী
৭০। মোহাম্মদ ইউনুস ভুইয়া - শিক্ষক
৭১। মৌলভী রফিকউদ্দীন - শিক্ষক
৭২। বাবু বিজয় কৃষ্ণ কুন্ডু - শিক্ষক
৭৩। মোহাম্মদ মকবুল আহম্মদ - শিক্ষক
৭৪। বাবু নরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য - শিক্ষক
৭৫। মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল - শিক্ষক
৭৬। বাবু অনিল চন্দ্র দাস - শিক্ষক
৭৭। বাবু সুবোধ চন্দ্র ব্যাপারী - শিক্ষক
৭৮। মোহাম্মদ আকরাম হোসেন- শিক্ষক
৭৯। মোহাম্মদ মোনজেল হোসেন - শিক্ষক
৮০। মি. আগষ্টিন গোমেজ - শিক্ষক
৮১। মোহাম্মদ সৈয়দ আহম্মদ - শিক্ষক

॥ ঘ ॥ সেন্ট আলফ্রেড স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ব্রাদার ডেনিস গডফ্রে, সিএসসি-এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি[৪]

লেখক: জনাব আনোয়ার উদ্দিন আহাম্মদ (নান্না মিঞা)

শ্রদ্ধেয় ব্রাদার গডফ্রে, সিএসসি-এর আর তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর স্মৃতিচারণ করেন জনাব আনোয়ার উদ্দিন আহাম্মদ (নান্না মিয়া) যিনি তাঁর ছাত্র ছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এই স্মৃতিচারণমূলক লেখাটি সংকলিত হয়েছে স্কুলের ম্যাগাজিন ''প্রদীপ'' থেকে। কিছুটা সম্পাদনা করে তাঁর লেখাটি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

যুগে যুগে এ পৃথিবীতে কিছু মহান মানুষের আবির্ভাব হয় যারা জগতের বিশাল কল্যাণে আত্মনিবেদন করে থাকেন। মানুষ যখন সাধারণ একটি শিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করে তখন সে কালক্রমে বয়োপ্রাপ্ত হয়, বেড়ে ওঠে দেহে, মনে ও জ্ঞানে। আর এদের মাঝেই এমন মানুষ সৃষ্টি হয় যিনি পরোপকার এবং জনহিতকর কাজে নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে বিলিয়ে দেন। আমরা জানি মানুষ মরণশীল। প্রত্যেক মানুষই মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ মরণের পরেও বেঁচে থাকেন মানুষের মনের কোঠায় তাঁদের মহান কর্মের মাধ্যমে। সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুলের মাননীয় প্রতিষ্ঠাতা রেভারেণ্ড ব্রাদার গডফ্রে, সিএসসিও তেমনি একজন আলোকিত মানুষ যিনি মরণের পরেও বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকবেন আমাদের সকলের হৃদয়ে চিরকাল। কবির ভাষায় বলা যায়ঃ

'' ধরার মাঝে অমর আমি
কীর্তি আমার নাম,
সদাই ঘুরি মনের মাঝে
স্বর্গ আমার ধাম।''

ব্রাদার গডফ্রে ২২শে আগস্ট ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে বিকাল বেলা প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত হন, দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর ২৬ জুলাই ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে কানাডার মন্ট্রিয়াল শহরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ব্রাদার গডফ্রে, সিএসসি ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। দীর্ঘদিন আমি তাঁর স্নেহভাজন ছাত্র ছিলাম। তাঁর কর্মময় জীবনের কিছু কথা না লিখলে নিজেকে অকৃতজ্ঞ মনে হয়।

[৪]দ্র: সেন্ট আলফ্রেড স্কুল: রজত জয়ন্তী স্মরণিকা – ১৯৫৮ খ্রি.

ব্রাদার গডফ্রে, সিএসসি এর জীবনী সম্পর্কে পাওয়া যায় রেভারেণ্ড ব্রাদার এলবারিক, সিএসসি এর "A Giant of a man" বই থেকে এবং ব্রাদারের প্রথম জীবনের ছাত্র আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক স্বর্গীয় পল গুদা ও ব্রাদারের বিশ্বস্ত কর্মচারী মি. যোসেফ গোমেজের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে। তাদের তথ্যের ভিত্তিতে ব্রাদার গডফ্রের জীবনকাল সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে লিখছি। আমার অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির জন্য বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থী। মন্ট্রিয়াল শহর থেকে ৭০ মাইল উত্তরে সেন্ট ডেভিড গ্রামে একটি সম্ভ্রান্ত ডেনিস পরিবারে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মে ব্রাদার গডফ্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্যকালের নাম হেনরী ডেনিস, পিতার নাম গডফ্রে ডেনিস। তাঁরা পাঁচ ভাই, চার বোন এবং তাঁর নিকটতম সহোদর যোষেফ ডেনিস। তাঁর পিতা একজন ব্যবসায়ী ছিলেন, মাতা ধর্মপরায়না গৃহিনী। তাঁর বাল্য শিক্ষা সেন্ট ডেভিড স্কুলে এবং পরবর্তীতে ১৯১১-১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কাসিয়ারি কলেজে পড়াশুনা করেন।

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেন্ট লরেন্স কলেজ, মন্ট্রিয়াল, হেনরি ডেনিস ও যোষেফ ডেনিস দুই সহোদর খুব মেধাবী ও খেলাধুলায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁদের মাঝে ছিল খুবই সুসম্পর্ক যেন দুজনে হরিহর আত্মা।

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেন্ট যোসেফ একাডেমির মেধাবী ছাত্র হিসেবে তিনি সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কুইবেক হতে একাডেমিক ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে মন্ট্রিয়াল বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডিপ্লোমা-ইন-ফিজিওলজি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে মন্ট্রিয়াল বিশ্ববিদ্যালয় হতে উচ্চতর বোটানী ডিগ্রি লাভ করেন।

মিশনারী প্রথা আছে ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার হবার সময় যদি কেউ ইচ্ছে করেন তবে তাঁর বাল্য নাম পরিবর্তন করে আপন গুরুজন অথবা প্রয়াত কোন ধর্মযাজকের নাম অনুসারে নিজ নাম রাখতে পারবেন। হেনরী ডেনিস যখন ব্রাদার হিসেবে ব্রত গ্রহণ করেন তখন তিনি তাঁর পিতার নাম অনুসারে নিজ নাম রাখেন গডফ্রে ডেনিস এবং তাঁর সহোদর যোষেফ ডেনিস একইভাবে নিজ নাম রাখেন এলড্রিক ডেনিস। ব্রাদার গডফ্রের একজন বোন জন অব আরক সম্প্রদায়ের সিস্টার হিসেবে ব্রত গ্রহণের সময় নিজের মাতার নাম অনুসারে তাঁর নাম রাখেন অলিভিন এবং অপর বোন ট্রিজা সিস্টারের ব্রত গ্রহণ করলেও নিজের নাম অপরিবর্তিত রাখেন। অর্থাৎ সিস্টার হবার পরে তাঁর পরিচিতি হয় সিস্টার ট্রিজা হিসেবেই।

আমাদের জীবনে নিয়তির লীলাখেলা আমরা বুঝতে পারিনা। যারা অলৌকিক শক্তির অধিকারী তারা হয়তো বুঝেন। তবে বিশেষ কিছু প্রকাশ করেন না। হয়তো ব্রাদার গডফ্রে ছিলেন অলৌকিক শক্তির অধিকারী। তাই বাংলার মাটি তাঁকে ডাক দিল– "ব্রাদার তুমি আসো, তোমার সহোদরকে নিয়ে বাংলার অন্ধকার দূর করতে।"

তাই মন্ট্রিয়ালের আকাশ, বাতাস, মাটি তাদেরকে ধরে রাখতে পারলো না। বাংলার ডাকে সাড়া দিয়ে ব্রাদার গডফ্রে ও ব্রাদার এলড্রিক ৫ অক্টোবর ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে সকাল ৭ঃ৩০ মিনিটে মন্ট্রিয়াল হতে নিউইয়র্ক যাত্রা করেন। তাঁদের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয় স্বজন ও ছাত্রগণ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় দেন। পিতা-মাতা কেঁদে চোখের জল মুছতে মুছতে বাড়ি ফিরে যান। ঐদিনই তারা নিউইয়র্ক শহরে পৌঁছেন। কিছুদিন বিশ্রামের পরে জাহাজযোগে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপের

হাভারি শহর থেকে জাহাজযোগে ২৩ নভেম্বর ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে কলম্বো পৌছেন। কলম্বো থেকে ঢাকা পৌছেন এবং ঢাকা থেকে বান্দুরা যান। সেখানে কিছুদিন বিশ্রামের পর চট্টগ্রাম আসেন।

জানুয়ারি ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রাদার গডফ্রে ও তাঁর সহোদর ব্রাদার এলড্রিক চট্টগ্রামে সেন্ট প্লাসিড স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। তখন সেন্ট প্লাসিড স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন রেভারেণ্ড ব্রাদার এমরোজ, সিএসসি। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ব্রাদার গডফ্রে ডেনিস, সিএসসি সেন্ট প্লাসিড স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। এতদিন সেন্ট প্লাসিডস্ স্কুলের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুমোদন ছিল না। কারণ স্কুল অনুমোদনের জন্যে যেসব শর্ত পূরণ প্রযোজ্য তা সেন্ট প্লাসিড স্কুলের ছিল না। স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি থাকা আবশ্যক। তাই ব্রাদার গডফ্রে ঐ বছরই ২২ ফেব্রুয়ারি সেন্ট প্লাসিড স্কুলের জন্য চার একর জমি হুকুম দখল করেন এবং নতুন স্কুল বিল্ডিং নির্মাণ করেন। স্কুলের নতুন ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.পি.আই ও তাঁর পত্নী। এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশপ, ফাদার, ব্রাদার, সাংবাদিক ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। উপস্থিত সকলেই ব্রাদার গডফ্রের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট প্লাসিড স্কুল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে।

পাদ্রীশিবপুর জোনাকী পোকার আলোর মত টিপ টিপ করে জ্বলছিলো সেন্ট এন্থনী মাইনর ইংরেজি স্কুল। এই সময় এতদাঞ্চলে চন্দ্রের মতো শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে মহামান্য বিশপ আলফ্রেড লাপায়ার ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ব্রাদার গডফ্রেকে তাঁর সহকর্মী ব্রাদার ফ্লেবিয়ানসহ পাদ্রীশিবপুরে প্রেরণ করেন। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি হাই স্কুলের নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে ৭ম-৮ম শ্রেণি নিয়ে হাই স্কুলের কার্যক্রম শুরু করেন। সেন্ট এন্থনী মাইনর ইংরেজি স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু সতীশ চন্দ্র ঘোষ, স্কুলের নাম পরিবর্তন করে সেন্ট আলফ্রেড নাম রাখার প্রস্তাব করেন। এবং সকলে তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

তবে সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুল নামকরণের বিষয়ে ভিন্নমতও রয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে চট্টগ্রামের মহামান্য বিশপ আলফ্রেড লাপাইয়োর নাম অনুসারেই স্কুলের নামকরণ করার প্রস্তাব ছিল। তবে মহামান্য বিশপের নামের পূর্বে সেন্ট উপাধি না থাকায় বিশপ গভীরভাবে এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেন। তিনি দেখতে পান যে কয়েক শতাব্দি পূর্বে সেন্ট আলফ্রেড নামে একজন ধর্মযাজক ছিলেন। তিনি তখনকার পোপ মহোদয় কর্তৃক ধন্য শ্রেণিভূক্ত হয়েছিলেন। তাই ব্রাদার গডফ্রে যখন বিশপের নামানুসারে পাদ্রীশিবপুর স্কুলের নামকরণ করার বাসনা প্রকাশ করলেন তখন বিশপ মনে করলেন তাঁর অতি শিশুকালে পিতামাতা যে মহান পুরুষের নাম অনুকরণ করে তাঁর নাম রেখেছেন তিনি সেই সে মহান সাধুর নাম অনুসারেই পাদ্রীশিবপুর স্কুলের নামকরণ করবেন। আর এর পরেই মহামান্য বিশপ আলফ্রেড লাপায়ার পাদ্রীশিবপুর স্কুলের নাম রাখলেন ''সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুল''। প্রকৃত মহাজ্ঞানীর আদর্শ এমনই হয়।

সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক ব্রাদার গডফ্রে ডেনিস, সিএসসি ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে ব্রাদার ফ্লেবিয়ানকে দ্বিতীয় প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করে পাদ্রীশিবপুর থেকে চট্টগ্রাম চলে যান। ব্রাদারের বিদায়ে পাদ্রীশিবপুরবাসী খুব দুঃখ প্রকাশ করে।

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ব্রাদার গডফ্রে একদল ফাদার, ব্রাদারসহ লুসাই প্রদেশের রাজধানী আইজল যান। আইজলের দূর দূরান্তে বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে স্থানীয় জনসাধারণের সাথে মত বিনিময় করেন। সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনায় আইজলবাসী মুগ্ধ হন।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ব্রাদার চট্টগ্রাম ফিরে আসেন এবং সেন্ট প্লাসিড স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। ছাত্রদের নিয়া (King's Jubilee) রাজকীয় জুবিলীতে যোগদান করেন এবং বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন। কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন অফিসে আলাপ আলোচনা করে ১২৫ x ২৫ সেন্ট প্লাসিড স্কুলের শাখা বিল্ডিং নির্মাণ করেন। ব্রাদার গডফ্রে সেন্ট প্লাসিড স্কুলেরও প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর কাজকর্ম ছিল টারজানের মতো।

চট্টগ্রামের ডিসি, রেলওয়ে কোম্পানীর ডায়রেক্টর, বড় বড় মার্সেন্ট ও রাজনৈতিক নেতাদের সাথে সুসম্পর্ক থাকায় ব্রাদার চট্টগ্রামের সর্বস্তরের জনগণের জনপ্রিয়তা লাভ করেন। ব্রাদার সেন্ট প্লাসিড স্কুল থেকে উচ্চ শিক্ষার জন্য কানাডা যান। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে তিনি কানাডা থেকে বাংলাদেশে আসেন। চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের মহামান্য বিশপ ব্রাদার গডফ্রেকে নোয়াখালিতে নিযুক্ত করেন। নোয়াখালী খ্রিস্টান গ্রাম থেকে স্কুল দূরে অবস্থিত ছিল। ব্রাদার সোনাপুরে চার একর জমি হুকুম দখল করেন এবং নতুন স্কুল বিল্ডিং নির্মাণ করে নতুন স্কুল স্থাপন করেন। স্কুলের নাম রাখেন ব্রাদার আন্দ্রেস হাই স্কুল। এর দুই বছর পর ব্রাদার গোপালপুরে চার একর জমি হুকুম দখল করেন। এজন্য মহামান্য বিশপ ৪৭,০০০/= টাকা প্রদান করেন। নতুন স্কুল নির্মাণের টাকা বিশপের তহবিলে না থাকায় ব্রাদার চট্টগ্রামে যাদের রেলওয়ে কোম্পানীতে চাকুরী দিয়েছেন তাদের কাছ থেকে, বণিকদের এবং বিশিষ্ট ধনী বন্ধুদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে নতুন স্কুল বিল্ডিং নির্মাণ করেন। প্রথম বছর ১ম শ্রেণি থেকে ৭ম শ্রেণি এবং ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ৮ম শ্রেণির পাঠক্রম চালু করেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি নোয়াখালি থেকে দ্বিতীয়বার পাদ্রীশিবপুর সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুলের ৫ম শ্রেণিতে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। তাঁর সহকর্মী ব্রাদার গেষ্টিন ও ব্রাদার ফ্লেবিয়ান, বিগত আট বছরে স্কুলের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও ছাত্র সংখ্যার বৃদ্ধি দেখে আনন্দিত হন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানীদের চট্টগ্রাম আক্রমণের ভয়ে সেন্ট প্লাসিডস্ স্কুলের ছাত্র, শিক্ষকদের পাদ্রীশিবপুরে নিয়ে আসেন। তাদের বসবাসের যাবতীয় ব্যবস্থা ব্রাদার করেন। সকাল ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত সেন্ট প্লাসিড স্কুলের ছাত্ররা সেন্ট আলফ্রেডস্ স্কুলে ক্লাস করতো। ১০ঃ ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সেন্ট আলফ্রেডস্ স্কুলের নিজস্ব ছাত্ররা ক্লাস করতো। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সেন্ট প্লাসিড হাইস্কুলের ছাত্র-শিক্ষক সবাই চট্টগ্রাম ফিরে যায়।

প্রাইমারী শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ আবশ্যক বিধায় পাদ্রীশিবপুর প্রাইমারী সেন্টার খোলেন এবং এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করে তদানিন্তন বৃটিশ সরকার, যা ব্রাদার গডফ্রের যোগাযোগের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। গ্রামের গরীব লোকেরা অনাহারে অর্ধাহারে দিন যাপন করতে লাগলেন। এহেন দৃশ্য দেখে ব্রাদারের হৃদয় দুঃখ ভারাক্রান্ত হলো। ২০ আগস্ট ১৫০

জন গরীব লোককে বিনামূল্যে তিনি খাবারের ব্যবস্থা করলেন। ক্রমে ক্রমে এই খাবারের ব্যবস্থা ৩০০ জনের জন্যে উন্নীত হলো। আর ব্রাদারের প্রচেষ্টায় এই খরচ তখনকার সরকার বহন করতো। ব্রাদার গ্যাস্টিন নঙ্গরখানার যাবতীয় কাজকর্ম তদারকি করতেন। ব্রাদার গডফ্রে ছিলেন সর্বজাতীয় মঙ্গল দূত। তাঁর কাছে কোন প্রকার জাতিভেদ ছিল না। তিনি জানতেন, পৃথিবীতে মাত্র একটি জাতি বাস করে সে জাতি মানব জাতি। তাই তিনি যা কিছু করেছেন তা মানব জাতির মঙ্গলের জন্যেই করেছেন। ব্রাদার গডফ্রে চট্টগ্রাম ধর্মপদেশের মহামান্য বিশপের অনুমতিক্রমে পাদ্রীশিবপুরে একটি এতিম স্কুল (অরফানাইজ) আরম্ভ করেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বিভিন্ন এলাকার ২০০ জন ছাত্র নিয়ে প্রথম এতিম স্কুল খোলেন। এজন্য মহামান্য বিশপ ব্রাদারকে ২৯,০০০/= টাকা প্রদান করেন। বাকি খরচ বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত সাহায্য দিয়ে মেটানো হতো। এক বছর যুক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী মরহুম শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের কাছ থেকে এককালীন ৬০,০০০/= টাকা এতিম খানার খরচের জন্য এনেছিলেন। এতিম ছেলেদের শুধু বিদ্যা শিক্ষাই দেন নাই সেই সঙ্গে তাঁত, বয়ন শিল্প, দর্জি প্রশিক্ষণ, কাঠ মিস্ত্রির কাজ ইত্যাদির শিক্ষারও ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে তারা কর্মক্ষম হয় এবং নিজেরাই স্বাবলম্বী হয়ে নিজ নিজ পরিবারের খরচ বহন করতে পারে। তিনি যখন এই সকল মহান কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং জনহিতকল্পে খুব ব্যস্ত ছিলেন এই সময় সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছানুসারে ব্রাদারের জীবনে একটি শোকবহ ঘটনা ঘটলো। স্রস্টার ডাকে সাড়া দিয়ে ব্রাদারের মা অলিভিন ডেনিস পরলোকগমন করেন।

২২ ডিসেম্বর ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে বুধবার হঠাৎ এক টেলিগ্রামে জানতে পারলেন যে তার মমতাময়ী মা দেহত্যাগ করেছেন। এ সংবাদে ব্রাদার মনে খুব কষ্ট পান এবং কিছুটা ভেঙ্গে পড়েন। তিনি এ বষয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন। তবে তাঁর মায়ের মৃত্যুর বিষয়ে তিনি বিস্তারিত জানেত পারেন তাঁর বোন সিস্টার ট্রিজার লেখা চিঠির মাধ্যমে। তিনি এই চিঠিঠি পেয়েছিলেন ৬ জানুয়ারি ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে।

আমাদের স্কুলের যে বিশাল খেলার মাঠ রয়েছে এখানেও ব্রাদারের বিশেষ অবদান রয়েছে। এই মাঠটি ছিল কৃষ্ণকাঠির কৈলু পরিবারের সম্পত্তি। তিনি তাদের কাছ থেকে উক্ত জমি গ্রহণ করেন এবং ছাত্রদের খেলাধুলার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হন। এতিম স্কুল, প্রাইমারী ট্রেনিং স্কুলের জমি হুকুম দখল করেন। তৎকালীন জমিদার সি.এফ. ডি'সিলভার সাথে এর ফলে মামলা মোকদ্দমা হয়। ব্রাদার কলিকাতা আদালত থেকে উক্ত জমির উপর হুকুম দখলের ডিক্রি লাভ করেন। বর্তমান ছাত্রী হোস্টল (সিস্টার বাড়ি) ও ছোট খেলার মাঠ ইত্যাদি উক্ত মামলায় জয়ী হবার ফসল। এগ্রিকালচার ডেভলপমেন্ট সেন্টার (এ.ডি.সি) বর্তমান খ্রিস্টান দুঃস্থ শিশু ছাত্রাবাস (হোম) যেখানে অবস্থিত সেখানে মি. যোসেফ গোমেজের বসত বাড়ি ছিল। মি. যোসেফ গোমেজকে নতুন বাড়িঘর নির্মাণ করে দিয়ে ব্রাদার মি. যোসেফের কাছ থেকে ঐ এক একর জমি অদল-বদল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রহণ করেন। ব্রাদারগণ যে বিল্ডিং এ বাস করতেন তার মালিক ছিলেন কালাবিবি। কালাবিবি যে কে তার কোন হদিস পাওয়া যায়নি। ব্রাদার একদিন ক্লাসে গল্প করে বলেন, এক অতি বৃদ্ধা মহিলা আমাকে বলেন ''তুমি কালাবিবির ছেলে।''

পাদ্রীশিবপুর গ্রামের সমাজ সেবক মরহুম রহিমউদ্দীন মোল্লা সাহেবের কাছ থেকে ০.৩৫ শতাংশ জমি স্কুলের মুসলিম বোর্ডিং এর জন্যে গ্রহণ করেন। পাদ্রীশিবপুর গ্রামের জমিদারি খ্রিস্টান প্যারিশ প্রিস্ট (বড় ফাদার) কর্মচারীদের কর্তব্যের অবহেলায় প্রতি বছর ৩০ চৈত্র খ্রিস্টান মিশনের টাকা দিয়ে জমিদারি রক্ষা করতেন। প্রজাদের কাছ থেকে আদায়কৃত টাকা দিয়ে জমিদারি রক্ষা হতো না বিধায় মহামান্য বিশপ ব্রাদার গডফ্রের উপর জমিদারির ভার সম্পূর্ণ অর্পণ করেন।

ব্রাদার প্রজাদের বকেয়া খাজনা বাদি দিয়ে সকল প্রজার হাল খাজনা আদায় করেন। ৩০ চৈত্র সরকারী খাজনা পরিশোধ করার পরেও তিনি প্রচুর টাকা মুনাফা করেন। আর এমন কাজের জন্যে তিনি মহামান্য বিশপের কাছ থেকেও প্রশংসা অর্জন করেন। মহামান্য বিশপ তার কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

মানুষের মাঝে যদি প্রতিভা থাকে তা ঢেকে রাখা যায় না। তা কোন না কোন সময় আপনা থেকেই প্রকাশ পায়। ২০ এপ্রিল ১৯৪৬ মহামান্য বিশপ লারোজের প্রস্তাবে ব্রাদার গডফ্রে সুপেরিয়র ব্রাদার নিযুক্ত হন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ব্রাদার গডফ্রেকে বদলি করে আসামের মিজুরাম তথা হিমালয়ের পাহাড়ী অঞ্চলে প্রেরণ করেন। মানুষের কাছাকাছি যেতে হলে তাদের ভাষা জানা একান্ত জরুরী এই উপলব্ধি থেকে তিনি লুসাই ভাষা শিখেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ব্রাদার গডফ্রে ৭-৮টি ভাষায় কথা বলতে পারতেন। মিজুরাম সেন্ট পল নামে একটি এম. ই. স্কুল স্থাপন করেন ও একটি অস্থায়ী ছাত্রাবাস নির্মাণ করেন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে শীত ঋতুতে ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু মিজুরামে এক সৌজন্য ভ্রমণে আসেন এবং ব্রাদার গডফ্রের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ব্রাদার ভারতীয় প্রথা অনুসারে দুই হাত একত্রিত করে নমস্তে পণ্ডিতজী বলে সম্মান প্রদর্শন করেন। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ব্রাদারকে দিল্লী যাওয়ার আমন্ত্রণ দেন। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু আসামের পার্বত্য জেলা ভ্রমণের সময় নাগারা থেকে তাঁকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে নাই। নেহেরু মনে করেন মিশনারী সাহেবরা নাগাদের বিদ্রোহী করে তুলছে। ভারতীয় পার্লামেন্টে হোম মিনিস্টার মিশনারী সাহেবদের জ্বালাতনকারী মনে করে প্রাদেশিক সরকারকে মিশনারী স্কুল বন্ধ করতে নির্দেশ দেন। নাগাদের রাজনৈতিক নেতা পাপলনানসিও দিল্লীতে স্কুল অনুমোদনের তদবীর করেন।

ব্রাদার গডফ্রে ডি.পি. আই গৌহাটিকে অনুমোদনের জন্যে লেখেন। ফাদার রো অধ্যক্ষ সেন্ট মুনতন কলেজ শিলং তাঁকে পত্র দেন ডি.পি. আই যাতে স্কুলের অনুমোদন দেন। অন্যদিকে মিজুরাম ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট লরেন্স চুগড়া ভারতীয় পার্লামেন্টের ভাইস-প্রেসিডেন্টকে সেন্ট পল স্কুলের অনুমোদনের জন্য অনুরোধ করেন। ভাইস-প্রেসিডেন্টের নির্দেশে ডি. আই. পি গৌহাটি সেন্ট পল স্কুলের অনুমোদন দেন। ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ সেন্ট পল স্কুলের জন্য নতুন ৬০ x ২০ ছাত্রাবাস উদ্বোধন করেন এবং জেলা সদর থেকে অনেক মেধাবী ছাত্র ছাত্র বাসে আসে।

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ব্রাদার গডফ্রে একবার পাদ্রীশিবপুরে বেড়াতে আসেন। এসময় অত্র এলাকার হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অনেক গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি ও পুরাতন ছাত্র ব্রাদারের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। এসময় অতীতের বিভিন্ন স্মৃতিচারণসহ নানা বিষয়ে কথাবার্তা হয়। এসময়েও তিনি সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুলের উন্নতির জন্য সকলকে কাজ করার আহবান জানান।

ব্রাদার এলড্রিক ছিলেন পাদ্রীশিবপুর সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলের ৪র্থ প্রধান শিক্ষক (১৯৩৯-১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ)। ব্রাদার গডফ্রে যখন ভারতের আইজলে অবস্থান করছিলেন তখন তার পিতার পত্রে জানতে পারেন যে ব্রাদার এলড্রিক খুব অসুস্থ। ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে এক টেলিগ্রামে জানতে পারেন যে ব্রাদার এলড্রিক তাঁর জীবনের শেষ স্টেশনে পৌছে গিয়েছেন। আর এই ঘটনার পর পরই ব্রাদার গডফ্রে অসুস্থ্য হয়ে পড়েন। এমন অবস্থা হয় যে তাঁর পক্ষে আর শ্রেণী কক্ষে ক্লাস নেয়া সম্ভব ছিল না। সুপেরিয়র জেনারেল এক টেলিগ্রামে ব্রাদার গডফ্রেকে কানাডা যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করেন।
৫ জুলাই ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ ব্রাদার কানাডার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ২৯ অক্টোবর তিনি কানাডার একটি হাসপাতালে ভর্তি হন। তাঁর অপারেশন হয়। ৪ মাস হাসপাতালেই অবস্থান করেন। এরপরে তিনি বেশ কিছুটা সুস্থ হলেন। আর আবারও তিনি ভারতে আসার মনস্থির করেন।

১৩ জুন ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ ব্রাদার গডফ্রে কানাডা থেকে কোলকাতা পৌছান। আইজল এসে তিনি আবারো সেন্ট পল স্কুলে যোগদান করেন। তিনি দেখেন যে তার অবর্তমানেও স্কুলটির কাজ সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়েছে এবং এরই মধ্যে স্কুলটির অনেক উন্নতি হয়েছে। তিনি এই উন্নতি দেখে খুবই খুশি হন।

আইজল জেলা সুপারিটেনডেন্টের বিশেষ অনুরোধে ব্রাদার গডফ্রে পাপহুনগা মেমোরিয়াল নৈশ কলেজের অধ্যক্ষ হন। বিকাল ৫ঃ৩০ মিনিট থেকে রাত ৮ঃ৩০ পর্যন্ত ক্লাস হতো। সকালে সেন্ট পল স্কুলের প্রধান শিক্ষক আর বিকালে নৈশ কলেজের অধ্যক্ষ। কলেজে ব্রাদার ইংরেজি বিষয়ে পাঠদান করতেন।

জ্ঞানী, গুণী, কর্মী লোকের কদর সর্বত্র। একথা ব্রাদার গডফ্রের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতে মিশনের কাজকর্মের অবনতি হওয়ায় সুপেরিয়র ব্রাদার ১৭ জানুয়ারি ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ ব্রাদার গডফ্রেকে দক্ষিণ ভারতের ইয়ারকোর্ট পাঠান। মার্চ মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত ইয়ার কোর্টের মিশনারী কাজকর্ম তিনি তদারকি করেন। ফলে সেখানকার মিশনের কাজকর্মে আবার গতি ফিরে আসে।

২৩ মার্চ বাঙ্গালোর প্রদেশে ছালেমের একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ছালামের মহামান্য বিশপের নির্দেশে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল ও হাই স্কুল দুই প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুলের জন্য জমি ক্রয় করেন এবং ব্রাদারদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করেন। ব্রাদার নাডোরোসে গিয়ে সুপেরিয়র জেনারেল রেভারেণ্ড ফাদার ওটেলের নিকট ছালেমে ব্রাদারের কার্যের পূর্ণ বিবরণ দেন। সুপেরিয়র জেনারেল সন্তুষ্ট হয়ে ব্রাদার গডফ্রেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য পরামর্শ দান করেন। সময়ের স্রোত কখন কি করে কার জন্য কি বহন করে আনে আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধির মানব বুঝতে পারিনা। ব্রাদার গডফ্রের জীবনেও দেখা দিল দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা এবং সর্বশেষে চিরশান্তি।

২২ আগস্ট ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত হন। জার্মানের এক লেডি ডাক্তার তার চিকিৎসার জন্যে নিযুক্ত করা হলো। তিনি দেখলেন ব্রাদারের প্যারালাইসিসের সাথে সাথে হাই ব্লাড প্রেসার। ফলে তাঁকে পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিলেন।

২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছালেমে চিকিৎসার পরে ২৯শে সেপ্টেম্বর ব্যাঙ্গালোর সেন্ট মার্থাস হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। সেখানে সামান্য আরোগ্য লাভ করার পর তিনি কানাডা যাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েন। ১২ নভেম্বর পর্যন্ত সেন্ট মার্থাস হাসপাতালে চিকিৎসার পরে ১৩ নভেম্বর ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে প্লেনে কানাডা যাত্রা করেন। ব্রাদার ম্যাডরো চোখের জলে ব্রাদার গডফ্রেকে বিদায় করেন। ব্রাদার ম্যাডরো দিবারাত্র ব্রাদারের সাথে ছিলেন। ১৪ নভেম্বর বিকেল বেলা ব্রাদার গডফ্রে নিরাপদে কানাডার মন্ট্রিয়ালে পৌছেন। অনেক ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার তাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান।

অসুস্থ, রোগাক্রান্ত ফাদার, ব্রাদারদের যেখানে বাসস্থান ছিল, ব্রাদার গডফ্রেকেও সেখানে বিশ্রামের স্থান দেয়া হলো এবং তার চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হলো।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে নটরডেম কলেজ (ইন্ডাস্ট্রিয়াল) বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ব্রাদার গডফ্রে হুইল চেয়ারে বসে সেখানে উপস্থিত হন। প্রভিনসিয়াল ব্রাদারের অনুরোধে বক্তব্য দিতে দাঁড়িয়ে বাঙ্গালী সম্ভাষণ ''নমস্কার'' শুধু এই কথা বলে বসে পরেন। উপস্থিত হাজার হাজার বাঙ্গালী ছাত্র করতালির মাধ্যমে ব্রাদারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এটাই ছিল তাঁর কানাডার বাসস্থান শহরের বাইরে জনসভায় প্রথম উপস্থিতি।

২১ নভেম্বর ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ব্রাদার নটরডেম কলেজের বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থিত হন। এটা ছিল তাঁর দ্বিতীয়বার বাইরে কোন জনসভায় উপস্থিতি।

সর্বশক্তিমান যা করবেন, তা রোধ করার ক্ষমতা কারোরই নেই। দীর্ঘদিনের চিকিৎসায় ব্রাদারের রোগের কোন পরিবর্তন হয়নি। ক্রমেই তাঁর রোগ বেড়েই চলছিলো। ব্রাদার গডফ্রের জীবন প্রদীপ ক্রমেই নিভে যেতে আরম্ভ করলো। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের প্রথম থেকে তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২৩ জুলাই খুব অসুস্থ হবার ফলে তাঁকে তাঁর নিজ কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। দীর্ঘদিন চিকিৎসার কোন ফল হলো না। ব্রাদার গডফ্রের জীবনের শেষ কথা যা চিরজীবন আমাদের হৃদয়ে অমর হয়ে থাকবে। ''*I think this is the end.*'' ''আমি মনে করি এই আমার শেষ।'' এই কথা বলে তিনি জ্ঞান হারালেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজন, ফাদার, ব্রাদার, ভক্ত শিষ্য সেসময় উপস্থিত ছিলেন। সকলকে শোক সাগরে ভাসিয়ে ২৬ জুলাই ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ ব্রাদার গডফ্রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সম্পূর্ণ মন্ট্রিয়াল ও মিশনারী জগতে তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর আত্মা স্বর্গীয় শান্তিতে প্রস্থান করে। রাত ১০ টায় ব্রাদারের মরদেহ সেন্ট যোসেফস্ ময়দানে নেয়া হলো। পরের দিন সোমবার নটরডেম কলেজে তাঁর জন্য বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠান করা হয়। কফিনের মধ্যে রাখা তাঁর মুখমণ্ডল ছিল খুবই সুন্দর, যেন কোন অলৌকিক আলোয় উদ্ভাসিত। শাহানশাহ সম্রাট দীন হীন কাঙ্গাল বিশ্ব বিজয়ী সেকান্দার যে ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন, মন্ট্রিয়াল কবরস্থানে ব্রাদার গডফ্রের জন্য সেইরূপ একটি ঘর নির্মিত হলো। তাঁর মরদেহ ধর্মীয় প্রথা অনুসারে সমাধিস্থ করা হলো।

একজন মহান ব্রাদারের আদর্শ বুকে নিয়ে আমিও আমার কর্মের মাঝে সকলের অন্তরে ঠাঁই করে নিতে চাই। ব্রাদারের মহান স্মৃতি ও কর্মতৎপরতা বার বার তাঁকে মনে করিয়ে দেয় তিনি ছিলেন, তিনি আছেন, চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবেন আমাদের সকলের অন্তরে। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।''

সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলের বিষয়ে প্রথম ২৫ বছরের বিবরণ স্কুলের আর্কাইভ থেকে পরিপূর্ণভাবে পাওয়া গেলেও পরবর্তী ৫০ বছর অর্থাৎ সুবর্ণ জয়ন্তী ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ এবং পরবর্তীতে প্লাটিনাম জুবিলী ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ পালনের কালে যে প্রকাশনা বা স্মরণিকা প্রকাশ করা হয় তাতে বিদ্যালয়টির ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি। যদিও উভয় স্মরণিকায় বেশকিছু মূল্যবান লেখা আছে যা বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন। কাঠামোগত উন্নয়নের বিষয়ে বিশদ কিছু বলা যায় না। পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। তখন স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন রেভারেণ্ড ব্রাদার এলবারিক, সিএসসি এবং পালক পুরোহিত ছিলেন রেভারেণ্ড ফাদার জার্মেন, সিএসসি । তাদের সুদূর প্রসারী পরিকল্পনায় এবং চট্টগ্রামের মহামান্য বিশপ রেভারেণ্ড যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি মহোদয়ের সহযোগিতায় বর্তমানে যে স্কুল বিল্ডিং আছে তার নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের মাধ্যমে এখানে পাঠদান কার্যক্রম শুরু হয়। পুরাতন বিল্ডিং এ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। এখানে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে কোন এক পর্যায়ে স্কুলটিতে কো-এডুকেশন শুরু হয়। ফলে আমাদের এলাকার মেয়েদের প্রাইমারী শিক্ষা গ্রহণের পরেই যে বরিশালে হাই স্কুলের পড়াশুনার জন্যে যেতে হতো তার অবসান ঘটে। এরই মধ্যে মেয়েদের জন্যে দীপ্তি হোস্টেল চালু করা হয়। ফলে বিভিন্ন এলাকার মেয়েরা পাদ্রীশিবপুরের হোস্টেলে অবস্থান করে পড়াশুনা করার সুযোগ লাভ করে।

॥ ঙ ॥ সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী – ১৯৮৩ খ্রি.[৫]

(১) সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুলের ইতিহাস সম্পর্কে স্মৃতিচারণ:[৬]

পাদ্রীশিবপুর সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের সময় যে স্মরণিকা প্রকাশ করা হয় তাতে কয়েকটি তথ্যবহুল রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এই স্মরণিকায় ''উপস্থাপনা'' শিরোনামে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে ১৯৫৮ খ্রি. পর্যন্ত এবং এর পরে অর্থাৎ ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের সার সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য পাওয়া যায়। আর এর থেকে আমরা ঐসময়ে স্কুলটির বিষয়ে কিছু ধারণা লাভ করতে পারি।

** ঐতিহ্যবাহী জেলা বরিশাল। আগাবাখের খাঁর নামের সঙ্গে মিল রেখে এ জেলার মূল নামকরণ করা হয়েছিল বাখেরগঞ্জ। শেরে বাংলার জন্মস্থান, অশ্বিনী কুমার দত্তের লীলা ক্ষেত্র, বাংলার শস্য-ভাণ্ডার বরিশাল। জেলার দক্ষিণ প্রান্তে বাখেরগঞ্জ উপজেলা, পটুয়াখালীর সীমানা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত।*

** এককালের অখ্যাত অজগ্রাম ''শিবপুর'' এই উপজেলার প্রায় শেষ সীমানায়। কবে কখন শিবপুর গ্রামের পত্তন হয়েছিল তা সঠিক করে বলা কঠিন। দক্ষিণে পায়রা নদী থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত স্রোতস্বিনী ''শ্রীমন্ত'' তারই পশ্চিম তীরে গড়ে ওঠা গ্রাম শিবপুর।*

** আনুমানিক ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিকদের ডিঙ্গা বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে প্রবেশ করে অভ্যন্তরে, এবং সেই ডিঙ্গা শেষ পর্যন্ত নোঙ্গর ফেলে শ্রীমন্ত-তটে। তাদের সঙ্গে এসেছিলেন কয়েকজন পতুর্গীজ মিশনারী বা পাদ্রী। তারা শ্রীমন্ত তটের অজগ্রাম এই শিবপুরের মায়ায় পড়ে থেকে যান এখানে। তারপর কোন এক সময়ে সহজ সরল এলাকাবাসীর মুখে মুখে গ্রামের নামের সঙ্গে 'পাদ্রী' শব্দটি যোগ হয়ে যায়, নতুন করে গ্রামের পরিচয় হয়– ''পাদ্রীশিবপুর'' নামে। শুরু হলো মিশনারীদের নানাবিধ সংস্কার কাজ।*

---

[৫] সেন্ট আলাফ্রেড স্কুল, সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা – ১৯৮৩ খ্রি.

[৬] মি. সুভাষ চন্দ্র রত্ন, যুগ্ম-সম্পাদক, সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ

* উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কোন এক সময়ে এ গ্রামে স্থাপিত হয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। আনুমানিক ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে পাদ্রীশিবপুর গীর্জার তৎকালীন ভিকার (প্রধান পুরোহিত) রেভারেণ্ড ফাদার পিও, সিএসসি, এর প্রচেষ্টায় প্রাথমিক বিদ্যালয়টি মাইনর স্কুলে (৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত) উন্নীত করে ''সাধু আন্তনীর মাধ্যমিক (মাইনর) বিদ্যালয় নামকরণ হয়। এ সময় শিক্ষার মাধ্যম ছিলো ইংরেজি। তাই এটিকে ইংরেজি স্কুলও বলা হতো। এই সময় পর্যন্ত পাদ্রীশিবপুর মিশন সুদূর মাইলাপুর ধর্মপ্রদেশের অধীনে ছিল।
* বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ দশকের প্রথম থেকে আরেক নতুন অধ্যায় তথা এক নতুন যুগের সুচনা হয় পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লী চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের অর্ন্তভূক্ত হয়। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে রেভারেণ্ড ফাদার ফিনো, সিএসসি এর নেতৃত্বে ও সহযোগিতায় রেভারেণ্ড ব্রাদার ইটিয়েন, সিএসসি (ইঞ্জিনিয়ার) স্কুলের জন্য নির্মাণ করেন একটি পাকা গৃহ।
* স্কুল ও সমাজ সেবামূলক সব কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে আসেন এক নতুন মিশনারী দল, কানাডার পবিত্র ক্রুশ ভ্রাতৃসংঘের (*Holy Cross Brothers*) সদস্যবৃন্দ।
* ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর (স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস, এক অপূর্ব মিল।) একটি ঐতিহাসিক দিন–দক্ষিণ বরিশালের তথা গোটা বাংলাদেশের বহু মানুষের মনরাজ্যের মুকুট-বিহীন রাজা, অক্লান্ত কর্মী, কিংবদন্তীর নায়ক, পুরুষ-সিংহ স্বর্গীয় রেভারেণ্ড ব্রাদার গডফ্রে ডেনিস, সিএসসি প্রধান পরিচালকরূপে পাদ্রীশিবপুরে আগমন করেন এবং পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যাঁরা সেদিন তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদের তারাবুনিয়া ষ্টিমার ঘাটে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে মিশনের একান্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী, সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন প্রবীণ মি. যোসেফ গোমেজ আজও তাদের মধ্যে বর্তমান। অতঃপর চট্টগ্রামের তৎকালীন মহামান্য বিশপ স্বর্গীয় আলফ্রেড লাপায়ারের অনুপ্রেরণায় পবিত্র ক্রুশ ভ্রাতৃ-সংঘের সদস্যবৃন্দের পক্ষে রেভারেণ্ড ব্রাদার গডফ্রে, সিএসসি, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এক নতুন অভিযান শুরু করেন– সাধু আন্তনীর মাধ্যমিক ইংরেজি বিদ্যালয়টিকে হাই স্কুলে রূপান্তরের দূর্বার অভিযান। সপ্তম শ্রেণিতে মাত্র চারজন ছাত্র নিয়ে যাত্রা শুরু হয়। রেভারেণ্ড বিশপ আলফ্রেড লাপায়ার, সিএসসি এর নামের সাথে মিল রেখে এবং তাঁর আদর্শ সাধু আলফ্রেডের নাম অনুসারে হাইস্কুলের নামকরণ করা হয়– ''সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুল''।
* পাশাপাশি তৈরি করা হয় খ্রিস্টান ছাত্রাবাস ''সেন্ট যোসেফস্ বোর্ডিং''– দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, ফরিদপুর, নোয়াখালি প্রভৃতি) ছাত্ররা এসে এ ছাত্রবাসে থেকে সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলে শিক্ষালাভের সুযোগ লাভ করে।
* ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে আরেক মহামতি জ্ঞান তাপস রেভারেণ্ড ব্রাদার ফ্লেবিয়ান স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। তৎকালীন ছাত্রদের অনেকের মতো সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুলের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ও রূপকার রেভারেণ্ড ব্রাদার ফ্লেবিয়ান, সিএসসি এবং রেভারেণ্ড ব্রাদার গডফ্রে, সিএসসি ছিলেন এর স্বপ্নদ্রষ্টা।
* ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে স্কুলটি সাময়িকভাবে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুমোদন লাভ করে এবং প্রথমবারের মতো দু'জন প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী প্রেরণ করা হয়– তারা হলেন পিটার হালদার ও দীনবন্ধু বাড়ৈ।

* *এর পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোল, আর্থিক সংকট ও বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়টি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ীভাবে অনুমোদন লাভ করে এবং পরবর্তীতে এখানে পবিত্র ক্রুশ ভ্রাতৃ সংঘের সদস্যদের নিরলস প্রচেষ্টায় একটি পুরো Education Complex গড়ে ওঠে ঃ (১) সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুল; (২) সেন্ট যোসেফস্ বোর্ডিং; (৩) রহিমুদ্দীন মুসলিম হোষ্টেল; (৪) খ্রিস্টান অরফানেজ; (৫) প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; (৬) বালিকা বিদ্যালয় (কনভেন্ট স্কুল) ও হোস্টেল এবং (৭) আরও অনেক কার্যক্রম।*
* *পঞ্চাশ দশকের শেষ দিক থেকে শুরু করে এর অনেক কেন্দ্র অন্যত্র স্থানান্তর করা হলেও সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুলটি আগের থেকে অনেক বেশি প্রসারতা লাভ করেছে– কৃষি ও বিজ্ঞান বিভাগসহ এ'টি এখন একটি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়।*
* *১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে হুইটলি সাহেবের বাড়িটি ক্রয় করে সেখানে নতুন স্কুল ভবন নির্মাণ করা হয়। এর ফলে হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সেখানে পাঠদান শুরু হয়।*
* *ইতিহাস পরিবেশনার লক্ষ্যে এসব কথা বলিনি। আমাদের প্রিয় বিদ্যাপীঠ সেন্ট আলফ্রেডস্ সম্পর্কে এটুকুই সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা।*
* *বিদ্যালয়ের প্রকৃত ইতিহাস আরও অনেক দীর্ঘ–একথা সত্য যে হাই স্কুলের বয়স পঞ্চাশ বছর হয়েছে কিন্তু এর প্রাথমিক ও পরবর্তী মাধ্যমিক (মাইনর) অবস্থাসহ বিদ্যালয়ের বয়স একশত বছরেরও বেশী। সকল অবদানের কথা ছাপার অক্ষরে যদিও প্রকাশ করা সম্ভব হলো না; তথাপি হৃদয়ের পাতায় তা চিরকাল লেখা থাকবে।*

সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলেই, এর সুশীতল ছায়ায় বসে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী জ্ঞানার্জনের সুযোগ পেয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে এবং ভবিষ্যতেও এ বিদ্যামন্দির থেকে বেরিয়ে আসবে অগণিত বলিষ্ঠ সৈনিক, জাতীয় জীবনের সকল দৈন্য, ক্লান্তি ও হতাশা জয়ের দুর্বার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে।"

(২) স্বর্গীয় ব্রাদার ফ্লেবিয়ান, সিএসসি-এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি[৭]

সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাকালে স্বর্গীয় ব্রাদার ফ্লেবিয়ানের অবদান ছিল অনন্য। তাঁকে নিয়ে একটি নিবন্ধ সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটি থেকে আমরা তাঁর অবদানের বিষয় জানতে পারবো।

"কোথায় পাব তারে" স্মৃতিচারণমূলক লেখা – যোসেফ গোমেজ (মাটিভাঙ্গা), প্রাক্তণ ছাত্র, কলকাতা

---

[৭] সেন্ট আলফ্রেড স্কুল: সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা – ১৯৮৩ মি. যোসেফ গোমেজ কর্তৃক রচিত প্রবন্ধটির ঈষৎ সম্পাদিত

"সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা নদীমাতৃক একদেশ, কাশবনের সাদা উত্তরীয় মেশানো তার শরতের আঁচল। বারে বারে মনে পড়ে স্নিগ্ধ সবুজ সেই দেশের ছবি। জলার মধ্যে ব্যাঙের ডাক, হাঁস-মুরগীর অবাধ চলা ফেরা, বাঁশ বনে জোনাকী জ্বলা, বসন্তের দুপুরে ঝি ঝি পোকা ও ঘুঘুর সুমধুর ডাক, মেঘে ঢাকা পথ ও সুশীতল গাছতলা। চোখ জুড়ানো সোনালী ধানের ক্ষেত– এসবের কিছুই ভুলতে পারিনা। ভুলতে পারিনা আমার অজপাড়া গাঁয়ের প্রিয় মানুষ মরহুম ফরমান হাওলাদারের আজান-ধ্বনী, পুঁথি পড় আর শায়ের গান। ভ্রমরের কানাকানি, মৌমাছির গুঞ্জরণে বাতাস মাতাল হয় নানারকম জংলী ফুলের উদগ্র সৌরভে। মনে হয় যেন আমাকে প্রায়ই হাতছানি দিয়ে ডাকে। আমন্ত্রণ জানায় ছেড়ে আসা আপন প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলিত হতে।

কোলকাতার চাকচিক্যময় প্রাণহীন আরাম বিরামের মধ্যে মনে হয় আমি যেন আজ ক্লান্ত। জীবনভর শুধু লড়াই করেছি, বাঁচার লড়াই। লড়াই শেষে আজ ক্লান্ত। তাই আজ বারে বারে মনে পড়ে অতীতের সেই আপন জনদের। স্নেহ-ভালোবাসায় উপচে পড়া মনের মানুষগুলোর কথা।

যে প্রিয় প্রতিষ্ঠানটি আমাকে শিক্ষার আলো দেখিয়েছিল, সেই সেন্ট আলফ্রেডস্ স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তীর পরম পুণ্য লগ্নে মনের কথা অনুরণিত হয় স্মৃতি বিজড়িত কত কথা। মন চলে যায় সেই শৈশব ও যৌবনের স্মৃতি মধুর দিনগুলিতে। মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি দেয় পুজনীয় শিক্ষকবৃন্দ। পড়ার ও খেলার সাথী প্রিয় ছাত্রবন্ধুদের মুখ। স্কুলের পবিত্র ও মায়াময় পরশ এখনও নাড়া দেয় হৃদয় তন্ত্রীতে।

উনিশ শতকের গোড়ারদিকে মাদ্রাজের মাইলাপুরের পর্তুগীজ মিশনের স্থলে তৎকালীন ভারতের এই পূর্ব এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় সিএসসি সম্প্রদায়ের মিশনকর্ম। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম আলাদা ধর্মপ্রদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই ধর্মপ্রদেশের অধীনে পাদ্রীশিবপুর অর্ন্তভূক্ত হয় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে। এই সময় অনেক আগে থেকে চালুথাকা মাইনর স্কুল সেন্ট এন্থনীকে হাই স্কুলে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এবং চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের মহামান্য বিশপ আলফ্রেড লাপায়ার, সিএসসি তাতে সম্মতি প্রদান করেন। পরবর্তীতে মহামান্য বিশপ আলফ্রেড, সিএসসি মহোদয়ের নামের সাথে মিল রেখেই তাঁর আদর্শ সাধু আলফ্রেডের নাম অনুসারে স্কুলটির নামকরণ করা হয় ''সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুল''। হাই স্কুলে উন্নীত হবার পরে প্রথম দু'তিন বছরের মধ্যেই এর সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। স্কুলটিতে উন্নতমানের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং খেলাধুলা প্রভৃতির ব্যাপারে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করে বরিশাল জেলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত।

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের এক শুভদিনে পাদ্রীশিবপুরে পদার্পণ করেলন বিরাট, বিশাল ব্যক্তিত্বশালী মনোরম শ্মশ্রুবহুল সৌম্যমূর্ত্তি রেভারেণ্ড ব্রাদার গডফ্রে ডেনিস, সিএসসি এবং সহকারীরূপে এক মানব দরদী ২৬ বছরের যুবক রেভারেণ্ড ব্রাদার ফ্লেবিয়ান ল্যাপল্যান্টে, সিএসসি। সুযোগ্য দক্ষ প্রশাসক ব্রাদার গডফ্রে, সিএসসি প্রিন্সিপাল ও হেডমাস্টার পদে অধিষ্ঠিত হন এবং তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় দু'বছরের মধ্যেই স্কুলটি প্রভূত উন্নতি লাভ করে। একের পর এক নির্মিত হয় ছেলেদের বোর্ডিং, মেয়েদের কনভেন্ট এবং আরও অনেক শিক্ষা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এমনি করেই সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলটি উন্নতির শিখরে আরোহণ করে। পাদ্রীশিবপুর গ্রামটি হয়ে ওঠে হিন্দু-মুসলমান ও খ্রিস্টানদের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং খেলাধুলার মিলনকেন্দ্র। এর পরে প্রধান শিক্ষকের

পদে অভিষিক্ত হলেন সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুলের সর্বাঙ্গীন উন্নতির মুখ্য রূপকার সর্বত্যাগী মহামানব ব্রাদার ফ্লেবিয়ান, সিএসসি।

জানিনা, আমার শিক্ষক কিংবা সহপাঠিদের মধ্যে তাঁকে কে কতটা জেনেছিলেন, পরিচয় পেয়েছিলেন তাঁর দরদে ভরা মনের আর ছাত্রদের জন্য মমত্ববোধের সীমা পরিসীমা। আমি তাঁকে যতটুকু জেনেছিলাম তার বিস্তৃত বিবরণ দিতে গেলে বিরাটকার পুস্তিকা রচিত হবে। এখনও তাঁর পবিত্র পরশ অনুভূত হয় সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলের সারা অঙ্গে (হুইটলি বাড়ির নবনির্মিত স্কুল ভবনটি বাদে), খেলার মাঠ, বোর্ডিং হাউজের প্রতিটি বাগ-বাগিচা আর নারকেল, সুপারি প্রভৃতি গাছপালার ডালে ডালে, পাতায় পাতায়।

বর্তমান খেলার মাঠ তখন ছিল নানা জাতের বিরাট গাছপালা ও বন জঙ্গলে ঘেরা। সে জঙ্গলে খেঁকশিয়াল প্রভৃতি তো ছিলই এমনকি বাঘের সাক্ষাতও পাওয়া যেত মাঝে মাঝে। এই জঙ্গলের আম, কাঁঠাল, জাম আর নারকেল, সুপারি প্রভৃতি গাছ কেটে জঙ্গল পরিষ্কার করে খেলার মাঠ তৈরির প্রতিটি কাজে কানাডা দেশের কুঠোর হাতে শ্রমিকদের সঙ্গে ব্রাদার ফ্লেবিয়ানকে দেখা যেত নিয়মিতভাবে। যোসেফ ডি'সিলভা সাহেবের বাড়ি কিনে সেখানে করা হয়েছে ছেলেদের বোর্ডিং। এই বোর্ডিংয়ের প্রতিটি গাছপালা, লতাপাতা, বাগান-বাগিচা, পুকুর, অট্টালিকা প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছড়িয়ে আছে ব্রাদার ফ্লেবিয়ান, সিএসসি এর পবিত্র স্মৃতি। গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে নারকেল-সুপারির চাড়া কাঁধে করে বয়ে এনে তিনি রোপন করেছিলেন সুন্দর পরিকল্পনা করে। লোকে বলতো ব্রাদার একটি পাগল। অতবড় নারকেল চাড়া কখনও বাঁচে নাকি? কিন্তু অবাক হয়েছি এই দেখে যে মরে যায়নি একটি চারাও। ব্রাদার ফ্লেবিয়ানের পবিত্র পরশে এগুলি যেন বেঁচে উঠেছিল সজীব প্রাণ নিয়ে। তাঁর সুপরিকল্পিত নারকেল-সুপারি আর কলা বাগান, ফুল বাগিচা আর শাক-সব্জির ক্ষেত দর্শন করে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, এস.ডি.ও, স্কুল ইনস্পেক্টর, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রমুখ উচ্চ পদস্থ অফিসারবৃন্দ, বরিশালের মৃত ইসমাইল মিয়া, হাসেম আলী খান, কলসকাঠির জমিদার রাজেশ্বর রায় চৌধুরী বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বোর্ডিং এ ঢুকে ব্রাদার ফ্লেবিয়ানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন এবং তারা সবাই তার স্বহস্তের কাজে মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি নিজের হাতে ঝাড়ু নিয়ে ছেলেদের পায়খানা পরিষ্কার করতেন অম্লান হাসিমুখে।

প্রতি মূহুর্তে মনে পড়ে ব্রাদার ফ্লেবিয়ানের বিভিন্ন প্রতিটি মহতীপূর্ণ কাজের কথা। বোর্ডিংয়ের ছেলেদের জন্য কিরকম খাবার রান্না করা হয় তা তিনি নিজে পরখ করে দেখার জন্য তাঁর খাবার টেবিলে প্রতিদিন এক প্লেট ছেলেদের খাবার পরিবেশন করার নিয়ম তিনিই প্রবর্তন করেছিলেন। কোন ছেলের অন্যায়ের জন্য শাস্তি দিয়ে তিনি সেখান থেকে সরে গিয়ে পরে অঝোরে চোখের জল ফেলেছেন। কোন ব্যাপারে অসন্তুষ্ট বা ক্রুদ্ধ হলে তাঁকে দেখেছি কোদাল হাতে মেজাজ মন শান্ত না হওয়া পর্যন্ত ঘন্টার পর ঘন্টা বাগানে কাজ করতে। শ্রীমন্ত নদীর গা ছোঁয়া খোলা জায়গায় ছেলেদের বোর্ডিং, তাই শীতের প্রকোপও বেশি। ছাত্রদের বিছানা যথেষ্ট না থাকায় তাঁকে দেখেছি শীতের ঋতুতে নিজের সব কম্বল, বিছানার চাদর ইত্যাদি অভাবগ্রস্থ ছেলেদের বিলিয়ে দিয়ে নিজেকে শুধু পরিধানের কাপড় পড়ে সেই প্রচন্ড শীতের রাত্রিতে ঘুমাতে। আস্তে আস্তে তাঁর জুতা মোজা পরিত্যাগ করে চলাফেরা করেছেন গ্রামের সাধারণ মানুষের ন্যায় খালি পায়ে।

পদ্রীশিবপুর পদার্পণের কিছুদিন পর শিক্ষকদের পায়ে হাত দিয়ে ছাত্রদের প্রণাম করতে দেখে তিনি অবাক ও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখে। পরিতাপের বিষয় আজকাল শিক্ষক-ছাত্রদের সেই পিতা পুত্র সুলভ সম্পর্ক আর নেই। আর নেই শিক্ষককে সেই শ্রদ্ধা-ভক্তি মিশ্রিত প্রণাম করার প্রথাও। শ্রদ্ধাবনতঃচিত্তে স্মরণ করি ব্রাদার ফ্লেবিয়ানের মাতৃসুলভ দরদে ভরা স্নেহের কথা। বোর্ডিংয়ের কোন ছেলে অসুস্থ হলে তিনি যে দরদী মায়ামমতা ও নিষ্ঠার সাথে ব্যাকুলভাবে অসুস্থ ছেলেদের সেবা-শুশ্রুষা করতেন তা মায়ের সেবা শুশ্রুষাকেও ছাড়িয়ে যেত। একটি অসুস্থ ছেলের অসুখে প্রাণ-পাত করে চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রুষা করেও তাকে বাঁচাতে না পেরে ব্রাদার ফ্লেবিয়ানকে দেখেছি দীর্ঘ এক বছর ঐ ছেলেটিকে স্মরণ করে চোখের জল ফেলতে।

অর্থের প্রতি নিস্পৃহ ব্রাদার ফ্লেবিয়ান। যখন তাঁর কাছে টাকা পয়সার সমারোহ থাকতো তিনি খুশি মনে সকলকে বিলিয়ে দিতেন, আবার বৃহস্পতিবার কালীগঞ্জের হাটের দিনে টাকার অভাবে স্কুলের অফিস ঘরের দরজা বন্ধ করে চোখের জল ফেলতেন।

দীন দরিদ্রের চিরসাথী ছিলেন তিনি। সেবা আর ত্যাগস্বীকার ছিল তার জীবনের মুখ্য-মন্ত্র। তাঁকে যখন চট্টগ্রামে বদলী করে সমগ্র ব্রাদার সম্প্রদায়ের প্রধান পদে মনোনীত করা হয়, তিনি খুশী মনে পারেননি এই সর্বোচ্চ পদ গ্রহণ করতে। তবুও নিয়মানুসারে প্রধান পদে তাঁর শর্ত-সময় শেষ করে তিনি পুনরায় চলে গেলেন সর্বহারা দুঃখী মানুষের মাঝে।

আমি স্বচক্ষে দেখেছি চট্টগ্রামে নোংরা দুর্গন্ধময় জেলে পাড়ায় তাঁর অবিরাম যাতায়াত। জেলেদের আর্থিক উন্নতি ও নিরাপত্তার জন্য তিনি সর্বস্ব পণ করে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়ে পরিশ্রম করেছেন। সমুদ্রে মাছ ছিনতাইকারী ডাকাতদের হাত থেকে জেলেদের সুরক্ষার জন্য বন্দুক নিয়ে জেলেদের সঙ্গী হয়ে তিনি সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছেন। তাদের উন্নতির জন্য সুদূর কানাডা থেকে নানারূপ সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন। এর পরের পর্যায় নিজের সংগৃহিত অর্থ ও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বিরাট এক মৎস প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করে কত দরিদ্র দীনহীন দুঃখী মানুষের মলিন মুখে হাসি ফুটিয়েছেন।

তাঁকে কতরূপে পেয়েছিলাম আমরা। তিনি সর্বত্র উজার করে আমাদের দিয়ে গেছেন, আর আমাদের শিখিয়ে গেছেন কিভাবে নিজের চেয়েও অপরকে ভালবাসতে হয়। শিক্ষকদের শিখিয়ে গেছেন কি করে আদর্শ গুরু হয়ে, পিতৃতুল্য শ্রদ্ধা-ভক্তি, বিশ্বাস-ভাজন ও প্রিয়পাত্র হওয়া যায় ছাত্রদের কাছে। ছাত্ররাই বা কি করে নিজেদের গড়ে তুলতে পারেন দেশের ভবিষ্যৎ দায়িত্বশীল ও সৎ নাগরিকরূপে। সেন্ট আলফ্রেডের ছাত্র জীবনের সুদীর্ঘ ৪৫-৫০ বছর পরে আজও আমার মনে পড়ে প্রতি বৃহস্পতিবার অর্ধদিবস স্কুলের দিনে তিনি স্কুলের সামনে সব ছাত্রদের পতাকার (ইউনিয়ন জ্যাক) তলায় দাঁড় করিয়ে সমবেত কণ্ঠে ''ধন ধান্য পুস্পে ভরা'' গানটি গাওয়াতেন, আর তাঁর ক্ষুদ্র ভাষণ দিয়ে সকলকে দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতেন।

পাশাপাশি দু'টি চরিত্র। বিরাট বিশাল ব্যক্তিত্বশালী সুযোগ্য বিচক্ষণ ও দক্ষ প্রশাসক রেভারেণ্ড ব্রাদার গডফ্রে, সিএসসি, যাঁর প্রতি ছিল আমাদের ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা ভক্তির অনুভূতি। শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র হলেও তিনি ছিলেন বহু উপরের মানুষ। আর একটি মানুষ রেভারেণ্ড ব্রাদার ফ্লেবিয়ান, সিএসসি– যিনি ছিলেন আমাদের মনের ও প্রাণের মানুষ, দরদে ও মমতায় ভরা আপনজন, যাঁর কথা স্মরণ করে নির্ভয়ে আমরা বলতে পারি–

''আমরা তোমার
তুমি মোদের: ওগো মহাপ্রাণ!
তোমার স্মৃতি,
মোদের কাছে এখনও অম্লান।''

জাগতিক সম্পর্ক শেষ করে ''মরিয়ম আশ্রমে'' প্রবেশ করার পূর্বে কানাডা থেকে ফেরার পথে শেষবারের মত তিনি কোলকাতা এসেছিলেন। আমার ঘরে খেতে এসে আমাদের ছেলে মেয়েদের মুগ্ধ ও বিস্ফোরিত দৃষ্টির সামনে আমাকে এই বয়সেও দু'হাতে তুলে তাঁর দরদে ভরা বুকে চেপে ধরেছিলেন। কোলকাতায় থাকার সময় তাঁর নিত্য সঙ্গী হয়ে আমার পারিবারিক সুখ-শান্তি, ব্যাথা-বেদনা, শারীরিক ক্ষুধা, আর্থিক অভাব অভিযোগের সব কথা বিস্তারিতভাবে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে তাঁর কাছে চেয়েছিলাম আমার দুর্ভাগ্য, দুশ্চিন্তা, দুঃখ, দুর্দশা ও গ্লানির হাত থেকে মুক্তির সন্ধান। তাঁর প্রদত্ত মূল্যবান উপদেশ ও বিধান আমার পারিবারিক জীবনে প্রভূত উপকারে এসেছে। তাঁকে জীবনের শেষ বারের মতো বিদায় জানাতে দমদম বিমান বন্দরে উভয়েই চোখের জলে ভেসেছিলাম। তখন জানতাম না যে ইহজগতে তাঁর সাথে সেই আমার শেষ সাক্ষাৎ।

তিনি অসুস্থ হয়ে পরার আগে আমাকে তাঁর শেষ চিঠিতে লিখেছিলেন ''আমি আর একবার মাত্র আমার মরিয়ম আশ্রমের বাইরে আসবো, আর তা আসবো পাদ্রীশিবপুরে আমার প্রিয় সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করতে।'' আমাকে বলেছিলেন–''তুমি যেখানেই থাকনা কেন সেই সময় অবশ্যই উপস্থিত থাকবে। এই আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে আমার হয়ে আমন্ত্রণ জানাবে স্কুলের প্রতিটি প্রাক্তণ ছাত্র-ছাত্রীকে।''

আজ এই শুভক্ষণে, মহানন্দের দিনে বারে বারে ভারাক্রান্ত ব্যাথা ভরা মনের মধ্যে শুধু একটি প্রশ্নই গুমরে মরে, ''কোথায় পাব তারে?'' সকলের সঙ্গে আরও বিশেষ করে মনে পড়ে আর এক মহৎ মানুষকে। তিনি আমার প্রিয়তম শিক্ষক যাঁর ঐ মাইনর এবং হাই স্কুল ছিল হৃদপিন্ড এবং জীবনের প্রধান অবলম্বন। তিনিও বেশ কিছু রক্ত দিয়েছেন ঐ স্কুল দু'টির জন্য, সেই স্বর্গীয় সতীশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়।

এছাড়া হৃদয়ের সঙ্গে স্মৃতির অধ্যায়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে আমার সকল শিক্ষকমণ্ডলী আর ভ্রাতৃপ্রতিম সহপাঠি প্রতিটি ছাত্রবন্ধু। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে অজানা, অচেনা, মানুষের আনাগোনা আমার হৃদয় তন্ত্রীতে ক্ষণে ক্ষণে নাড়া দিয়েছিল এবং মনে যে ছাপ রেখে গিয়েছে সংসারের অসংখ্য ধোয়া মোছাতেও তা আজ পর্যন্ত মুছে যায়নি একবিন্দুও।

কখনও কল্পনা করিনি এই শুভ ও পবিত্র আনন্দানুষ্ঠান পালিত হবে ব্রাদার ফ্লেবিয়ানের অনুপস্থিতিতে–। তাই বারে বারে মনকে নাড়া দিয়ে প্রশ্ন ওঠে ''আজ কোথায় পাবো তারে?''

(৩) "সেন্ট আলফ্রেড উচ্চ বিদ্যালয়ে আমার একটানা ৪৫ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা"[৮]

মৌঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক (অবসারপ্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক)

সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলে যারা সেবা দিতেন তাদের মধ্যে নিজেকে নিবেদন করার একটি সুন্দর ও পবিত্র মানসিকতা বিদ্যমান ছিল। এ ক্ষেত্রে মিশনারী ব্রাদারদের ভূমিকা ছিল অনন্য। সুবর্ণ জয়ন্তীর স্মরণিকা সংখ্যায় তার একটি সুন্দর প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। আবার বিদেশী মিশনারীগণের যে উদারতা ছিল তার স্বাক্ষ্যও দান করেছেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মৌলভী মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক । তিনি সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলে একটানা ৪৫ বছর শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর লেখা থেকেই খন্ডিত অংশ তুলে ধরছি; ''এক বৎসর পূর্বে পাদ্রীশিবপুর স্কুলটিকে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়েছে। আমি সে স্কুলের তদানিন্তন স্বনাম ধন্য হেডমাস্টার রেভারেণ্ড ব্রাদার গডফ্রে, সিএসসি সাহেবের সাথে একজন পদপ্রার্থী হয়ে সাক্ষাৎ করেছিলাম। তিনি এক বৎসর পরে সাক্ষাৎ করতে বলেছিলেন। নভেম্বর মাসে (১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ) সে কথা মনে পরায় একখানা দরখাস্ত প্রেরণ করলাম। আমাকে ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ দেখা করতে বলা হয়। তখন হেডমাস্টার ছিলেন স্বর্গীয় ব্রাদার ফ্লেবিয়ান, সিএসসি। তিনি বলেন যে, জানুয়ারি মাসে অষ্টম শ্রেণী খোলা হবে। 'নতুন স্কুল, আপনি স্থানীয় লোক, দেশের সেবা করাতো কর্তব্য। আমাদের স্কুলে আরবী শিক্ষক আবশ্যক, আপনি যুবক সুযোগ্য, আসুন আমরা একত্রে দেশের সেবা করি।'

আমাকে নামে মাত্র ১৭ (সতের) টাকা মাসিক বেতনে নিযুক্তিপত্র প্রদান করলেন। মরহুম আব্বাজানের মত নিয়ে গলাচিপা হতে পালতুলে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে পাদ্রীশিবপুর স্কুলে কাজে যোগদান করলাম। প্রাইমারী সেকশন একত্রে ছিল। অষ্টম শ্রেণীতে মোট আটজন ছাত্র ছিল। শিক্ষক কম থাকায় আমাকে আরবী ব্যতীত ইংরেজি, বাংলা এমনকি শরীর চর্চাও করাতে হত। উত্তরোত্তর ছাত্র বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করল, আমার উপর শিক্ষার চাপও বৃদ্ধি পেতে লাগল।

মিশনারী ব্রাদারেরা এক একজন মন্ট্রিয়াল ইউনিভার্সিটির এম.এ, এম.এস.সি পাশ ছিলেন। তাঁরা মানুষের সেবার জন্যই জীবন উৎসর্গ করে দেশদেশান্তরে ছুটে আসতেন। তখন বৃটিশ আমলে এক একজন ব্রাদারের হাজার দেড় হাজার টাকা বেতন হলেও অত্যুক্তি হত না। কিন্তু মিশন থেকে তাঁরা শুধু খোরাক ও পোশাক ব্যতীত আর কিছুই পেতেন না। একজন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে অনুন্নত স্থানে প্রাইমারীতে বদলী করলে তখনই বিনা দ্বিধায় সেখানে চলে যেতেন। কাজ ব্যতিত তাঁরা কিছুই জানতেন না। এদেশের কিছু লোক তাঁদের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান ছিল। এ সন্দেহ অলিক; কেননা ২৪ ঘন্টা রুটিন অনুযায়ী কাজে লিপ্ত থাকতেন। কথায় বলে খালি মন, শয়তানের দোকান। সর্বদা কাজে লিপ্ত থাকায় দুঃচিন্তা এদের মনে স্থান পেতনা। এদের সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও সময়ানুবর্তিতা বাস্তবিকই প্রসংশনীয় ছিল।

---

[৮] সাধু আলফ্রেড উচ্চ বিদ্যালয় সুবর্ণ জয়ন্তী – ১৯৮৩ খ্রি.

এখন ধর্মান্তকরণের কথাঃ লোকের ধারণা ছিল মিশন এদেশী লোকদের ধর্মান্তকরণের জন্য প্রলুব্ধ করতে এসেছে কিন্তু দীর্ঘ ৪৫ বৎসরে এর একটা উদাহরণও পাইনি। একবার ক্ষেপুপাড়া থেকে অষ্টম শ্রেণীর একজন মুসলমান ছাত্র তদানিন্তন হেডমাস্টার ব্রাদার গডফ্রে, সিএসসি সাহেবের কাছে খ্রিস্টান হবার জন্য চিঠি লিখেছিল। সাহেব আমাকে চিঠিখানা দেখান ও তাকে তখনই উত্তর দিয়াছেন, 'তুমি ছেলে মানুষ প্রথমতঃ তোমার ধর্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান লাভ কর। তৎপর তোমার অভিভাবক ও ওস্তাদের সাথে আলাপ করে তৎপর ধর্মান্তরের বিষয় চিন্তা কর। আমরা হুজুগে মেতে কোন ধর্মের ছেলেকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা দেই না।'

আর একটি কথা না লিখলে আমার মনের ৪৫ বৎসরের একটা জ্বলন্ত সত্য কথা বাদ থেকে যায়। সেটা হলো, মুসলিম বোর্ডিং বা মুসলিম ছাত্রাবাসের কথা। স্থানীয় স্বনামধন্য মরহুম রহিমুদ্দিন মোক্তার মোল্লা সাহেব মুসলিম ছাত্রাবাসের জন্য তাঁর বাড়ির সম্মুখে স্কুলের অনতিদূরে দক্ষিণদিকে বেশ মূল্যবান একখন্ড জমি দান করে যান। মিশনারীরা বলেন যে, মৌলভী সাহেব আপনি স্থানীয় মুসলমানদের নিকট হতে চাঁদা আদায় করে বোর্ডিং নির্মাণ করুন। আমরাও মোটা দানের চাঁদা আপনি যাহা ধার্য্য করেন তাই দিব। ১০/১২ বৎসর মুসলমানদের দ্বারে দ্বারে ধর্না দিলাম। কোন সাড়া পেলাম না। পরিশেষে মিশনকে শক্ত করে ধরলাম যে, আপনাদের স্কুলের ছাত্রাবাস যদি আপনারা নির্মাণ না করেন তা হলে কে করবে। তাই চট্টগ্রামের তদানিন্তন মহামান্য বিশপ রেমণ্ড লারোজ, সিএসসি মহোদয় মিশনের ফাণ্ড হতে ৩০/৪০ হাজার টাকা খরচ করে রহিমুদ্দিন মুসলিম ছাত্রাবাস নির্মাণ করে দিলেন।

আর একটি সত্য কথা বলে আমার কথা শেষ করছি। অত্র স্কুলের চতুর্দিকে অনেক মধ্যবিত্ত ও গরীব পরিবারের মুসলিম হিন্দু ছাত্র যাদের আলোকে আজ দেশদেশান্তর উদ্ভাসিত তারা অত্র স্কুল প্রতিষ্ঠিত না হলে হয়তো কেহ কেহ মিলে বা অন্যত্র পাটের গাইট বহন করত। সত্য কথা তিক্ত। তাই আমার কথায় কেহ অসন্তুষ্ট হলে তাতে আমার কিছু আসে যাবে না।

(৪) আমাদের প্রিয় বিদ্যালয়[৯] – মি. জীবন হরি নাথ, শিক্ষক

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের সুবর্ণ জুবিলী পালনকালে অনেক লেখকের মাধ্যমেই স্কুলের বিভিন্ন বিষয়ের ধারণা পওয়া যায়। তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সকলের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরা হলোঃ

কৃষি: কৃষি বিভাগ সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলের একটি লক্ষণীয় দিক। কয়েক বছর পূর্বে (১৯৬৪) কৃষি বিভাগ থেকে নিত্যগোপাল ওঝা যশোর বোর্ড থেকে এসএসসি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে রেকর্ড স্থাপন করে গিয়েছেন। শিক্ষকদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় কৃষি বিভাগের ছাত্ররা বিদ্যালয়ের কৃষি ক্ষেতে ধান ও বিভিন্ন শাক-সব্জি উৎপন্ন করে থাকে। মাঝে মাঝে কৃষি প্রদর্শনীর মাধ্যমে কৃষি শিক্ষা সম্প্রসারিত করা হয়। এখানের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এমনভাবে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা হয় যাতে কর্মজীবনে তারা ক্ষেত-খামারের কাজ করতে এতটকু লজ্জাবোধ না করে। এজন্য কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষক বিজয় আনন্দ নাথকে জানাচ্ছি সাধুবাদ।

---

[৯] সাধু আলফ্রেড উচ্চ বিদ্যালয় সুবর্ণ জয়ন্তী – ১৯৮৩ খ্রি.

স্কাউট ও কাবস্: এই বিদ্যালয়ের স্কাউট ও কাবস্ সোনালী স্মৃতির বার্তাবাহক। জাতীয় ও আঞ্চলিক 'র‍্যালীতে' যোগ দিয়ে তারা পুরস্কৃত হয়েছিল কয়েকবারই। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে নিয়োজিত স্কাউট ও কাবেরা শৃঙ্খলা রক্ষায় বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে এবং এখনও দিচ্ছে। চলতি বছর (১৯৮৩) খ্রি. এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে পুলিশ বিভাগের অন্যতম এক প্রধান কর্মকর্তা আমাদের স্কাউট ও কাবদের ক্রীড়া নৈপূন্যে মুগ্ধ হয়ে দুইখানা শিল্ড পুরস্কার দিয়ে এ বিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। এ গৌরবের বাহক স্কাউট মাষ্টার রেমন্ড মধু এবং আমাদের প্রিয় ছাত্রবৃন্দ।

খেলাধুলা: খেলাধুলা শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে আমাদের স্কুলের ছাত্ররা ফুটবল, ভলিবল, সফ্‌ট বল, ওয়াটার পোলো, বাস্কেট বল, হাডুডু, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলায় বেশ নিপুণতার পরিচয় দিয়ে অনেক পুরস্কার অর্জন করেছে। এই বিদ্যালয়ের বাস্কেট বলের একটি দল আন্তঃস্কুল খেলায় খুলনা বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে ঢাকায় গিয়েও সুনাম অর্জন করেছিল। এছাড়া বেশ কয়েকবার এ বিদ্যালয়ের ফুটবল দল থানা পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে জিলা পর্যায়েও গৌরব অক্ষুন্ন রেখেছিল। বস্তুতঃ ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দেও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাছাড়া প্রত্যেক বছরেই ইন্টার বাস্কেট বল, হাডুডু, ওয়াটার পোলো হয়। চলতি বছর ক্রীড়ামোদি ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য ক্রীড়াঙ্গনের বহুবিধ সংস্কার সাধন করা হয়েছে। এই বিষয়ে বাখেরগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী অফিসারের আর্থিক সাহায্য উল্লেখযোগ্য। খেলাধূলার বিভিন্নমুখী অগ্রগতির জন্য সাধুবাদ জানাতে হয় ক্রীড়া-শিক্ষক হাবিবুর রহমানকে এবং ব্রাদার এথেলবার্টকে।

নাট্য বিভাগ: অভিনয়কে শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এ বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ও শিক্ষকা সম্মিলিতভাবে অতীতে যেরূপ অভিনয়ে নৈপূন্য প্রদর্শন করে দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে পেরেছে, বর্তমানেও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটেছে বলে মনে হয় না। প্রতি বছরই বেশ জাঁকজমক সহকারে এই বিদ্যালয়ের হলে নাটক মঞ্চস্থ হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য যে, শাহজাহান ও রাজসন্ন্যাসী নাটকে আমাদের অভিনয়ের কথা কোন দর্শক ভুলতে পারেনি। চলতি বছরও (১৯৮৩) খ্রি. বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক সমবিব্যহারে 'আসামী হাজির' নাটকখানি মঞ্চস্থ করতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

সংস্কৃতি ও নাচগান: সংস্কৃতি বিভাগ শিক্ষাঙ্গন থেকে দূরে সরিয়ে দিলে বোধকরি শিক্ষার অঙ্গহানি হবে। কারণ 'নয়নের অংশ যেমন নয়নের পাতা'। এ বিদ্যালয়ের বিতর্ক বিভাগ অতীতে যেমন অবদান রেখেছে তেমনি ১৯৮২ ও ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে এ বিদ্যালয়ের বিতর্ক বিভাগের দলটি মৌসুমী প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে পুরস্কৃত হয়ে মহাকুমা পর্যন্ত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে পুরস্কারের অধিকারী হয়েছিল।

চলতি বছরে কবিতা আবৃত্তিতে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে এ বিদ্যালয়ের এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে আমাদের দুজন ছাত্র-ছাত্রী মাননীয় মহকুমা প্রশাসকের দেয়া মোট ৪টি পুরস্কার লাভ করেছে। একই অনুষ্ঠানে নাচ ও গানে অপূর্ব কলাকৌশলের পরিচয় দিয়ে আমাদের কয়েকজন ছাত্রী পুরস্কার অর্জন করেছে। এজন্য সঙ্গীত শিক্ষক ব্রায়েন গোমেজ এবং শিক্ষয়িত্রী জসিন্তা দিদি, নীলুদিদি ও রেনু দিদিকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গত একটানা দুই বছরে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র বাসুদেব সরকার ও তার দল জারিগানে থানা পর্যায়ে প্রথম স্থান অর্জন করে জেলা পর্যায়েও পুরস্কৃত হয়েছিল। বাসুদেবের সুললিত কণ্ঠস্বর সমগ্র বাখেরগঞ্জ উপজেলায় একটি গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা: এ বিদ্যালয়ে প্রতিবছর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। চলতি বছর মহকুমা প্রশাসক এ অনুষ্ঠানে সভাপতি করে অনুষ্ঠানের গৌরব বর্ধন করেছেন এবং নিজ হাতে বিজয়ী ও বিজয়িনীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এ বিদ্যালয়ে প্রতি বছর প্রতিটি শ্রেণির বিভিন্ন শাখাগুলিতে বার্ষিক পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল লাভের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীকে পুরস্কার দেয়া হয়। পাশপাশি বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতির জন্যেও পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে।

হাতের কাজ: এ বিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকে শুধুমাত্র ছাত্রীদেরকে সুচি ও পাট শিল্প এবং ছাত্রদেরকে মাটির কাজ ও অঙ্কন বিদ্যা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। পাটের মাধ্যমে ছোট ছোট মেয়েরা যেসব জিনিস তৈরি করে যাচ্ছে তা সত্যই প্রশংসনীয়।

(৫) বিদ্যালয়ে কৃষি ও বিজ্ঞান শিক্ষা[১০] – মি. বিজয় আনন্দ নাথ

সেন্ট আলফ্রেডস হাই স্কুলে কৃষি ও বিজ্ঞান বিষয়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। অন্যভাবে বলা যায় এই বিদ্যালয়টি কৃষি বিদ্যালয় হিসেবে যশোর বোর্ডে বেশ সুনাম অর্জন করেছে। যতটুকু স্মরণ করতে পারি ব্রাদার কনষ্ট্যান্ট, সিএসসি মহোদয় পাদ্রীশিবপুরে যে কৃষি বিপ্লব এনেছিলেন তার প্রভাব সমস্ত গ্রামেই পড়েছিল। সেই সাথে সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুল একটি শাখা হিসেবে কৃষিবিজ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়েছে পাকিস্তান আমলের মধ্যভাগ থেকেই। এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধে সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুলের মাননীয় শিক্ষক মি. বিজয় আনন্দ নাথ একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধটি কিছুটা পরিমার্জন করে নিম্নে তুলে ধরছিঃ

''পৃথিবীর মধ্যে বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। কৃষির উন্নতি ছাড়া দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির সম্ভাবনা কম। আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় উদ্ভিদ তত্ত্ব, প্রাথমিক বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান স্থান লাভ করেছে। মানুষের দেহের পুষ্টি ও বুদ্ধি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু এই শিক্ষাকে ক্লাস রুমের ভিতরে এবং পুঁথি-পত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। এটি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হয়নি।

শিশুদের মনে সৃষ্টির যে সুপ্ত ব্যাকুল উদ্দীপনা রয়েছে এই গাছপালা লাগানো ও হাঁস-মুরগী পোষার মাধ্যমে তার পরিস্ফুটনের ব্যবস্থা হয়নি বলেই মাধ্যমিক স্তরে কৃষি শিক্ষার প্রচলন কিশোর মনে তেমন দোলা দিতে পারেনি। যার জন্য শিক্ষা ও কৃষি বিভাগের নানারূপ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মাধ্যমিক স্তরে কৃষি শিক্ষা পুঁথিগত বিদ্যায় সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে।

আমাদের প্রায় সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়েই কিছু পরিমাণ জমি আছে। এই জমিটুকু অবলম্বন করে বীজতলা তৈরি করে ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি থেকে সংগৃহিত আলু-টমেটো, মরিচ-বেগুন এবং নানাবিধ ফুলের বীজ বোনা হবে। তাতে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ পরিশ্রমে ও কর্মকুশলতায় বীজ বুনবে, তার গতি-প্রকৃতি দেখে হাতে কলমে শিক্ষা পাবে ও অভিজ্ঞতা লাভ করবে। এ শিক্ষা তারা কখনও ভুলবে না এবং এটি তাদেরকে পরবর্তী স্তরের কৃষি শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ করবে এবং গার্হস্থ্য জীবনে খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ যোগাবে।

---

[১০] সাধু আলফ্রেড উচ্চ বিদ্যালয় সুবর্ণ জয়ন্তী – ১৯৮৩ খ্রি.

এই দিক দিয়ে সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুল শিশু শ্রেণি হতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত কৃষি শিক্ষার দিকে জোর দেওয়ায় প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী নিজ হাতে কাজ করে আসছে। যেহেতু শিশু থেকেই ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে ছোট ছোট বাগান থেকে আরম্ভ করে বাড়িতেও বাগান করে, সেহেতু মাধ্যমিক স্তরে তারা স্কুলের বাগান তৈরি করে এবং নিজ হাতে উন্নতমানের ধান বীজতলা থেকে শুরু করে কাটা পর্যন্ত নিজেরাই করে। স্কুলে যে শিক্ষা পায় সেই অনুসারে তারা বাড়িতে সবুজ সার তৈরি, গোবর সংরক্ষণ, উন্নতমানের বাগান তৈরি থেকে শুরু করে পিতার সাথে মাঠেও কাজ করে। যেহেতু তাদের শিক্ষা হাতে-কলমে সেই দিক দিয়া তারা এস.এস.সি পরীক্ষায়ও পিছিয়ে নেই। প্রতি বছর কৃষি বিভাগে বহু ছাত্র-ছাত্রী ১ম বিভাগে পাশ করছে। এমনকি আমাদের স্কুলের ছাত্র নিত্যগোপাল ওঝা কৃষি বিভাগে এস.এস.সি পরীক্ষায় ১ম স্থান লাভ করেছে।"

(৬) প্রথম পঞ্চাশ বছরে প্রবেশিকা/মেট্রিক/এসএসসি পাস করা ছাত্রদের সংখ্যা[১১]

সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলের প্রথম ২৫ বছরের ছাত্র-ছাত্রীদের বোর্ড পরীক্ষায় পাসের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছিলাম। তবে ৫০ বছরের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে লেখাটি অনেক বড় হয়ে যাবে। তাই একটি সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান তুলে ধরছি। ১৯৮৩ শিক্ষাবর্ষে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪২০ জন। বিগত ৫০ বছরে যারা বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা, ম্যাট্রিক, এসএসসি পাস করেছে তাদের পরিসংখ্যান নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

বছর	প্রবেশিকা/মেট্রিক/ এসএসসি উত্তীর্ণের সংখ্যা	বৎসর	প্রবেশিকা/মেট্রিক/ এসএসসি উত্তীর্ণের সংখ্যা	বৎসর	প্রবেশিকা/মেট্রিক/ এসএসসি উত্তীর্ণের সংখ্যা
১৯৩৭	০২	১৯৫৩	২৯	১৯৬৯	২৬
১৯৩৮	০৭	১৯৫৪	৩০	১৯৭০	২৪
১৯৩৯	১২	১৯৫৫	৩১	১৯৭১	৪৪
১৯৪০	০৭	১৯৫৬	৩২	১৯৭২	৪৮
১৯৪১	০৭	১৯৫৭	২৬	১৯৭৩	৪৮
১৯৪২	১৪	১৯৫৮	২৩	১৯৭৪	২০
১৯৪৩	১৩	১৯৫৯	২৩	১৯৭৫	৩৬
১৯৪৪	২৪	১৯৬০	২৭	১৯৭৬	৪২
১৯৪৫	২০	১৯৬১	৩৬	১৯৭৭	৩৮
১৯৪৬	২৮	১৯৬২	৩৪	১৯৭৮	৩০
১৯৪৭	২৩	১৯৬৩	২৮	১৯৭৯	৩৪
১৯৪৮	১৫	১৯৬৪	২৫	১৯৮০	৩৬
১৯৪৯	২২	১৯৬৫	২৭	১৯৮১	৪৩
১৯৫০	১৭	১৯৬৬	২৪	১৯৮২	৪৬
১৯৫১	২৩	১৯৬৭	১৮	১৯৮৩	৬১
১৯৫২	২০	১৯৬৮	৩৩		

[১১] সাধু আলফ্রেড উচ্চ বিদ্যালয় সুবর্ণ জয়ন্তী – ১৯৮৩ খ্রি.

॥ চ ॥ সেন্ট আলফ্রেড স্কুলের প্লাটিনাম জুবিলী -২০০৮ খ্রি.

(১) ঐতিহাসিক বিবর্তনের সংক্ষিপ্তসার[১২]

ঐতিহাসিক ধারবাহিকতার জন্যে যে তথ্য প্রয়োজন তা সত্যই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তবে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে প্লাটিনাম জুবিলীতে যে স্মরণিকা প্রকাশিত হয় তার আলোকে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুলের কিছু তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

''১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত হন ব্রাদার জেরার্ড, সিএসসি। তিনি অনুভব করলেন ধান, নদী, খালের দেশ বরিশালকে কৃষিভিত্তিক উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। তাই প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি কৃষি শিক্ষাকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত করার জন্য ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে কৃষি বিভাগের অনুমোদন করান। সে থেকে কৃষি ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা আজও বিদ্যালয়টিতে চালু রয়েছে। সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলে পরবর্তী প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব লাভ করেন রেভারেণ্ড ব্রাদার জর্লাদ ডি'সুজা, সিএসসি। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে আসেন আর একজন মহান পুরুষ রেভারেণ্ড ব্রাদার এলবারিক, সিএসসি। তিনি অনুভব করেন বিজ্ঞান ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। তিনি ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখা উন্মুক্ত করলেন। এরই মধ্যে বিদ্যালয়ের এল টাইপ দ্বিতল পাকা ভবনের কাজ শেষ হয় ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে।

সময়ের দাবীতে বাংলার লড়াকু মানুষ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলো, দেশকে স্বাধীন করার মহান ব্রত নিয়ে ছাত্র-জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ল মুক্তিযুদ্ধে। প্রধান শিক্ষক তখন স্বর্গীয় ভেনানসিও ডি'কস্তা। দীর্ঘ ৯ মাস স্থগিত থাকে স্কুলের কার্যক্রম। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রই প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বিদ্যালয়ের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছে। ফলশ্রুতিতে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে দেশ স্বাধীন হবার পরে স্কুলের কার্যক্রম যথারীতি শুরু হয়। স্বাধীনতার পর পরই ছাত্র সমাজের নৈতিক বিকাশের দায়িত্ব নিয়ে স্বাধীন দেশে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় রাজেন্দ্র মোহন নাথ। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের নানা সাফল্য আসে এবং শেষ হয় বাবু রাজেন্দ্র মোহন নাথ (রাজেন স্যারের) প্রধান শিক্ষকতার সময়কাল। দায়িত্বপ্রাপ্ত হন বিদ্যালয়েরই কৃতি ছাত্র, আদর্শ শিক্ষক শ্রদ্ধাভাজন মি. আলবার্ট গোমেজ। ৯০ দশকের শেষের দিকে দেশে যখন ব্যবসায় শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটে তার সাথে তাল মিলিয়ে পাদ্রীশিবপুর সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুলেও ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে যশোর বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন পায় ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ। সেই থেকে বিদ্যালয়টিতে একই সাথে মানবিক, কৃষি, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ সমূহ চালু রয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি চরিত্র গঠন, শরীর গঠন, খেলাধুলা ও অন্যান্য সহশিক্ষার ক্ষেত্রে স্কুলটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে। সহশিক্ষা হিসেবে বিদ্যালয়টিতে চালু রয়েছে স্কাউটিং, গার্লস গাইড, কাবিং, বিজ্ঞান ক্লাব, সাহিত্য ক্লাব, সাংস্কৃতিক ক্লাব, চারু ও কারুকলা ক্লাব এবং বিতর্ক ক্লাব।

---

[১২] *সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুল: প্লাটিনাম স্মরণিকা ২০০৮ খ্রি.*

খেলাধুলায় বিদ্যালয়টি জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কৃত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে এবং প্রথম বিভাগে ও জাতীয় দলে অংশগ্রহণ করেছে এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা। ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেটবল, ওয়াটার পলো, হ্যান্ডবল, দাবা, ব্যাডমিন্টন খেলায় আন্তঃস্কুল ও আন্তঃজেলা, আন্তঃবিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে এ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। একই সাথে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক শিক্ষা পাঠক্রমের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক আলবার্ট গোমেজ অবসর গ্রহণ করলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন লরেটো সিস্টার এ্যাগনেস ইভন গোমেজ, আই.বি.ভি.এম। তার তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়টি নতুনরূপে পথচলা শুরু করে। "শিক্ষার সাক্ষ্য সেবাদানে" এই মন্ত্রে শিক্ষার্থীদের দীক্ষিত করার মহান ব্রত নিয়ে বিদ্যালয়ের ৭৫তম বর্ষ পূর্তিতে প্লাটিনাম জুবিলি উদ্‌যাপনের দ্বারপ্রান্তে এই মহিয়সী নারী মানব সেবায় জীবন উৎসর্গের শপথ গ্রহণকারী সদা হাস্যোজ্জ্বাল, শান্ত, দৃঢ় চিত্ত, কর্মদীপ্ত এই দৃশ্যমান দেবী বিদ্যালয়টিকে শিক্ষার্থীদের তীর্থস্থানে রূপান্তরের কাজে লিপ্ত। প্লাটিনাম জুবিলীকে কেন্দ্র করে নির্মাণ করা হয়েছে চারতলা বিশিষ্ট জুবিলী ভবন। নতুন সাজে সাজানো হয়েছে বিদ্যালয়টির সব ভবন, মানসিকভাবেও সাজ সাজ রব যেন প্রতিটি আলফ্রেডিয়ানদের মধ্যে বর্তমানে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ১৮৫০ জন, শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা ৩৩ জন, ৩য় শ্রেণির কর্মচারী ৩ জন, ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী ৬ জন।"

(২) স্মৃতিচারণমূলক শুভেচ্ছা-বাণী

Reminiscences of Brother Conrad Auger, CSC (Former Headmaster, 1956-58)[13]

My Dear Padrishibpur

I, as ex-headmaster from 1955 (Primary) and 1956 to 1959 (High School) organised the first 25th Anniversary and I was also present at the 50th travelling then from in South India where I was posted.

On behalf of my confreres who devolop themselves in Padrishibpur, I wish you the brightest of success in the celebration of the 75th Anniversary of the school that we will ever keep with a fond and dear memory in our heart. And may I recall the names of some great people who were at the begnning of St. Alfred's High School and helped make it a bit what is it today.

Bro. Godfrey, the founder whose life is so well described in Bro. Alberic's "A Giant of our Massion". Bro. Flavian, whose life is also written by the same author in the book English and Bengali,: The great Flavian and who is up for eventual beatification. And so many others, to mention only the ex-headmasters, such as late Bro. Paul, late Bro. Robert, Bro. Hamel, ex-Bro. Gerad, Bro. Alberic, late Mr.Venancio D'Costa, Mr. Albert Gomes and not forget his father late Mr. Joseph Gomes lovingly remembered as Joseph Babousi as the very first collaborator to show up at the arrival of Bro. Godfrey in Padrishibpur and who continued to serve so devotedly all his life. I will be so happy to have some photos and write up on the celebration for publication here to let know our conferes here the happy events that have taken place in Padrishibpur.

[১৩] সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুল: প্লাটিনাম স্মরণিকা ২০০৮

I guess we will have all that to enjoy on the school website of Padrishibpur on our computer here. That will be like living again the good old days in the modern context; a dream come true! I guess Bro. Alberic now in Dhaka and the only Canadian Holy Cross Brother left in Bangladesh is going to be our perfect representative to the celebrations. With my regards and best wishes.

Yours lovingly,

Bro. Conrad Auger, csc

Reminiscences of Brother Jarlath D'Souza, csc (Former Headmaster, 1963-65)[14]

St. ALFRED REMEMBERED

1. I have spent at least three different stages of my life in this beautiful village of PADRISHIBPUR, and much of those times were with St. Alfred's School.

First, as a school boy, 1944-46, as a student of St. Placid's then temporarily located in Padrishibpur. Our hostel was by the very peaceful river SRIMANTA, in which we bathed sometimes. Two Boardings side-by-side, St. Joseph's Boarding of St. Alfred's and St. Placid's Boarding.

We played football together, the boys of St. Joseph's Boarding and the St. Placid's boys. The Inter-School Football Tournaments had just- started in those years. We put up a combind team, in the name of St. Alfred's. I was the Goal Keeper of the combined team, and we won our first match, on St. Alfred's ground, against Shyampur H. School, though because of the very slippery ground conditions I concended one goal.

2. In February 1949, I came back to Padrishibpur, this time as a young Brother. Our residence was near the "moth" monument, by the side of which is now the new Seminary I am told. I was studying for my I.A. and B.A privately, and had the St. Alfred's School Sanskrit Teacher, Keshav Ch. Thakur Kavya Tirtha (Pandit Mahasay) as my Bangla Teacher.

At the same time I taught English in Class seven and Eight of St. Alfred's. Among my best students of those days were Altaf Gazi (later Teacher at St. Alfred's.) Dr. Vivekananda Nath MBBS (son of Rajen Babu), Joseph Sarker (later at the Oriental Institute, Sagardi), Father Phillip D'Rozario (now Vicar General of Chittagong Diocese), Mahbub Alam (later in Diang), Norbert Gomes "boyati" (later in Khulna), Sushil Kumer Sarker (famous NGO worker for the poor), Joseph Madhu (now running two schools in Dhaka), Lalit K. Howlader (father of Fr. Subrata Howlader {now Archbishop Of Chittagong), Andrew Biswas (social worker) Joseph Baroi (later in Bandarbon), Peter Gain (founder of BDS, Barisal), Murtuza Mollah, Stephen Gomes (Udayan School), Biren Bhattachaejee and so many others.

[14] সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুল: প্লাটিনাম স্মরণিকা ২০০৮ খ্রি.

Also helped to organize games of St. Joseph's Boarding and St. Alfred's School. At that time there were also two Government-aided Orphanages in the Boarding campus, one for Muslim boys and one for Christian boys. There was also G.T (Guru Training) Boarding by the river side, near the "Kumar-bari". And finally a Catechist Training Academy, run by the then expert Fr. St.Pierre. I was connected with all these Institutions. For games, beside football and volleyball, we also played soft-ball and "Chinese ball" (throw ball), ha-du-du and "Dharia-bandha". Those were great sporting days for St. Alfred's and also for me. In the Inter-School football competitions, St. Alfred's usually became champions in the District and at the same time one swimmer (Abdus Salam) as the Divisional champion took part in the national Inter-School swimming Championships in Dhaka.

3. I left Padrishibpur in 1951, but came back again in 1963, this time as Headmaster of St. Alfred's School. I was at that time the first Bengali Brother to be the Headmaster of any Mission School. The late Venancio D'Costa was my able Assistant Headmaster, and Sushil Sarker my Office Secretary. While I was Headmaster, we organized voluntary labour of the students and the Teachers, and enlarged the football ground, closing the school for three days and taking mud from the river. We also built a class-room for the teaching of Islamiat, paid for by the Government of Pakistan. The School revived the nouka-baich(boat races) on the Srimanta, and we had grand Inter-village football and ha-du-d,u tournaments. During this time, a team from Chittagong (under Bro. Hamel) came to play in the Rohini Kumer Shill Memorial football tournament.

During my time the Agriculture Group was introduced, one of the very first in the whole Province. From our first batch all passed and one secured First Place in the Jessore Board in1964. Gardening was made compulsory subject in all classes. The school also started (under Bro. Constant) a Savings Bank system for the students and a "Kitchen Market" cooparative for the teachers. The Boy Scouts group was revived, with both the teachers, Mahbub Alam and Habibur Rahman, sent for training in Dhaka.

4. I would like to mention here the names of some famous "Old Boys" of the school:- Hera Ch. Ratna of Narikelbari (Headmaster in many schools), Dr. Kazi Saadat Hossain, Ph.D. of Moukoron village (Profesor in Canada), Dr. Ashrafuddin Ahmed of Krishnakathi (Vice-Chancellor of the Agriculture University in Mymemsingh), Dr. A.K. Azad (renowned physician and Director of the Diabetes Hospital in Dhaka), Bishop Patrick D'Rozario,csc (Bishop of Chittagong).

But we cannot forget our pioneer Headmaster, Brother Flavien, csc (now going to be declared a saint of the Catholic Church, hermit of Diang), then Bro. GODFREY (the giant in all respects, nick-named the "tiger" of the Sunderbans), Bro. Paul Lemieux (the organizer), Bro. Hamel (the musician) Bro. Gerad Arsenul, Bro. Alberic and the other brother headmasters.

Also, the great past Teachers of the School must be remembered-Satish Babu (pro-Headmaster for many years); Rajen Babu (Rajendra Mohan Nath) who walked to and from School from his residence six miles everyday; Mvi. Abdur Razzak, the Arabic scholar who always wore a "Fez" cap; Mvi. Hatem Ali, Luxmi Kanta Nath, Chittaranjan Howlader, Venancio D'Costa, Gazi Altaf Hossain, Mahbub Alam, etc. The names of many of these personalities should be engraved in golden letters and put in some prominant place on the school campus. And, can we ever forget Sylvester Gomes, the composer of the melodious School song:

'Dhirey, Dhirey,
Srimanta tirey,
Dhire Bohe re.'

(৩) ১৯৩৩-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রধান শিক্ষকদের নাম[১৫]

১) ব্রাদার গডফ্রে ডেনিস, সিএসসি (১৯৩৩-১৯৩৪)
২) ব্রাদার ফ্রেবিয়ান লাপ্লান্ত, সিএসসি (১৯৩৪-১৯৩৬)
৩) ব্রাদার জি. মার্টিন, সিএসসি (১৯৩৭-১৯৩৮)
৪) ব্রাদার এলড্রিক ডেনিস, সিএসসি (১৯৩৯-১৯৪০)
৫) ব্রাদার গডফ্রে ডেনিস, সিএসসি (১৯৪১-১৯৪৫)
৬) ব্রাদার গেস্টিনা, সিএসসি (১৯৪৬-১৯৪৮)
৭) ব্রাদার পল, সিএসসি (১৯৪৯-১৯৫০)
৮) ব্রাদার রবার্ট, সিএসসি (১৯৫১-১৯৫৩)
৯) ব্রাদার হ্যামেল, সিএসসি (১৯৫৩-১৯৫৫)
১০) ব্রাদার কনরাড ওজে, সিএসসি (১৯৫৬-১৯৫৮)
১১) ব্রাদার জেরার্ড, সিএসসি (১৯৫৯-১৯৬২)
১২) ব্রাদার জার্লাদ ডি'সুজা, সিএসসি (১৯৬৩-১৯৬৫)
১৩) ব্রাদার হ্যামেল, সিএসসি (১৯৬৬-১৯৬৭)
১৪) ব্রাদার এলবারিক, সিএসসি (১৯৬৭-১৯৭০)
১৫) মিস্টার ভেনানসিও ডি'কস্তা (১৯৭১-১৯৭২)
১৬) শ্রী রাজেন্দ্র মোহন নাথ (১৯৭৩-১৯৭৭)
১৭) মিস্টার আলবার্ট গোমেজ (১৯৭৮-২০০৬)
১৮) সিস্টার আগনেস ইভন গোমেজ, আইবিভিএম (২০০৭-২০১২)
১৯) সিস্টার এম. অর্চনা, আইবিভিএম (২০১০-২০১৪)
২০) সিস্টার মনিকা রোজারিও, আইবিভিএম (২০১৫-২০১৭)
২১) সিস্টার এ্যাগনেস ইভন গোমেজ, আইবিভিএম (২০১৭-২০২৩)
২২) সিস্টার এম. অর্চনা, আইবিভিএম (২০২৩- চলমান)

(ছ) নারী শিক্ষা ও সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুলটি কলেজে উন্নীতকরণ : ২০২১ খ্রি.[১৬]

সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই কোন এক সময়ে সেই সময়কার ফাদারগণ অনুভব করেন যে প্রকৃত উন্নয়নের জন্যে নারী শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। বিশেষ করে পরিবার গঠনে নারীদের ভূমিকা প্রধান। তাই তাদের মাঝে যদি শিক্ষার আলো না থাকে তবে পরবর্তী প্রজন্ম সঠিকভাবে শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারবে না। উল্লেখ করা যেতে পারে যে ছেলেদের শিক্ষার জন্যে ইতোমধ্যেই সেন্ট আন্তনী প্যারিশ স্কুল ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত চালু ছিল যা পুর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি মেয়েদের শিক্ষার জন্য চালু করা হয়ে সেন্ট যোসেফস্ প্রাইমারী স্কুল। আমাদের গ্রামের অনেক মেয়েই এই স্কুলে লেখাপড়া করেছে। এই স্কুলটি তখন মিশন বাড়িতেই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতো। যারা এই স্কুলে লেখাপড়া করেছে তাদের মধ্য থেকে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য অনুসারে জানা যায় যে এই সেন্ট যোসেফস্ প্রাইমারী বিদ্যালয়ে তখন ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করা

[১৫] সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুল: প্লাটিনাম স্মরণিকা ২০০৮ খ্রি.
[১৬] মিসেস আইরিস গোমেজ, বর্তমানে ভারত, ঠাকুর পুকুর ও কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও

হতো। আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে সেসময়ে ৫ম শ্রেণির ছাত্রীরা বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে এবং তাদের মধ্যে মেধাবী মেয়েরা বৃত্তি লাভ করেছে। সেই বিদ্যালয়ে এক সময়ে যারা সেবা দিয়েছেন তারা হলেনঃ

মিস্ আইরিস গোমেজ - প্রধান শিক্ষিকা (মোক্তার বাড়ি), মিস্ ডলি গমেজ - শিক্ষিকা, মিস্ আগ্নেস ডি'রোজারিও, (সাভার, ঢাকা) - শিক্ষিকা, জানি মাষ্টার (দক্ষিণ) – শিক্ষিকা, মিস্ তেরেজা কৈলু – শিক্ষিকা, এবং মিস্ লুসিয়ানা ডি'কস্তা – শিক্ষিকা (সেলাই কাজ, হাতের কাজ, পাটের কাজ ইত্যাদি) এসময়ে যারা শিক্ষাদান করতেন তাদের আন্তরিকতার কোন কমতি ছিল না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে তারা মিশনের ফাদার ব্রাদারদের সহযোগিতায় ও উৎসাহে তাদের সাধ্য অনুসারে শিক্ষাদান করতেন। পরবর্তীতে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে মেয়েদের জন্যে বাংলা মিডিয়াম হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এবং তা ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে বরিশালে প্রভাতী স্কুল নামে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রভাতী স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায় এবং পাদ্রীশিবপুরের মেয়েরা সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলে পড়াশুনা শুরু করে। এই সময় থেকেই সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলে কো-এডুকেশন চালু হয় যা বর্তমান পর্যন্ত আছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নতুন শিক্ষানীতি–২০১০ খ্রি. অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা মাধ্যমিক স্তরে নিয়ে আসবে। অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়টি স্কুলের সাথে একীভূত করা হবে। তবে তা করতে গিয়ে অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও পড়তে হয়। কারণ স্কুলের অবকাঠামো এবং শিক্ষক স্বল্পতা সকল স্কুলকে এ পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব নয়। তখন যে সকল স্কুলের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং কলেজ পর্যায়ে উন্নীত করার যথেষ্ট ভালো পরিবেশ বিদ্যমান সেই সকল স্কুলকে স্কুল এন্ড কলেজ নামকরণ করে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা চালু করা যেতে পারে। এরই ধারাবাহিকতায় বাখেরগঞ্জ উপজেলায় পাদ্রীশিবপুর সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে উন্নীত করার জন্য নির্বাচিত করা হয়। ২০২১ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলটি উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদানের অনুমোদন লাভ করে। এ সময় স্কুলটির প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন সিস্টার এ্যাগনেস ইভন গোমেজ, আইবিভিএম। এভাবেই স্কুলটি উন্নীত হয় 'সেন্ট আলফ্রেড স্কুল এবং কলেজ'' হিসেবে। বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম সার্থকতার সাথেই চলমান রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: স্বাস্থ্য-সেবা : ফাতিমা স্বাস্থ্য কেন্দ্র[১৭]

পাদ্রীশিবপুরে মানুষের স্বাস্থ্য সেবার মহান উদ্দেশ্যে ফাতিমা স্বাস্থ্যকেন্দ্র অনন্য অবদান রেখে চলেছে। এই যাত্রা শুরু হয়েছিল ১১ মে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে। সেসময় হলি ক্রস সিস্টারগণ এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের গোড়াপত্তন করেন। সেই সময়ে মানুষের জীবন রক্ষা বিশেষ করে শিশু ও নারীদের চিকিৎসা সেবাদানের ক্ষেত্রে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্র ছিল একমাত্র ভরসা। কেবল পাদ্রীশিবপুর নয় গোটা বাখেরগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে রোগীরা এখানে এসে চিকিৎসা গ্রহণ করতো।

সেবাসমূহ: হলিক্রস সিস্টারগণ রোগী দেখতেন; বিভিন্ন রক্ত পরীক্ষা করতেন, বিশেষভাবে সেই সময় ম্যালেরিয়া ও কালা জ্বরের প্রকোপ খুব বেশি ছিল। গর্ভবতী মা ও ৩ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু ক্লিনিকের মাধ্যমে শিশু পরিচর্যা। স্বাস্থ্য শিক্ষা - শিশু ক্লিনিকের মায়েদের রোগ প্রতিরোধক, পুষ্টি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ইত্যাদি বিষয়ের উপর যে শিক্ষা দেওয়া হতো, বছর শেষে এসব শিক্ষার উপর প্রতিযোগিতা হতো এবং শিশুদের সঠিক বৃদ্ধি, ভালো স্বাস্থ্য এবং যেসব শিশুর স্বাস্থ্য ও ওজনের ক্ষেত্রে খারাপ থেকে ভালোর দিকে উন্নতি করেছে তাদের মায়েদের পুরুস্কৃত করা হতো। বছর শেষে ''বেবী-শো''নামে এই উৎসব এলএইচসি সিস্টারগণও চালিয়ে নিয়েছেন। স্থানীয় কয়েকজন হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিস্টান মহিলাকে ধাত্রী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

ফাতিমা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম আশে-পাশের এলাকার জনগনের কাছে "লেডি ডাক্তারখানা" নামে সুপরিচিত ছিল। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের কারণে গ্রাম থেকে বরিশাল শহরে সিষ্টারগণ চলে যান। নার্সদের সহযোগিতায় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ চলতে থাকে। বাবু দেবেন্দ্রনাথ অধিকারী (সিনিয়র নার্স) স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন তারিখ ১৯৬৭-১৯৮৪ পর্যন্ত, তিনি নারিকেলবাড়ী ধর্মপল্লীর রামশিল গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। পরে তিনি পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর সদস্য হন।

১৯৭১ খিস্টাব্দ থেকে এলএইচসি সিস্টারগণ পরিচালনার ক্ষেত্রে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ধাত্রী ট্রেনিং প্রাপ্তগণ ঃ মালগারিনা, মাফিনার মা, সেবি প্রিছিলা (মেরী বিশ্বাসের মা), এনি (পাঙ্খাওয়ালা বাড়ী), বৃজেট ব্রিটো দাত্রী এবং প্যাথলজিতে সাহায্যকারী। এছাড়া কয়েক জন হিন্দু, মুসলমান মহিলাও ধাত্রী ট্রেনিং পেয়েছেন।

ধাত্রী ও নার্স: প্রিছিলা গমেজ, রোজী গমেজ, মালতি গমেজ, বার্থা গমেজ, সেলিন গমেজ

১৯৭২/৭৩ কোর/কারিতাস এর সহযোগিতায় ফাতিমা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে Preventive Health Program শুরু হয় যা পরবর্তীতে Under Five and Maternity Clinic নামে জুন ২০১৬ পর্যন্ত চলমান ছিল, এই প্রোগ্রামের আওতায় মাঠ স্বাস্থ্য কর্মীদের পরিবার পরিদর্শন, উঠান বৈঠক, এবং মাসে বারোটি মোবাইল ক্লিনিক পরিচালিত হয়েছে।

[১৭] সিস্টার আরতি ডি'কস্তা, এলএইচসি

	পরিচালকবৃন্দ	মেয়াদকাল
১	সিষ্টার উদালী সি.এস.সি	১৯৩৬-১৯৩৯
২	সিষ্টার আর্থার সি.এস.সি	১৯৩৯–১৯৪০
৩	সিষ্টার জন সি.এস.সি	১৯৪০–১৯৪১,১৯৪৩–১৯৪৮,১৯৫২,৫৫
৪	মাদার জিন সি.এস.সি	১৯৪২–১৯৪৩
৫	সিষ্টার আলেক্সী সি.এস.সি	১৯৪৯–১৯৫১,'৫৩–'৫৪,'৫৬–'৫৮,১৯৬৪
৬	সিষ্টার ডেমিয়ান সি.এস.সি	১৯৫৯–১৯৬২
৭	সিষ্টার মাদলালিন সি.এস.সি	১৯৬৩,১৯৬৫
৮	ফাদার ডেমার্স সি.এস.সি	১৯৬৫–১৯৬৮
৯	সিষ্টার শিশিলিয়া এল.এইচ. সি	১৯৬৯–৭০, ১৯৭৫–১৯৭৮
১০	সিষ্টার মার্থা এল.এইচ.সি	১৯৭১
১১	সিষ্টার মাগদালেন এল.এইচ সি	১৯৭২–১৯৭৩
১২	সিষ্টার জুলিয়েট এল.এইচ.সি	১৯৭৪
১৩	সিষ্টার আরতি এল.এইচ.সি	১৯৭৯–১৯৮৫,২০০৫–২০০৭,২০১৪–২০২১
১৪	মিস আন্না কোড়াইয়া	১৯৮৬
১৫	মিস্টার মার্টিন সি গোমেজ	১৯৮৭–২০০৫
১৬	মিস্টার আলবার্ট গোমেজ স্যার	২০০৭–২০০৮
১৭	মিস ভেরোনিকা গোমেজ	
১৮	সিষ্টার লাকী এল,এইচ.সি	
১৯	সিষ্টার শেলী এল.এইচ.সি	
২০	সিষ্টার হানিমা এল,এই.সি	

তৃতীয় অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুর কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্র (পি.এ.ডি.সি)[১৮]

পাদ্রীশিবপুরের একটি বড় প্রতিষ্ঠানের নাম এডিসি। ব্রাদার কনষ্টান্ট, সিএসসি এর হাত ধরেই এর যাত্রা শুরু। এই কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্রটি এক সময় বাখেরগঞ্জ উপজেলায় সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। কেবল কৃষি উৎপাদন নয় এর পাশাপাশি কৃষকদের উন্নত মানের বীজ ও নতুন চাষাবাদ কৌশল প্রদানে এই এডিসি অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। এখানে সুদূর ফিলিপাইন থেকে এলেক্স বাবু এবং তাঁর স্ত্রী সেবা দিয়েছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে স্ত্রী বিয়োগের পরে এলেক্স বাবু যাজকবরণ ব্রত গ্রহণ করেন ও মণ্ডলীতে সেবা দান করেন। এছাড়াও বাবু নিশিকান্ত বাড়ৈ এডিসি এর উন্নয়নে ব্রাদারের সাথে থেকে অনেক কাজ করেছেন। প্রয়াত মার্টিন গোমেজও এবং মি. নরবার্ট গোমেজও এই এডিসিতে সেবা দিয়েছেন। তাঁদের সকলের প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। এই লেখাটি মি. মার্টিন গোমেজ লিখেছিলেন। তাই তাঁর লেখাই এখানে তুলে ধরা হলোঃ

[১৮]মার্টিন সি. গোমেজ, পাদ্রীশিবপুর জুবিলী স্মরণিকা – ২০১৬ খ্রি.

"শ্রদ্ধেয় ব্রাদার কনস্ট্যান্ট, সিএসসি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাপানি সৈন্যদের হাতে বন্দী হন, ফিলিপিন্সে বন্দী শিবিরে আটক ছিলেন। বন্দীশালায় ধান ছিটিয়ে দেওয়া হতো, এগুলো টুকিয়ে খুঁটে খুঁটে খেয়ে আধা গ্লাস পানি খেতেন। এভাবে দীর্ঘদিন পরে শীর্ণকায় দেহ নিয়ে মিশনারি হিসেবে বঙ্গদেশের পাদ্রীশিবপুরে আসেন। তিনি এখানে এসে আরেকটি সোনালি ইতিহাস সৃষ্টি করেন। তিনি সেন্ট যোসেফ'স বোর্ডিং পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। প্রায়ই গ্রামে যেতেন, কৃষকদের সাথে কথা বলতেন, সমস্যা শুনতেন - এ নিয়ে কী করা যায়, সে বিষয়ে চিন্তা করতেন। কৃষকদের সমস্যাসমূহ অবলোকন-অনুধাবন ক'রে একটিমাত্র বিষয় তাঁর মনে আসে যে কৃষির উন্নতি ছাড়া কৃষকদের আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব না। এজন্য আর্ন্তজাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্র, ফিলিপিন্স, গ্রাম উন্নয়নের কর্ণধার কুমিল্লা একাডেমি, বাংলাদেশ ধান গবেষণা কেন্দ্র, জয়দেবপুর, কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জয়দেবপুর, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন জায়গা হতে শর্টকোর্স প্রশিক্ষণ নিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ফিলিপিন্সে ধান গবেষণা কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় বাংলাদেশ ধান গবেষণা কেন্দ্রের তৎকালীন পরিচালকও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। হলিক্রস ব্রাদার সুপিরিয়র ও তৎকালীন বিশপ-এর সুপারিশক্রমে পাদ্রীশিবপুরে "কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্র" গড়ে তোলেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের আর্থিক উন্নতি, উচ্চ ফলনশীল ধানের আবাদ, অনাবাদী জমি আবাদ করা, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির সাথে কৃষকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া, উচ্চ ফলনশীল শাক-সবজি, ধান, পাট, সয়াবিন, বাঁধা কপি, ফুল কপি, ব্রকোলি, গাজর, উন্নত জাতের টম্যাটো, মূলা প্রভৃতি চাষের সাথে কৃষকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এছাড়া, প্রজননের মাধ্যমে উন্নত গাভী, হাঁস-মুরগী, মৎস চাষসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা ও তাতে সফল হওয়া। অত্র অঞ্চলে পাওয়ার-টিলার, পাওয়ার পাম্প, পাওয়ার স্প্রে দিয়ে কৃষকদের সহায়তা দেওয়া। সমবায়ভিত্তিক কৃষকদল গঠন করা, সমবায় সমিতি গঠন করা, দলীয়ভাবে ইরি ব্লক করা, ক্রেডিট ইউনিয়নে সহায়তা দেওয়া। উল্লেখ্য, কুমিল্লা একাডেমি'র বর্তমান বার্ড প্রতিষ্ঠাতা জনাব আখতার হামিদ খান সাহেব এ বিষয়ে তাঁর স্বশরীরে উপস্থিতি দ্বারা অনেক সহায়তা করেন। তৎকালীন সময়ের সরকারি কর্মকর্তাগণ সহায়তা করেন। ফিলিপিন্স থেকে উচ্চ ফলনশীল (High Yielding Varieties-HYV) ধানের বীজ এনে একইদিনে পাদ্রীশিবপুর ও জয়দেবপুরের মাটিতে দুই গাটা করে রোপন করা হয়। এতে, ব্রাদারকে অনেকে পাগল মনে করেন। পরে, ক্ষেত ভরা ঢেউ-খেলানো গোছাভরা ধানের ফলন দেখে কৃষকদের মন আনন্দে ভরে যায়। পরে, কৃষকেরা এই প্রযুক্তিগত তথ্য-জ্ঞান নিতে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নেন। ব্রাদার কন্সট্যান্টের আরেকটি গুণ - তিনি নিয়মিত প্রর্দশনী খামার করতেন যাতে কৃষকেরা শিক্ষণ-ফল লাভ করতে পারে। কৃষকদের জন্য তাঁর চিন্তাধারা ছিল এরকম "দেখো, বিশ্বাস করো এবং বাস্তবতায় কাজ করো (Seeing in Believing)।

ব্রাদার কনস্ট্যান্টের বড়ো সাফল্য সেন্ট আলফ্রেডস্ উচ্চ বিদ্যালয়ের সাথে যৌথ উদ্যোগে ছাত্রদের জন্য কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এজন্যে, ফিলিপিন্স হ'তে একজন কৃষি বিশেষজ্ঞ মিঃ আলেক্স রাবানেল, এম. এজি-কে নিয়ে আসেন। সিলেবাস প্রণয়ন করেন ও বই লিখেন এবং ছাত্রদের মধ্যে তা প্রয়োগ করেন, ছাত্রদের বাড়িতে কিচেন গার্ডেনিং চালু করেন। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর সহ ৪টি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানদের নিমন্ত্রণ দেন। দেশ উন্নয়নে ছাত্রদের কৃষি শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন। পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়টি অনুধাবন করে মাধ্যমিক পর্যায়ে সিলেবাসে কৃষিশিক্ষা অর্ন্তভুক্ত করেন। জাতীয় পর্যায়ে এটি একটি মাইলফলক হয়ে আছে এবং

থাকবে। শ্রদ্ধেয় ব্রাদারের এ সকল কাজে সন্তুষ্ট হযে ঐই ভি. সি. মহোদয় সেন্ট আলফ্রেডস হাই স্কুলের ছাত্রদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার অগ্রাধিকার ঘোষণা করেন। এই সুযোগ গ্রহণ করে অনেকে-ই সেই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নেন। তন্মেধ্যে, এ স্কুলের ছাত্র ড. আশরাফ আলী খান, নিজেই ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর (ভিসি), শ্রদ্ধেয় রাজেন স্যারের ছেলে বিকাশ দেবনাথ (এম. এজি), জেলা কৃষি কর্মকর্তা অন্যতম।"

চতুর্থ অধ্যায়: ত্রাণ, পুনর্বাসন ও সমাজ-উন্নয়ন এবং অন্যান্য কার্যক্রম

(১) ক্ষুদ্র সমিতি: সেলাইকাজ, পাটের কাজ, নারিকেলের ছোবা দিয়ে কাঁচি ও দড়ি (বিলুপ্ত)

আগেই যেমনটি উল্লেখ করেছি, পাদ্রীশিবপুরে সেন্ট যোসেফস্ প্রাইমারী স্কুল (মেয়েদের) ছিল। এখানেই শুরু করেছিলেন সেলাই কাজ, পাটের কাজ এবং নারকেলের ছোবা দিয়ে কাছি ও দড়ি তৈরি করার ট্রেনিং দিতেন মিস্ লুসিয়ানা ডি'কস্তা। এই কাজ মেয়েদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য একটি বিশেষ কর্মসূচি হিসেবে বিবেচনা করা হতো। পাকিস্তান আমল এমনকি বাংলাদেশের আমলেও অনেক বছর এ কাজ চালু ছিলো। বিশেষ করে মেয়েদের সেলাই ক্লাস নিয়মিত হতো। আর আমরা দেখেছি যে, মহিলারা পাটের কাজ করতেন এবং বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করতেন। এই হস্তশিল্পের দ্রবাদি 'জাগরণীতে' বিক্রয় করে আমাদের গ্রামের মহিলাগণ বিশেষ উপকৃত হতেন।

(২) কোর-কারিতাস

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে নানা অভাব অনটন দেখা দেয়। যদিও পাদ্রীশিবপুর গ্রামে অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা যুদ্ধের সময় ঘটেনি, তবে কাছাকাছি কালিগঞ্জ ও আরও কিছু গ্রামে বিভিন্ন মানুষের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছিল। এই সময় "কোর" নামক সাহায্য সংস্থা মানবতার সেবায় এগিয়ে আসে। বিশেষ করে স্মরণ করতে পারি আমাদের শ্রদ্ধেয় সুশীল স্যার, কালিগঞ্জের সুনীল দাস, মন্টু মেম্বারসহ বেশকিছু ব্যক্তি এই কোরের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তারা মানুষের ঘরবাড়ি তৈরি, কাপড়চোপড় এবং খ্যদ্য সামগ্রী দিয়ে সেই সময় মানুষকে বিশেষ সহযোগিতা প্রদান করেন। এই সময়ে বিশেষভাবে আমাদের গ্রামে যাদের গোলপাতার ছাউনী ঘর ছিল তা কোরের সহায়তায় টিনের ঘরে পরিণত হয়। কোরের সহায়তায়ই গ্রামে বেশ কয়েকটি গভীর নলকূপ বসানো হয় যা সর্বসাধারণের জন্য বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানির নিশ্চয়তা দান করে। পরবর্তীতে এই কোরের কার্যক্রমই কারিতাস নামে পরিচালনা করে।

(৩) নিউমার্কেট

পাদ্রীশিবপুরের নিউমার্কেট ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের পরেই নির্মিত হয়। একাজে বিশেষভাবে অবদান রাখেন রেভারেণ্ড ফাদার জার্মেন, সিএসসি। প্রতিদিনের বাজারের জন্যে এর পূর্বে স্কুলের খেলার মাঠের উত্তর প্রান্তে একটি স্থান ছিলো। তবে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে উক্ত বাজারটি ভস্মীভূত হয়। এই বাজারে যারা ব্যবসা করতেন তারা আর ব্যবসায় সুবিধা করতে পারেননি। নিউমার্কেটটি আড়াইবেকীতে মিশনের জায়গায় সুপরিকল্পিতভাবেই করা হয়। এখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দোকান বরাদ্দ দেয়া হয়।

কাঁচা বাজারের জন্যে ২ টি বড় বড় খোলা টিন সেড ঘর তৈরি করা হয়। যা বর্তমানেও বাজার হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে। এই নিউমার্কেটের অর্থায়নে তৎকালীন 'কোর' সহায়তা প্রদান করেছিলো। অনেক বছর এই মার্কেটটি মিশনের অধীনেই সচল ছিল। কিন্তু কালক্রমে বিভিন্ন ব্যবসায়ীগণ নিয়মিত দোকান ভাড়া ও বিদ্যুতের বিল পরিশোধ না করাতে মিশনের পক্ষে এই মার্কেট লস প্রজেক্টে পরিণত হয়। তাই তা ব্যক্তি মালিকানায় বিক্রি করে দেয়া হয়। জনাব আবুল বাশার হারুন এই মার্কেটটি মিশনের কাছ থেকে ক্রয় করেন। এই মাকেটেই জনতা ব্যাংকের একটি শাখা আছে। ফলে এলাকাবাসীর টাকা জমা দেয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন আর্থিক লেনদেনে সুবিধা হয়। এমনকি ব্যাংকটি কৃষিঋণও প্রদান করে থাকে ফলে স্থানীয় কৃষকগণ উপকৃত হন।

(৪) ক্রেডিট ইউনিয়ন

পাদ্রীশিবপুর মিশনের উদ্যোগেই স্থানীয় মানুষদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্যে ''পাদ্রীশিবপুর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন'' এর জন্ম হয় পাকিস্তান আমলেই। চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের মধ্যে পাদ্রীশিবপুরে মহিলা সমবায় সমিতির প্রথম বীজ বপন করা হয় (১৯৫৬) খ্রি. এসময়ে সামান্য টাকা পয়সা জমা করেই এই ঋণদান সমিতি পরিচালিত হতো। অনেক বছর এই সমিতি চালু ছিল। বিশেষ করে মহিলাগণ এই সমিতির সদস্যা ছিলেন এবং তারা নিয়মিত সঞ্চয় করতেন। তবে কোন এক পর্যায়ে এই সমিতির বিলুপ্তি ঘটে।

(৫) রিলিফ সামগ্রী (টিনের দুধ)

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরে স্কুলে ও মিশনে রিলিফ হিসেবে কিছু সামগ্রী সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এর মধ্যে ছিল টিনের দুধ, বিস্কেট ও ছাতু ইত্যাদি। বিশেষ করে সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলে এই সমস্ত খাদ্য সামগ্রী ছাত্র-ছাত্রীদের দেয়া হতো। তার পরিমাণ বেশ বেশি ছিল এবং তা নিজ নিজ পরিবারে ছাত্রছাত্রীরা নিয়ে যেতো। স্মরণ করা যেতে পারে এর অনেক আগেও সত্তুরের দশকে যখন বর্তমান সেমিনারীর স্থানে (এক সময়ের এডিসি যেখানে ছিল) প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু ছিল সেখানেও ছাত্র-ছাত্রীদের টিফিন হিসেবে তেলে ভাঁজা রুটি ও টিনের দুধ দেয়া হতো। এখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ চলেছে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এর পরে বর্তমান হাই স্কুলের দালান নির্মিত হলে হাইস্কুলের ছাত্ররা নতুন দালানে ক্লাস করা শুরু করে এবং বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়টি চালু হয়। (এখানেই ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হাই স্কুলের কার্যক্রম চালু ছিল।)

(৬) টিচার্স কোয়ার্টার - দু'টি: মিশন খালের পাড়ে এবং আড়াইবাকী (বিলুপ্ত)

সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুলের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্যে স্থানীয় শিক্ষকগণ যথেষ্ট ছিলেন না। তাই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষকগণ এখানে এসে শিক্ষকতা করেছেন। তাদের বসবাসের সুবিধার জন্যে মোট ছয়টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল। মিশন সংলগ্ন খালের পাড়ে এই ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল। তবে পরবর্তীতে এই ঘরের আর প্রয়োজন না থাকাতে তা বিলুপ্ত হয়।

(৭) কাচারি পুকুর

পাদ্রীশিবপুরের মানুষের জন্যে কাচারী পুকুর একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পুকুর। এটি ফাদার বাড়ির বাইরে পূর্বদিকে অবস্থিত যা বর্তমানেও আছে। যত সময় পর্যন্ত নলকূপের প্রচলন হয়নি তার পূর্ব পর্যন্ত এই পুকুরের পানি ছিল গোটা পাদ্রীশিবপুরবাসীর পানীয় জলের উৎস। আশ্চর্যের বিষয় এই পানি এতই নিরাপদ ছিল যে তা পান করে কেউ উদারাময় রোগে আক্রান্ত হয়েছে এমনটি শোনা যায়নি। এই পুকুরের পানি কেবল পানীয় জল হিসেবেই ব্যবহার করা হতো। এখানে স্নান করা বা কোন প্রকার কোন কিছু ধৌত করা ছিল একেবারে নিষেধ। স্থানীয় লোকেরাও বিষয়টি খুব ভালো করেই জানতো এবং সেইভাবেই এই পুকুরটিকে ব্যবহার করতো। একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন প্রতিদিন স্কুলের ছাত্ররা বিকেল বেলা মাঠে খেলতে আসতো, তাদের সাথে নিয়ে আসতো একটি করে কলসি। আর খেলা শেষে সবাই কলসি ভর্তি করে পানি নিয়ে যেতো। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরেই ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে পাদ্রীশিবপুর গ্রামে কোরের মাধ্যমে অনেকগুলো গভীর নলকূপ বসানো হয় এবং স্থানীয় জনগণ তখন থেকে নলকূপের পানি পান করা শুরু করে। আর এর পর থেকেই কাচারী পুকুরের পানি পান করার প্রচলনটির ইতি ঘটে।

(৮) পুরনো পোস্ট অফিস, দোকানপাট ও ডি'সিলভাদের ঘাট, শ্রীমন্ত নদীর পাড়ে মিশন ঘাট এবং গির্জার সামনে পুলগোড়ার ঘাট; গয়না নৌকার ঘাট

পাদ্রীশিবপুরে কিছু কিছু স্থান আগে ছিল এখনও আছে তবে তার ব্যবহার পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে যেখানে সেমিনারী তার গেটের বাইরেই মাঠের পশ্চিম উত্তর কোণে ছিল পোস্ট অফিস দলান। আকারে ছোট হলেও এর প্রয়োজনের গুরুত্ব বিবেচনায় এটি ছিল পাদ্রীশিবপুরসহ চারিদিকের অনেক গ্রামের যোগাযোগের মাধ্যম। আমাদের অঞ্চলের অনেকেই কোলকাতা, ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রামসহ দূর দূরান্তে চাকুরি করতো। তারা নিয়মিত পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখতো চিঠি ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে। আর এই কাজটি সম্পাদন করতো এই ডাকঘর। মাসের প্রথমভাগে অনেক পরিবারই অপেক্ষায় থাকতো কখন মানিঅর্ডার আসবে। মাঝে মাঝে এই ডাকঘরে এসে অনেকে তার খবরও নিতো। আর যখন বেঞ্জামিন পিওন মানি অর্ডার নিয়ে কারো বাড়িতে যেতেন তারা খুবই খুশি হতেন।

আমাদের শিশুবেলার দোকানপাট বলতে এই পোস্ট অফিসের পূর্বদিকে অবস্থিত বাজারের দোকানগুলিকেই বুঝতাম। এখানে রেষ্টুরেন্টসহ, মুদিদোকান ছিল, থান কাপড়ের দোকান ছিল যেখানে সুতি কাপড়সহ ক্যারোলিন, টিস্যু, সিল্ক ইত্যাদি কাপড় বিক্রি করা হতো। এই বাজারটি সকলের কাছে হাটখোলা নামে পরিচিত ছিল। এবং প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা এখানে কাঁচা বাজার বসতো। ইলিশের সিজনে তো শেষ বিকেলবেলা এখানে মানুষ অপেক্ষা করতো কখন ইলিশের নৌকা আসবে। বাজারের শেষ মাথায় পূর্বদিকে ছিল শ্রীমন্ত-নদী এবং এখানেই ছোট্ট একটি ঘাট ছিল। এই ঘাটেই ইলিশমাছ বোঝাই ডিঙ্গি নৌকা এসে ভিড়তো। আর শুরু হতো সকলের আনন্দের সাথে ইলিশ মাছ বেচাকেনা।

স্কুলের মাঠের পূর্বদিকে মাঝামাঝি স্থানে শ্রীমন্ত-নদীর তীরে ছিল শানবাঁধানো ঘাট। এখানে গয়না নৌকা, 'কেরায়' নৌকা এমনকি লঞ্চ পর্যন্ত ভিড়তো। এই ঘাট মূলত ডি'সিলভাদের ঘাট হিসেবে পরিচিত ছিল এবং পরবর্তীতে মিশন এই মাঠটি যখন স্কুল অধিগ্রহণ করে। ফলে এই ঘাটটিকে

মিশনের ঘাটও বলা হতো। এই ঘাট বিশেষ প্রসিদ্ধ এই জন্য যে যখনই কোন বিশেষ ব্যক্তি যেমন সরকারী অফিসার বা মিশনের ফাদার, ব্রাদার তারা এই ঘাটেই নৌকা বা লঞ্চ থেকে নামতেন।

শ্রীমন্ত-নদী থেকে বর্তমান কৃষ্ণকাঠি যেতে যে পুলটি আছে এর নিকট থেকে পশ্চিম দিকে একটি খাল চলে গেছে। এই খালটির পাড়েই মিশনবাড়ী অবস্থিত। এই খালের পাড়ে মিশন বাড়ির দক্ষিণ দিকে একটি শানবাঁধানো ঘাট ছিল। এই ঘাটেই মিশনে আগমনকারী ব্যক্তিগণ গয়না নৌকা করে আসতেন এবং এখানে নামতেন। অনেকের স্মৃতিতেই এই ঘাটটি এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে। এর পাশেই রয়েছে একটি পুল। এই পুলটি দক্ষিণের সাথে স্কুল মিশনবাড়ীর সংযোগ স্থাপন করেছে। এখানকার পুলটি মূলত পর্তুগীজ আমলে নির্মাণ করা হয়েছিল এবং তা বাংলাদেশ আমলের নব্বই দশকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এই জন্য এই ঘাটটিকে পুলের গোড়ার ঘাটও বলা হয়।

(৯) পাওয়ার হাউজ

পাদ্রীশিবপুরবাসী ভাগ্যবান এজন্য যে পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকেই বিজলী বাতির সাথে তাদের পরিচয় ঘটে। কানাডার হলি ক্রস ফাদার-ব্রাদারগণের উদ্যোগে এখানে প্রথম ডায়নামা বসানো হয়। এই ডায়নামার দায়িত্বে ছিলেন মি. যোসেফ গোমেজ। আর এই পাওয়ার হাউজ থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ থেকেই ব্রাদার বাড়ি, ফাদার বাড়ি, সিস্টার বাড়ি এবং স্কুলে সরবরাহ করা হতো। চারিদিকে যখন নিশিকালো অন্ধকার তখন এই এলাকাটি আলো ঝলমল করতো। অনেকেই এখানে এসে শহরের স্পর্শ পেতেন।

(১০) ফাদার চার্লস ইয়াং ট্রেড স্কুল (বাকেরগঞ্জ)

বাখেরগঞ্জ থানা সদরে কারিতাসের উদ্যোগে একটি ট্রেড স্কুল খোলা হয়। এখানে মেশিনারী ট্রেড, ইলেকট্রিক ট্রেড, সেলাই, অটোমোবাইল ট্রেড আরও বিভিন্ন প্রকার মেশিনারী কাজের ট্রেনিং প্রদান করা হয়। এখানে স্থানীয় যুবকেরা (জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এখানে শতাধিক ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এজন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের সামান্য কিছু খরচ বহন করতে হয় এবং বাকী খরচ কারিতাস বাংলাদেশ বহন করে। পাদ্রীশিবপুরের বেশ কিছু যুবক এখানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হয়ে নিজ নিজ ব্যবসা পরিচালনা করছে। এখানকার তৈরি গ্রিল এবং সেনিটারী রিং এলকায় বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে।

(১১) সাইক্লোন সেন্টার:[১৯]

সোনাতলা ও রাখাইন সম্প্রদায়ের জন্য, চট্টগ্রামের বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও-এর উদ্যোগে এবং অর্থ সংগ্রহের দ্বারা চার্চের পক্ষ থেকে সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা হয়: সোনাতলা ও রাখাইনদের জন্য সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ: তালতলি (২০০৯), তাঁতি পাড়া (২০০৯); কবিরাজ পাড়া (২০০৯), আমখোলাপাড়া (২০০৯), পাখিয়াপাড়া (২০০৯), সোনাতলা খ্রিস্টান পাড়া (দুটো সেন্টার - ২০০৯), পটুয়াখালি শপিং কমপ্লেক্স (২০০৮); মাটিভাঙ্গার স্কুল ও সাইক্লোন সেন্টার।

[১৯] তথ্য: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও

(১২) উজ্জ্বলা মহিলা সমবায় সমিতি এবং বাসন্তিকা ক্লাব:[২০]

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের দিকে সি: মারী সিএসসি ৪/৫ জন দু:স্থ মহিলা নিয়ে একটি দল গঠন করেন। তারা বিদেশ থেকে আনা পুরানো কাপড় দিয়ে শততালি, পাপশ তৈরি করতো, ঠোঙ্গা, নারিকেলের ছোবড়ার দড়ি বানাতো। সংখ্যা বাড়তে থাকলে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে সি: আলেক্সি, সিএসসি এই দলের নামকরণ করেন 'উজ্জ্বলা মহিলা সমবায় সমিতি'। এসময় এরা পিনাট বাটারও বানাতো। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে এলএইচসি সিস্টারগণ এই সমিতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সিস্টার এডলিন এলএইচসি উজ্জ্বলা মহিলা সমবায় সমিতির কার্যক্রম সম্প্রসারণে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। এক সময় সমিতি একটি দোকান শুরু করে। পাট হস্তশিল্পের সাথে যুক্ত হয়ে প্রথমে 'ঢাকা জাগরণীর' মাধ্যমে ও পরে সরাসরি কোর-দি-জুট ওয়ার্ক এর সদস্য পদ লাভ করে। কোর-দি-জুট ওয়ার্ক এর প্রথম সদস্য দলের মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বলা মহিলা সমিতি। সিস্টার এডলিন, এলএইচসি পাট ও নারিকেলের মালা দিয়ে বেশ কয়েকটি নেকলেস, ব্রেসলেট, পেঁচা, নতুন ডিজাইন তৈরি করে সমিতির নাম উজ্জ্বল করেন। সমিতি পরিচালনায় স্থানীয় নেতৃত্ব তৈরিতে হলি ক্রস সিস্টারদের মতো এলএইচসি সিস্টারগণও বিশেষ যত্ন দেন এবং ১৯৮৫ খিস্টাব্দ পর্যন্ত সমিতির কাজের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকেন। বিশেষভাবে হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে। এলএইচসি সিস্টারগণের অনুপ্রেরণায় সমিতির মহিলাদের নৈতিক শিক্ষা এবং মাসে একবার আন্ত:ধর্মীয় প্রার্থনা ব্যবস্থা ছিল। ১৯৮৬ খ্রি. থেকে এখন পর্যন্ত মহিলাদের নিজেদের আগ্রহ ও উদ্যোগে মহিলা সমিতির পাটের কাজ কোর-দি-জুট ওয়ার্ক এর সাথে চলমান রয়েছে।

যারা নেতৃত্বে ছিলেন : সভানেত্রী ও পরিচালিকা: মিসেস রেনুকা অধিকারী; সভানেত্রী ও পরিচালিকা: মিসেস ফিলোমিনা সরকার। হিসাব রক্ষক : মিসেস ফ্লোরী গোমেজ।

বাসন্তিকা ক্লাব: চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশে মেয়েদের জন্য বরিশালে একটি মাত্র হাই স্কুল থাকার কারণে প্রভাতী হোস্টেলে প্রতিটি ধর্মপল্লী থেকে মাত্র ৪/৫ জন ছাত্রী স্কুলে পড়ার সুযোগ পেত। বাকী ছাত্রী এবং স্কুলে না পড়া মেয়েদের নিয়ে খুব সম্ভবত সিস্টার শান্তি, সিএসসি ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে একটি সেলাই ক্লাব শুরু করেন। এখানে হিন্দু-মুসলমান মেয়েরাও সুযোগ পেত। সেলাই শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা, পারিবারিক শিক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা (যারা লেখাপড়া জানতো না) এবং সাপ্তাহিক সঞ্চয় ইত্যাদি নিয়মিত ছিল। গল্প বই পড়ার উৎসাহ দেওয়ার জন্য শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বইয়ের একটি লাইব্রেরী ছিল এবং গল্পের শিক্ষা সকলের সাথে সহভাগিতা করতে হতো। সিস্টার শান্তি, সিএসসি এর পরে সি: রোজ ও সি: এভলিন, সিএসসি ক্লাবের দায়িত্বে ছিলেন।

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে এলএইচসি সিস্টারগণ পাদ্রীশিবপুর আশ্রম খোলার পরে সি: সিসিলিয়া, এলএইচসি ক্লাবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কয়েক বছরের মধ্যে যখন ছেলে-মেয়ে একই স্কুলে পড়ার নিয়ম হয় তখন মেয়েরা সেন্ট আলফ্রেড স্কুলে পড়ার সুযোগ পায় এবং ধীরে ধীরে বাসন্তিকা ক্লাব বন্ধ হয়ে যায়। তবে স্টাডি ক্লাব নামে এলএইচসি সিস্টারগণ মেয়েদের নিয়ে আর একটি সংগঠন শুরু করে নৈতিক ও খ্রিস্টীয় গঠণ অব্যাহত রাখেন।

---

[২০]সিস্টার আরতি ডি'কস্তা, এলএইচসি.

(১৩) সেবক-সেবিকা: যাজক, সন্ন্যাসব্রতী, খ্রিস্টবিশ্বাসী ও অন্য ধর্মাবলম্বী

পাদ্রীশিবপুর ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদে আশীর্বাদিত। মিশনারীদের সংস্পর্শে আসাতে শিশুকাল থেকেই আমাদের ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় গঠন সুন্দররূপে হয়েছিল। প্রাইমারী স্কুলে অধ্যয়ন করার সময় ছেলে-মেয়েদের একটি শিশু সংগঠন ছিল। যার নাম যীশুর সেবক-সেবিকা। তাদের প্রশিক্ষণ দিতেন সিস্টারগণ এবং প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষিকাগণ। তাদের নিয়মিত প্রার্থনা, রবিবারে গির্জায় যোগদান, এছাড়া সপ্তাহে একটি নিদিষ্ট দিনে তাদের একটি খ্রিস্টযাগে বাইবেল পাঠ, গান, প্রার্থনার উদ্দেশ্য ইত্যাদি পরিচালনা করতে হতো। আর বিভিন্ন খ্রিস্টযাগে তারা বেদী সেবকের দায়িত্ব পালন করতো। এমনকি রোগীদের বাড়ি পরিদর্শন, তাদের বাড়িতে প্রার্থনা করা এমনকি সম্ভাব্য ক্ষেত্রে রোগীর সেবাও করা হতো।

আমাদের শিশুকাল থেকে এই ধর্মীয় অনুশীলন পরবর্তী জীবনে বিশেষ করে ব্রতীয় জীবনে আহ্বানের পথে অনেক অনুপ্রাণিত করেছে। তাইতো দেখি ফাদার লিও গোমেজ থেকে শুরু করে অনেকেই যাজকীয় জীবনে প্রবেশ করেছে এবং মেয়েদের কেউ কেউ সিস্টার হিসেবে ব্রত গ্রহণ করে এখনও মণ্ডলীর সেবা করে যাচ্ছেন। এই দিকে আমরা ভাগ্যবান এজন্য যে আমাদের গ্রাম থেকেই সমগ্র বাংলা ভাষাভাষীদের প্রথম ও একমাত্র কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও কে ঈশ্বর আমাদের দান করেছেন।

আমাদের গ্রামটি খ্রিস্টান অধ্যুষিত। ফলে এখানে আমাদের জীবন খ্রিস্টান মিশনারীদের কল্যাণেই খ্রিস্টের আদর্শে গড়ে উঠেছে। আমাদের বিশ্বাসের মূল ভিত্তি খ্রিস্ট। তবে আমাদের ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ মা মারীয়া ও সাধু আন্তনীর প্রতি বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করে থাকে। যদি এখন থেকে ৫০/৬০ বছর আগেকার দিনে ফিরে তাকাই আমরা দেখতে পাই তখন প্রতিদিনের খ্রিস্টযাগে অনেকেই যোগদান করতেন নিয়মিত। তাঁদের মধ্যে এই মূহুর্তে মনে পড়ছে দক্ষিণ গ্রামের লাভলী ডি'কস্তা, কাথারিনা ডি'কস্তা, মেলকাম ডি'কস্তা, জিতা গোমেজ, লালজন গোমেজ, যোসেফ গোমেজ, ডা. ফ্রান্সিস গোমেজ, বেনেডিক্ট গোমেজ, মেটিল্ডা গোমেজ, আইরিচ গোমেজ, চার্লস গোমেজ (গুরুমহাশয়), রামুয়েল গোমেজ এবং পশ্চিমের লিও গোমেজ, ক্লেমেন্ট গোমেজ, মাইকেল ডি'রোজারিও (নিঙ্গাল সাধু), উর্চ্ছি গোমেজ (সি. অনুর মা) বির্জিয়ানা ডি'কস্তা (ভেনাসসিও স্যারের মা) মার্গারেট গোমেজ(ফাদার কানুর মা) গ্রেসি গোমজ, আইরিন গোমেজ, মালগারিনা গোমেজ সহ আরও কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি নিয়মিত প্রতিদিনের খ্রিস্টযাগে যোগদান করতেন। এসময়ে পারিবারিক প্রার্থনার উপরে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হতো। তাই প্রতিদিন সকাল, দুপুর, সন্ধ্যাবেলা দূত সংবাদ প্রার্থনা ছিল আবশ্য করণীয়। উল্লেখ করা যেতে পারে এই সময়গুলিতে গির্জা থেকে নিয়মিত ঘন্টা বাজানো হতো। ফলে ঘন্টা ধ্বনি শুনে যে যেখানেই থাকতো সেখানেই এই প্রার্থনা তাৎক্ষণিকভাবে করতো। এছাড়া বাড়িতে বাড়িতে নিয়মিত জপমালা প্রার্থনা করা হতো। ফলে একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে আমাদের জনগণের জীবন ছিল প্রাচীনকাল থেকেই সুগঠিত। সময়ের পরিক্রমায় বর্তমানে প্রাত্যহিক খ্রিস্টযাগে যোগদানের লোকের সংখ্যা দিন দিন কমে আসছে। তবে আমাদের ধর্মপল্লীর খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জীবনযাত্রা বর্তমানেও তুলনামূলকভাবে অনেক ভালো।

পাদ্রীশিবপুরে খ্রিস্টানদের পাশাপাশি হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের লোকেরা বসবাস করেন। তারাও আমাদের আলোকে আলোকিত একথা আমরা দৃঢ়ভাবেই বলতে পারি। তাদের কথাবার্তা ও আচার আচরণে মার্জিতভাব বিদ্যমান। এই এলাকার বাইরে গেলে একই সম্প্রদায়ের লোকের আচার আচরণে ও কথাবার্তায় বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুদের পেশা মূলত কাপড়ের ব্যবসা, এক সময় তাদের কেউ কেউ তাঁত শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তাই দক্ষিণ গ্রামে যুগি বাড়ি নামে একাধিক বাড়ি রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সেলুন ব্যবসা করছে এবং একটি পরিবার ধোপার কাজ করছে। মুসলিমদের অনেকেই দক্ষিণ শিবপুর, কানকী, দূর্গাপুর নিউমার্কেট, কালিগঞ্জ বা বাখেরগঞ্জে ব্যবসা করছেন। আবার বেশিরভাগই কৃষিকাজ করছেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ খ্রিস্টানদের জমিজমাও যুগের পর যুগ চাষাবাদ করছেন। ফলে তাদের সাথে আমদের সব সময়ই একটি সুন্দর সম্পর্ক বিরাজমান। বিভিন্ন পার্বণে বা উৎসবে আমরা পরস্পর পরস্পরের বাড়িতে যোগদান করি। তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের মাঝে সুদৃঢ়ভাবে বিদ্যমান।

এই অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ স্থান, ব্যক্তি ও সংঘ-সমিতি সম্পর্কে আলোচনা করলাম। আমরা জানি আমাদের গ্রামের বা এলাকার ইতিহাস ও এতিহ্য আরও ব্যাপক। আমাদের জানার সীমাবদ্ধতা রয়েছে সেই সাথে প্রযোজনীয় তথ্য সংগ্রহ করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনি। তবে একথা আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে আমাদের প্রচেষ্টার কোন কমতি ছিলো না। যদি আমাদের উপস্থাপিত বিষয়াদি সামান্যটুকুও আপনাদের হৃদয়ে রেখাপাত করে থাকে সেখানেই আমাদের সার্থকতা। যারা আমাদের এই লেখা সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে সহায়তা দান করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

তথ্যসূত্র:[২১]

[২১] সেন্ট আলফ্রেড স্কুল এবং কলেজ – এর জয়ন্তী স্মরণিকা ও বার্ষিকীসমূহ; অফিস ফাইল, আর্কাইভ। তথ্যপ্রদানে সহযোগিতায়: সি. অর্চনা, আইবিভিএম (প্রধান শিক্ষক), মি. অজিধর বাবু গোমেজ (সহকারি প্রধান শিক্ষক), জন অমল গোমেজ, লিংকন ডি'রোজারিও, প্রিয়াঙ্কা, সিমকি গোমেজ।

অষ্টম ভাগ

পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ: বিশপ, যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী: অতীত ও বর্তমান

লেখক: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

আলোচ্য বিষয়সূচির সারসংক্ষেপ

প্রথম অধ্যায়: তালিকা: সেবাকর্মী বিশপ, ধর্মপ্রদেশীয় যাজক, সন্ন্যাসব্রতী পুরোহিত, সিস্টার এবং ব্রাদার

॥ ক ॥ ধর্মপ্রদেশের ধর্মপালবৃন্দ (১৯২৭ থেকে অদ্যাবধি)

॥ খ ॥ পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে নিয়োগকৃত পালপুরোহিত ও সহকারী পুরোহিতবৃন্দ

॥ গ ॥ পাদ্রীশিবপুরে যে সমস্ত ব্রাদারগণ কাজ করেছেন

॥ ঘ ॥ পাদ্রীশিবপুরে বিভিন্ন ধর্মসংঘের যে সমস্ত সিস্টারগণ কাজ করেছেন

দ্বিতীয় অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুরবাসী বিশপ, ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণ

॥ ক ॥ পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ থেকে জন্মসূত্রে ধর্মপ্রদেশীয় যাজক/সন্ন্যাসব্রতী-যাজক

॥ খ ॥ পাদ্রীশিবপুর বংশোদ্ভূত প্রবাসী যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী

॥ গ ॥ পাদ্রীশিবপুর বংশোদ্ভূত বাংলাদেশের যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী

॥ ঘ ॥ জন্মসূত্রে অথবা বংশোদ্ভূত পাদ্রীশিবপুরের সন্ন্যাসব্রতী

তৃতীয় অধ্যায়: যাজকীয় ও সন্ন্যাসজীবনের প্রয়াত ও জীবিত বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

॥ ক ॥ প্রয়াত বিশেষ ব্যক্তিত্ব: যাজক ও কাটেখিষ্ট

॥ খ ॥ পাদ্রীশিবপুরের বিশেষ ব্যক্তিত্ব: সুবর্ণ জয়ন্তীকারী যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী

অবতারণা

পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ খ্রিস্টান ধর্মগোষ্ঠির একটি ধর্মীয় সমাজ। একটি নির্দিষ্ট এলাকার খ্রিস্টানদের দায়িত্বে থাকেন একজন কাথলিক পুরোহিত যাকে বলা হয় পাল-পুরোহিত এবং যিনি বিশপ কর্তৃক নিযুক্ত হন। প্যারিশে একাধিক পুরোহিত ও সহকারী নিযুক্ত হতে পারেন। প্রতিটি প্যারিশ কাথলিক মণ্ডলীর একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠির আওতায় থাকে যার নাম ডাইয়োসিস। ডাইয়োসিসের যিনি প্রধান তাঁকে বলা হয় বিশপ আর যদি আর্চডাইয়োসিস হয়, তাহলে তার প্রধান হচ্ছেন আর্চবিশপ। বিশপ/আর্চবিশপ সর্বদাই বিশ্বজনীন কাথলিক মণ্ডলীর প্রধান, অর্থাৎ পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় কর্তৃক মনোনীত। এই ভাবে মণ্ডলীর প্রশাসনিক কাঠামো সুবিন্যস্ত রয়েছে।

পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ বা ধর্মপল্লী যুগ যুগ ধরে নির্দিষ্ট ডাইয়োসিস/আর্চডাইয়োসিস ও তার প্রধান ধর্মপালের অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে। এক সময় ভারতে যখন পর্তুগীজদের আগমন ঘটে সেই সময় বিশ্বজনীন পোপ মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে পর্তুগাল থেকে প্রতিষ্ঠিত ডাইয়োসিস/আর্চডাইয়োসিসের প্রধান কর্তৃক পরিচালিত হয়ে আসছে।

পাদ্রীশিবপুর মিশনের বয়স প্রায় তিন শতাব্দী। বিগত শতাব্দীগুলোতে অনেক বিদেশী মিশনারি পাদ্রীশিবপুরে খ্রিস্টের বাণী প্রচারের জন্য, খ্রিস্টান জনগণের বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য, সংস্কারীয় জীবন, পরিপালন ও যত্ন নেওয়ার জন্য, শিক্ষা ও সমাজ-উন্নয়নের জন্য এসেছেন। পূর্বেই বললাম যে, এই সমস্ত মিশনারিদের পরিচালনা দিয়েছেন তৎকালীন সময়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত ধর্মপালগণ এবং তাদের সহকারী রূপে ছিলেন যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীগণ।

প্রথম অধ্যায়: সেবাকর্মী বিশপ, ধর্মপ্রদেশীয় যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদার ও সিস্টারদের তালিকা

প্রথম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হল যে সমস্ত ধর্মপাল, যাজক, সন্ন্যাসব্রতী সেবক-সেবিকা পাদ্রীশিবপুর প্যারিশটিকে সেবা ও পরিচালনা দিয়েছেন তাদের নাম লিপিবদ্ধ করে রাখা এবং তাদের নাম ধরে স্মরণ করা: (ক) পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ/আর্চবিশপদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়; (খ) ফাদারগণ যারা পাদ্রীশিবপুর অতীতে ও বর্তমানে কর্মরত আছেন তাদের নামের তালিকা; (গ) হলিক্রস ব্রাদার ও সিস্টারগণ, মণ্ডলীর ক্ষুদ্র সেবিকা সংঘের সিস্টারগণ এবং লরেটো সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ পাদ্রীশিবপুরে অতীতে কাজ করে গেছেন এবং যারা এখনও আছেন তাদের নাম উল্লেখ করা হল।

॥ ক ॥ ধর্মপ্রদেশের ধর্মপালবৃন্দ (১৯২৭ থেকে অদ্যাবধি)[১]

1. Most Rev. Alfred Le Pailleur, csc., the First Bishop of Chittagong Diocese (1927-1951)



Born: August 9th 1886 in Lachine, Quebec.
Novitiate: Joined Holy Cross on August 15, 1907 and
First Profession on 29th August, 1909
Ordained Priest: December 23, 1911 in Rome.
S.T.D. from Angelicum in Rome 1913
Arrival in Bengal: January 15, 1914
Ministries: Noakhali (1914-1919); Secretary to the Bishop of
Dhaka and Religious Superior (1920-1927)
Episcopal Ordination: on 30th October, 1927 at Chittagong.
Coat of Arms: TO CARRY THE CROSS WITH YOU.
Retirement: 8th March, 1951.
Death: Died on April 12th 1952, Buried at St. Laurent, Quebec, Canada.

2. Most Rev. Raymond Larose, csc., Second Bishop of Chittagong (1952-1967)



Born: 10th January, 1897, St. Hyacinthe, Quebec, Canada
Novitiate: 22nd July, 1917 at Ste. Genevieve. Quebec,
First Profession Canada; 22nd July, 1919.
Ordained Priest: February 7th 1926.
D.D.: Laval University Major Seminary, Quebec, Canada
Arrival in Bengal: December 1926.
Ministries: Narikelbari (1928-1946) and
Religious Superior (1938-1950)

[১]Chittagong Jubilee 2000

Episcopal Ordination and Bishop of Chittagong 2nd July, 1952
Coat of Arms: TO THE LIGHT THROUGH CHARITY
Retirement: 1967: Parish Priest Rangamati and Prayer Life (1968-1975); Padrishibpur 1975-1983
Death: Died on 17th May, 1984 and buried in Chittagong.

3. Most Rev. Joachim Rozario, csc., Third Bishop of Chittaong (1968-1994)



Born: 2nd September, 1930, Solepur, Dt. Dhaka
Novitiate: Sonapur in Noakhali (1952-1953)
First Profession: 16th August, 1953
Scholaticate: College: Sacred Heart Scholasticate (1953-1956); NDU, Indiana (1956-1958) Washington Catholic University (1958-1962)
Ordained Priest: 6th June 1962, Notre Dame University, Indiana,
Ministries: Prefect, St. Edward's Hall (1962-1963), Baluchora, Mymensingh (1963-1966)
Episcopal Ordination and Bishop of Chittagong on 17th November, 1968
Coat of Arms: UNITY IN CHARITY
Retirement: 1994 and Administrator of Chittagong Diocese
Death: 9th June and buried in Chittagong on 11th June, 1996

4. Most Rev. Patrick D'Rozario, csc., Fourth Bishop of Chittagong (1995-2010)



Born: 1st October, 1943, Padrishibpur, Barisal
Novitiate: Sagardi in Barisal (1961-1962)
First Profession: June 14th, 1962
Scholaticate: Notre Dame College (1962-1966); Christ the King Seminary in Karachi (1966-1971)
Ordained Priest: 8th January, 1972, Padrishibpur, Barisal.
S.T.L. Degree and STD study in Catholic University of Leuven (1973-1976)
Ministries: Assistant in Gournadi Parish and CORR Gournadi Project Director (1972-1973); Teaching in the Major Seminary in Bonani (1976-1990); PST and PRC Director (1983-1990); District Religious Superior (1981-1984), Parish Priest in Padrishibpur 1983 and Barisal Parish (1986-1989)
Episcopal Ordination and Ministry: First Bishop of Rajshahi on 12th September, 1990. Bishop of Rajshahi (1990-1995); Bishop of Chittagong (1995-2010, Archbishop of Dhaka (2011-2020); Cardinal (1916---); President of CBCB (2011-2020)
Coat of Arms: মিলন সাধনায় মগ্ন অন্তরে (Contemplating Communion)
Retirement: CBCB Center (2020-2023), Moreau House, Rampura (2024--)

5. Most Rev. Moses Costa, csc., Fifth Bishop/Archbishop of Chittagong (2011-2020)[2]



Born: 17th November 1950, Toomilia, Dhaka
Novitiate: Sagardi in Barisal (1977)
First Profession: 20th January, 1978.
Scholaticate: Notre Dame College (1971-1973);
Holy Spirit Major Seminary, Bonani (1973-1981)
Ordained Priest: 5th February, 1981, Toomilia, Dhaka
S.T.L. Degree on Theology & Spirituality and STL on Psychology and Counselling in Rome (1984-1996)
Ministries: Parish Ministry in Sreemangal, (1981-1982); Jalchatra (1983-1984)
Episcopal Ordination: Bishop of Dinajpur 6th September, 1996
Bishop of Dinajpur (1996-2010), Bishop of Chittagong (2011-2016).
Archbishop of Chittagong (2017-2020), CBCB Secretary General (2014-2020)
Coat of Arms: জীবন ধ্যান ও সেবায় মিলন-আনন্দ
Death: July 13th July, 2020 and buried in Chittagong.

6. Most Rev. Subrato Howlader, csc. First Bishop of Barishal (2017-2021)



Born: September 11th 1965, Nobogram Road, Barishal
Education: School: Oxford Mission High School and Udayan School; Palordi, Gournadi, SSC pass 1982. HSC and B.A. from B.M. College 1984-1986; Major Seminary Bonani (1988-1994)
Novitiate: Sagardi in Barishal (1987-1988)
First Profession: 2nd August, 1988, Final Profession 6th August 1993
Ordained Priest: 31st December 1994
Ministries: Parish Ministry, Morium Nagar (1995), Director St. Paul Seminary (1996-1998), Pirgacha (1998-2000); Holy Cross Novice Master (2004-2009)
S.T.L. Degree on Psychology and Counselling in Rome (2000-2004)
Episcopal Ordination & Ministry: Auxiliary Bishop of Chittagong (July 3, 2009-2016)
Bishop of Barishal (2016-2021),
Archbishop of Chittagong (April 9, 2021--)
Coat of Arms: পিতার ভবনে চলো যাই

[2] স্মরণিকা – চট্টগ্রামকে আর্চডাইয়োসিকে উন্নতিকরণ, সেপ্টেম্বর ৮, ২০১৭ খ্রি.

7. Most Rev. Emmanueal K. Rozario, Second Bishop of Barishal Diocese (2022)[3]



Born: 8th February, 1963, Foilzana Parish, Rajshahi Diocese.
Education: School Education: St. Xavier School, Foilzana, St. Louis School, Borni (1979), St. Philip's School (1980-1982), Notre Dame College (1982-1986); Holy Spirit Major Seminary, Bonani (1986-1992)
Ordained Priest: 28th December, 1993.
S.T.D. Degree on Biblical Theology in Rome (1997-2001)
Ministries: Parish Ministry in Bonpara (1992-1997), Borni (2002-2007);
Kolim Nagar (2019-2021), Cathedral Parish and Vicar General (2021-2022);
Major Seminary Professor (2007-2011) and Rector (2012-2018)
Episcopal Ordination: Bishop of Barishal on 19th August, 2022.
Coat of Arms: তব হৃদে স্থিত চিত্ত মম

॥ খ ॥ পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে নিয়োগকৃত পালপুরোহিত ও সহকারী পুরোহিতবৃন্দ[৪]

Father Raphael Das Anjous - Augustinian (1764 .....)
Father Germano Eusebis Rodrigues (1855-1866)
Father J. M. Rebello (1866-1868)
Father D. L. De Sancta Maria (1866-1877)
Father T. Aquinas Tigredo (1877-1880)
Father Salda Costa (1880-1881)
Father R. Trimdade (1881-1889)
Father Pio D'Souza (1889-1992, 1893-1894)
Father Norberto De Lobo (1892-1893)
Father B. Mascarenhas (1894-1897)
Father T. O. S. M. Menezes (1895, 1897-1904
Father A. O. Pereira (1904-1905)
Father M. A. Lobo (1905-1915)
Father M. Godino (1915-1922, 1923-1928)
Father A. S. De Costa (1922-1923, 1927-1928)
Father A. De Souza (1928)
Father A. Montario (1928-1930)
Father Louis Faineau, csc. (1930-1942)
Father Germaine Grandmaison, csc (1965-1968, PP 1970-1978)
Father Sebastian Rodrigues (1972-1973)
Father Guy Monette, csc. (1968)
Father George Laprade, csc. (1960, 1995-1996)
Father Benjamin Labbe, csc. (PP 1978-1982)
Father Patrick D'Rozario, cc. (PP. 1983)
Father Timothy Quiah (1963, PP 1984-1987)
Father G. M. Tourangeau, csc. (PP 1986-1990, 1991-1992)
Father Bimal Joachim Rozario, csc (1986-1990 & PP 1991-1992)
Father Betram Nelson, csc (PP 1991-1993)
Father Gordon Dias (PP 1993-1995)
Father Benjamin Labbe, csc (PP 1996-1998)

[৩] স্মরণিকা – বিশপীয় অভিষেক, বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও, ১৯ আগস্ট, ২০২২ খ্রি.

[৪] Chittagong Jubilee 2000; মি. মার্টিন সি. গোমেজ, প্যারিশ হাউজে বোর্ডে লিখিত তালিকা ও স্মরণিকা থেকে

Father G. G. Lapiere, csc. (PP 1942-1947)
Father Misod, csc, (1943 ...)
Father Robi Hubert Gomes, csc,
(PP 2001-2004)
Father Ezzio Mascaratti, pime,
(PP 2004-2014)
Father Garibaldi, pime
Father Hamlet Botlero (2004-2005)
Father Amado, pime (2005-2007)
Father David Ghorami (.....)
Father Michael Dewri (.....)
Father Michael Collins Sarker
(PP 2014-2021)
Father Bipul Das, csc, (2014-2017)
Father Ashish Aloysius Rozario, csc
Father Mrinal Michael Mrong, csc
Father Vincent Bimol Rozario, csc
(PP 2021-2022)
Father Maurice D'Cruze, csc
(1998-2001)
Father David Das, csc, (2014-2017)
Father Ashish Aloysius Rozario, csc
Father Mrinal Michael Mrong, csc
Father Vincent Bimol Rozario, csc
(PP 2021-2022)
Father Robert Dilip Gomes, csc
(PP 2023 continues)
Father Khokon Gabriel Nokrek, csc.
(2021 continues)

॥ গ ॥ পাদ্রীশিবপুরে যে সমস্ত ব্রাদারগণ কাজ করেছেন

পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ আলফ্রেড ল্য পাইয়োর, সিএসসি, চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের প্রথম বিশপের আমন্ত্রণে কানাডার কুইবেক রাজ্য থেকে পবিত্র ক্রুশ সংঘের ব্রাদারগণ ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে অবস্থান করেন এবং সেন্ট আলফ্রেড স্কুল এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা দিয়ে আসছেন। ব্রাদারদের মধ্যে শেষ প্রধান শিক্ষক ছিলেন ব্রাদার আলেবেরিক, সিএসসি (১৯৬৭-১৯৭০)। তারপরেও ব্রাদার মরভেন ব্যাপ্টিস্ট, সিএসসি স্কুলের সাথে সম্পৃক্ত থেকে বেশ কয়েকবছর সেবা দিয়ে গেছেন। যে সমস্ত ব্রাদারগণ শিক্ষা ও অন্যান্য গঠন কাজে পাদ্রীশিবপুরে সেবা দিয়ে গেছেন তাদের নাম কৃতজ্ঞতার সাথে নিম্নে তুলে ধরছি।[৫]

HOLY CROSS BROTHERS (1932)

Bro. Godfrey Denis, csc.
(Headmaster-1933-34, 1941-1945)
Bro. Flavian Laplante, csc.
(Headmaster- 1934-1936)
Bro. Ambrose, csc.
Bro. G. Martin, csc.
(Headmaster-1937-1938)
Bro. Aldrick, csc.
(Headmaster-1939-1940)
Bro. Gastin, csc
(Headmaster-1946-1948)
Bro. Paul, csc.
(Headmaster-1949-1950)
Bro. Richard, csc.
Bro. Robert, csc.
(Headmaster-1951-1953)
Bro. Leo Dubois, csc

[৫] Chittagong Jubilee 2000; Bro. Alberic, History of Chittagong

Bro. Edward, csc
Bro. Gilbert, csc.
Bro. Ulysse Hamel, csc.
(Headmaster-1966-1967;
Teacher 1933-1935)
Bro. James Duschene, csc.
Bro. Marcel Duschene, csc.
Bro. Julien Grandmont, csc.
Bro. Antoine Richard, csc.
Bro. Donald Nadeau, csc.
Bro. Conrad Auger, csc.
(Headmaster 1956-1958)
Bro. Madore, csc.
Bro. Marvyn Baptist, csc.
Bro. Constant Brouillard, csc.
Bro. Gerard Arsenault, csc.
(Headmaster 1959-1962)
Bro. Jarlath D'Souze, csc.
(Headmaster 1963-1965)
Bro. Alberic Houle, csc.
(Headmaster - 1967-1970)
Bro. Lawrence Dias, csc.
Bro. Hiralal Mondol, csc.
Bro. Sylvester Rozario, csc.

॥ ঘ ॥ পাদ্রীশিবপুরে যে সমস্ত সিস্টারগণ কাজ করেছেন।

1. HOLY CROSS SISTERS (1936)

পাদ্রীশিবপুর ইতিহাসের প্রথমবারের মতো কানাডা থেকে হলি ক্রস সিস্টার আগমন করেন ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে। তাদের পূর্বে এই এলাকায় কোন সিস্টারদের দেখা যায়নি। তারা বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিত করে আর্থ-সমাজ-উন্নয়ন করে গেছেন ১৯৩৬ থেকে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। পাদ্রীশিবপুর যে সকল সিস্টারদের পরিচয় ও সেবা অবগত আছে তাদের নাম কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করি।[৬]

Sr. Marie de Sainte-Germaine, csc.
- Superior (1936)
Sr. Marie de Saint-Eulalie, csc. (1936)
Sr. Marie de S. Laura, csc (1936)
Sr. Canisius (Odina Rvenelle), csc
Sr. Odilia (Simon Legault), csc.
Sr. Jeanne (Marie-Jeanne Morin), csc
Sr. Alphonse (Lucille Latour), csc/LHC
Sr. Shanti (Marcelle Lalande), csc.
Sr. Alexi (Denis Arsenaul), csc.
Sr. Damien (Juliaeate Boucher), csc.
Sr. Evelyne (Agathe Drouin), CSC/LHC
Sr. Myriam Rollande Richard, csc
Sr. Marie, csc.
Sr. Monique Desnoyers, csc.
Sr. Rose (Therese Crepeu), csc.
(Sp. Animator to LHC)

2. LITTLE HANDMAIDS OF THE CHURCH (LHC) (1969)

পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ রেমণ্ড লারোজ, সিএসসি, চট্টগ্রামের বিশপ এবং মাদার আলফোন্স লিগরী, সিএসসি – যথাক্রমে প্রতিষ্ঠাতা ও সহ-প্রতিষ্ঠাত্রী হিসেবে "মণ্ডলীর ক্ষুদ্র সেবিকা সংঘ" (এলএইচসি) নামে একটি সন্ন্যাসসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মসংঘের প্রতিষ্ঠাবর্ষ হচ্ছে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ। হলি ক্রস সিস্টার সংঘেরই দেশীয় রূপায়ন হচ্ছে তাদের বৈশিষ্ট্য। তারা যিশুর "ক্ষুদ্র" জন হয়ে মণ্ডলীতে সাদাসিধে জীবনযাপন করেন, পরিবারে সাথে একাত্ম হন, স্বাস্থ্যসেবা ও পালকীয় সেবা দান করেন, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও গঠন দান করেন এবং বয়স্ক মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ করেন।

[৬] Chittagong Jubilee 2000; Bro. Alberic, History of Chittagong

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবারের মতো পাদ্রীশিবপুরে দক্ষিণ-মাঝগ্রামে বার্নাড স্যারের বাড়িতে ক্ষুদ্র আকারে একটি আশ্রম শুরু করেন। ঐ সময় থেকে আজোবধি পাদ্রীশিবপুরে যারা বসবাস ক'রে নানা ক্ষেত্রে সেবা দিয়েছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাদের নাম উল্লেখ করছি।[৭]

Sr. Magdalene Biswas, LHC.
Sr. Aroit D'Costa, LHC.
Sr. Annu Clarisse Gomes, LHC.
Sr. Cecilia Modhu, LHC
Sr. Margaret Shikha, LHC.
Sr. Adeline Gonsalves, LHC
Sr. Juliet Mendes, LHC.
Sr. Theresa Shima D'Rozario
Sr. Clara Costa, LHC.
Sr. Rina Catherine Palma, LHC.
Sr. Binu Palma, LHC.
Sr. Pushpa Cecilia Cruze, LHC.
Sr. Anjali D'Silva, LHC.
Sr. Hashi Rebeiro, LHC.
Sr. Milon Cruze, LHC.
Sr. Hanima Tripura, LHC.
Sr. Momota Palma, LHC.
Sr. Nitu C. Rozario, LHC.
Sr. Milon S. Cruze, LHC.
Sr. Rupali Purification, LHC.
Sr. Lucky Mary Gomes LHC.
Sr. Rita Gomes, LHC.
Sr. Shely Maria Palma, LHC
Sr. Elizabeth Tripura, LHC
Sr. Pronalika Tripura, LHC
Sr. Soneta Panna, LHC
Sr. Mitu Golder, LHC.
Sr. Priti Murmu, LHC.

3. INSTITUTE OF THE BLESSED VIRGIN MARY (IBVM) – LORETO SISTERS

হলি ক্রস ব্রাদারগণ ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের পরে, ধর্মসংঘের সদস্য-সংখ্যার স্বল্পতার কারণে পাদ্রীশিবপুরের জন্য কর্তৃপক্ষ আর কোন ব্রাদার দিতে পারেন নি। সৌভাগ্যক্রমে স্থানীয় পর্যায়ে কয়েকজন উপযুক্ত শিক্ষক থাকায় পর্যায়ক্রমে তাদেরকে সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে মনোনীত করা হয় এবং সফলতার সাথে তারা তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করেন। তারা ছিলেন স্বর্গীয় ভেনানসিও ডি'কস্তা (১৯৭১-১৯৭২), শ্রী রাজেন্দ্র মোহন নাথ (১৯৭৩-১৯৭৭) এবং মি. আলবার্ট গোমেজ (১৯৭৮-২০০৬)। ধর্মপ্রদেশের বাসনা অনুযায়ী এবং স্থানীয় জনগণের দাবি অনুসারে হলি ক্রস ব্রাদারদের আবার স্কুলে আনার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তখনও ব্রাদারগণ তাদের অপারগতা স্বীকার করেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, কোলকাতা থেকে লরেটো সিস্টার সংঘকে সেন্ট আলফ্রেড স্কুলের প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করায়, সংঘের একটি বিশেষ কারণে, সংঘটির সিস্টারগণ সম্মত হলেন এবং ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে পাদ্রীশিবপুরে তারা আসলেন এবং ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং আজ পর্যন্ত সেই দায়িত্বে অব্যাহত আছেন। লরেটো সিস্টারগণ যারা পাদ্রীশিবপুরে শিক্ষা ও অন্যান্য সেবাকাজ করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাদের নাম উল্লেখ করে স্মরণ করছি।[৮]

1. Sr. Christopher D'Souza 2005
2. Sr. Yvonne Gomes 2005
3. Sr. Archana Gomes 2005
4. Sr. Maloti Thakur 2008
5. Sr. Rani Minj 2009
6. Sr. Benedicta Gomes 2013
7. Sr. Ursula Darcy 2013
8. Sr. Monica Rozario 2014
9. Sr. Rina Ekka 2014
10. Sr. Punita 2014

[৭] সি. আরতি ডি'কস্তা

[৮] সি: অর্চনা গোমেজ

11. Sr. Agnes Bhutia 2015
12. Sr. Linda Mrong 2020
13. Sr. Balika Pal 2017
14. Sr. Baishakhi Mondal 2018
15. Sr. Regina Thami 2017
16. Sr. Sushila Turkey 2017
17. Sr. Mann Veronica 2018
18. Sr. Aruna Kujur 2019
19. Sr. Mary De Souza 2022
20. Sr. Shova Costa 2022

দ্বিতীয় অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুরবাসী বিশপ, ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণ[৯]

একটি প্যারিশ খ্রিস্টীয় জনপদ রূপে স্বাবলম্বীতা লাভ করে যখন প্যারিশের জনগণ বিশ্বাসে পরিপক্ক হয়ে খ্রিস্টীয় সাক্ষ্যদান করে, খ্রিস্টে দীক্ষিত হয়ে তারা খ্রিস্টের অনুসারী হয়ে আধ্যাত্মিক জীবনে যাজকীয় দায়িত্ব, শিক্ষাকাজে প্রাবন্ধিক এবং পরিচালনার কাজে রাজকীয় সেবাদায়িত্ব পালন করতে পারে। একটি প্যারিশ স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে যখন তারা মিলন-সমাজ হিসেবে জীবন যাপন করে, খ্রিস্টসমাজের কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এবং তাদের যে মিশন সম্পন্ন করে। স্বাবলম্বী হবার আরেকটি বাস্তব দিক হচ্ছে যে, প্যারিশ বৃহত্তর সমাজ ও মণ্ডলীর জন্য ধর্মীয় জীবনে, অর্থাৎ যাজকীয় ও সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদার ও সিস্টার জীবনে প্রবেশ করে মণ্ডলীতে সেবাকর্মী দান করতে পারে।

পাদ্রীশিবপুরের ইতিহাসে দেখা যায় যে, ফাদার-ব্রাদার-সিস্টারদের জীবনে যোগ দেওয়ার সূচনা হয়েছে আজ থেকে প্রায় একশত বছর আগে। বিগত বিংশ শতাব্দীর আনুমানিক দুই ও তিন দশকের দিকে চারজন মেয়ে প্রথম সিস্টার জীবনে যোগ দিয়েছেন। তারা মাদ্রাজে এফ.বি.এস বলে একটি ধর্মসংঘে যোগদান করেন। তাদের নাম ও পরিচয় (ঘ) বিভাগে বর্ণিত হয়েছে। আর যাজকদের মধ্যে পাদ্রীশিবপুরের প্রথম ছিলেন ফাদার লিও গোমেজ। তিনি ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে যাজক হন।

পাদ্রীশিবপুরে প্রায় প্রথম দুইশত বছরে কেউ ধর্মীয় জীবনে যোগদান করেনি। বলা যায় তৎকালীন সময়ে আহ্বানের জন্য তেমন চেতনা ও উদ্যোগও ছিল না। নিম্নে যে তালিকা ও তথ্য দেয়া হল তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, পাদ্রীশিবপুর থেকে অথবা পাদ্রীশিবপুর বংশোদ্ভূত যারা ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টার হয়েছেন তারা বিগত প্রায় ৯০ বছরের মধ্যে। তাদের সংখ্যা (যারা পরিত্যাগ করেছে তাদের সহ) প্রায় ৬০ জনের মতো। নিম্নে চারটি ভাগে ভাগ করে তাদের পরিসংখ্যানটি উপস্থাপন করা হল।

[৯] স্মরণিকা - ২০১৬, পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর বিশপ, যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও বিবাহিত দম্পতিদের রজত ও সুবর্ণ জয়ন্তী, পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ, পৃষ্ঠা ৫১-৫৩: স্মরণিকা – ২০২২, বিশপীয় অভিষেক: বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও, ১৯ আগস্ট, ২০২২, পৃষ্ঠা ৫৫-৫৬

॥ ক ॥ পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ থেকে জন্মসূত্রে ধর্মপ্রদেশীয় যাজক/সন্ন্যাসব্রতী-যাজক

ক্র. নং	যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীদের নাম	জন্ম স্থান ও তারিখ	সংঘ/ধর্মপ্রদেশ	প্রথম ব্রত/ আজীবন ব্রত	যাজকীয় অভিষেক	মৃত্যু দিবস	মন্তব্য
১	প্রয়াত ফাদার লিও গোমেজ	পাদ্রীশিবপুর ০৭/১২/১৯০৭	চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ ১৭/১২/১৯০৮	---------	ভারত ০২/০২/১৯৩৮	পাদ্রীশিবপুর ০২/০২/১৯৯৮	
২	প্রয়াত ফাদার বাট্রাম নেলসন, সিএসসি	পাদ্রীশিবপুর ১৬/০৫/১৯৩৪	চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ	প্রথমব্রত: ১৪/০৬/১৯৫৪ আজীবনব্রত: ১৬/০৮/১৯৬০	রোম ২৭/০২/১৯৬৩	চট্টগ্রাম ০৩/০৫/২০০৮	
৩	প্রয়াত ফাদার ফিলিপ ডি'রোজারিও	পাদ্রীশিবপুর ২০/১২/১৯৩৬		---------	রোম ১৬/১২/১৯৬৬	পাদ্রীশিবপুর ১০/০৫/২০১৮	
৪	কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি	পাদ্রীশিবপুর ০১/১০/১৯৪৩	সিএসসি ফাদার সংঘ	১ম ব্রত: সাগরদী ১৪/০৬/১৯৬২ আজীবন ব্রত পাদ্রীশিবপুর ০১/০১/১৯৭১	যাজক-অভিষেক পাদ্রীশিবপুর ০৮/০১/১৯৭২ ; বিশপ অভিষেক: ১২/০৯/১৯৯০ কার্ডিনালপদে অধিষ্ঠান - রোম ১৯/১১/২০১৬:		রাজশাহীর বিশপ (১৯৯০-১৯৯৫): চট্টগ্রামের বিশপ (১৯৯৫-২০১০): ঢাকার আর্চবিশপ; অবসরগ্রহণ ২০২০:
৫	ফাদার লাজারুস গোমেজ	পাদ্রীশিবপুর ০৮/০৮/১৯৩৯	সিএসসি ফাদার সংঘ	১ম ব্রত: সাগরদী ১৪/০৬/১৯৬২ আজীবন ব্রত পাদ্রীশিবপুর ০১/০১/১৯৭১	৩১/১২/১৯৭২		সংঘ ও যাজকীয় জীবন পরিত্যাগ ১৯৭৬
৬	ফাদার যোসেফ জীবন গোমেজ	পাদ্রীশিবপুর ১৫/০৪/১৯৫৪	চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ	--------	২৮/১২/১৯৮৪		
৭	ফাদার লরেন্স বরুন গোমেজ	পাদ্রীশিবপুর ১২/০৩/১৯৫৭	চট্টগ্রাম-বরিশাল ধর্মপ্রদেশ	--------	২৭/১২/১৯৮৫		
৮	ফাদার লাজারুস কানু গোমেজ	পাদ্রীশিবপুর ১৪/০৯/১৯৫৪	চট্টগ্রাম-বরিশাল ধর্মপ্রদেশ	--------	পোপ কর্তৃক যাজকীয় অভিষেক ১৯/১১/১৯৮৬		
৯	ফাদার জেরোম রিঙ্কু গোমেজ	পাদ্রীশিবপুর ৩০/০৯/১৯৬৬	চট্টগ্রাম-বরিশাল ধর্মপ্রদেশ	--------	২৮/১২/২০০১		

১০	ফাদার লরেন্স লেকাভালিয়ের গোমেজ	পাদ্রীশিবপুর ১৪/০৪/১৯৮১	চট্টগ্রাম-বরিশাল ধর্মপ্রদেশ	--------	০৭/০২/২০১৪		
১১	ফাদার লিটন গোমেজ (রাজাবাড়িয়া)	পাদ্রীশিবপুর ১৫/০২/১৯৭৯	চট্টগ্রাম-বরিশাল ধর্মপ্রদেশ	--------	০৭/০২/২০১৪		
১২	ফাদার ক্লেমেন্ট রিগন ডি'কস্তা	পাদ্রীশিবপুর ১৬/০৯/১৯৮১	চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ	--------	২৮/১১/২০১৪		
১৩	ফাদার জার্মাইন সঞ্জয় গোমেজ	পাদ্রীশিবপুর ২৭/০৫/১৯৮৪	চট্টগ্রাম-বরিশাল ধর্মপ্রদেশ	--------	২৭/১১/২০১৫		
১৪	ফাদার রুবেন ম্যানুয়েল গোমেজ, সিএসসি	পাদ্রীশিবপুর ০৫/০৯/১৯৮১	সিএসসি ফাদার সংঘ	১ম ব্রত: ০১/০৭/২০০৯ আজীবন ব্রত ১৫/০৪/২০১৬	২৮/১২/২০১৬		

॥ খ ॥ পাদ্রীশিবপুর বংশোদ্ভূত পশ্চিমবঙ্গের যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী

ক্র. নং	যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীদের নাম	জন্ম স্থান ও তারিখ	সংঘ/ধর্মপ্রদেশ	প্রথম ব্রত/ আজীবন ব্রত	যাজকীয় অভিষেক	মৃত্যু দিবস	মন্তব্য
১	ফাদার দীপক গোমেজ, এসজে	পাদ্রীশিবপুর ২০/০২/১৯৪৬	জেসুইট সংঘ		২৪/১০/১৯৮১		
২	ফাদার তপন গোমেজ, এসজে	ভারত ২৯/১১/১৯৪১	জেসুইট সংঘ			২২/৫/২০১৮	
৩	ফাদার অনিল গোমেজ, এসজে	ভারত ০৫/০৭/১৯৫০	জেসুইট সংঘ		২০/১০/১৯৮৯		
৪	ফাদার মলয় ডি'কস্তা	পাদ্রীশিবপুর ২২/১০/১৯৬১	কোলকাতা আর্চডাইয়োসিস		২২/০৪/১৯৯৫		
৫	ফাদার তুষার গমেজ, এসভিবি	ভারত ১১/০৬/১৯৯৪	সালেসিয়ান সংঘ	২৪/০৫/২০১৫ ০৫/০২/২০২২	১৬/১২/২০২৩		

॥ গ ॥ পাদ্রীশিবপুর বংশোদ্ভূত বাংলাদেশের যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী

ক্র. নং	যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীদের নাম	জন্ম স্থান ও তারিখ	সংঘ/ধর্মপ্রদেশ	প্রথম ব্রত/ আজীবন ব্রত	যাজকীয় অভিষেক	মৃত্যু দিবস	মন্তব্য
১	ফাদার টেরেন্স রড্রিগস	চট্টগ্রাম ০৩/১১/১৯৬৭	চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ		০৭/১১/১৯৯৬		
২	ফাদার ম্যাক্সওয়েল টমাছ	ঢাকা ১০/০৬/১৯৭৬	ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ		১৩/১০/২০০৬		
৩	ফাদার রিপন আন্তনি ডি'রোজারিও	ঢাকা ১৭/০৯/১৯৮১	ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ		২৭/১২/২০১২		
৪	ফাদার ডেভিড রকি গোমেজ	খুলনা ১৫/১০/১৯৬৯	জেভেরিয়ান সংঘ		২০/০৭/২০০৭		
৫	ফাদার জুয়েল ম্যাকফিল্ড	খুলনা ০৬/১১/১৯৮১	খুলনা ধর্মপ্রদেশ		০৪/০৩/২০১১		

॥ ঘ ॥ জন্মসূত্রে অথবা বংশোদ্ভূত পাদ্রীশিবপুরের সন্ন্যাসব্রতী

ক্র. নং	যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীদের নাম	জন্ম স্থান ও তারিখ	সংঘ/ধর্মপ্রদেশ	প্রথম ব্রত/ আজীবন ব্রত	মৃত্যু দিবস	মন্তব্য
১	মাদার বর্জিয়ানা ডি'রোজারিও, এফবিএস	পাদ্রীশিবপুর	মাদ্রাজ - ভারত			বার্নাড স্যারের বোন
২	প্রয়াত সিস্টার অ্যানেটে গোমেজ, এফবিএস	পাদ্রীশিবপুর	মাদ্রাজ - ভারত			রামুয়েল গোমেজের বোন
৩	প্রয়াত সিস্টার মেরী স্টেলা কৈলু, এফবিএস	পাদ্রীশিবপুর	মাদ্রাজ - ভারত			স্বর্গীয় আন্টনি কৈলুর মেয়ে
৪	প্রয়াত সিস্টার ক্লারা আরাতোনিয়া গোমেজ	পাদ্রীশিবপুর	মাদ্রাজ - ভারত			ফাদার লাজারুসের পিসি
৫	সিস্টার মেরী লিলিয়ান, এসএমআরএ	পাদ্রীশিবপুর	এসএমআরএ সংঘ	০৬/০১/১৯৫১ ০৬/০১/১৯৫৭		
৬	সিস্টার অনু ক্লারিছ, এলএইচসি	পাদ্রীশিবপুর ২২/০৬/১৯৪১	এলএইচসি সংঘ	০৫/০১/১৯৭১ ১৯৭৭		
৭	সিস্টার আরতি ডি'কস্তা, এলএইচসি	পাদ্রীশিবপুর ১৪/০১/১৯৪৯	এলএইচসি সংঘ	২৫/০৭/১৯৬৯ ০২/০৮/১৯৭৭		
৮	সিস্টার জসিন্তা বেবী ডি'রোজারিও, সিএসসি	পাদ্রীশিবপুর	এলএইচসি সংঘ	২৭/০১/২০০২		
৯	সিস্টার মার্লিন মুন্না গোমেজ, এলএইচসি,	পাদ্রীশিবপুর ২১/১১/১৯৮৩	এলএইচসি সংঘ	১০/০৯/২০০৮ ০৪/০৯/২০১৫		
১০	সিস্টার মেরী অ্যালুইসিয়াস, এমসি	পাদ্রীবপুর ১৩/০৮/১৯৪৬	ভারত এমসি সংঘ	১৯/১০/১৯৬৫		
১১	সিস্টার মার্লিন নোরা গোমেজ, এমসি	পাদ্রীশিবপুর	এমসি সংঘ	প্রথমব্রত ১৯/০৫/১৯৮৩		
১২	সিস্টার জেনিকা হেলেন গোমেজ, এমসি	পাদ্রীশিবপুর ১৪/০৫/১৯৫৮	এমসি সংঘ	আজীবন ব্রত ০৫/০৫/১৯৮৭		
১৩	সিস্টার রাণী শ্রুতি ভিক্টোরিয়া ডি'কস্তা, এমসি	পাদ্রীশিবপুর	এমসি সংঘ	প্রথমব্রত ১৯/০৫/১৯৮৩		
১৪	প্রয়াত মাদার রিচেল গোমেজ আরএনডিম	পাদ্রীশিবপুর	আরএনডিম সংঘ	প্রথমব্রত ১৯/০৫/১৯৮৩		
১৫	সিস্টার শিউলি রোজারিও, আরএনডিম	ঢাকা	আরএনডিম সংঘ	২০০১ ২০১০		
১৬	সিস্টার বেবী ট্রিজা, আরএনডিএম	পাদ্রীশিবপুরু	আরএনডিম সংঘ	২০০৫ ২০১৩		
১৭	সিস্টার জ্যাকলিন গোমেজ, এসসি	পাদ্রীশিবপুর	এসসি সংঘ	০৬/১০/১৯৯৫ ২৩/১১/২০০১		
১৮	সিস্টার কর্নেলিউস শ্যামলী গোমেজ, এসসি	মাটিভাঙ্গা পাদ্রীশিবপুর	এসসি সংঘ	০১/১১/১৯৯৬ ২২/১১/২০০২		

১৯	সিস্টার ফিলোমিনা শিউলি গোমেজ, এসসি	মাটিভাঙ্গা পাদ্রীশিবপুর	এসসি সংঘ	২১/০১/২০০০ ২১/১১/২০০৬		
২০	সিস্টার প্রমিলা গোমেজ, সিএসসি	রাজাবাড়িয়া পাদ্রীশিবপুর	সিএসসি সিস্টার সংঘ	১০/০৩/২০০৭ ১৮/১০/২০১৩		
২১	সিস্টার ক্যাথরিন কনিকা সরকার, সিএসসি	চট্টগ্রাম	সিএসসি সিস্টার সংঘ	০৭/০৯/২০০৭ ১৮/১০/২০১৩		
২২	সিস্টার বেনেডিক্টা স্বপ্না গোমেজ, আইবিভিএম	ভারত ২৬/১২/১৯৪৭	আইবিভিএম সংঘ (লরেটো)	২৬/০৪/১৯৬৮ ০৭/০৯/১৯৭৫		
২৩	সিস্টার ইভন আগ্নেস গোমেজ, আইবিভিএম	ভারত	আইবিভিএম সংঘ (লরেটো)	০৮/০৯/১৯৮৭ ০৯/০৬/১৯৯৬		
২৪	ব্রাদার লিনুস ডি'রোজারিও, সিএসসি	পাদ্রীশিবপুর ২২/০৪/১৯৬০	সিএসসি ব্রাদার সংঘ	২৬/১০/১৯৮৪ ০২/১০/১৯৯০		
২৫	ব্রাদার প্রিন্স ম্যাকফিল্ড, সিএসসি	খুলনা ২৭/১২/৯১	সিএসসি ব্রাদার সংঘ	২২/০৭/২০১১ ০৪/০১/২০১৯		
২৬	ব্রাদার জেমস গোমেজ, কেবিজে	পাদ্রীশিবপুর	কটোংনে সংঘ	০২/০২/২০১৫		

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এখানে একটা বিষয় রেকর্ড করতে চাই যে, পাদ্রীশিবপুর গির্জা-প্রাঙ্গণের মধ্যে দক্ষিণ দিকের রাস্তা ঘেসে একটি সমাধিস্থান আছে যেখানে তিন জন ফাদারকে ইতোমধ্যে সমাহিত করা হয়েছে। তার হলেন:

ফাদার লিও গোমেজ – জন্ম: ৭ই ডিসেম্বর, ১৯০৭ খ্রি. মৃত্যু: ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮ খ্রি.

ফাদার বেঞ্জামিন লাবে সিএসসি – জন্ম: ১৯মে ১৯২৩ খ্রি. মৃত্যু: ১৫ই মে, ১৯৯৮ খ্রি.

ফাদার ফিলিপ গোমেজ – জন্ম: ২০ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬ খ্রি.; মৃত্যু: ১০ই মে, ২০১৮ খ্রি.

উপসংহার:

উপসংহারে কয়েকটি মন্তব্য তুলে ধরছি:

* নিশ্চত করে বলা যায় যে, ১৯৫০ দশকের আগে আনুষ্ঠানিক ভাবে ধর্মীয় জীবনে আহ্বান বৃদ্ধির জন্য তেমন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি। এর আগে যারা ধর্মীয় জীবনে যোগ দিয়েছে তারা অনেকটা ব্যক্তিগত উদ্যোগে করেছেন।
* সর্বমোট প্রায় ৫০ জন ধর্মীয় জীবনে যোগ দিয়েছেন: ২৪ জন পুরোহিত, ২৪ জন সিস্টার ও ২ জন ব্রাদার, আরও ১০ জনার মতো যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু আহ্বান ত্যাগ করে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করেছে। পাদ্রীশিবপুরের মতো খ্রিস্টান ঐতিহ্যবাহী একটি প্যারিশ থেকে এতো সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও ধর্মীয় জীবনে প্রবেশকারীদের সংখ্যা আরও বেশী হতে পারত। তথাপি অভিবাসনের চ্যালেঞ্জের মধ্যে ধর্মীয় সেবক-সেবিকাদের সংখ্যা সন্তোষজনক বলতেই হবে।
* দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা মণ্ডলীতে অনেক পরিবর্তন নিয়ে আসছে যা গ্রহণ করা খ্রিস্টভক্তদের নিকট কষ্টসাধ্য ছিল। এর মাঝে আবার যারা প্রবেশ করেছিল তারা চলে যাওয়ায় উভয় পিতামাতা ও ছেলেমেয়েরা কিছুটা নিরুৎসাহিত হয়েছে অনেক বেশি।

* আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে কোলকাতা, চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনায় যারা অভিবাসী হয়েছিল তাদের মধ্যেও কেউ কেউ ধর্মীয় জীবনে যোগদান করেছে – এটা একটি ভাল লক্ষণ।
* পাদ্রীশিবপুরের দুটো উপকেন্দ্র থেকে ধর্মীয় জীবনে আহ্বান এসেছে তবে দেশের মধ্যে দেশান্তরকাঠি থেকে কোন ছেলেমেয়ে ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করেনি। তারা এই বিষয়টি নিয়ে সচেতন; ভবিষ্যতে আশা করা যেতেই পারে।
* পাদ্রীশিবপুরবাসীরা ঈশ্বরের কাছে একটা বিষয়ে অনেক কৃতজ্ঞ যে, ঈশ্বর পাদ্রীশিবপুরের একজন সন্তানকে প্রথমবারের মতো বিশপ, আর্চবিশপ এবং মণ্ডলীতে একজন বাঙালিকে আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও-কে কার্ডিনাল হিসেবে মনোনীত করেছেন। জনগণের কাছে এটা একটি বড়ো আশীর্বাদ যেমন পাদ্রীশিবপুর, তেমনি গোটা বাংলাদেশের জন্য।
* ভবিষ্যতে পাদ্রীশিবপুরবাসী যেখানেই থাকুক না কেন আশা করি ধর্মীয় জীবনে প্রবেশের জন্য পরিবারের পিতামাতা আরও উদ্যোগী হয়ে ছেলেমেয়েদের যাজক, ব্রাদার ও সিস্টার হওয়ার জন্য উৎসাহিত করবেন।

তথ্যসূত্র :[১০]

(১) শ্রীমন্ত তটে-২০১৫, পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, ঢাকা
(২) স্মরণিকা - ২০১৬, পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর বিশপ, যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও বিবাহিত দম্পতিদের রজত ও সুবর্ণ জয়ন্তী, পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ, পৃষ্ঠা ৫১-৫৩
(৩) স্মরণিকা – ২০২২, বিশপীয় অভিষেক: বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও, ১৯ আগস্ট, ২০২২, পৃষ্ঠা ৫৫-৫৬
(৪) মি. মার্টিন সি. গোমেজ, প্যারিশ হাউজে বোর্ডে লিখিত তালিকা ও স্মরণিকা থেকে
(৫) সাক্ষাৎকারে সংশ্লিষ্ট যাজকদের মৌখিক তথ্য।

[১০] তথ্যসূত্র

তৃতীয় অধ্যায়: যাজকীয় ও সন্ন্যাসজীবনের সুবর্ণ-জয়ন্তীকারী প্রয়াত ও জীবিত ব্যক্তিবর্গের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

॥ ক ॥ প্রয়াত বিশেষ ব্যক্তিত্ব: যাজক ও কাটেখিষ্ট

ফাদার লিও গোমেজ[১১]

জন্ম: ৭ ই ডিসেম্বর, ১৯০৭ খ্রি. এবং মৃত্যু: ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯ খ্রি.

– মার্টিন সি. গোমেজ



ঈশ্বরের সেবায় নিবেদিত পাদ্রীশিবপুর মাটির প্রথম সন্তান স্বর্গীয় ফাদার লিও গোমেজ স্মরণে দুটি কথা। রেভাঃ ফাদার লিও গোমেজ পাদ্রীশিবপুরের একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা গাব্রিয়েল গোমেজ এবং মাতা আগ্নেস গোমেজ।

ফাদার লিও গোমেজকে চেনেন অনেকেই কিন্তু জানেন কয়েকজন। তার আত্মীয়-স্বজন অধিকাংশই দরিদ্র ছিলেন। লেখাপড়া করার জন্য তাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে, কারণ সে সময় লেখাপড়া বা জ্ঞানার্জন এতোটা সহজসাধ্য ছিল না। এই কথাটা বললাম এজন্যে যে, সে সময় পেটে ভাত জুটতো না, পরণে কাপড় ছিল না, পড়াশুনার জন্য যাবতীয় উপকরণের অভাব ছিল। চলাফেরার জন্য রাস্তাঘাট ভালো ছিল না, ভালো বাসস্থানেরও অভাব ছিল। চরম দরিদ্রতার মধ্যে লেখাপড়া করে ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে কঠিন অধ্যবসায়ের মাধ্যমে ঈশ্বরের অসীম দয়ায় তখনকার ফাদার, ব্রাদার, সিস্টারদের সাহচর্য্যে, ভালোবাসায়, আন্তরিকতায়, নৈতিকতায় ও অর্থনৈতিক সমর্থনে ধীরে ধীরে ঈশ্বরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস, প্রেম ও ভালোবাসায় ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করেন এবং ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে যাজকত্ব লাভ করে।

তাঁর কর্মস্থলসমূহ

নারিকেলবাড়ি ধর্মপল্লীঃ যাজকীয় অভিষেকের পর তার প্রথম কর্মস্থল নির্ধারিত হয় নারিকেলবাড়ি ধর্মপল্লীতে। তিনি এখানে ১৯৩৮ খ্রি. থেকে ১৯৫১ খ্রি. পর্যন্ত পালকীয় দায়িত্ব পালন করেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজনে, ফাদার লিও গোমেজ বাঙ্গালী পুরোহিতদের মধ্যে বাণী প্রচারে অগ্রপথিকদের অন্যতম। তার কর্মক্ষেত্র বিশাল ও ব্যাপক। তাকে সম্পূর্ণ জানতে হলে ব্যাপক গবেষণা করা প্রয়োজন। মাতামণ্ডলী প্রচারে বিমুখ, তাই এরকম ব্যবস্থা নেই। নারিকেলবাড়ি সম্পর্কে বলতে হলে বর্তমান নারিকেলবাড়ি'র চিত্র দিয়ে বোঝা যাবে না। ১৯২১ খ্রি. থেকে ১৯৫১ খ্রি. পর্যন্ত নারিকেলবাড়ি'র সার্বিক চিত্র খুবই নাজুক ছিল; আশ্রয়, যাতায়াত, চিকিৎসা, প্রভৃতি অমানবিক পর্যায়ে ছিল। এটা ছিল বিলাঞ্চল; বছরের ৯ মাস ১০-১২ ফুট পানির নিচে থাকতো। খ্রিস্টানদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। হিন্দু পরিবেশ থেকে ওঠা-বসা করে অনেক হিন্দু পরিবারকে সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে

[১১]শিমন্ত তটে-২০১৫, পৃষ্ঠা ৪৮-৫০

খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করে খ্রিস্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। অভাব-অনটনে, অসুখে-বিসুখে অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ওখানকার প্রবীণ লোকজন আন্তরিকরতার সাথে কৃতজ্ঞতাভরে আজও এর সত্যতা স্বীকার করেন। নারিকেলবাড়ি প্যারিশ সংলগ্ন জমি-জমা ক্রয় করে খ্রিস্টান পরিবারগুলোকে স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করেন।

আগরতলা ঃ বর্তমান আগরতলা তৎকালীন সময়ে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত ছিল। রেভা: ফাদার লিও গোমেজ ১৯৫২ খ্রি থেকে ১৯৫৫ খ্রি. পর্যন্ত আগরতলা মরিয়মনগর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতের দায়িত্বে ছিলেন। সেখানে যাজকীয় দায়িত্বের পাশাপাশি স্কুল এবং হোস্টেল পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। দরিদ্র ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য তিনি একজন নিদর্শন হয়ে ওঠেন। এখানেও তিনি অনেক অখ্রিস্টানকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেছেন এবং তিনি এখানে দুটো ধর্মপল্লী স্থাপন করেন। শ্রদ্ধেয় ফাদার আগরতলা থেকে পায়ে হেঁটে বান্দরবানের 'রাড়াপাড়া'য় প্রবেশ করে তৎকালীন বান্দরবান মহকুমায় আসেন।

বান্দরবন ঃ তিনি বান্দরবন থেকে পায়ে হেটে রাঙ্গামাটি-তে যান। হাটার পথে অসংখ্য পাড়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এখানে ফাদারের একটি বাড়ি দৃষ্টিগোচর হয় যেখানে তিনি বাড়িটি বিভিন্ন পশু-পাখির হাড়-গোড়, কঙ্কাল, মুন্ডু দিয়ে সজ্জিত দেখতে পান। সেখানে কালো কাপড়, চুন, সিঁদুরের ফোটা দেওয়া ছিল। ফাদারের হৃদয়ে এ উপলব্ধি আসে যে খ্রিস্টবাণী প্রচারের এটাই উপযুক্ত জায়গা। রাঙ্গামাটি থেকে তিনি চট্টগ্রামে গিয়ে মাননীয় বিশপ আলফ্রেড ল্য পাইওর-এর সাথে দেখা করে সমস্ত বিষয় অবগত করেন। বিশপ মহোদয় সন্তুষ্ট হয়ে ফাদারকে বান্দরবানের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

শ্রদ্ধেয় ফাদার লিও বান্দরবনের দায়িত্ব পেয়ে তৎকালীন ওখানকার বোমাং রাজার সাথে সখ্যতা গড়ে তোলেন। উল্লেখ্য যে, ওই রাজ-পরিবারের পাদ্রীশিবপুর সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে রাজা সাহেব সেন্ট প্লাসিড হাই স্কুলে (ইংলিশ মিডিয়াম) পড়াশুনা করেছেন এবং যুদ্ধের কারণে চট্টগ্রাম থেকে দুই বছর সেন্ট প্লাসিড পাদ্রীশিবপুরে স্থানান্তরিত হয়। রাজার সহযোগিতায় ফাদার রাজবাড়ির পাশেই মণ্ডলী স্থাপনের জন্য বিশাল জায়গা লাভ করেন। ফাদার পাহাড়ি ভাইবোনদের সাথে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে যান। তাদের ভাষাও আয়ত্ব করেন। খ্রিস্টকে তাদের মধ্যে তুলে ধরেন। আন্তরিক ভালোবাসায় ও স্নেহমায়া মমতায় তাদেরকে আপন করে নেন। ফাদারের সাধারণ বেশভুষা-চলাফেরা তাদেরকে অভিভূত করেন। পাহাড়ি ভাইবোনদের মধ্যে সর্বপ্রথম ত্রিপুরা সম্প্রদায় খ্রিস্টবাণী বিশ্বাস করে বাপ্তিস্ম নেন। ফাদার লিও-র বুনে যাওয়া বীজ বৃক্ষে পরিণত হয়ে ফুলে-ফলে ভরে উঠেছে। ফাদার লিও-র পরবর্তী পুরোহিতগণ কঠোর পরিশ্রম করে অনন্য অবদান রেখেছেন, যার সুফল আমরা দেখতে পাচ্ছি। তিনি এখানে ১৯৫৬ খ্রি. থেকে ১৯৬১ খ্রি. পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন।

আমেরিকা ঃ ফাদার লিও গোমেজ ১৯৬২ খ্রিঃ কানাডায় গিয়ে এক বছরের ঐশতত্ত্বের ওপর একটি কোর্স সমাপ্ত করেন। কানাডা থেকে উত্তর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে গমন করেন এবং আওয়ার লেডি অব পার্পেচ্যুয়াল ট্রাস্ট- এ সহকারি পাল-পুরোহিত এবং ধর্ম শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তিনি আমেরিকায় দীর্ঘ ২৬ বছর সেবা দিয়েছেন। এই সময়কালে তিনি চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের পক্ষে মিশন কাজ করেন।

এখান থেকে তিনি মিশা উৎসর্গের যে (Mass Stipend) টাকা পেতেন তা দিয়ে তিনি পাদ্রীশিবপুরের গরিব ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার খরচ যোগাতেন। জমিজমা রক্ষা করার ব্যবস্থা করতেন আর অতি দরিদ্র পরিবারে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। তাদের মধ্যে অনেকেই আজ স্বাবলম্বী ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত। তিনি পাদ্রীশিবপুরসহ অন্যান্য স্থানে গরিব ছেলেমেয়েদের জন্য আর্থিক সাহায্য করেছেন এবং ফাদার লিও গোমেজ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গঠন করেছেন যার মূল উদ্দেশ্য শিক্ষা, রোগীদের চিকিৎসা, দুর্যোগকালীন সহায়তা এবং ট্রাস্ট সিডিউলের জমি ফেরৎ দেওয়া। বর্তমানে ট্রাস্টের অধীনে নিয়মিত শিক্ষা সহায়তা দেওয়া হয়। আমরা স্মৃতিভরে তার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। আমেন।

ফাদার ফিলিপ ডি'রোজারিও[১২]

জন্ম: ২০ ডিসেম্বর, ১৯৩৫ খ্রি. এবং মৃত্যু: ১০ মে, ২০১৮ খ্রি.

- মার্টিন সি. গোমেজ/ফা: লেকাভালিয়ের গোমেজ



জন্ম ও শৈশব ঃ শ্রীমন্ত নদের তীরে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস-সমৃদ্ধ একটি গ্রাম পাদ্রীশিবপুর। ভারতের মাইলাপুর ধর্মপ্রদেশাধীন পর্তুগীজ অধ্যুষিত এ গ্রামটি কাথলিক মণ্ডলীতে শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অনেক অবদান রেখেছে। এ গ্রামে গীর্জা, স্কুল, ফাদারবাড়ি, সিস্টারবাড়ি, ব্রাদারবাড়ি এবং ফাতেমা চিকিৎসা কেন্দ্র সংলগ্ন একটি ছোট্ট গ্রাম আড়াইবেকি। আড়াইবেকি গ্রামের মা-বাবার কোল জুড়ে ডিসেম্বর ২০, ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ফাদার ফিলিপ ডি'রোজারিও-র জন্ম।

ঠাকুরদাদা ফিলিপ ডি'রোজারিও এবং ঠাকুরমা অ্যানি ডি'রোজারিও। তাদের ছয় ছেলে ও এক মেয়ে। তারা হলেন ঃ জ্যাঠা যোসেফ জুমা ডি'রোজারিও ও জ্যাঠিমা গ্রেসী ডি'রোজারিও, পিতা জেরমান ডি'রোজারিও এবং মাতা প্রিসিলা ডি'রোজারিও। কাকা নিকোলাস ডি'রোজারিও ও কাকিমা স্টেলা ডি'রোজারিও, এরমান ডি'রোজারিও, এলাই ডি'রোজারিও, পাসকেল ডি'রোজারিও এবং পিসিমা মনি ডি'রোজারিও, এরা সবাই ভারত প্রবাসী ছিলেন।

ফাদার পরিবারে এক বোন ও তিন ভাই; তারা হলেন ঃ-

১) মাগ্দালেনা ডি'রোজারিও (কন্যা) ভারত-প্রবাসী, এক মেয়ে, দুই ছেলে।

২) ফ্রান্সিস ডি'রোজারিও (পুত্র), বিবাহিত, ভারত-প্রবাসী, চার ছেলে, দুই মেয়ে।

৩) ফিলিপ ডি'রোজারিও (পুত্র), পুরোহিত, বাংলাদেশ।

৪) রবিন ডি'রোজারিও (পুত্র), বাংলাদেশ। এর চার মেয়ে ও এক ছেলে। এছাড়াও বাড়িতে কাকাতো এক ভাই ও দুই বোন আছে।

বাবা-মা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন কোলকাতার বৈঠকখানার গীর্জায়। সেখানে তাদের সংসার ও পারিবারিক জীবন শুরু হয়। তবে ফাদার ফিলিপের জন্ম, শৈশব-কৈশোর এবং শিক্ষা জীবন কেটেছে এই পাদ্রিশিবপুর গ্রামেই।

---

[১২] শ্রদ্ধেয় ফাদার ফিলিপ ডি'রোজারিও'র যাজকীয় জীবনের সুবর্ণ জয়ন্তী – স্মরণিকা, ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ খ্রি.

মা সাধারণ লেখাপড়া জানা গৃহিনী ছিলেন। দৈনন্দিন জীবনে সন্ধ্যা প্রার্থনা এবং রাত ৮:০০ টায় মৃত লোকদের আত্মার কল্যাণে কামনা করে প্রার্থনা করা বাধ্যতামূলক ছিল। বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি ছাড়াও প্রতি রবিবারে খ্রিষ্টযাগে যোগদান করাও বাধ্যতামূলক ছিল। ফাদারের ছোট ভাই রবিনের জন্মের সাত মাসের মধ্যে তার মা স্বর্গবাসী হন।

বাবা জেরমান কোলকাতার বৈঠকখানায় এবং পাদ্রীশিবপুরে ব্রাদারদের সাথে কাজ করতেন। সাংসারিক সব ধরনের কাজে পটু ছিলেন। বড় ভাই ফ্রান্সিস ভারতে পুলিশ বাহিনীতে চাকুরিরত ছিলেন। সেখান থেকে অবসর নিয়ে মারা যান। তাদের বাবার আরেকটি গুণ ছিল - কবি গান গাওয়া। বয়াতি হিসাবে তার পরিচিতি ছিল। গ্রামীণ সন্ধ্যাকালীন আসরে পরম কথা (গ্রাম্য লোকগল্প) এবং গান গেয়ে সবাইকে মাতিয়ে রাখতেন।

শিক্ষাজীবন ঃ বয়োঃবৃদ্ধির সাথে সাথে ফাদার ফিলিপ মায়ের হাত ধরে স্থানীয় আলফ্রেড্স হাই স্কুলের শিশু শ্রেণীতে ভর্তি হন। এ বিদ্যালয় হতে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুলের ছাত্রজীবনে সব ধরনের খেলাধুলায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। প্রতি বছর-ই বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার পেতেন। নাটকে অভিনয় করতেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও তার অংশগ্রহণ নিয়মিত-ই ছিল। ফুটবল, বাস্কেটবল, ভলিবল, ব্যাটবল, ওয়াটারপোলো প্রভৃতি খেলা তার প্রিয় ছিল। বিদ্যালয়ে নম্রতা, ভদ্রতা, বাধ্যতা ইত্যাদির জন্য তিনি একাধিকবার শ্রেষ্ঠ ছাত্র হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন।

স্কুল স্কাউটিং- এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা ছিল তার আরেকটি বিশেষ গুণ। বরিশাল জেলা পর্যায়ে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে খেলায় অংশ নিতেন এবং প্রতিবারই পুরস্কার পেয়ে স্কুলের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতেন। প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম স্থানটি তাঁর প্রায় নিয়মিতই থাকতো। ভদ্র, বিনয়ী ছাত্র হওয়ার সুবাদে ক্লাসের সামনের আসনেই বসতেন। তার ক্লাসে ২ জন মাত্র মেয়ে পড়তেন এবং তারা তার পাশেই বসতেন। ভালো ও মেধাবী ছাত্র হওয়ার কারণে শিক্ষকদের প্রিয় পাত্র ছিলেন। এমনকি, ঐ সময়ে স্থানীয় মিঃ চার্লস গোমেজ (নায়েব মশায়), ডাক্তার ফ্রান্সিস হোমিওপ্যাথ) সহ অন্যান্য নেতৃস্থানীয় লোকজন তাঁকে ডেকে এনে স্নেহের চোখে কথা বলতেন। এটা ছিল তার জীবনে বিশেষ প্রাপ্তি। ধর্মপল্লীর তৎকালীন পাল-পুরোহিত শ্রদ্ধেয় ফাদার রড্রিগ্স ফিলিপকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন, ভালোবাসতেন এবং অনুপ্রেরণা যোগাতেন। এ ভালোবাসা এবং অনুপ্রেরণার জন্যই ফাদারকে যাজকীয় জীবনে প্রবেশের আগ্রহী করে তুলেছে। ঐ সময়ের অন্যান্য ফাদার, ব্রাদার এবং সিস্টারদের কাছেও তিনি প্রিয় ছিলেন। শিক্ষা জীবনে ব্রাদার গডফ্রে সিএসসি, ব্রাদার গ্যাস্টিন সিএসসি, ব্রাদার পল সিএসসি, ব্রাদার রবার্ট সিএসসি, ব্রাদার হ্যামেল সিএসসি এবং সিস্টার আলফন্স সিএসসি, সিস্টার অ্যালেং সিএসসি, সিস্টার ডেমিয়েন সিএসসি প্রমুখ তার জীবনের চলার পথকে অনুপ্রাণিত করেছেন।

নটর ডেম কলেজ, ঢাকা (১৯৫৭-১৯৫৮) ঃ ম্যাট্রিকুলেশন পাসের পর তিনি ঢাকাস্থ নটর ডেম কলেজ-এ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং সফলতার সাথে আইএ পাস করেন। এখানে তিনি পড়াশুনার পাশাপাশি বিভিন্ন খেলাধুলায় পারদর্শী ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন; বিশেষ করে, কলেজে আয়োজিত ইংরেজী নাটক সমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন।

স্কলাসটিকা, সাগরদি, বরিশাল (১৯৫৯) ঃ যাজকীয় জীবনে প্রবেশের প্রস্তুতি-পর্ব হিসেবে তিনি এখানে ভর্তি হয়ে এক বছর ফিলোসফি (দর্শন) বিষয়ে পড়াশুনা এবং ল্যাটিন ভাষা আয়ত্ব করে নেন।

রোমে গমন (১৯৬০-১৯৬৮) ঃ পরবর্তী পড়াশুনার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে তৎকালীন চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের মাননীয় বিশপ রেমন্ড লারোজ ফাদার ফিলিপকে রোমে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। যাওয়ার আগে বিশপ মহোদয়ের সাথে একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হয় যে শিক্ষার পিছনে যাবতীয় খরচাদি ফেরৎ দিতে হবে। স্বদেশে ফিরে ফাদার চুক্তি ভঙ্গ করেননি।

রোমে ফিলোসফি বিষয়ে তিন বছর পড়াশুনা করেন। তিনি সফলভাবে বাকালরিয়েট, অর্থাৎ বিএ পাস করেন এবং পরবর্তীতে লাইসেন্সশিয়েট ডিগ্রি (এম এ) লাভ করার জন্য আরও চার বছর পড়াশুনা করেন। ইতোমধ্যে তিনি যাজক হওয়ার পথ্যে ধাপগুলো অতিক্রম করে ডিকন পদ লাভ করেন।

যাজকীয় অভিষেক (১৯৬৬) ঃ অবশেষে জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আশা-আকাঙ্খা পূরণের সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি উপস্থিত হয় ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে যখন তিনি রোমে থাকাকালীন চিরকালীন যাজকীয় অভিষেক লাভ করেন। পুরোহিত হওয়ার পর তিনি লাইসেন্সশিয়েটে (এমএ) Cum Laude প্রশংসা পত্র পেয়ে ডিগ্রি লাভ করেন। শ্রদ্ধেয় ফাদার ফিলিপ ডি'রোজারিও চারটি ভাষায় লেখা ও পড়ায় সমভাবে পারদর্শী। এটা তার একটা বিশেষ গুণ। উল্লেখ্য যে, ফাদার ফিলিপ হলেন ধর্মপ্রদেশীয় সংঘের একজন যাজক। রোমে থাকাকালীন একটি পরিবার তাঁকে সন্তানতুল্য স্নেহের চোখে দেখতেন। তাঁর যাজকাভিষেকের সময়ে ঐ পরিবারটি তাদের একমাত্র মেয়ে নিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল।

ফাদার ফিলিপ রোমে থাকাকালীন হাত-খরচ থেকে জমানো টাকায় একটি ভেস্পা (Vespa) স্কুটার কিনে ছুটির ফাঁকে ফাঁকে প্রায় সমস্ত ইউরোপ ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর সাথে একসঙ্গে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষীর আরও অনেকজন যাজকপদে অভিষিক্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে অনেকেই পরলোকগত হয়েছেন। যারা বেঁচে আছেন তাদের সাথে ফাদারের যোগাযোগ আছে। সুবর্ণ জয়ন্তীতে তাদের সাথে দেখা করার জীবনের শেষ ইচ্ছা নিয়ে তিনি রোমের পুণ্য ভুমিতে এবং সেই সাথে ইউরোপে আরেকবার ঘুরতে যান। তাঁর বন্ধুরা অনেকে বিশপ, কার্ডিনাল এবং পোপের সেক্রেটারি পদে আসীন।

রোমে অন্যান্য কর্মকান্ড ঃ

* বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে ডিন (Dean) নির্বাচিত হতো। শ্রদ্ধেয় ফাদার ফিলিপ ছাত্রাবস্থায় এ পদটি পেয়েছিলেন।
* ভারত, পূর্ব পাকিস্থান, পশ্চিম পাকিস্তান ও শ্রীলংকা দেশগুলো নিয়ে একটি ফোরাম গঠন করা হলে তিনি তাঁর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন।
* বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় ঐদিন পাকিস্তানের হাই কমিশনের সেক্রেটারির স্ত্রীকে বাংলা শেখাতেন।
* RAI - ইটালিয়ান রেডিও-তে বাংলা সংবাদ পাঠ করতেন ফাদার ফিলিপ।

রোমে পড়াশুনা শেষ হলো। বিশপ রেমন্ড লারোজ ফাদার ফিলিপকে জানালেন যে বাংলাদেশে অনেক বেশি পুরোহিত প্রয়োজন। তাই, তিনি ফাদারকে অতি দ্রুত স্বদেশে আসার তাগিদ দিলেন। আসার সময় ফাদার দেশে ভেস্পাটির প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে জাহাজে বুকিং করে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

দেশের পথে (১৯৬৮) ঃ দেশে ফিরে আসার পথে ১৯৬৮ খ্রিঃ ফেব্রুয়ারি মাসে কোলকাতায় আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা করতে কোলকাতায় যান। সেখানে কাথলিক অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (ক্যাব)- এর প্রেসিডেন্ট, মিঃ যোসেফ গোমেজ, প্রেসিডেন্ট, ক্রেডিট ইউনিয়ন কোলকাতা, মিঃ নরবার্ট গোমেজ (মিঃ চার্লজ গোমেজের ছেলে) সহ আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হয়ে নব-অভিষিক্ত ফাদারকে সংবর্ধনা দেন। বিশপ লিনুস তখন কোলকাতার পালক ছিলেন। এ ধরনের সংবর্ধনায় তিনি আবেগে আপ্লুত হন।

কলকাতা থেকে সরাসরি ঢাকায় ঃ ঢাকায় মিঃ মিল্টন গোমেজ, মিঃ আগস্টিন গোমেজ (প্যাঁদা বাড়ি), অধ্যাপক গাব্রিয়েল মানিক গোমেজ, মিঃ গিলবার্ট হুইটলি, মিঃ রবিন গোমেজ, মিঃ পিটার সাহা (স্যার) সহ অন্যান্যদের সহযোগিতায় বিশপ রেমন্ড লারোজ, সিএসসি-এর উপস্থিতিতে ফাদার ফিলিপ ডি'রোজারিও-কে অভ্যর্থনা জানানো হয়। বিশপ মহোদয়ের অনুমতিক্রমে পরবর্তীতে ফাদার পাদ্রীশিবপুর নিজ গ্রামে যান।

চট্টগ্রাম হ'তে নিজ গ্রামে পাদ্রীশিবপুরে ঃ চট্টগ্রাম হতে নিজ গ্রাম পাদ্রীশিবপুরে পৌছানোর পর মিঃ চার্লস গোমেজ (নায়েব মশায়), ডাঃ ফ্রান্সিস গোমেজ, মিঃ ফিলিপ ডি'কস্তা, শ্রদ্ধেয় সিলভেস্টার স্যার, পিজন স্যার, পেতাই মাস্টার, জনাব নওরোজ মিএাঁ প্রমুখ সম্মিলিতভাবে ফাদার ফিলিপকে স্বাগত জানান এবং অভ্যর্থনা দেন। এরপর বিশপ মহোদয়ের নির্দেশক্রমে চট্টগ্রাম ফিরে তিনি বান্দরবনে পালকীয় কাজে নিযুক্ত হন। যাবার পূর্বে হাঁটু গেড়ে মাননীয় বিশপ মহোদয়ের আশীর্বাদ নিয়ে পবিত্রাত্মার শক্তিতে বান্দরবান যাত্রা করেন।

বান্দরবান ধর্মপল্লী, (১৯৬৮-১৯৭১)ঃ জীবনে কখনও পাহাড় দেখা হয়নি। অজানা-অচেনা এক রূপকথার দেশ। গাড়িতে বান্দরবান যেতে আঁকাবাঁকা, চড়াই-উৎরাই পথ। বাসে উঠে প্রভুর নামে এগিয়ে চলছে। দুরু দুরু বুকে, ভীরু মনে সর্পিল গতিতে এগিয়ে চলছে। একসময় গন্তব্যস্থলে পৌছে পাহাড়ের ওপরে প্যাগোডার মতো গির্জাটি দৃষ্টিগোচর হয়। ধীর গতিতে হাঁটি হাঁটি পায়ে পাহাড় বেয়ে উঠে পৌছালেন সঠিক স্থানে।

বান্দরবানে তখন পাল-পুরোহিত ছিলেন ফাদার জর্জ লাপ্রাদ সিএসসি, সহকারী ফাদার বাট্রম নেলসন সিএসসি, ফাদার মরিস ডি'ক্রুজ সিএসসি প্রমুখের সাথে কনিষ্ঠ সহকারী হিসেবে ফাদার ফিলিপ পালকীয় কাজে যোগ দেন। বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত ঘেরা এই জনপদে নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে জীবনের কাজ শুরু। এ প্যারিশে কাজ করেছেন ফাদার লিও গোমেজ। তিনি প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর অসমাপ্ত কাজ এগিয়ে নিতে অনেক আনন্দঘন এ যাত্রা।

এখানে কাজের সুবিধার্থে তাঁকে ত্রিপুরা ভাষা শিখতে হয়েছে। মিঃ জনি ত্রিপুরা কারবারী (গ্রাম প্রধান) নামে একজন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভাষান্তর করে তাঁকে সহায়তা করতেন। বান্দরবন বোর্ডিং-এ তখন ৬৫ জন ছেলে ও ২ জন মাত্র মেয়ে থাকতো। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছেলেদের সাথে খেলাধুলা করে কাটতো।

বোমাং রাজা অং ও প্রু চৌধুরীর সাথে বেশ সখ্যতা ছিল। উল্লেখ্য যে মিঃ চৌধুরী দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধকালীন সময়ে পাদ্রীশিবপুরে ছাত্র ছিলেন। তিনি মিশনারিদের কাজে কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। সময়-সুযোগ পেলে ফাদার স্কুলে গণিত, ইংরেজী বিষয়গুলোর ওপর ক্লাস নিতেন। পালকীয় কাজে গ্রামে যেতে হলে যাওয়ার কোনও নিদিষ্ট সময় থাকতো না। কোন সংবাদ আদান-প্রদান করা সম্ভব হতো না। মরিচ আর হলুদের রান্না করা খাবারে প্রায়ই পেটের পীড়া হতো।

সাধারণ বেশে, সহজ-সরলভাবে পাহাড়ীদের মতো করে জীবনযাপন করে ওদের আপন হয়ে উঠতেন। কিন্তু পাহাড়ী লোকদের সরলতা, আন্তরিকতায় ঈশ্বরের উপর অগাধ বিশ্বাসে সর্বপ্রকার কষ্ট আনন্দে পরিণত হতো। কষ্ট আনন্দে পরিণত হওয়ার মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করা যেত। একবার একটানা তিন মাস পাহাড়ে থাকার অভিজ্ঞতা জীবনকে আনন্দময় করে তুলেছিলো। তিল তিল শ্রম ও মেধায় খ্রিষ্টের আশিষধন্য হয়ে বাণী প্রচারে প্রসারতা লাভ করেছে। এ সুবর্ণ জয়ন্তীতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সবার আশীর্বাদ কামনা করেন।

নারিকেল বাড়ি ধর্মপল্লী, (১৯৭১-১৯৭২) ঃ নারিকেল বাড়ি তখনকার মেঠো পথ ও জলপথ ছিল প্রধান ভরসা ও দীর্ঘ যাত্রা। নৌকায় চেপে বসা, মাঝি তার পেশী শক্তি ও বাহুবলে নৌকা চালায়। খাল-বিল আঁকা-বাঁকা, ঝোঁপ-জঙ্গল, কচুরিপানা, শেওলার স্তুপ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রমণ। মাঝে মধ্যে পানকৌড়ি, বক, ডাহুক এর দেখা মেলে। শাপলা ফুল ফুটে এক মনোরম সৌন্দর্য্য ছড়িয়ে দেয়। নানা রকমের মাছ তার নিজ গতিতে স্বাধীনভাবে ছুটে বেড়ায়। বাড়ি বা পাহাড় গুলো জলের মধ্যে যেন এক টুকরা ভাসমান দ্বীপ। ঋতু পরিবর্তনে এর ভিন্নতা দেখা যায়। সবকিছু মিলে স্রষ্টার অপূর্ব সৃষ্টি তুলিতে আঁকা ছবি। এভাবে ফাদার পৌছলেন নারিকেলবাড়ি। ফাদার ডেমার্স সিএসসি তখন সেখানকার পাল-পুরোহিত। স্বাধীনতা যুদ্ধের বিভীষিকা চারদিকে ছড়িয়েছে। এরমধ্যে বদলি হয়ে নারিকেলবাড়ি যেতে হলো। গ্রামের মধ্যে প্রচন্ড অস্থিরতা ছিল।

১৯৭১ খ্রি. নারিকেল বাড়িতে একটি ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হলো। পাকিস্তান আর্মিদের কাছে খবর পৌছে যে মিশন বাড়িতে মুক্তি বাহিনী আছে। বাস্তবতা বন্যা দেখা দেয়, অনেক মানুষের ঘর-বাড়ি পানিতে তলিয়ে যায়। এলাকাবাসী মিশন বাড়িতে এসে আশ্রয় নেয়। ২০০ জন পাকিস্তানি আর্মি এসে মিশন বাড়ি ঘেরাও করে। সিস্টার বাড়িতে বেশ কিছু সুন্দরি মেয়েও আশ্রয় নিয়েছিল। তাদেরকে লাকড়ির গুদামে লুকিয়ে রেখে, সিস্টারদের পোশাক পড়ে ধূপ-মোমবাতি জ্বালিয়ে বাইবেল পাঠ করতে বলা হয়েছিল। বিশপ যোয়াকিম, ফাদার ডেমার্স, গৌরনদীর পাল-পুরোহিতসহ সবাই তখন হঠাৎ এসে হাজির। তাদেরকে পেয়ে সবার সাহস বেড়ে যায়। ওদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে আসা হয়। কথাবার্তা বলতে বলতে সময় বয়ে যায়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। চারদিকে জলের কারণে সাধারণ সেনারা আতঙ্কিত ছিল। রাতে থাকার প্রস্তাব করায়- মেজর ও কর্নেল সাহেবদের

গির্জার টাওয়ার ঘরে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। রাতের খাবার ও সকালের নাশতা করিয়ে বিদায় দিয়ে সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। অবশ্য, মিশন থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করা হতো। উল্লেখ্য যে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনদের প্রার্থনা শিখিয়ে গলায় ক্রুশ ও রোজারি মালা দেওয়া হতো। বাঁচানোর জন্য তাদের আইডি কার্ড দেয়া হতো।

হিন্দু সম্প্রদায়ের স্থানীয় অনেক লোক নৌকা ভরে বাঁচার তাগিদে পশ্চিম বাংলার কৃষ্ণনগরের তৎকালীন বিশপ মতিলাল বাড়ৈ-এর অধীনে সীমান্তের বিভিন্ন প্যারিশে আশ্রয় নিয়েছে। উল্লেখ্য যে বিশপ মতিলাল বাড়ৈ-এর পৈত্রিক বাড়ি এই নারিকেল বাড়ি ধর্মপল্লী।

এছাড়া স্থানীয় লোকদের বাঁচানোর তাগিদে মহিলাদের জন্য ধানভানাসহ বিভিন্ন কাজ এবং পুরুষদের জন্য লাকড়ি ফাড়া, জঙ্গল পরিস্কার করা প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত করা হয়েছিল। এসব কিছু সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র পরমেশ্বরের মহান দয়ায় ও আশীর্বাদে।

শ্রদ্ধেয় ফাদার ফিলিপ নারিকেলবাড়ির লোকদের আন্তরিকতায় ও ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন। এ সুবর্ণ জয়ন্তীতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সবার আশীর্বাদ কামনা করেন।

গৌরনদী ধর্মপল্লী, (১৯৭২-১৯৮১) ঃ ফাদারকে নারিকেলবাড়ি হতে বদলি করা হলো গৌরনদী প্যারিশে। তবে, এবারে দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন পাল-পুরোহিত হিসেবে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে এ বদলি কার্যকর করা হলো। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অভাব-অনটন লেগে ছিল। খাদ্যের অভাব, কাজের অভাব, উপকরণের অভাবে চাষাবাদ করা যাচ্ছে না। নানারকম সমস্যা নিয়ে এলাকার লোকজন হতাশ এবং অভাবে জর্জরিত।

এমতাবস্থায়, এলাকাবাসী তথা খ্রিস্টভক্তদের ডাকা হলো। দুর-দূরান্ত হতে, রাস্তাঘাট, নৌকা পথ খারাপ হওয়া সত্ত্বেও এক ডাকে সবাই চলে এলো। মনে হলো, সবাই যেন এক মন, এক প্রাণ। এলাকার সমস্যাগুলো নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা করা হলো। সমস্যাদি চিহ্নিত করে কর্ম-পরিকল্পনা নেয়া হলো। এসব পরিকল্পনা প্রকল্প আকারে " কোর"-এ (CORR- বর্তমানে কারিতাস) দেয়া হলো। কারিতাসও উদারভাবে সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসলো। কর্ম পরিকল্পনাগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

কাজের বিনিময়ে খাদ্য (অগ্রাধিকার মহিলা)। বন্ধকী উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের মাধ্যমে চাষাবাদ করা। জমি চাষাবাদের জন্য সহায়-সম্বলহীনদের ঋণ প্রদান। জমির উপর ঋণ - প্রয়োজনানুসারে নিদিষ্ট লোকদের জন্য। ব্যবসায়ী ঋণ - যারা ব্যবসা করে এবং ব্যবসায়ে উৎসাহী। দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা ঋণ (৬৫-৭০ জন ছাত্র-ছাত্রী)। দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চ শিক্ষা ঋণ (কলেজ পড়ুয়াদের জন্য)।

উল্লেখ্য, এ সমস্ত লোনের জন্য ৫% হারে সেবামূল্য ধার্য ছিল। লোন আদায়ের হার ছিল সন্তোষজনক। এ সমস্ত সুযোগ-সুবিধা নিয়ে যারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারা সমাজে অনেক অবদান রেখে যাচ্ছেন। তাদের মধ্যে মিঃ দিলিপ চ্যাটার্জী, ক্যাটেখিস্ট মিঃ সুবোধ মন্ডল, মিসেস রত্না ঢালী, মিসেস মারিয়া সরকার প্রমুখ অন্যতম।

* কলাবাড়িয়া এলাকায় গামছা তৈরির একটি তাঁত শিল্প গড়ে তোলা হয়। প্রথমে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। পরে স্বার্থপরতার কারণে এর করুই অবস্থা হয়।
* বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি মহোদয়ের নির্দেশক্রমে প্যারিশ স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্ঠা করা হয়। ঐ সময়ে ফাদার ফিলিপ গৌরনদী ধর্মপল্লীকে প্রায় সাবলম্বী করে গড়ে তুলেন।
* প্যারিশের সম্পদ জমিজমা, দলিলপত্র সঠিকভাবে ত্রুটিমুক্ত করে সংরক্ষণ করা হয়।
* ৭৫ বছরের পুরোনো জমি পুনরুদ্ধার করা হয়।
* জলাশয়গুলোকে মৎস্য চাষ করা হয়।
* বনজ, ফলজ বৃক্ষ লাগিয়ে প্যারিশকে স্বাবলম্বী করা হয়।
* গৌরনদী প্যারিশের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো কবরস্থান করার উদ্যোগ নেয়া এবং তা বাস্তবায়ন করা।
* তিনি এ সময়ে অনেককে চাকুরি জুটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ মিঃ ফ্রান্সিস ঢাকীকে ঢাকাস্থ ভাটিকান এম্বাসিতে কার্ডিনাল এডোয়াড ক্যাসিডিকে চিঠি লিখে চাকুরির দেয়ার চেষ্ঠা করেছেন। মিঃ ঢাকী বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক।

রোম থেকে নিয়ে আসা ভেস্পা স্কুটারটি এসময় তড়িৎ গতিতে কাজ করার জন্য খুব সহায়ক ছিল। শ্রম, সময় ও অর্থের সাশ্রয় হয়েছে। গ্রামের এক সপ্তাহব্যাপী এক একটি প্রোগ্রামে সিস্টার মিরিয়াম সিএসসি, সিস্টার মারী সিএসসি, সিস্টার পলিন, সিএসসি প্রমুখ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন এবং অনেক কষ্ট ও ত্যাগস্বীকার করেছেন যা বর্তমানে অচিন্তনীয়।

১৯৭৭ -৭৮ খ্রিস্টাব্দে EAPI – Philippines বিশেষ কোর্সে অংশগ্রহণ করার জন্য ফিলিপিন দেশে যান। পরে, সময় বৃদ্ধি করে Approaches to Human Development" মিঃ মার্টিন সি গোমেজসহ একসাথে কোর্সটি সম্পন্ন করেন।

গৌরনদী ধর্মপল্লীর খ্রিষ্টভক্তগণ যথেষ্ট সহযোগী ও আন্তরিক মনোভাবাপন্ন। এ জন্যে সুবর্ণ জয়ন্তীতে তাদের প্রতি রইলো ফাদারের প্রাণঢালা ভালোবাসা ও খ্রিস্টের আশীর্বাদ।

বান্দরবান ধর্মপল্লী, (১৯৮১-১৯৯০) ঃ গৌরনদী হতে ফাদারকে সরাসরি বদলি করা হলো বান্দরবন প্যারিশে। সেই চিরচেনা, চির জানা, অত্যন্ত আকর্ষণীয় পাহাড়-ঘেরা বন-জঙ্গলে পূর্ণ সহজ-সরল অতি পরিচিত সেই মানুষদের মাঝে যেখানে প্রকৃতির মাঝে স্রষ্টার সৃষ্টির অনাবিল আনন্দ-বেদনা, হাঁসি-কান্না বয়ে চলে। তবে, একসময়ে দায়িত্ব পালন করেছেন কনিষ্ঠ পুরোহিত হিসেবে। এবার এলেন পাল-পুরোহিত হয়ে। সাথে সহকারী অত্যন্ত সহজ-সরল, পাদ্রিশিবপুরের আরেক কৃতি সন্তান ফাদার বট্রম নেলসন, সিএসসি। ফাদার ফিলিপ তার স্মৃতিচারণে প্রকাশ করেছেন তাদের দু'জনের মধ্যে কাজের মিল ছিল বন্ধুর মতো, কখনও বা সহোদর ভাই-এর মতো। পৌরহিত্য জীবনে এ মধুর বন্ধন ও স্মৃতি কখনো ভুলবার নয়। ফাদার লিও গোমেজ ১৪ একর জমি নিয়ে ধর্মপল্লীর কাজ শুরু করেন। ফাদার ফিলিপ ৩০ একর জমি বৃদ্ধি করেন, মোট ৪৪ একর। শুধু তাই নয়, দুরদর্শিতা নিয়ে মণ্ডলীর কলেবর বৃদ্ধিকল্পে ভবিষ্যতের প্যারিশের জন্য জমির প্রয়োজনীয়তা ফাদার ফিলিপ উপলব্ধি করেন। এ চিন্তাধারায় আলীকদম, থানচি, খাগড়াছড়ি অন্যতম ছিল। জমি ক্রয়ের জন্য অগ্রিম ঋণ দেয়া হয়।

এছাড়া আন্তাপাড়ায় ৪২ টি খ্রিষ্টান পরিবারের জন্য প্রতি পরিবার ৫ একর করে জমি রিজার্ভ ফরেস্ট থেকে বন্দোবস্তী দেয়া হয়। এ পরিবারগুলো সুন্দরভাবে বসতি করে জীবনযাপন করছে ও খ্রিস্টের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

* এরই মধ্যে ৩০০ ভক্তজনের একসঙ্গে বাপ্তিস্ম, প্রথম কমিউনিয়ন, হস্তার্পণ প্রদান অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হলো। পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি এবং বিশপ থিওটোনিয়াস গোমেজ, সিএসসি উপস্থিত ছিলেন। এমনি এক মাহেন্দ্রক্ষণে ফাদার ফিলিপের যাজকীয় জীবনের ২৫ বছর পূর্তি পালন করা হয়। ফাদারের জীবনে এ ছিল মহানন্দের এক মিলন উৎসব।
* মন্ডলীর বৃদ্ধিকল্পে এবং স্থায়ীরূপ দিতে নবদীক্ষিত খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের জন্য ছেলেদের বোর্ডিং-এ ৬৫ জন এবং মেয়েদের বোর্ডিং-এ ৪৫ জনকে রাখা, থাকা-খাওয়া ও লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হয়।
* বিশপ মহোদয়ের সহায়তায় ময়মনসিংহ হতে পাওয়া গেলো মিস সুজানা হাচ্চা-কে। মেয়েদের বোর্ডিং চালাতে অত্যন্ত দক্ষ। নাচে-গানে, লেখাপড়ায়, সবজি চাষে, ফসল ফলাতে, পশু পালনে সার্বিকভাবে পারদর্শী। বোর্ডিং পেলো এক নূতন জীবন। মেয়েদের প্রাণচাঞ্চল্যে এলাকা মুখরিত হলো।
* বিশপ মহোদয়ের সহায়তায় ছেলেদের বোর্ডিং-এর জন্য ময়মনসিংহ থেকে নিয়ে আসা হলো জগদীশ আজিমকে। উনি ছিলেন একজন প্রাক্তণ সেমিনারিয়ান। সর্বগুণে গুণান্বিত। উনিও ছিলেন বোর্ডিং পরিচালনা, লেখাপড়া, নাচ-গান সর্বদিকে তার গুণাবলী বিস্তৃত। ছেলেদের বোর্ডিং-ও প্রাণচাঞ্চল্যে মেতে উঠলো। ফাদার ফিলিপ সুযোগ পেলে ছেলেদের সাথে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতেন। পড়ালেখায় ইংরেজী ও গণিত বিষয়ে সহায়তা ও উৎসাহ দিতেন। চাষাবাদ, পশুপালন, সবজি উৎপাদন, ফলজ-বনজ বৃক্ষ রোপন সার্বিক দিকে উন্নয়ন ঘটে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রচুর উন্নতি হয়। জেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণ এবং পুরস্কারপ্রাপ্তি এ গুলোর স্বীকৃতি।
* ডন বস্কো মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয় কিন্তু বিভিন্ন বাঁধা থাকায় সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে মিঃ পল গুদা সাহেব ইন্সপেক্টর অব স্কুলস (স্কুল পরিদর্শক) বান্দরবান বেড়াতে যান। সে সুযোগে মিশন স্কুলটি মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক আপগ্রেড করা হয়।
* খ্রিস্টভক্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে একটি কবরস্থানের একান্ত প্রয়োজন দেখা দেয়। এজন্য বান্দরবানে এই প্রথম কবরস্থান তৈরি করা হয়।
* সরকারের সেনাবাহিনী মিশনকে সন্দেহের চোখে দেখতো। পরে গৌরনদীর একটি ডাক্তার ছেলে বান্দরবান পোস্টিং নিয়ে যায়। তাঁর সাথে সখ্যতা থাকায় বারবার যাওয়া-আসার মাধ্যমে তাদের সন্দেহ দূর হয়ে বন্ধুতে পরিণত হয়।
* তৎকালীণ বান্দরবনের ডি.সি. জনাব নাজমূল আলম সিদ্দিকী সাহেব সবসময় বন্ধুর মত সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তার সহায়তায় অনেক কঠিন কাজ সহজ হয়েছে।
* বান্দরবন সার্কলের রাজা এবং রাজ পরিবার-এর সাথে সর্বদা সুসম্পর্ক ছিল। মিশনের যেকোন আচার-অনুষ্ঠানে তাদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য ছিল।
* মান্দিদের মধ্যে মিঃ শৌল হাচ্চা অর্থনীতিতে এম. এ পাস করে বর্তমানে ব্যবসা করছেন এবং সমাজে সেবামূলক কাজে জড়িত।

* গোপালগঞ্জে আছিয়া বেগম এম.এ পাস করে বর্তমানে কলেজে অধ্যাপনা করছেন এবং দরিদ্র ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় অবদান আছে।
* মিঃ চার্লস হাচ্চা হোটেল ম্যানেজমেন্টে ডিগ্রি নিয়ে বর্তমানে মাস্টার্স করছেন।
* আরও কয়েকজনকে তো বিদেশে পাঠানো হয়েছে এবং তাদের পরিবারগুলো এখন সচ্ছল। তারা সবাই কম-বেশি সামাজিক কাজে নিবেদিত।

বান্দরবানে আজও বেঁচে আছেন, ফাদারকে সহায়তা-সহযোগিতা করেছেন যারা, তাদের সবাইকে সুবর্ণ জয়ন্তীতে খ্রিস্টিয় শুভেচ্ছা রইলো।

ধ্যানাশ্রম, সাগরদি, বরিশাল, (১৯৯০-১৯৯১) ঃ এবারে ফাদারকে বদলি করা হলো ধ্যানাশ্রম, সাগরদি, বরিশাল-এ। এখানে ফাদারের দায়িত্বে বিভিন্ন প্রোগ্রাম পরিচালনা করা হত। ফাদার বেঞ্জামিন লাবে, সিএসসি বিভিন্ন রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামতের দায়িত্বে ছিলেন। এসময় বরিশাল ধর্মপল্লীবাসী ফাদার ফিলিপের ২৫ বছর যাজকীয় পুর্তি পালন করেন। এজন্য ফাদার বরিশালবাসীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। বরিশাল ধর্মপল্লীবাসী পরবর্তী সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এজন্যে আগাম ধন্যবাদ এবং সুবর্ণ জয়ন্তীর শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ রইলো।

সাধু পিতরের গির্জা, বরিশাল ধর্মপল্লী, (১৯৯১-১৯৯৫) ঃ বিশপ মহোদয়ের নির্দেশক্রমে বরিশালে পাল-পুরোহিত হিসেবে যোগদান করেন।

বরিশালে উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে কবরস্থান সংস্কার করা, দেওয়াল তৈরি করা, মাটি ভরাট করা প্রভৃতি। আন্তঃমান্ডলিক সম্পর্কে জোরদার করা, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সব মানুষের সাথে সংলাপ বৃদ্ধি করা হয়। এখানে বিভিন্ন এনজিও, ক্রেডিট ইউনিয়নের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা হয়।

চট্টগ্রাম ক্যাথিড্রাল, (১৯৯৫-২০০১) ঃ ফাদার ফিলিপকে বদলি করা হলো চট্টগ্রাম ক্যাথিড্রাল-এ। এবারে মনোনয়ন পেলেন চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল হিসেবে। ভিকার জেনারেল হিসেবে এবং মান্ডলিক চিন্তাধারায় চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশকে স্বাবলম্বী করার উদ্যাগ নেয়া হয়।

* ফাদার ফিলিপের ভাষ্যমতে, সর্বপ্রথম ২০,০০,০০০ টাকা (বিশ লাখ) ফিক্সড ডিপোজিট করা হয় এবং সেভিংস অ্যাকাউন্টে ৩,৫০,০০০ টাকা নগদ জমা করা হয়।
* মান্দিদের বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে একত্রিতভাবে ওয়ান গালা অনুষ্ঠান করা হয়।
* সাঁওতালদের সংগঠিত করে প্রতিমাসের শেষ শুক্রবার খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়।
* অ্যাংলোদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা হয়।
* সেবা সংঘ , কারিতাস, কাথলিক ক্লাব, ফাদার বুদ্রো মেডিকাল সেন্টারসহ অন্যান্য সংগঠনগুলোর সাথে সুসম্পর্ক নিয়ে এক সাথে পথ চলেছেন।
* সব কাজেই খ্রিস্টভক্তগণ এগিয়ে এসেছেন এবং সহযোগিতা দিয়েছেন। ফাদার ফিলিপ সবাইকে সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

ধ্যানাশ্রম, সাগরদি, বরিশাল, (২০০১-২০০৩) ঃ ফাদার ফিলিপকে পুনরায় পরিচালক, প্রোগ্রাম করে এখানে পাঠানো হয়। এসময়ে আন্তঃধর্মীয়, আন্তঃমান্ডলিক সংলাপ অনুষ্ঠানের উপর জোর দেয়া হয়। ডায়োসিসান প্রোগ্রামগুলোও নিয়মিত চলছে।

জপমালা মাইনর সেমিনারি, পাদ্রিশিবপুর, (২০০৪-২০০৫) ঃ শ্রদ্ধেয় ফাদার ফিলিপকে পাদ্রিশিবপুরস্থ জপমালা মাইনর সেমিনারিতে আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা করে পাঠানো হয়। ছাত্রদের বিভিন্নভাবে কাউন্সেলিং করেছেন। ফাঁকে ফাঁকে পাদ্রিশিবপুরে এবং এর উপ-ধর্মপল্লীগুলোতে বসবাসরত পরিবারগুলো ভিজিট করেনে। অখ্রিস্টান ভাই- বোনদের সাথে সুসম্পর্ক গড়েছেন।

অবসর জীবনযাপন (২০০৬-২০১৬ তম) ঃ ২০০৬ খ্রিঃ থেকে ফাদার তিমথির সাথে একসঙ্গে অবসর জীবনযাপন শুরু করেন। অবসরপ্রাপ্ত ভিকার জেনারেল হিসেবে ফাদার ফিলিপ ২০১৪ খ্রিঃ থেকে পূর্ণ মাত্রায় অবসর জীবন যাপন করেছেন।

অন্যান্য কর্মকান্ড ঃ

* "বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক-ভ্রাতৃ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন ২ বার। এ পদে থেকে তিনি ৩ বার আর্ন্তজাতিক কনফারেন্সে যোগদান করেন।
* ডায়োসিসান পুরোহিতগণ সংগঠনের মাধ্যমে একত্রিত হন। বিভিন্ন বিষয়ে সম্মিলিতভাবে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
* ডায়োসিসান পুরোহিতদের উচ্চ শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হয়।
* অবসরপ্রাপ্ত যাজকবৃন্দ ডাইয়োসিস ভিত্তিক থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা সহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করা হয়।
* ডায়োসিসান পুরোহিতদের স্ব-অর্থায়নে ফান্ডের ব্যবস্থা করা হয়।
* "Couples for Christ" নামে একটি সংগঠন চট্টগ্রামে অ্যাংলোদের নিয়ে করা হয়। ১ম চেয়ারম্যান মিঃ লেসলী ডি'কস্টা। পরবর্তীতে, মিঃ মভেন ক্রাউলি দায়িত্ব নেন। এ সংগঠনের মাধ্যমে ফাদার ২ বার ফিলিপিন্সে যান।

অন্যান্য দায়িত্ব সমূহ ঃ

* ন্যাশনাল মেজর সেমিনারি (বনানী) ফর্মেশন, ডায়োসিসান ভোকেশন, শিক্ষা কমিশন, প্যাস্টোরাল কমিশন, ল্যান্ড কমিটি, বিভিন্ন এনজিও, ক্রেডিট ইউনিয়নসহ কখনো সদস্য বা পরিচালক বা চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
* সৎ সংঘ - পাদ্রিশিবপুরে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, এনজিও কর্মী, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে ভালো কাজ করার জন্য এ সংঘটি কাজ করে।
* বরিশালের মিঃ টমাস গোমেজ-এর বাড়িটি ভূমিদস্যুদের হাত থেকে রক্ষা করে কয়েকজন বসতি দিয়ে খ্রিস্টানপাড়া করার পেছনে ফাদার ফিলিপ-এর অবদান আছে।
* অনেক ছেলেমেয়েকে শিক্ষা সহায়তা এবং অনেক পরিবারকে আর্থিক অনুদান দিয়ে সুরক্ষা করা হয়েছে এবং করা হচ্ছে।

পাদ্রীশিবপুর প্রতিবন্ধী আশ্রয় কেন্দ্র ঃ সমাজের বিভিন্ন পরিবারে প্রতিবন্ধী শিশুদের নিজপ্রাণের সমতুল্য বিবেচনা করে তাদের জন্য নিজ গ্রাম পাদ্রিশিবপুরে একটি প্রতিবন্ধী আশ্রয় কেন্দ্র ২০০৮ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকে এ পর্যন্ত ২১ জন ছেলে এবং ১৭ জন মেয়েকে কর্মক্ষম করে গড়ে তোলা হয়েছে। যদিও এর সংখ্যা অতি নগণ্য তবে প্রচেষ্টাটি অত্যন্ত মহৎ। আশ্রয় কেন্দ্রটি পরিচালনা করার জন্য একটি কমিটি বর্তমান, নিয়মিত সভা করা হয়। সংস্থাটি পরিচালনা করার জন্য মিঃ গাব্রিয়েল বাবলু ডি'কস্তা এবং সন্ধ্যা রানী দেবনাথকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সন্ধ্যা রানী দেবনাথ একজন বিধবা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। এ আশ্রয় কেন্দ্রে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে আসছেন। তিনি বলেন, "ফাদার ফিলিপ চিন্তা-চেতনায় ও কর্মে ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য। ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন।"

স্থানীয় গণ্যমান্য, বিভিন্ন ধর্মপল্লী এবং অন্যান্য উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যাদির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

১) প্রতিটি ধর্মপল্লীতে দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার জন্য ফান্ড তৈরি করে নিজেও অনুদান দিয়েছেন।

২) বান্দরবন ধর্মপল্লীর বাবুর্চি মি লাফাই মার্মার বড় ছেলে মিঃ টমাস রতন মার্মাকে সুদূর চায়না থেকে আকুপাংচার বিষয়ে শিক্ষার খরচ দিয়ে ডাক্তার (আকুপাংচারিস্ট) বানিয়েছেন। তিনি এখন চট্টগ্রামে বেশ সুনামের সাথে চিকিৎসা করছেন এবং মেজো ছেলে মিঃ যতন মার্মাকে ম্যাজিস্ট্রেট করেছেন এবং ছোট ছেলে মিঃ লিটন মার্মা বিদেশে আছে।

৩) মিঃ সানাই ত্রিপুরা তিনি একজন কুষ্ঠরোগী ছিলেন, তাঁকে অর্থ দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করেছেন। পরবর্তীতে মেডিকাল যন্ত্রপাতি দিয়ে ডাক্তারি পড়তে সহায়তা করেছেন। বর্তমানে সমাজে অবদান রাখছেন।

৪) মিঃ রাফায়েল ত্রিপুরাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন এবং মিঃ মোশী ত্রিপুরা করে যিনি বর্তমানে হেডমাস্টার। বিভিন্ন সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করছেন।

৫) শ্রদ্ধেয় ফাদার একজন প্রচারবিমুখ ব্যক্তিত্ব, তাই তার ব্যক্তিগত মহৎ কাজগুলো হয়তো অনেকেরই অজানা।

৬) অদ্যাবধি ৮১ বছর বয়সেও অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনায় জীবন কাটাচ্ছেন।

৭) জীবনভর কঠোর পরিশ্রমী। নিয়মিত কঠোর তপস্যাময় জীবন কাটিয়েছেন।

৮) খ্রিস্টভক্তদের অসুখ-বিসুখে আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন।

৯) বিভিন্ন গ্রামে দারিদ্র বিমোচন এবং অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য-আত্মীয়-অনাত্মীয়, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অনেককেই রিকশা, ভ্যান, গরু, ছাগল, শুকর, ঘর মেরামত, শোবার খাটসহ বিভিন্ন রকম সহায়তা করেছেন।

১০) ময়মনসিংহ-এ পাঁচগাঁও গ্রামে একটি বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের একবেলা খাওয়া, বই-খাতা এবং পোশাক দেওয়া হয়। ফ্রান্স হতে ফাদারের এক সহযোগী বন্ধুর সহায়তায় এ প্রকল্প আজও চলমান।

১১) খ্রিস্টভক্তদের কল্যাণমূলক কাজের পেছনে কয়েকজন দেশী-বিদেশী বন্ধু শুভাকাঙ্খীদের বিভিন্ন বুদ্ধি-পরামর্শ, অর্থ সাহায্য দিয়ে ফাদারকে উদারভাবে সহযোগিতা করেছেন।

১২) সর্বোপরি, শ্রদ্ধেয় ফাদার ফিলিপ ডি'রোজারিও, একজন মিষ্টভাষী, মিতব্যয়ী, নেশামুক্ত, সহজ-সরল জীবন-যাপনকারী, দক্ষ প্রশাসক, হিসাব-নিকাশে পারদর্শী, কষ্ট-সহিষ্ণু, নিরহঙ্কার খ্রিস্টপ্রেমিক সমাজসেবক। অতিথি আপ্যায়নে, পরিচর্যায় এবং ভ্রাতৃত্বে অনন্য সাধারণ একজন পুরোহিত।

ফাদার ফিলিপ ডি'রোজারিও-এর জীবনের বাস্তব ধারণা ঃ "কাউকে শত্রু না ভেবে তার কাছে বার বার যাওয়া-আসার মাধ্যমে বন্ধুত্ব করে সমস্যার সমাধান অতি সহজেই করা যায়।"
শ্রদ্ধেয় ফাদার ফিলিপ জীবন সায়াহ্নে এসে অনুভব করেন: " জীবনে যত পূজা হলো না সারা, জানি হে জানি, তাও হয়নি হারা"।

জীবনের নৌকা এগিয়ে চলে.....সীমানার শেষ প্রান্তে.....অসীম হতে হাতছানি দিয়ে ডাকে। জীবনের যতো চাওয়া-পাওয়া ফুরিয়ে যায়। এভাবেই দিনের বেলা বয়ে যায়, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, রাতের আঁধারে আকাশ-বাতাস স্তব্দ হয়ে যায়। জ্যোৎস্নার মৃদু আলোয় ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক, নিশাচর প্রাণীর চলার শব্দ। নতুন দিনে নব জীবনের সূচনা মাত্র।
সজীব গাছের পাতাগুলোও শুকিয়ে একে একে ঝরে যায়, মানব জীবনের এক একটি দিন শুকনো পাতার ন্যায় ঝরে পড়ে। জীবনের বেলা ভূমিতে দাঁড়িয়ে, সান্ধ্যকালীন রক্তিম সূর্যের আভায় গোধূলি লগ্নে পশ্চিমাকাশে তাকিয়ে সর্বজনশ্রদ্ধেয় ফাদার ফিলিপ ডি'রোজারিও গুন গুন করে গিটার বাজিয়ে মনের অজান্তে গেয়ে ওঠেন :-

"আমি অকৃতি অধম বলেও তো কিছু কম করে মোরে দাওনি,
যা দিয়েছো তারি অযোগ্য ভাবিয়া কেড়েও তো কিছু নাওনি।।
(তব) আশিস্ কুসুম ধরি নাই শিরে, পায়ে দলে গেছি চাহি নাই ফিরে,
তবু দয়া করে কেবলই দিয়েছো, প্রতিদান কিছু চাওনি।"

[বিঃদ্রঃ একজন পুরোহিতের পৌরহিত্য জীবনের ৫০ বৎসর আশীর্বাদরূপ। তার বিশাল কর্মযজ্ঞের খুঁটিনাটি তুলে ধরা অসম্ভব। বয়সের কারণে স্মৃতি থেকে অনেক কিছু মুছে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু না। তাই, একজন পুরোহিতকে মূল্যায়নের নামে যেন অবমূল্যায়ন না করা হয়। এজন্য এটি একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র। লেখা, ভাষাগত এবং তথ্যগত যেকোনও ভুল-ত্রুটির জন্য সবার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। - লেখক]

ফাদার জার্মেন গ্রাঁমেজোঁ, সিএসসি

জন্ম: ১৫ই মার্চ, ১৯২৮ কুইবেক, কানাডা: মৃত্যু: ২৭ই এপ্রিল, ২০২৪ খ্রি.

– কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.



ফাদার জার্মেন গ্রাঁমজোঁ, কুইবেক প্রভিন্সের "দ্য-মন্টাইন" শহরে সাধু-বেনেডিক্ট নামক গ্রামে ১৫ই মার্চ ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৩ জন ভাইবোনদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তাঁর ছয় জন দিদির মধ্যে পাঁচজনই "মন্ট্রিয়ালের গ্রিজে সিস্টার-সংঘে"র সিস্টার ছিলেন। আর তিনি তো ছিলেন পুরোহিত।

ফাদার জার্মেন সিস্টারদের দ্বারা পরিচালিত প্রাইমারি স্কুলে পড়াশুনা শুরু করেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে জার্মেন সেমিনারিতে প্রবেশ করেন এবং সেমিনারীর শিক্ষা গ্রহণ করেন। তার বন্ধুবান্ধবদের সাথে হাতের কাজ শেখার সাধ পায়। পরবর্তীতে পবিত্র ক্রুশ সংঘে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে নবিশিয়েটে যোগদান করেন এবং প্রথমব্রত গ্রহণ করেন। সেন্ট লরেন্স কলেজে দর্শন শাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা পড়াশুনা করেন। স্কলাস্টিক হিসেবে ১৯৫০-১৯৫৪ পর্যন্ত সেন্ট-জেনেভিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐশতত্ত্ব অধ্যয়ন করার পর তিনি তার জন্ম স্থানে আপন ধর্মপল্লীতে যাজকীয় অভিষেক লাভ করেন ২০ ডিসেম্বর, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম আগমন করেন এবং বরিশালে বাংলা শিখেন। ৩৩ বছর তিনি পূর্বপাকিস্তান ও স্বাধীন বাংলাদেশে যে সমস্ত প্যারিশে কাজ করেছেন তা হল: নারিকেলবাড়ি, গৌরনদী, বান্দরবান এবং পাদ্রীশিবপুর, নোয়াখালি ও বরিশাল।

১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে ফাদার জার্মেন কানাডাতে ফিরে যান এবং ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় তিনি কাজ করেন। তার মনে হয়েছে যে, নিজের দেশের মধ্যেও বাংলাদেশের মতো বাণীপ্রচারের কাজ করে গেছেন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। নব্বই বছরে মন্ট্রিয়ালে বাসিল মরো গৃহে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং ২৭ই এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি কানাডাতে ৯৬ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জীবনের শেষ চার বছরে পাদ্রীশিবপুর থেকে বেশ কয়েকজন তার সাথে সাক্ষাৎ করতে মন্ট্রিয়ালে গেছেন এবং আমারও সৌভাগ্য হয়েছিল এই সময়ে দুই বার তার সাথে সাক্ষাৎ করার।

৩৩ বছর মিশনারি হিসেবে বাংলাদেশে কাজ করার পর তিনি পাদ্রীশিবপুর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখে গেছেন যা আমাদের এই বইয়ে স্থান দিয়ে তার কথা এবং বিশেষভাবে তাঁকে স্মরণীয় করে রাখতে চাই।

ফাদার জার্মেন লিখলেন: "আমার তেত্রিশ বছর ধরে যাদের সেবা করেছি তারা দরিদ্র ও সাধারণ মানুষ হলেও তারা মানুষকে আপন করে নিতে পারে। তারা বিস্ময়কর এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে খুবই আন্তরিক।

"আমার বন্ধু মাহবুব আলমের কথা না বলে পারছি না। তিনি পাদ্রীশিবপুর সেন্ট আলফ্রেড স্কুলের একজন শিক্ষক। তিনি একজন খাঁটি মুসলমান এবং একই সময়ে প্যারিশের অনেক খ্রিস্টানদের চাইতে একজন ভাল খ্রিস্টানও বটে। তাঁর ধর্মে তিনি বিশ্বস্ত, তবে তার জীবন যিশুর মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধের একজন বাস্তব অনুসারী। আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে, প্রত্যেক ধর্মে ঈশ্বর কাজ করেন আর সেই জন্য প্রত্যেক ধর্মকে শ্রদ্ধা করা উচিত। আমি এটাও অনুভব করেছি যে, গির্জায় আমার উপদেশের চাইতে আমার জীবনের সাক্ষ্য আরও গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমি হিন্দু ও মুসলমানদের সেবা করি যেমন সেবা করি খ্রিস্টানদের। "অন্যের সেবা করা" সেটাই তো মঙ্গলসমাচার, তা নয় কি?"

"এ প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের, অর্থাৎ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা না বলে পারছিনা। আমার এমন অভিজ্ঞতা যা একদিকে গভীরভাবে মানবিক এবং অপরদিকে আধ্যাত্মিক। আমি সর্বদাই অনুভব করতাম যে, আমাদের জীবনের কঠিন মুহূর্তে ঈশ্বর-বিধাতা আমাদের পরিচালনা করেন এবং আমাদের রক্ষা করেন। আমার সামনে ঐ সময়ে দুটো পথ খোলা ছিল: প্রথম, যুদ্ধের সময় সকল আক্রমন থেকে সকল খ্রিস্টানদের রক্ষা করতে হবে। আর দ্বিতীয় পথ ছিল খুবই বিশেষ, যার বর্ণনা দিচ্ছি।

"পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এই সময়ে পাকিস্তান সেনাদলের একজন মেজর, নাম তার মেজর প্যাট্রিক, ঢাকাতে আসলেন। মেজর প্যাট্রিক চট্টগ্রামের ব্রাদার মারভিন ব্যাপ্টিষ্ট-এর বোনকে বিয়ে করেছিলেন। ব্রাদার ব্যাপ্টিষ্ট তখন আমার সাথে পাদ্রীশিবপুরে বাস করতেন এবং সেন্ট আলফ্রেড স্কুল দেখাশুনা করতেন। মেজর প্যাট্রিক অফিসিয়াল ভাবে একটি আদেশ দিলেন যেন পাকসেনারা যেন পাদ্রীশিবপুরের ব্রাদার ব্যাপ্টিষ্ট ও ফাদার জার্মেন যেন রক্ষা পায় এবং তারা যেন বিশেষ নিরাপত্তা লাভ করে। ধন্যবাদ প্যাট্রিক! আমরা যুদ্ধের সময় এবং পরবর্তীতে অনেক সহায়তা পেয়েছি।

"তৎকালীন সরকারি অফিসারগণ, এবং তার সঙ্গে হিন্দু ও মুললমানগণ আমাদের মিশন প্রাঙ্গণে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের স্পীড বোট দিয়ে তাদেরকে ভারতে পার করে দিয়েছি। এই কারণে কত সুযোগ-সুবিধাই না আমরা পেয়েছি। এ প্রসঙ্গে মাত্র একটা ঘটনা উল্লেখ করি।

"পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রায় সবাই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ছিল। তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলে যেন হিন্দু এবং বিশ্বাসঘাতক মুসলমানদের হত্যা করা হয় এবং তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়। খ্রিস্টানদের ওপর যেন কোন হামলা না করে।

"পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর আটটি প্রতিবেশী হিন্দু গ্রাম থেকে একটি প্রতিনিধি দল আমার সঙ্গে দেখা করতে আসল। তারা অনুরোধ করল যেন তাদেরকে আমরা খ্রিস্টান করি যাতে তারা জীবন বাঁচাতে পারে। এভাবে করাটা তো ঠিক হবে না। তবে কী করা যায়? সেই সময়ে পবিত্র আত্মায়ই আমাকে বলে দিল তাদের জন্য আমি কী করতে পারি। আমি তাদের বললাম, "এভাবে তো আমি তোমাদের খ্রিস্টান বানাতে পারব না। তবে বিপথ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তোমরা প্রত্যেকে গলায় একটা ছোট কাঠের ক্রুশ ঝুলিয়ে রাখ আর মিলিটারি যখন আসে তাদেরকে বলবে আমরা ফাদার জার্মেনের অধীনে আছি। এভাবে তোমরা শান্তিতে থাকতে পারবে, আমি নিশ্চিত।" তারা তাই করল। কী বিশ্বাসই না আমার ছিল যাতে আমি হিন্দু ও মুসলমানদের এভাবে রক্ষা করতে পারি। খ্রিস্টান না হলেও আমি অনেক সহানুভূতি নিয়ে এবং তাদের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এরূপ কাজ করলাম। প্রভু আমাদের সাথে ছিলেন।

"আমি যখন কানাডা ছুটিতে যাব তখন আমার জন্য একটা বিদায়-অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল। ঐ অনুষ্ঠানে আমাকে একটা উপহার দেওয়া হল যা আমাকে ভীষণভাবে স্পর্শ করেছে। সেই উপহারটা সেই দিন থেকে আমি সর্বদা আমার গলায় পরে থাকি। সেটা ছিল সোনার চেইনের সাথে ছোট্ট একটি ক্রুশ। আর তার সঙ্গে একটা কথা ছিল: "হিন্দু ও মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে আমাদের এই উপহারটি গ্রহণ করুন, কেননা আপনি আমাদের ভালবেসেছেন এবং খ্রিস্টযীশুর ক্রুশ দিয়ে আমাদের এবং আমাদের গ্রামকে রক্ষা করেছেন।"

"এই কথা পাঠ করে আমি বুঝতে পারলাম আমার মিশনারি কাজের ধরন কীরূপ ছিল এবং সকল ধর্মের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মের সামনে এসে আমরা বুঝতে পারি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে এবং তাদেরকে আমরা শ্রদ্ধা ও সহ-ভাব নিয়ে তাদেরকে কী ভাবে গ্রহণ করতে পারি। মঙ্গলসমাচারের বিদ্যালয়ে আমরা সর্বদাই বেড়ে উঠতে পারি এবং সকল দুর্বলতাকে জয় করতে পারি।"[১৩]

আমাদের দেশ ও পাদ্রীশিবপুরের এক কঠিন মুহূর্তে আমরা ফাদার জার্মেনকে পেয়েছিলাম। তিনি দুইবারে সর্বমোট প্রায় ১২ বছর পাদ্রীশিবপুরের পালপুরোহিত ছিলেন (১৯৬৫-১৯৬৮; ১৯৬৯-১৯৭৮)। ঐ সময়ে কতকগুলো যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছে এবং যোগ্যতার সাথে কতকগুলো দূরদর্শি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যার শুভ ফল আজো আমরা ভোগ করে যাচ্ছি। সেগুলো ব্যাখ্যা না করে কেবলমাত্র উল্লেখ করছি: (ক) মিশনের যে-কোন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দোকানপাট সরিয়ে নেবার জন্য ফাদার জার্মেন বর্তমান নিউমার্কেট নির্মাণ করলেন এবং দোকানপাট গুলো এক জায়গায় নিয়ে গেলেন। (খ) ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের প্রলংকারী ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস এবং যার সাথে এসেছে পাদ্রীশিবপুরের ভেতরে ও বাইরে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কার্যক্রম। (গ) গিলবার্ট হুইটলী সাহেবের বাড়ীর সামনে ব্রাদার আলবারিকের সাথে একসঙ্গে দুইতলা বিশিষ্ট হাই স্কুল নির্মাণ। (ঘ) স্থানীয় এলাকায় মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে বৈরী মনোভাবের মোকাবেলা, তার সমাধান করা ও সুসম্পর্ক গড়ের তোলার চেষ্টা করা (ঙ) মুক্তিযুদ্ধ এবং সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতির সামাল দেওয়া। (চ) যুদ্ধোত্তর কালে পাদ্রীশিবপুরে ও দক্ষিণাঞ্চলে ত্রাণ, পুনর্বাসন ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা, বিশেষ করে কোর/কারিতাসের মাধ্যমে। (ছ) পাদ্রীশিবপুরের পশ্চিমের রাস্তা পাকা করা। (জ) আনুষ্ঠানিকভাবে ও দলগতভাবে পাদ্রীশিবপুর থেকে বান্দুরা সেমিনারীতে যাজক হওয়ার জন্য ছেলেদের পাঠানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা। (ঝ) গ্রামে নিরপত্তার জন্য অতন্দ্র প্রহরী হয়ে ফাদার জার্মেন কাজ করেন। (ঞ) খ্রিস্টানদের জমিজমা সংরক্ষণ করা। (ত) পাদ্রীশিবপুর ইতিহাসে প্রথমবার আমার যাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠান ধর্মপল্লীতে আয়োজন করা ইত্যাদি।

[১৩] PROVINCE CANADIENNE DE LA CONGRÉGATION DE SAINTE-CROIX – INFO CSC – NO 72 – 13 JANVIER 2022

ব্যক্তিগতভাবে আমিও তার অনেক কাজের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম। যুদ্ধের সময় আমি বরিশালে ছিলাম এবং তখন অনেকবার পাদ্রীশিবপুর গেছি। তিনি আমাকে দেখিয়েছেন তার ঘরে প্রায় দশটি ছালার বস্তা। বস্তার মধ্যে ছিল সোনা-গয়না। হিন্দুরা নিরাপত্তার জন্য ফাদার জার্মেনের কাছে জমা রেখে গেছে। ফাদার বাড়ী তার ঘরের পাশে বিভিন্ন সময়ে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডারগণ বাস করতেন এবং স্কুলে তিন দিন ধরে একবার মুক্তিবাহিনীর প্রায় তিনশত সেনারা স্থান নিয়েছিল। তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা তিনি করতেন। স্পীড বোট দিয়ে সুন্দরবন ও দক্ষিণাঞ্চলের মুক্তিবাহিনীর কমান্ডারদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন, তথ্য সরবরাহ করতেন, যার ফলে স্থানীয় রাজাকারের রোষের মধ্যে ফাদার জার্মেন দিন কাটাতেন। মুক্তিযুদ্ধে তার অবদান কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। অথচ আমি অনেক ব্যাথা পেয়েছি যে, স্থানীয় ভাবে কেউই তার নাম মুক্তিযুদ্ধে তার অবদানের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়নি। অবশেষে বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তীতে ২০২২ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টানসমাজের দ্বারা আমার হাত দিয়েই তাকে স্বীকৃতি ও সম্মাননা দেয়া হয়। আমি অনায়সে বলতাম যে, তিনি মুক্তিবাহিনীর একজন বড়ো মাপের কমান্ডার ছিলেন।

ফাদার জার্মেন মারা যান ২৭ই এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে, ৯৬ বছর বয়সে। মৃত্যুর পর স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফেইস বুকে যারা কিছু লিখে সমবেদনা ও তার আত্মার শান্তি কামনা করেছেন তাদের মেসেজগুলো এখানে তুলে ধরছি:

"A great parish priest, a lover of the poor, collaborator with people of all religions, saviour of the sick, suffering and vulnerable, committed muktijodha at the time of liberation war, courageous pastor with soft and kind heart, a farsighted leader to alleviate sufferings of the poor; no arrogance, no egoism, no pride but serene and humble, a joyful and smiling pastor and.....and... what not!

He is Fr. Germain Grandmaision, csc, of the French Canadian Province of Holy Cross, served Bangladesh for 33 years. The star has fallen to the ground on 27 April, 2024. The former Chittagong Diocese, particularly the PROPLE OF PADRISHIBPUR BOW THEIR HEADS in respect, thanksgiving, admiration and amazement.
Lord grant him eternal rest."[14]

"শ্রদ্ধেয় ফাদার জার্মেন সিএসসি ছিলেন পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর জন্য ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ, ধন্য মহান ব্যক্তি। সদাহাস্য নিরহংকারী এই প্রিয় ফাদারের তিরোধান সত্যি মর্মান্তিক বেদনার। তাঁর মৃত্যুতে আমি এবং পাদ্রীশিবপুরবাসী গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি। ১৯৬৯/১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে পাদ্রীশিবপুর থেকে বেশ কিছু কিশোর যাজক হবার জন্য সেমিনারিতে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে ফাদার যোসেফ জীবন গোমেজ, ফাদার লরেন্স বরুন গোমেজ, ফাদার লাজারুস কানু গোমেজ যারা এখন বাংলাদেশ মণ্ডলীকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। এ ছাড়াও আমিসহ আরও কয়েকজন সেমিনারীতে গিয়েছিলাম। যাজক হতে না পারলেও আমরা সবাই কোন না কোনভাবে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের সেবাদান করে যাচ্ছি। আর এই যে সেমিনারীতে গমন ও আমাদের জীবন গঠন সেখানে ফাদার জার্মেনের ভূমিকা অসামান্য। তাঁর প্রতি আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

[14] Condolence Message of Cardinal Patrick D'Rozario, csc.

পাদ্রীশিবপুর-এর সর্বস্তরের জনগণকে তিনি মনপ্রাণ উজার করে ভালবাসা দিয়েছেন, তাদের কল্যাণে কাজ করেছেন এমনকি নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে তিনি বিশেষ অবদান রেখেছেন। পাদ্রীশিবপুরে বিশাল মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য সম্ভব হয়েছিল। তিনি বহুগুণে গুণান্বিত এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যে তা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি।"[১৫]

"শ্রদ্ধেয় ফাদার জার্মেন-এর মৃত্যুর সংবাদ আমার কাছে নিদারুণ কষ্টের সংবাদ। ছোটবেলা থেকে তাঁর কাছ থেকে অনেক স্নেহ, আদর ও ভালোবাসা পেয়েছি। তাই একান্ত আপনজনের বিয়োগ বেদনা যেমন আমাদের আহত করে তাঁর মরণও তেমনি আমাকে মর্মান্তিক বেদনা দিয়েছে। আমি সত্যি মর্মাহত, শোকাভিভূত ও নিরাতিশয় কষ্ট পেলাম। পাদ্রীশিবপুরবাসী তাঁকে কখনো ভুলতে পারবে না। তিনি ছিলেন সকলের একান্ত উপকারী বন্ধু স্বজন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি না থাকলে আমাদের অস্তিত্ব থাকতো কিনা তাতে সন্দেহ আছে। কিভাবে এমন শোকের জন্য সমবেদনা জানাবো বুঝতে পারছি না। বিশ্বাস করি তিনি স্বর্গে আছেন। তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।"[১৬]

"শ্রদ্ধেয় ফাদার জার্মেন-এর চিরশান্তি কামনা করি। উনার অবদানের কথা আমরা ভুলতে পারবো না। যদিও আমরা ছোট ছিলাম, কিছু ঘটনা মনে আছে সেটা হল বিকেল বেলা স্কুলে আমরা কাজে যেতাম। তখন উনি আমাদের ডেকে নাস্তা খাওয়াতেন। আর আমাদের সাথে কথা বলতেন, দুষ্টুমি করতেন। আমরা তো ছোট ছিলাম। উনি খুব ভালো ফটো তুলতেন। ফাদার বাড়ীর ছাদে নিয়ে গিয়ে সূর্যের দিকে ঘুরে দাঁড়াতে বলতেন তারপর উনি আমাদের ছবি তুলতেন। আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম কারণ তখন তো ক্যামেরা চিনতাম না। উনি স্পীড বোট চালাতেন। আমাদেরকে স্পীড বোটে নিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আসতেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমরা তো ছোট ততটা বুঝিনি, পাদ্রীশিবপুর এলাকাকে তিনি বিপদমুক্ত রেখেছেন। উনার অবদান ভোলার মতো না। উনি ঈশ্বরের কাছে আছেন। ঈশ্বর উনার আত্মার চিরশান্তি দান করুন।"[১৭] ইভন ছিলু ডি'রোজারিও

"আমরা ছোট ছিলাম, কিন্তু ফাদার জার্মেন গ্রামবাসীর জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। সাতটা পরিবারে ডাকাতি হয়েছিল এক সাথে। কিন্তু তিনি খবর শোনার সাথে সাথে তার বন্দুক এবং শিকারী কুকুরসহ গ্রামে চলে এসেছিলেন। দুঃখের বিষয় ডাকাত দলকে ধরতে পারেন নি। ফাদার জার্মেন-এর আত্মার চিরশান্তি লাভ করুক – এই প্রার্থনা করি।"

---

[১৫] যোসেফ ডি'রোজারিও, মৃত্যুতে সমবেদনা

[১৬] মীরা মেরিলিন ডি'রোজারিও, মৃত্যুতে সমবেদনা

[১৭] ইভন ছিলু ডি'রোজারিও, মৃত্যুতে সমবেদনা

[১৮] নিলীমা ডি'রোজারিও, মৃত্যুতে সমবেদনা

"বাণী প্রচারক ও ধর্মশিক্ষকের সম্মাননায় আমার অনুভূতি"[১৯]

– রবি খ্রীষ্টফার ডি'কস্তা

পাদ্রীশিবপুরের সন্তান রবি খ্রিস্টফার ডি'কস্তা বাংলাদেশ মণ্ডলীতে একটি স্মরণীয় নাম। রবি ছিলনা একজন যাজক বা ছিলন একজন সন্ন্যাসব্রতী। কিন্তু সে ছিল ভক্তজনগণের মধ্যে একজন এবং তার আহ্বান ছিল মঙ্গলবাণী প্রচার করা এবং ধর্মশিক্ষকের কাজ করা। আহ্বান হিসেবে এই কাজটি বেছে নিয়েছিলো এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেই কাজে নিবেদিত ছিলো। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পর মণ্ডলীর ভক্তজনগণের জীবন ও সেবাকর্মের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত, পথিকৃত এবং বরিশাল, চট্টগ্রাম এবং তথা গোটা মণ্ডলীতে একটা অগ্রণী ভূমিকা রেখে গেছে। উনিশ শতকের ত্রিশ দশকে তার ঠাকুরদাদা মি. নিকোলাস ডি'কস্তা ছিলেন একজন শিক্ষক যিনি পাদ্রীশিবপুরে আগত নতুন হলি ক্রস সংঘের মিশনারি ব্রাদার গডফ্রে, ব্রাদার ফ্লেবিয়ান এবং ফাদার ফিনু ও সিস্টারদের বাংলা শিক্ষা দিতেন। রবি'র বাবা ছিলেন সেন্ট আলফ্রেড স্কুলের প্রধান শিক্ষক। রবি ছিল একজন বাণীপ্রচারক ও ধর্মশিক্ষক। ওর সাথে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে আমৃত্যু পর্যন্ত আমি যাত্রা করেছিলাম। আশা ছিল ওকে একজন বিবাহিত ডিকন হিসেবে অভিষিক্ত করব। মণ্ডলী যেন তখনও প্রস্তুত ছিল না। তবে ওর জীবন একজন বিবাহিত ডিকনের মতোই ছিল বিধায় ওর একটি নিজের লেখা: "বাণী প্রচারক ও ধর্মশিক্ষকের সম্মাননায় আমার অনুভূতি" প্রয়াত ফাদার ও সিস্টারদের পাশেই রাখতে চাই বলে ওর অনুভূতিটা এখানে সংযোজন করলাম (সম্পাদক: কার্ডিনাল প্যাট্রিক)।

এ বছর আমার, চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশে বাণী-প্রচারক ও ধর্ম-শিক্ষক হিসেবে ৩২ বছর পূর্ণ হয়েছে এবং এ সেবাকাজেরও প্রায় শেষ অধ্যায়। তাই, ধর্মপ্রদেশ আমার কাজের স্বীকৃতি, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মাননা প্রকাশ করেছে। শুধু আমি একা নই, ধর্মপ্রদেশের মোট দশজন বাণীপ্রচারকদের একত্রেই এই সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে, পরম শ্রদ্ধেয় দুই বিশপ, মজেস কস্তা ও সহকারী বিশপ সুব্রতর আয়োজনে। তা ঘটেছে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশেরই একটি মাহেন্দ্রক্ষণে, ধর্মপ্রদেশীয় পালকীয় সাধারণ সভায়, যা হয়তো ধর্মপ্রদেশের তিন অঞ্চল মিলে শেষ সাধারণ সভা। এভাবে, এ ঘটনাটি চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় হয়ে থাকবে। এর পূর্বে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি চট্টগ্রামের বিশপ থাকাকালীন আমার কাজের ২৫ বছরের জুবিলী, ধর্মপ্রদেশের সকল প্রচারক, প্রার্থনা পরিচালক ও পালকীয় দলের সেবাকর্মীদের নিয়ে উৎসব পালন করেছিলেন।

এ ধরনের সম্মাননা, প্রচারকদের সেবাকাজের স্বীকৃতি ২৫ বছরের জুবিলি পালন, যার গভীর অর্থ হল প্রচারকদের কাজের পরিমাপ করা, এবং তাদের সেবা কাজে বিশ্বাস স্থাপন করা। তাদের প্রতি মণ্ডলীর একাত্মতা প্রকাশ, মণ্ডলীর ধর্মপ্রচারে তাদেরও যে পরিশ্রম, ত্যাগ, ও সাধনা রয়েছে তা যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে কারণ, আমরা প্রচারকগণ যে তাদেরই আপনজন।

[১৯] পাদ্রীশিবপুর, জুবিলী স্মরণিকা – ২০১৬ খ্রি. পৃষ্ঠা ৩৫-৩৯

বিশেষভাবে আমাকে নিয়েই যেহেতু কথা তাই, কিছু বলতে চাই যেন ভবিষ্যত প্রজন্ম এখান থেকে কিছু নিতে পারে, যা বর্তমান প্রজন্মের জানা দরকার। আমার বাবা মৃতঃ ভেনানসিও ডি'কস্তা, যিনি পাদ্রীশিবপুরস্থ সেন্ট আলফ্রেড উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও পরবর্তীতে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে সত্তর দশক পর্যন্ত এই স্কুলে কাজ করেছেন। তার স্বল্পমূল্যের আয় দিয়ে প্রথমতঃ যৌথ পরিবার, পরবর্তীতে একক পরিবার পরিচালনা ছিল অনেক কষ্টের। পরবর্তীতে, দীর্ঘদিন ডায়াবেটিক রোগে আক্রান্ত থেকে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর আমরা ছিলাম দরিদ্র, মণ্ডলী তথা কোন লোকের সাহায্য না পাওয়ার মত বাস্তবতা - এ সময় আমার মন মানসিকতাকেও আক্রান্ত হয়, হয়ে উঠি বিদ্রোহী। ঈশ্বর ও মণ্ডলীর প্রতি মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। ঈশ্বর, তুমি শৈশবে আমার মাকে তুলে নিলে, যখন বুঝতে শিখেছি তখন আমার বাবাকে তুলে নিলে, আমাদের পাশে তো কেউই নেই। মণ্ডলীর বিরুদ্ধে এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন নেতিবাচক কথাবার্তা ইত্যাদি ছিল আমার জীবনে স্বাভাবিক। এভাবেই চলেছে জীবনের সংগ্রাম।

বাবা মারা যাওয়ায় লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভব হলো না। বাবার ইচ্ছা ছিল আমাকে ময়মনসিংহের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবেন। স্বপ্ন দেখা ওখানেই শেষ। কিছুদিন পরে মা বোনসহ আমরা ঢাকা পাড়ি দিলাম। ওখানে মা একটি শিশু ক্লিনিকে কাজ করতেন, আমি টিউশনি করতাম, বোনদের পড়াতাম। এভাবে বেশ কিছু সময় চলেছে। আমার বড় ভাই বাবলু তখন বিয়ে করে সিলেটের কমলগঞ্জে হীড-বাংলাদেশে কাজ করতো। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় সিস্টার মেরী রানী, এসএমআরএ ও সিস্টার মাগ্রেট শীল্ডের সাথে তেজগাঁয়ে কিছু কাজ করতে শুরু করি। তখন, তেজগাঁয়ে ক্যারিজমেটিক দলে যোগ দিই। ভালই লাগতো, একবার ভারত থেকে আগত ফাদার রুফাস পেরেরা ও ফাঃ ফিও মাসকারেনহাস, এস.জে. রমনা কাথিড্রালে কারিজমেটিক নির্জন ধ্যান পরিচালনা করেন। এই নির্জন ধ্যানেই আমার এক আমূল মন পরিবর্তন ঘটে। ইসাইয়া ভাববাদীর কথানুসারে; 'এ জগতে তোমার গর্ভধারিণী মা, তোমার বাবা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলেই তোমাকে ত্যাগ করবে কিন্তু আমি ঈশ্বর কখনো তোমাকে পরিত্যাগ করবো না'। নির্জন-ধ্যানে পাপস্বীকার করে আবার স্বাভাবিক সুন্দর জীবন-যাপন শুরু করলাম। প্রতিদিন বাণী পাঠ ও তার ধ্যান সহভাগিতার জন্য পাঁচটি কার্বন কপি করতাম। প্রতিদিন সকালে গীর্জায় এসে তা পাঁচজনের সাথে সহভাগিতা করতাম। আস্তে আস্তে ঐশবাণী আস্বাদন করতে শুরু করলাম। তখন, ঢাকায় আমি একটি স্কুলে ৭,৫০০/- টাকা বেতনের কাজ করতাম। বোনেরা বটমলী হোম স্কুলে পড়তো। মা-ও কাজ করত। তখন আর্চবিশপ প্যাট্রিক, ফাদার ছিলেন এবং বনানী পবিত্র আত্মার মেজর সেমিনারীতে নৈতিক ঐশতত্ত্বের প্রফেসর ছিলেন।

১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর পালকীয় পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়। পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে মণ্ডলী তার প্রেরণ কাজ ও পালকীয় পরিকল্পনা এগিয়ে নেন। তার মধ্যে একটি ছিল "খ্রিস্টবিশ্বাসীদের গঠন" বিষয়ক; এ বিষয়টি চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছিল। এ কাজ করার জন্য লোকের প্রয়োজন। বিশপ যোয়াকিম রোজারিও তখনকার ফাদার প্যাট্রিকের সাথে আলাপ করেন। আমার নাম প্রস্তাব করা হয়। তখন ফাদার প্যাট্রিক ডি'রোজারিও আমাকে ডেকে নিলেন বনানীতে কিছু আলাপ করতে। আলাপের সময় উনি বললেন, "আমরা ধর্মপ্রদেশে খ্রীষ্টভক্তদের

গঠনের জন্য কিছু কাজ করবো ও পরে ট্রেনিং সেন্টার করবো। তুমি এ কাজে আসবে কি না? কাজটি সার্বক্ষণিক বিশপ, ফাদার-সিষ্টারদের সাথে একত্রে কাজ করতে হবে।" আমি কোন কিছুর চিন্তাভাবনা না করে বললাম, "হ্যাঁ, আমি রাজী, আমি যাব।" ফাদার প্যাট্রিক বললেন, "এখনই তোমার উত্তর চাই না, মা-বোনদের সাথে আলাপ করে তারপর আমাকে জানাবে।" তখন আমি বললাম, "আলাপ করতে হবে না, আমি যাব।" ফাদার বললেন, "বেতন বেশি দিতে পারব না, ডাইয়োসিসের স্কেল অনুসারে প্রথমে তুমি পাবে ১,৩৫০/-টাকা।" পরে বাসায় এসে মা-বোনদের সাথে আলাপ করলাম, মা একেবারে রাজী নয়। মা বললেন, "এতদিন যে কষ্ট করেছিলে, না খেয়ে ছিলে, লেখাপড়া করতে পারোনি, তখন বিশপ, ফাদার কোথায় ছিল? মাকে তখন আমি বলেছিলাম, মা, মণ্ডলী আমাকে কি দেয়নি সে কথা না ভেবে আমি কি দিতে পারব- এই চিন্তা নিয়েই আমি যাব। এভাবেই হয়তো বিশপ যোয়াকিম রোজারিও ও ফাঃ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও-র মাধ্যমে, আমি এ কাজের আহ্বান পেয়েছিলাম। মা বললেন, ওতো বুদ্ধ হয়ে গেছে, ওকে আর ফেরানো যাবে না।

১৯৮৪- এর ফেব্রুয়ারির দিকে সবাইকে ছেড়ে বরিশালে চলে আসলাম। এপ্রিলে আমার কাজ ফাঃ প্যাট্রিকের সাথে শুরু করলাম। বিভিন্ন গ্রামে যেতাম কোন শিক্ষা নেই, গঠন নেই বাইবেলের কিছু জানি না, কি কাজ করব। একদিন ফাঃ প্যাট্রিকের সাথে কাঁদলাম আর বললাম, আপনি আমাকে কেন এনেছেন, আমি আপনাকে কি দেব ? ফাঃ প্যাট্রিক বলেছিলেন, "রবি, তোমার ভেতর যেটুকু আছে, সেটুকু দিলেই হবে।" দু'জনে একত্রে প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ করতাম। তারপর দিনের কাজ শুরু করতাম। এদিকে একমাস কেটে যায়, প্রথম মাসের বেতন পেয়েছিলাম ১,৩৫০/- টাকা। ঘরভাড়া ২৫০/- টাকা, নভিশিয়েটে খেতাম ২৫০/- এভাবে ৫০০/- টাকা কাটার পর হাতে পেলাম ৮৫০/- টাকা। প্রথম মাসের বেতন হাতে নিয়ে আমি যখন কাঁদছিলাম যে, কেমন করে ৮০০/- টাকা মাকে পাঠাব। আমি কী মা-বোনদের উপর অন্যায় করলাম? আমি কি স্বার্থপরতার পরিচয় দিলাম? তখন সিঃ মিরিয়াম আমাদের সাথে কাজ করতেন, আমাকে কাঁদতে দেখে, আমাকে সান্তনা দিয়ে বললেন, "রবি, দুঃখ কোরো না, তুমি যেভাবে এসেছ, তাই হয়তো ঈশ্বরের ইচ্ছা, তা প্রার্থনাপূর্ণভাবে মেনে নাও। ঈশ্বরের হাতে রাখো, ঈশ্বর অনেক বড় কাজ করতে পারেন।" আমি শান্ত হলাম। কাজে আবার মনোনিবেশ করলাম। আমি এ কাজে আনন্দ, তৃপ্তি পেতে শুরু করি। তখনই, আমি অতীতের স্বপ্নকে মূল্যায়ন করি- ঈশ্বর আমাকে কৃষিবিদ বানাতে চায়নি। এখন যা করছি, ঈশ্বর তাই আমার কাছে চেয়েছেন। যে ফাদার-বিশপদের বিরূপ আচরণ করেছি, তাদের হাতেই আবার ধরা পড়ে গেলাম। তখন মনে পড়েছিল, সাধু পলের জীবনী। সাধু পলও যীশুর মণ্ডলীর উপর এত অত্যাচার করলো। সেই যীশুর হাতেই সে ধরা পড়লো। এভাবে আমার প্রচার জীবনের আদর্শ হিসেবে নিয়েছি সাধু পলকে।

আমি ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে নোয়াখালীর রীতা আঞ্জেলা প্রীতি ব্লেইককে বিবাহ করি। আমার এ কাজের শুরুতে মা-বোনদের ত্যাগস্বীকার এবং পরবর্তী ২৮ বছর আমার স্ত্রী, ছেলে-মেয়েদের ত্যাগস্বীকারই ছিল অপরিমেয়, যাদের ত্যাগের ফলে আজ আমার এ সম্মাননাপ্রাপ্তি।

আমার স্ত্রীর ত্যাগের কথা বলার নয়, বিবাহের পর নতুন বধু হিসাবে একা থাকা, তার চাওয়া-পাওয়া, কোন দাবী কিছুই প্রকাশ না করে - আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে বেশি। বিবাহের পর থেকে এ পর্যন্ত আমার শক্তি, সামর্থ্য ও সমর্থন হলো আমার স্ত্রী। আমার এ কাজে কেউ বাঁধা হতে পারেনি। দৈন্যতা

যখন ভর করতো তখন দু'বার এ কাজ ছেড়ে দেব বলে সিদ্ধান্ত নেই। আমার স্ত্রী আমাকে তা ছাড়তে বাঁধা দেয়। আমার স্ত্রীর উপর পরিবারের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা চাপিয়ে দিয়ে চলে যেতাম, যেখানে ডাকতো সেখানে। তাই, আমি ঈশ্বরকে আজ অনেক ধন্যবাদ জানাই আমাকে এমন একজন আধ্যাত্মিক ধৈর্য্যশীলসম্পন্ন স্ত্রী উপহার হিসেবে দিয়েছেন। তার মনন, ধৈর্য্য, একনিষ্ঠতা যা আমাকে বারবার উঠতে সাহায্য করেছে।

এ কাজে আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও-ই আমাকে হাত ধরে হাঁটতে শিখিয়েছেন। তার কাছ থেকে একজন অনভিজ্ঞ খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে পেয়েছি প্রেরণা, সমর্থন। হাতে-কলমে শিক্ষাদান, কিভাবে কাজে শৃঙ্খলা রাখতে হয়, প্রার্থনায় একনিষ্ঠ হওয়া, উপাসনা, সৃজনশীলতা, স্বচ্ছকাজ, স্পষ্ট কথা, কোন্ কথাকে অন্তরে ধারণ, ইত্যাদি। তাছাড়া, মানবিক মর্যাদা, আনন্দপূর্ণ ব্যক্তি, একটি দয়ার মন, ভালবাসার মন, মানুষের কাছে যাওয়ার প্রেরণাও তার কাছে শিখেছি। আমাদের কাছে, কাজের সহভাগিতা ও সহভাগিতার উপর কিছু যোগ দেওয়াই ছিল শিক্ষাদানের একটি অন্যতম দিক। একত্রে মোটরবাইকে করে গ্রামে যাওয়া, একত্রে শিক্ষাদানে মঞ্চে ওঠা, আন্তঃমাণ্ডলিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক তৈরি করা, তাদের কাছে যাওয়া। এ গভীর শিক্ষা হয়েছে বিশপ প্যাট্রিক, বিশপ যোয়াকিম ও ফাঃ এজ্জো কোর্বার সাথে। তাহলো অন্যধর্মের লোকেদের সাথে কিভাবে একত্রে নির্জনধ্যান করা যায়। এভাবে আমার ৩২ বছরে আর্চবিশপকে পেয়েছিলাম প্রথমদিকে মাত্র ছয় বছর, অর্থাৎ ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এর মাধ্যমে তার কাছ থেকে তার অন্তর্দৃষ্টিটা হয়তো আমি উপলব্ধি করেছিলাম, যে যাজকদের সহকর্মী হিসাবে যাদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমাকে বাণী প্রচারের কাজ করতে হবে। যে বিশপ যোয়াকিম রোজারিও ছিলেন আমার কাজের পূর্ণ সমর্থন - তিনি আজ দেখতে পেলেন না আমার অবস্থান। আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও'র হয়তো গর্ব করার কিছু থাকবে কারণ উনি আমাকে অনুপ্রাণিত করে পরিচালনা করেছেন। এমনকি রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ হওয়ার পরও তিনি আমাকে ডেকেছেন। তিনটি ধর্মপল্লীতে তার সাথে সেমিনার পরিচালনা করতে। আমাদের দলটি ছিল খুবই প্রাণদায়ী, উদ্যমী ও মজার। বিশপ যোয়াকিম, বিশপ প্যাট্রিক, ফাঃ কোর্বা, আমি ও সিঃ মিরিয়াম। আজ আমি ধন্য ও আশীর্বাদিত যে এ ধরনের মহা-মণিষীদের হাত ধরে চলতে শিখেছিলাম। 'আর্চবিশপ প্যাট্রিক, আজ এ সুযোগ আপনার চরণে আমার মাথা রাখার। আমার উপর আপনাদের অর্পিত দায়িত্ব কম করে হলেও তা যথার্থ ও পূর্ণ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি।'

বিশপ প্যাট্রিক আবার ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে ফিরে আসেন চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের বিশপ হয়ে। তখন আবার ষোলটি বছর তার নির্দেশনায়- পরিচালনায়, সৃজনশীলতায় একত্রে সাথে থেকে কাজ করার সুযোগ হয়। তাহলে, সর্বমোট ২৩ বছর শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি-এর সাথে প্রাণভরে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। ২০১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে পেলাম শ্রদ্ধেয় বিশপ মজেস কস্তা, সিএসসি-কে, উনিও আমার অনেক প্রেরণাদাতা, উৎসাহদাতা, রোম থেকেই উনি আমাকে পালকীয় যত্ন দিয়েছেন। উনি বারবার বলতেন, জীবনটা তো একেবারে মণ্ডলীর জন্য দিলে, আবার বললেন, কোথায় যাবে, তোমার তো দেবার অনেক আছে। তাঁর সময়েই আবার আমার সর্বশেষ সম্মানপ্রাপ্তি। তাই, আমি নিজেকে অনেক অনেক ভাগ্যবান ও ধন্য মনে করি।

বাণী প্রচার করতে গিয়ে ভেবেছি, আমার মত দুর্বল, অযোগ্য, পাপী মানুষের কথা মানুষ কেন শুনছে বা শুনতে চায়। উত্তরে যা অনুভূত হয়েছে, তা হলো আমি অযোগ্য হলেও ঈশ্বর আমার অন্তরটা তাঁর বাণী বহন করার ও মানুষের কাছে পৌছে দেবার বাহন হিসাবে ব্যবহার করছেন। ঈশ্বর এ পর্যন্ত আমার মুখ দিয়ে তাঁর বাণী হাজার হাজার মানুষের কাছে ব্যক্ত করেছেন। আমার বাণী প্রচার ও ধর্মশিক্ষাদান হাজার মানুষের (বয়স্ক, যুব, শিশু) জীবনে একটু হলেও ঈশ্বরের স্পর্শ দিয়েছে বলে বিশ্বাস করি। কারণ, তা ছিল আমার স্বার্থপরতা ও অহংকারের উর্ধ্বে। তাই, আমি যা দিয়েছি তাতো উদারভাবেই দিয়েছি। এভাবেই আমি নিজেকে মনে করেছি, আমার বাণী প্রচারে আমি সার্থক। আমি একাজ করতে এসে শুধুমাত্র চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশেই সীমাবদ্ধ ছিলাম না।

একজন সাধারণ খ্রিস্টভক্ত হিসেবে আমার প্রচার ও শিক্ষাদানের পদচারণা পড়েছে বাংলাদেশের সাতটি ধর্মপ্রদেশে, এমনকি কোলকাতার ব্যান্ডেল-এর গীর্জায় এবং আগরতলায়। ভালবাসা, সম্মান, মর্যাদা পেয়েছি বাংলাদেশের সকল বিশপদের, এমনকি আগরতলার বিশপেরও। বাণী প্রচারের সাথে সাথে লেখা ও প্রকাশনা ছিল আমার নিত্য সঙ্গী। সেখানে আমার, ঈশ্বর, খ্রিষ্টমণ্ডলী ইত্যাদি সম্পর্কে আত্মধ্যান ও অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৮৩ থেকে প্রতিবছর কত লিখেছি তা হয়তো হিসাব রাখিনি। আমার লেখাগুলো ছিল আমার কাজের বিষয়ভিত্তিক, পালকীয়, যুবদের নিয়েও বিভিন্ন বর্ষের মূলসুরের উপর ও পরিবার নিয়ে। আমার প্রচারের ও ধর্মশিক্ষার ক্ষেত্র ছিল - শিশু, যুবসমাজ, বয়স্ক, ক্ষুদ্র খ্রিষ্টিয় সমাজ, ধর্মশিক্ষা, বাইবেল শিক্ষা, বিবাহ শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা ইত্যাদি। এছাড়া কাজের মধ্যে ছিল বিভিন্ন কমিশনের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেট করা, কমিশনগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা, প্রোগ্রামগুলোতে সহায়তা প্রদান করা, বিভিন্ন সেমিনারে প্রশিক্ষক হিসাবে ক্লাস দেওয়া। আমার প্রচার জীবনের পাশাপাশি শুরু করেছিলাম যুবদের নিয়ে ফা: অবনী সরদারের পদাবলী কীর্তন ও ভজননৃত্যের মাধ্যমে মুক্তির ইতিহাস প্রদর্শন। পড়াশুনা, সাধনা ও অনুশীলনের মাধ্যমে এসব কিছু আমাকে নিজেরই করতে হয়েছে। এ প্রচারক জীবনের কাজে আমি আরো বেশি তৃপ্ত হয়েছি - মাণ্ডলিক, বাইবেলীয়, আধ্যাত্মিক বিভিন্ন বিষয়ের বই সংগ্রহ, বই কেনার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছি। এ সমস্ত বই আমার ব্যক্তিগত সাধনার জন্য নিজেই কিনেছি।

আমার বাণী প্রচারের পাশাপাশি মানুষের সাথে ভালবাসার বন্ধন ও সখ্যতা ঘটেছে বেশি। বাড়ী ও পরিবার পরিদর্শন দুঃখী মানুষের কথা শোনা ও কিছু করতে প্রচেষ্টা নেওয়া ছিল আমার অন্তরের বাসনা। বিশেষভাবে, যেসব গরীব ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনা করতে পারে না, তাদের জন্য কিছু করা। তা করতে চেষ্টা করেছি যখন কোন প্রতিষ্ঠানে ক্লাশ দিতাম সেখানে থেকে যে অনুদান পেতাম এবং দুইটি বই প্রকাশের অর্থ দিয়ে। আজও তা অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করছি। কারণ, বাণী প্রচার ও দরিদ্রদের সেবা এ দুটো যে একত্রেই চলে। কিছু বিপথগামী যুবককে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি, লেখাপড়ার জীবন চালু করার সাহস দিয়েছি। যুবদের সাথে চিঠি লিখে যোগাযোগ রক্ষা করেছি। বর্তমানে ফেইসবুকে তা করা হয়। অনেককে পরামর্শ দিয়েছি, একসাথে চলেছি। এ ভাবেই সেবা কাজ করে কিছুটা হলেও অনেকের জীবনে একটা স্বাদ দিতে চেষ্টা করেছি। এই তো বাণী প্রচার! শুধু বক্তব্য দিয়ে বাণী প্রচার ও ধর্মশিক্ষা দিয়েই নয়, মানুষের জীবনের বাস্তবতায় প্রবেশ করা ছিল আমার সাধনা। অনেকে প্রকাশ করেছে, বিভিন্ন সময়ে, আপনার সাথে আমাদের কাজ করতে নেন। কিন্তু আমি তো তা করতে পারিনি কারণ আমি তো অধীনস্থদের কাজে নিয়োজিত।

এ কাজে, অনেক বিষয় জানার ও বোঝার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে, পড়তে হয়েছে। চিন্তা ছিল আমি বিস্তারিত কিছু না জানলে কিভাবে মানুষের সামনে দাঁড়াব। তথাপি, ঈশ্বর আমার সহায় ছিলেন, তাই চলতে পেরেছি। প্রতিটি কাজে চলতে গিয়ে, কথা বলতে গিয়ে ঈশ্বরের উপস্থিতি ও পরিচালনা বাস্তবিকভাবে অনুভব করেছি। সব কাজে আমার প্রার্থনা, মণ্ডলীকে ভালবেসে ত্যাগস্বীকার, ঐশবাণী ধ্যানের শক্তিতে পথ চলাই ছিল আমার সার্থকতা। আজ যাদের কথা স্মরণ না করলেই নয়, যাদের সাথে বাণী প্রচারক ও প্রশিক্ষক হিসেবে তাদের হাত ধরে যাত্রা করেছি, তাদের মধ্যে কেউ স্বর্গীয়ও হয়েছেন। আমাদের প্রথম পালকীয় দলে ছিলেন স্বর্গীয় বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি, বর্তমান আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি, স্বর্গীয় ফাঃ এঞ্জো কোর্বা, পিমে, সিঃ মিরিয়াম, সিএসসি (আমার আধ্যাত্মিক জীবনের প্রেরণা), স্বর্গীয় সিঃ ডরথী, এলএইচসি, পরে এসেছেন সিঃ রোজ, সিএসসি। তাই, আমি অনেক অনেক গর্বিত, অনেক নমস্য ব্যক্তিদের হাত ধরে হাঁটতে শিখেছি ও জীবনে কিছু অর্জন করেছি। পরবর্তীতে ১৯ জন পরিচালকদের সাথে সহকর্মী হিসাবে শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করতে পেরেছি। অফিস সহকারীদের সাথে একই তালে, একই গতিতে কাজ করেছি। আমরা সবাই ছিলাম বন্ধু, শিষ্য, কে বড়, কে ছোট এই বৈষম্য আজও পরিলক্ষিত হয় নি। সবচেয়ে ভাল লাগে সারা বাংলাদেশ আমাকে "আমাদের রবিদা' বলেই জানে ও ডাকে। অনেকের সাথে এখনো দেখা হলে কবে কোন বাণী বলে এসেছি, তা তারা অন্তরে গেঁথে রেখেছে, সেই উদ্ধৃতি দিয়েই কথা বলে। বাণী প্রচারের প্রথমদিকে বেশি সময় কেটেছে পার্বত্য অঞ্চলে, পাদ্রীশিবপুর, নারিকেলবাড়ী, দেশান্তরকাঠী, মাটিভাঙ্গা ছাড়াও পরবর্তীতে অন্যান্য স্থানে।

কাজের শেষ পর্যায়ে এসে আমি মনে করি আরও অনেক শিক্ষিত যুব সমাজকে এ কাজে এগিয়ে আসা উচিত। খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে সাক্ষ্য দিতে না পারলে মণ্ডলী ততটা গতিশীল হয় না। খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে শুধু ব্যক্তি পরিবারের চিন্তা করলেই চলবে না। আমরাই মণ্ডলী, যুবদের এ কাজে সম্পৃক্ত হওয়া প্রয়োজন। 'আস্বাদন কর, দেখ, প্রভু কত মঙ্গলময়'। পাশাপাশি মণ্ডলীকেও ভাবতে হবে খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের গঠনের জন্য, কাজে ব্যবহারের জন্য। আমাদের দেশে এখন খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে ঐশতত্ত্ববিদ গড়ে ওঠা খুবই জরুরী প্রয়োজন। একইসাথে সার্বক্ষণিক কর্মে নিয়োগের বেলায় বেতনের কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে খ্রিষ্টীয় পরিবারের ছেলে-মেয়েদের উৎসাহ দিতে হবে। আমাদের টাকা-পয়সা সব বিনিয়োগ করছি নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে। মণ্ডলীকে প্রতিষ্ঠিত কে করবে? আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসীরাই তো মণ্ডলী, মণ্ডলীর প্রতি অতীতের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে। ধর্মপল্লীতে যুবদের এ ধরণের কাজের যত্নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

শেষে, বলতে চাই, সকল পরাক্রম মহিমা সবই পরমেশ্বরের। ৩২ বছরের অনেক পুঞ্জিভূত অনুভূতি রয়েছে, তা সব প্রকাশ করাও সম্ভব নয়। সাধু পলের ভাষায় দৌড়িয়েছি সামনে - এখন শেষ হতে যাচ্ছে, লাঠিটা অন্যজনে নিয়ে আবার ছুটবে। সাধু শিমিয়োনের ভাষায় বলছি, "এবার আমায় শান্তিতে বিদায় দাও, তোমার পরিত্রাণের বাণী আমি সার্থকভাবে প্রচার করতে পেরেছি।"

॥ খ ॥ পাদ্রীশিবপুরের বিশেষ ব্যক্তিত্ব: সুবর্ণ জয়ন্তীকারী যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী

এই অধ্যায়ের নিম্নোক্ত অংশে কয়েকজন পাদ্রীশিবপুর সন্তানদের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। যাদের পরিচিতি এই অংশে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে তার সকলেই ইতোমধ্যে যাজকীয় ও সন্ন্যাসজীবনে কমপক্ষে পঞ্চাশ বছর অতিবাহিত করেছেন এবং তারা যাজক ও সন্ন্যাসজীবনের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করেছেন।

"আমার হৃদয়-মন-প্রাণ প্রভুর মহিমাগানে ভরপুর"

- সিস্টার মেরী লিলিয়ান, এসএমআরএ

আজকে এ শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে মা মারীয়ার মত আমারও বলতে ইচ্ছে করে - 'প্রভুর জয়গানে আমার প্রাণ উল্লসিত'। প্রভুর গৌরব মহিমা কীর্তন করে এ কথা বলা ছাড়া আমার আর কিছু বলার ভাষা নেই। আমার হৃদয়-মন-প্রাণ আনন্দে ভরপুর। ঈশ্বরের বিশেষ আহ্বানে এ ধর্মসংঘে প্রবেশ করে তাঁর ভালোবাসা যত্ন পেয়ে, ভগ্নিদের ভালোবাসা সেবা পেয়ে, আমার আধ্যাত্মিক, মানসিক ও শারীরিক জীবন যেন তিলে তিলে বৃদ্ধি পেয়েছে। হাঁটি হাঁটি পা পা করে নভিশিয়েট শেষ করে প্রথম ব্রত, আজীবনের ব্রত, ২৫ বছর ও ৫০ বছরের জুবিলী উৎসব পালন করে আজ এ হীরক জয়ন্তী উৎসবে উপনীত হতে পেরে আনন্দে আমি আত্মহারা। আজ সবাই আমার সঙ্গে এ মহতী উৎসবে যোগদান করে আমার আনন্দকে আরও বর্ধিত করেছেন। তাই ঈশ্বরকে, ভগিনীদের ও উপস্থিত আমার প্রিয় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবসহ সকলকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ জানাই।

আজকের এ দিনে যাঁদের স্মরণ না করলেই নয়, তারা হলেন - আমার প্রিয় স্বর্গীয় পিতা-মাতা। চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর অর্ন্তগত পাদ্রীশিবপুর গ্রামে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ১৬ অক্টোবর তাঁদের কোল আলোকিত করে আমি জন্ম নিয়েছিলাম। তাঁদের আদর্শ, প্রার্থনার জীবন, ঈশ্বরের অগাধ বিশ্বাস, ভক্তি ও ভালোবাসা আমাকে খুবই প্রভাবিত করেছে। স্মরণ করি, আমার প্রিয় সব মৃত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে, ঈশ্বর যেন সকলকে অনন্ত সুখ দান করেন। এরপর, আমার সংঘ-জীবনে আমার নব্যামাতা সিস্টার মারী ভিয়ান্নী, সিএসসি এবং আত্মিক পরিচালকগণ আমার প্রার্থনার জীবনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করেছেন। যার ফলে, আমার শত কাজের মাঝেও প্রার্থনায় বিশ্বস্ত থাকতে চেষ্টা করেছি। মনে পড়ে আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, সিএসসি-র কথা - 'সব কাজের মাঝেও প্রার্থনার সময় করে নিতেই হবে এবং করতেই হবে'। তাঁর এ প্রেরণামূলক কথা স্মরণে রেখে প্রার্থনার জীবনে বিশ্বস্ত থাকতে আপ্রাণ চেষ্টা করি। বাকিটুকু দয়াময় ঈশ্বরের হাতে।

---

[২০] এসএমআরএ বুলেটিন, ২৩ বর্ষ, বিশেষ সংখ্যা, ৭ অক্টোবর, ২০১১ খ্রীঃ

আমার প্রৈরিতিক জীবনে আমি প্রথমে তুমিলিয়া, পানজোরা ও তেজগাঁও কাথলিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়িয়েছি। এরপর, সংঘের ও ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে অদ্যাবধি জাগরণী পাটশিল্পের সাথে যুক্ত থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ এ কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্থ মনপুরায় ফাদার আর. ডাব্লিউ টিম, সিএসসি-র সাথে এবং বটমলী হোমের সিস্টার মাইকেল ফ্রান্সিস, সিএসসি-র সাথে গরীব, দুস্থ মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। বলাবাহুল্য, মঠবাড়ি ধর্মপল্লীর মাত্র পাঁচজন দরিদ্র মহিলাকে নিয়ে হস্তশিল্পের কাজ শুরু করি। কোনো কাঁচামাল না থাকায় একজন বিদেশী বন্ধু তাঁর পোশাক তৈরির পর যে টুকরোগুলো দিতেন তা দিয়ে পর্দা, বেডকভার তৈরি করা হতো। নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র না থাকায় বিদেশী বন্ধুরা দোকানে দোকানে গিয়ে তা বিক্রয় করে দিতেন।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর জাগরণী পাটশিল্প কেন্দ্রে তা হস্তান্তরিত হলে এখানে গরীব, বিশেষভাবে বাক-প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রথমে তাদের নিয়ে কাজ করতে কষ্ট হলেও এখন তারা সবাই দক্ষ ও কর্মপটু। এ সময়ে সিস্টার মাইকেল ফ্রান্সিস, সিএসসি কাজ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করে যাওয়ার সময় মাত্র পাঁচ টাকা আমাকে দিয়ে যান। বর্তমানে কর্মরত দুস্থ মহিলাদের সংখ্যা পাঁচজন থেকে পাঁচ হাজারে দাঁড়িয়েছে এবং বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে।

ধর্ম-সংঘে প্রবেশের পর থেকে এ পর্যন্ত প্রভুর হাজারো কৃপারাশি লাভ করেছি এবং তাঁর সেবাকাজ চালিয়ে যাচ্ছি। প্রভুকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করতে পারবো না। আপনারা আমার জন্য প্রার্থনা করবেন যেন সকলকে বুঝাবার জ্ঞান, ধৈর্য্যশক্তি লাভ করতে পারি। আজকের এ সুন্দর দিনে আমার জীবনের শেষ লগ্নে এসে হীরক জুবিলী উৎসব পালন করার যে সুযোগ ঈশ্বর ও সংঘমাতা আমাকে দিয়েছেন তার জন্য ঈশ্বরকে, সংঘকে ধন্যবাদ জানাই। আপনারা আমার আনন্দে শরিক হয়েছেন, তাই আপনাদেরও আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের প্রার্থনা চাই যেন বাকি জীবন সুস্থ থেকে বিশ্বস্তভাবে দিন কাটিয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। (সিস্টার লিলিয়ানের বয়স এখন, অর্থাৎ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ৯৪ বছর)।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত[২১]

– যোসেফ ডি'রোজারিও

১। **জন্ম তারিখ ও স্থান :** অক্টোবর ১, ১৯৪৩ খ্রি.: স্থান ঃ পথ প্রদর্শিকা কুমারী মারীয়ার ধর্মপল্লী, পাদ্রীশিবপুর; গ্রাম ও পোষ্ট অফিস ঃ পাদ্রীশিবপুর জেলা, বরিশাল, ৮২৮২, বাংলাদেশ

২। **পিতামাতা:** প্রয়াত মি. মাইকেল নিঙ্গাল ডি' রোজারিও (নিঙ্গাল সাধু বলে পরিচিত); জন্ম: আগষ্ট ১২, ১৯০৩; মৃত্যু ঃ জুন ১২, ১৯৮৮; মাতা : প্রয়াত মিসেস এম্পিওজা ডিসপিনা ডি' রোজারিও; জন্ম মার্চ ৩, ১৯০৫; মৃত্যু: মার্চ ১৯, ১৯৯৫ খ্রি.

[২১] কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও-এর জীবন-চরিত, ২০২২ খ্রি.

প্যাট্রিক ডি'রোজারিও স্বর্গীয় মাইকেল ডি'রোজারিও এবং স্বর্গীয় দিসপিনা ডি'রোজারিও-এর আট সন্তানের মধ্যে কণিষ্ঠতম পুত্র। তাঁর বাবা সর্বজনের কাছে নিঙ্গাল সাধু হিসেবে সুপরিচিত। কনিষ্ঠ ছেলের বয়স যখন ৫ বছর, অর্থাৎ ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে হঠাৎ করেই কাউকে না জানিয়ে তিনি সংসার ত্যাগী হন এবং সন্ন্যাস জীবন যাপনের জন্যে ভারতের দার্জিলিং পাহাড়ে চলে যান। পাঁচ বছর নির্জন-জীবন যাপন করে সংসারে ফিরে আসেন কিন্তু সংসারত্যাগী হয়ে, লাল কাপড় পরিহিত সাধুবেশে। পারিবারিক জীবনের প্রতি নিরাসক্ত।

আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি' রোজারিও এর শৈশব কেটেছে অতি সাধারণ পরিবেশে। তিনি বড় হয়েছেন তাঁর বাবার আদর্শে আর মা ডিসপিনা ডি'রোজারিও-র একান্ত পরিচর্যায়। মায়ের কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন স্কুল জীবনে কঠোর শিক্ষা ও গঠন: খ্রিস্টীয় জীবনে প্রথম দীক্ষা, নিয়মিত গীর্জায় যাওয়া এবং প্রতিদিন পারিবারিক প্রার্থনা। সন্ধ্যায় প্রার্থনা ও জপমালা নেই, খাওয়াও নেই – এই ছিল মায়ের নির্দেশ। মা দিসপিনা ডি' রোজারিও ছিলেন অতি সাধারণ একজন নারী তবে দেখতে সুন্দরী এবং দৃঢ়চেতা নারী। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন গুরুজনকে ভক্তি করতে। বিশেষ করে পুরোহিত, ব্রাদার এবং সিস্টারদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করতে তিনি তার সন্তানকে সর্বদা শিক্ষা দিয়েছেন। মা শিখিয়েছেন কিভাবে মণ্ডলীর জন্যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হয়। বাড়ীর প্রথমজাত কৃষিজ ফসল তিনি প্যাট্রিক এবং তার বোন আইরিসের হাতে দিয়ে তাদেরকে ফাদার বাড়ী বা গীর্জায় পঠিয়ে দিতেন। এভাবেই ভূমির ফসল উৎসর্গ করতে করতে একদিন নিজের জীবন নৈবেদ্যরূপে উৎসর্গ করতে হবে তা তিনি মায়ের কাছ থেকেই শিখেছেন।

৩। বিদ্যালয়, কলেজ, সেমিনারী শিক্ষা এবং স্নাতক পরবর্তী পড়াশুনা ঃ

* প্রাথমিক শিক্ষা ঃ সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুল, পাদ্রিশিবপুর, (১৯৫১-১৯৫৫)
* উচ্চ বিদ্যালয় ঃ সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুল, পাদ্রিশিবপুর, (১৯৫৬-১৯৬০)
* পাদ্রিশিবপুরের সাধু যোসেফের বোর্ডিং-এ অবস্থান (১৯৫৮-১৯৬০)
* ম্যাট্রিক পাশ ঃ সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুল থেকে (১৯৬১)
* আই.এ. ঃ নটরডেম কলেজ, ঢাকা (১৯৬২-১৯৬৪)
* বি. এ. ঃ নটরডেম কলেজ, ঢাকা (১৯৬৪-১৯৬৬)
* উচ্চ সেমিনারী ঃ দর্শনতত্ত্ব ও ঐশতত্ত্ব ঃ খ্রিষ্টরাজার সেমিনারী, করাচী, পাকিস্তান, (১৯৬৬-১৯৭১)
* খ্রিষ্টীয় নীতিশাস্ত্রের লাইসেন্সিয়েট (STL) এবং একবছর ডক্টরেট পড়াশুনা (STD) পন্টিফিক্যাল ইউনিভার্সিটি অব লুভেন, বেলজিয়াম (১৯৭৩-১৯৭৬)

৪। পবিত্র ক্রুশ সম্প্রদায়ে ধর্মীয় ব্রতগ্রহণ ও যাজকীয় অভিষেক

* নভিশিয়েট ঃ পবিত্র হৃদয় নভিশিয়েট, সাগরদী, বরিশাল (জুন ১৩, ১৯৬১- জুন ১৩, ১৯৬২)
* প্রথম ব্রতগ্রহণ ঃ জুন ১৪, ১৯৬২, সাগরদী, বরিশাল
* শেষব্রত ঃ জানুয়ারী ১, ১৯৭১, পাদ্রীশিবপুর, বরিশাল
* যাজকীয় অভিষেক ঃ জানুয়ারী ৮, ১৯৭২, পাদ্রিশিবপুর, বরিশাল।
* মহামান্য বিশপ যোয়াকিম রোজারিও-র দ্বারা অভিষিক্ত: স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম অভিষিক্ত পুরোহিত।

সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম অভিষেক্ত যাজক হলেন পাদ্রীশিবপুরের সন্তান ফাদার প্যাট্রিক ডি'রোজারিও। পাদ্রীশিবপুরে স্কুল জীবন শেষ করে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তিনি হলি ক্রস সংঘে যোগদান করেন এবং ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জুন তারিখে প্রথম সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। প্রথমবারের মতো পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের প্রাঙ্গণে ৮ই জানুয়ারী, পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ যোয়াকিম কর্তৃক যাজকীয় পুণ্যপদে অভিষিক্ত হন। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে ১২ই সেপ্টেম্বর ফাদার প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি, নব-প্রতিষ্ঠিত রাজশাহী ডাইয়োসিসের প্রথম বিশপ হিসেবে অভিষিক্ত হন। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২২ই এপ্রিল তিনি চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের বিশপ রূপে নিযুক্ত হবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ২০১১ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী ঢাকা আর্চডাইয়োসিসের কো-অজুটর হিসেবে প্রথমত দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ২২শে অক্টোবর ঢাকার আর্চবিশপ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ১৯ শে নভেম্বর কার্ডিনাল পদে অধিষ্ঠিত করেন। তিনিই প্রথম বাঙালি ও বাংলাদেশের কার্ডিনাল। এই আশীর্বাদে পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ খুবই গর্বিত।

৫। সন্ন্যাসব্রতী ও যাজক হিসেবে প্রদত্ত দায়িত্বসমূহ ঃ

* গৌরনদী ধর্মপল্লীঃ সহকারী পাল পুরোহিত ও গৌরনদী কোর্ (CORR) - প্রজেক্টের পরিচালক (১৯৭২-১৯৭৩)
* বনানী, ঢাকার জাতীয় উচ্চ সেমিনারীর অধ্যাপক এবং ডিন অব স্টাডিস্ (১৯৭৬-১৯৮২)
* নটরডেম কলেজে পবিত্র ক্রুশ সংঘের স্কলাষ্টিকেটের সহকারী পরিচালক (১৯৭৬-১৯৮০)
* জাতীয় পালকীয় সেবাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক (NCPS) ঃ (১৯৭৯-১৯৮২)
* জাতীয় উচ্চ সেমিনারীর খ্রিষ্টীয় নীতিশাস্ত্রের ও পালকীয় সাময়িকী "প্রদীপন"-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকঃ (১৯৭৯-১৯৮২)
* ফরাশী-কানাডীয় প্রদেশের অধিনস্থ চট্টগ্রাম পবিত্র ক্রুশ সংঘের যাজকদের ডিষ্ট্রিক্ট সুপিরিয়র (১৯৮১- ১৯৮৪)
* পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর ভারপ্রাপ্ত পাল পুরোহিত (জানুয়ারী-আগষ্ট, ১৯৮৩)
* ঢাকার জাতীয় উচ্চ সেমিনারীতে খ্রিষ্টীয় নীতিশাস্ত্রের খণ্ডকালীন অধ্যাপক (১৯৮৩-১৯৯০)
* চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের পালকীয় সেবাদল (PST) প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক (১৯৮৩-১৯৯০)
* বরিশাল ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত (১৯৮৬-১৯৮৯)
* বরিশালের সাগরদীর পালকীয় সেবাকেন্দ্র ও ধ্যানাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক (জানুয়ারী - জুন, ১৯৯০)

৭। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ (১৯৯০-১৯৯৫)

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের প্রথম বিশপ মনোনয়ন ঃ মে ২১, ১৯৯০; মনোনয়নের ঘোষণা ঃ জুন ৯, ১৯৯০; বনপাড়া ধর্মপল্লীতে বিশপীয় অভিষেক ঃ সেপ্টেম্বর ১২, ১৯৯০ খ্রি.

১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ থেকে আলাদা করে রাজশাহীকে নতুন ধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠা করেন। যাজক প্যাট্রিক ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের ৯ জুন পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট কর্তৃক রাজশাহীর প্রথম ধর্মপাল হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। সেদিন ছিল পবিত্র ত্রিত্বের পর্বদিন। ত্রিব্যক্তি

ঈশ্বরের একত্র মিলনের কথা অনুধ্যান করেই তিনি বিশপীয় মটো হিসেবে "মিলন সাধনায় মগ্ন অন্তরে" গ্রহণ করেন এবং তা অনুসারেই তিনি বর্তমানেও একই মটো নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। বিশপ হিসেবে মনোনয়নের দিনে তাঁর উপলব্ধি ছিল; পিতরের প্রতি যীশুর আহ্বান "যোনার পুত্র শিমন, তুমি কি আমাকে ভালবাস? ---- আমার মেষদের দেখাশুনা কর"। যোহন ২১:১৭

১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে ১২ই সেপ্টেম্বর তিনি রাজশাহীর প্রথম বিশপ হিসেবে অভিষিক্ত হন। বিশপ প্যাট্রিক যীশুর সেই আহবানের কথাই অন্তরের অতল থেকে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর উপলব্ধিতে আরও সাড়া জাগিয়েছে এই যে, তিনি যাদের কাছে প্রেরিত হয়েছেন– তাদের কাছে যেন প্রকৃত পালক হয়ে উঠতে পারেন– এমনই একটি আহ্বান তিনি অনুভব করেছেন। তিনি এই আহবানের বিষয় নিজে যেভাবে বলেছেন তা হলো: ''ক) আহ্বানটা বিস্ময়কর, অস্বস্তিকর, আবার সান্তনাদায়ক। খ) অজানা এলাকার জনগণের পালক হওয়া: বাঙালি ও আদিবাসীর বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির জনগণ; কৃষ্টিগত বিভিন্নতা এবং যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীদের বিভিন্নতা"। তিনি তাঁর সেবাকাজের ধরণ নির্ধারণ করেছেন এভাবে: পালক হিসেবে জনগণকে জানবেন, চিনবেন ও ভালবাসবেন, আর জনগণও যেন পালককে চিনতে পারেন এবং মঙ্গলবাণী ঘোষণা ও পালকীয় যত্নের মনোভাব সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেন।

৮। চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের বিশপ (১৯৯৫-২০১০)

চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের বিশপ মনোনয়ন ঃ ফেব্রুয়ারী ৩, ১৯৯৫; ঘোষণা ঃ ফেব্রুয়ারী ১৮, ১৯৯৫
চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের বিশপ হিসেবে অধিষ্ঠান ঃ এপ্রিল ২১, ১৯৯৫

১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে পুণ্যপিতা পোপ ২য় জন পল (বর্তমান সাধু ২য় জন পল) কর্তৃক তিনি চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল হিসেবে মনোনয়ন লাভ করেন এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে এই মনোনয়নের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয়। তিনি চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল হিসেবে ২১ এপ্রিল ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে চট্টগ্রাম ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে অধিষ্ঠিত হন। পোপের প্রতিনিধিসহ তৎকালীন ঢাকার আর্চবিশপ ও সকল বিশপদের উপস্থিতিতে অবসরপ্রাপ্ত তাঁর পূর্বসূরী শ্রদ্ধেয় বিশপ যোয়াকিম রোজারিও সিএসসি উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন।

তিনি তাঁর আহ্বানকে চট্টগ্রামের জনগণের পালক হওয়ার আহ্বান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মনে স্থান পেয়েছে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের জনগণের অবস্থার কথা; ইংরেজি ভাষাভাষী জনগণ, বিভিন্ন কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের বাঙালি জনগণ, পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্রনৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠিসমূহের জনগণ। অর্থাৎ তিনি প্রথমেই তাঁর ধর্মপ্রদেশের জনগণের নানা ভিন্নতা ও অবস্থান সম্পর্কে সচেতন ।

সেবাকাজের জন্য তিনি প্রথম থেকেই তাঁর লক্ষ্য স্থির করেছিলেন। মূল লক্ষ্য ছিল মঙ্গলবাণী প্রচার, আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃমাণ্ডলিক সম্পর্ক ও সংলাপ; বিভিন্ন কৃষ্টির মানুষের কাছে মঙ্গল সমাচারের মূল্যবোধ পৌঁছে দেয়া। এজন্য তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন: (ক) গঠন ও প্রশিক্ষণ: "কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা" অনুসারে যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণের শিক্ষা ও গঠন। (খ) পরিবার ও মৌলিক সমাজকে লক্ষ্য করে সর্বস্তরে পালকীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সেবাকাজ।

৯। **ঢাকার উত্তরসূরী আর্চবিশপ:** মনোনয়ন: ২৫শে নভেম্বর, ২০১০; অধিষ্ঠান: ২৫শে জানুয়ারী, ২০১১

১০। **ঢাকার আর্চবিশপ :** দায়িত্বকাল: ২২শে অক্টেবর, ২০১১ খ্রি. থেকে ১লা অক্টোবর ২০২০ খ্রি.

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ হিসেবে বিগত দশ বছরে প্রেরণার বাণী ছিল: যীশুর যাজকীয় প্রার্থনা: "তারা যেন এক হয় (যোহন ১৭:১১): এটাই মিলন, পবিত্রতা, ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ। সেবাকারী যাজকের সংস্কারীয় মর্যাদা নিয়ে পালক হওয়া; মিলন ও একতার পালক হওয়ার আহ্বান। বিশেষ সেবাকাজ ছিল নতুন প্রক্রিয়ায় মণ্ডলী হওয়া, যে-মণ্ডলী হবে মিলনসমাজ (Communion), ঐশ্বরিক ও জাগতিকের মিলন-রহস্য (Mystery) ও মিলন-সেবাকাজে প্রেরিত (Mission) মণ্ডলী স্বরূপ। মণ্ডলীকে মিলনসমাজ রূপে গঠন করা, বিশেষ করে (১) যীশুর সঙ্গে মিলন, (২) "তারা যেন এক হয়" এই পবিত্র আহ্বানে মিলন, (৩) পারিবারিক, যাজকীয় ও সন্ন্যাসব্রতী জীবনের আহ্বানে মিলন, (৪) মণ্ডলীর প্রশাসনিক ও আত্মিক অনুগ্রহদানের মধ্যে মিলন, (৫) দীক্ষাস্নাত সকল ব্যক্তির পবিত্রীকরণ, শিক্ষাদান ও পরিচালনা – এই ত্রিবিধ কর্মদায়িত্বের মধ্যে মিলন।

১১। কার্ডিনাল: মনোনয়ন অক্টোবর ৯, ২০১৬: পদে অধিষ্ঠান (রোম): নভেম্বর ১৯, ২০১৬ খ্রি.
"বাংলাদেশের ক্ষুদ্র মণ্ডলী থেকে একজন কার্ডিনাল মনোনয়ন ক'রে পোপ মহোদয় ক্ষুদ্রদের প্রতি ভালবাসা, প্রান্তিক দেশের প্রতি তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেছেন এবং বিশ্বজনীন মণ্ডলীতে বাংলাদেশের স্থান করে দিয়েছেন। মনোনয়নের মাধ্যমে পোপ মহোদয় "ক্ষুদ্র মেষদল"–এর বিশ্বাসকে সমর্থন জানিয়েছেন, খ্রিষ্টবিশ্বাসের সাক্ষ্যদানকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং নতুন মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। পোপ মহোদয় বাংলাদেশের ক্ষুদ্র মণ্ডলীকে "প্রদীপ" ও "লবন" হয়ে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দয়ার কাজ, আর্থ-সামাজিক ও মানবোন্নয়ন, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও সর্বধর্মীয় মানুষের জন্য প্রার্থনা করা, প্রভৃতি খ্রিষ্টীয় অবদানের স্বীকৃতি দিলেন এবং তা ভবিষ্যতে অব্যহত রেখে আরও জোরদার করার আহ্বান জানালেন।

"বাংলাদেশের ক্ষুদ্র মণ্ডলীর এই মর্যাদা ও সম্মান প্রাপ্তির সময়ে আজ, আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি অতীতের সকল মিশনারী, যারা বাংলাদেশের জনগণের কাছে খ্রিষ্টের বাণী ও ঐশরাজ্যের মঙ্গলসমাচার প্রচার করে গেছেন। অতীতে ও সাম্প্রতিককালের সকল ধর্মপাল, যাজক, পালক, সন্ন্যাসব্রতী পুরুষ ও নারী, বাণী প্রচারক, খ্রিষ্টান সমাজের নেতৃবৃন্দ ও সেবক-সেবিকা, এবং সর্বোপরি সকল খ্রিষ্টবিশ্বাসীর প্রতি আমি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাই। তাদের খ্রিষ্টীয় জীবন-সাধনা ও সেবাকাজের মাধ্যমে যে অবদান তারা রেখে গেছেন তারই একটি স্বীকৃতি হিসেবে আমি আমার মনোনয়নকে গ্রহণ করছি।

"কার্ডিনাল রূপে মনোনয়নের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীসহ সকল জনগণ, অন্যান্য খ্রিষ্টান মণ্ডলীসমূহ, কাথলিক মণ্ডলী এবং তার সকল ধর্মপাল, যাজক, সন্ন্যাসব্রতী, ভক্তবিশ্বাসী জনগণ এবং মণ্ডলীর সকল সেবা- প্রতিষ্ঠান ও সেবাকর্মীবৃন্দ। আমরা সকলেই এই মর্যাদার অংশী ও ভাগীদার।"

১২। অন্যান্য দায়িত্ব পালন ঃ

* বাংলাদেশ বিশপ সম্মিলনী-এর সামাজিক যোগাযোগ বিষয়ক বিশপীয় কমিশনের চেয়ারম্যান (১৯৯১-১৯৯৬)
* সামাজিক যোগাযোগের বিষয়ক এশিয়ার বিশপ সম্মিলনীর (এফএবিসি) অফিস-এর সদস্য (১৯৯১-১৯৯৬)
* বাংলাদেশ বিশপ সম্মিলনী (সিবিসিবি)-এর খ্রিষ্টীয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক কমিশনের চেয়ারম্যান (১৯৯৬-২০০৬)
* রোমের ভাটিকানের আন্তঃধর্মীয় সংলাপের পোপীয় পরিষদের সদস্য (১৯৯৬-১৯৯৮)
* কাথলিক মণ্ডলীর নতুন ধর্মশিক্ষা গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ কমিটির সভাপতি ও প্রধান সম্পাদক (১৯৯৫-২০০০)
* "কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা"-র বাংলা সংস্করণের প্রধান সম্পাদক, সিবিসিবি, ঢাকা, ২০০০ খ্রি
* ভক্তজনগন বিষয়ক বিশপীয় কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান, (মার্চ ২০০৪-২০১৭)
* বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, সংবাদপত্র ও স্মরণিকায় নিয়মিত লেখালেখি
* বাংলাদেশে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিসের পালকীয় সফরের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি
* বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান (২০১০-২০২০)
* বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর ভাইস প্রেসিডেন্ট (২০০৫-২০১১) ইউনাইটেড ফোরাম অব চার্চ, বাংলাদেশ: প্রেসিডেন্ট (২০১১-২০২০)
* ঢাকার তেজগাঁওতে অবস্থিত সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা তিনি (২০১৯)
* বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট (২০১১-২০২০)
* পোপ ফ্রান্সিস মিইজিয়াম : বালাদেশ কাথলিক মণ্ডলী, বনানী সেমিনারী, উদ্যোক্তা ও উদ্বোধক ২০১৭- আগস্ট ২১, ২০২৪ খ্রি.
* মানব-উন্নয়ন বিষয়ক পোপের মন্ত্রণালয়ের কার্ডিনাল সদস্য (২০১৬-২০২০ খ্রি.)
* জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটির সদস্য (২০১৮-২০২০)
* পুস্তক প্রকাশনা: ইতিমধ্যে তিনি ১৭ খানা পুস্তক প্রকাশ করেছেন; সর্বশেষ গ্রন্থ: প্রধান সম্পাদক ও লেখক: "শ্রীমন্ত-বাটে পাদ্রীশিবপুর : এতিহ্যবাহী একটি খ্রিস্টান জনপদ", ২০২৪ খ্রি.

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি[২২]

– রবি খ্রিস্টফার ডি'কস্তা

পুণ্য দয়ার বর্ষে কাথলিকভাবে ঈশ্বরের এত অসীম দয়া বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী পেয়েছে তা প্রকাশ করার ভাষা আমাদের নেই। ঈশ্বরের মহোত্তম দান আমাদের দিয়েছেন, আমরা প্রাণভরে আনন্দ ও উল্লসিত মনে গ্রহণ করেছি। ঈশ্বরের এই সকল মহোত্তম দানের জন্য আমরা গভীরতম সত্তা দিয়ে জানাই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র দেশ, এ দেশের একজন আর্চবিশপ কার্ডিনাল হয়েছেন, তা অতীব গৌরবের, মহিমার, সম্মানের এবং একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, যা প্রশংসারই যোগ্য। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম যাজক, যিনি স্বাধীন বাংলার মাটিতে স্বর্গীয় বিশপ যোয়াকিম রোজারিও কর্তৃক অভিষিক্ত হয়েছেন ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৮ জানুয়ারী, বর্তমান বরিশাল ডাইয়োসিস, অভিষেকের সময় ছিল চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসে, পর্তুগীজদের দ্বারা স্থাপিত "পথ প্রদর্শিকা রাণী মারীয়ার গীর্জা", পাদ্রীশিবপুরে, তার নিজের ধর্মপল্লী গ্রামে। বাংলাদেশ থেকে কার্ডিনাল মনোনয়নে বাংলাদেশকে ঈশ্বর করলেন আলোকিত। তাই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম যাজকই আবার বাংলাদেশের প্রথম কার্ডিনাল; তোমায় করি গো নমস্কার। ধন্য ঈশ্বরের নন্দন, তাঁর অসীম ভালোবাসা ও দয়ার পূর্ণ প্রকাশ এশিয়ার তিনটি দেশের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দেশে। বিশ্ব মানচিত্রে, এশিয়ার মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র দেশ। যেখানে খ্রীষ্টানদের সংখ্যা মাত্র ০.০৩%। এতেই প্রমানিত "ঈশ্বর ক্ষুদ্রদের তুলে ধরেন"। পরিত্রাণের ইতিহাসে আমরা তাই দেখি।

আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি' রোজারিও কার্ডিনাল হবেন এ কথাটি শুনেছিলাম ঢাকার রমনা আর্চবিশপ হাউজের মাঠে। যখন কার্ডিনালের আর্চবিশপীয় অধিষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিল তখনই। সদ্য প্রয়াত পবিত্র ক্রুশ ব্রাদার সংঘের শ্রদ্ধেয় ব্রাদার জর্লাথ ডি' সুজা সিএসসি, আমাকে চেয়ারে বসা দেখে, দৌড়ে এসে বললেন অন্য কোনো খবর শুনেছ, আর্চবিশপ হয়ত কার্ডিনাল হয়ে যাবেন, তখন ২০১১ খ্রিস্টাব্দ। সেবার আর হল না, উনিও মৃত্যুবরণ করলেন, আর্চবিশপ প্যাট্রিকের কার্ডিনাল মনোনয়ন আর দেখতে পেলেন না।

যখন পূণ্যপিতা ফ্রান্সিস ৯ই অক্টোবর ভ্যাটিক্যান সাধু পিতরের স্কয়ার থেকে ১৭ জন কার্ডিনালের নাম ঘোষণা করলেন, তার মধ্যে আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি' রোজারিওর নামও ঘোষণা করলেন। সাথে সাথে তা ফেসবুকে পেয়ে গেলাম। খবরটি শুনে এতই আনন্দে আপ্লুত হয়েছিলাম যে চোখ বেয়ে আনন্দ-অশ্রু ঝরতে শুরু করে। রাত ৮ ঘটিকার সময় মি: রক রোনাল্ড, ইউকান নিউজের ব্যুরোরচীফ ঢাকা থেকে আমাকে ফোন দিয়ে আমার অনুভূতি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আপনি তো কার্ডিনালের সাথে কাজ করেছেন (প্রথমবার ১৯৮৪-১৯৯০, দ্বিতীয়বার ১৯৯৫-২০১১) মোট ২২ বছর। আমি আমার অনুভূতিতে বলেছিলাম; দীর্ঘকাল পর ক্ষুদ্র বাংলাদেশ একজন কার্ডিনাল পেয়েছে তাতো গর্বের, অতীব আনন্দের ও উচ্ছাসের বিষয়। বাংলাদেশ মণ্ডলী ক্ষুদ্র হলেও পাঁচশত বছরের কাথলিক আমরা,

[২২] উদয় – ২০১৭ খ্রি., পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান যুব সংঘ, ঢাকা

বিভিন্ন মিশনারীরা বীজ বপন করেছেন। তাহলে এখনই একটি উপযুক্ত সময় কারণ বিগত ২০ বছরে মণ্ডলী অনেক প্রসারিত হয়েছে, হয়েছে পরিপক্ক। পূর্বে দীর্ঘকাল ধরে মাত্র চারটি ধর্মপ্রদেশ ছিল, বর্তমানে আটটি ধর্মপ্রদেশ। বিদেশী মিশনারীরা প্রায় নেই বললেই চলে, বাঙ্গালী বিশপ, পুরোহিত, ব্রাদার, সিস্টার দ্বারাই এখন বাঙালীর স্বরূপ প্রকাশিত। তাহলে এই হল পোপের সঠিক সিদ্ধান্ত, সঠিক সময়ে। কার্ডিনালের এ মনোনয়ন ক্ষুদ্র বাংলাদেশ মণ্ডলীকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেড়ে উঠতে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করবে। দেশটি মুসলিম প্রধান দেশ যেখানে কাথলিক বিশ্বাসী ৩৫০,০০০ মাত্র।

আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি আমি কার্ডিনালকে ম্যাসেজ করেছিলাম। আমরা সকলেই খুব খুশী ও গর্ব অনুভব করছি যে, আপনাকে বাংলাদেশের কার্ডিনাল মনোনয়ন করা হয়েছে। বাঙালী প্রথম কার্ডিনাল। শ্রদ্ধাস্পদ কার্ডিনাল আমরা আপনাকে স্বাগত জানাই। মহান ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই এ পুণ্য দয়ার বর্ষে ঈশ্বরের মহান দয়া দানের জন্য। এখন বাংলাদেশ মণ্ডলী হবে আরও শক্তিশালী ও গতিময়। হঠাৎ তার মায়ের কথা মনে পড়ায় তাও উদ্ধৃতি দিলাম।

এ ঘটনাটি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গুরুত্ব পাবে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে খ্রিস্টান সমাজের পরিচিতির উন্নয়ন ঘটবে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ জানবে যে, কার্ডিনাল পদ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ। তা রাষ্ট্র ও মণ্ডলীর সম্পর্ককে এক নব ধারায় পরিচালিত করবে। কার্ডিনাল পদ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী পরিষদের মন্ত্রীর সমকক্ষ বলেই আমরা মনে করি। কারণ "কলেজ অব কার্ডিনালই" হলো পোপের মন্ত্রণা পরিষদ। কার্ডিনাল হওয়া কোনো সাক্রামেন্ত বা অভিষেক নয়, এটি পোপীয় দপ্তরের একটি পদ। পোপের হাত থেকে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ১৯শে নভেম্বর তিনি রোমে উপস্থিত থাকবেন।

বাঙ্গালী এক সন্তান পেলো অনন্য মর্যাদা: বাংলাদেশের বাঙ্গালী তথা বাংলাদেশী খ্রিস্টানদের জন্য তা এক অনন্য মর্যাদা ও গৌরব। বাঙ্গালী জাতির জন্য তা মহা গৌরব বলে ভাবতে আনন্দ লাগে। এ অনন্য প্রাপ্তি, অনন্য মহিমায় ভাস্বরিত হলো "বাংলাদেশ"। এ আনন্দের অংশভোগী রাষ্ট্র নিজেও। এতদিন যা ভেবেছি তা শুধুই মাত্র কল্পনা। আজ যা পেয়েছি তা অতি বাস্তব: আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি' রোজারিও কার্ডিনাল, পোপীয় সংসদের একমাত্র বাঙ্গালী সদস্য।

ঈশ্বর দীনজনদের তুলে ধরেন: ঈশ্বর মানুষের বাহ্যিকতা দেখেন না, দেখেন মানুষের অন্তরে আর্চবিশপ প্যাট্রিকের অন্তর। গভীরতম নীরব সাধনাই ঈশ্বরের এ মহাকাজ সাধিত হল। ঠিক যেন যীশুর জননী মা মারীয়াকে ঈশ্বর মনে হয় সেদিন এভাবেই বেছে নিয়েছিলেন। নাজারেথের যোয়াকিম ও আন্নার পরিবারে সাধারণ এক ক্ষুদ্র বালিকা মারীয়াকেই ঈশ্বর দান করেছেন এক অনন্য মর্যাদা ত্রাণকর্তা প্রভু যীশুর মা হতে, সহ ত্রাণকারী হতে। মারীয়া ছিলেন অতি সরল, বিনম্র ও অন্তরে ধীর, সে অন্তর থেকেই উদ্ভূত কণ্ঠস্বরে বলেছিলেন: "আমি প্রভুর দাসী আপনি যা বলেছেন আমার তাই হোক"। একথা ঈশ্বরের দেয়া শক্তিতে মারীয়া বলতে পেরেছিলেন, "কারণ পরমেশ্বরের অসাধ্য কিছুই নেই"।

আজ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও হয়তো মারীয়ার এ বাণী ধ্যানে কার্ডিনাল হিসাবে দায়িত্ব পালনের যাত্রায় নিমগ্ন হলেন। তোমারই জয় হোক, তোমারই জয় হোক। বাংলাদেশ থেকে কার্ডিনাল হওয়া একটি মহাকাজ ও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তাই ঈশ্বরকে আজ আমরা প্রাণভরে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। কারণ ক্ষুদ্র দেশটি বিশ্ব দরবারে ছিল অচেনা, অজানা, অপরিচিত; সে অবস্থা থেকে

একজন কার্ডিনাল মনোনয়ন করেছেন। একই সাথে পূণ্য পিতা ফ্রান্সিসকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই তার এ ভালোবাসার মনোনয়নের জন্য। তার এ মনোনয়ন অতি মহোত্তম উদ্যোগ। একটি ক্ষুদ্র দেশ থেকে একজন কার্ডিনাল মনোনয়ন করে দান করেছেন এক অনন্য মর্যাদা। পূণ্য পিতা ফ্রান্সিসকে অভিনন্দন। আবার কার্ডিনাল প্যাট্রিককেও আমরা জানাই অভিনন্দন। আমরা জানিনা, বুঝিনা কার্ডিনাল প্যাট্রিকের অন্তরে আজ কি ধরনের অধ্যায় শুরু হয়েছে। অনেক চেষ্টা করেছি তার অনুভূতিকে ধ্যানে আনতে। শুধু পেয়েছি: প্রভু তুমি মহান, দীনতমদের তুমি যে এ ভাবেই তুলে ধর। আজ আরেকটি বার দেখতে পাই পবিত্র বাইবেলের বাণী অতি বাস্তব, তা ঐশ প্রেরণায় অনুপ্রাণিত। এ ঐশ বাণীই মাংস হয়ে যেমন দেহ ধারণ করেছিল মারিয়ার গর্ভে। এ ঐশ বাণীর প্রতি বিশ্বস্ততাই কার্ডিনালের অন্তরকে ঈশ্বর তার মহা বদান্যতায় পূর্ণ করেই পুণ্যপিতা ফ্রান্সিসের মাধ্যমে দান করলেন এ আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ।

পূণ্য পিতা ফ্রান্সিসকেও ভাবতে অবাক লাগে। একজন প্রবক্তাই বটে, সারা বিশ্বে যেন একের পর এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর আলোড়ন ঘটিয়ে যাচ্ছেন। তার অদম্য সাহসিকতা, বীরদর্পে এগিয়ে যাওয়া, মাত্র দুই বছরে যে কত কি ঘটিয়ে ফেললেন তা বুঝবার উপায় নেই। তার তুলনা হয় না। ঐশ বাণীর ন্যায়, যেখানে কেউ বুনে না, সেখান থেকে যেন উনি তুলে আনেন, দান করেন পূর্ণতা। তার ঐশ বাণী, ধ্যান অতীব বাস্তব ও স্পষ্ট। দয়ার বর্ষে তিনি ছিলেন গভীর ধ্যানী তাপস। তাই তার সকল সাধনা অনন্য। তিনি দেখিয়েছেন মণ্ডলী শুধু উচ্চ বংশপরম্পরারই নয়, তা দীনতমদেরও। যেখানে ঈশ্বরের দয়া অফুরান ধারায় প্রকাশ করলেন।

প্রাইমারী শিক্ষা চলাকালীন সময় থেকে স্বর্গীয় ফাদার রড্রিগ্স এর সান্নিধ্য পেয়ে যাজক হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন। তিনি বদলী হয়ে গেলে ফাঃ পাইয়া সিএসসি'র সান্নিধ্যে ও পরামর্শে বেড়ে উঠতে থাকেন। ফাঃ পাইয়াই তাকে পবিত্র ক্রুশ সংঘের পরিচালিত সাধু যোসেফের বোর্ডিং এ পাঠান। বোর্ডিং-এ থেকেই পাদ্রীশিবপুর সেন্ট আলফ্রেড উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তাদের পরীক্ষার সিট পড়েছিল, বরিশালের নুরিয়া স্কুলে। তাই তারা ৭ জন পরীক্ষা দিতে এসে বরিশালের পুলিশ লাইনে টমাস গোমেজের বাড়ীতে থেকেছিলেন। ১৯৬১ খ্রি. ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করার পরেই বরিশালের পবিত্র ক্রুশ সংঘের নব্যালয়ে যোগদান করেন। তারা ছিলেন ২ জন: প্যাট্রিক ও লাজারুস গোমেজ (যাজক হয়েও ত্যাগ করেছেন) বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে। নবিশিয়েটে ৭ জন নবিশ ছিলেন কিন্তু বর্তমানে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও একাই আছেন। ১৯৬২ খ্রি. তিনি প্রথম ব্রত উচ্চারণ করেন। তখন নভিস মাষ্টার ছিলেন স্বর্গীয় ফাদার গী ব্রো, সিএসসি। স্কুল জীবনে ফাদার পাইয়া, সিএসসি ছিলেন কার্ডিনালের একান্ত আধ্যাতিক গুরু। বিভিন্ন সময়ে কার্ডিনাল ফা: পাইয়ার কথা বলতেন। বর্তমানে যেখানে নভিশিয়েট তখন সেখানে নভিসিয়েট ছিল না। অরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটের আওতায় একটি টিনের চালা ঘরে এক রুমে নভিস মাষ্টার অন্য রুমে নভিশরা থাকত। চট্টগ্রাম ডাইওসিসের পালকীয় সেবা কেন্দ্রের পরিচালক হিসাবে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ঐ ঘরেই আবার তিনি ছিলেন। ফাদার পাইয়া দক্ষিণ ভারতে চলে যান আশ্রমবাসী হয়ে। অনেক দিন পর্যন্ত একটি আশ্রমের গুরু ছিলেন। গুরুর অতি সাধারণ জীবন-যাপন আধ্যাত্মিক সাধনা কার্ডিনালকে সেদিন তার আধ্যাত্মিক জীবনে বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল কার্ডিনালের দীর্ঘ দিনের যাজকীয় ও বিশপীয় জীবনের বেশভূষায় পোশাক-পরিচ্ছদে।

গুরুর আদর্শ বাস্তব করে তুলেছেন। পায়জামা-পাঞ্জাবী, স্যান্ডেলই ছিল যেমন গুরুর ভূষণ তেমনি শিষ্যেরও ছিল তাই। বিশ্বাস করি, গুরুর আদর্শ সাধনায় তাকে এ পবিত্র জীবন-যাপনে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। পরবর্তীতে স্বর্গীয় বিশপ যোয়াকিম রোজারিও সিএসসি, যার হাতে কার্ডিনাল প্যাট্রিক যাজকীয় জীবনের অভিষেক গ্রহণ করেছিলেন। তাকেও কার্ডিনাল গুরু হিসাবে দেখতেন। যিনি বিশপের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণের পর শিষ্য হয়ে উত্তরসূরীভাবে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের বিশপ হয়েছিলেন। তার কাছ থেকে পালকীয় কাজের অনেক অভিজ্ঞতা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। যেমন সাধারণ জীবন-যাপন করা, সংলাপ করা, স্থানীয় মন্ডলী গঠনে স্বপ্নের উত্তরসূরী হওয়া, সংস্কৃতায়ন ইত্যাদি। যাদের কাছ থেকে গ্রহণ ও বহন করেছেন তারা আজ কেউই বেঁচে নেই। তবে তাদের আশীর্বাদ রয়েছে আজকের দিনে কার্ডিনাল হওয়ার যাত্রায়।

কার্ডিনালের অনেক গুণাবলী মানুষকে সঠিক পরিচর্যা দিয়েছে

তিনি নীতিবোধের মানুষ: ব্যক্তি হিসাবে কার্ডিনাল নীতিবোধের মানুষ ছিলেন। তিনি নৈতিক ঐশতত্ত্ব নিয়ে বেলজিয়ামের পন্টিফিক্যাল ইউনিভার্সিটি অব লুভেন থেকে উচ্চতর (লাইসেনোসিয়েট) শিক্ষা লাভ করেছেন। পরবর্তীতে তিনি বনানীর পবিত্র আত্মার মেজর সেমিনারীতে নৈতিক ঐশতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। যে কোনো কাজই তিনি করেছেন, সর্বদাই ছিলেন নীতিতে অটল। অবশ্য তার যাজক হওয়ার জন্য থিউলজি ও ফিলোসফি পাকিস্তানের করাচীর খ্রিস্টরাজা মেজর সেমিনারীতে পড়াশোনা করেছেন। তখন বাংলাদেশ ছিল পূর্ব পাকিস্তান। তারা বাংলাদেশ থেকে ১৮ জনের একটি দল "খ্রিস্ট রাজা" করাচীরে সেমিনারীতে পড়াশোনা করেছেন। যারা তার সমপাঠী ছিলেন তারা হলেন: ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা, সিএসসি, ফাদার বানার্ড পালমা, ফাদার জ্যোতি এ্যালেক্সিস গোমেজ, ফাদার লাজারোজ গোমেজ সি.এস সি, (যাজকীয় জীবন ত্যাগ করেছেন)। মিঃ বার্থলোমীয় প্রত্যুষ সাহা সেমিনারিতে তিন বছরের জুনিয়র ছিলেন। কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও এবং লাজারুস গোমেজ সেখান থেকে যুদ্ধের সময়ে জুন মাসে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন।

পরিকল্পনাকারী ব্যক্তি: তিনি যে কোনো কাজ, প্রোগ্রাম, কোন স্থানে যাত্রা যা কিছু করতেন পূর্বেই তার পরিকল্পনা ছক তৈরী করে যোগাযোগ ঘটিয়ে এগিয়ে যেতেন। পূর্ব প্রস্তুতিই তার কাজের পূর্ণতা। খ্রিস্টযাগের উপদেশের প্রস্তুতি পূর্বের দিন লিখিত ভাবে করতেন। কোনো সেমিনারের প্রস্তুতি, বক্তব্য উপস্থাপনায় লিখিত প্রস্তুতি, যা তার সব কাজে এনেছে গ্রহণযোগ্যতা ও মানুষকে করত অনুপ্রাণিত। তিনি অভ্যাসটি রপ্ত করেছিলেন, নবিশিয়েটে, কলেজে এবং করাচীর মেজর সেমিনারীতে পড়াশোনার সময়। তখনকার দিনে কম্পিউটার ছিলনা বিধায় প্রতিদিনের কাজগুলো তিনি টাইপ করে লিখে ফেলতেন। একবার দেখেছি উনার ৩৪টি রবিবারের প্রার্থনা, ঐশবাণী পাঠ ও উপদেশ ছিল সব টাইপ করা। এভাবেই তার পড়াশুনা। পূর্ব প্রস্তুতিতে একটি শৃংঙ্খলাপূর্ণ জীবনই ছিল তার।

পড়াশোনার একনিষ্ঠতা: তিনি সর্বদাই পড়াশোনার প্রতি অধ্যবসায়ী। মণ্ডলীর আপডেট শিক্ষা যা কিছু ছিল তিনি দীর্ঘ সময় নিয়েই পড়তেন। আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য কোন কিছু রিসার্স করার জন্যই তিনি অনেক পড়াশোনা করতেন। কার্ডিনাল লেখক হিসাবে ছিলেন একজন সিদ্ধহস্ত। লেখা শুরু করেন বিশেষভাবে বনানী মেজর সেমিনারীতে থাকতে সেখান থেকে নিয়মিত যে প্রদীপণ নামক জার্নালটি

এখনও বের হচ্ছে। তার উদ্যোক্তা ও প্রথম সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছেন। কার্ডিনাল এছাড়াও লেখায়, বাক্য গঠন, বানান, এসব কিছুর উপর ছিল তার অগাধ পান্ডিত্য। এছাড়া যখন চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ পালকীয় সেবা কেন্দ্রের পরিচালক হিসাবে কাজ করেছেন তখন "তুমি আমায় ডেকেছ, এইতো আমি" বই খানি অনুবাদ করেছিলেন। এছাড়াও গবেষণালব্ধ অনেক লেখা তিনি বিভিন্ন সময় লিখেছেন। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা পুস্তকখানির পরিভাষা সংকলন ও প্রস্তুতিতে, অনুবাদে ও সম্পাদনার প্রধান দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। কাথলিক মন্ডলীর ধর্মশিক্ষার মূল গ্রন্থ তার "কম্পেন্দিয়াম (কলকাতা) সংক্ষিপ্ত সার এর অনুসরণে বয়স্কদের জন্য মন্ডলীর এ ধর্ম শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ক্যাথলিক মন্ডলীর সংক্ষিপ্ত ধর্মসার নামে পুস্তক খানি ২০১২-২০১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন।

সংস্কৃত্যায়ন ও স্থানীয় মন্ডলী গঠনে সহায়ক উত্তরসূরী ছিলেন স্বর্গীয় বিশপ যোয়াকিমের সাথে। বনানীতে অধ্যাপনার সময়ও তিনি স্বর্গীয় ফাদার ফ্রান্সিস গোমেজ (সীমা) ও ফাদার বার্নার্ড পালমার সাথে এ বিষয়ে সেমিনার, কর্মশালা ও লেখালেখির কাজ করেছেন। তারই উদ্যোগে প্রথমে "উপদেশ সহায়ক" রচনা শুরু হয়।

সংলাপী ভাবধারার মানুষ: স্বর্গীয় বিশপ যোয়াকিম রোজারিও'র থেকে এ ভাবটি পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করেছিলেন। অন্যান্য মন্ডলীর সাথে অন্য ধর্মবিশ্বাসী ভাই-বোনদের সাথে সেমিনার, ধ্যান সভা আয়োজনে তিনি অনেক পরিশ্রম ও লেখালেখি করেছেন। স্বর্গীয় বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, ফাঃ এঞ্জো কোরবা পিমে ও আমি রবি খ্রিস্টভার ডি' কস্তা এ বিষয়ে অনেক কাজ করেছি। এছাড়া জাতীয় আন্তঃমাণ্ডলিক ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের প্রথম সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন স্বর্গীয় বিশপ যোয়াকিম রোজারিও এবং তার অবসরের পর (১৯৯৪) উত্তরসূরী হিসাবে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন দীর্ঘদিন। যে দুটি ধর্মপ্রদেশে বিশপ হিসাবে কাজ করেছেন এ সংলাপমুখী কার্যক্রম তিনি অব্যাহত রেখেছেন।

মন্ডলীতে খ্রিস্টভক্তদের ভূমিকার আন্দোলন: মণ্ডলীতে খ্রিস্টভক্তদের আন্দোলন প্রথম শুরু হয় চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশে। যেখানে তিনি বিভিন্ন ধর্মপল্লী খ্রিস্টবিশ্বাসীদের অনুপ্রাণিত করেছেন, ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের বিভিন্ন সেবা কাজে অংশগ্রহণের জন্য। একারণেই ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের পালকীয় সেবাকেন্দ্র ও ধ্যানাশ্রম শুরু করেন খ্রিস্টভক্তদের প্রশিক্ষণ দান করার জন্য।

ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ গঠনের ভূমিকা: ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর পালক-পুরোহিত থাকাকালীন সময় থেকে গ্রামে গ্রামে গিয়ে ক্ষুদ্র সমাজ গঠনের কাজ তখন শুরু করেন। এছাড়া ধর্মপল্লীতে পালকীয় পরিষদ ও সংবিধান রচনায় তিনি এ অঞ্চলে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। পরবর্তীতে তারই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জাতীয় লেইটি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের গঠন ও প্রশিক্ষণের নিয়মিত আয়োজন করে যাচ্ছেন।

এছাড়াও ব্যক্তি হিসাবে তার আচরণে যে গুণগুলি দেখা গেছে তা হল: তিনি ভালবাসার মানুষ। মানুষকে কাছের বা নিজের মানুষের মতই ভালোবাসেন। প্রাণ খোলা হাসিতে ভরে তোলেন মানুষের মনকে, একজন আনন্দপূর্ণ ব্যক্তি। শখের মধ্যে দেখেছি মাছ ধরা, তাস খেলাও তিনি পছন্দ করতেন। লোক সংস্কৃতির পদাবলী কীর্তন, ভজন নৃত্য সম্পর্কে তার অগাধ পান্ডিত্য রয়েছে। তার নিত্য দিনের সাধনা, পরিশ্রম, বন্ধু সুলভ ভাবের মানুষ তিনি। আধুনিক যুগে তিনি এখন ডিজিটাল কার্ডিনাল। নেট, ফেসবুক, ওয়াইফাই, ল্যাপটপ, ক্যামেরা তিনি সর্বদাই ব্যবহার করেন। বিভিন্ন ছবি সংগ্রহ তার একটি শখ। অনেক পুরানো সংগ্রহ তার কাছে রয়েছে। আরেকটি বিশেষ গুণ হচ্ছে প্রতি বছর পরিবারের সকল ভাই বোন আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে তার আপন বাড়ীতে পারিবারিক মিলন উৎসবের আয়োজন করা।

সার্বিকভাবে শ্রদ্ধাস্পদ কার্ডিনালকে আমি এভাবেই তুলে ধরতে চেয়েছি। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের পালকীয় সেবা কেন্দ্রের একজন খ্রিস্টভক্ত হিসাবে প্রশিক্ষক ও বাণী প্রচারের কাজে কার্ডিনালের আহ্বানে আমি এ কাজে আত্মনিয়োগ করে ২২ বছর তার সাথে একান্তে কাজ করেছি। অনেক শিখেছি, অর্জন করেছি স্বাধীনভাবে কথা বলা, আলাপচারিতা নিয়ে মাণ্ডলিক ভাবনায় তিনি আমাকে প্রবেশ ঘটিয়েছেন। আজ আমি মণ্ডলীতে যা হয়েছি, দিতে পেরিছি সব তারই অবদান। উনার এ সম্মানে আমি ও আমার পরিবারও, গর্বিত, আনন্দিত ও রক্ষিত। তার ভবিষ্যৎ "জ্যোতির্ময় হোক", তার বাবার কথা দিয়ে শেষ করছি।

"অনুভূতিঃ ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা প্রশংসা"

– সিস্টার অনু ক্লারিছ, এলএইচসি (সাক্ষাৎকার)

১। এলএইচসি সিস্টার সমাজে আপনি কিভাবে আহবান পেয়েছেন?
আমি আমার মায়ের আদর্শ, প্রার্থনার জীবন ভালবাসায় থেকে আহবান পেয়েছি।

২। ব্রতীয় জীবনে আসার পেছনে কার অবদান সবচেয়ে বেশি?
ব্রতীয় জীবনে আসার পিছনে মা ও ধর্ম পিতা-মাতার এবং হলিক্রশ সিস্টারদের অবদান সবচেয়ে বেশি ছিল।

৩। আপনার বাল্যকাল সম্পর্কে কিছু সহভাগিতা করবেন?
আমার পিতা-মাতা অনেক প্রতিক্ষার পরে আমাকে পেয়ে অনেক বেশি খুশি ছিল। ছেলে মেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলা করতাম। আমার ছোট পিসিমা আমাকে হাত ধরে স্কুলে নিয়ে যেতেন কারণ আমি ভয় পেতাম। পড়াশুনায় ভাল ছিলাম বলে শিক্ষকগণ আমাকে ভালবাসতেন এবং সিস্টারগণও আমাকে ভালবাসতেন।

৪। গঠনগৃহে থাকাকালীন সময়ে আপনার অভিজ্ঞতা কেমন? সে সময়ে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছেন কি?
গঠনগৃহে থাকাকালীন সময়ে আমি নব্যালয়ে সবসময় গান করতাম নীরবতার কথা মনেই থাকতো না। একদিন সিস্টার রানী আমাকে একটি ঘরে হারমোনিয়াম দিয়ে বলেন যত খুশি গান কর। যখন গান গেয়ে ক্লান্ত হয়ে গেছি, ঘর থেকে বাহির হতে পারিনা। তখন অনেক কেঁদেছি শব্দ করেছি যেন দরজা খুলে দেয়।

৫। আপনার প্রৈরিতিক কাজের কিছু অভিজ্ঞতা ও চ্যালেঞ্জ আমাদের সাথে সহভাগিতা করবেন কি?
নারিকেল বাড়ি থাকাকালীন সময়ে একটি গ্রামে যাই। একটি পরিবারে যাই এবং খাবার সময় হলে শুধু কচুশাক খেতে দেয় এবং পরে ঘরে ফিরে আসি। অন্য একদিন একবাড়িতে গিয়ে ঢেঁকিতে ধান ভানি এরপর রান্না করে ঐ ভাত খেয়ে ঘরে ফিরে আসি। যেখানে পায়ে হাঁটার রাস্তা ছিল না সেখানে নৌকাযোগে যেতাম এবং পরিবারে বেশি জায়গা না থাকায় সিস্টারগণ থাকত গির্জা ঘরে এবং ফাদার নৌকায় রাত্রি যাপন করত।

৬। ব্রতীয়-জীবন ও সংঘবদ্ধ জীবনকে কিভাবে দেখেন?
বাধ্যতা, দরিদ্রতা ও শুচিতা নিয়ে ব্রতীয় জীবন। এই তিন এর সমন্বয়ে সংঘবদ্ধ জীবন; যারা এই দলে এসেছে একত্রে বসবাস করে। ৬/৭ জন একত্রে একটা আশ্রমে থাকা দায়িত্ব বন্টন করে শৃঙ্খলায় কাজ চালিয়ে যাওয়া। ঘরের বাইরে প্রৈরিতিক কাজ পরিবার সাক্ষাৎ, স্কুল, ডিসপেনসারিতে, শিশুমঙ্গল এই ভাবে মান্ডলিক কাজ চালিয়ে যাওয়া আনন্দের।

৭। ব্রতীয় জীবন ও সংঘবদ্ধ জীবনকে আপনি কিভাবে দেখেন?
আদর্শ ব্রতধারী হতে হলে চোখ খোলা আবশ্যক, কোথায় কোন প্রয়োজন, কেহ অসুস্থ হলে দেখা, আমার ব্রতীয় জীবনের ধ্যান প্রার্থনা বিশস্ত ভাবে চালিয়ে যাওয়া এবং প্রৈরিতিক কাজগুলো চালিয়ে যাওয়া পাল-পুরোহিতের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা আমার কর্তব্য।

৮। আপনার জীবনের মূলমন্ত্র কি?
জীবনের মূলমন্ত্র বিশ্বস্ততা এবং ঈশ্বর ও সংঘের কতৃপক্ষের নির্দেশনানুসারে চলা।

৯। অবসর সময়ে আপনি কোন কাজ বেশি ভালোবাসেন?
অবসর সময়ে সেলাই করা, গান করা ও শেখা, বই বেশি পছন্দ করি।

১০। এলএইচসি সিস্টার সমাজের কাছে আপনার প্রত্যাশা কি?
আমার প্রত্যাশা মানুষের মত মানুষ হওয়া, পবিত্র জীবন যাপন করা যা প্রতিদিন করে থাকি। মালা প্রার্থনা, সংবিধান অনুসারে জীবন যাপন, অবহেলিত ভাইবোনদের সাথে সাক্ষাৎ।

১১। আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?
আমার বয়স হয়েছে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আর কি, যেন বিশস্ত থেকে ভাল মৃত্যু পেতে পারি।

১২। যুব সমাজের কাছে আপনার প্রত্যাশা কি? কিছু বলুন....
যুব সমাজের কাছে প্রত্যাশা বর্তমান যুগলক্ষণ বেশি ভাল না তাই যুবদের নিয়ে মাসে কমপক্ষে ২ বার বসা, কর্ম পরিকল্পনা করা, যেন ওরা সঠিক পথে চলতে পারে। যেন তারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ভুল পথে না যায়। আনন্দপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহন করা, যেন জীবনে যেন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

---

[২০] যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবনের রজত-সুবর্ণ জয়ন্তী, বরিশাল ধর্মপ্রদেশ, বরিশাল, ১১ই অক্টোবর, ২০১৯ খ্রি.

সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত

পরিবার: সিস্টার অনু ক্লারিস গোমেজ, এলএইচসি-এর জন্ম হয়েছে ২২ই জুন, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে, মিস্ত্রি বাড়ি, পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লী, বরিশাল। তার বাবা হচ্ছেন: স্বর্গীয় রেচমন্ড গোমেজ এবং স্বর্গীয়া সিসিলিয়া গোমেজ। পরিবারে তারা দুই বোন ও এক ভাই।

শিক্ষা ও গঠন জীবন:

* প্রাইমারি শিক্ষা ছিল পাদ্রীশিবপুরে এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে এসএসসি ও এইচএসসি বরিশাল শহরে।
* নবিশিয়েট, সাগরদি বরিশাল: ১৯শে জানুয়ারি, ১৯৬৭ খ্রি.
* প্রথম ব্রতগ্রহণ: ১৯৭১ খ্রি.; আজীবন ব্রতগ্রহণ: ১৯৭৭ খ্রি.; রজত-জয়ন্তী ১৯৯৪ খ্রি. এবং সুবর্ণ-জয়ন্তী ২০১৯

কর্মজীবন:

* ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এল, এইচ, সি সংঘের সুপিরিয়র জেনারেল-এর দায়িত্ব পালন করেন।
* পাদ্রিশিবপুর দীপ্তি হোস্টেলে ৩ বছর; উদয়ন স্কুলে ১ বছর; আশাকেন্দ্রে ৪ বছর; পাদ্রিশিবপুর পাটের সমিতিতে ৩ বছর; বরিশালে মহিলা সমিতিতে ৩ বছর, ঘোড়ারপাড় সেন্ট মেরীস হোমে ৫ বছর। নারিকেল বাড়ি, গৌরনদী, বান্দরবান, বরিশাল, পাদ্রিশিবপুর হাউজে সুপরিয়রের এবং পালকীয় কাজের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে এল, এইচ, সি মাদার হাউজ বরিশালে আছেন।

সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমার অভিজ্ঞতা[২৪]

– সিস্টার আরতি ডেলফিনা ডি'কস্তা, এলএইচসি (সাক্ষাৎকার)

কেমন করে যে পঞ্চাশটি বছর কেটে গেল বিশ্বাসই হচ্ছে না। আনন্দটা অনুভব হলো যখন দেখলাম আমার চাইতে বেশি আনন্দ আমার সংঘের ভগ্নীদের, কি উৎসাহ নিয়ে সবাই পরিশ্রম করছে। কোন ক্লান্তি, বিরক্ত নেই, রাত দুপুর পর্যন্ত কাজ করে যাচ্ছে হাসি মুখে....

এভাবেই আমি বিভিন্ন ব্যক্তি ও আমার সংঘের ভগ্নীদের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা করেছি পিতা ঈশ্বরের উদার ভালবাসা ক্ষমা, সহানুভূতি সমর্থন ও অনুপ্রেরণা। আমি আজ যা হতে পেরেছি তার পিছনে আছে আমার সংঘ। ব্রতগ্রহণ করেই নারিকেল বাড়ি ধর্মপল্লীতে নিয়োগ পাই। নভিসিয়েটে কোন দিন গান শুরু করতে হয়নি। এখন খ্রীষ্টযাগে, প্রার্থনা সভায় গান চালাতে হবে। আমার সিস্টারগণই আমাকে জোর করছেন আবার তারাই আমাকে সাহস দিচ্ছেন "আমরা টেনে নিব, তুমি পারবে"। আর এখন পর্যন্ত অনেক কিছুই পেরে আসছি। এরপর নার্সিং শেষে ফিরে এসেছি, ডাক্তারখানায় দায়িত্ব দেয়া হলো। এতোদিন অন্যের পরিচালনায় কেবলমাত্র রোগীর সেবা করেছি-নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে। আর এখন চার উপকেন্দ্রে মোবাইল ক্লিনিক করতে হবে। কেন্দ্রে মা, শিশু, গর্ভবতী সাধারণ রোগী, মাঠ স্বাস্থ্য কর্মীদের মনিটরিং, নার্সদের পরিচালনা করা, যিনি এতদিন দায়িত্বে ছিলেন আমাকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে পরের দিনই চলে গেলেন পাদ্রিশিবপুর ডাক্তার খানায়। কত অনুরোধ করেছি কয়েকটা দিন আমার সাথে থাকার জন্য। আগের মতই মনে হয়েছে কি নিষ্ঠুর এরা। তারপর দিনে দিনে আবিস্কার করলাম আমার কর্তৃপক্ষ, আমার ভগ্নিগণ ডাক্তারখানার সহকর্মীগণ আমাকে শেখাচ্ছেন কিভাবে পরিচালনা করতে হবে। এভাবেই আমাকে গড়ে তোলা হয়েছে।

[২৪] যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবনের রজত-সুবর্ণ জয়ন্তী, বরিশাল ধর্মপ্রদেশ, বরিশাল, ১১ই অক্টোবর, ২০১৯ খ্রি.

সাধু পোপ ষষ্ঠ পল ঢাকায় এলে L.H.C সংঘের পক্ষে আমাকে একটা কার্ড দেওয়া হলো তখন আমি হলি ফ্যামিলিতে ট্রেনিংয়ে। প্লেন থেকে নেমে পোপ মহোদয় যখন হেঁটে যাচ্ছেন আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম তাঁর হাত চুম্বন করার জন্য কিন্তু তার নিরাপত্তারক্ষী আমার হাত সরিয়ে দিলেন। আমিও হাত সরিয়ে নিলাম। ততক্ষণে পোপ মহোদয় সামনে চলে এসেছেন। কিন্তু অবাক কান্ড- পোপ মহোদয় ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তার হাত বাড়িয়ে দিলেন - আমি তাঁর হাত চুম্বন করে আশীর্বাদ নিলাম। কিন্তু তেমন কিছু অনুভব করলাম না। পরের দিন সকালে চ্যাপলেন ফাদার বললেন "কাল দেখলাম বরিশালের লোকদের ভাগ্য! পোপ মহোদয় নিজে হাত বাড়িয়ে আশীর্বাদ দিলেন" সেই মুহূর্তে অনুভব করলাম তাই তো এ কৃপা তো আমার কাছে যেচে এসেছে। উপলব্ধি করলাম কী আশীর্বাদ আমি পেয়েছি। জীবনে এরকম অজস্র আশীর্বাদ এসেছে-অনেক, ঈশ্বর আমার কাছে কত দেবদূতদের পাঠিয়েছেন কিন্তু আমি তখন খেয়াল করিনি-আজ সেসব মনে হলে অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠে।

বিশপ যোয়াকিম কি কারণে একই সাথে প্রধান অধ্যক্ষা ও নব্যাধ্যক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিলেন জানি না। তবে বিশ্বাস করেছেন আর আস্থা রেখেছেন। সব সময় পাশে ছিলেন সিস্টার এডলিন, ফাদার প্যাট্রিক এবং ফাদার লাবে। সিস্টার এডলিন কানাডা ফিরে যাওয়ার পর ছিলেন সিস্টার রোজ। কত দেবদূতের নাম বলবো? সেই সময়ে বলা যায় নতুন করে আবার সংঘ শুরু হলো। নবীসদের মধ্যে দেখেছি সংঘের ক্যারিজম, বৈশিষ্ট্য, প্রেরণ কাজ কত সাবলীলভাবে আত্মস্থ করছে। এসব আমার উপর দয়ালু পিতার আশীর্বাদ। আজ আমি উপলব্ধি করছি যা পেয়েছি তা অযাচিত দান। কৃতজ্ঞ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি।

আপনি কেন ব্রত জীবনকে বেছে নিয়েছেন?

আমার বেছে নেওয়ার কিছু নেই। সেই যোগ্যতা আমার নেই। ঈশ্বর চেয়েছেন তাই আমি এ জীবনে এসেছি।

সমাজে আমি কীভাবে আহ্বান পেয়েছি? ব্রতীয় জীবনে আমার পেছনে কার অবদান সবচেয়ে বেশি?
ছোটবেলা বাবা মায়ের কাছে শুনতাম মায়ের পিসিমা-মাসিমা ও একজন জ্ঞাতিবোন মাদ্রাজে সিস্টার হয়েছেন। মায়ের বোন সি. লিলিয়ান এসএমআরএ। বড় মামাও হলিক্রশ নবীস ছিলেন নোয়াখালীতে। মামা অবশ্য চলে আসেন। এদের গল্প শুনতাম। বাবা ছিলেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও প্রতিদিন খ্রীষ্টযাগে অংশগ্রহণ করতে চেষ্টা করতেন। এছাড়া সন্ধ্যায় বিভিন্ন নভেনায়ও যোগ দিতেন। আমাকেও মাঝে মাঝে নিয়ে যেতেন। পারিবারিক সন্ধ্যা প্রার্থনা ছিল নিয়মিত। পঞ্চম শ্রেণিতে হলিক্রশ সিস্টারদের সংস্পর্শে এসে তাদের মত সিস্টার হওয়ার ইচ্ছা জাগে। ফাদার পাইয়াকে আমার ইচ্ছা জানালে ফাদার আমার মাকে বলেন আর মা আমার কাছে ফাদারের ব্যাপারে কিছু না বলে আমাকে সেভাবেই গঠন দেন, ঠাকুরমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফাদারের সহযোগিতায় আমাকে বরিশাল হোস্টেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। ঠাকুরদা চেয়েছেন আমি যেন তুমিলিয়া আমার মাসির কাছে যাই। ওখানেই পড়াশুনা করি। ফাদার আমাকে বললেন তুমি বরিশালে সিস্টার হবে। মাকেও মনে হয় তাই বলেছিলেন যার জন্য মা আমাদের একজন আত্মীয়ের সাহায্যে ঠাকুরদাকে রাজি করালেন বরিশালে যাওয়ার জন্য। বরিশাল হোস্টেলের মেয়েদের নিয়মিত আধ্যাত্মিক পরিচালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হতো। বরিশালে স্কুল ধর্ম ক্লাস দিতেন L.H.C সিস্টারগণ এবং মাঝে মাঝে মাদার আলফন্স। মাদার আলফন্স হলেন L.H.C সংঘের সহ-প্রতিষ্ঠাত্রী। মাদারকে খুব ভালো

লাগতো। সংঘে প্রবেশের আগে দেড় বছর তুমিলিয়া সেন্ট মেরিসে ছিলাম টিচার হিসাবে। তখন সিস্টার লিলিয়ানকে দেখে উৎসাহ পেয়েছি আর মাদার আলফন্সের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতাম চিঠি লিখে। মাদারও লিখতেন আমাকে।

আমার বাল্যকাল

আমার বাল্যকাল কেটেছে কোলকাতায়। সেন্ট ট্রিজা গীর্জার সাথেই ছিলো স্কুল। ডটারস অফ সেন্ট এ্যান সিস্টারগণ আমাদের পড়াতেন। ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীতে দুইমাস পড়ি এরপর আমরা পাদ্রিশিবপুর চলে আসি। মাসে ২ বার ক্লাস-ওয়ারি লাইন করে পাপস্বীকার করতে যেতাম। বাবা প্রায়ই আমাদের দু'বোনকে খেলার মাঠে নিয়ে যেতো। একবার দোলনা থেকে পড়ে যাই। সেদিন বাবা বোনকে হাঁটিয়ে নিয়ে আমাকে কোলে নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন। সেদিন ভয় আর ব্যাথা নিয়ে বাবার কাঁধে মাথা রেখে বুকে লেপটে থাকা সেই স্মৃতি আমার জীবনে কঠিন সমস্যা হতাশা নিরাশায় দিশেহারার কালে আমাকে আরাম আর শান্তি দিয়েছে। মনে পড়ে আমার নিজের ঠাকুরমা ছিলেন না। বাবার একজন কাকীমাকে আপন ঠাকুরমা জানতাম। বেশ কয়েক মাস এই ঠাকুরমার কাছে ছিলাম। ঠাকুরমা প্রতিদিন গীর্জায় যেতেন আর আমাকে নিয়ে যেতেন মাসের প্রথম শুক্রবার ও শনিবার।

স্কুলে ছিলাম যীশুর সেবক-সেবিকার দলে। প্রতি দলে দু'জন করে লিডার ছিল। এই লিডারদের প্রতি বৃহস্পতিবার সিস্টার মিরিয়াম, সিএসসি আর শোভাদি প্রস্তুত করতেন যাতে পরের রবিবার দলের মধ্যে মিটিং পরিচালনা করতে পারি। দলে কে কত ক্ষুদ্র প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার, ভাল কাজ, সাক্রামেন্তের সাক্ষাৎ করেছে, পরিবারে প্রার্থনা করেছে ইত্যাদি নিয়ে আলাপ হতো। প্রস্তুত করানো ধর্মশিক্ষা নীতি শিক্ষা দিতাম আর দলে সিদ্ধান্ত নিতাম অসুস্থ্যদের বাড়িতে গিয়ে তাদের ঘর পরিস্কার, লেপা চারপাশ পরিস্কার ইত্যাদি কাজ করবো। এ সবই জীবন গঠনের অংশ।

প্রৈরিতিক কাজের কিছু অভিজ্ঞতা ও চ্যালেঞ্জ

সমতলে বেশির ভাগ এবং অল্প কয়েক বছর পাহাড়ে সেবা দিয়েছি। নারিকেল বাড়ি সে সময়ে ছিল বিল অঞ্চল যাতায়াতের একমাত্র বাহন নৌকা। বর্ষার সময় ধানের জমি সব জলের নিচে। চারিদিকে তাকালে বিশাল সমুদ্র, বাতাসে সামান্য ঢেউও উঠতো। নৌকায় উঠলেই বমি হতো সেজন্য নৌকায় উঠতে ভয় পেতাম। তারপর তো অভ্যাস হয়ে গেল ৪ টি উপকেন্দ্রে যেতাম মোবাইল ক্লিনিক করতে মাসে একবার। দুরত্ব ৯ মাইল, ৫ মাইল আর ৭ মাইল। শুকনোর কয়েকমাস হাঁটতে হতো। আমি একা নই ডাক্তারখানার দলে মাঝি সহ ৪ জন। অন্য সিস্টারগণও প্রৈরিতিক কাজে ১০ থেকে ১৫ দিন এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে কাজ সেরে আসতেন। ভরা বর্ষায় জোৎস্না রাতে পানসীর ছাদে গিয়ে রোজারি মালা করতাম তারপর গান। বাতাস পক্ষে থাকলে পাল তুলে ৮ ঘন্টার পথ অবিশ্বাস্যভাবে ২ ঘন্টায় চলে এসেছি। পালের দড়ি দক্ষ হাতে ধরে রাখতেন নার্স মার্টিনাদি। তখন অভিজ্ঞতা করেছি জীবন নৌকার পালের দড়ি দক্ষ হাতেই রাখতে হবে। আমার তিনজন নার্সই ছিলেন বিধবা। সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে এরা কখনই বিয়ে করতে রাজী হয়নি আর বিশ্বস্তভাবে আনন্দ নিয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন। এদের দেখে আমি প্রেরণা পেয়েছি আমার ব্রতজীবনে বিশ্বস্ত থাকতে। রাবেয়া খানম ছিলেন একজন ভাল ধাত্রী। আমার নিজের ধাত্রী ট্রেনিং ছিল না। কিন্তু রাবেয়ার প্রতিটি

ডেলিভারি কাজের সময় আমাকে রোগীর পাশে থেকে রোজারি মালা করতে হতো যাতে "বিবি মরিয়ম" তার কাজ সহজ ও নিরাপদ করেন। রাবেয়ার নামাজ রোজা কখনো বাদ যেত না।

পাদ্রিশিবপুরে ডাক্তারখানার দায়িত্বের সাথে আমাকে প্রৈরিতিক কাজের দায়িত্ব দেয়া হয় উজ্জলা মহিলা সমিতির দেখাশুনা করার জন্য। এরা পাটের জিনিস তৈরি করতো-একশোর উপরে ছিল সদস্য। হিসাবের জন্য সাহায্য দিতে হতো। এছাড়া সব কাজই তারা দায়িত্বশীল ভাবে সম্পন্ন করতো। আমি অবাক হতাম কিভাবে এই অল্প শিক্ষিত মহিলারা আয় সৃষ্টিকারী প্রকল্প চালিয়ে নিচ্ছে। আমার কাজ ছিলো তাদের নৈতিক শিক্ষা দেওয়া, মাসে একবার আন্তঃধর্মীয় সভা করা আর প্রেরণা ও সমর্থন দেয়া। এই সময়ে সংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় বিশপ লারোজকে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়। প্রতি সোমবার বিকাল ৩ টায় তিনি আমাদের ক্লাশ নিতে সিস্টার বাড়িতে আসতেন। তার নিয়মানুবর্তিতা, তার প্রার্থনার জীবন, বাধ্যতা, নম্রত কষ্ট সহিষ্ণুতা আর আধ্যাত্মিক ক্ষমতার প্রকাশ এসবের সাক্ষী হয়েছি।

একই সময়ে প্যারিশে ছিলেন ফাঃ লাবে পালক পুরোহিত ও ফাঃ প্যাট্রিক (বর্তমানে কার্ডিনাল)। এই সময়ে ওয়ার্ডে ক্ষুদ্র খ্রিস্টিয় সমাজে ও ক্যারিজ ম্যাটিক প্রার্থনা শুরু হয়। এসময়ে অভিজ্ঞতা করেছি সক্রিয় পালক পুরোহিতের ভূমিকা এবং যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও কাটেখিষ্ট সম্পৃক্ত থাকলে সে কাজে খ্রীস্টভক্তগণও আন্তরিকতা নিয়ে জড়িত হয়।

ব্রতীয় জীবনে ও সংঘবদ্ধ জীবনকে আপনি কিভাবে দেখেন?

সংঘবদ্ধ জীবনে আশ্রমের এবং সংঘের সকল ভগ্নির জন্য আন্তরিক ভালোবাসা থাকবে এবং এর জন্য যে যেমন আছে তাকে সেভাবেই গ্রহণ করতে হবে-মনে প্রাণে। এই আন্তরিকতা না থাকলে ব্রতজীবনের ব্যাঘাত হবে। আমরা এক সঙ্গে মিলে পুনরুত্থিত খ্রিস্টকে খুঁজছি।

আদর্শ ব্রতধারী হতে-আমার জন্য গুরত্বপূর্ণ দিক হলো

* সমস্যায় হতাশা নিরাশায় প্রথম আশ্রয় হলো-আরাধ্য সাক্রামেন্তে উপস্থিত যীশু।
* কর্তৃপক্ষের প্রতি অন্ধ আনুগত্য যতক্ষণ না আমার বিবেকের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে বলা না হয়। নম্রতা চর্চার জন্য এর চাইতে ফলপ্রসূ ক্ষেত্র আর হয় না।
* সরল এবং খোলা মন।
* নিয়মিত ভাবে আধ্যাত্মিক গুরুর সাথে সাক্ষাৎ

জীবনের মূলমন্ত্র

জীবনের মূলমন্ত্র নিয়ে কোনদিন চিন্তা করিনি-কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যখন সে লক্ষ্য সামনে এসেছে তা পূরণ করে আবার নতুন লক্ষ্যে এগিয়েছি।

অবসর সময়ে

বই পড়া, গান শোনা সাথে ছেড়া কাপড় সেলাই করা।

মন্ডলী ক্ষুদ্র সেবিকা সংঘের কাছে আমার প্রত্যাশা সংঘের অনুগ্রহদান ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে জীবন যাপন করে সংঘের ভগ্নিগণ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে তাদের মেধা দক্ষতা সম্পূর্ণ ঢেলে ঐশ্বরাজ্য প্রতিষ্ঠায় যত্নশীল ও বিশ্বস্থ হবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

আমার নিজের কোন পরিকল্পনা নেই। কর্তৃপক্ষ আমার জন্য যা ভাল মনে সেই কাজে আমার এই বয়সে মঙ্গল সমাচারের সেই বিধবার মত আমিও চেষ্টা করর আমার সাধ্যমত উজাড় করে দিতে।

যুব সমাজের কাছে আমার প্রত্যাশা

যুবরা যেমনই হোক না কেন সেই অবস্থায়ই ঈশ্বর তাদের ভালবাসেন সে ভালবাসা উদার ও শর্তহীন। ঈশ্বরের এই ভালবাসা যেন যুবরা উপলব্ধি করে-

* বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব থেকে যুবসমাজ যেন নিজেদের মুক্ত রাখতে পারে-
* আমাদের ঐতিহ্য কৃষ্টি সংস্কৃতি রক্ষার দায়িত্ব তারা অনুভব করবে-
* যুব সমাজ তাদের যৌবনের ভালোবাসা ও শক্তি দিয়ে তাদের পরিবার সমাজ ও মন্ডলীর জন্য যুবক যীশুর মত জীবন ব্যয় করবে। সমাজে দুর্বলদের প্রতি আর পরিবারে বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের প্রতি যত্নশীল হবে।

সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত

জন্ম ও পরিবার:

সিস্টার আরতি ডেলফিনা ডি'কস্তা, এল এইচ সি-এর জন্ম হয় পাদ্রীশিবপুরে ১৪ই জানুয়ারি, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ, পাদীশিবপুর, বরিশাল। তাঁর পিতা প্রয়াত মৃত: হিউবার্ট ডি'কস্তা এবং মাতা ডরথী ডি'কস্তা। পরিবারে তারা তিনবোন ও দুই ভাই।

শিক্ষা জীবনঃ

১ম শ্রেণী – সেন্ট ট্রিজা স্কুল; কোলকাতা-১ম ও ২য় শ্রেণী, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী পড়েনি

৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণী: পাদ্রীশিবপুর সেন্ট যোসেফ স্কুল; ৭ম-১০ম শ্রেণী এস.এস.সি প্রভাতী গার্হস্থ বিদ্যালয় বরিশাল

অন্যান্য: সিনিয়র নার্সিং-ঢাকা হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল

এল.এইচ.সি. গঠন ও জীবন

এল.এইচ.সি. নব্যালয়, সাগরদি, বরিশাল: ২৫/০১/১৯৬৭-২৫/০৭/১৯৬৯

প্রথম ব্রতগ্রহণ: ২৫/০৭/১৯৬৯ বরিশাল ধর্মপল্লী; আজীবন ব্রত গ্রহণ: ০২/০৮/১৯৭৭ বরিশাল ধর্মপল্লী; রজত জয়ন্তী পালন: ১৯৯৪ খ্রীষ্টবর্ষ বরিশাল ধর্মপল্লী; সুবর্ণ জয়ন্তী পালন: ৫/০৭/২০১৯ বরিশাল ধর্মপল্লী

কর্মজীবনঃ

নারিকেল বাড়ি ধর্মপল্লী: ডাক্তার খানায় ১৯৭৫-১৯৭৮ – ৪ বছর

পাদ্রিশিবপুর ধর্মপল্লী: ১৯৭৯-১৯৮৫ – ৭ বছর, ফাতিমা স্বাস্থ্য কেন্দ্র

- পাদ্রিশিবপুর ফাতেমা স্বাস্থ্য কেন্দ্র ডাক্তার খানার পাশাপাশি
- উজ্জলামহিলা পাট সমিতি– ৭ বছর
- প্যারিশে ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সমাজ দলের সাথে ক্যারিজম্যাটিক দলের সাথে
- বড় মেয়েদের সাথে জীবন শিক্ষা, বিবাহ শিক্ষা

গৌরনদী ধর্মপল্লী: ১৯৮৬ খ্রীঃ ১৯৮৭ খ্রীঃ ইন্ডিয়া ব্যাঙ্গালোর- ৬ মাস- ঘোড়ার পাড় ৬ মাস

১৯৮৮-২০০৪: সংঘে-প্রধান অধ্যক্ষা ১৬ বছর

১৯৮৮-১৯৯৯: নব্যাধক্ষা- ১১ বছর

২০০৫- ঃ ফিলিপাইন- ৪ মাস; ২০০৫-২০০৭ ফেব্রুয়ারি: পাদ্রিশিবপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্র

২০০৭-ফেব্রু:-২০১০-ফেব্রুঃ নব্যাধক্ষা

২০১০-২০১৩ ডিসে-২০১৪ জানু: ঘোড়ারপাড়, গৌরনদী, কলাঝিরি লামা- রোয়াংছড়ি

আশ্রম কর্ত্রী: কলাঝিরি, গৌরনদী, পাদ্রিশিবপুর বিভিন্ন সময়ে।

নবম ভাগ

পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ: অতীত ঐতিহ্যের অ্যালবাম ও রচনা:

সংকলনে ও সম্পাদনে: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

আলোচ্য বিষয়সূচির সারসংক্ষেপ

প্রথম অধ্যায়: ঐতিহ্যগত ম্যাপ, ছবি, লিপিফলক, দ্রব্য-সামগ্রী ও স্মৃতিচিহ্ন

॥ ক ॥ পাদ্রীশিবপুর মিশন বাড়ির ঐতিহাসিক অবস্থান ও প্রতিষ্ঠান (ডিজিটাল ম্যাপসহ)

২০২৪ খ্রিস্টাব্দে মিশনবাড়ির অবস্থান ও চিত্র

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে মিশনবাড়ির অবস্থান ও চিত্র

২০২৪ খ্রিস্টাব্দে: মিশন কম্পাউন্ডের ফটোগুলো

॥ খ ॥ পাদ্রীশিবপুরের অতীত গির্জা ও বিশেষ ব্যক্তিদের ছবি

॥ গ ॥ পাদ্রীশিবপুরের কিছু লিপিফলক ও সমাধিফলক

॥ ঘ ॥ পাদ্রীশিবপুর অতীত গির্জার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কলকাতার দুটো ঐতিহাসিক গির্জা

মুর্গিহাটার গির্জা: কলকাতা আর্চডাইয়োসিসের কাথিড্রাল – পবিত্র জপমালার গির্জা (১৭৯৭)

বৈঠকখানা গির্জা: শোকর্তা জননী মারীয়ার গির্জা (১৮১০)

॥ ঙ ॥ পাদ্রীশিবপুরে ব্যবহৃত পুরনো দ্রব্য-সামগ্রী ও স্মৃতিচিহ্ন

দ্বিতীয় অধ্যায়: অতীতের তথ্য, গবেষণা ও অভিজ্ঞতা মূলক কয়েকটি লেখা

॥ ক ॥ পাদ্রীশিবপুরের আধ্যাত্মিক জীবন (সংশোধিত) – খ্রিস্টফার রবি ডি কস্তা

॥ খ ॥ পাদ্রীশিবপুরের অর্থনৈতিক অবস্থা – পল শিকদার

॥ গ ॥ পাদ্রীশিবপুরের সোনালী যুগ - মার্টিন সি গোমেজ (মার্টিন স্যার)

॥ ঘ ॥ "জয়ন্তী উৎসব: যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও বিবাহিত দম্পতি" – এ্যালেক্সি গোমেজ

॥ ঙ ॥ পথ প্রর্দশিকা কুমারী মারীয়ার গীর্জা – অঞ্জন বাড়ৈ

তৃতীয় অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের প্রয়াত বিশিষ্টজনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

॥ ক ॥ পাদ্রীশিবপুর: প্রয়াত বিশেষ ব্যক্তিবর্গ

(১) রামুয়েল ফ্রান্সিস গোমেজ – পাদ্রীশিবপুরের জনৈক লেখক

(২) ডাক্তার ফ্রান্সিস গোমেজ – ফাদার লরেন্স বরুণ গোমেজ

(৩) আঞ্জেলিনা গোমেজ (জানি মাস্টার) – পাদ্রীশিবপুরের জনৈক লেখক

(৪) মাইকেল নিঙ্গেল ডি' রোজারিও – বিয়াট্রিস গোমেজ

(৫) গাব্রিয়েল লালজন গোমেজ - "দি গ্রাণ্ড ফাদার" – মেরীলিন মীরা গোমেজ

(৬) যোসেফ গোমেজ - স্মরণিকা সেন্ট আলফ্রেড স্কুল রজত-জয়ন্তী – ১৯৫৮

(৭) সিলভেস্টার গোমেজ (স্যার) – আমি যেমন দেখেছি – খ্রীষ্টফার রবি ডিঃ কস্তা

(৮) ভেনানসিও ডি কস্তা – অতীতের স্মৃতি – মিসেস লিলি ঊষা গোমেজ

(৯) ছিছিলিয়া উর্ছি গোমেজ – মেরী রেনু গোমেজ

(১০) ভিনসেন্ট গোমেজ – বুলবুল গোমেজ, স্বপন গোমেজ ও নির্মলা গোমেজ

(১১) ব্রিজেট ব্রিতু – জার্মেন তরুন গোমেজ এবং লীলা ডি'কস্তা (কানাডা) এর সৌজন্যে

(১২) লরেন্স সুশীল সরকার – লিলি সরকার

(১৩) জেমস মিলিগেন ডি'রোজারিও – নিপু ডি'রোজারিও

(১৪) আলবার্ট গোমেজ (প্রধান শিক্ষক) – সিস্টার জ্যাকলিন গোমেজ, এস.সি

(১৫) মার্টিন কর্ণেল গোমেজ (মার্টিন স্যার) ডেভিড টমাস গোমেজ ও কিরিট সেবাস্তিন গোমেজ

(১৬) খ্রীষ্টফার রবি ডি'কস্তা – প্রীতি ডি'কস্তা

॥ খ ॥ ভারত: প্রয়াত বিশেষ ব্যক্তি
॥ গ ॥ চট্টগ্রাম: প্রয়াত বিশেষ ব্যক্তি
(১) পিটার পল গোমেজ - বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক – ফাদার টেরেন্স রড্রিক্স
(২) ভিনসেন্ট গোমেজ (ভিআইবি) – মানিক ইলভার ডি'কস্তা ও জুলিয়ান গোমেজ
(৩) উইলসন গোমেজ – অস্কার অর্ক গোমেজ
(৪) ক্যাপ্টেন লিওনার্ড টিটাস গোমেজ – মানিক ইলভার ডি'কস্তা ও জুলিয়ান গোমেজ
(৫) জেরাল্ড রুফাস গোমেজ – মানিক ইলভার ডি'কস্তা ও জুলিয়ান গোমেজ
(৬) বার্নাড ডি'রোজারিও – এমরোজ গোমেজ
(৭) নরবার্ট গোমেজ – এমরোজ গোমেজ
॥ ঘ ॥ ঢাকা: প্রয়াত বিশেষ ব্যক্তি
(১) উইলিয়াম আলবিন গোমেজ – ড. মনিকা গোমেজ
(২) আগষ্টিন গোমেজ – সাক্ষাৎকার গ্রহণে: মিঃ খ্রীস্টফার ডিঃ কস্তা এবং মিঃ যোসেফ ডিঃ রোজারিও
(৩) লুকাছ ডি'রোজারিও – রক ফার্ডিনাণ্ড গোমেজ
(৪) আরনল্ড সি. গোমেজ - জেভিয়ার গোমেজ এবং যোসেফ ডি'রোজারিও
(৫) গাব্রিয়েল মানিক গোমেজ, মাটিভাঙ্গা – সহধর্মিনী শান্তি গোমেজ
(৬) ছিন্তিয়া সরকার – জুলিয়েট লিপিকা সরকার
॥ ঙ ॥ প্রবাসী (আমেরিকা/কানাডা) প্রয়াত বিশেষ ব্যক্তি
দেখুন: এই গ্রন্থের চতুর্থ ভাগে

অবতারণা:

"শ্রীমন্ত-বাটে পাদ্রীশিবপুর ঃ ঐতিহ্যবাহী একটি খ্রিস্টান জনপদ" শীর্ষক গ্রন্থটির নবম ভাগ-এর শিরোনামে রয়েছে: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ: অতীত ঐতিহ্যের অ্যালবাম ও রচনা। পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের রয়েছে একটি দীর্ঘকালীন ঐতিহ্য। গোড়াপত্তন থেকে শুরু করে ইতিহাসের বহু ঘটনা, মুহূর্ত, স্থাপত্য, সংস্থা-প্রতিষ্ঠান, ভাষা-কৃষ্টি, আচরণ-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত, ধর্মবিশ্বাস, ধর্মাচারণ ও বিচিত্র সেবা, প্রভৃতির মধ্য দিয়ে পাদ্রীশিবপুর সেই ঐতিহ্য ধারণ, বহন ও সঞ্চার করে আসছে। গ্রন্থের এই অংশে আমরা সেই ঐতিহ্যকে কিছুটা হলেও দৃশ্যমান করে তোলার প্রয়াস পাচ্ছি। এই উদ্দেশ্যে প্রথমেই এলাকার ভৌগোলিক চিত্র, অতীত ও বর্তমানের কিছু ছবি, লিপিফলক প্রস্তরফলক, দ্রব্য-সামগ্রী ও স্মৃতিচিহ্ন তুলে ধরছি। দৃশ্যমান করার জন্য প্রকাশ করছি কয়েকজন ব্যক্তির প্রাবন্ধিক কয়েকটি রচনা। দৃশ্যমান করার উদ্দেশ্যে প্রয়াত কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তিকে স্মরণ করছি যারা পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে, দেশের মধ্যে অভিবাসী হয়ে এবং দেশের বাইরে প্রবাসী হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। তারা আজ জীবিত না থাকলেও তাদের জীবন-পরিচিতি ঐতিহ্যকে তুলে ধরছে, তাদের অতীতের জীবন আমাদের কাছে এখনও যেন কথা বলছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের একটি সীমাবদ্ধতা আন্তরিকভাবে স্বীকার করতে চাই: অনেক বিশিষ্টজন পাদ্রীশিবপুরবাসী ছিলেন কিন্তু তাদের নিজেদের তেমন কোনো লেখা পাইনি, তাদের সম্বন্ধে কিছু লেখার সাহসও বর্তমানে অনেকে করেনি – হয় নিজের অপারগতায় নতুবা তথ্যের অপ্রতুলতায়। যাদেরকে আমরা স্মরণ করতে পারছি তাদের নাম কিন্তু বিভিন্ন এফ.জি.ডি দলের আলোচনায় প্রস্তাবিত হয়েছে এবং তাদের বিষয়ে লেখা পাওয়ার সম্ভব হয়েছিল। খুবই আন্তরিকভাবে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই যারা বিভিন্ন স্মরণিকায় বিভিন্ন

ব্যক্তিদের লেখা, হয় সংগ্রহ করে রেখেছেন, অথবা স্মরণিকায় তাদের সম্বন্ধে লেখা প্রকাশ করেছেন, বা যারা আমাদের অনুরোধের ডাকে সাড়া দিয়ে লেখা দিয়েছেন। পুস্তকের এই অংশে তাদেরকে দৃশ্যমান করে রাখার, তাদের কথা শ্রবণযোগ্য করার এবং তাদের পরিচিতি সংরক্ষিত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে, যদিও আমরা স্বীকার করি এ ক্ষেত্রে আমাদের সীমবদ্ধতা।

প্রথম অধ্যায়: ঐতিহ্যগত ম্যাপ, ছবি, লিপিফলক, দ্রব্য-সামগ্রী ও স্মৃতিচিহ্ন

॥ ক ॥ পাদ্রীশিবপুর মিশন বাড়ির ঐতিহাসিক অবস্থান ও প্রতিষ্ঠান

(১) ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে মিশনবাড়ির অবস্থান ও চিত্র (সংযুক্ত ম্যাপ দেখুন)

(২) মিশনবাড়ির অবস্থান ও চিত্র:১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ম্যাপ

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

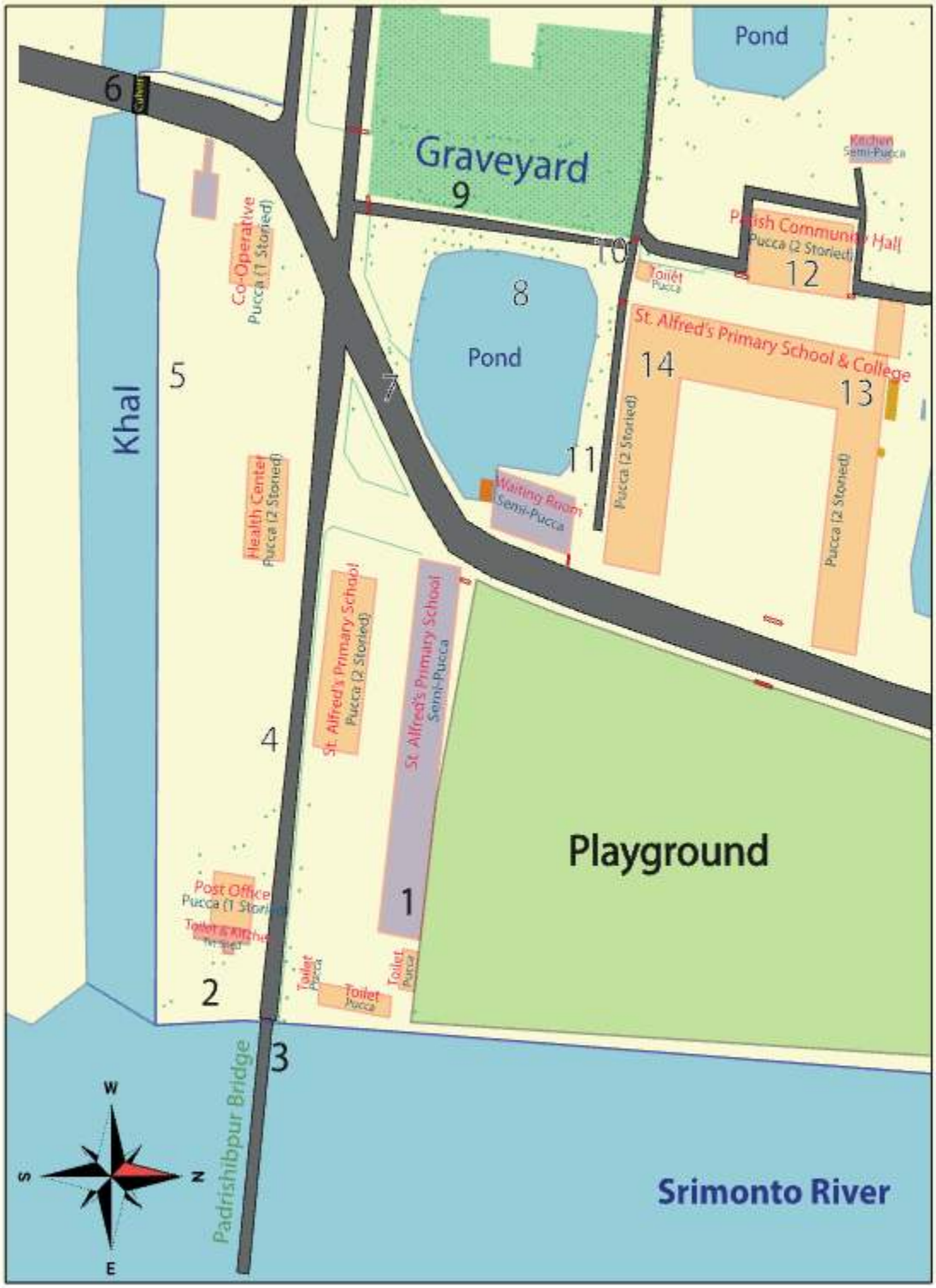
সহযোগিতায় : কিরিট সেবাস্তিন গোমেজ ও ফরহাদ মজুমদার ফাহিম

ভূমিকা:

২০২৪ খ্রিস্টাব্দে পাদ্রীশিবপুরের মিশন প্রাঙ্গণের একটি ডিজিটাল ম্যাপ করা হয়েছে যা এই গ্রন্থে ছাপানো হয়েছে। এই ম্যাপের মধ্যে আছে ভৌগোলিক এলাকা আর আছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও তার নাম। বর্তমানে যে-ভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেখানে আছে সেখানে অতীতে সেভাবে ছিল না। অতীতে কোথায়, কীভাবে, কী কী প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থাপনা ছিল তা জানার মতো কোন ম্যাপ বা পূর্ণাঙ্গ ছবি আমাদের হাতে নেই। তবে যেহেতু পাদ্রীশিবপুরে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ আমার জন্ম, সেহেতু ছোট সময়ে কোথায় কোন প্রতিষ্ঠান ছিল তার একটা ধারণা এখনও আমার স্মৃতিপটে অংকিত হয়ে আছে। তাই বর্তমান ডিজিটাল ম্যাপটির উপর ভিত্তি করে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের কোথায় কী ছিল সেগুলো চিহ্নিত করে অতীতের স্মৃতি থেকে সাধারণ একটি চিত্র ও বর্ণনা তুলে ধরছি। এভাবে কিছুটা হলেও প্রায় ৭৫ বছর আগের পাদ্রীশিবপুর মিশন প্রাঙ্গণের একটা চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

নবম ভাগের প্রথম অধ্যায়ের উপস্থাপনার শুরুতে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে বর্তমানের ডিজিটাল ম্যাপটিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বাম হাতের পৃষ্ঠায় ম্যাপের অংশবিশেষ ছাপানো হয়েছে এবং সেখানে কয়েক জায়গায় নম্বর দেওয়া হয়েছে। সেই নম্বর অনুসারে ডান হাতের পৃষ্ঠায় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে কোন প্রতিষ্ঠান ছিল বা স্থানটি কীভাবে ব্যবহার করা হত তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

Church Premise : MAP No. 1



ম্যাপ নং ১: সেন্ট আলফ্রেড স্কুল ও কলেজ এবং পারিপার্শ্বিক এলাকা – ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে

(১) বর্তমানে লম্বা টিনের ঘরটি ছিল হাই স্কুল। স্কুলটি ছিল "L" আকারে। পূর্ব-দক্ষিণ দিকে প্রথম কক্ষটি ছিল প্রধান শিক্ষকের অফিস; তার উত্তর দিকে দ্বিতীয় কক্ষটি ছিল স্কুলের দাপ্তরিক অফিস; তৃতীয়টি ছিল শিক্ষকদের কক্ষ। তারপরে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত টিনের ঘরে ছিল পাঠদানের শ্রেণি-কক্ষসমূহ, সেভিংস দোকান ও ক্রীড়ার নানা সরঞ্জামাদি রাখার কক্ষ। পশ্চিমে শেষ কক্ষটি ছিল দশম শ্রেণির ছাত্রদের জন্য।

(২) এখানে পোস্ট অফিস ছিলনা। তবে ঐ সময়ে চারটি কক্ষবিশিষ্ট সেমি-পাকা টিনের ঘর ছিল যা প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রদের জন্য ব্যবহার করা হত। এখানে আমি নিজেও ক্লাশ করেছি। পূর্বদিকে অবস্থিত শ্রীমন্ত নদীর পাড়ে এবং পশ্চিমের দিকে খালের পাড়ে স্কুলের ছাত্রদের জন্য একটা টয়লেট ছিল।

(৩) ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমন্ত-নদীর উপর কোন ব্রিজ ছিলনা। সিমেন্ট দ্বারা বাধানো একটি ঘাট ছিল। ওখান দিয়েই নৌকাযোগে শ্রীমন্ত নদীতে এপার-ওপার যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

(৪) এই স্কুলের পশ্চিম দিকে খোলা মাঠ ছিল সেখানে স্কুলের "ডি" ও "ই" টিমের ছেলেরা ফুটবল খেলতো। আমিও এখানে ফুটবল খেলেছি। পুরনো সরকারি হাসপাতাল ছিল এখানে, টিনের ঘরের ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে।

(৫) পশ্চিম খাল ঘেষে রাস্তার দক্ষিণ পাশে তিনটি টির্চাস কোয়ার্টার ছিল যেখানে আমাদের সময়ে শতীষ স্যার, নগেন স্যার এবং চিত্ত স্যার তাদের পরিবারসহ বাস করতেন।

(৬) ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে সুইজ গেইটের জায়গায় পাকা ইটের পুল ছিল।

(৭) তখন এ রাস্তায় কোন গাড়ি চলতো না। হুইটলি সাহেবের বাড়ির সামনে দিয়ে রাস্তাটি সোজা দক্ষিণে এসে হাসপাতালের সামনে দিয়ে সোজা গির্জার বড়ো গেইট বরাবর চলে যেতো। ফলে কাচারি পুকুরের দক্ষিণ দিকে আরেকটি মাঠ ছিল যেখানে "সি" টিমের ছাত্ররা ফুটবল খেলতো।

(৮) কাচারি পুকুর: এই পুকুরের পানি সারা গ্রামের জন্য ছিল পানীয় জল। গ্রামের লোকেরা এখান থেকে কলস ভরে পানি বাড়িতে নিয়ে যেত। আমিও বাড়ি থেকে কলস নিয়ে আসতাম এবং সেটি নিরাপদ জায়গায় রেখে খেলাধূলা করতাম এবং বাড়ি চলে যাওয়ার সময় মাথায় করে এক কলসি পানি নিয়ে যেতাম।

(৯) কাচারি পুকুরের পশ্চিমে এবং কবরস্থানের দক্ষিণ দিকে খোলা জায়গা ছিল। সেখানে ছোট ছোট বাগান করার জন্য প্লট ছিল এবং স্কুলের ছাত্ররা হাতেকলমে কৃষিকাজের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করতো।

(১০) এই জায়গায় একটি গোলপাতার ছাউনি দিয়ে একটি গোল ঘর ছিল যেখানে প্যারিশের সেবক-সেবিকা সংঘের এবং ওয়াই.সি.এম-এর মিটিং হত এবং তাদের অফিসের জিনিসপত্র রাখা হত।

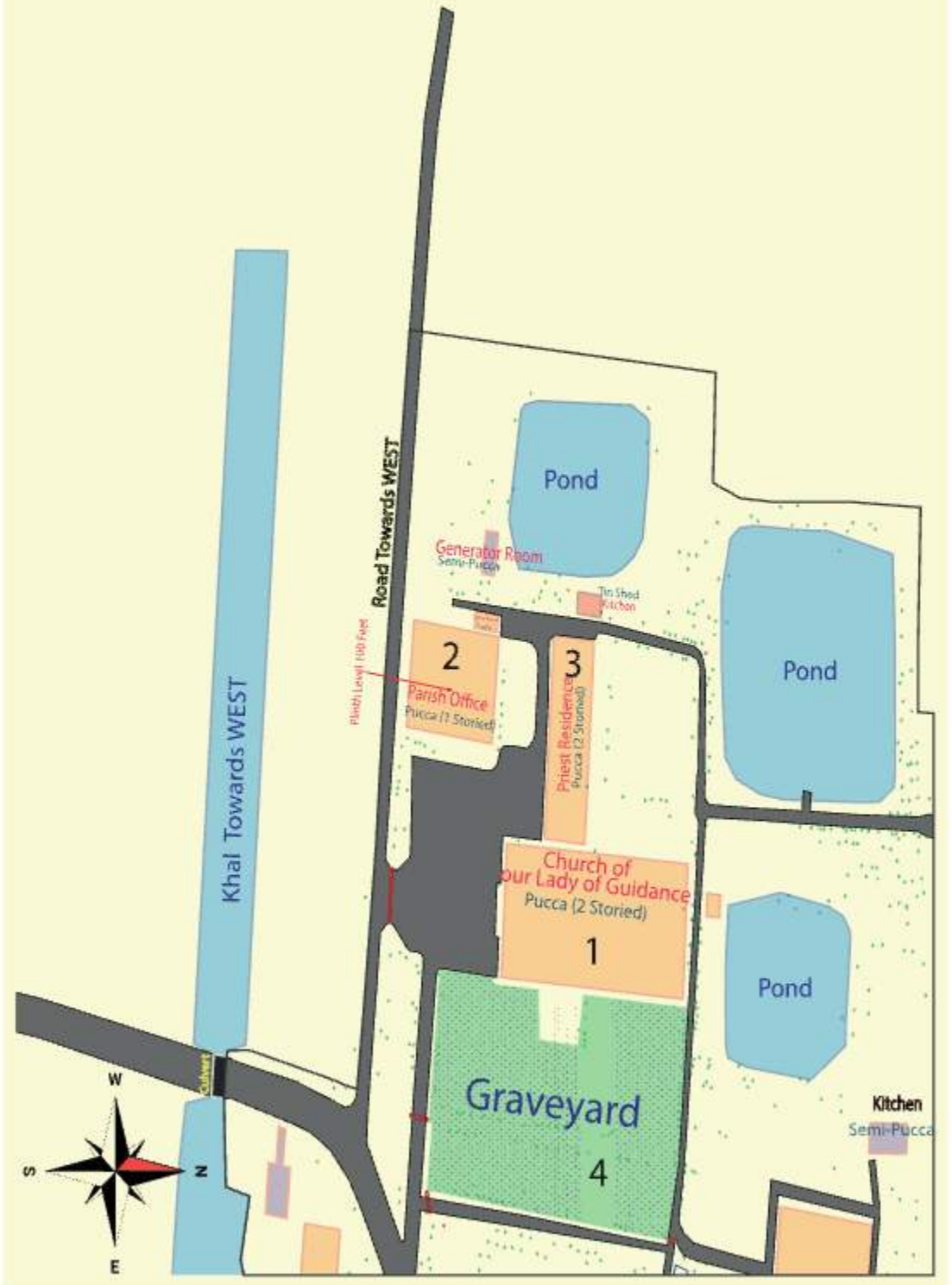
(১১) কাচারি পুকুরের উত্তর দিকে এবং গিলবার্ট হুইটলি সাহেবের দক্ষিণ দিকে একসারিতে প্রায় পাঁচ/ছয়টি দোকান ছিল। অধিকাংশই খ্রিস্টানদের দোকান। পরবর্তীতে নিউমার্কেটে স্থানান্তরিত হয় অথবা অবলুপ্ত হয়।

(১২) এই পাকা দালানটিকে বলা হত গিলবার্ট হুইটলির বাড়ি, উনি জাতিতে ছিলেন স্কটল্যান্ডবাসী। ঐতিহাসিক তথ্য অনুসারে এই বাড়ির আদি নাম ছিল "পিটার ডি'সিলভার বাড়ি" যিনি পাদ্রীশিবপুরের একজন জমিদার ছিলেন। তখনকার প্রযুক্তি অনুসারে দালানের নিচে ফাঁকা রাখা হত। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে দালানের সামনে পূর্বদিকে সম্পূর্ণ খোলা ছিল।

(১৩) ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ও পশ্চিম দিকে দ্বিতলা ভবন নির্মিত হয়। তখন থেকে পুরনো টিনের স্কুল (১) প্রাইমারী রূপে ব্যবহৃত হতে থাকে।

(১৪) ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ দিকের তিনতলা দালানটি নির্মাণ করা হয় যা জুবিলী ভবন নামে পরিচিত।

Church Premise : MAP No. 2



ম্যাপ নং ২: গির্জা, প্যারিশ অফিস, ফাদারদের বাসগৃহ এবং কবরস্থান

(১) বর্তমানের পথ-প্রদর্শিকা কুমারী মারীয়ার গির্জাটি নির্মাণ করা হয় ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে। এটা তৃতীয় গির্জা। দ্বিতীয় গির্জাটি ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে একই জায়গায় নির্মিত হয়েছিল যার ছবি এ্যালবামে দেওয়া আছে। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথম গির্জাটিও এ জায়গাতেই অতি ছোট্ট পরিসরে তৈরী হয়েছিল । দ্বিতীয় গির্জার সম্মুখ ভাগের চত্তরটি বড়ো রাখার জন্য, ১২ ফিট পেছনে নিয়ে বর্তমান গির্জাটি নির্মাণ করা হয়। একই সময়ে পুরো চত্তরটা ইট দিয়ে পাকা করা হয়। গির্জা ঘরের সাথে সংযুক্ত রয়েছে পূর্বদিকে মা মারীয়ার একটি গ্রটো। এটাও ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করা হয়।

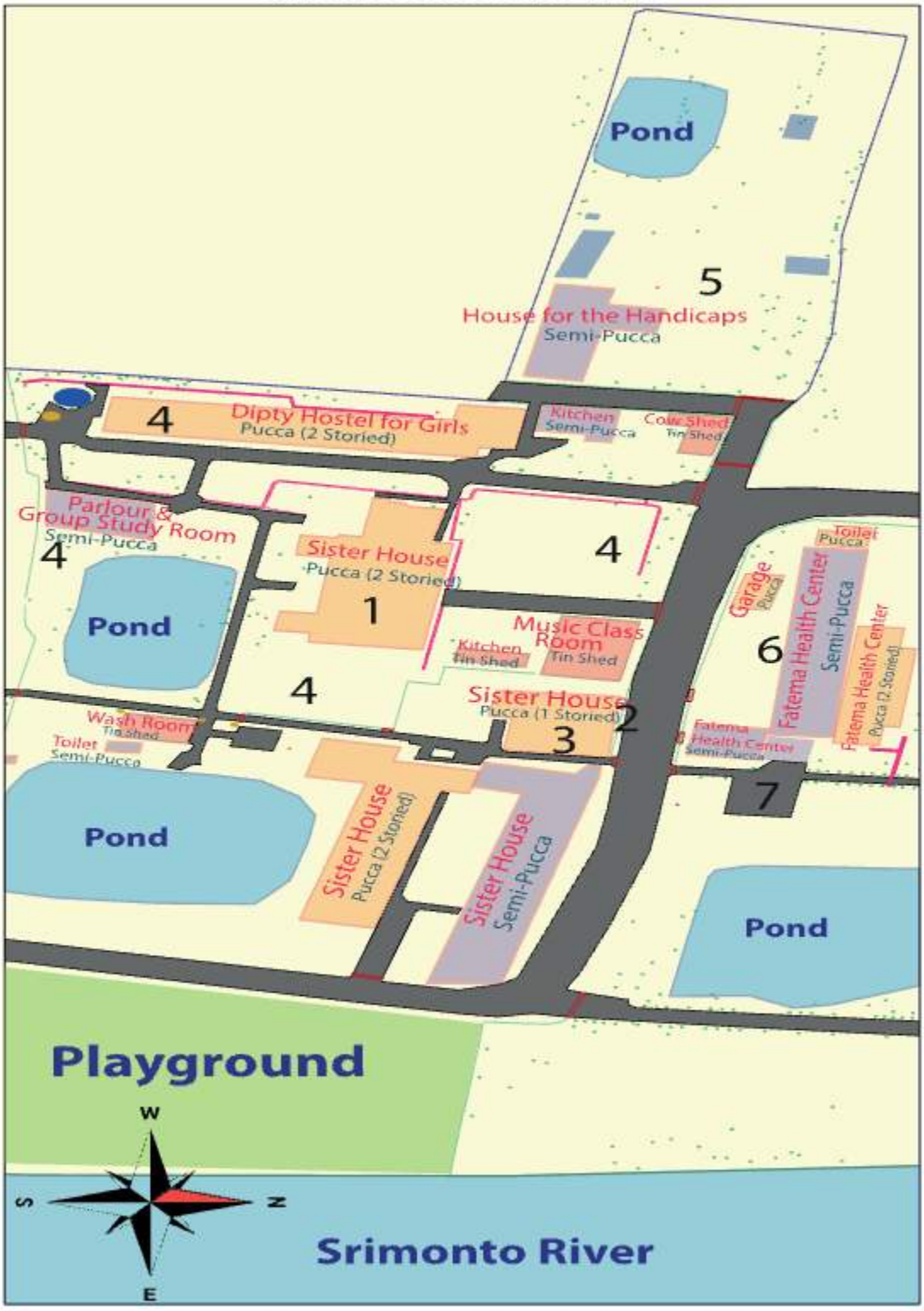
(২) এই ঘরটিই ছিল ফাদারদের বাসগৃহ যেখানে ফাদারদের থাকা-খাওয়া ও অফিস ঘর ছিল। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ঘরটির বাহ্যিক আকার যেভাবে ছিল এখনও সেইভাবে আছে। তবে নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না এই ঘরটি কখন নির্মাণ করা হয়েছিল। তবে অনেকের মতে হয়তো প্যারিশের জন্ম থেকে এই ঘরটি ছিল। ঘরটি দীর্ঘকাল ধরে স্থায়ী আছে এই কারণে যে, ঘরের নিচের অংশ ফাঁকা রেখে মোটা ওয়ালের উপর নির্মাণ করা হয়েছে যাতে ঘরটি স্যাতসেতে না হয় এবং স্থায়ী থাকে।

(৩) দ্বিতলা বিশিষ্ট দালানটি ফাদারদের বাসগৃহ। উপরতলা নির্মাণ করা হয়েছিল ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে। নিচের তলা মনে হয় তারও অনেক আগে থাকতে ছিল। মনে আছে যখন শিশু ছিলাম তখন এখানে প্রাইমারী স্কুল ছিল এবং কানাডিয়ান সিস্টারগণ আমাদের ক্লাশ নিতেন।

(৪) কবরস্থানটি প্যারিশের গোড়াপত্তন থেকেই রয়েছে তবে অতীতে ছিল ছোট্ট আকারে। গ্রোটোর পেছনের দিক পর্যন্ত পূর্বদিকে কবর স্থানের বড়ো ক্রুশটি ছিল। পেছনে যে জায়গা ছিল সেখানে কয়েকটি তালগাছ ছিল আর যারা অপমৃত্যু হয়ে বা দীক্ষাস্নান ব্যতিত মারা যেত তাদেরকে ঐ এলাকায় সমাধিস্ত করা হত। পরবর্তীতে কবর পেছনের দিকে বর্ধিত করায় বড়ো ক্রুশ পেছনে সরানো হয় তখন সবাইকে মাটি দেবার জন্য উন্মুক্ত হল।

আবার আরেকটি সময়ে কবরস্থানের সীমানা বাড়িয়ে পূর্বদিকে কবরস্থান বড়ো করা হয় এবং বর্তমানের প্রাচীরটি করা হয়। যার পাশ দিয়ে শুধু স্কুলে যাওয়ার একটি রাস্তা রাখা হয়।

Church Premise : MAP No. 3



ম্যাপ নং ৩: সিস্টার বাড়ি ও ডি'সিলভা বাড়ি – ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে

সিস্টারদের কম্পাউন্ডে, তাদের বাসগৃহ ছাড়া আরও অনেক প্রতিষ্ঠান ছিল, অনেকটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, আবার নতুন প্রতিষ্ঠান হয়েছে। এখানে তিনটি ধর্মসংঘের সিস্টারগণ বাস করেছেন। উনিশশত চল্লিশ ও পঞ্চম দশকে সিস্টার বাড়ীতে অনেক কার্যক্রমের বিবরণ আছে কিন্তু ঠিক কোন স্থানে কী কার্যক্রম করা হত, তা আমাদের জানার তেমন সুযোগ ছিলনা। তথাপি যতটুকু আমি জানি সেটাই লিপিবদ্ধ করছি। এই বর্তমান ম্যাপে যেখানে দিপ্তী হোস্টেল, গান শেখার ঘর, গ্রুপ স্টাডি হল ও পার্লার, লরেটো সিস্টারদের ঘর, সেমি পাক্কা লম্বা ঘরটি, ইত্যাদি ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ছিল না।

(১) ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে সিস্টারদের এই ঘরটি নির্মিত হয় যেখানে হলিক্রস সিস্টারগণ বাস করতেন। এটাই সবচেয়ে পুরনো ঘর। এটিই আবার এক সময়ে দিপ্তী হোস্টেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখন এলএইচসি সিস্টারগণ বাস করেন।

(২) এটিও একটি পুরনো ঘর যেখানে মহিলাদের নিয়ে কার্যক্রম করা হত: যেমন "বাসন্তিকা ক্লাব", হস্ত শিল্প, পাটের কাজ, নারকেলের ছোবা দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরীর কাজ করা হত।

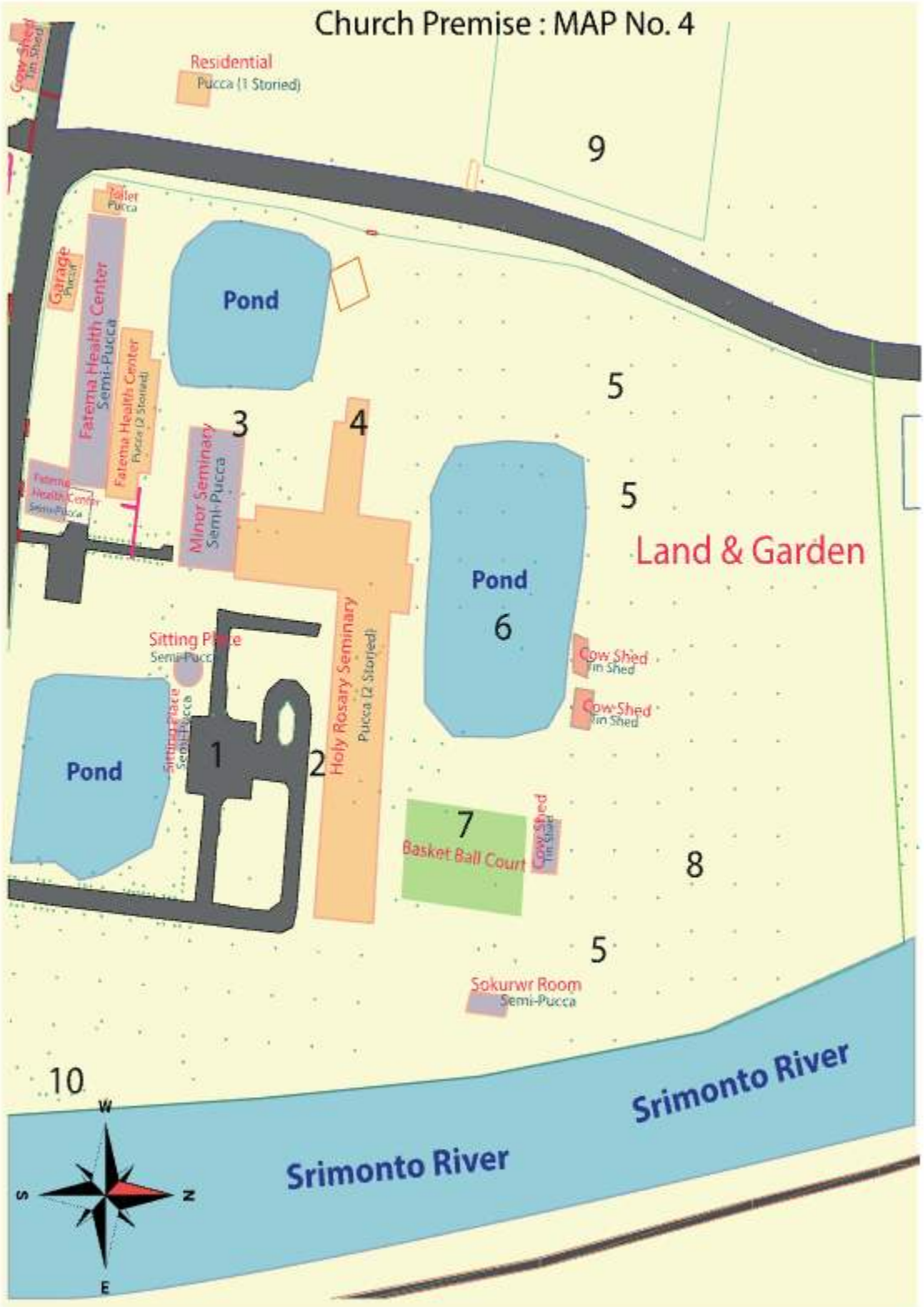
(৩) ফাতিমা স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি সিস্টারদের কম্পাউন্ডেই ছিল। আমার মনে আছে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে সোনাতলার জলোচ্ছাসের পর কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে হলিক্রস সিস্টারগণ, যদিও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোন বেড ছিলনা, তথাপি তাদের কাছে রেখে আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছেন।

(৪) তবে সিস্টার বাড়ির মধ্যে অন্যান্য যে প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রম হত তা হচ্ছে: নার্সদের ট্রেনিং স্কুল, মেয়েদের স্কুল (৬ষ্ট শ্রেণি পর্যন্ত), মেয়েদের হোস্টেল, ধাত্রী ট্রেনিং স্কুল, "লেডি ডাক্তার খানা", শিশু ক্লিনিক, ইত্যাদি।

(৫) এই জায়গাটা ছিল ডি'সিলভাদের বাড়ি। ওখানে একটি দালান ছিল। আবার একইভাবে নির্মাণ করা নিচে ফাঁকা, কিন্তু লাকরি ও অন্যান্য দামি নয় এমন জিনিসপত্র রাখা হত। আর উপরে ছিল বাসগৃহ যেখানে ডি'সিলভাদের ঘর ছিল। তারা এখান থেকে চলে যাওয়ায় পরে জায়গাটি ন্যাশনাল এস.ভি.পি সোসাইটি ক্রয় করে নেয় যখন মার্টিন সি. গোমেজ স্যার কিছু দিন ভাড়া থাকতেন। এ্যালবামে ঘরের একটা ছবি আছে। পরবর্তীতে দালান ভেঙ্গে ফেলা হয়, খামার হিসেবে মিশন কর্তৃক ব্যবহার করত এবং যে-জায়গার একটি কোনে পাদ্রীশিবপুরের ফাদার ফিলিপ ডি'রোজারিও কর্তৃক প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি কেন্দ্র করা হয়।

(৬) আমার যতটুকু মনে হয়, বর্তমানে যে-জায়গায় "ফাতেমা স্বাস্থ্যকেন্দ্র" আছে সেখানে শুরু থেকে সেখানে ছিল না। ওটা তখন সেন্ট যোসেফ ব্রাদার বাড়ি ও বোর্ডিং-এর কম্পাউন্ডের মধ্যে ছিল।

(৭) তারই পূর্ব পাশে আছে একটি মঠ। কোন্ সময়ে এটি করা হয় তা বলা যায় না। তবে এটি হিন্দুদের একটি মঠ। এক সময়ে এই মঠকে সংস্কার করে সাধু যোসেফের মূর্তি রাখা হয় এবং ঐ সময়ে থেকে মঠটি সাধু যোসেফের মঠ বলে পরিচিত এবং এখানে প্রতিবছর ১৯শে মার্চ, মণ্ডলীর প্রতিপালক সাধু যোসেফের পর্ব উপলক্ষে প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়।


Church Premise : MAP No. 4
Residential
Pucca (1 Storied)
9
Toilet
Pucca
Garage
Pucca
Fatema Health Center
Semi-Pucca
Fatema Health Center
Pucca (2 Storied)
Pond
5
3
4
Minor Seminary
Semi-Pucca
Fatema
Health Center
Semi-Pucca
5
Land & Garden
Pond
6
Holy Rosary Seminary
Pucca (2 Storied)
Sitting Place
Semi-Pucca
Cow Shed
Tin Shed
Cow Shed
Tin Shed
Pond
1
2
Sitting Place
Semi-Pucca
7
Basket Ball Court
Cow Shed
Tin Shed
8
5
Sokurwr Room
Semi-Pucca
10
Srimonto River
Srimonto River
W
S
N
E

ম্যাপ নং ৪: হলিক্রস ব্রাদারদের বাসস্থান ও সেন্ট যোসেফ বর্ডিং – ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে পুরো এলাকাটা ছিল হলিক্রস ব্রাদারদের বাড়ি এবং ছেলেদের জন্য সেন্ট যোসেফ বর্ডিং। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ডি'সিলভাদের কাছ থেকে ব্রাদারগণ জমি ক্রয় করেন। এখানে হলি ক্রস ব্রাদারগণ ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাস করেন পরবর্তীতে ত্যাগ করেন এবং ব্রাদার মরভিন ব্যাপ্টিস্ট, সিএসসি ফাদার বাড়িতে আরও ৩/৪ বছরের মতো পাদ্রীশিবপুরে ছিলেন। বিগত শতাব্দীর ষাট দশকের শুরু থেকে প্রথমে "পাদ্রীশিবপুর এগ্রিকালচারাল একস্টেনশন সেন্টার" শুরু হয় এবং "এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার" (এডিসি) আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে এবং এই জায়গাতেই সকল কৃষি-বৈপ্লবিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। অনাথদের জন্য সেন্ট যোসেফ হোম শুরু হয় ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে। ধর্মপ্রদেশীয় হলি রোজারি সেমিনারিটি শুরু হয় ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে এবং সেমিনারির নতুন ত্রিতল ভবন এবং আঙ্গিনার সংস্করণ হয় ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে। আজ পর্যন্ত তা চলমান আছে এবং তার অবস্থান ম্যাপে দেখা যাচ্ছে। আমি ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরছি। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে, তৎকালে অবস্থিত সেন্ট যোসেফ বোর্ডিং-এ আমি ১৯৫৮-১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরো চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ থেকে আসা ৬০ জনের সাথে বাস করেছি।

(১) এই জায়গাতেই ছিল একতলা বিশিষ্ট একটি পাকা ঘর যেখানে এক সময় ৬/৭ জন হলিক্রস ব্রাদার একসঙ্গে থাকতেন। কক্ষ কম থাকায় পশ্চিম দিকে সেমি পাকা টিনের ঘর ছিল যেখানে ৫ টি কক্ষ ছিল যেখানে তিন জন ব্রাদার থাকতেন এবং একটি কক্ষ ছিল যেখানে বোর্ডিং ছেলেদের জন্য টাইপিং শিক্ষা দেওয়া হত। আমিও নিজে এখানে টাইপিং শিক্ষা গ্রহণ করে হাত পাকা হয়েছে।

(২) এখানে ছিল ব্রাদারদের রান্নাঘর ও গুদাম ও যন্ত্রপাতি রাখার ঘর।

(৩) ১৯৩০ দশক থেকে এই ঘরটি ছিল ব্রাদারদের এবং বোর্ডিং-এ ছেলেদের প্রার্থনা-ঘর বা চ্যাপেল। নিয়মিতভাবে এখানে খ্রিস্টযাগ ও রোজারিমালা ও অন্যান্য প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হত। বাহ্যিকভাবে সেই ঘরটি এখনও দাঁড়িয়ে আছে যদিও ব্যবহার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, যেমন থাকার ঘর, গুদাম ইত্যাদি।

(৪) এখানে ছিল টিন দ্বারা তৈরি বোর্ডিং-এর খাওয়ার ঘর এবং রান্নাঘর। পরবর্তিতে ছেলেদের সংখ্যা কম থাকায় খাওয়ার ঘর ও রান্না ঘর ৫ নং এলাকায় স্থানান্তরিত হয়।

(৫) পুকুর পাড়ের উত্তর-পশ্চিমে ছিল শোবার ঘর এবং উত্তর-পূর্বে ছিল স্টাডি হল এবং পূর্ব সীমানায় শ্রীমন্ত নদীর কাছাকাছি ছিল টয়লেট।

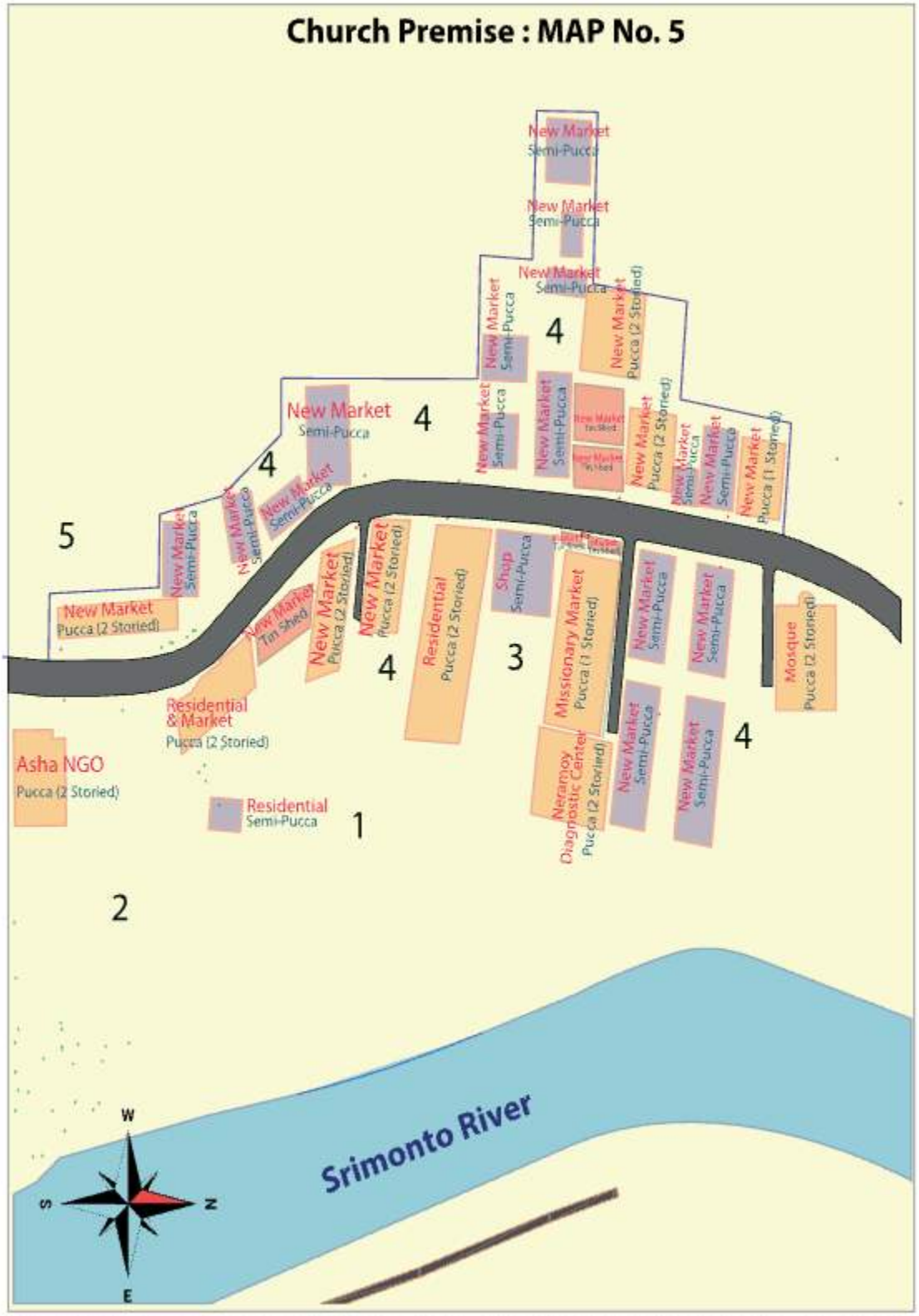
(৬) পুকুরটা বেশ স্মরণীয় এ কারণে যে পুকুরের মাঝখানে ছিল ডাইভিং পোস্ট। অনেক ছেলেরা পোস্টিং খুব দক্ষ ছিল। আর পুকুরে ছিল বড়ো বড়ো মাছ; নৌকাযোগে জাল দিয়ে মাছ ধরতাম। একবার তিনহাত লম্বা একটি বোয়াল মাছ ধরেছিলাম।

(৭) বাস্কেটবল কোর্টের জায়গায় ছিল বড় একটি টিন ঘর যা হলঘর হিসেবে ব্যবহার করা হতো এবং এখানে মিলনায়তন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক মঞ্চায়িত হত। এখানে বার্ষিক কৃষি প্রদর্শিনী অনুষ্ঠিত হত। যেখানে গ্রাম থেকে কৃষিজাত বৃহৎ আকারের নানা ফলন এখানে প্রদর্শিনীতে নিয়ে আসা হত। উদাহরণ ১ কেজির একটি টমেটো, দুই-আড়াই হাত লম্বা মুলা, ইত্যাদি।

(৮) বর্তমান ম্যাপে কৃষি-বাগান দেখানো হচ্ছে ওখানে একটা উত্তর-দক্ষিণ একটা লম্বা ঘর ছিল সেখানে প্রাইমারী স্কুল ছিল যেখানে আমি ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে নিজেও পড়াশুনা করেছি ৫ম শ্রেণীতে। তারও আগে ছিল জিটি স্কুল ও জিটি বোর্ডিং সকল ধর্মের টিচার্সদের জন্য।

(৯) এ জায়গায় ছিল টিচার্স কোয়ার্টার যেখানে রফিক স্যার, সিলভেস্টার স্যার, চিত্ত স্যার, নির্মল হাওলাদার, পিটার সাহা প্রমুখ টিচার্সগণ পরিবার নিয়ে থাকতেন এবং স্কুলে পড়াতেন।

(১০) এখানে বিদ্যুতের জন্য জেনারেটর ছিল যাকে "পাওয়ার হাউজ" বলতাম, কাছে ধানা-কল ছিল। মি. যোসেফ গোমেজ ছিলেন ম্যানেজারের দায়িত্বে। বহুকাল ধরে দারোগাবাড়ির ইউজিন গোমেজ ব্রাদারদের টেবিল বয় হিসেবে অনেক কিছুর দেখাশুনা করতেন।


Church Premise : MAP No. 5
New Market
Semi-Pucca
New Market
Semi-Pucca
New Market
Semi-Pucca
New Market
Pucca (2 Storied)
4
New Market
Semi-Pucca
New Market
Semi-Pucca
New Market
Semi-Pucca
New Market
Pucca (2 Storied)
New Market
Semi-Pucca
New Market
Semi-Pucca
New Market
Pucca (1 Storied)
New Market
Semi-Pucca
4
4
5
New Market
Semi-Pucca
New Market
Semi-Pucca
New Market
Pucca (2 Storied)
New Market
Pucca (2 Storied)
Residential
Pucca (2 Storied)
Shop
Semi-Pucca
Missionary Market
Pucca (1 Storied)
New Market
Semi-Pucca
New Market
Semi-Pucca
Mosque
Pucca (2 Storied)
New Market
Pucca (2 Storied)
New Market
Tin Shed
4
3
Residential
& Market
Pucca (2 Storied)
Asha NGO
Pucca (2 Storied)
Residential
Semi-Pucca
1
Neramoy
Diagnostic Center
Pucca (2 Storied)
New Market
Semi-Pucca
New Market
Semi-Pucca
4
2
Srimonto River
W
S
Z
E

ম্যাপ নং ৫: বর্তমানের নিউ মার্কেট ও তৎসংলগ্ন এলাকা

মিশন প্রাঙ্গণের বিভিন্ন জায়াগায় প্রয়োজনে হাট, বাজার ও দোকান গড়ে উঠতে থাকে যেমন, বর্তমান নদীর পাশে খেলার মাঠের উত্তর সীমানায় (ডি'সিলভা ঘাটে যাওয়ার রাস্তার দু'পাশে), রাস্তার পাশে সিস্টারদের বাড়ির কোনায়, রাস্তা বরাবর হুইটলি সাহেবের কম্পাউন্ডের দক্ষিণ সীমানা ও কাচারি পুকুরের উত্তর সীমানায়, এমন কি পুরনো হাই স্কুলের সামনে ও সরকারি হাসপাতালের সামনে, দোকান-পাট, মসজিদ বানানোর প্রচেষ্টা ও দাবি, ইত্যাদি বৃদ্ধি পেতে থাকায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ রক্ষা করা হুমকির মুখে পড়ে। যতদূর সম্ভব বিগত শতাব্দীর সত্তর দশকে গোড়ার দিকে "মিজেরিও" নামের একটি জার্মান সংস্থার অর্থায়নে এবং ফাদার জার্মেন গ্রাঁমেজোঁ, সিএসসি'এর নেতৃত্বে বর্তমান নিউ মার্কেটে সারিসারি কতকগুলো স্টল তৈরি করা হয় এবং সব ধরণের বাজার ও দোকানপাট ওখানে স্থানান্তরিত করা হয়। তার সাথে সাথে মসজিদ ও ব্যাংক মিশনের পক্ষ থেকে তৈরি করে দেওয়া হয়। এটা ছিল খুবই একটা দূরদর্শী চিন্তা ও পরিকল্পনা। এ এলাকার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করছি:

(১) বাকেরগঞ্জ যাওয়ার রাস্তার পূর্বপাশে এবং শ্রীমন্ত নদীর পশ্চিমপাশে ছিল জেলে বাড়ি (জাইল্লা বাড়ি) যারা ছিল হিন্দু। ইলিশ মাছের মৌসুমে ওনারাই পায়রা নদী থেকে ইলিশ মাছ নিয়ে "ডাক" দিতে দিতে ঘাটে আসত বিক্রির জন্য। অনেক মানুষ ইলিশ মাছের নৌকা আসার অপেক্ষায় থাকত।

(২) ঐ এলাকায় স্টিফেন ব্যারেল (ভট্টাচার্য), মার্টিন সি. গোমেজ, উইলসন গোমেজ, ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ অধিকারী এবং রাস্তার পশ্চিম পাশে কাথলিক নিশিকান্ত বাড়ৈ এবং আরেকটু উত্তরে বোচা বাড়ির (সম্পূর্ণ বিলুপ্ত) কাথলিক পরিবার বাস করত। বোচা বাড়ি ও নিশিকান্ত বাড়ির মাঝখানে ছিল অনেক গভীর জঙ্গল সেখানে বাঘ বাস করত। একবার একটি বাঘ মেরে ফাদার বাড়ি নিয়ে আসা হয়েছিল।

(৩) অনেকটাই ছিল মিশনের জমি কিন্তু সব হাতছাড়া হয়ে ব্যক্তি মালিকানায় চলে গেছে। বর্তমানে মিশনের মাত্র পাঁচটি দোকান আছে এবং এক খন্ড জমি আছে যার ওপর ব্যাংক নির্মিত হয়েছে।

(৪) বর্তমানে নিউমার্কেট এলাকায় সর্বমোট ৪০০-৪৫০ দোকান-পাঠ ও স্থাপনাদি আছে। শোনা যায় মাত্র ১০-১২ জন খ্রিস্টান দোকানদার আছে।

(৫) নিউ মার্কেটের দিকে যেতে বামপাশে যেখানে অতীতে টিচার্স কোয়ার্টার ছিল সেখান থেকে এক খণ্ড জমি মিশন থেকে দু'বছর আগে মি. শ্যামল লরেন্স গোমেজ ক্রয় করেছেন। পরবর্তীতে আছে দুটো পরিবার আন্দ্রিয় গোমেজ ও অঞ্জন বাড়ৈ যিনি তিনতলা দালান করে ভাড়া দিচ্ছেন।

৩) মিশন কম্পাউন্ডের ফটোগুলো-২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

Pictures of the Church, Rectory & Cemetry



Church after 2005



Parish Rectory and Office



Parish Rectory and Office - Sideway



Residence of the Priest



Graveyard



St. Joseph's Moth

Sisters Compound



LHC Sisters House



LHC - House for Music Class



LHC - Entrance of Dipti Hostel



LHC - Dipti Hostel



LHC Sisters Pond



Loreto Sisters House

Sisters Compound



Loreto Sisters House 2005



Loreto Sister - Aspirants House



Loreto Sister House 2005



Loreto Sisters House - Back



Loreto Sisters Pond

Holy Rosary Seminary



Holy Rosary Seminary



Holy Rosary Seminary 2006



Holy Rosary Seminary Entrance Road



Holy Rosary Seminary Groto
(Originaly Brothers House)



St. Joseph Chapel Oldest Existing Building



Holy Rosary Seminary Pond
(Originaly Diving Post at the Center)

St. Alfred High School



St. Alfred School (1937)



SAS Primary School and Interior Ground



SAS Primary School & Field



SAS Primary Section - with some Teachers



SAS Building 1970



SAS- New Building of 1970 +2009

St. Alfred High School



SAS High School & College



Present High School and College (2009)



SAS Principal and Vice-Principal



SAS Assembly

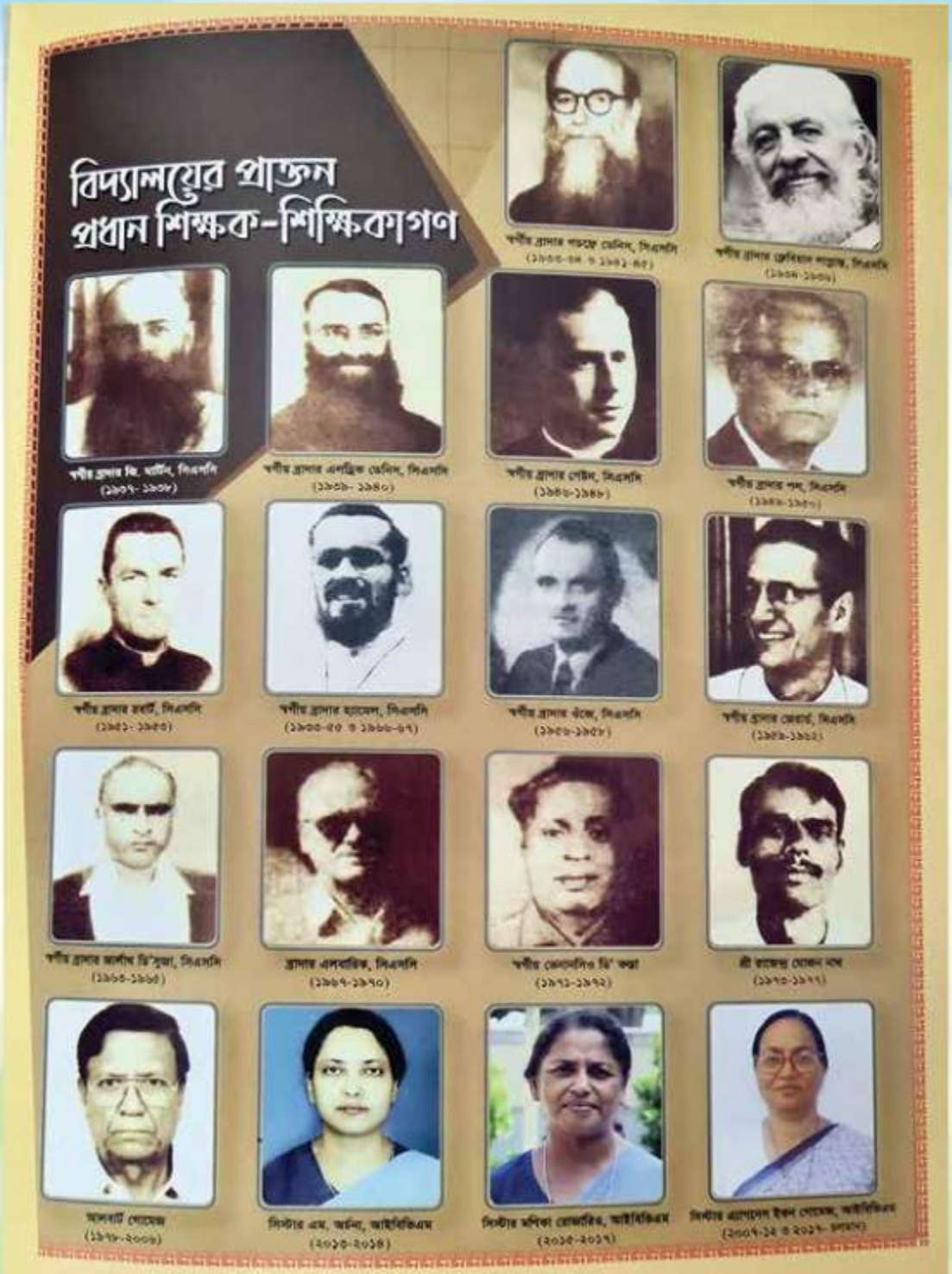


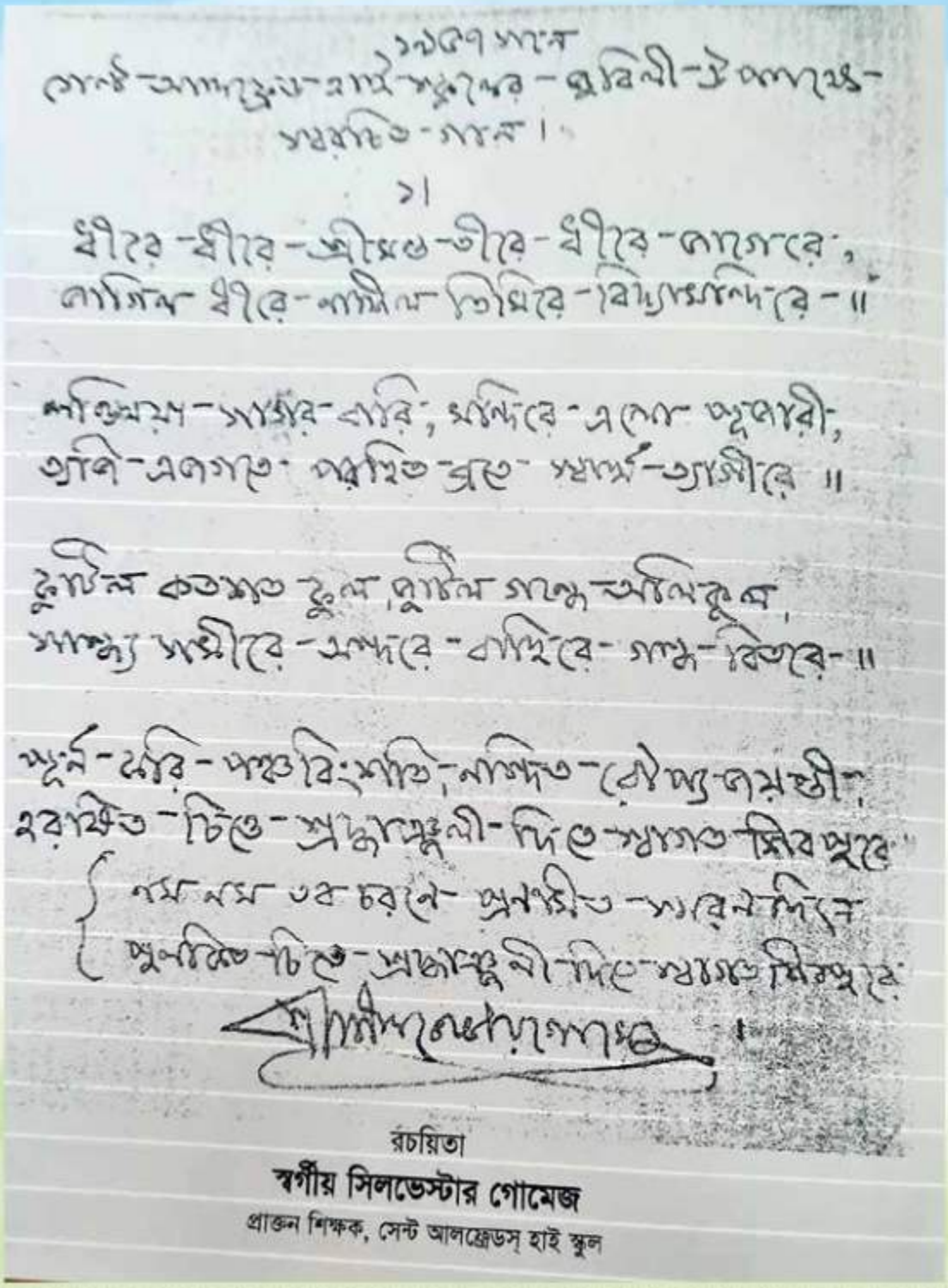
SAS Assembly



Back of SAS with Kachari Pukur and Graveyard

St. Alfred High School





রচয়িতা

স্বর্গীয় সিলভেস্টার গোমেজ

প্রাক্তন শিক্ষক, সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুল

Srimonto River











॥ খ ॥ পাদ্রীশিবপুরের অতীত গির্জা ও বিশেষ ব্যক্তিদের ছবি

Church Until-2004



Church Until 2004



Church Until 2004



Altar at Back Drop



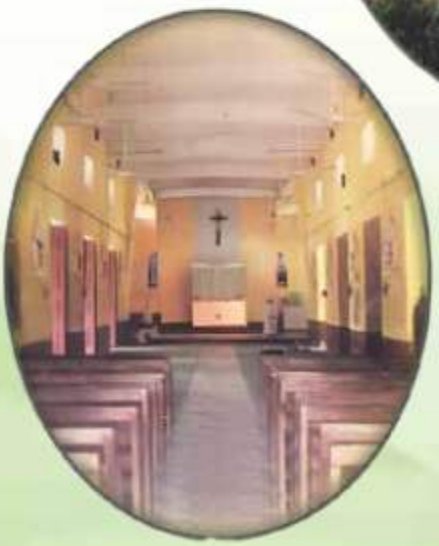
Eastern wing of the church

Church Until-2004











Priests & Religious



Fr. Philip Payent, csc, eating with hands



Archbishop Lawrence Graner, csc
Fr. Patrick Peyton,Fr.Charles Young.1961



Scholastics at Sagardi, Fr. Mclure and Br. Dubois 1953

Priests & Religious



Annual Retreat: Brother Scholatics 1995



Some Holy Cross Sisters



Mother Alphonse Ligori, LHC



Fr. Shaha, Bro. Alberic, Sr. Aroti and Sr. Shikha



Sr. Aroti, Sr. Shikha, Sr. Dorothy



LHC Sisters with Bp. Patrick & Others


Conrad Auger


Louis-E. Leduc


Flavien Laplante


Lucien Goupil (Luke)


Constant-R. Brouillard

Some Canadian Brothers of the Chittagong Diocese


Bertin Cormier


Fernand Madore


Aquila Laniel


Maurice Jodoin

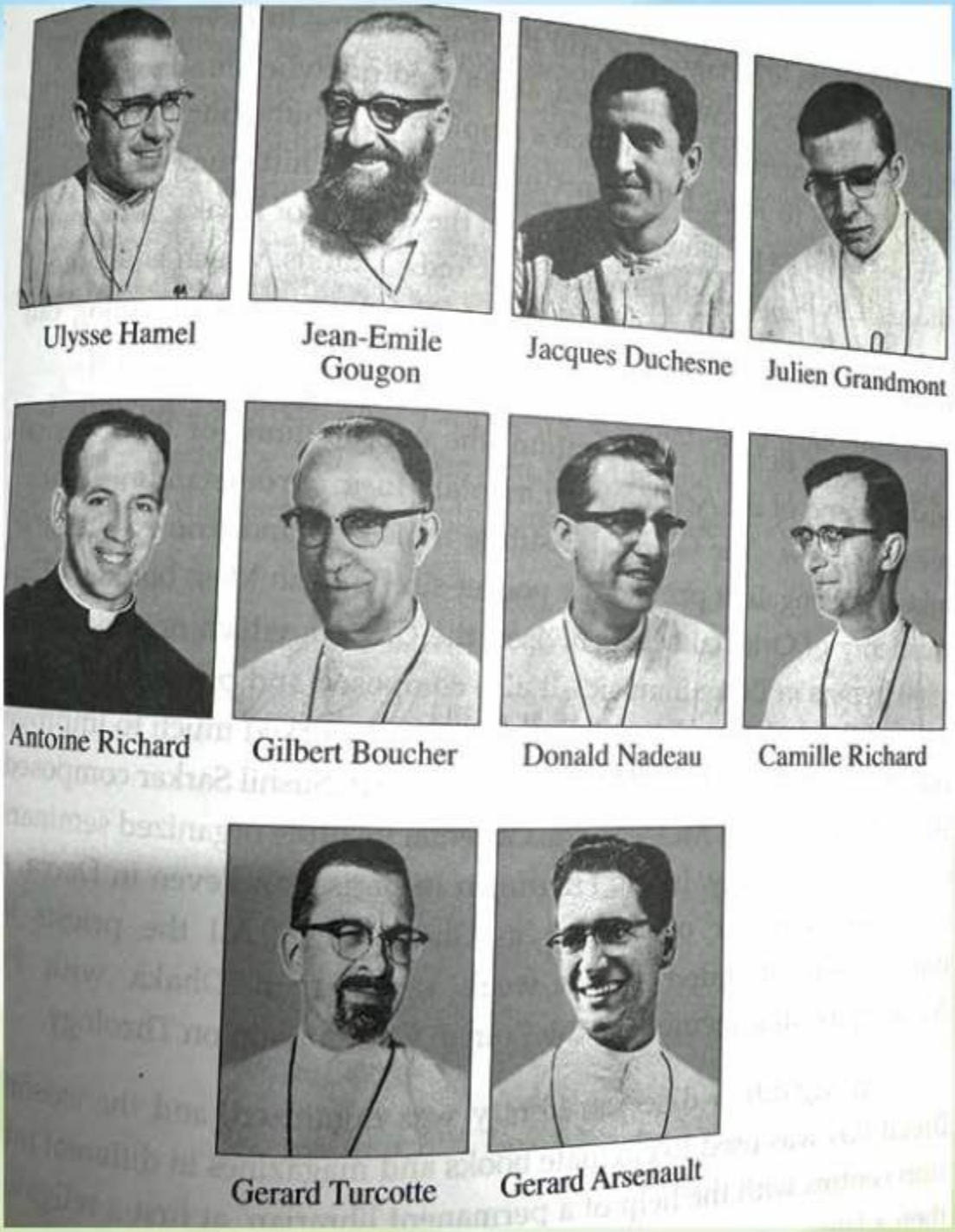

Gilles Côté


Isidore Joyal


Albéric Houle

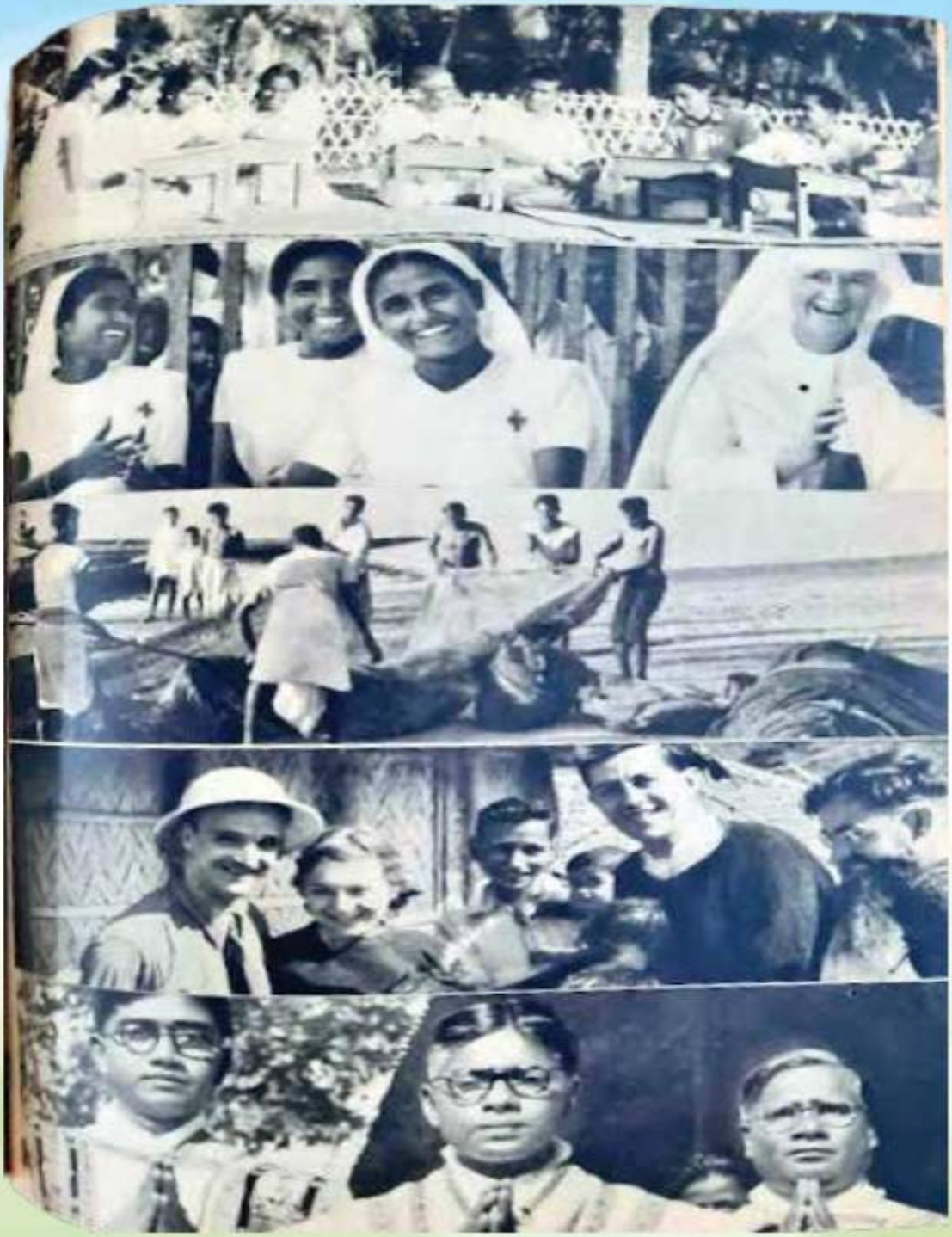
Missionary Brothers-

Priests & Religious



Names are Written

Priests & Religious



Priests and Sisters

Church Events



Bishop Larose and Sonatola Refugees, 1961



Cyclone of May 9, 1961 - Devasted School of Padrishibpur



Famine of 1943 - Ponchasher Monantor (1350)

Individual Families



1920s Francis Gomes (Lalu Shikdar), son Philip, grandson Patrick Mistiri Bari



Manuel & Virginia Gomes Shikdar Bari



Santa Maria & wife Carolina Santa Maria Bari



Peter Gomes (son of Francis Gomes) & wife Rita O Rouke Mistiri Bari

Individual Families



Teresa Gomes (daughter of Francis Gomes)
& Harold Walker Mistiri Bari



1930s Manuel Gomes, wife Virginia, sister,
10 children Shikdar Bari



Aloysius Gomes (R) & Albert Gomes (L)
Shikdar Bari



Manuel & Virginia Gomes Shikdar Bari

Individual Families



1969 Vincent & Philomena Gomes



1946 Charles Gomes (Gurumoshai)



1960s Norbert & Ruth Gomes & family



1940s Philomena & Avelyn Gomes

Individual Families



1960s Napier D' Costa & wife Philomena Aloysius, with Philomena Gomes & others



George Francis Nelson & Rosie Ann Gomes (wedding photo -1928)



Cynthia Sarker



Ursi Gomes

Individual Families



Photos - Mr. Albin's Gomes



2001 Shikdar Bari Rosie auntie & Helena, wife of Edu Gomes



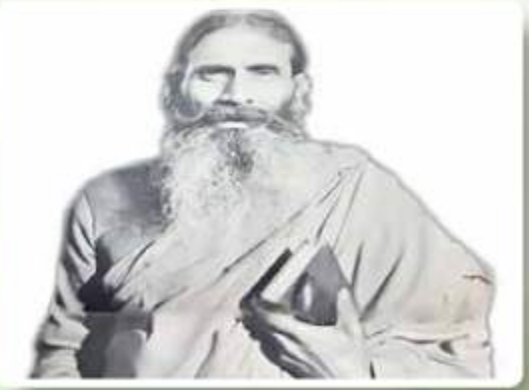
2001 Mistiri Bari Moses & Paul's wives



1982 Capt. Leonard T. Gomes

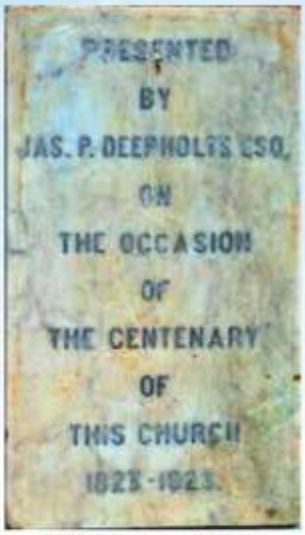


Cardinal's mother & Akhila's mother in 1992

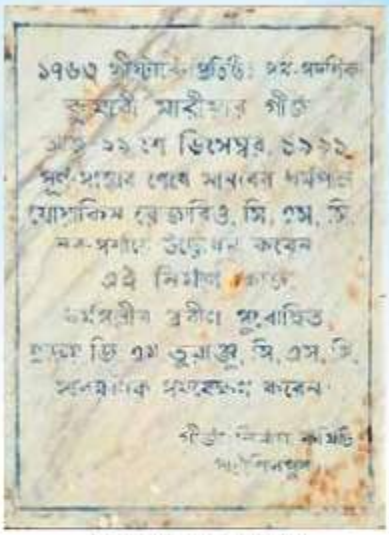


Shadhu Michael Ningal D'Rozario (1961)

Church Tablets



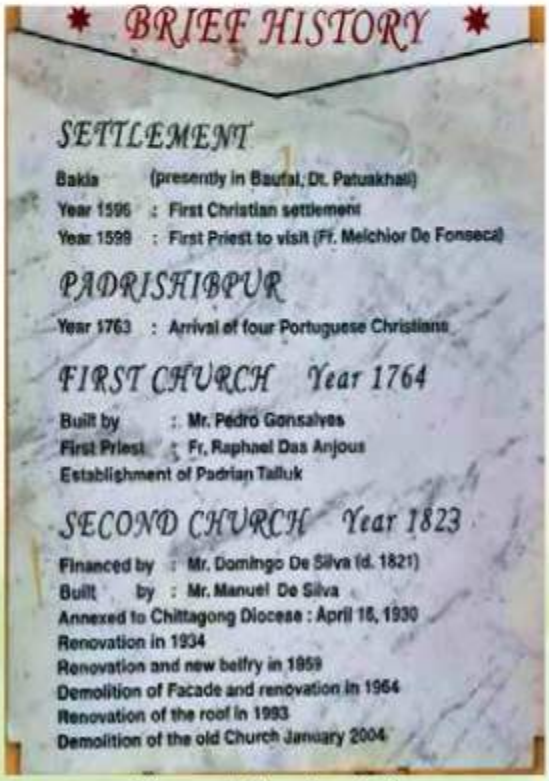
First Centenary of the Second Church (1823-1923)



Major Repair of the Church in 1991



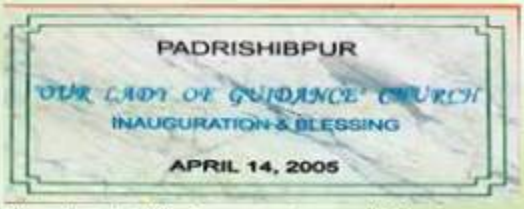
Special Donors of the Church (2005)



History of Churches Built

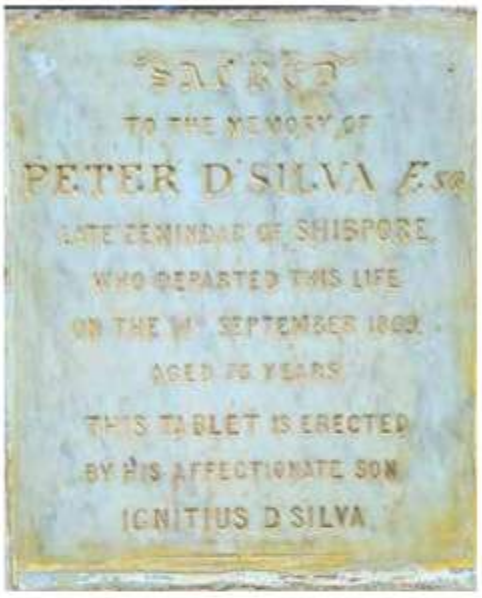


Donors of the Parish for Church (2005)



Church of 2005 - Inauguration and Blessing

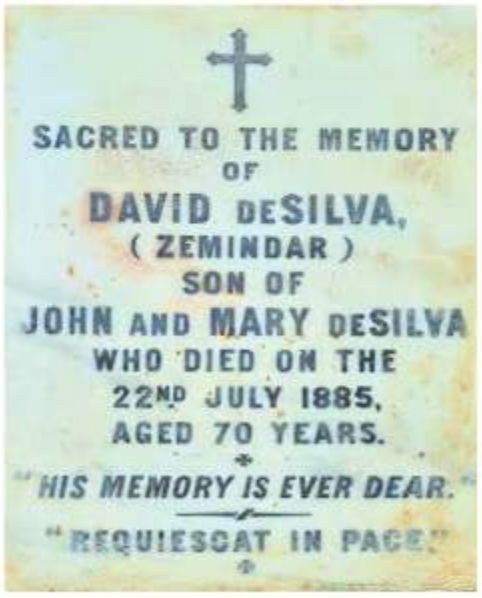
Graves - Epitaphs



Peter D`Silva (Zamindar) Born 1793 Died 14-09-1869



Thomas Gomes - Born 1813 Died 04-03-1885



David de Silva (Zamanidar) Born 1815 Died 22-07-1885



Eliza Annie - Born 1865 Died 1892.

Graves - Epitaphs



Alexandar Gomes - Born 1877 Died 02-02-1936



Manuel Gomes. Born 12-05-1902 11-11-1975 Borjiana, Born 1908 7-5-1971 (Kalada)



Domingo D'Costa, Born 5-11-1959 Died 14-05-1996



German Gomes. Born 1865 Died 03-11-1937

দ্বিতীয় অধ্যায়: অতীতের তথ্য, গবেষণা ও অভিজ্ঞতামূলক কয়েকটি লেখা

পাদ্রীশিবপুরের আধ্যাত্মিক জীবন[১]

- খ্রীস্টফার রবি ডি'কস্তা

পাদ্রীশিবপুর সম্পূর্ণ ভাবে পর্তুগীজদের দ্বারা গড়া। এখানকার গির্জা একটি প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করে। পর্তুগীজ আমলেই এই গির্জার নাম রাখা হয় "পথ প্রদর্শিকা মারীয়ার গির্জা"। গির্জার সম্মুখ ভাগে একটি গ্রটো বা পুণ্যপীঠ ছিল। বিশেষভাবে তখনকার দিনের পুরোহিতদের অবদানে এখানকার আধ্যাত্মিকতা আজও সুন্দর ও পবিত্র।

প্রার্থনা জীবনঃ পাদ্রীশিবপুরের প্রার্থনা জীবন বলতে এখানকার খ্রীষ্টভক্তগণ সবসময়ই মারীয়ার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন ও ঈশ্বরের সান্নিধ্যে বেশ কিছুটা সময় কাটাতে চান। তবে এর একটি বিশেষ কারণ হতে পারে, পর্তুগীজ আমল থেকে এখানকার সন্তানদেরকে কোলকাতা যেতে হত শিক্ষা অর্জনের জন্য, এবং মাইলাপুরের বিশপদের তত্ত্বাবধানে বর্তমান ও অতীতের কিছু সংখ্যক অভিভাবকগণ প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের জন্য কোলকাতা বোর্ডিং ও কনভেন্টে অধ্যয়ন করেন। সেখানকার জ্ঞানালোকে তারা পরবর্তী বংশধরদের প্রভাবিত করেন। বিশেষ ভাবে গির্জার ঘণ্টাধ্বনির সাথে সাথে দূত সংবাদ আবৃতি এবং মা তার সন্তানদের নিয়ে সান্ধ্যকালীন প্রার্থনায় যোগ দেয়া, রাতে চিরাচরিত প্রথা অনুসারে প্রতি ঘরে ঘরে রোজারীমালা করা, মারীয়ার নিকট মানত করা, ধন্যবাদের মীশা উৎসর্গ করা ও মারীয়ার গ্রটোর সম্মুখে মারীয়ার সামনে ভক্তি ভরে প্রার্থনা করা। এছাড়া মারীয়ার মূর্তি ও সাধু আন্তনীর মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা ও বাড়ীতে স্থান (থান) দেওয়া এবং ঐ দিন বিশেষভাবে উপবাস পালন এবং প্রার্থনাও করা হয়ে থাকে। এই সমস্ত বিভিন্ন উপায় দ্বারা সন্তানদের মনে বিশেষভাবে ধর্মীয় জ্ঞান-আলোক বিস্তার করা হচ্ছে। তারই ফলশ্রুতিতে আজও এখানকার খ্রীষ্টভক্তরা এ প্রথা-গুলিকে বিশেষভাবে অনুসরণ করে যাচ্ছেন। নতেনা, খ্রীষ্টরাজার পর্বদিনে প্রসেশনের মাধ্যমেই ভক্তি দেখানো হয়ে থাকে। গ্রামের মধ্যে দুটো তিনটে বেদী তৈরি করা হয় এবং প্রায় দেড় থেকে দু'হাজার খ্রীষ্টভক্তগণ" জীবন্ত খ্রীষ্টের "বাস্তব উপস্থিতিতে বিশ্বাসী হয়ে এ প্রসেশনে যোগ দেন এবং খ্রীষ্ট-রাজার প্রশংসা গান করেন। এমনকি এই অনুষ্ঠান বা ভক্তি প্রদর্শন বিজাতীয়রাও সারিবদ্ধ হয়ে অধীর আগ্রহে দেখে থাকে। কিছু সংখ্যক হিন্দুরা তো খ্রীষ্টান জীবনের সাথে সব সময়ই জড়িত এবং সবসময় উঠা-বসা করে।

উপাসনা অনুষ্ঠানঃ সপ্তাহে প্রতিদিন উপাসনা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। প্রতিদিনের উপাসনা অনুষ্ঠানে আগের মতো ততো বেশী লোক অংশগ্রহণ করেন না। তবে যারা অভ্যস্ত তারা সব-সময়ই আসেন এবং গির্জার গান ও প্রার্থনা পরিচালনা করেন। বৃদ্ধ বিশপ মহামান্য লারোজ সি,এস,সি, বর্তমানে পাদ্রীশিবপুর থাকায় নিয়মিত পবিত্র ঘন্টা, বেনেডিকশন, যীশু হৃদয়ের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন যথারীতি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়।

---

[১] খ্রিস্টফার রবি ডি'কস্তা, শ্রীমন্ততটে – ১৯৮০

প্রার্থনা জীবনে সক্রিয় ভূমিকাঃ পাদ্রীশিবপুর নিবাসীরা গ্রামের খ্রীষ্টভক্তের আধ্যাত্মিক উন্নতি করে সেই প্রাচীনকাল থেকে আজও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। গ্রামে গ্রামে প্রার্থনা সভা করা, গির্জায় বাইবেল পাঠ, গান পরিচালনা এবং গির্জার যাবতীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণে কোন সময় ত্রুটি করে না। এ ছাড়া রয়েছে বিভিন্ন পালাগান যা আজ পাদ্রীশিবপুরের অতীতের স্মৃতি বহন করে চলেছে। এক হিন্দু পন্ডিত আমাদের পবিত্র বাইবেল অনুকরণে নিজ ভক্তির মাধ্যমে যীশু খ্রিস্টের জন্ম থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত পালাগান রচনা করে গেছেন। আমাদের শ্রদ্ধাভাজন শ্রী রামুয়েল গোমেজ তার সহচর অর্থাৎ শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি নিজেই বাড়ি বাড়ি এই পালা-গানের প্রচলন করেন। আজও গেয়ে চলেছেন এবং অন্যদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। বড় মর্মবিদারী ও সুললিত কণ্ঠস্বর দ্বারা আকৃষ্ট করতেন সমস্ত খ্রিস্টভক্ত ও বিজাতীয়দের মন। গানের সুরে সুরে অভিনয় দ্বারা সমস্ত ইতিহাস বুঝিয়ে দিতেন। বিশেষভাবে জনগণ যাতনাভোগের কাহিনী উপবাসকালে ভক্তি সহকারে শুনতো। এ ছাড়া এখানকার প্রবীণরা বড়দিন ও যাতনাভোগের অনেক কীর্তন রচনা করে গেছেন, যা অতি চিত্তাকর্ষক ও প্রাণবন্ত। আজও এ এলাকায় সেই পুরাতন গানগুলি গেয়েই খ্রিস্টের যাতনাভোগ ও বড়দিনের মর্মোপলব্ধি করা হয়। তখনকার দিনে যাতনাভোগের সময় পুণ্য শুক্রবারে বড় মাটির তৈরি যীশুর মূর্তি যাকে বলা হত "বাবা যীশুর মূর্তি" নিয়ে বড় শোক-শোভা যাত্রা করা হত। পথে হেঁটে আবার গির্জায় আসত, তখন বাস্তবিকভাবে যীশুর মৃত্যু কল্পনা ও ধ্যান করা যেত। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে সে মূর্তি খানা ভেঙ্গে যাওয়ায় এই ধরনের ভক্তি প্রদর্শন আর হয়ে উঠে না।

উপবাসকাল, অক্টোবর ও মে মাসে বাড়ী বাড়ী নিজেরাই রোজারীমালা প্রার্থনা ও গান পরিচালনা করেন। বাড়ীতে কুমারী-মারীয়া ও সাধু আন্তনীর মূর্তির আসন দান করলে নিজেরাই এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন।

আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতিফলনঃ পাদ্রীশিবপুর একটি ক্ষুদ্র ধর্মপল্লী হলেও আধ্যাত্মিক জীবনের ফলশ্রুতিতে যে ধর্মীয় প্রসারতা কতটুকু তার বাস্তব প্রমাণ এখানকার সন্তানদের ব্রতীয় জীবনগুলি। পাদ্রীশিবপুরের অনেক সন্তান যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবনে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। আজও অনেকে এ পথে জীবন উৎসর্গ করার জন্য পা বাড়াচ্ছে এবং অনেকে অধ্যয়নরত আছেন।[২]

এছাড়া আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মোহে বিশেষভাবে মোহিত হয়ে একজন বিবাহিত পুরুষ সন্ন্যাসজীবনে প্রবেশ করেন। যাকে "নিঙ্গাল সাধু" নামে আখ্যা দেয়া হয়। তিনি রেভাঃ ফাদার প্যাট্রিক ডি'রোজারিওর পিতা মিঃ মাইকেল নিঙ্গাল ডিঃ রোজারিও যিনি প্রায় পাঁচ বছর ভারতে তপস্যার জীবন যাপন ক'রে সংসারত্যাগী সাধু হন। বাংলাদেশে ফিরে এসে লোকদের মাঝে অধিককাল ধরে ধর্মপ্রচারের কাজ করতেন, লোকদের সান্তনা ও আশ্বাস দান করেন, তিনি বর্তমানে একজন সত্যিকারের ও উপযুক্ত কাটেখ্রিস্টের কাজ করেন। তিনি এখনও মনে হয় জীবন্ত, ধর্মপ্রচার কাজে বর্তমানে তিনি আজও কাজ করে যাচ্ছেন।

---

[২] লেখক এখানে পাদ্রীশিবপুরবাসী যারা যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী জীবনে প্রবেশ করেছেন তাদের তালিকা প্রদান করেছেন। তবে পূর্ণ তালিকা যেহেতু সপ্তম অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে সেহেতু তার দেওয়া তালিকাটি বাদ দেওয়া হয়েছে – সম্পাদক

ধর্মীয় গোড়াভাবঃ সত্যিকারের ধর্মীয় মনোভাব বলতে গেলে এখন একটু কম পরিলক্ষিত হয়। কারণ তখনকার দিনে ল্যাটিনে মিশা শুনায় একটি বিশেষ ভক্তি ছিল। ল্যাটিনে প্রার্থনা, গান কালো মীশা, এগুলিই প্রবীণরা বেশী পছন্দ করেন। বর্তমানের যুগপ্রবাহে ধর্মীয় কাজ ও প্রার্থনা জীবন থেকে দূরে থাকায় এই ধর্মীয় ভাবের কিছুটা অভাব পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে বাংলা ভাষায় সব ধর্মীয় কাজ চললেও আদি প্রথা ধরে রাখবার প্রবণতা প্রবীণদের প্রত্যাশা। এমনকি হাতে কমুনিয়ন নেয়া প্রবীণরা আজও সহজে মেনে নিতে পারছেন না। প্রবীণদের ভাবধারা হল যা এতকাল হয়ে এসেছে তা কেন এখন হতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে প্রাচীন ধর্ম-সংস্কৃতিকে সুন্দর বলতে হয় কিন্তু যুগের পরিবর্তনে মনের কিছুটা পরিবর্তন হবে তা বড়ো দেখা যাচ্ছে না। এ বিষয়টি খুবই সময় সাপেক্ষ। প্রবীণরা বাইবেল ভিত্তিক নয় তারা জানেন গদবাঁধা মুখস্থ প্রার্থনা, জপমালা, যীশু হৃদয়ের প্রতি ভক্তি, সাধু আন্তনীর প্রতি ভক্তি, ইত্যাদি। বাইবেল পাঠ করা ও সহভাগিতা করা, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উদ্দেশ্য বলা বা বাইবেল ভিত্তিক আলোচনা এবং ক্যারিজমেটিক প্রার্থনা, এগুলি তারা বিশেষ পছন্দ করেন না। বিশ্বে যা এখন চলমান তার মধ্যে খ্রীষ্টের বাস্তব উপস্থিতি নির্ণয় করা যেতে পারে, এই ভাবনা এখনও আসেনি। মনে হয় আর দু-এক বছর পর প্রবীণরা আরও সহজ হতে পারবে। এর জন্য প্রাচীনরা অবশ্য দায়ী নয়; প্রচলিত প্রথার কারণেই এরূপ হচ্ছে।

উপসংহারে বলতে চাই যে, বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে আজ নিজেরা প্রার্থনা সভা পরিচালনা করে, স্বতঃস্ফূর্ত প্রার্থনা বলা তাদের আয়ত্তে এসেছে। তবে মাঝে মাঝে বিচার-বিবেচনার সীমাবদ্ধতা এবং আরও বিশেষ কতগুলি কারণে কিছু সংখ্যক লোক ধর্মীয় প্রাচীন পন্থার প্রতি আকৃষ্ট আছে। তবে আমরা মনে করি সমবেত প্রার্থনায় তাদের জন্য সব সময় প্রার্থনা অর্পণ করব, যেন আমাদের সাধনা ও বৃদ্ধ শ্রদ্ধেয় বিশপ লারোজ, সিএসসি যিনি পাদ্রীশিবপুরের মাটিতেই বাস করছেন, তার প্রার্থনায় পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ বর্ষিত হবে। ব্যক্তিগত ভাবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে লোকেরা যীশুর সান্নিধ্য লাভের জন্য এতই ক্ষুধিত ছিল; সেই দানটি একদিন ফিরে আসবে পাদ্রীশিবপুরের মাটিতে। স্থানীয় মন্ডলী গঠন করে নিজেদের প্রার্থনা জীবনে ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রচুর পরিমাণে পেতে হবে। তাই আসুন আবার আমরা 'জীবন্ত খ্রীষ্টের' শোভাযাত্রা আরম্ভ করি। ইহাই যেন হয় অন্য জাতির মানুষের কাছে ও আমাদের ধর্মান্ধতার মাঝে খ্রীষ্টের বাস্তব ও ২য় আগমন; সেই আগমন বয়ে আনবে আমাদের জন্য মহা পুরস্কার। পরিশেষ ক্ষুদ্র একটি প্রার্থনা দ্বারা আমার লেখা শেষ করি।

যাত্রাপুস্তকে ২৩; ২০-২৩ পদ দেখ: "আমি পথে তোমাদের রক্ষা করিতে এবং আমি যে স্থান প্রস্তুত করিয়াছি সেই স্থানে তোমাকে লইয়া যাইতে তোমার অগ্রে এক দূতকে প্রেরণ করিতেছি। তাহা হইতে সাবধান থাকিও এবং তাহার রবে অবধান করিও, তাহার অসন্তোষ জন্মাইও না, কেননা তিনি তোমাদের অধর্ম ক্ষমা করিবেন না। কারণ তাহার অন্তরে আমার নাম রহিয়াছে। কিন্তু তুমি যদি নিশ্চয়ই তাহার রবে অবধান কর এবং আমি যাহা বলি, সে সমস্ত কর। তবে আমি তোমার শত্রুদের শত্রু ও বিপক্ষীদের বিপক্ষী হইব। কেননা, আমার দূত তোমার অগ্রে অগ্রে যাইবেন এবং ইমোরীয়, পরীষয়, কনানীয়, হিব্বীয়, ও যিবুষীয়ের দেশে তোমাকে প্রবেশ করাইবেন আর আমি তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিব।"

পাদ্রীশিবপুরের অর্থনৈতিক অবস্থা[৩]

- পল শিকদার

প্রায় ২৬০ বৎসরের অধিক পূর্বে পর্তুগীজরা এই গ্রামে আসিয়া প্রভু যীশুর বানী প্রচার করিয়া এখানকার অধিবাসীগণকে কাথলিক ধর্মে দীক্ষাস্নান দিয়া খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের গোড়াপত্তন শুরু করে। ইহার অধিবাসীগণ সবই কাথলিক ধর্মে বিশ্বাসী।

এই গ্রামের পূর্ব পাশ দিয়া শ্রীমন্ত নদী প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। ইহার পলি মাটি দিয়াই গঠিত হইয়াছে এই পল্লীটি। গ্রামটি সমতল ভুমি।

আনুমানিক ১ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে এই গ্রামটি। এর প্রায় ১/৪ অংশ ভূমি নিয়া মিশন এলাকা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাকি জমি গুলির বর্তমানে প্রায় ২৩০ টি পরিবারে লোকদের মধ্যে ভাগাভাগি হইয়া গিয়াছে। এই পরিবার গুলির লোক সংখ্যা ১৫০০/২০০০ মত হইব।

পূর্বে এখানকার অধিবাসীগণ কৃষিকাজ করিয়া স্বাছন্দে জীবিকা নির্বাহ করিত। ভাত ও মাছ অধিবাসীগণের প্রধান খাদ্য। ক্রমে ক্রমে যখন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তখন কৃষি জমি বসত বাড়ী হিসাবে ব্যবহার করিতে লাগিল। ইহাতে কৃষিজমির পরিমাণ কমিতে লাগিল। নদী, খাল ও পুকুরে প্রচুর মাছ পাওয়া যাইত। আস্তে আস্তে মাছ দুস্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। জীবনধারণ করাও খুব মুস্কিল হইয়া উঠিল।

গ্রামের পূর্বপুরুষগণ গাদা-বন্দুক পরিচালনার দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। এর সুখ্যাতি সুদূর দক্ষিণে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময় দক্ষিণে ভাটির দেশে মগ রাজারা বাস করিত। তাহাদের কৃষিজমি বন্য পশুর অত্যাচারে বিনষ্ট হইত। এই সকল কৃষিজমি পাহাড়া দিবার জন্য এই গ্রামের মানুষদিগকে ভাড়া করিয়া নিত ও মগদের কৃষি জাত ফসল বন্য পশুদের হাত থেকে রক্ষা করিত। ইহার পারিশ্রমিক বাবদ ধান, চাউল ও কৃষিজাত দ্রবাদ্রি সংগ্রহ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। অধিবাসীগণ বিবাহ-অনুষ্ঠানে বন্দুক ও পটকা বাজি মারার দক্ষতা অর্জন করিয়াছিল। ইহার সুনাম আশে পাশে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যেকোন বিবাহ বাড়ীতে বিবাহ-বন্দুক ও ফটকা বাজি মারার জন্য লোকদের ভাড়া করিয়া নেওয়া হইত। ইহাতেও অনেক টাকা পয়সা আয় হইত।

আস্তে আস্তে মগ রাজত্ব চলিয়া যাওয়ার পর লোকজন গ্রামের উৎপাদিত কৃষিজাত দ্রব্যাদ্রি যেমন, নারিকেল, সুপারি, বাঁশ, গৃহপালিত পশু যেমন গরু, ছাগল, হাস-মুরগী ইত্যাদি বিক্রি ও পালন করিয়া কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করিত। নদী-নালায়, খাল-বিলে ও পুকুরে মাছের অভাব ছিল না। তরিতরকারীও প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হইত। মানুষ নিজে খাইয়া পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে বিলি বণ্টন করিত। ক্রমে ক্রমে যখন পরিবারের লোক সংখ্যা আরও বাড়িতে লাগিল ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে জমির উর্বরতা কমিতে শুরু করায়, জমির উৎপাদন ক্ষমতা দিন দিন কমিয়া যাওয়ায় কৃষির উপর নির্ভরতা লোপ পায়। মানুষ বিকল্প চিন্তা-ভাবনা করিতে আরম্ভ করিল।

[৩] শ্রীমন্ততটে – ১৯৮০ খ্রি.

ভারত ভাগ হইবার পূর্বে অধিকাংশ লোক জীবিকা নির্বাহের জন্য কলিকাতায় চাকুরীর আশায় পাড়ি জমাত, ওখানে কাজ করিত ও সেখান থেকে অনেক লোক জাহাজে চাকুরী করিয়া বহু টাকা-পয়সা আয় করিত। সেই আয় দিয়া গ্রামের পরিবার পরিজন নিয়া খুবই আনন্দে দিনযাপন করিত। পাকিস্তান স্বাধীন হইবার পর বিদেশে যাওয়ার, লেনদেন ও চাকুরীর কড়াকড়ি হওয়ায় লোকজন বিদেশ যাওয়া অনেক অংশে কমিয়া যায়। ইহাতে গ্রামের আর্থিক অবস্থা অনেক শোচনীয় হইয়া পড়ে।

১৯৫৮ এবং ১৯৬১ সনে প্রবল ঝড়ে ও সর্বনাশা বন্যায় প্রকৃতির অনেক গাছ-পালা, গৃহপালিত পশুপাখী ও কৃষি দ্রব্যাদি বিনষ্ট হয়। ১৯৭০ সনের সর্বনাশা ঝড়-বন্যা ও জলোচ্ছাসে পুনরায় প্রাকৃতিক সম্পদ, পশুপাখি ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি ধ্বংস করে ও জমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়, ইহাতে জমির উর্বরতা কমিয়া যায়। যার ফলে কৃষিজাত ফসল উৎপাদন কমিয়া যায়, গৃহপালিত পশু-পাখী, সুপারী গাছ, নারিকেল ও বাঁশ গাছে এক রকম রোগ দেখা দেয়। উহার ফলে অনেক গৃহপালিত পশু-পাখী, সুপারী গাছ, নারিকেল গাছ, ইত্যাদির ফলন কমিয়া যায় ও মরিয়া যায়। সুতরাং প্রাকৃতিক সম্পদ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ ও গৃহপালিত পশু পুনরুদ্ধার করার সেরকম কোন প্রচেষ্টা করা হয় নাই, যাহার ফলে গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পরিয়াছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হইবার পূর্বে উল্লেখিত কারণে শিক্ষিত / আধাশিক্ষিত / অশিক্ষিত মানুষ অর্থনৈতিক দুরাবস্থা হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রধান প্রধান শহরের দিকে চাকুরীর আশায় ভিড় জমাইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক চাকুরীর সংস্থান করিয়া সমর্থ অনুযায়ী পরিবার পরিজন লইয়া শহরে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়াছে। এদেরই মধ্যে আবার অনেকে স্থায়ীভাবে জায়গা জমি ক্রয় করিয়া ঘরবাড়ি তৈরি করিয়া শহরে বসবাস করিবার চেষ্টা করিতেছে। আবার অনেক মানুষ চাকুরীর আশায় বেকার অবস্থায় ঘুরাফিরা করিয়া দিন কাটাইতেছে।

বর্তমানে বিদেশে যাহারা চাকুরি করে তাহাদের মাসিক যে পরিমাণ টাকা আয় হয়, তাহা দিয়া নিজের ও গ্রামের সংসারের খরচ বহন করা এই দুর্মূল্যের বাজারে খুবই মুস্কিল হইয়া পড়িয়াছে। সেহেতু পরিবারের কর্তা হয়ত বা কর্মস্থলে বা অন্য কোন সংস্থার কাছে ঋণগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছে । আবার অন্যদিকে গ্রামের পরিবারের খরচ সংকুলানের জন্য স্বামী বিদেশ হইতে যে টাকা পাঠান তাহা দিয়া পরিবার পরিজন নিয়া এই অর্থনৈতিক দুরাবস্থার সঙ্গে ও বাজার দরের সঙ্গে তাল মিলাইয়া জীবন অতিবাহিত করা খুবই কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। তাকে বাঁচিয়া থাকার তাগিদে গ্রামের বিত্তবান ও মহাজনের নিকট হইয়ে কর্জ করিয়া সংসার চালাইতে হয়। তাহাদের উভয়ের ঋণের বোঝা দিন দিন বাড়িতে থাকে। আর কর্জ পরিশোধ করার সুযোগ তাহাদের হইয়া উঠে না। সমাজে এই বিত্তবান ও মহাজন কর্তৃক শোষিত, অত্যাচারিত ও নিষ্পেশিত হইয়া বহু পরিবার আজ পৈতৃক সম্পত্তি তাহাদের হাতে তুলিয়া দিয়া ভিটা বাড়ি ছাড়িয়া রিক্ত হস্তে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হইয়াছে।

গ্রামে যাহারা দিন মুজুরী দিয়া জীবনধারণ করিত, তাহাদের অবস্থা কংকাল সার। বর্তমানে আগেকার দিনের মত দিন মজুরের কাজ পাওয়া যায় না। গ্রামে কাজ পাওয়া যায় না তাই বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বহুকালের পূর্বে হইতেই সমাজের ভিতর বিদেশী ভাবধারা অর্থাৎ নেশা জাতীয় দ্রব্যাদি সমাজের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ছড়াইয়া পড়ায় অর্থনৈতিক অবস্থাকে আরও পঙ্গু করিয়া তুলিয়াছে। ইহার ফলে বাব-দাদার সম্পত্তি অন্যের হাতে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে ।

গৃহকর্তার সম্পদ দিয়া স্থানীয়ভাবে কোন শিল্প বা কুটির শিল্প গড়ে তোলা সম্ভবপর হয় নাই। কৃষি কাজের উন্নতিকল্পে এখানে পাদ্রীশিবপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (এ.ডি.সি.) গড়ে উঠেছে তাহা চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত নয় বলিয়া অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

বর্তমান অর্থনৈতিক দুরাবস্থার হাত হইতে পরিবার ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য গ্রামের মহিলাগণও পুরুষের সাথে আয়ের সহভাগী হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা একত্রিতভাবে পাদ্রীশিবপুর মহিলা হস্ত শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছে। এর ফলে অনেক অকর্ম হস্ত কর্ম চঞ্চল হস্তে পরিণত হওয়ার ফলে বেশ কয়েকটি দুস্থ পরিবার জীবিকা নির্বাহের পথে অর্থনৈতিক দুরাবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া তাল রাখিয়া স্বচ্ছন্দে জীবনধারণ করিয়া চলিয়াছে।

সমাজের অর্থনৈতিক দূরাবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিবার একমাত্র পথ সমবায় আন্দোলন। সমবায় আন্দোলনকে আরো জোরদার করিতে পারিলে অর্থনৈতিক মুক্তি আসবেই।

পাদ্রীশিবপুরের সোনালী যুগ[৬]

- লেখক মার্টিন সি গোমেজ

আজ আমরা পাদ্রীশিবপুর বলতে যে ধর্মপল্লী চিনি বা জানি, তার পূর্ব নাম ছিল শিবপুর। গ্রামটি মূলতঃ যথেষ্ট বড়ো নয়। পাদ্রীরা (যাজকেরা) এখানে বাস করতেন ব'লেই পরবর্তীতে এর নামকরণ হয় পাদ্রীশিবপুর।

পেছনের ইতিহাস থেকে জানা যায় ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে আমাদের এখানে প্রথম গির্জাঘর নির্মিত হয়। তবে, খ্রিস্টানদের আগমন তারও অন্ততঃ পঞ্চশ বছরের আগে। রাজা রাজবল্লভ সেন তার জমিদারির খাজনা আদায়ের জন্য যে চারজন পর্তুগিজ নাগরিক পাঠান তাদের মাধ্যমে খ্রিস্টানদের গোড়াপত্তন হয়। প্রথমতঃ প্রার্থনাগৃহ নির্মাণ করা হয়। পরে ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে গির্জাঘর তৈরি করা হয়। এরপরই সামাজিক প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন আসতে শুরু করে।

১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মিশনারিদের জন্য বঙ্গদেশে যাতায়াতের অন্যতম পথ ছিলো চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের রক্তমাখা খ্রিস্টীয় ইতিহাস সৃষ্টি হয় শ্রদ্ধেয় জেসুইট ফাদার ফার্নান্দেজ শহীদ হওয়ার মাধ্যমে। তিনি-ই বঙ্গমাতার বুকে সর্বপ্রথম ধর্মশহীদ। তবে পেছনের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করবো না। বিভিন্ন বক্তাগণ মঞ্চে উঠে প্রায়ই বক্তব্য দেন - ঐতিহ্যবাহী পাদ্রীশিবপুর। মূলতঃ পাদ্রীশিবপুরের ঐতিহ্য জিনিসটা কী এবং কেন? এ জাতীয় বক্তব্যে এ শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়। এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে যে গৌরবগাঁথার বিষয়গুলো পাওয়া যায়, সেগুলো বিভিন্ন উপায়ে সংগ্রহ করে বিজ্ঞ পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো।

[৬] পাদ্রীশিবপুর জুবিলী স্মরণিকা – ২০১৬ খ্রি. পৃ: ৩০-৩৪

চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের যাত্রা শুরু হয় ২৫ মে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে। ধর্মপ্রদেশাধীন চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী (সোনাপুর), বরিশাল, গৌরনদী, নারিকেলবাড়ি, হাফলং, বদরপুর, আকিয়াব, সানডায়, কিয়োপাউ এবং চাউগথা নিয়ে ৪৬,৬০০ বর্গ মাইল নিয়ে এ ধর্মপ্রদেশের যাত্রা শুরু হয়। পাদ্রীশিবপুর এসময়ে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের অন্তর্ভূক্ত হয়নি। চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশে কানাডিয়ান মিশনারিদের আগমন ঘটে। চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের প্রথম বিশপ হন মহামান্য বিশপ আলফ্রেড ল্য পাইয়োর, সিএসসি ১৯২৭-১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গে পাদ্রেয়াদোর ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি লাভ করে। ওই বছরের এপ্রিল মাসে পাদ্রীশিবপুর মিশনকে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের আওতাভূক্ত করা হয়।

এ সময়ে পাদ্রীশিবপুরের পাদ্রীয়ান জমিদারি ছিল, মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটি উন্নতমানের বালিকা বিদ্যালয় ছিল (যার নাম সেন্ট যোসেফ) এবং ছেলেদের জন্যে সেন্ট অ্যান্টনি নামে একটি বালক বিদ্যালয় ছিল। এছাড়া এখানে ৩৬০টি খ্রিস্টান পরিবারের স্থায়ী বসতি ছিল। গির্জাঘর, ফাদার এবং সিস্টারদের মোটামুটি বাসস্থান ছিল। পাদ্রীশিবপুর মিশনের খরচাদি মায়লাপুর (মাদ্রাজ) ধর্মপ্রদেশাধীন থাকা অবস্থায় পর্তুগাল থেকে বহন করা হতো। পাদ্রীশিবপুর মিশন চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশভূক্ত হওয়ায় ধর্মপ্রদেশে নতুন মাত্রা যোগ হয়।

চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ শুরু হওয়ার পর মাননীয় বিশপ মহোদয় তাঁর পরিষদ নিয়ে একটি নব পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, যার মধ্যে ছিল (১) আধ্যাত্মিক গঠন, (২) শিক্ষার উন্নতি সাধন, (৩) স্বাস্থ্যসেবা, (৪) সাংস্কৃতিক উন্নতি ও প্রসার, (৫) কৃষির উন্নতি, (৬) কারিগরি শিক্ষার প্রসার। চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের তৎকালীন বিশপ মহোদয়ের সাথে তাঁর বিজ্ঞ পরিষদের সুদূরপ্রসারী চিন্তা-চেতনা, কর্মপরিকল্পনা চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশে নতুন সোনালী যুগের সূচনা করে। যার ছোঁয়া পাদ্রীশিবপুর মিশনের গায়ে লেগে "পাদ্রীশিবপুরে"- এ "সোনালী যুগ"-এর উন্মেষ ঘটে। সেন্ট অ্যান্টনি মাইনর বিদ্যালয়টির উন্নতি করে উচ্চ বিদ্যালয় করার চিন্তা-ভাবনা আসে। কারণ, খ্রিস্টান ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার উন্নতি ছাড়া সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব না। তাই, নারিকেলবাড়ি, গৌরনদী, বরিশাল, নোয়াখালী নিয়ে এ চিন্তাধারা চলে।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে হলিক্রস ব্রাদারদের বাসস্থান করার জন্য একটি জমি ক্রয় করা হয়। স্থানীয় খ্রিস্টভক্তগণ এ মহতী উদ্দেশ্যর সাথে একাত্ম হয়ে স্বাগত জানায়। কেউ জমি দান ক'রে, কেউ জমি বদল ক'রে আবার কেউ জমি বিক্রি ক'রে মিশনারিদের চিন্তাধারাকে এগিয়ে নেয় এবং সাহায্য সহযোগিতা করেন। এজন্য অনেক খ্রিস্টান পরিবারের অবদান আছে। ডি'সিলভা জমিদারগণ জমি ও অর্থনৈতিক সহায়তা দিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দুর্ভিক্ষের কারণে ব্রাদারগণ হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টানদের জন্য তিনটি ভিন্ন নোঙ্গরখানা চলমান রাখেন। সেন্ট প্লাসিড স্কুল পাদ্রীশিবপুরে স্থানান্তর হয়। তৎকালীন বান্দরবান রাজার ছেলে এখানে পড়াশুনা করেন।

সামাজিক প্রেক্ষাপটঃ

পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান সমাজ পুরোহিত কেন্দ্রিক ছিল। সামাজিক নেতারা প্রাধান্য পেতো। অধিকাংশ পরিবারগুলো একান্নভুক্ত পরিবার ছিল। পরিবারের প্রধান কর্তা এবং শ্বাশুড়ির প্রাধান্য ছিল। ঝগড়া-বিবাদ, মিমাংসায় ফাদার এবং সমাজ নেতাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ছিল। এলাকায় পুলিশ-প্রশাসনের তেমন কোনো প্রাধান্য ছিল না। আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্তসমূহে ফাদারের মতামত চূড়ান্ত।

বিবাহের ক্ষেত্রে বর-কনের মতামতের চেয়ে তাদের অভিভাবকদের মতামত প্রাধান্য পেতো। যে বাড়িতে বিবাহ হতো, সে বাড়ির সামনে উঁচু টং-ঘর বানানো হতো এবং সন্ধ্যার পর ঢাক বাজানো হতে। এ পদ্ধতিকে 'দিয়ারা' নামে পরিচিত ছিল। বরের পোশাকে ধূতি-পাঞ্জাবি এবং কনের পোশাকে শাড়ি-ব্লাউজ, পেছনে কুচি দিয়ে পড়তো। মাথায় রিদ-বেল্ট বা চাঁদর দিতো।

অধিকাংশ পরিবারগুলো অর্থসঙ্কটে ছিল। ঘর-বাড়িগুলো কাঠের, বাঁশের, চাল নারা বা গোলপাতার ছিল। রাস্তাঘাট ভাঙ্গল-খানা-খোন্দরে ভরপুর ছিল। খোলা (ছ্যাতখানা) পায়খানার ছড়াছড়ি। রোগবালাই লেগেই থাকতো। মমতাময়ী হলিক্রস সিস্টারদের দুরদর্শিতায় পানিবাহিত রোগ রোধকল্পে কাছারি পুকুরের পানি পান করতে বাধ্য করা হয়। এমতাবস্থায় মিশনারিদের শিক্ষা-দীক্ষা, আধ্যাত্মিকতা, তাদের সহজ-সরল জীবন ব্যবস্থা সমাজে আমূল পরিবর্তন সাধন করে। আমরা তাদের সাধনার ফল। খ্রিস্টযাগে ল্যাটিন ভাষার পরিবর্তে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের এই পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীতে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় খ্রিস্টযাগ ও গান গাওয়ার প্রচলন শুরু হয়। আমরা চিরজীবন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

সামাজিক ও ধর্মীয় পার্বণে নানারকম খাবারের আয়োজন করা হতো। বেশকিছু খাবার ছিল যেগুলো অন্য এলাকা থেকে ভিন্নতর। এ ধরণের অপ্রচলিত খাদ্যতালিকা হ'তে স্মরণ করার জন্য কিছু নাম তুলে ধরা হলো।

পিঠাঃ দোদল, বিরিঙ্কা (বিবিকা), মিঠাই, বিরান, খেজুর, বিচ্‌কি, ভোদুয়া, পাস্তাইল, ক্ষীর পাটিসাপটা প্রভৃতি।

কারি (তরকারি)ঃ দোলমা, ওলমা, মরিচট্যাঙ্গা, বিন্দালু, মিঠা-ট্যাঙ্গা, টেম্পোরাদু, ভাঁপা-ইলিশ, পাতখোলা, কালদো কারি, শিং, ফলি মাছের খাইস্যা প্রভৃতি। বর্তমানে এর অনেক আইটেম পরিশ্রমের জন্য করা হয়না। এগুলো পাদ্রীশিবপুরের ঐতিহ্য যা অন্য এলাকা হ'তে স্বাদে-গন্ধে-রসনায়-বাসনায় তৃপ্তিতে অনন্য।

সেন্ট আলফ্রেড্‌স হাই স্কুল পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ আলফ্রেড লা পাইয়োর, সিএসসি মহোদয়ের নামের অনুকরণে সেন্ট আলফ্রেড্‌স উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সাথে সাথে পাদ্রীশিবপুরে সোনালি যুগের শুরু হয়। "সেন্ট যোসেফ" নামে ছেলেদের জন্য একটি বোর্ডিং খোলা হয়। সমস্ত শর্তাদি পূরণসাপেক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্থায়ী অনুমোদন লাভ করে। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে অত্র বিদ্যালয় হ'তে বাংলা, ইংরেজি, গণিত এ ৩টি বিষয়ে লেটারমার্কস নিয়ে ২ জন ছাত্র অনন্য ফলাফল লাভ করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। এদের মধ্যে হেমপ্রসাদ রত্ন অন্যতম। সাথে সাথে চারদিকে স্কুলের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ব্রাদার ডেনিস গডফ্রে, সিএসসি প্রতিষ্ঠাতা হেডমাস্টার নিয়োগ পান।

১৯৬৮ খ্রিঃ থেকে স্বর্গীয় বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি- এর অনুপ্রেরণায় এ স্কুলে সহ-শিক্ষা'র যাত্রা শুরু হয়। এই স্কুলের অনেক প্রাক্তণ শিক্ষার্থীরা সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে ভিসি, এয়ারচিফ, বিগ্রেডিয়ার, সচিব, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দেশে-প্রবাসে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

খেলাধুলাঃ ফুটবল, বাস্কেটবল, ব্যাটবল, হাডুডু, দাড়িয়াবান্ধা, ছিপবুড়িসহ বিভিন্ন খেলাধূলার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে, জেলা, বিভাগীয় এমনকি জাতীয় পর্যায়ে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) চ্যাম্পিয়নও হয়। ফুটবল খেলায় বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বেশ নামডাক ছিল।

স্টাডি ক্লাবঃ পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের দূর্বল বিষয়গুলোকে সবল করার লক্ষ্যে স্টাডি ক্লাবের মাধ্যমে গুণী শিক্ষকদের দ্বারা ছাত্রদের উন্নতি সাধন করা হতো।

দরিদ্র ছাত্র সহায়তাঃ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজ-কর্মের অংশ বিশেষ কাজ করে দরিদ্র ছেলেরা বেতন পরিশোধ করার সুযোগ পেতো। দরিদ্র তহবিল হ'তে অর্থনৈতিক সহায়তা ছিল। ফাদার-ব্রাদারদের নিজস্ব সাহায্য-সহযোগিতা এর সাথে যোগ হতো।

বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানঃ এটা বছরান্তে নিয়মিত করা হতো। সাথে নিয়মিত উপস্থিত থাকার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল।

ছাত্র সঞ্চয় প্রকল্পঃ প্রত্যেক ছাত্রকে তাঁর হাত-খরচ বাঁচিয়ে নিয়মিত সঞ্চয় করতে হতো। শ্রেণি-শিক্ষক সঞ্চয়ের হিসাব রাখতেন। উদ্দেশ্য ছিল সঞ্চয়মুখী করা এবং বার্ষিক পরীক্ষা ও এন্ট্রান্স (ম্যাট্রিক) পরীক্ষার ফি দিতে কোথাও হাত না পাতা।

অভিভাবক সভা/বাড়ি পরিদর্শনঃ অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হতো। কোনো ছেলে শ্রেণি কক্ষে অনুপস্থিত থাকলে বাড়িতে খোঁজ নেওয়া হতো। ছাত্ররা পরীক্ষায় খারাপ করলে তাদের অভিভাবকদের নিয়ে বিশেষ সভা করে প্রয়োজনীয় দিক্ নির্দেশনা দেওয়া হতো।

কিচেন গার্ডেনিংঃ ছাত্রদের বাড়িতে ভোজ্য সবজি চাষ করা হতো। শিক্ষকরা পরিদর্শনে যেতেন এবং এর জন্য তাদের নম্বর দেওয়া হতো।

মডেলিংঃ ছাত্ররা উঁই পোকার মাটি সংগ্রহ ক'রে বিভিন্ন পশু পাখির প্রকৃতি, ফল-ফলাদির মডেল বানিয়ে প্রদর্শন করতো। এর জন্য নম্বর বরাদ্দ ছিল।

কাবস্/স্কাউটিংসঃ ছাত্রদের মধ্য থেকে জুনিয়র ছাত্ররা কাবস্ এবং সিনিয়র ছাত্ররা স্কাউটিং-এ যোগ দিয়ে এর মাধ্যমে তারা জীবনে চলার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি জ্ঞান লাভ করতো। এর মাধ্যমে তাদের মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো হতো এবং বিভিন্ন জেলা-বিভাগীয়-জাতীয় পর্যায়ে জাম্বুরিতে যোগ দিয়ে ভালো ফলাফল করতো এবং পুরস্কার নিয়ে আসতো।

সাঁতার প্রতিযোগিতাঃ ছাত্রসহ এলাকা ভিত্তিক বিভিন্ন মহলে নৌকাবাইচ হতো এবং পুরস্কার বিতরণ করা হতো। বিশেষকরে, শ্রীমন্ত নদে ছাত্রদের জন্য সাঁতারের প্রতিযোগিতা হতো।

নাটকঃ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক-ঐতিহাসিক নাটক মঞ্চায়ন করা হতো। ছেলেরা, মেয়ে সেজে নাটকে অভিনয় করতো।

বাইস্কোপঃ সাপ্তাহিক, মাসিক ভিত্তিতে বাইস্কোপ দেখিয়ে ছাত্র এবং স্থানীয় গণমানুষের মানবিক চিন্তা-চেতনা বৃদ্ধি করা হতো।

কুটির শিল্পঃ সিস্টারগণ স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রী এবং পুরুষ-মহিলাদের কর্মমুখী করে গড়ে তোলার জন্য আয়-বৃদ্ধিমূলক কুটির শিল্পের প্রচলন করেন। উল্লেখ্য, নারিকেল তেল তৈরি, পি-নাট বাটার বানানো, পেন্সিল তৈরির কারখানা, গামছা তৈরির তাঁত শিল্প প্রভৃতি ছিল।

জি. টি. স্কুলঃ ব্রাদারদের পরিচালনায় প্রাইমারি শিক্ষকদের জন্য "গুরু প্রশিক্ষণ" বিদ্যালয় চালু করা হয়। বর্তমানে পি.টি.আই. ট্রেনিং-এর সমতুল্য। সেসময়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিশেষ অবদান রাখা হয়।

কৃষি প্রদর্শনীঃ ছাত্রদের কিচেন গার্ডেন এবং স্থানীয় কৃষকদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য বছরে একবার কৃষি প্রদর্শনী করে পুরস্কার দেওয়া হতো। সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকতেন। উল্লেখ্য যে ওই সময়ে এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে খুব একটা কৃষি প্রদর্শনী হতো না।

শাস্তিঃ ব্রাদারদের ভালোবাসার সাথে শাস্তিরও বিধান ছিল। ব্রাদারদের পকেটে কাঠের দন্ডের সাথে একটি লাল এবং আরেকটি কালো রঙের রাবার বাঁধা থাকতো। বলা হতো, কোনটি চাও ? ব্যাথার চেয়ে শব্দের তাড়নায় (সপাং সপাং) পঞ্চআত্মা উড়ে যেতো।

ফাতেমা স্বাস্থ্য কেন্দ্রঃ পাদ্রীশিবপুরের আরেকটি সোনালী মাইলফলক ১১ মে ১৯৩৬ খ্রি. স্বাস্থ্যসেবার জন্য অনন্য দ্বার "ফাতেমা স্বাস্থ্য কেন্দ্র"-এর শ্রদ্ধেয় মাদার আন্না এবং সিঃ উডলি, সিএসসি-এর হাত ধরে যাত্রা শুরু হয়। সেসময় অত্র এলাকায় মহিলারা চিকিৎসা সেবায় বড়ো অবহেলিত ছিল। এ সমস্ত সিস্টারগণ তাদের দেশ থেকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ নিয়ে চিকিৎসা চালিয়েছেন। তারা ম্যালেরিয়া, কলেরা, কালাজ্বর, পেটের পীড়া, কাওলা (জন্ডিস), দাঁতের চিকিৎসাসহ বিভিন্ন চিকিৎসায় বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। তাদের সুনাম এতো ছড়িয়ে পড়ে যে, চিকিৎসার জন্য নৌকায় এসে শ্রীমন্ত নদে লাইন ধরে অপেক্ষা করতো। তাদের থাকা-খাওয়া নৌকায়-ই সীমাবদ্ধ ছিল। বিশেষ করে, মুসলিম মহিলাগণ এসে সিস্টারদের দেখে খুবই অবাক হতো। সিস্টারগণ পুরুষ না মহিলা তা নিশ্চিত হয়ে সিস্টারদের চিকিৎসা নিতেন।

আমাদের সিস্টারগণ সেসময়ে ডমেস্টিক সায়েন্স (গার্হস্থ্য বিজ্ঞান), জেনারেল নার্সিং, ধাত্রী প্রশিক্ষণ, রোগ-প্রতিরোধ, স্বাস্থ্যসেবা প্রভৃতির উপর সিলেবাস প্রণয়ন করে বই লেখেন, পূর্ব বঙ্গ সরকারের অনুমোদন নেন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন এবং সরকারি অনুমোদনক্রমে সার্টিফিকেট দেন।

সিস্টারগণ যুবতীদের জন্য বাসন্তী ক্লাব, মায়েদের জন্য মাদার্স ক্লাব পরিচালনা করতেন।

যুবতীদের সঠিক পথে পরিচালনা, মায়েদের সংসার জীবন, সন্তান-সন্ততিদের লালন-পালন, শ্বশুর-শাশুড়িদের যত্ন, সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা এবং পারিবারিক শান্তির উপর শিক্ষা দিতেন। এছাড়াও, কুটির শিল্পের মাধ্যমে তারা এলাকার জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য অভুক্ত পরিবারের অন্ন যোগাতেন। সেলাই, নারিকেল তেল, নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে ম্যাট তৈরি, নারিকেলের আইচা দিয়ে বিভিন্ন জিনিস বানানো, পিনাট বাটার তৈরি ও পাট শিল্পের বিভিন্ন কারুকাজ দ্রব্য তৈরি করা প্রভৃতি। এল.এইচ.সি. সিস্টারগণ এবং সিঃ মেরী লিলিয়ান, এসএমআরএ, এ বিষয়ে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সিঃ মেরী লিলিয়ান, এসএমআরএ মহোদয়ার কাজের প্রতি আমরা চির কৃতজ্ঞ। আমরা তাঁর ব্রতীয় জীবনের ৬০ (ষাট) বছর পূর্তিতে তাঁকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই এবং সাথে সাথে তাঁর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সার্বিক মঙ্গল কামনা করি।

সিস্টারগণ বরিশাল জেনারেল হাসপাতালে ১৯৪৮ খ্রিঃ পর্যন্ত জনগণ ও সরকারকে চিকিৎসা সেবা দিয়ে সহায়তা করেছেন।

সিস্টারগণ স্থানীয়ভাবে মল-মূত্র, রক্তের প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষা করতেন। সিঃ উদলি, সিঃ অ্যালেক্স, সিঃ ডেমিয়্যান প্রমুখ চিকিৎসায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। এ ধারাবাহিকতা ১৯৬৫ খ্রিঃ পর্যন্ত বহাল ছিল।

পরবর্তীতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের হস্তক্ষেপে এ কাজে ছন্দপতন ঘটে। উল্লেখ্য, পানিবাহিত রোগ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকায় সকল খ্রিস্টান পরিবারগুলোকে কাছারি পুকুর হ'তে পানি পান করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে, পরিবারগুলো অনেক রোগ থেকে মুক্ত থাকতো। আমরা এ সকল করুণাময়ী প্রয়াত সিস্টারদের বিদেহী আত্মার চির কল্যাণ কামনা করি।

কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্র (এ. ডি. সি.)ঃ শ্রদ্ধেয় ব্রাদার কন্সট্যান্ট, সিএসসি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাপানি সৈন্যদের হাতে বন্দী হন, ফিলিপিন্সে বন্দীশিবিরে আটক ছিলেন। বন্দীশালায় ধান ছিটিয়ে দেওয়া হতো, এগুলো টুকিয়ে খুঁটে খুঁটে খেয়ে আধা গ্লাস পানি খেতেন। এভাবে দীর্ঘদিন পরে শীর্ণকায় দেহ নিয়ে মিশনারি হিসেবে বঙ্গদেশের পাদ্রীশিবপুরে আসেন। তিনি এখানে এসে আরেকটি সোনালি ইতিহাস সৃষ্টি করেন। তিনি সেন্ট যোসেফ'স বোর্ডিং পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। প্রায়ই গ্রামে যেতেন, কৃষকদের সাথে কথা বলতেন, সমস্যা শুনতেন - এ নিয়ে কী করা যায়, সে বিষয়ে চিন্তা করতেন। কৃষকদের সমস্যাসমূহ অবলোকন-অনুধাবন ক'রে একটিমাত্র বিষয় তাঁর মনে আসে যে কৃষির উন্নতি ছাড়া কৃষকদের আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব না। এজন্য আর্ন্তজাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্র, ফিলিপিন্স, গ্রাম উন্নয়নের কর্নধার কুমিল্লা একাডেমি, জয়দেবপুর বাংলাদেশ ধান গবেষণা কেন্দ্র, জয়দেবপুর কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন জায়গা হ'তে শর্টকোর্স প্রশিক্ষণ নিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ফিলিপিন্সে ধান গবেষণা কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় বাংলাদেশ ধান গবেষণা কেন্দ্রের তৎকালীন পরিচালকও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। হলিক্রস ব্রাদার সুপিরিয়র ও তৎকালীন বিশপ-এর সুপারিশক্রমে পাদ্রীশিবপুরে "কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্র" গড়ে তোলেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের আর্থিক উন্নতি, উচ্চ ফলনশীল ধানের আবাদ, অনাবাদী জমি আবাদ করা, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির সাথে কৃষকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া, উচ্চ ফলনশীল শাক-সবজী, ধান, পাট, সয়াবিন, বাঁধা কপি, ফুল কপি, ব্রকোলি, গাজর, উন্নত জাতের টম্যাটো, মূলা প্রভৃতি চাষের সাথে

কৃষকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এছাড়া, প্রজননের মাধ্যমে উন্নত গাভীর হাঁস-মুরগী, মৎস চাষসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা ও তাতে সফল হওয়া। অত্র অঞ্চলে পাওয়ার-টিলার, পাওয়ার পাম্প, পাওয়ার স্প্রে দিয়ে কৃষকদের সহায়তা দেওয়া। সমবায়ভিত্তিক কৃষকদল গঠন করা, সমবায় সমিতি গঠন করা, দলীয়ভাবে ইরি ব্লক করা, ক্রেডিট ইউনিয়নে সহায়তা দেওয়া। উল্লেখ্য, কুমিল্লা একাডেমি'র প্রতিষ্ঠাতা জনাব আখতার হামিদ খান সাহেব এ বিষয়ে তাঁর সশরীরে উপস্থিতি দ্বারা অনেক সহায়তা করেন। তৎকালীন সময়ের সরকারি কর্মকর্তাগণ সহায়তা করেন। ফিলিপিন্স থেকে উচ্চ ফলনশীল (High Yielding Varieties-HYV) ধানের বীজ এনে একইদিনে পাদ্রীশিবপুর ও জয়দেবপুরের মাটিতে দুই গাটা করে রোপন করা হয়। এতে, ব্রাদারকে অনেকে পাগল মনে করেন। পরে, ক্ষেত ভরা ঢেউ-খেলানো গোছাভরা ধানের ফলন দেখে কৃষকদের মন আনন্দে ভরে যায়। পরে, কৃষকেরা এই প্রযুক্তিগত তথ্য-জ্ঞান নিতে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নেন। ব্রাদার কন্সট্যান্টের আরেকটি গুণ - তিনি নিয়মিত প্রর্দশনী খামার করতেন যাতে কৃষকেরা শিক্ষণ ফল লাভ করতে পারে। কৃষকদের জন্য তাঁর চিন্তাধারা ছিল এরকম "দেখো, বিশ্বাস করো এবং বাস্তবতায় কাজ করো (Seeing in Believing)।

ব্রাদার কন্সট্যান্টের বড়ো সাফল্য সেন্ট আলফ্রেডস্ উচ্চ বিদ্যালয়ের সাথে যৌথ উদ্যোগে ছাত্রদের জন্য কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এজন্যে, ফিলিপিন্স হ'তে একজন কৃষি বিশেষজ্ঞ মিঃ আলেক্স রাবানল, এম. এজি-কে নিয়ে আসেন। সিলেবাস প্রনয়ন করেন ও বই লিখেন এবং ছাত্রদের মধ্যে তা প্রয়োগ করেন, ছাত্রদের বাড়িতে কিচেন গার্ডেনিং চালু করেন। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি.সি. সহ ৪টি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানদের নিমন্ত্রণ দেন। দেশ উন্নয়নে ছাত্রদের কৃষি শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন। পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়টি অনুধাবন করে মাধ্যমিক পর্যায়ে সিলেবাসে কৃষিশিক্ষা অর্ন্তভূক্ত করেন। জাতীয় পর্যায়ে এটি একটি মাইলফলক হয়ে আছে এবং থাকবে। শ্রদ্ধেয় ব্রাদারের এ সকল কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ওই ভি. সি. মহোদয় সেন্ট আলফ্রেডস হাই স্কুলের ছাত্রদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার অগ্রাধিকার ঘোষণা করেন। এই সুযোগ গ্রহণ করে অনেকে-ই সেই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নেন। তন্মেধ্যে, এ স্কুলের ছাত্র ড. আশরাফ আলী খান, নিজেই ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর (ভিসি), শ্রদ্ধেয় রাজেন স্যারের ছেলে বিকাশ দেবনাথ (এম. এজি), জেলা কৃষি কর্মকর্তা অন্যতম।

এছাড়াও, পাদ্রীশিবপুরের অনেক গৌরব ও ঐতিহ্য পর্দার অন্তরালে রয়ে গেছে যা হয়তো গবেষণা করলে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। মিশনারিদের সার্বিক অবদানের জন্য আমরা চির কৃতজ্ঞ এবং তাদের বিদেহী আত্মার কল্যাণ কামনা করি। আমেন।

"জয়ন্তী উৎসব: যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও বিবাহিত দম্পতি"[৫]

- এ্যালেক্সিস গোমেজ

ইতিহাস-ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ পাদ্রীশিবপুর। অত্র খ্রিস্টান ধর্মপল্লীর পথ-প্রদর্শিকা কুমারী মারীয়ার গীর্জার বয়স আজ ২৫০ বছরের উর্ধে। এই সুদীর্ঘতম মণ্ডলীর ইতিহাস পরিক্রমায় রয়েছে অপরিসীম আনন্দ-দয়া, আছে দুঃখ-কষ্ট, আছে গর্ব করার মতো অনেক পরম-প্রাপ্তি। তাই মহাগৌরবে এই ধর্মপল্লীর জয়ন্তী পালনের প্রাক্কালে আমরা স্নেহময়ী মা কুমারী মারীয়ার চরণতলে নিবেদন করি আমাদের সমস্ত আনন্দ-উল্লাস।

আড়াইশত বছরের পুরোনো খ্রিস্টান বলে আমাদের অহংকার কারণ সেই আদি যুগ থেকেই একইভাবে কাথলিক চার্চ কেন্দ্রিক সমস্ত শিক্ষা-সেবা-দীক্ষায় বেড়ে উঠি এবং অনুরূপভাবে আমাদের পরিবার-বংশ বৃদ্ধি লাভ করছে। আমরা রোমান কাথলিক।

খ্রিস্টমণ্ডলীর আদিষ্ট বিবাহ (সাক্রামেন্ত) সংস্কার গ্রহণের মধ্য দিয়ে পরিবার গঠিত হয় অর্থাৎ বর-কনের উপর মণ্ডলীর পদ্ধতিগত বিশেষ প্রার্থনা ও আর্শীবাদে প্রধানতঃ আত্মিকভাবে দু'জন পরিপক্ক বয়সের যুবক-যুবতী বন্ধন সৃষ্টি করে এক দেহ হয়ে ওঠে আর তাতে পরিবার ক্রমশঃ ফলবান হয় ও পরিজনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

সেই পরিবার বা বর-কনে দম্পত্তিরূপে (স্বামী-স্ত্রী) সমাজ ও জনমণ্ডলীতে পরিচিতি লাভ করে। তাই পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা পথ-প্রদর্শিকা কুমারী মারীয়ার গীর্জা থেকে অদ্যাবধি যতজন দম্পতি তথা বিশ্বের যে কোনো কাথলিক চার্চ থেকে পাদ্রীশিবপুরের সন্তান (Parishioner) সাক্রামেন্তীয় সংস্কার প্রাপ্ত দম্পতি ২৫-৫০ বছর বিশ্বস্ত থেকে পূর্ণতা অর্জন করেছেন আজকে তাদেরই মহান স্বর্ণ ও রৌপ্য জয়ন্তী যা পরিবার-সমাজ-মণ্ডলীতে ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ-আর্শীবাদ, আর ইহাই হলো ঈশ্বরীয় প্রভাবে সৃষ্টির মূলে প্রেম আর প্রেমের মূলে সৃষ্টি।

আজ আমাদের এই বৃহৎ পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লী পরিবারের বিবাহিত দম্পতিগণ জীবনের সর্বস্তরে বিশ্বস্ত ও পবিত্র থেকে ২৫-৫০ বছর অতিবাহিত করেছেন আর তাতে প্রতীয়মান হলো, পুণ্য বিবাহ সংস্কার ঈশ্বরের কৃপা দৃশ্যতঃ ফলবান।

অত্র ধর্মপল্লীর ১ জন ব্রতধারিণী ভগ্নি সিস্টার মেরী লিলিয়ান গোমেজ, এসএমআরএ, ব্রতীয় জীবনকালের ৬০ (ষাট) বছর অতিবাহিত করেছেন। আজ মহাগৌরবে তার সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হচ্ছে।

চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল শ্রদ্ধেয় ফাদার ফিলিপ ডি' রোজারিও-র স্বর্ণ জয়ন্তী ১৬ ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে পালিত হবে। তিনি ধর্মপ্রদেশের সবচেয়ে বয়োঃজ্যেষ্ঠ পুরোহিত।

শ্রদ্ধেয় ফাদার যোসেফ জীবন গোমেজ, শ্রদ্ধেয় ফাদার লরেন্স বরুণ গোমেজ, ও শ্রদ্ধেয় ফাদার লাজারুস কানু গোমেজ-এর রজত জয়ন্তী উৎসব আজ। তাদের পৌরহিত্য জীবনকাল ২৫ বছরের উর্ধে।

[৫]পাদ্রীশিবপুর জুবিলী স্মরণিকা – ২০১৬ খ্রি.

অত্র ধর্মপল্লীর একজন পবিত্র ক্রুশ সংঘের ব্রাদার লিনুস ডি' রোজারিও-র ২৫ বছর ব্রতীয় জীবনকাল অতিবাহিত করেছেন। আজ তাঁর রজত জয়ন্তী।

এছাড়া, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে কর্মরত ৬ জন সিস্টার ব্রতীয় জীবনের ২৫ বছরের উর্ধে পার করেছেন। আজ তাদের রজত জয়ন্তী উৎসব। কিন্তু তাদের অনেকজন দেশের বাইরে কর্মরত থাকায় আজকে এই মহা আনন্দমেলায় উপস্থিত থাকা সম্ভব হয়নি। মণ্ডলীর সেবায় নিবেদিত এই সেবক-সেবিকাদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তাদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

আবার যাজকদের মধ্য থেকে প্রভু বাংলাদেশের মহাধর্মপ্রদেশের মেষদের পরিচর্যার জন্য একজন বিচক্ষণ মেষপালক খুঁজে নিয়েছেন। এই ধর্মপল্লীর শ্রেষ্ঠতম সন্তানকে - আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি, তিনি বিশপীয় অভিষেকের ২৫ টি বছর সগৌরবে অতিবাহিত করেছেন। তাই আজ এই ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের নতুন দিনে বিশপের রৌপ্য জয়ন্তী উৎসবে পাদ্রীশিবপুর গ্রামে স্মরণকালের সবচেয়ে বড় আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

জুবিলী আমাদের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় জীবনের আনন্দপূর্ণ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা ঈশ্বর ও ভাই-মানুষের কাছে প্রকাশ করতে। অর্থাৎ জীবনের সমস্ত প্রাপ্তি মূল্যায়ন করতে, বিশেষভাবে পবিত্র পরিবার থেকে যিনি বা যারা মঙ্গলবাণী প্রচারে চিরকালীন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে ২৫-৫০টি বছর ব্রতীয় জীবনকাল অতিবাহিত করেছেন তাতেই খ্রিস্টমণ্ডলী আজ গৌরবান্বিত ও উল্লসিত।

অতএব, সর্বস্তরে স্বর্ণ ও রজত জয়ন্তী পালনের উদ্দেশ্যে অত্র ধর্মপল্লীর খ্রিস্টবিশ্বাসী সন্তানেরা যারা প্রধানত ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশালসহ উপকেন্দ্র ৩টি - মাটিভাঙ্গা, দেশান্তরকাঠী ও রাজাবাড়িয়া থেকে সমগ্র জুবিলী অনুষ্ঠান আড়ম্বরতার সাথে বাস্তবায়ন করতে বিভিন্নভাবে আন্তরিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেছেন তার জন্য তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি কেন্দ্রীয় জুবিলী কমিটি'র সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের যারা এই মহান জুবিলী উৎসব সফল করার জন্য আর্থিক সঙ্কটকালে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

স্থানীয় পর্যায়ে ৮টি ওয়ার্ডসহ দেশান্তরকাঠী, মাটিভাঙ্গা ও রাজাবাড়িয়ার খ্রিস্টভক্তদের পরিবার থেকে তথা ঢাকা মহানগরী থেকে অত্র ধর্মপল্লীর বিশিষ্ট ও সমাজমনস্ক ব্যক্তিবর্গ - ব্যক্তিগতভাবে অর্থ সাহায্য দিয়ে সমগ্র জুবিলী অনুষ্ঠানটি সফল করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। এসকল দয়ালু-দানশীল খ্রিস্টভক্তদের জন্য ঈশ্বরীয় আশীর্বাদ-প্রার্থনাসহ কেন্দ্রিয় জুবিলী কমিটি'র চেয়ারম্যান ও পাল-পুরোহিতের নামে অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

স্মরণকালের এই শ্রেষ্ঠতম প্রকাশনায় যারা পুণ্যবাণী ও মূল্যবান লেখা দিয়েছেন তাদেরকে বিনম্র চিত্তে আর একবার ধন্যবাদ ও সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি। এছাড়া, সম্পাদক মণ্ডলীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই স্মরণিকাখানি প্রকাশিত হলো। ব্যক্তিগতভাবে আমার অজ্ঞতা ও সীমিত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও প্রকাশনা কমিটির আন্তরিক ইচ্ছায় অবশেষে আমাকে এই প্রকাশনার দায়িত্ব বহন করতে হয়েছে। এতে অজস্র ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে সেসব নিজ নিজ গুণে-জ্ঞানে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

আমরা প্রভুর মহিমা গান করি কারণ এই সুন্দর নতুন দিনে অনেকজন পুণ্য মানুষের শুভপদচারণায় পাদ্রীশিবপুরের মাটি হলো ধন্য - পবিত্র। এই পরম প্রাপ্তির সাথে আমরা সকল অতিথিদের আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আর একবার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। এছাড়া, সম্মানিত অতিথিবর্গকে যথাযথভাবে আদর-যত্ন করতে পারিনি ব'লে আমাদের সমস্ত অবহেলা ও অপারগতার জন্য বিনয়ের সাথে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমাদের প্রার্থনা এ মহান জুবিলী উৎসবের আর্শীবাদে ধর্মপল্লীর পরিবারগুলোতে আরও যাজকীয় ও ব্রতধারী-ব্রতধারিণীর আহ্বান বৃদ্ধি পাক। জগতের সকল পরিবারের মানুষ সুখী হোক।

পথ প্রর্দশিকা কুমারী মারীয়ার গীর্জা [৬]

– অঞ্জন বাড়ৈ

"বৃথাই নির্মাতাদের চেষ্টা যদি সদাপ্রভু নিজেই নির্মাণ না করেন"। সদাপ্রভুর নির্মাণ কাজে সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছে পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের সকল খ্রিস্টভক্ত। সময়ের হাত ধরে পাদ্রীশিবপুরের পথ প্রর্দশিকা মারীয়ার গীর্জাটিও পেড়িয়ে এসেছে কয়েক শতাব্দী। সময়ের পথ পরিক্রমায় প্রয়োজন হয় গীর্জাটির নতুন সংস্করণ। শুরু হয় নতুন গীর্জা নির্মাণের প্রক্রিয়া ও কাজ। পাদ্রীশিবপুর প্যারিগের বর্তমান প্রজন্ম সাক্ষী হল এক নতুন ইতিহাসের। প্রায় এক বছর ধরে চলছে পথ প্রর্দশিকা মারীয়ার গীর্জা নির্মানের কাজ। পাদ্রীশিবপুরের অবস্থানরত ও বিভিন্ন শহরে অবস্থানরত পাদ্রীশিবপুরবাসী প্রত্যক্ষ করছেন নির্মাণ প্রক্রিয়া। পাদ্রীশিবপুরে পর্তুগীজ মিশনারীগণ এসেছেন ষোড়শ শতাব্দীতে। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত পথ প্রর্দশিকা কুমারীমারীয়ার গীর্জায় উৎসর্গ হয়ে আসছে খিস্টযাগ। পাদ্রীশিবপুরবাসী মা মারীয়ার এই গীর্জায় ও প্রার্থনায় অতিক্রম করেছে কয়েক পুরুষ। পেয়েছে অসীম করুণা ও আর্শিবাদ, যা কলমের মাধ্যমে বা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

গীর্জাঘরটি নির্মাণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর পাদ্রীশিবপুরের সকল বয়সের, অর্থনৈতিক অবস্থার, ভৌগলিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল খ্রীষ্টভক্ত একযোগে সাধ্যমত কাজ করে যাচ্ছেন, যা মা মারীয়ার আর্শিবাদ। গীর্জা নির্মাণকে কেন্দ্র করে পাদ্রীশিবপুরের সকল খ্রীষ্টভক্ত হয়ে উঠেছে একমন, একপ্রাণ। প্রাণপ্রিয় এ গীর্জাঘরটিকে ঘিরে আবর্তিত খ্রীষ্টভক্তদের জীবন যাত্রা শুধু আধ্যাত্বিকভাবেই নয় সামাজিকভাবেও খ্রিস্টের সাক্ষ্যবহনে উদ্বুদ্ধ করেছে। মা মারীয়ার অপার করুণা, সকল খ্রীষ্টভক্তের প্রার্থনা ও প্রচেষ্টায় গীর্জা নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে এবং প্রায় শেষ প্রান্তে। ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকেই শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে আমাদের বহু প্রতীক্ষিত পথ প্রর্দশিকা কুমারী মারীয়ার গীর্জা। বর্তমান গীর্জাটি পূর্বের তুলনায় অধিক সংখ্যক লোক ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন। বর্তমান গীর্জাটি পূর্বের অবস্থানের থেকে কিছুটা উত্তর দিকে সরে গিয়ে দক্ষিণে সামনের অংশে বেশ বড় খোলা জায়গা রেখে নির্মাণ করা হয়েছে। গীর্জার পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে রাখা হয়েছে বেশ বড় বারান্দা। গীর্জার দৈর্ঘ্য ৭৫ ফুট ও প্রস্থ ৬০ ফুট। এর ধারন ক্ষমতা প্রায় ৮০০। এর পাশেই নির্মাণ করা হবে পথ প্রর্দশিকা কুমারী মারীয়ার প্রতিকৃতি সম্বলিত গ্রটো। পাদ্রীশিবপুরের গীর্জার ঘন্টাধ্বনি শুধু খ্রীষ্টভক্তদের কাছেই নয় পুরো

[৬] শ্রীমন্ত তটে – ২০০৪ PCWA, Dhaka

এলাকা ও পরিচিত সকলের অতি পরিচিত। সুমধুর ধ্বনির এ ঘন্টাটি পূনঃস্থাপন করা হবে। গীর্জাটির আকার-আকৃতি ও অবস্থান পরিবর্তনের কারণে এর আশে পাশের নিকট ভৌত কাঠামোতেও পরিবর্তন করা হয়েছে এবং আরও পরিবর্তন করা হবে। যেমন, পুরোহিতগণের বাসস্থান, প্যারিগ হল ইত্যাদিরও কিছু অবস্থানগত পরিবর্তন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। গীর্জার ভেতরের সাজসজ্জাও নতুন আঙ্গিকে পূনঃবিন্যাস করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে বেঞ্চ, বিভিন্ন প্রতিমূর্তির অবস্থান, সাউন্ড সিষ্টেম ইত্যাদি। গীর্জার অঙ্গসজ্জার যাই হোকনা কেন প্রকৃত পক্ষে আমাদের মনের সৌন্দর্যই ঈশ্বরের নিকট বেশী গ্রহণযোগ্য।

বিগত একটি বছর আমাদের গির্জাঘরটির কাজ বিরামহীনভাবে এগিয়ে চলেছে। আর পাশাপাশি চলেছে এর জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা। এখানে স্মরণ করতে হয় যে, চার বছর আগে আমাদের শ্রদ্ধেয় ধর্মপাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, সিএসসি পালকীয় সম্মেলনীতে আমাদের গির্জা নির্মানের জন্য ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং আহ্বান জানিয়েছিলেন স্থানীয়ভাবে যাতে গীর্জা নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়। আর প্রাক্তন পাল পুরোহিত হিউবার্ট রবি গমেজ, সিএসসি প্রথমে প্যারিগ কাউন্সিল এবং পরে বিভিন্ন শহরে বসবাসরত পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টভক্তদের সাথে মতবিনিময় করেছিলেন একই বিষয় নিয়ে। ফলে সবার মাঝেই আমাদের নতুন গীর্জার জন্য একটি আবেদন সৃষ্টি হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় এবং শহরে অবস্থানরত পাদ্রীশিপুরের খ্রিস্টভক্তদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল কেন্দ্রীয় গীর্জা নির্মাণ তহবিল কমিটি। আর শ্রদ্ধেয় প্রভু বিশপের আন্তরিকতায় এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের শতকরা আশিভাগ অর্থ সংগ্রহ করার পাশাপাশি স্থানীয় অর্থাৎ পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টভক্তদের কাছ থেকে শতকরা কুড়ি ভাগ অর্থ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় কমিটি।

অর্থ সংগ্রহসহ অন্যান্য প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এই প্রক্রিয়ায় এসে বিভিন্ন অঞ্চলে পাদ্রীশিবপুরবাসীর মাঝে যে ঐক্য লক্ষ্য করেছি তা সত্যিকার অর্থে মা মারীয়ার আর্শিবাদ। বিশেষ করে পাল পুরোহিত রেভাঃ ফাদার হিউবার্ট রবি গমেজ, সিএসসি এ ব্যাপারে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, ঢাকা পাদ্রীশিবপুরের প্যারিশ কাউন্সিল স্বীকৃত একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন হিসেবে ঢাকাতে গির্জা নির্মাণ তহবিলের অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব লাভ করে। ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভের পর এর কর্মকর্তাগণ তা ঈশ্বর কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। একাজে সকলের সম্পৃক্ততার বিষয়টি PCWA-এ এর কার্যকরী পরিষদের সভায় বিষদভাবে আলোচিত হয় এবং আমাদের মাননীয় উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। তাঁদের পরামর্শ অনুসারে একটি মতবিনিময় সভা আহব্বান করা হয়। PCWA-এ এর প্রেসিডেন্ট এর সভাপতিত্বে এ সভায় পাদ্রীশিবপুরের প্রায় তিন শতাধিক ঢাকাস্থ পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। সকলের সাথে পরামর্শক্রমে ঢাকার অর্থ সংগ্রহের জন্য একটি অর্থ সংগ্রহ উপকমিটি গঠন করা হয় যা সরাসরি পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে একাজ সম্পন্ন করার জন্য বিগত ১৬/০৫/০৩ খ্রিঃ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ উপকমিটির সফল নেতৃত্বদান করেন মিঃ জেরী বেসিল গোমেজ যিনি এসোসিয়েশনের সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করে চলেছেন। আমরা লক্ষ্য করেছি মত বিনিময় সভাতেই আমাদের ধর্মপল্লীর সবাই এ বিষয়ে দারুণ উৎসাহ নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

যদিও ঢাকায় সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি উপ কমিটি গঠন করা হয়েছিল তারা মনে করেছেন যে এত বড় কাজে আরও অধিক লোকের অবদান থাকা একান্ত প্রয়োজন। আর এ চিন্তা থেকেই ঢাকা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলকে কয়েকটি ইউনিটে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক ইউনিটে অর্থ সংগ্রহের জন্য এক বা একাধিক অর্থ সংগ্রহকারী মনোনিত করা হয়। অর্থ সংগ্রহকারীগণ বিনা পারিশ্রমিকে এবং বিনা যাতায়াত ভাতায় নিজের শ্রম, সময় এবং অর্থ ব্যয় করে অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব পবিত্রভাবে এবং সার্থকতার সাথে সম্পন্ন করেন। গীর্জার জন্য তাদের এ ত্যাগের পুরস্কার একমাত্র পিতা ঈশ্বরই দিতে পারেন। কাজের সুবিধার্থে এবং প্রতারনা এড়ানোর জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, ঢাকা পরিচয়পত্র প্রদান করেছে। এছাড়া কিস্তিতে টাকা পরিশোধ করার সুযোগ সৃষ্টি করে একটি কন্ট্রাক্ট ফরম ছাপানো হয়েছে। অর্থ সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থ সংগ্রহ কমিটি কর্তৃক সরবরাহকৃত রশিদবহি ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের সেবাকর্মীগণ চুক্তিপত্রে উল্লেখিত তারিখ অনুসারে বিভিন্ন ঘরে ঘরে গিয়ে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। অর্থ সংগ্রহকারীগই সংগৃহীত অর্থ প্রতিমাসের ২৬ তারিখের মধ্যেই ঢাকা অর্থ সংগ্রহ কমিটির ট্রেজারার আলবার্ট প্রশান্ত গোমেজের কাছে জমা দিয়েছেন এবং তিনি তা মাননীয় প্রভু বিশপ প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, সিএসসি এর একাউন্টে জমা দিয়েছেন। এখানে উল্লেখ করা একান্তই প্রয়োজন যে গীর্জার জন্য সংগৃহীত অর্থ সম্পূর্ণই বিশপের একাউন্টে জমা দেয়া হয়েছে। যাতায়াতসহ অন্যান্য খরচ অর্থসংগ্রহকারীগন ব্যক্তিগতভাবে বহন করেছেন। এমনকি এ কার্যক্রমের জন্য প্রস্তুতিমূলক ব্যয় সম্পূর্ণই পাদ্রীশিবপুর খ্রীষ্টান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন বহন করেছে।

ঢাকাস্থ অর্থ কমিটির কাজের সমন্বয়ের জন্য বিভিন্ন সময়ে এলাকার অর্থ সংগ্রহকারী, উপদেষ্টা পরিষদ এবং এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাগণ মতবিনিময় সভায় মিলিত হয়েছেন। বিগত বছরে এরূপ তিনটি মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ মত বিনিময় সভার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় বিভিন্ন উদারমনা ব্যক্তিবর্গের সৌজন্যে নির্বাহ করা হয়েছে। এ মতবিনিময় সভায় সকল অর্থ সংগ্রহকারীগণ নিজ নিজ অভিজ্ঞতা, সুবিধা অসুবিধা এবং বিভিন্ন পরামর্শমূলক প্রস্তাব দিয়েছেন। যার আলোকে পরবর্তী কর্মপন্থা নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকাস্থ অর্থ সংগ্রহ কমিটি তিনটি বিশেষ সভা করেছে যেখানে উপদেষ্টা পরিষদের সম্মানিত সদস্য মিঃ আরনল্ড অরুন গোমেজ এবং এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মিঃ যোসেফ ডি' রোজারিও উপস্থিত ছিলেন। আমাদের ঢাকার পক্ষে কেন্দ্রীয় অর্থ সংগ্রহ কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করেছেন মিঃ আরনল্ড অরুন গোমেজ, মিঃ লরেন্স শ্যামল গোমেজ এবং মিঃ আলবার্ট প্রশান্ত গোমেজ। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে পাদ্রীশিবপুর, ঢাকা, খুলনা এবং চট্টগ্রামে কেন্দ্রীয় অর্থ সংগ্রহ কমিটির আলোচনা সভায় বসেছেন এবং আমাদের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। তবে যা কিছুই করা হয়েছে সবকিছুই পাদ্রীশিবপুর খ্রীষ্টান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, ঢাকা এর সাথে সহভাগিতার মাধ্যমেই। আর আপনারা ভালো করেই জানেন যে আমরা পাদ্রীশিবপুর খ্রীষ্টান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের বিগত বার্ষিক সাধারন সভা যা ১৬/১২/০৩ খ্রীঃ তেজগাঁওস্থ কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানেও গীর্জা তহবিল সংগ্রহের সর্বশেষ অবস্থার একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছিলাম।

অর্থ সংগ্রহ এবং যোগাযোগ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করতে গিয়ে আমরা অর্জন করেছি নানা অভিজ্ঞতা। পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টভক্তগণ অর্থনৈতিকভাবে যেমন অবস্থানেই থাকেননা কেন উদারভাবে দেয়ার যে দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছি তা কেবল ঐশ্ব পরিকল্পনার অংশই নয় - পৃথিবীতে খ্রিস্টের কাজের অংশও বটে এখানে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে চাই। একজন স্থানীয় খ্রিস্টভক্ত যিনি পরিবার প্রতিপালনে হিমসিম খাচ্ছেন। তিনি প্রথমে জানালেন যে তার পক্ষে গীর্জা তহবিলে অর্থ দান করার কোন উপায়ই নেই। তার ঘরে খাবার নেই। কিন্তু একটু পরেই আবার তিনি ফিরে এলেন নিজের বাঁশ ঝাড় থেকে বাঁশ বিক্রি করে এবং ক্রেতাকে অনুরোধ করলেন বাঁশের দাম যেন গির্জা তহবিলে দেয়া হয়। তিনি নিজের সবটুকু সামর্থ্য দিয়ে গির্জা নির্মাণে অবদান রাখলেন। এদানের তুলনা-কি হতে পারে তা কেবল সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই জানেন। এ ঘটনা আমাদের শুধু অভিভূতই করেনি, করেছে আপ্লুতও। এমনিভাবে অর্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছল অনেকেই সামর্থ্যের চেয়ে বেশি দিতে না পারায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এমন অভিজ্ঞতা আমাদেরকে কৃতার্থ করেছে এবং তাদের দুঃখে আমরা আরও বেশি উৎসাহিত হয়েছি এ কাজে অধিক সময় দিতে। এলাকা ভিত্তিক অর্থ সংগ্রহকারীগণ বিভিন্ন মতবিনিময় সভায় তাদের নানামুখী অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেছেন। অপেক্ষাকৃত অর্থনৈতিকভাবে কম স্বচ্ছল ব্যক্তিগণ তাদের কষ্টার্জিত অর্থ দান করেছেন তার পুরস্কার স্বয়ং পরমেশ্বরই নির্ধারণ করবেন। বাস্তবে অর্থ সংগ্রহ প্রক্রিয়া একটি কঠিন কাজ। সংগ্রহকারীগণ কোন কোন বাসায় বহুবার গিয়েও হয়তো আশানুরূপ সাড়া পায়নি। আবার যেহেতু সংগ্রহকারীগণ ব্যক্তিগত ব্যস্ততার কারণে যথাযথভাবে যোগাযোগও রক্ষা করতে পারেননি তবুও আমাদের সবার মাঝে যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা ছিল তার কোন তুলনা হতে পারে না। আমরা এমনও লক্ষ্য করেছি যে আমাদের খ্রিস্টভক্তদের কেহ কহ নিজ থেকে এসেও আমাদের সাথে যোগাযোগ করে তাঁর প্রদেয় অর্থ প্রদান করেছেন। আবার আমাদের বিব্রতকর অভিজ্ঞতাও যে নেই তা বলা যাবে না, তবে তার সংখ্যা নিতান্তই কম। অনেক সময় নিজেদের অর্থ এবং সময় ব্যয় করে অনেকের কাছে গিয়ে হয়তো কোন অনুদান পাওয়া যায়নি। আবার কারো কারো কাছে বার বার যাওয়ার পরে জিজ্ঞাসার সম্মুখিন হতে হয়েছে সংগ্রহকারীগণ কোন কমিশন পান কিনা! তবুও আমাদের মাঝে আজ পরিতৃপ্তির এক পরিপূর্ণতা বিরাজ করছে আমরা পেরেছি আমাদের পবিত্র দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সাথে পালন করতে। আমাদের ঢাকাকে দেয়া টার্গেট আমরা মা মারীয়ার পরম কৃপায় এবং আমাদের খ্রিস্টভক্তদের আন্তরিকতায় সংগ্রহ করতে প্রায় সক্ষম হয়েছি। আমরা মনে করি এ সাফল্য আমাদের সবার। তাই আজকে আমাদের প্রভু যীশুর জন্মদিনে আপনাদের প্রতি আমাদের একান্ত কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপণ করছি। গির্জা নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের কাজ ও অনুদানের পুরস্কার স্বয়ং প্রভু যীশু খ্রিস্টই দান করবেন। পিতা পরমেশ্বরের বাণীই স্মরণ করিয়ে দেয় যে গির্জাঘর নির্মাণ স্বয়ং ঈশ্বরের কাজ। "তোমরা আমার জন্য কিরূপ গৃহ নির্মাণ করিবে? আমার বিশ্রাম স্থান কোন স্থান? এ সকলই তো আমার হস্ত দ্বারা নির্মিত; তাই এই সকল উৎপন্ন হইল"। (যিশাঃ ৬৬ঃ ১-১)

তৃতীয় অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের প্রয়াত বিশিষ্টজনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

(ক) পাদ্রীশিবপুর: প্রয়াত বিশেষ ব্যক্তিবর্গ

রামুয়েল ফ্রান্সিস গোমেজ[৭]

জন্ম: ২৩শে নভেম্বর, ১৮৯১ খ্রি. মৃত্যু ১১ই আগস্ট ১৯৮১ খ্রি.

- পাদ্রীশিবপুরের জনৈক লেখক

স্বর্গীয় রামুয়েল ফ্রান্সিস গোমেজ এক সম্ভ্রান্ত খ্রীষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ২৩শে নভেম্বর ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে। বাবার নাম এডুইন ডানিয়েল গোমেজ ও মায়ের নাম এলিজা গোমেজ। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১১ই আগষ্ট ১৯৮১ খ্রীঃ । তিনি কিছু কিছু লেখাপড়া জানতেন। তার পেশা ছিল মনিহারি দোকান।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি (রামু) ছিলেন দীর্ঘদেহী সুপুরুষ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। যৌবন বয়সের আমলে গান বাজনার প্রতি খুবই অনুরাগী হয়ে উঠেন। তিনি ছিলেন একজন ধর্মভিরু লোক। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে তিনি নিয়মিত যোগদান করতেন। তিনি ছিলেন একজন সদালাপী ব্যক্তি। সবার সাথে তিনি হাসিমুখে কথা বলতেন এবং সদ্ব্যবহার করতেন। কারো প্রতি তিনি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করতেন না।

তার প্রথম স্ত্রী কোন সন্তানাদি না রেখে মারা গেলে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তিনি পাঁচকন্যা ও তিন পুত্র সন্তানের যোগ্য পিতা ছিলেন। তার দ্বিতীয় কন্যা সোফিয়া "প্রেরিতগণের রাণী মারীয়া সঙ্গিণী সংঘ" (এস এম আর এ) সম্প্রদায়ের একজন সিস্টার। যিনি সিস্টার মেরী লিলিয়ান এস এম আর এ নামে সকলের কাছে সুপরিচিত। বর্তমানে তিনি ঢাকায় জাগরণী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিচালিকা। রামুয়েলের জ্যেষ্ঠা কন্যার বড় মেয়ে সিঃ আরতী ডিঃ কস্তা এল এইচ সি মন্ডলীর ক্ষুদ্র সেবিকা সংঘের মহাপরিচালক (সুপরিয়ার জেনারেল)। তার পারিবারিক জীবন ছিল বেশ সুশৃঙ্খল। পারিবারিক নানা অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তিনি তার ছেলেমেয়েদেকে সু-সন্তান করে গড়ে তুলেছিলেন।

রামুয়েল শৈশবকাল থেকে গান বাজনার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। যেখানে গান বাজনার সুর শুনতেন শত বাধা থাকতেও তিনি সেখানে ছুটে চলে যেতেন এবং আসনে গিয়ে বসতেন। এই সময় জনৈক হিন্দু ব্রাহ্মণ কালী প্রসন্ন চক্রবর্তী এর সান্নিধ্যে আসেন। চক্রবর্তী মশায় স্বর্গীয় জেরমান ডিঃ রোজারিও (পন্ডিত)-এর সাহায্যে সুসমাচার থেকে প্রভু যীশুর জীবনীর উপরে (জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থান পর্যন্ত) তিনটি অংশে পদাবলী কীর্তন গান রচনা ও সুরারোপ করেন। এ ব্যাপারে স্বর্গীয় ফিলিপ ডি'কস্তা (যিনি পোষ্ট মাষ্টার নামে পরিচিত ছিলেন) চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে গান রচনায় সহায়তা করেছিলেন। রামুয়েল রীতিমত চক্রবর্তী মশায়ের নিকট কীর্তন গানের তালিম নিতে থাকেন। তিনি এই গানের শিক্ষার আসর তার দোকানে বসাতেন এবং এজন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, তার ব্যবসায় প্রভুত ক্ষতি হতে থাকে। শোনা যায় এজন্য তার বাবা রাগ করে তার হারমোনিয়ামটি নিকটবর্তী পুকুরে (কাছারি পুকুর) ফেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু এতেও তিনি দমে যান নাই। হারমোনিয়ামটি পুনরুদ্ধার করে গান সাধনা করতে থাকেন।

---

[৭] Chittagong Jubilee Souvenir 2000

রামুয়েল একজন দক্ষ ও সুনিপুন কীর্তনীয়া হওয়ার জন্য প্রথম থেকে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন। তিনি তার গানের জন্য একটি দল গঠন করেন। যেহেতু কীর্তন গান সাধারণত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা গেয়ে থাকে, যেহেতু তার গানের দলে বেশ সংখ্যক হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকও নিয়েছিলেন। রামুয়েল এই গান গেয়ে জীবিকার্জন করতেন না, তবে এটা ছিল তার নেশা, তিনি পাড়ায় পাড়ায় গান পরিবেশন করতেন। তিনি প্রথমবার গান পরিবেশন করেন স্বর্গীয় ফিলিপ ডিঃ কস্তার বাড়িতে (পন্ডিত বাড়ী)। এই গান শোনার জন্য দূরদূরান্ত থেকে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে শত শত লোক গানে আসরে আসতো। অনেকেই এই পালা গান মানত করত এবং বিভিন্ন রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত হতো। রামুয়েল তার সুমধুর সুর ও অঙ্গ-ভঙ্গিমা দ্বারা শত শত শ্রোতামন্ডলীকে মুগ্ধ করে দিতেন। তিনি যীশু পালা গান করে খিস্টের বাণী সকলের কাছে পৌঁছে দিতেন। এইভাবেই তিনি খ্রীষ্টকে প্রচার করেছিলেন অ-খ্রিস্টান ভাই-বোনদের কাছে। আজও তার কিছু শিষ্য এ পালা গান করে থাকে। তন্মধ্যে ডমিনিক গোমেজ, আলবারিস গোমেজ ও উইলসন ধলু গোমেজ অন্যতম। কয়েক বছর আগে, ডমিনিক গোমেজ তার দল শ্রদ্ধেয় ফাঃ যোসেফ জীবন গোমেজের একান্ত প্রচেষ্টায় ঢাকায় গিয়ে বাণী দীপ্তির মাধ্যমে এ পালা গানের কিয়দংশ ক্যাসেট করে আসে। এভাবে রামুয়েল গোমেজ তার পালা গানের মধ্য দিয়ে শুধু পাদ্রীশিবপুরবাসীরাই নয়, সারাদেশে যারা পালাগানের ক্যাসেট শুনবে, তাদের মাঝে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আমরা তার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

ডাক্তার ফ্রান্সিস গোমেজ – একজন সমাজ সেবক

জন্ম: ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯০১; মৃত্যু: ২৮শে মে, ১৯৭২ খ্রি.

– ফা: লরেন্স বরুন গোমেজ ও মেরীলিন গোমেজ মীরা

পাদ্রীশিবপুরে মোক্তার বাড়ি একটি ঐতিহ্যবাহী বাড়ি। এই বাড়ির মি. এরমান গোমেজের জেষ্ঠ্য পুত্র মি. ফ্রান্সিস গোমেজ যিনি ডাক্তার ফ্রান্সিস হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন যে মোক্তার বাড়ি পাদ্রীশিবপুরে একটি ঐতিহ্যবাহী জমিদার বাড়ি। যদিও সময়ের পরিক্রমায় বর্তমানে সেই আগেকার অবস্থা নেই। তবে এখনও হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান সবাই এই বাড়িকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখে।

পাদ্রীশিবপুরের বুকে সমাজসেবা এবং বিবিধ গুণাবলীর যেসমস্ত ব্যক্তি ছিলেন তাদের অনেকেই স্মরণীয় এবং বরণীয় হয়ে আছেন। আমাদের সাথে রক্তের সম্পর্কে নিতান্তই একজন স্বজন ব্যক্তি ছিলেন ডাক্তার ফ্রান্সিস গোমেজ। তাঁকে আমরা দেখেছি খুব কাছ থেকে। একজন আদর্শ পরিবার প্রধান হিসেবে তিনি সংসারের সবদিকে নজর রাখতেন এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতেন। কিন্তু তাঁকে আমরা কখনো কঠোর হতে বা কতৃত্ববাদী হতে দেখিনি। বরং তিনি সন্তানদের কাছে ছিলেন দায়িত্বশীল পিতা। আর আমাদের কাছে অর্থাৎ নাতি-নাতনীদের কাছে ছিলেন রসিক পুরুষ। দৈনন্দিন জীবনে তিনি প্রথমেই ভোর বেলা প্রতিদিন পবিত্র -খ্রিস্টযাগে যোগদান করতেন এবং মিশা থেকে ফিরে এসে ঘরে আবার বিশেষ প্রার্থনা করতেন এবং এর পরেই তিনি সকালের নাস্তা গ্রহণ করতেন। নাস্তা শেষে তিনি প্রতিদিন বাজারে যেতেন এজন্য যে যাতে করে পরিবারের জন্যে একেবারে তাজা ও

সবচেয়ে ভালো মাছটি কিনতে পারেন। তিনি ছিলেন বেশ ভোজন রসিক তাই যখনই ভালো কিছু পেতেন তা কিনতে সামান্যটুকু কুণ্ঠা বোধ করতেন না। তিনিই প্রথম পাদ্রীশিবপুরে টর্চলাইট এনেছিলেন। আর তখন এর আলো দেখে অনেকেই আশ্চর্য্য হয়ে যেতো।

ডাক্তার হিসেবে তিনি সবার প্রিয় ছিলেন এজন্যে যে ঐ সময়ে বিশেষ করে বৃটিশ শাসনের শেষ দিকে এবং পাকিস্তান শাসনামলে আমাদের গ্রামে সুচিকিৎসার বিশেষ অভাব ছিল। সরকারী ডাক্তারখানা যদিও ছিল সেখানে ডাক্তারের দেখা তেমন একটা মিলতো না। সেখানে কাজ করতো এক ব্যক্তি। তার মিকচারের উপরেই মানুষের ভরসা করা ছাড়া উপায় ছিলো না। কিন্তু ডাক্তার ফ্রান্সিস হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করলেও রোগীদের প্রতি তিনি ছিলেন আন্তরিক। বেশীরভাগ সময়ে তিনি ঘরেই থাকতেন এবং রোগী দেখতেন। তার বিনিময়ে তিনি সামান্য পারিশ্রমিক নিতেন। যেহেতু তিনি জমিদার পরিবারের সন্তান ছিলেন সেহেতু অভাব বলতে কিছুই ছিলো না। জমি থেকে যা আয় হতো তাতে স্বচ্ছলভাবে তথা আড়ম্বরতার সাথেই তার পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করা হতো। তাই যদি কোন রোগী পয়সা দিতে অপারগ হতেন তবে তিনি তাদের থেকে কোন পয়সা নিতেন না। তিনি মানুষের বিপদের বন্ধু ছিলেন। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা যখনই হোক কোন বাড়িতে গিয়ে রোগী দেখতে হলে তিনি কখনোই না বলতেন না। এমনকি অনেক দূরে বা অনেক রাত হলেও তিনি রোগীকে প্রাধান্য দিয়ে ছুটে যেতেন। তিনি উদারাময় রোগের চিকিৎসার জন্য বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এই সময়ে কলেরা রোগীদের একমাত্র ভরসা ছিলেন তিনি। আমরা তার কাছে ঘুর ঘুর করতাম একটু মিষ্টি দানা খাবার জন্যে। তিনি হাসি মুখে আমাদের তা দিতে কখনো কার্পণ্য করেননি।

সমাজ সেবক হিসেবেও তাঁকে দেখেছি। বর্তমান প্যারিশ কাউন্সিল তখন জনকল্যাণ নামে পরিচিত ছিল। তিনি সেই জনকল্যাণের একজন সদস্য ছিলেন। সে সময় তাঁর সাথে যারা সমাজের তথা জনকল্যাণের কাজ করতেন তারা হলেন নিঙ্গাল সাধু, ফ্রান্সিস স্যার, ক্লেমেন্ট স্যার, লালজন স্যার, বেনেডিক্ট স্যার এবং আরও দু'একজন। সমাজের কোন বিবাদ বা কলহ দেখা দিলে জনকল্যাণেই তার সমাধা হতো। এসময় খ্রিস্টানদের কখনো থানায় মামলা করতে যেতে হয়নি।

ডাক্তার ফ্রান্সিস ছিলেন একজন সংস্কৃতিমনা ব্যক্তি। তিনি নিজে কোন কিছু পরিবেশন না করলেও বিশেষ করে নাটকের সময় প্রমোটার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। আমাদের গ্রামে যখন কোন অনুষ্ঠান হতো তিনি তা সফল করে তোলার জন্যে যথাসাধ্য সহযোগিতা করতেন। তিনি সেই সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগদানও করতেন। আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তিনি ছিলেন শিক্ষানুরাগী। তাই সেন্ট আলফ্রেড স্কুলের যেকোন অনুষ্ঠানেই তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হতো। শিক্ষার প্রতি অনুরাগের জন্যেই তিনি তালতলীর বেশ কিছু রাখাইন ছাত্রদের তাঁর বাড়িতেই থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

সবশেষে বলা যায় একজন সৎ, কর্মনিষ্ঠ ও পরোপকারী ব্যক্তি হিসেবে পাদ্রীশিবপুরের জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করতো। তিনি প্যারিশের যেকোন কাজেই আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করতেন। ফাদারদের সাথেও তাঁর ছিল খুব ঘনিষ্ট সম্পর্ক। সারা জীবন মানুষের চিকিৎসা সার্থকতার সাথে করলেও তিনি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র কলেরায় আক্রান্ত হলে তাকে রক্ষা করতে পারেননি। এই কষ্ট নিয়েই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

আঞ্জেলিনা গোমেজ (জানি মাস্টার)[৮]

জন্ম: ২২শে জানুয়ারি ১৯০৩ খ্রি. মৃত্যু ৯ই মে, ১৯৬১ খ্রি.

– পাদ্রীশিবপুরের জনৈক লেখক

স্বর্গীয় আঞ্জেলিনা গোমেজ (জানি মাস্টার) বরিশাল জেলার অন্তর্গত পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। পল্লীবাসীর নিকট তিনি "জানি মাস্টার" নামে পরিচিত ছিলেন। এক সাধারণ পরিবারে তার জন্ম। তার বাবার নাম ছিল ডমিনিক গোমেজ এবং মায়ের নাম হেলেনা গোমেজ। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ২২ শে জানুয়ারী তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিন বোন ও দুই ভাই নিয়ে তাদের পরিবার। আঞ্জেলিনা ছিলেন বোনদের মধ্যে কনিষ্ঠ। তার পৈত্রিক বাড়ী ছিল দিঘিরপাড় বর্তমানে যোসেফের বাড়ী। পাদ্রীশিবপুর সেন্ট যোসেফ স্কুলে প্রাইমারী পাঠ শেষ করে তিনি ঢাকার পাঞ্জোরা স্কুলে পড়াশুনা করেন।

আঞ্জেলিনা ছিলেন একজন ধর্মভীরু এবং পরোপকারী ব্যক্তি। মন্ডলীর সেবা কাজে একনিষ্ঠভাবে অংশ নেয়ার জন্য ঢাকায় সিস্টার হতে গিয়েছিলেন। কিন্তু অসুস্থতার জন্য তিনি সুযোগ পাননি তথাপি তিনি মনক্ষুন্ন হননি । শুধু বলেছিলেন ঈশ্বরের পরিকল্পনা কখনো ভুল হয়না, নিশ্চয়ই এতে কিছু মঙ্গল রয়েছে। ব্রতধারী জীবন যাপন করতে না পারলেও তিনি আমরণ কুমারীই ছিলেন এবং সমাজের বহুকাজ করে গেছেন। জীবিকা নির্বাহের জন্য তিনি শিক্ষকতা পেশা বেছে নিয়েছিলেন। অবসর সময়ে তিনি দরিদ্র ছেলেমেয়েদের পড়াতেন। মানুষের যেকোন সমস্যায় তিনি এগিয়ে যেতেন। রোগীর সেবা, বাড়ী বাড়ী প্রার্থনা অনুষ্ঠান পরিচালনা, ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা করতেন। শত কাজের মাঝেও তিনি প্রার্থনা করতে ভুলতেন না। প্রতিদিন খ্রিস্টযাগে যোগদান করতেন এবং প্রতি শুক্রবার উপবাস রাখতেন। তিনি অনেক বছর পাদ্রীশিবপুর মেয়ে বোর্ডিং এর দায়িত্বে ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নম্র, ভদ্র এবং মিতব্যয়ী। অপচয় করা কখনো পছন্দ করতেন না। তার বাস্তব উদাহরণ হলো, হোস্টেলের মেয়েরা খাবার নষ্ট করত কিন্তু সে খাবার তিনি ফেলতে দিতেন না বরং কখনো কখনো তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ নিজেই খেতেন।

মণ্ডলীর যে কোন কাজ করতে কখনো কুণ্ঠাবোধ করেননি বরং হাসি মুখে এগিয়ে যেতেন। শেষ বয়সে তার হাতে পায়ে কুষ্ঠ রোগের মত এক মারাত্মক ব্যাধি হয়েছিল। তাকে দেখাশুনা করার কেউ ছিলনা। তাই তার মাসী তাকে নিজের বাড়ী আড়াইবাকী গ্রামে নিয়ে আসেন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই মে ঝড়ের রাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার মাসীকে বলেছিলেন: "আমি যেদিন মারা যাব সেদিন প্রকৃতি এক বৈরীরূপ ধারণ করবে। কিন্তু তোমরা ভয় করোনা তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। আর সত্যিই ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ঝড়ে লোকদের অনেক ক্ষতি হয়েছিল কিন্তু উনি একটি বেরার (কুড়ে ঘর) মধ্যে থাকতেন তার কোন ক্ষতি হয়নি। এমনকি কবর খুড়তে গিয়ে লোকেরা কবরের মাটি শুকনো পেয়েছিল। ছেলে-মেয়েরা স্কুল ছুটির পরে তাকে দেখতে যেত প্রতিদিন এবং তার আত্মার চির শান্তি লাভের জন্য প্রভুর কাছে অনুনয় করি।[৯]

---

[৮] Chittagong Jubilee Souvenir 2000

[৯] Chittagong Jubilee Souvenir 2000

মাইকেল নিঙ্গেল ডি'রোজারিও[১০]

জন্ম: ১২ই আগস্ট ১৯০৩ খ্রি. এবং মৃত্যু: ১২ই জুন, ১৯৮৮ খ্রি.

– মিসেস বিয়াট্রিস গোমেজ

স্বর্গীয় মাইকেল নিঙ্গেল ডি' রোজারিও ১২ই আগস্ট ১৯০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ম্যানুয়েল ডি' রোজারিও এবং মাতা শিশিলিয়া ডি' রোজারিও। তিনি ছিলেন একজন সাধারণ সাদাসিদে সংসারী খ্রীষ্টভক্ত। বিবাহিত জীবনে ফ্লোরা ডিসপানার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সংসারে পাঁচ ছেলে এবং তিন মেয়ের সুযোগ্য পিতা ছিলেন।

শৈশবকালে লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে সংসারের কাজ করতেন এবং সর্বদা কর্মব্যস্ত থাকতে ভালোবাসতেন। তার বিভিন্ন শখের মধ্যে মাছ ধরা একটি বিশেষ শখ ছিল। এরই মধ্যে সংসার জীবন মাঝে মাঝে উদাসীনতা দেখা দেয়। ঈশ্বরের পরিকল্পনা মানুষের বোধগম্য নয়। এরই বাস্তবতা দেখা দেয় তার জীবনে। তার জীবনে হঠাৎ করে বৈরাগ্য ভাবের উদয় হয়। একদিন সকলের অগোচরে, রাতের আঁধারে বাড়ীর দরজায় কাঠের ক্রুশ দাঁড় করিয়ে চলে যান পাদ্রীশিবপুর হতে দক্ষিণে কলাপাড়া বার্মিজ ভাইবোনদের মধ্যে। সেখানে কিছুকাল অতিবাহিত করে, পায়ে হেঁটে দীর্ঘ ১০০ কিঃ মিঃ পথ অতিক্রম করে বাড়ী ফিরে আসেন। সবার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এইভাবে কয়েকদিন থাকার পর পুনরায় হঠাৎ করে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। কোথায় কিভাবে যান কেহ জানতে পারেনি। পরে জানা যায় তিনি আসাম, বিহার এবং নেপালে ধর্মীয় ভাবধারায় ভ্রমণ করেন। এসব পরিভ্রমণ কালে বেশ ভুষায় পরিবর্তন সাধিত হয়। অর্থাৎ লাল বসন পরিহিত, লম্বা চুল, দাড়ি রাখেন, গলায় বড় রোজারিমালা এবং ক্রুশ ধারণ করেন । এ বেশভুষা তার আমরণ ছিল। বিহারে তার ছেলে হ্যারীর সাথে দেখা করেন। বিহার ধর্মপ্রদেশের সাহেবগঞ্জ নামক স্থানে কয়েকদিন থাকার পর আসামে মেল ফেরী সক্‌ডি গলিতে কিছুদিন ধর্মপ্রচার কাজে সময় কাটান।

আবার পায়ে হেঁটে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় আসা যাওয়া তার জীবনে ছিল ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ। আসামে পাহাড়ী এলাকায় চলার পথে ক্লান্তি ও দুর্বলতায় এক সময় অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তাঁর জীবনে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে যা কারো নিকট প্রকাশ করেননি। এক সময় দৈবদর্শন পেয়ে স্বদেশের মাটিতে ফিরে আসেন। জীবনে চলার পথে সাধুর সান্নিধ্যে এসে জীবনের আরও পরিবর্তন ঘটে। সে সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে রাঙ্গামাটি ধর্মপল্লীর গোড়াপত্তনে ফাঃ রড্রিক্স এবং রাঙ্গামাটি পাহাড়ে কার্যরত স্বর্গীয় ফাদারদের সাথে পালকীয় কাজে পাহাড়ের বুকে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতেন। তাঁর বেশ ভুষা চাল চলন, কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার পাহাড়ী ভাই-বোনদের কাছে আকর্ষণীয় এবং গ্রহণীয় ছিল।

শেষ জীবনে স্বগ্রামে ফিরে আসেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমাজে সকল শ্রেণীর সাথে সাধারণভাবে ওঠা বসা করতেন। তার ছোট ছেলে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল শ্রদ্ধেয় বিশপ প্যাট্রিক ডি' রোজারিও এবং এক নাতনি ইভন গোমেজ ভারতে কর্মরত। পাদ্রীশিবপুর নিউমার্কেটে একবার "সত্যের দোকান" খুলেন। নিয়ম ছিল খেয়েদেয়ে তালিকা দেখে টাকা ক্যাশ বাক্সে দিয়ে যাওয়া। কিন্তু দোকানে লোকেরা খায় দায়, খুশীর কথা কয়, কিন্তু ক্যাশ বাক্সে টাকা পড়ত না। এভাবে এক সময় সত্যের দোকানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

[১০] Chittagong Jubilee Souvenir 2000

আধ্যাত্মিক জীবনে উপবাস, রেজবার প্রদান (মৃত লোকের আত্মার কল্যাণার্থে পারিবারিক প্রার্থনা) নিয়মিত প্রার্থনা, খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ ছিল তাঁর জীবনের বিশেষ দিক। শেষ জীবনে সস্ত্রীক দুই পুত্র ও দুই কন্যার ঘরে থাকার জন্য পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণপুর ধর্মপল্লীতে চলে যান । সেখানেও পূর্বের ন্যায় ধর্মীয় জীবনে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অবশেষে ১২ই জুন ১৯৮৮ খ্রীঃ ৮৫ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তঁকে কল্যাণপুরের কবরে শায়িত করা হয়। তাঁর স্ত্রী ফ্লোরা ডিস্পিনা পাদ্রীশিবপুরে ফিরে আসেন এবং ১৯শে মার্চ ১৯৯৫ খ্রিস্টব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আমরা তাদের উভয়ের আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

তার ছেলে যিনি বর্তমানে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি নামে পরিচিত, তিনি তার বাবার মৃত্যুদিবসে একবার লিখেছিলেন:

" 'ব্রহ্মচারী' জীবন শেষ ক'রে, "গার্হস্থ্য" জীবনে প্রবেশ করেছিলেন ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে। আট সন্তান নিয়ে সংসার করার পর তিনি সংসার ত্যাগ করলেন (১৯৪৭ খ্রি.)। দার্জিলিং পাহাড়ে পাঁচ বছর "বাণপ্রস্থ" জীবনের সমাপ্তিতে তিনি আবারো সংসারে ফিরে এলেন (১৯৫২ খ্রি.) তবে "সংসারত্যাগী" হয়ে। তখন থেকে তিনি সবার কাছে পরিচিত হলেন "নিঙ্গাল সাধু" নামে, যে-নামে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি পরিচিত ছিলেন।

"সাধু" হিসেবে তিনি গরিব ও দুর্বলদের ভালবেসেছেন; সকল ধর্মের মানুষের সাথে ছিল তার সুন্দর ও খ্রিস্টীয় সম্পর্ক; রাঙ্গামাটি পাহাড়ে ছিল তার বাণী প্রচার; ঐশরাজ্য ও সত্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠা ছিল তার প্রাবক্তিক বাণী; ঈশ্বরের ইচ্ছাপালন ছিল তার জীবনের প্রেরণা ও সাধনা।

পাদ্রীশিবপুরের "পাড়ের বাবুর বাড়ির পরম্পরা" নতুন নাম পেল "সাধুবাড়ির পরম্পরা"।

আমাদের প্রার্থনা: চিরজীবনে ঈশ্বর তাকে আশীষধন্য করুন; ধন্য হোক তার জন্ম ও মৃত্যু, পুণ্য হোক মাটি, ধন্য হোক পরম্পরা। "

"গাব্রিয়েল লালজন গোমেজ - দি গ্রাণ্ড ফাদার"[১১]

জন্ম: ১লা জানুয়ারি, ১৯০৭ খ্রি. মৃত্যু: ১লা ফেব্রুয়ারি. ১৯৮০ খ্রি.

– মেরীলিন মীরা গোমেজ

মানুষ মারা যায়, কিন্তু সেটাই শেষ নয়। পৃথিবী প্রান্তে স্বগৌরবে চিরজীবন্ত হয়ে থাকে তার স্মৃতি। স্মৃতির উজ্জ্বল অম্বরে মানিক সমতুল্য ঝলমলে তার কীর্তি, যা যুগ যুগ ধরে মানুষকে অনুপ্রেরণা যোগায়, দান করে মাহাত্ম্য। আজও আমার মনে পড়ছে সেই কাল বড় বড় দাড়ি ঢাকা, সন্ন্যাস-প্রবর সমতুল্য এক ঝাঁক চুল মাথায়, সদা হাসির মাঝে যে ব্যক্তি ছিল পাদ্রীশিবপুরের সকলের কাছে সপ্রতিভ, সেই প্রবীণ, সেই দাদু, সেই শিক্ষাগুরু লালজন গোমেজকে। মাঝে মাঝে পথ চলতে আজও তার কাছে ছুটে যেতে মন চায়। কিন্তু তিনি আর এ নিখিলে রূপ-রস-গন্ধের মাঝে নেই। মৃত্যুর করাল গ্রাস থাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে কোন অজানায় জানিনা ।

[১১] শ্রীমন্ত তটে – ১৯৮০ খ্রি. পৃ: ৩৯-৪১

মিঃ লালজন গোমেজ ছিলেন মিঃ ফ্রান্সিস গমেজ ও মিসেস ফিলোমিনা গোমেজের পুত্র। তিনি শ্রীমন্তের তটভূমি পাদ্রীশিবপুরে যে দিনে ভূমিষ্ঠ হন সেদিন ছিল নববর্ষ উৎসব ১ লা জানুয়ারি ১৯০৭ সাল। আনন্দঘন এ দিবস। বর্ষের শ্রেষ্ঠ দিবস আর এ সুপুরুষের আবির্ভাব হল এমন এক আনন্দঘন দিবসে। আমার মনে হয় আনন্দের মাঝেই সূচনার জন্যই তিনি আজীবন ছিলেন রসের হাড়ি, আজীবন আনন্দের স্রোতে তিনি তার জীবন তরী ভাসিয়েছেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি তার মাতৃভূমি শ্রীমন্তের তীরে ঐতিহ্যবাহী বিদ্যায়তন সাধু আলফ্রেড উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষানবিশ ছিলেন। ছোটবেলা থেকে তিনি দৌড়ঝাপ এবং ফুটবল খেলায় বহুল সুনাম অর্জন করেন। শৈশবটুকু গ্রাম বাংলার মধ্যেই কাটালেন।

কৈশোরটাকে চঞ্চল তৃপ্ত করে তুলল, তিনি শিক্ষার মহান পিপাসায় কলকাতায় গমন করেন এবং কৃতিত্বের সাথে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তার শিক্ষানুরাগ এতই প্রশংসনীয় ছিল যে, তিনি পরীক্ষার পরপরই ওই বিদ্যালয়ের মনিটর হবার সুযোগ লাভ করেন। এখানে তার দায়িত্বশীলতা ছিল অপরিসীম।

গ্রামকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন, পাদ্রীশিবপুরের জন্য তার মন কেঁদে উঠলো, তিনি ছুটে এলেন মায়ের কোলে। তিনি যে শিক্ষা লাভ করেছেন তা সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার মানসে সাধু আলফ্রেড হাই স্কুলে শিক্ষকতার জীবন গ্রহণ করেন। শিক্ষার আলোয় তিনি সকলকে উদ্ভাসিত করার সুমহান দায়িত্ব স্কন্ধে তুলে নেন।

সব মানুষের জীবনই চায় সংসার করে আগামী দিনের নাগরিকের প্রবেশাধিকার উন্মুক্ত করতে। তিনি ১৯৩৩ সনে বিসাই বাড়ির ম্যানুয়েল গোমেজের কন্যা মিসেস তেরেজা গোমেজকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করেন। এলো নতুন জীবন, নতুন দায়িত্ব।

সাংসারিক ব্যয়ভার বহন তার পক্ষে হয়ে উঠে মহা সমস্যার সামিল। তিনি একান্ত অনিচ্ছা সত্বেও পুনরায় কলকাতায় কাস্টমস অফিসে চাকরী নেন। তবু মাঝে মাঝে তার মন সরল শিশুর মতই মাতৃভূমির জন্য ব্যথাতুর হয়ে উঠতো।

সোনালী দিগন্তে রূপালী চাঁদের ইশারায় তিনি ১৯৩৫ সনে প্রথম কন্যা সন্তানের পিতা হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তার প্রথম কন্যা সন্তানের নাম মেরী মিরেন্ডা গোমেজ। সোনার সংসারের ছোট শিশুর হাসিতে চমৎকার ছিল তাদের দাম্পত্য জীবন।

প্রলংকারী ডাঙ্কা বাজিয়ে শুরু হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। কাস্টমস অফিস, সরকরি চাকরির দায়িত্ব বহন করা ছিল ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদ সঙ্কুল, তাই তিনি এ চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি গ্রহণ করলেন। ১৯৩৭ সনে তার প্রথম পুত্র সন্তান, রক ফার্ডিনান্ড গোমেজ জন্মগ্রহণ করেন। এলো নতুন বন্যা, এলো নতুন আশা, তিনি আনন্দ পেলেন যা বর্ণনাতীত।

১৯৪৫ সনে এল মাতৃভূমির ডাক। তৎকালীন পাদ্রীশিবপুরের পাল পুরোহিত রেভাঃ ফাদার ফেনুর আমন্ত্রণে তিনি গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। সমাজের কাজে তিনি শরীক হলেন।

১৯৪৭ সালে তিনি চট্টগ্রামে এক প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি গ্রহণ করেন। হেথায় একটানা কয়েক বছর কাজ করার পর বরিশালের কাথলিক সেন্টারে ফাদার রড্রিগসের সহায়তায় স্টোর ইনচার্জ হিসাবে অনেক দিন কাজ করেন।

তার ফুটবলের কৃতিত্ব ছিল অপরিসীম। আজও কলিকাতায় তিনি যে লীগে খেলতেন তার প্রতিকৃতি রয়েছে। বলা বাহুল্য যে, ইতিমধ্যে তার অন্য তিন পুত্র এবং দুটি কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করে। পরে আরো একটি কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করে কিন্তু মাত্র তিন বছর বয়সে আগুনের দহনে জীবন হারায়। তার নাম ছিল এলিজাবেথ গোমেজ। তার অন্যান্য ছেলেমেয়েদের নাম পর্যায়ক্রমে দেওয়া হলঃ কার্মেলিনা গোমেজ, ফিডেলিস গোমেজ, ফেলিক্স গোমেজ, ও হেলেনা গোমেজ।

মিঃ লালজন গোমেজের অবদান সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, তিনি ছিলেন পাদ্রীশিবপুরের উজ্জ্বল রত্ন। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ তিনি কোর, ক্রেডিট ইউনিয়ন, রেশনিং, পলিশী বোর্ড এবং রিলিফ সাহায্য সংস্থার একজন নিঃস্বার্থ কর্মী ছিলেন। বাংলাদেশে যখন যুদ্ধের দাবানল প্রজ্বলিত তখন বাংলার বীর সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দান এবং তাদের সার্বিক সুবিধা প্রদানে তার হৃদয় তোড়নের ঔদার্য্যতা সব সময় ছিল ব্যাকুল। গ্রামের সর্বসাধারণের চিন্তায় তিনি থাকতেন উন্মুখ। পরামর্শ, উপদেশ ও আর্থিক যে কোন বিষয়ই হোক না কেন, তার কাছে সাহায্য কামনা করে কোনদিন কেউ বিমুখ হয়েছে বলে শোনা যায়নি। তিনি সকলের সহায় থেকে সকলকেই সবরকমের সাহায্য দিতেন আপন হস্তে।

পাদ্রীশিবপুর গ্রামেই তার জীবনে বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত হয়। প্যারিশ কাউন্সিল তথা তৎকালীন জনকল্যাণ, সেন্ট ভিনসেন্ট ডি' পল সোসাইটিসহ বিভিন্ন সংঘ-সমিতির মাধ্যমে মিঃ লালজন গাব্রিয়েল গোমেজ সমাজ তথা দেশের জন্য যারপর নাই অবদান রেখে গেছেন। তার জীবনের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হলো তার বন্ধু সুলভ সদয় ব্যবহার, যার ফলে সমাজে প্রায় সব স্তরের লোক তাকে "নানা" ও " দাদু" বলে ডাকতো। এটা সর্বজনবিদিত যে, অন্যকে আনন্দ দেয়া, অন্যের মুখে হাসি ফোটানো যেন তার এক বিশেষ প্রৈরিতিক কাজ ছিল। বয়স্ক হলেও যীশু যেমন ছোট ছেলেমেয়েদের আপন করে নিতে পারতেন মিঃ লালজনও সেই একই গুণের গুণান্বিত ছিলেন। তাকে কেউ কোনদিন কোন কারণে রাগ করতে দেখেননি এবং কর্তব্যের খাতিরে এবং নিজের সরলতা ও নম্রতার কারণে অকারণ অপমানকেও তিনি হাসিমুখে সহ্য করতেন। কোন বিচিত্রানুষ্ঠানে "নানা"র একটা কমিক না থাকলে সে অনুষ্ঠানের স্বার্থকতা বা সফলতা সম্পর্কে দর্শকরা প্রশ্ন তুলতো। ফাদার প্যাট্রিক ও ফাদার লেকাভেলিয়ার তার মৃত্যুর দিন, তেজগাঁও জপমালা রানীর গির্জার মীসায় যথার্থ বলেছেন যে মিঃ লালজন গোমেজ শারীরিকভাবে আমাদের মধ্যে না থাকলেও তিনি যে আদর্শ রেখে গেছেন তা যেন তার পরিচিত সবার জীবনে গ্রহণীয় ও অনুকরণীয় হয়ে থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি তাই বলবো মৃত্যুর পরপারে তিনি অমর।

পরিশেষে তার আত্মার মঙ্গল কামনা করে বলতে চাই: "রেখে গেল বাণী সে যে অভয় ও অশোক, জয় হোক, জয় হোক, তারই জয় হোক। তোমাকে স্মরি"।

যোসেফ গোমেজ[১২]

জন্ম: ৪ই ডিসেম্বর, ১৯১২ খ্রি.; বিবাহ: ১০ই জানুয়ারি, ১৯৩১ খ্রি.; মৃত্যু: ২২ই মে, ২০০৪ খ্রি.

পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ আলফ্রেড ল্য পাইয়োর সিএসসি-এর একটি লেখায় পড়লাম যে, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পালপুরোহিত ফাদার লুইস ফিনো সিএসসি মিস্টার যোসেফ গোমেজ নামে ২১ বছরের বিবাহিত এক যুব-পুরুষকে পাঠিয়েছিলেন বাকেরগঞ্জ থেকে গয়না নৌকায় যাত্রা করে প্রথমবারের মতো পাদ্রীশিবপুরে আগমনকারী ব্রাদার ডেনিস গডফ্রে সিএসসি এবং ব্রাদার ফ্লেবিয়ানকে বরণ করে পাদ্রীশিবপুর নিয়ে আসতে। আর সেই বছর থেকে হলি ক্রস ব্রাদারদের সাথে শ্রদ্ধেয় যোসেফ গোমেজের যাত্রা। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রাদারগণ শুরু করেন সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুল এবং খ্রিস্টান ছেলেদের জন্য সেন্ট যোসেফ বোর্ডিং। যখন সেন্ট আলফ্রেড স্কুলের রজত জয়ন্তী পালন করা হয় তখন শ্রদ্ধেয় বিশেষ সেবক যোসেফ গোমেজের কাজেরও রজত জয়ন্তী পালন করা হয়। ২৫ বছরের পূর্তিতে যে স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছিল সেখানেও "রজত জয়ন্তী - যোসেফ গোমেজ" নামে একটা লেখায় তাকে রজত জয়ন্তীর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। পাদ্রীশিবপুরের গ্রন্থে প্রয়াত একজন বিশেষ ব্যক্তি হিসেবে শ্রদ্ধেয় যোসেফ গোমেজকে স্মরণ করতে চাই বলে উক্ত লেখাটি হুবহু নিম্নে তুলে ধরা হল। (কার্ডিনাল প্যাট্রিক)

"আমাদের যোসেফ, সত্যই আমাদের। কেউ তাকে ম্যানেজার বলি, কেউ বা ইঞ্জিনিয়ার বলি, আবার অনেকে যোসেফ বাবুর্চিও বলে থাকি। সঠিক পদটা দেওয়া বড়ই মুস্কিল। আজকের কথা নয়, সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর আগেকার কথা। ১৯৩৩ সালে হাই স্কুল ও সাধু যোসেফ বোর্ডিং আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে তাকে তাকে প্রথম দেখি আমাদের বোর্ডিংয়ের ছোট বাবুর্চিরূপে। অত্যন্ত সাদাসিধে লম্বা চেহারার মানুষটি। ব্রাদারগণ বাংলা জানতেন না। বাধ্য হয়ে তাকে হাতে মুখে ইংরেজী বলতে হত। মনে পড়লে এখনও হাসি পায়। কত তামাসা করেছি তার সেই সরলতা ও ইংরেজী বলার সুযোগ নিয়ে; কেউ তখন ভাবিনি যে তার মধ্যে এত কর্মশক্তি লুক্কায়িত ছিল। তিনি এখন আর বাবুর্চির কাজ করেন না। তবু আজও তিনি বাবুর্চি নামেই পরিচিত। এতটুকু কুণ্ঠা নেই তজ্জন্য তার।

"এই সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরে তার কত পরিবর্তন, কত রদ বদল হয়েছে। কত ব্রাদার, কত কর্মচারীর পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু আমাদের যোসেফের একটুও নড়চড় হয়নি। তার বিশ্বস্ততা, কর্মের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা তাকে সকলের প্রিয় করেই রেখেছে। তাকে না হলে আমাদের যেন কেন কাজই চলে না। কখনো খেলার মাঠে, কখনো বোর্ডিংয়ে, কখনো স্কুল ঘরে, কখনো রাজের কাজে, কখনো মিস্ত্রীর কাজে আবার কোন সময় তাকে কাঠের নৌকায় তাকে দেখতে পাই। কোন দ্বিধা নেই তার কোন কাজে। এমন সর্বতোমুখী কর্মশক্তি খুব কমই দেখা যায়। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে এমন ধৈর্য্য, এমন নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত কাজ করার দৃষ্টান্ত সত্যই বিরল।

৯টি ছেলে এবং ১টি মেয়ের বাবা তিনি। একটি ছেলে এবারে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। তিনি বেশ সুখে শান্তিতে পারিবারিক জীবন যাপন করেছেন। তার কাজের ২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। তাকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

[১২] সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুল রজত-জয়ন্তী – ১৯৫৮

রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে যে কথাগুলো বলা হয়েছে তার সাথে আমরা পুরোপুরি একাত্ম হতে পারি। আমরা জানি যে, তিনি তার কর্মজীবনেরও সুবর্ণ জয়ন্তী করেছেন এবং ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। যেহেতু তিনি আমার পিসাতো বোন-জামাই ছিলেন, পাদ্রীশিবপুরে আসলে তার সাথে এবং দিদির সাথে বেশ গল্প হতো। কথা হতো অতীতের ব্রাদারদের নিয়ে, তার সকল কাজ নিয়ে, পাদ্রীশিবপুরের ইতিহাস নিয়ে, পরিবারের সকলকে নিয়ে, তাঁর মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে, ইত্যাদি। বংশ-তালিকা লিখতে গিয়ে তার সহায়তা নিয়েছি বেশ কয়েকবার। পাদ্রীশিবপুরের দীর্ঘ-ইতিহাস রচনায় তার দীর্ঘ জীবন ও মন্ডলীর সেবার কথা বলা সেটা তো স্মরণীয় করে রাখা। (কার্ডিনাল প্যাট্রিক)

"মি. সিলভেস্টার গোমেজ (স্যার) – আমি যেমন দেখেছি"[১৩]

জন্ম: ১৯০৬, মৃত্যু ৫ই মে, ১৯৭৫

– খ্রীষ্টফার রবি ডিঃ কস্তা

তখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি। কি বা কতটুকু স্যারকে জানতে পেরেছি জানি না । তবে আজ অনেক বছর ঘুরে এলো স্মৃতি যেন বার বার একটি সুর শুনিয়ে যায়। যা আমার শ্রদ্ধেয় স্যারের বীণায় ঝংকৃত হয়ে উঠতো, রবিঠাকুরের গানের সেই কলিগুলো

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে
আমি বাইব না, বাইব না তোর খেয়াতরী এই ঘাটে ।
চুকিয়ে দিব লেনা দেনা চুকিয়ে দেব গো
যখন আমায় নাই বা মনে রাখলে ।

সুষ্ঠু ও সুঠাম দেহের অধিকারী, হাতে একখানা বেতের লাঠি, কালো কোর্ট পরিহিত দূর থেকে দেখলেই হাসির রেখা ফুটে উঠত শিশু কিশোর, যুবক বয়োঃবৃদ্ধের সাথে। মনে হতো কত যুগের পরিচয় তার সাথে, হাসি যেন মধুময়তা সৃষ্টি করত। মুখে ছিল একই বুলি, 'কেমন আছিস?' বলেই একগাল হাসি, যেন ভালবাসার অকৃত্তিম ছাপ পরিদৃষ্ট হত। পরবর্তী প্রশ্নের জন্য অধীরতায় বসতে হতো না। পরপর উদ্ধত প্রশ্নের উত্তর হলে বিকিয়ে যেত স্নেহ সুধা।

বিদেশের লোক তিনি। ঢাকার উত্তর অঞ্চল থেকে সুদূরে পাড়ি জমায় বঙ্গোপসাগরের উপকূলে। পদ্মা মেঘনা ঢেউ তার এ গতিকে বাধা দিতে পারেনি কোন কালে। এসে উপস্থিত হলেন পাদ্রীশিবপুর গ্রামে। প্রথমে পোস্ট অফিসে ও পরে স্কুলে চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে এদেশের মেয়ে বিবাহ করে আর দেশে ফিরে যাননি। কলকাতা থেকে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা লাভ করে চলে আসেন এখানে। পাদ্রীশিবপুরকে তিনি এতই ভালবাসতেন যে, সবুজে ঘেরা শ্রীমন্তের তীরের ক্ষুদ্র গ্রামখানি যেন তার মনে স্নেহের বাৎসল্যের পরশ ভুলিয়ে দিয়েছিল। তাই পাদ্রীশিবপুরের মাটি তাকে আর ছেড়ে দিতে পারেনি। তার সরলতা এবং উদারতা যেন পাদ্রিশিবপুরের প্রকৃতির সাথে একাকার হয়ে গিয়েছিল। কারণ প্রকৃতিও

[১৩] শ্রীমন্ত তটে – ১৯৮০ খ্রি.

যেমন উদার তাহার চিত্ত ছিল তেমনি উদার। শ্রীমন্তের উপকূলে যে লাল সংকেত বিহীন বিদ্যানিকেতনখানি ছিল, আজও রয়েছে। দূর থেকে যারা এই বিদ্যানিকেতনখানি দেখতেন লালে ঘেরা সংকেত দেখেই সকলে একবার থেমে যেত এখানে। তিনি এই নিকেতনেরই একজন দক্ষ কারিগর ছিলেন। যুগের পর যুগ ধরে কত শত ছাত্র গড়েছে অধীর আগ্রহে। সত্যিকারে তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত সাধক। কারণ সাধক ও কারিগর হতে হলে যে সমস্ত গুণের প্রয়োজন হয় ও উপাদান সাথে রাখতে হয়, সেগুলি যথার্থভাবে তার জীবনে বিরাজমান ছিল। হাসিমুখে, স্নেহবাৎসল্য, শাসন ও শৃঙ্খলা ইত্যাদি। আমরা পড়েছি, শুধু এটুকুই মনে পড়ে ক্লাসে ঢুকেই এক গাল হাসি দিতেন; পরে চক নিয়ে এগিয়ে যেতেন বোর্ডে, লিখতেন Class Work and Date. এছাড়া খাতার প্রতি পৃষ্ঠায় মার্জিন টানতেই হবে। নতুবা কোন ছাত্র তার করা শাসন থেকে বাদ পড়ত না। স্যার আমাদের ইংরেজী পড়াতেন বলে প্রতিদিন দেখাতে হতো হাতের লেখা।

সেই তো সেদিনের কথা অর্থাৎ পাদ্রীশিবপুর সাধু আলফ্রেডস স্কুলের "রজত জয়ন্তীতে" যে গানখানি রচনা করে গেছেন তা ওই শ্রীমন্তের রূপ, সৌন্দর্য, স্নিগ্ধতা, ও মাধুর্যতা যেন বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় তার কয়েকটি কলি:

ধীরে ধীরে শ্রীমন্ত তীরে ধীরে জাগেরে
ফুটিল কত শত ফুল, ছুটিল গন্ধে অলিকুল।

এই গানের তাৎপর্যে বোঝা যায় যে পাদ্রীশিবপুরের প্রতি তার কত ভালোবাসা ছিল। পাদ্রীশিবপুরে প্রতি তার হৃদয়ে যে ভালোবাসা তাই ফুটে উঠেছিল তার এই গানে। যেমনি ভালবেসেছিলেন পাদ্রীশিবপুর তেমনি ছিল তার ভার পরহিতব্রত।

যদিও সমাজকর্মী হিসেবে তেমন কোনো সঙ্গ-সমিতিতে জড়িত ছিলেন না বলে জানি। তবুও দক্ষিণ গ্রামের চিত্র আজও যার চোখে পড়ে সে ভুলতে পারেনা যে, তিনি গ্রামবাসীকে কত ভালবাসতেন। লোকেরা অন্ধকার রাতে হাঁটাচলা করার সুবিধাথে সেই ভর-দুপুরে এসেই মাথায় একটি পাগড়ী বেঁধে হাতে একখানি লাঠি আর "দা" নিয়ে ছুটে যেতেন পথিমধ্যে। কত বড় বড় জঙ্গল তিনি পরিষ্কার করেছেন তা সেই দক্ষিণ গ্রামবাসীই জানেন।

গায়ক হিসেবে বলতে গেলে বাউল যেমন একতারা নিয়ে গান গায়, এমনি তিনিও তার সেঁতার হাতে নিয়ে বাউলের মত সেধে যেতেন একজন প্রকৃত সাধকের মত। গান যেমন তার জীবন সঙ্গী ছিল তেমনি সঙ্গী করে নিত শিশু, কিশোর, বয়োঃবৃদ্ধ সকলকে। কতজনদের যে গানের সুরে বিভোর করে রাখত তা যে দেখেছে সেই মাত্রই জানেন। আমি দেখেছি বেশিরভাগ গানই গেতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান। সে গান দ্বারা যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন অতল গর্ভে, তার প্রিয় গানের কলি এইরূপ:

(১) স্বপন পাড়ের ডাক শুনি তোরা আয়রে আয় (২) এমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না (৩) যদি কিছু কর মোরে দান (৪) ডাকব না ডাকব না (৫) মাথা নত করে দাও (৬) দূর দেশী ছেলে (৭) এই মনিহার আমার নাহি সাজে। এ তো কয়েকটি মাত্র, তার নিজের রচনা নিয়ে তার জীবনখানি ছিল এক গানের ভুবন, তবে তা গানের সুর ছিল মিষ্টি, স্নিগ্ধ ও সুরভিত যা সত্যি সহজেই মানব হৃদয় জয় করতে পারতো।

পরবর্তী জীবনে দেখা দেয় অবসাদ ও ক্লান্তি। তিনি রোগ-ব্যাধিতে জরাজীর্ণ হয়ে একেবারে শিশুর মতো হয়েছিলেন। পরপর কয়েক বছর ডায়াবেটিস ও ব্লাড প্রেসার রোগে ভুগতে আরম্ভ করলে, হঠাৎ করে জ্ঞান ও বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। মনে পড়ে যখন আমরা একত্রে গান করার জন্য তার ঘরে বসতাম, তখন গানে সুরে বিভোর হয়ে, এসে ঘরে জানালার শিক ধরে ফ্যাল ফ্যাল করে উদাস দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকতেন। সে দৃশ্যকে অনুধাবন করা ছিল বড়ই মর্মস্পর্শী।

১৯৭৫ সালে ৫ই মে মাসে আমার প্রিয় শিক্ষক শ্বাসক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ইহলোকে থেকে পাড়ি জমান। পরিশেষে তার অমর আত্মার কল্যাণ কামনা করে আবার স্যারের সুরে সুরে তুলি:

"যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে
আমি বাইবোনা, বাইবোনা তোর খেয়া তরীন এই ঘাটে।"

"স্বর্গীয় ভেনানসিও ডি কস্তা – অতীতের স্মৃতি"[১৪]

জন্ম: ৭/৫/১৯১৭ এবং মৃত্যু ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ খ্রি.

– মিসেস লিলি উষা গোমেজ

অতীতের স্মৃতিকে ভোলা যায় না বলেই স্মৃতিকে মন্থন করতে চেষ্টা করছি। মিঃ ভেনানসিও ডি'কস্তা আমাদের প্রিয় শিক্ষক ছিলেন। তিনি সবার কাছে কেন এত প্রিয় ছিলেন, তার অবদান কি একক ছিল? না, তা নয়। মিঃ ভেনানসিও-এর পিতা ও পিতামহ এ দেশে কি করেছেন, পাদ্রীশিবপুর মিশনে তাদের অবদান কতটুকু তার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমি তুলে ধরতে চেষ্টা করব। হয়তো পুঙ্খানুপঙ্খরূপে ফুটে উঠবে না। কারণ সকল তথ্য সংগ্রহ অনেক সময়ের সাপেক্ষ।

মিঃ ভেনানসিও পরিবারের পূর্বপুরুষ ছিলেন ঢাকার উত্তরাঞ্চলের অর্থাৎ ভাওয়ালের অধিবাসী। সেখান থেকে শ্রী ডমিঙ্গুস-র পিতামহ কোন এক বিশেষ কারণে চলে আসেন পাদ্রীশিবপুর অঞ্চলে। তখন পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টান সব অপরিচিত বলে এক হিন্দু বিধবা বুড়ি তাকে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় দান করেন। পরে এই পাদ্রীশিবপুর স্কুলে শিক্ষকতা জীবনে প্রবেশ করেন। কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে গেলে শ্রীমুন ডি'কস্তা তার দেশে ফিরে না গিয়ে পাদ্রীশিবপুরের মেয়েই বিবাহ করেন। হিন্দু বুড়ি মারা যাওয়ার পূর্বে এই বাড়ি শ্রীমুন ডিঃ কস্তাকে দান পত্র করে যান।

পর্তুগীজরা যখন এ দেশে আসে ঠিক তখন থেকেই এই ডি'কস্তা পরিবারটি পর্তুগীজ মিশনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। আমাদের এই অঞ্চলে যে সমস্ত পর্তুগীজ মিশনগুলি ছিল তা তখন ভারতের গোয়ার তত্বাবধানে সংরক্ষিত হত। মিঃ ভেনানসিওর পিতার নাম ছিল মিঃ প্যাচকল জন ডিঃ কস্তা ওরফে মিঃ নিকোলাস ডিঃ কস্তা। মিঃ নিকোলাস ডিঃ কস্তার পিতার নাম ছিল মিঃ ডমিঙ্গুস ডিঃ কস্তা। উনিও মিশনে সারা জীবন বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করে গেছেন। তখন পর্তুগীজ মিশনের যে জমিদারি ছিল তা অল্প বেতনে দেখাশোনা করা এবং তার হিসাবপত্র রাখাই ছিল তার প্রধান দায়িত্ব। মিঃ নিকলাস ডিঃ কস্তা ১৯১৫ সাল থেকে পর্তুগীজদের নির্মিত সাধু যোসেফ বালিকা বিদ্যালয় এবং এম,ই,

[১৪] শ্রীমন্ত তটে – ১৯৮০ খ্রি. পৃ: ৩৪-৩৮

বালক বিদ্যালয়ে ১৩ বছর চাকুরী করেন। তখন এ সম্প্রদায়গুলি গোয়ার অধীনে ছিল বলে , ঢাকার তেজগাঁওতে পর্তুগীজদের গীর্জা ছিল। ১৯১৩ সালে রেভাঃ ফাদার পাইও ডিঃ সুজা, মিঃ নিকোলাস ডিঃ কস্তাকে ঢাকাস্থ তেজগাঁও স্কুলে শিক্ষকতা করার জন্য নিযুক্ত করেন। সেখানে কয়েক বছর শিক্ষকতা করার পরে ষ্টীমার কোম্পানির হিসাবে (২৭) সাতাশ টাকা বেতনে কিছুদিন কাজ করার পর মাইলাপুরের বিশপ Lord Bishop Dom Theotonious ১৯১৬ সালে মিঃ জার্মান ডিঃ রোজারিওর পরিবর্তে তাকে আবার দেশের দুইটি স্কুল পরিচালনার ভার অপর্ণ করেন। কারণ তখন মিঃ জার্মান ডিঃ রোজারিও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হয়ে যান। উল্লেখযোগ্য যে তখন ঢাকা বিভাগের স্কুল পরিদর্শক শিক্ষকতার ক্ষেত্রে তার যোগ্যতা ও অন্যান্য গুণাবলী দেখে তাকে উচ্চ প্রশংসাপত্র দান করেন। অন্যদিকে মাসিক ২০০ টাকা বেতনে মিশনের জমিদারি মালিকানা প্রদান হিসাবরক্ষক হিসাবেও কাজ করেন। তিনি প্রায় সাত বছর যাবত রেভাঃ ফাদার এম গুদানীকে বিভিন্ন মিশন সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে সাহায্য করেন। ১৯২৬ সালের তিনি প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তখন স্থানীয় সার্জন তাকে পরামর্শ দেন সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকতে। কিন্তু তার অনুপস্থিতে জমিদারি মালিকানার হিসাবে অনেক গন্ডগোল হলে ১৯২৭ সনে সালেসিয়ান বিশপ তাকে ৬ টাকা বেতনে আবার হিসাবরক্ষক হিসেবে দায়িত্ব অর্পণ করেন। এখানেও আবার তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করতে থাকেন। তিনি যখন ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং আর কর্ম দক্ষতা দেখাতে পারেননি, তখন মিশনারীরা তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে থাকে সামান্য কিছু পেনশন ভাতা দান করেন।

তখন তার চাকুরী না থাকায় পরিবারে দেখা দেয় অসচ্ছলতা, ভরণ পোষণে খুবই অসুবিধা হতে থাকে। সম্ভবত ১৯৩৩ সনের দিকে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

মিঃ ভেনানসিও ডি' কস্তাই ছিলেন স্বর্গীয় পাসকাল নিকোলাস ডি' কস্তার কনিষ্ঠ পুত্র। ১৯১৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি পাদ্রীশিবপুরেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৩ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ছাত্র জীবনে তিনি ছিলেন একজন মেধাবী ছাত্র। কারণ ছেলেবেলা থেকে দেখা যায় তাকে বিদ্যানুরাগী হিসাবে। লেখাপড়া ও খেলাধুলা, দৌড়ঝাপ এই ছিল তার শিশু কালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি এত দুষ্টু ছিলেন যে তার শিক্ষকতা জীবনের রস গল্পের মাধ্যমে ফুটে উঠতো। তার পিতার কড়া শাসনে তিনি আরও বিদ্যানুরাগে মনোনিবেশ করতে পারেন। কারণ তার পিতা লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে খুবই কঠোর ছিলেন। ১৯৩৩ সনে যে বছর মিঃ নিকোলাস ডি' কস্তা মারা যান, সেই বছর পরিবারের অভাব অনটনের মুখে পরেও তিনি লেখাপড়ায় পিছপা হননি। ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য পয়সা না থাকায় দক্ষিণ পারের মিঃ চার্লস গোমেজ ওরফে গুরু মহাশয় তার পকেট থেকে টাকা দিয়ে পরীক্ষার ফিস দাখিল করেন। এ বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি চলে যান কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। সেখানে পরপর দুই বছর অধ্যয়ন করে কৃতিত্বের সাথে আই. এ. পাশ করেন। এদিকে সংসারের আরো পাঁচ ভাইয়ের খরচ ও সংসারের দায়িত্ব পালন তার একার পক্ষে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক সেই সময় তিনি মিলিটারি পোষ্টাল ডিপার্টমেন্টে চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে সেখান থেকে ১৯৫৭ সনের মাঝামাঝি সময়ে পুত্র, কন্যা ও স্ত্রীকে নিয়ে গ্রামে চলে আসেন। মিঃ ভেনানসিও ডি' কস্তার একটি কন্যা ও দুটি পুত্র সন্তান ছিল। ১৯৫৭ সনে পাদ্রীশিবপুর স্কুলে তখনকার প্রধান শিক্ষক শ্রীঃ শতীশ বাবু দশ টাকা বেতনে চাকুরী দান করেন। এইদিকে তার স্ত্রীর অসুস্থতার

জন্য তাকে ঢাকা হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ভর্তি করান এবং কিছুদিন হাসপাতালে চিকিৎসার পর তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। এদিকে মিঃ ভেনানসিওর জীবনে দেখা দিতে থাকে অবসাদ। কারণ কি করে সন্তানদের প্রকৃত মানুষ করে তুলবে। তাই বাধ্য হয়ে ১৯৬৫ সনের দিকে দ্বিতীয় বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন এবং এ পক্ষে মাত্র দুটি কন্যাসন্তান রেখে যান।

স্কুলে চাকুরী থাকাকালীন সময়ে তিনি বি. এ. বি.এড, এবং এম এ প্রথম পর্ব পরীক্ষা দিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে সংসার বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পারিবারিক অভাব অনটন তাকে আরো চাপিয়ে বসে। কিন্তু তার জ্ঞান অর্জনে যে তৃষ্ণা ছিল তা শত বাধা বিঘ্ন আসলেও আটকিয়ে রাখতে পারেনি। মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পূর্ব পর্যন্ত তার শিয়রে ছিল শত শত পুস্তকের সমাহার।

শিক্ষকতা জীবনে বড় কথা ছিল কতটুকু জানবে এবং কতটুকু দান করবেন। তিনি ছিলেন পরবর্তী পর্যায়ে পাদ্রীশিবপুর স্কুলের একজন অন্যতম ইংরেজি শিক্ষক। অক্সফোর্ডের একখানা অভিধান সব সময় থাকতো তার হাতে। যেখানে সেখানে দাঁড়িয়েই বই পড়তে আরম্ভ করতেন।

টাকা পয়সা, সাংসারিক মোহ কিছুই তার মানুষ গড়ার কাজেই কোনদিন অন্তরায় হয়নি। সংসার গোল্লায় যাক, তিনি শুধু জানতেন রাত পোহালে কতক্ষণ স্কুলে যাবেন, ক্লাস নিবেন, বই পড়বেন ও স্কুলের কাজে মনোনিবেশ করবেন। মনে পড়ে সেই একটি দিনের প্রতিচ্ছবি, রাতে ভীষণ জ্বর ও ডায়রিয়া হয়েছে অথচ ভোর পাঁচটার সময় উঠে, ঘুর ঘুর করে রওনা হয়েছেন স্কুলের দিকে। স্ত্রীর বাধায় রাগ করে বলেছিলেন, তোমরা বুঝবে না, স্কুলের কাজে না গেলে চলবে কেমন করে? এমনি ভাবধারা নিয়ে কাজ করে গেছেন আজীবন। গড়ে গেছেন এক নিষ্ঠাবান কর্মীর মত কত শত ছাত্র। ঝড়, বৃষ্টি, কাদা অসুখ-বিসুখ কিছুই যেন এর মত কারিগরকে বেঁধে রাখতে পারতো না। কঠোর ত্যাগের মহান ব্রত নিয়ে সুদীর্ঘ ১৭ টি বছর ধরে তিনি বিদেশী ব্রাদারদের সাথে শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক রূপে কাজ করে প্রচুর সুনাম কুড়িয়েছেন। বিদেশীরা তার প্রশাসন ইংরেজি পড়ানোর উচ্চারণ, ভাষা লেখা ও পড়াশোনা গুণ দেখে অবাক হতেন। একবার এক বিদেশী রাষ্ট্রদূত পাদ্রীশিবপুরে আসলে তাকে ইংরেজিতে অভিনন্দন দিয়েছিলেন। সেই রাষ্ট্রদূত এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, গ্রামে কি করে এমন রত্ন লুকিয়ে থাকে।

শিক্ষকতা ও শিক্ষা পদ্ধতিঃ সহজ সরল রসব্যঞ্জক ও সুলালিত্য কণ্ঠে তিনি শিক্ষা দিতেন সকলকে। পড়া দেওয়া এবং আদায় করাই ছিল তার শিক্ষার প্রধান অংশ। যেকোন ছাত্র ইংরেজি লেখার ও পঠনের অভ্যাস গঠন করে দিতেন। যখন ইংরেজি কবিতা পড়াতেন, তখন সম্পূর্ণ ক্লাসকে নীরব করে, চোখ বন্ধ করে সম্পূর্ণ কবিতা সারমর্ম সহজ ও সরল ইংরেজিতে বলে যেতেন, পরে ছাত্রদের থেকে কিছু আদায় করতেন। প্রত্যেক ছাত্রকে কিছু বলতে হবে নতুবা শাস্তি দিতেন। মনে পড়ে Phonetic উচ্চারণ শিক্ষা দিতেন ছোট আয়না দিয়ে। শুধু ইংরেজি শিক্ষকই ছিলেন না। অনেক সময় বিদেশীদেরকে বাংলা ভাষাও শিক্ষা দিতেন। সব সময় কথা বলতেন চলিত ভাষায়। যখন রম্যরস করতেন তখন যেন তার মুখ থেকে চলতি ভাষায় এক মাধুর্য্যতা প্রকাশ পেত।

প্রশাসনিক দক্ষতাঃ স্নেহ ও মমতা দ্বারা ছাত্রদের তিনি শাসন করতেন। কারণ শাসন পদ্ধতির কথা বললে বলতে হয়, তিনি ছিলেন উচ্চ পর্যায়ের একজন বিদ্যালয় প্রশাসক যদি দেখতেন ছাত্ররা ক্লাসে গন্ডগোল করছেন। বেত একখানা হাতে নিয়ে সোজা ক্লাসে ঢুকে যেতেন নতুবা প্রধান শিক্ষকের কক্ষের সম্মুখে বুকে হাত বেধে গভীরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেন এমনি এক নিমিশে গন্ডগোল থেমে যেত। অনেক রম্যরস দ্বারা তিনি শিক্ষা দিলেও ছাত্ররা তাকে অধিক ভয় পেত। ছাত্রদের তিনি এতই ভালোবাসতেন যে কত ছাত্র ব্যক্তিগতভাবে পড়াতেন, অথচ পয়সা নেয়ার প্রবৃত্তি তার ছিল না। যে ইংরেজি না বুঝতো তাকে বলে দিতেন বিকেলে বই নিয়ে ঘরে আসতে। কোন ছাত্র দুই এক নম্বরে জন্য নির্বাচনী পরীক্ষা নির্বাচিত না হলেও তার নিকট কোন সুপারিশ টিকতে পারতো না। এমন এভাবে স্নেহ মমতা আনন্দ ও শাসন দ্বারাই নিষ্ঠাবান কারিগরের মতো আজীবন গড়েই গেছেন প্রকৃত মানুষ। আজও তার ছাত্ররা সে সমস্ত শিক্ষাকে স্মরণ করছে।

সরলতায় ছিল তার জীবনে প্রধান ধর্ম। সেই সরলতায় আনতো জীবনে অভাব অনটন। আর্থিক জ্বালা নিবারণ করতে না পেরে শিশুর মতো সরল ভাবে একা একা নীরবে কাঁদতেন। তার কোন বিলাসী জীবনযাত্রা ছিল না। তিনি সাধারণ পাজামা পাঞ্জাবি অথবা দুটি আর শীতের দিনে খয়েরী রং এর একখানা চাদরই পড়তেন বেশি। অহংকার বলতে মোটেই ছিল না তার। বাজার করে কাঁধে বয়ে চলতেন। পারিবারিক ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকার জন্য তিনি বেশিরভাগ সময়ই স্কুলে পড়ে থাকতেন। স্কুলে যারা তার সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন, তারা প্রতিটি মুহূর্তে স্মরণ করেন তাকে। যখন বেশি কাজের চাপ পড়ত তখন সবাইকে ডেকে মাঠে নিয়ে যেতেন, অনেক গল্প গুজব করে আবার কাজে মনোনিবেশ করতেন। স্যারেরা বলতেন সত্যিই অমায়িক আপনি।

সমাজ সেবকঃ সমাজকর্মী হিসেবে বিভিন্ন সংঘ, সমিতি ও কমিটিতে জড়িত ছিলেন। তার ত্যাগের মাধ্যমে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। কোন লোক কোন কাজের জন্য আসলে হাসিমুখে তার কাজটি করে দিতেন। তবে বেশিরভাগ সময় ব্যয় করতেন ইংরেজী দরখাস্ত ও চিঠি লিখে। অতি অল্প সময়ে তিনি লোকদের ভালোবেসে ফেলতেন।

সাধনাঃ তার জীবনের সাথে পুস্তকের সম্পর্কই ছিল প্রধান। তিনি বলতেন যদি সব বিষয় না জানতে ও বুঝতে পারি তবে কেমন শিক্ষক। তার সাধনার মধ্যে ইংরেজী নোবেল পড়ে তার মর্ম উপলব্ধি করায় যেন ছিল তার বড় আনন্দ। স্কুল থেকে এসে, রাত্রে শুতে গেলে এই বই নিয়ে পড়ে থাকতেন। বই পড়তে ও জ্ঞানার্জনের কোনদিন ধৈর্য্য হারা হতেন না। সাহিত্যের পূজারী হিসাবে যে সমস্ত লাইব্রেরী বই তিনি পড়তেন তাহলে ঢাকা পাবলিক লাইব্রেরী, ঢাকা হলি ক্রস লাইব্রেরী, ঢাকার নটর ডেম লাইব্রেরী, ঢাকা প্রভেন্সিয়াল লাইব্রেরী,বরিশাল ওরিয়েন্টাল ইনিষ্টিটিউটের। এছাড়া যেখানে যেতেন একখানা বই খুঁজতেন ও পড়তেন খুব আগ্রহ ভরে। শেষ বয়সে অসুখে পড়লেও তার বিদ্যার্জনের এমনি আগ্রহ ছিল যার জন্য মৃত্যুর দুমাস পূর্বেও ঢাকা এসে একখানা এম এ চূড়ান্ত পথে সিলেবাস নিয়ে যায়। কিন্তু বিধাতা এত নিষ্ঠুর ছিলেন যে তার মনের আশাকে আর বাস্তবায়িত করতে দেননি।

খেলাধুলাঃ তার জীবনখানি যদিও ছিল বিদ্যার পাদপিঠে, তবুও তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের "ক্রীড়াবিদ"। কারণ যখন কলকাতায় চাকরি করতেন, তখন কোন এক গাড়ির সাথে দৌড়ের প্রতিযোগিতা করে ১ম স্থান অধিকার করেছিলেন। যে শীল্ড আজও কলকাতায় রয়েছে। অবশ্য একথা শুনলে অনেকের অবাক লাগে।

শেষ জীবনে মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্ব থেকেই স্যার ভীষণ অসুস্থতায় ভুগতে আরম্ভ করেন। ১৯৬৮ সনের দিকে স্বাস্থ্যের খুবই অবনতি ঘটে। কারণ তার ডায়াবেটিস রোগ ছিল, পারিবারিক অভাব অনটনের মধ্যে করে ডাক্তারি নির্দেশ সঠিক মত পালন করতে পারেননি। পরপর তিনবার তিনি ভয়াবহভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে ঢাকার হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে চিকিৎসা চালান হয়। ১৯৭২ সনে ১১ই সেপ্টেম্বর রাত ২ টার দিকে ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুসজ্জা বড়ই ভয়াবহ ছিল। কারণ শেষের দিকে প্রায় এক সপ্তাহ যাবত বাকশক্তি হারিয়ে এবং জ্ঞানও হারান। তবে যতটা মনে পড়ে তার পূর্ববর্তী শনিবার এত জোরে জোরে স্যারদের সাথে ইংরেজীতে কথা বলেছিলেন যে সমস্ত ওয়ার্ডের মধ্যে রোগীরা পর্যন্ত অবাক হয়ে যান। মনে হয় সেই ছিল তার প্রিয় শিক্ষকদের থেকে চির বিদায়। মৃত্যুশয্যায় ছিল তার কনিষ্ঠ পুত্র। পরে ঢাকা থেকে তার ছাত্ররা শব শুধু একটিবার অবলোকন করার জন্য আবার ফিরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যায়। শবদেহ খুলে তুলে নেওয়ার সাথে সাথে বহুদূরান্ত থেকে ছুটে আসে অগণিত পরিচিত ছাত্রবৃন্দসহ পাঠিরা। কান্নায় ভেঙে পড়ে সমস্ত বিদ্যানিকেতন। সকলেই যেন পলকহীন নেত্রে বারবার করে প্রিয় স্যারের স্নেহ মমতা ও ভালোবাসার সেতু বন্ধনকে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করে। শুধু মৃত্যু ছিল না তার, কি এক অমূল্য সম্পদ সেদিন হারিয়ে গেছে যা লিপি দ্বারা সন্নিবেশিত করা সম্ভব নয়।

পরিশেষে বলার মত এই থাকে: যেমনি রেভাঃ ফাদার পায়ো ডিঃ সুজা লিখে গিয়েছিলেন মিঃ ভেনানসিও ডিঃ কস্তার পিতার সমাধির উপর "Who died after leading a most exemplary life" সে কথাটা তার সমাধির উপর রচনা করাটা সঙ্গতিপূর্ণ। তার স্বর্গীয় অমর আত্মার কল্যাণ কামনা করি; প্রার্থনা করি তার গুণীজন এবং আত্মীয়-স্বজন ও পরিবার বর্গের জন্য। পরিশেষে রবিঠাকুরের গানের দুটি কলি.....

"সংসারে জেলে গেলে যে নব আলো
জয় হোক জয় হোক তারই জয় হোক
তোমাদের স্মরি
সত্যের বরমালের সাজালে বসুধা
তোমাদের স্মরি"

ছিছিলিয়া উর্ছি গোমেজ

মিস্ত্রী বাড়িঃ জন্মঃ ১৯২২ খ্রি.; মৃত্যুঃ ২৩/১০/২০০১ খ্রি.

– মেরী রেনু গোমেজ

স্বর্গীয় ছিছিলিয়া উর্ছি গোমেজ, স্বামীঃ স্বর্গীয় গার্বিয়েল চিরমন গোমেজ, নিবাসঃ মাটিভাঙ্গা, থানাঃ পটুয়াখালী, জেলাঃ বরিশাল। তিনি ছিলেন একজন মন্ডলীর সমাজ সেবিকা। ছিছিলিয়া উর্ছি গোমেজ বিবাহ-সূত্রে পাদিশিবপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন। ছিছিলিয়া ছিলেন তিন সন্তানের জননী। কন্যাদ্বয়ঃ সিস্টার অনু গোমেজ (তিনি এলএইচএসসি সম্প্রাদায়ের একজন সন্যাস ব্রতধারিনী সিস্টার), মিস রেনু গোমেজ (তিনি একজন সেন্ট আলফ্রেড বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন) এবং পুত্রঃ মিঃ শ্যামল গোমেজ (তিনি ছিলেন একজন বেসরকারি সংস্থার নিবেদিত কর্মকর্তা)।

আমার বাবা কলকাতায় কাজ করতেন তাই মা (ছিছিলিয়া) বিয়ের পর বেশ কয়েকবছর কলকাতায় ছিলেন পরে সংসার বড় হওয়ার পর বাংলাদেশে ফিরে আসেন। আমার মা মধ্যবর্তী পরিবারের একজন ধার্মিক নারী ছিলেন। পরিবারের অভাব অনটনের কারণে তিনি অন্যদের বাড়ীতে কাজ করতেন এবং পারিবারিক প্রাত্যহিক জিনিসপত্র প্রতিবেশীদের নিকট বিক্রি করে ক্ষুদ্র ব্যবসাও তিনি করেছিলেন। আমাদের তিন ভাই-বোনকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করেছেন। আমরা পড়তে বসলে বলতো জোরে জোরে পড়, ভুল হলে বলতেন দেখ এটা মনে হয় ভুল পড়েছো। খুব মেধাবী ও প্রখর স্মরণশক্তি ছিল তার। আমার মায়ের গানের কণ্ঠ ছিল খুব মিষ্টি। তিনি গির্জায় খ্রীষ্টযাগে গান পরিচালনা করতেন। নিজে নিজে গান রচনা ও সুর দিতেন। তাদের একটি গানের দল ছিল। আমার মায়ের গানের গানগুলো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করতো।

ছিছিলিয়া ছিলেন উপকারী একজন নারী। তিনি সকলের বিপদে এগিয়ে যেতেন। কোন বাড়ীতে কেউ মারা গেলে বা নতুন সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে সারারাত সেখানে প্রার্থনা ও অনান্য কাজে সহযোগিতা করতেন। তিনি ছিলেন লিজেন অব মেরী ও ভিনসেন্ট দি পল সংঘের একজন সক্রিয় সদস্যা ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বাড়ীতে প্রার্থনা করতে যেতেন। আমার মাকে কোনদিন কারো সাথে ঝগড়া করতে দেখিনি। যদি কারো গ্রামে/বাড়ীতে কোন ঝগড়া-বিবাদ হলে, বা স্বামী/স্ত্রী'র মাঝে কোন বিবাদ হলে বা গ্রামের কোন বাড়ীতে অবৈধ সন্তান জন্ম নিলে তা রক্ষা করা ও বিবাদ মিমাংসা করার জন্য সংঘের সবাইকে নিয়ে ঐ বাড়ীতে যেতেন। মা যেন এক ঐশ্বরিক গুণের অধিকারী ছিলেন। মা আমাদের খুব শাসন করতেন। আমি ছোট বেলায় পাশের বাড়ী থেকে না বলে একটি বোম্বাই মরিচ নিয়ে এসেছিলাম। মা দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কোথায় পেয়েছ? এক্ষুনি দিয়ে আসবে, আর না বলে নেয়ার জন্য ক্ষমা চেয়ে আসবে। ঐ দিন এই কাজ করার জন্য আমাকে রাতে ভাত খেতে দেয়নি এবং পিটুনী দিয়েছিল। অন্যের জিনিস না বলে ধরা উচিত নয় এবং অন্যকে যেন কোন দিন আঘাত/কষ্টদিয়ে কথা না বলি এই শিক্ষা দিয়ে মা আমাদের বড় করেছেন।

মা প্রতিদিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতেন এবং নাস্তা বানিয়ে রেখে সকালের খ্রীষ্টযাগে যোগ দিতেন। প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার উপবাস থাকতেন আর প্রতি রবিবার নিজে নাস্তা না খেয়ে ভিক্ষুকদের

খাওয়াতেন। তিনি খুব সহজ সরল ছিলেন সবাইকে খুব অল্পতেই বিশ্বাস করতেন। এমনকি তার নিকটতম আপন আত্নীয়স্বজনরা তার অনেক জায়গা প্রৈত্রিক সম্পত্তি ঠকিয়ে নিয়ে গিয়েছেন তবুও তাদেরকে তিনি কিছু না বলে বলতেন: থাক কি হবে ঈশ্বর আমাকে দেখবেন। তার কোন লোভ ছিল না। তাই আমরাও (ভাই-বোন সকলে) তার আশীর্বাদে খুব ভালো আছি।

২০০১ সালে ২৩শে আগষ্ট আমার মা (ছিছিলিয়া গোমেজ) হার্ট এট্যাকে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৭৯ বছর। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের মা স্বর্গে ঈশ্বরের কৃপায় ভালই আছেন। তিনি সর্বদা প্রার্থনাশীল ও ধার্মিক ছিলেন বিধায় তাকে আমাদের গ্রামবাসীসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর জনগণ এখনও স্বরণ করেন। আমরা আমাদের মায়ের আত্মার চির শান্তি কামনা করছি।

ভিনসেন্ট গোমেজ (দেশান্তরকাঠি)

জন্ম: ০২/০২/১৯৩১ খ্রি.; মৃত্যু: ১০/০৬/২০১০ খ্রি.

– বুলবুল গোমেজ, স্বপন গোমেজ ও নির্মলা গোমেজ

পাদ্রিশিবপুর ধর্মপল্লীর অধীনস্থ দেশান্তরকাঠী উপকেন্দ্রের বড়বাড়ির সন্তান স্বর্গীয় মিঃ ভিনসেন্ট গোমেজ। ১৯৩১ খ্রীঃ ২ রা ফেব্রুয়ারী তিনি তার বাবা-মায়ের কোল জুড়ে এ পৃথিবীতে আসেন। তার বাবা স্বর্গীয় মিঃ ফিলিপ গোমেজ ও মা স্বর্গীয়া মিসেস এলিজাবেথ গোমেজ। তার সহধর্মিনী হলেন স্বর্গীয়া মিসেস রেভা গোমেজ। স্বর্গীয়া মিসেস রেভা গোমেজ হলেন পাদ্রিশিবপুর ধর্মপল্লীর শ্রদ্ধেয় ব্রাদার লিনুস ডি'রোজারিও'র বড় বোন। অতীব দুঃখের বিষয় স্বর্গীয় ভিনসেন্ট গোমেজ এর বয়স যখন সাত বৎসর তখন তার বাবা মারা যান। তিনি ছিলেন তার বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। তার বিধবা মা তাকে আদর, স্নেহ, ভালবাসা ও শাসনের মধ্য দিয়ে বড় করে তুলেছিলেন। তার মা স্বর্গীয়া এলিজাবেথ গোমেজ একজন সমাজসেবী, দানশীল, প্রার্থনাশীল মানুষ ছিলেন। তিনি একজন সুদক্ষ, নামকরা ধাত্রী ছিলেন। তার সুদক্ষতার মধ্য দিয়ে এ দেশের শত শত সন্তান সুস্থ সবলভাবে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বিনা পারিশ্রমিকে এ কাজ করে গেছেন। মিশনেও জমি দান করেছেন।

১৯৩৯ খ্রীঃ স্বর্গীয় মি ভিনসেন্ট গোমেজ স্থানীয় মিশন পাঠশালায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত লেখা পড়া করেন। ১৯৪২ খ্রীঃ তাকে পাদ্রিশিবপুর সেন্ট আলফ্রেডস্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। সেখানে তিনি তার বড় পিসির বাসায় থেকে পড়াশুনা করেন। পঞ্চম শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলে পর তাকে বোর্ডিংয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু বছরের মাঝা মাঝি সময়ে তিনি বোর্ডিং থেকে পালিয়ে গ্রামে চলে আসেন। আর পড়াশুনা করেননি। এ পর্যন্তই ছিল তার শিক্ষা জীবন। বেশী দুর পড়াশুনা না করলেও তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিমান লোক।

কর্মময় জীবনঃ তিনি কখনও পরের অধীনে থেকে কাজ করেননি। কৃষি নির্ভর ছিল তার পরিবার। তার অনেক কৃষি জমি ছিল। কৃষি কাজের মধ্য দিয়েই তিনি তার পরিবারের ভরণ পোষণ চালাতেন।

সমাজ সেবাঃ স্বর্গীয় মিঃ ভিনসেন্ট গোমেজ তার মায়ের আদর্শে হয়ে ওঠেন একজন স্বনাম ধন্য পুরুষ। দেশান্তরকাঠীর ইতিহাসে স্বর্গীয় মিঃ ভিনসেন্ট গোমেজ এর মতো সমাজ সেবায় এখনও পর্যন্ত কোন ব্যক্তি তার কাছাকাছি পৌছাতে পারেননি। তিনি এক নাগারে দেশান্তরকাঠী সমাজে ৩৬ বছর

সভাপতিত্ব করেন। শুধু খিস্টান সমাজেই না, বিচার সালিশীতে বিবিচিনি ইউনিয়ন সহ কাছাকাছি ৪ টি জেলায়, বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ঝালকাঠিতে তার অনেক ভূমিকা ছিল। বরগুনা জেলার জেলা প্রসাশক, এস.পি, এম.পি, সহ উর্ধতন কর্তৃপক্ষ তাকে সব সময় মূল্যায়ন করতেন।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের সময় তার যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। আমাদের গীর্জাঘরে তখন মুক্তিযোদ্ধারা থাকতেন। তাদের খাবারের সব রকমের ব্যবস্থা স্বর্গীয় মিঃ ভিনসেন্ট গোমেজই করছেন।

থানায় কোন কাজে দারোগা, পুলিশ কোন গ্রামে আসলে তার ঘাটেই প্রথমে তারা নৌকা বাঁধতেন। তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সব সময়ই তিনি নিজে করেছেন। সবার সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল।

স্বর্গীয় মিঃ ভিনসেন্ট গোমেজ এর সাথে পাল-পুরোহিত সহ সকল ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের সাথে ছিল তার এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। যা তার সমাজ সেবায় প্রেরণা যোগাতো। ফাদার, সিস্টারদের খাবারের ব্যবস্থা নব্বই দশক পর্যন্ত তিনি ও তার পরিবার করতেন। এখন পর্যন্ত তার সে আদর্শ তার সন্তানেরা ধরে রেখেছেন। তিনি সবার সাথে সুসম্পর্ক রেখে সমাজ পরিচালনা করেছেন।

ক্ষমাশীল ব্যক্তিঃ একবার একটি নিছক ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার চাচাতো মামা জুজাই তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। তাকে নয়টি কোপ দিয়েছিল রামদা দিয়ে। কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদে তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। স্বর্গীয় ফাঃ জার্মান, সি.এস.সি তাকে বলেছিলেন আইনের আশ্রয় নিতে। কিন্তু তিনি ফাদারকে বলেছিলেন না ফাদার, আমার কিছু হবে না। তিনি অপরাধীকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। সমাজ জীবনে তাকে অনেক অপমান, লাঞ্চনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু সে কারও বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ না করে সবার সাথে সুসম্পর্ক রেখেছেন, সবাইকে ক্ষমা ও সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছেন।

আধ্যাত্মিক জীবনঃ ব্যক্তি জীবনে তিনি একজন প্রার্থনাশীল মানুষ ছিলেন। সে তার পরিবারের সবাইকে একসাথে নিয়ে প্রতিদিন রাতে বাইবেল পাঠ করতেন আর জপমালা প্রার্থনা করতেন। ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিদিন রাত তিনটায় তিনি প্রার্থনা করতেন।

গির্জায় ক্রুশের পথ, বাড়ি বাড়ি তপস্যাকালিন প্রার্থনা সভা তিনি পরিচালনা করতেন। রবিবাসরীয় উপাসনায় যাজকের অনুপস্থিতে তিনি মঙ্গল সমাচার পাঠ করে ব্যাখা করতেন। মৌখিক প্রার্থনা ছিল তার অর্থপূর্ণ ও ধ্যান মূলক।

সংগীত জীবনঃ তিনি একজন সংগীত প্রিয় মানুষ ছিলেন। তার গানের গলা ছিল অসাধারণ। নিজে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান বাজনা করতেন। তিনি নিজে আধ্যাত্মিকতা দিয়ে কয়েকটি গানও লিখেছিলেন। নিজেই সুর দিয়েছেন। সেই গান তিনি (স্বপন গোমেজ, ডলি গোমেজ, মার্টিনা গোমেজ ও নির্মলা গোমেজ) এদের নিয়ে গাইতেন। গানগুলো তিনি বই আকারে প্রকাশ করতে পারেননি। তার স্বরচিত একটি গানের দু'টো লাইন তুলে ধরলাম-

ছাড়িব না তোমার চরণ (২)
ঐ চরণে সব পাওয়া যায়
যা কিছু মোর মনের মত ।
ছাড়িব না ---------- ।

সমাজকর্মী ও গুণি স্বর্গীয় মিঃ ভিনসেন্ট গোমেজ দুই ছেলে, তিন মেয়ে, নাতি-নাতনি, আত্মীয়-স্বজন ও অনেক শুভাকাঙ্খী রেখে ২০১০ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই জুন এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে ঈশ্বরের কাছে চলে যান।

ব্রিজেট ব্রিতু – "বিজিমানা"

জন্ম: ১৯৩২ খ্রি. মৃত্যু: ১৮/০১/২০১৭ খ্রি.

জার্মেন তরুন গোমেজ এবং লীলা ডি'কস্তা (কানাডা)-এর সৌজন্যে

ব্রিজেট ব্রিতু যিনি একনামে পাদ্রীশিবপুরে "বিজিমানা" বলে সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। পাদ্রীশিবপুরে ধাত্রী সেবায় একনামে সবাই তাকে সমাদার করতেন।

চার সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় ব্রিজেট ব্রিতুর জন্ম ১৯৩২ সালের দিকে পাদ্রীশিবপুরের পবরি বাড়ি। বাবা মাইকেল ব্রিতু আর মা সিসিলিয়া ব্রিতু । ওনার বাবা কোলকাতায় গির্জায় পবরির (সাক্রিষ্টিয়ান হিসেবে) দ্বায়িত্ব পালন করতেন। এভাবে ওনাদের বাড়ির নাম হয় পবরি বাড়ি।

বড়ভাই বেনাস ব্রিতু কোলকাতায় চাকরিজীবি ছিলেন, আরেক ভাই মার্টিন ব্রিতু সেন্ট জেভিয়ার্সে বাবুর্চি ছিলেন। একমাত্র বোন শেফালি ফিলোমিনা ঢাকায় স্বাস্থ্যসেবায় কর্মরত ছিলেন।

ব্রিজেট ব্রিতু সারাজীবন অবিবাহিতা ছিলেন। তবে ওনার বোনের মেয়েরা ছোট বেলা থেকে ওনার কাছেই মানুষ হয়েছেন। লিলা ও শিলা দুইবোনকে নিজের মেয়ের মতোই আদরে বড় করেছেন।

পাদ্রীশিবপুর স্কুলে ক্লাশ ফোর পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। ছোটবেলা নিয়মিত গীর্জায় যেতেন। পুরোপুরি লাটিন ভাষাটা না জানলেও সিস্টারদের তত্বাবধানে গির্জার গানের দলে যোগ দিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য ওই সময়ে গীর্জার গান ও প্রার্থনা হতো লাটিন ভাষায়।

পরবর্তীতে ব্রিজেট ব্রিতু যখন যুবতী তখন কানাডা থেকে পাদ্রীশিবপুরে দুজন সিস্টার আসেন। সিস্টার আলেক্সি ও সিস্টার আলফোন্সের কাছে ব্রিজেট ব্রিতুর ধাত্রী-বিদ্যায় হাতেখড়ি হয়। ওনারা দুইবছর একটানা ব্রিজেটকে ধাত্রী-বিদ্যায় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। একই সাথে উনি সেলাই এবং এম্ব্রোইডারির উপরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ধাত্রী-বিদ্যার উপরে দুই বছরের ট্রেনিং-এর পরে উনি সিস্টারদের কাছ থেকে সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ থেকে পেশাদারি ধাত্রী হিসেবে পাদ্রীশিবপুরে ধাত্রীর কাজ শুরু করেন।

ওনার পাশের বাড়ি সান্তামারিয়ার বাড়িতে বউ হয়ে আসেন মোক্তার বাড়ির মেয়ে সোফিয়া গোমেজ। প্রথম দিন থেকেই ওনারা দুইজন সখি। প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে দুইজনে সারাদিন গল্প-আড্ডা করতে করতে দিন কাটতো। একসময়ে ব্রিজেট ব্রিতুর ধাত্রী-বিদ্যায় হাতেখড়ি হয় এবং তার সারাজীবনের বান্ধবী হন সোফিয়াকে। সোফিয়ার দ্বিতীয় সন্তান কনস্টান্ট ভানু গোমেজ (বর্তমানে কানাডা নিবাসি) এই ব্রিজেট ব্রিতুর ধাত্রীসেবায় ভুমিষ্ঠ হওয়া প্রথম শিশু। ব্রিজেট ব্রিতু কনস্টান্ট ভানুর ধাত্রী-মা এবং একই সাথে ধর্ম-মা। সম্ভবত এইজন্য আমরা সব ভাইবোন ওনাকে "মাদি" (ধর্ম মা) বলে ডাকতাম।

এর পরে বাকেরগঞ্জ উপজেলার কতশত সন্তান এই ধাত্রীর হাতে ভূমিষ্ঠ হয়েছে তার হিসেব নেই। ১৯৫১ থেকে সম্ভবতঃ ২০১০ পর্যন্ত ৫০ বছরের উপরে উনি নিরলসভাবে ধাত্রীসেবা দিয়েছেন। বাকেরগঞ্জ থেকে কানকি বাজার, দুর্গাপুর, মহেশপুর, দূরদূরান্ত থেকে লোকজন এসে ওনাকে নৌকায় করে নিয়ে যেতো। রাত নেই, দিন নেই, উনি ডেলিভারি ব্যাগ হাতে নিয়ে ছুটে চলে যেতেন।

এমনও দেখেছি রাত দুইটা-তিনটায় ঘুটঘুটে অন্ধকারে অনেক দূর থেকে ডেলিভারির জন্য ওনাকে নিতে এসেছে, তুমুল বৃষ্টিতে ঘুটঘুটে অন্ধকারেও ছাতা আর হেরিকেন হাতে উনি বেরিয়ে পড়তেন।

ডেলিভারির পরেই বাড়ি ফিরে ওনার প্রথম কাজ ছিলো সমস্ত যন্ত্রপাতি, ডেলিভারিতে ব্যবহৃত পাত্রগুলো ভালো মতো জীবানুমুক্ত (স্টেরালাইজড) করে রাখা। কোনো প্রসুতির যাতে ইনফেকশন না হয় সে ব্যাপারে খুব সজাগ ছিলেন।

আমার জানামতে বাকেরগঞ্জ বা অন্যান্য জায়গার অনেক গাইনি ডাক্তাররাও ক্রিটিকাল কেসগুলো ওনার সাথে আলাপ করতেন। পড়াশোনা ক্লাস ফোর পর্যন্ত হলেও কানাডিয়ান সিস্টারদের তত্বাবধানে যে শিক্ষা উনি পেয়েছেন সেটা ছিলো অনেক উন্নত। রোগীদের সাথে অনেক আত্মবিশ্বাস ও বলিষ্ঠতার সাথে কথা বলতেন।

এমনও ঘটনা হয়েছে নতুন ভূমিষ্ঠ হওয়া সন্তানের মুখ দেখে খুশিতে ওনাকে বখশিশ দিতে চেয়েছেন কিন্তু উনি বিনয়ের সাথে ফিরিয়ে দিয়ে শুধুমাত্র ওনার ফিসের টাকাটাই নিতেন। অনেক গরীব পরিবার ওনার ফিস দিতে পারে নাই সেজন্য কখনো মুখ ফিরিয়ে নেননি। বিনা পয়সায় অথবা সামান্য সম্মানির বিনিময়ে অনেকের সেবা করেছেন।

মিষ্টভাষী এই মানুষটা বরাবরই বেশ সাহসী ছিলেন। বিশাল গাছপালা বেষ্টিত বাড়িতে একাই থাকতেন তিনি। সারাদিন ঘরবাড়ি নিজ হাতে পরিস্কার করতেন। ঘরের সামনে বিশাল উঠান এমনকি পুকুর পাড় পর্যন্ত রাস্তাটা গোবর দিয়ে লেপাপোঁছা করে রাখতেন।

বোনের মেয়েরা পড়াশোনার জন্য শহরে যাবার পরে তার একমাত্র সঙ্গী ছিলো কুকুর, বিড়াল আর মুরগী। কুকুর বিড়ালকে নিজের সন্তানের মতো আদর করতেন। দুপুর বেলা ওদের চিরুনী দিয়ে ম্যাসেজ করে দিতেন। একবার মনে আছে ওনার কুকুরটাকে টিকা দিবেন কিন্তু একজনকে তো সাথে ধরতে হবে, ডাক পড়লো আমার ওনাকে সাহায্য করার, কিন্তু আমি বায়না ধরলাম একশর্তে সাহায্য করতে পারি যদি তুমি জিলাপি খাওয়াও। সত্যি সত্যিই বিজিমানা কুকুরের টিকা দেয়ার পরে আমাকে জিলাপি কিনে খাওয়ালো।

শেষ বয়সে তেমন আর কাজ করতে পারতেন না। মৃত্যুর আগে চার পাঁচ বছর বিছানায় ছিলেন। ১৮/০১/২০১৭ তে উনি সবার মায়া ছেড়ে এই পৃথিবী ত্যাগ করেন।

৫০ বছরের ধাত্রী থাকাকালীন সময়ে ওনার হাতে সাকসেস রেট ছিলো ৯৫% এর উপরে। প্রায় সময় দুস্টুমি করে বলতেন "আইজকাইলকার ডাক্তাররা খালি কথায় কথায় পেট কাটে (সিজার অপারেশন করে), আমি তো সারাজীবন নরমাল ডেলিভারিই কইরা গেলাম"। তবে সিরিয়াস কোনো কেস যা মেডিক্যালি খুব জটিল ছিলো উনি সেটা আগেই বুঝতে পারতেন এবং যথাসময়ে শহরের হাসপাতালে নেবার পরামর্শ দিতেন।

ব্রিজেট ব্রিতু আজকে হয়তো আমাদের মাঝে নেই তবে আমরা যারা এই লেখা পড়ছি অনেকেই হয়তো এই ধাত্রীমাতার হাতেই এই ভুমিষ্ঠ হয়েছি। ওনার আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি।

লরেন্স সুশীল সরকার

জন্ম: আগৈলঝাড়া গৌরনদী, ১৪ই আগস্ট ১৯৩৩ খ্রি.: মৃত্যু ২৩শে মার্চ, ১৯৯১ খ্রি.

– লিলি সরকার

মিঃ লরেন্স সুশিল সরকার, পিতা মৃত নিকোলাস নগেন্দ্রনাথ সরকার, মাতা মৃত লুচি বিনোদিনী সরকার, গ্রাম - বাগধা, ডাক - বাগধা, উপজেলা - আগইলঝাড়া গৌরনদী ১৪ই আগস্ট ১৯৩৩ খ্রিঃ এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৫ খ্রিঃ পরিবারের দৈন্যদশার কারণে বরিশাল সাগরদি ওরিয়েন্টালের তৎকালিন সেমিনারিয়ান যোয়াকিম (পরবর্তীতে শ্রদ্ধেয় বিশপ) ও ফাঃ ম্যাকলুর-এর সহযোগিতায় একটি ছোট ঘরে বসবাস করার সুযোগ পায়। সে অবস্থায় বাবা নগেন সরকার হস্তিয়া বানানো ও প্রচারকের কাজসহ স্কুলে পড়ানোর কাজ পান এবং মা লুচি বিনোদিনী সরকার ফাদারদের ক্যাছাক বানাতেন ও বেদির কাপর চোপর সেলাই করতেন।

১৯৪৮ খ্রীঃ শ্রদ্ধেয় বিশপ যোয়াকিম ও ফাঃ ম্যাকলুর সহযোগিতায় পাদ্রিশীবপুর সেন্ট আলফ্রেডস উচ্চ বিদ্যালয় পড়াশুনা করার সুযোগ পায় এবং পরবর্তীতে অত্র স্কুলে টাইপিস্ট কাম কেরানীর কাজ করেন দীর্ঘ ২৫ বছর। হাতের লেখা ভাল থাকায় তাকে দিয়ে সার্টিফিকেট হাতে লেখাতেন মাঝে মধ্যে ক্লাসও নিতেন। ১৯৫৮ খ্রীঃ পাদ্রিশীবপুরস্ত পশ্চিম গ্রামের ফিলোমিনা গমেজকে বিবাহ করেন এবং আড়াইবেকী টিচার্স কোয়াটারে বসবাস করেন।

এর পরে ১৯৭১ খ্রীঃ যুদ্ধ আরম্ভ কালে সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধ চলাকালিন সময়ে ক্যাপ্টেন নাসির ও বেইস কমান্ডার বজলুর রহমানের সাথে বেইস টেনিং গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন অপারেশনে অংশ নেন। বলাবাহুল্য পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের তৎকালীন পালপুরোহিত শ্রদ্ধেয় রেভাঃ ফাঃ জার্মেন সি.এস.সি, উক্ত মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তার সাথে লরেন্স সুশিল সরকার সব ধরনের সহযোগিতা করেন সবসময় তার সাথে থাকতেন।

১৯৭২ খ্রীঃ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে জনাব আবদুর রব সেনিয়াবাতের নেতৃত্বে আওয়ামী কৃষকলীগ নামে একটি সংগঠন তৈরী করেন। উক্ত সংগঠনে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন আওয়ামীলীগের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী ও নিবেদিত প্রাণ। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অর্থনৈতিক সাহায্য সহযোগীতা ও তাদের খাদ্য সরবরাহ করতেন। তাদের সুসংগঠিত করাই ছিল একজন সংগঠক হিসাবে তার দায়িত্ব।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত অবস্থায় স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ১৯৭২ খ্রীঃ "কোর" নামে একটি বেসরকারি সংগঠন (এনজিও) এর ফাদারদের আস্থাভাজন ও বিশস্থতার কারণে রিজিওনাল ডিরেক্টর হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করেন। এভাবেই গরিব অসহায় মানুষের সেবা করার সুযোগ পান এবং নিজেকে মানব সেবায় উৎসর্গ করেন। পরবর্তীতে কোর নামক এনজিও-টি কারিতাস নামে পরিবর্তিন লাভ করেন। লরেন্স সুশিল সরকার কারিতাসের মাঠ কর্মকর্তা হিসেবে ঢাকার টঙ্গি বাস্তহারা নামক একটি প্রকল্পে যোগদান করেন, পরবর্তীতে শরিয়তপুরের ভেদরগঞ্জে উক্ত দায়িত্ব পালন করেন ।

রিলিফ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন এর কাজ করার পর থেকেই তার মনে অসহায় ছিন্নমূল গরিব মানুষের জন্য কাজ করার অভিপ্রায় জায়গা করে নেয়। তখন নিজে অসহায় মানুষদের জন্য কিছু করার ইচ্ছা পোষন করেন। ১৯৭৭ খ্রীঃ "পল্লি গণ-উন্নয়ন কেন্দ্র" নামে একটি এনজিও প্রতিষ্ঠা করেন যা সমাজকল্যাণ ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত। বর্তমানে সংগঠনটি সাফল্যের সাথে কাজ করে যাছে। উপকার ভোগীর সংখ্যা প্রায় ৫০,০০০ হাজার।

ইহাছাড়াও পাদ্রীশীবপুর প্যারিশের বিভিন্ন কমিটিতে থেকেও সততা এবং নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং প্যারিশের বিভিন্ন সমস্যা সমাধনেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ছিলেন অতি সাধারণ একজন নিবেদিত মানুষ। চলাফেরাও ছিল অতি সাধারন। চাইলে তিনি একজন বিত্তশালী ব্যক্তি হিসেবে জীবনযাপন করতে পারতেন কিন্তু করেননি। মানুষ হিসাবে ছিলেন সৎ ও নিষ্ঠাবান গরিবের বন্ধু হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বাকেরগঞ্জ উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নেই তার পদচারনা ছিল। তিনি ছিলেন একজন সাংস্কৃতিক মনের মানুষ। পিতা মাতার প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। তার সন্তানদেরও তিনি তার আদর্শে লালন পালন করে গেছেন।

১৯৯১ খ্রীঃ ২৩শে মার্চ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তার জীবনাবসান ঘটে। মৃতকালে তিনি দুই ছেলে ও চার মেয়ে আত্মীয় -স্বজন ও অসংখ্য শুভা কাঙ্খিদের রেখে গেছেন। সকল শুভানুরাগীদের কাছে তার আত্মার চির শান্তি কামনা করার জন্য অনুরোধ করছি।

জেমস মিলিগেন ডি'রোজারিও

জন্ম: ১৮/০৪/১৯৩৬ খ্রি.; মৃত্যু: ১১/০৯/২০০৫ খ্রি.

– নিপু ডি'রোজারিও

জেমস মিলিগেন ডি'রোজারিও'র জন্ম হচ্ছে ১৮ই এপ্রিল, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে, পাদ্রীশিবপুর, বরিশাল। পিতামাতা হচ্ছেন মেনুয়েল ডি'রোজারিও এবং এলিজাবেথ ডি'রোজারিও। পিতা-মাতার ৬ সন্তানের মধ্যে মিলিগেন ডি'রোজারিও'র অবস্থান দ্বিতীয়। ছেলে-বেলা থেকেই পিতা-মাতার বাধ্য সন্তান হিসেবে বেড়ে ওঠেন। তাদের ছিল অভাবের সংসার। বাবা কৃষি কাজ করতেন এবং মা বাসায় নারিকেল তেল তৈরি করে বিক্রি করতেন। প্রাথমিক শিক্ষা পাদ্রীশিবপুরস্থ সেন্ট আলফ্রেড স্কুল এ সমাপন ক'রে চট্টগ্রামস্থ সেন্ট প্লাসিডস হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন ৫০ এর দশকে। এখানে উল্লেখ্য যে তিনি পৌরহিত্য লাভের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামস্থ নভিশিয়েট এ যোগদান করেছিলেন। পরবর্তীতে টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হলে তিনি নভিশিয়েট থেকে বের হয়ে আসেন। সাংসারিক অর্থকষ্টে তার আর উচ্চতর পড়াশুনা লাভের সুযোগ হয়নি। দেশে কয়েকদিন থাকার পর চাকরির উদ্দেশ্যে ঢাকা চলে যান। মতিঝিলস্থ একটি আমেরিকান কোম্পানী ORDIGNUM এ চাকুরি শুরু করেন। ঢাকায় তিনি ফার্মগেট এলাকায় বাসা ভাড়া করে থাকতেন। চাকরিরত অবস্থায় তিনি ছোট ভাই-বোনদের লেখাপড়ার খরচ ও সংসার চালাতেন। এরই মধ্যে তিনি পাদ্রীশিবপুরের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব মিঃ

লালজন গোমেজ-এর মেজো মেয়ে কার্মেলিয়া গোমেজকে বিবাহ করেন। সেটা ছিল ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে তাদের বড় ছেলে নিপুর জন্ম হয়। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মেয়ে সন্তান এবং ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় মেয়ে সন্তানের জন্ম হয়। তিন সন্তানের জন্ম হয় ঢাকাস্থ হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে।

শিক্ষা জীবনে তিনি স্কাউটিং-এ সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন এবং তিনি বেশ কয়েকটি ক্যাম্পুরি ও জাম্বুরিতে যোগদান করেন। লিডারশিপে তার বেশ দক্ষতা ছিল যা তার পরবর্তী কর্মজীবনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। শোনা যায়, ছাত্র জীবনে অসুস্থ রোগীদের তিনি বরিশাল নিয়ে যেতেন। ঢাকায় তখন হাতেগোনা কয়েকজন পাদ্রীশিবপুরবাসী অবস্থান করতেন। তখনকার সময়ে পাদ্রীশিবপুরের মানুষজন ঢাকায় গেলে (চিকিৎসার্থে বা অন্যান্য উদ্দেশ্যে) তারা মিলিগেনের বাসায় আতিথ্য নিতেন এবং বেশ কিছুদিন যাবৎ তারা অবস্থান করে বাড়ি চলে আসতেন। তিনি উদারভাবে তাদের দেখাশুনা করতেন। তিনি ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠাতা ৭-৮ জনদের মধ্যে অন্যতম। এছাড়াও, তিনি পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন (PCWA)- এরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ঢাকাস্থ পূর্ব তেজতুরি বাজার-এর আগ্নেস ভিলায় বাসাভাড়া করে থাকতেন। সেখানে থাকাকালীন ছোট ভাই ইউজিন ডি'রোজারিও-র বিবাহ-অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ খরচ তিনি বহন করেন । পরবর্তীতে তিনি তার পরিবারসহ বাসা পরিবর্তন ক'রে পূর্ব রাজারস্থ সাধন পাড়ায় চলে যান। বেশ সুখে শান্তিতে দিন কাটছিল। এমনি সময়ে সারা দেশজুড়ে স্বাধীনতার আন্দোলন জোরালো হয়ে উঠে এবং যুদ্ধ অবশ্যাম্ভাবী হয়ে ওঠে। তাই তিনি তার ছোট ভাই ও তার বৌকে ঢাকাস্থ বাসার দেখভালের দায়িত্ব দিয়ে ৭১-এর ৫ই মার্চ তারিখে স্বপরিবারে গ্রামের বাড়িতে চলে আসেন। ঐ সময়ে বাড়িতে তার মেঝো বোন ও তার পরিবার থাকতেন। চাকুরিকালীন অবস্থায় তিনি তার নিজ খরচে বোনের পরিবারও চালাতেন। বাড়িতে এসেও তার অন্যথা হয়নি।

১৯৭০-এর প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়ের কবলে সম্পূর্ণ দক্ষিণের উপকূল অঞ্চল বিধ্বস্ত হয়ে যায়। তখন শ্রদ্ধেয় ফাদার লাবে সি.এস.সি-র নির্দেশে (CHRISTIAN ORGANISATION FOR RELIEF & REHABILITATION) CORR-G Field Director – হিসেবে মহিপুর কুয়াকাটায় যোগদান করেন। সড়ক পথ উন্নত না থাকায় তিনি পাদ্রীশিবপুর থেকে Speed Boat চালিয়ে কর্মস্থলে যেতেন। একদিন বোট চালিয়ে মহিপুরে যাওয়ার সময় মুক্তিযোদ্ধারা গুলি চালায় বোট থামানোর জন্যে। একটি গুলি ফাদারের একটি কান ঘেষে চলে যায়, ফলে ফাদার অল্পের জন্য বেঁচে যান। তীরে স্পিডবোট ভেড়ালে তারা ত্রাণ-পুনর্বাসনের জন্য তাদের কাছ থেকে ২২,০০০ টাকা জোর-পূর্বক নিয়ে যায়। মহিপুরে থাকাকালীন ওখানে রাখাইন সম্প্রদায়ের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা হয়। বিশেষ করে, তিনি একজন রাখাইন ঠাকুরের কথা প্রায়ই স্মরণ করতেন। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে, যখন CORR পরিবর্তন হয়ে CARITAS – নামে পরিচিতি পায় তখন ফাদার লাবের নির্দেশে বরিশালস্থ কারিতাস আঞ্চলিক কার্যালয়ে Education-cum-Development Officer হিসেবে যোগদান করেন। সংস্থা থেকে তিনি ৫০ সি.সি. হোন্ডা মোটরবাইক পেয়েছিলেন। সেটা চালিয়ে তিনি গৌরনদীসহ বিভিন্ন এলাকায় ট্যুরে যেতেন। বরিশালে বেলসপার্ক এলাকার দেশান্তরকাঠীস্থ ফিলিপ-এর বাসায় থাকতেন।

এভাবে সুনামের সাথে চাকুরি করার এক পর্যায়ে ১৯৭৯ খ্রি. চাকুরি থেকে ইস্তফা দেন এবং বাড়িতে চলে আসেন। প্রথমে তিনি একটি স্টেশনারি দোকান-ব্যবসা শুরু করেন। বেশ কিছুদিন পর সুবিধাকরতে না পেরে ব্যবসা বন্ধ করে দেন। এরপর, পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীতে প্যারিশ-সেক্রেটারি পরবর্তীতে ক্যাটেখ্রিস্ট হিসেবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নিয়োজিত ছিলেন।

তিনি সৎভাবে জীবন যাপন করতেন। পারতপক্ষে তিনি কারও কোনো ক্ষতি করার কথা চিন্তা করতে পারতেন না। বাড়িতে থাকাকালীন তিনি চাষাবাদের কাজেও জড়িত ছিলেন। লোক রেখে তিনি কাজ করাতেন। কেউ সাহায্যের জন্য তার কাছে আসলে তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না। এমনও আছে মানুষ চুক্তি করে তার থেকে ঋণ নিয়েছেন কিন্তু পরবর্তীতে আর পরিশোধ করেননি। দেশান্তরকাঠীস্থ তার ছোট মাসী ও তার পরিবারকে অর্থ সাহায্য ছাড়াও মেসোকে মাছ ধরার জাল ব্যবস্থা করেছেন বেশ কয়েকবার। তাছাড়া, তার মেসোকে নিজ বাড়িতে বেশ কয়েক বছর রেখেছেন। তিনি চাইলে, ঢাকায় থাকাকালীন অনেক জায়গা জমি কিনে রাখতে পারতেন। তিনি বৈষয়িক ছিলেন না বলেই পারেননি।

তিনি প্যারিশে অত্যন্ত কম বেতনে চাকুরি করতেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত পুরোহিতদের বিশস্ত ছিলেন। তারা বিভিন্ন সময়ে তার হাতে মিশনের কাজের দায়িত্ব অর্পন করে অন্য কোথাও যেতেন। তিনি পুরোহিতের অনুপস্থিতিতে গির্জাঘরে প্রার্থনার কাজ চালাতেন। তিনি খ্রীস্টপ্রসাদ-হস্তার্পন প্রার্থীদের, বিবাহ প্রার্থীদের শিক্ষাদান করতেন। মিসা শেষে ঘোষণা প্রদানের কাজটি তাকেই করতে হতো। যেহেতু এক সময়ে মাইক ছিল না সেহেতু তাকে উচ্চস্বরে ঘোষণা দিতে হতো।

তিনি ছোট বেলা থেকেই কষ্ট করা শিখেছেন। অভাবের সংসারে অল্প বয়সেই কাজে নামতে হয়েছিল। ছোট ভাইয়ের বিয়ের ও চাকুরির ব্যবস্থা করা, বোনদের পড়াশুনার ও বিয়ের দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করা, নিজ সংসার এবং বাড়িতে পিতা-মাতার সংসার তাকে চালাতে হতো। জীবনে তিনি তার মনকষ্টের কথা কাউকে বুঝতে দেননি। তিনি কিছুটা introvert টাইপের লোক ছিলেন। মনটা ছিল উদার ও দয়াশীল। সবার জন্য উদার হস্তে তিনি সাহায্য সহযোগিতার বিনিময়ে প্রতিদান চাইতেন না কিন্তু মানুষ কখনও তার মূল্যায়ন করেনি।

তিনি ছিলেন খুবই ধর্মপরায়ন ব্যক্তি। তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিজের মতো ধর্মীয় স্কিপ্ট প্রস্তুত করে তা প্যারিশ-প্রধানের অনুমতিক্রমে অনুষ্ঠানে পরিচালনা করতেন।

তিনি সংস্কৃতিমনা ছিলেন। এমন এক সময় ছিল প্রতিটি বড়দিনের নাটক মঞ্চস্থ হতো। সেসব নাটকে তিনি অভিনয় করতেন। তিনি ইংরেজীতে পারদর্শী ছিলেন। তিনি যেমন লিখতে পারতেন তেমনি ইংরেজীতে দক্ষতার সাথে কথাও বলতে পারতেন। একবার পুরানো পুল মেরামত করার নিমিত্তে ইংরেজীতে চিঠি লিখে বিদেশ থেকে ডোনেশনের ব্যবস্থা করেছিলেন যা দিয়ে পরবর্তীতে গির্জা ঘরটি সংস্কার কাজ করা হয়েছিল। এভাবে তিনি ষোলো বছর যাবৎ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করেছেন। তিনি উচ্চ রক্তচাপের রোগী ছিলেন। চিকিৎসার জন্য ঢাকা গিয়েছিলেন। শুক্রবার দিন রওনা দিয়ে ঢাকা পৌছাবার পর রবিবার দিন বিকাল ৫ টায় ঢাকায় ছোট বোনের বাসায় স্টোক করে মৃত্যুবরণ করেন ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর।

আলবার্ট গোমেজ (প্রধান শিক্ষক)

জন্ম: ২০ অক্টোবর, ১৯৩৭ খ্রি. ৫ই জুন, ২০১৯ খ্রি.

– সিস্টার জ্যাকলিন গোমেজ, এস.সি.

পার্থিব প্রাচুর্য অর্জন করা আলবার্ট গোমেজের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অর্থচিন্তা কিংবা লোভ-লালসার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছুঁতে পারেনি তাঁকে। কিন্তু তিনি স্বর্গীয় এবং অপার্থিব সম্পদে সম্পদশালী ছিলেন। বরিশালের শ্রীমন্ত নদীর পাড়ে পাদ্রীশিবপুর গ্রামে স্বর্গসুখে ঘেরা তাঁর একটি পরিবার ছিল। চার কন্যা, এক পুত্র এবং দায়িত্বশীল ও গুণবতী; এই ছিল তাঁর সম্পদ। নিজের সামর্থেও সবটুকু উজার করে দিয়ে সংসার ধর্ম ও দায়িত্ব পালন করেছেন। নিজের আদর্শ ও বিশ্বাসের বীজ বপন করেছেন সন্তানদের হৃদয়ে, ধমনীতে ও রক্তে। সেই পঞ্চরত্ন সন্তানেরা জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় গর্বিত করেছেন বাবাকে, পরিবারকে, সমাজকে। কিছু মানুষের নেই কোন মৃত্যু। তাঁরা শুধু রূপান্তরিত হয় যুগ যুগান্তরে। তাঁদের আদর্শ, নীতি ও ত্যাগ বেঁচে থাকে সন্তান থেকে সন্তানদের মধ্যে, কাল থেকে অনন্তকাল। সেই রূপান্তরিত মানুষটি হলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় দক্ষিণ অঞ্চলের ক্যাথলিক সমাজ তথা সমগ্র খ্রিস্টীয় সমাজের আদর্শের প্রতীক আলবার্ট গোমেজ আলবাট স্যার। স্বর্গীয় যোসেফ গোমেজের এগারো সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়, ক্ষণজন্মা এই নক্ষত্রটির জন্ম হলো ২০ অক্টোবর ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে।

তিনি ১৯৬০ খ্রি. ২রা জানুয়ারী সেন্ট আলফ্রেডস হাইস্কুলে শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন। এই স্কুল থেকেই তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেছেন ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির রজত-জয়ন্তী বর্ষে এবং সেই একই প্রতিষ্ঠান পরিচালক হলিক্রস ব্রাদারদের সাথে তার বাবা যোসেফের চাকরীর রজত-জয়ন্তীতে। শিক্ষকতার জীবনে বিভিন্ন দেশভ্রমণ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি শিক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এর মধ্যে ১৯৭২ খ্রি. সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং ১৯৭৮ খ্রি. প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০০১ খ্রি. ৯ মার্চ তাঁর ৬০ বছর পূর্ণ হওয়ায় তাঁকে অবসর গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু সরকারের কাছে বয়োঃবৃদ্ধির জন্য আবেদন করায় আরও ৫ বছরের জন্য সরকারী বেতনসহ ২০০৬ খ্রি. ৯ মার্চ তারিখ পর্যন্ত চাকুরি বৃদ্ধি করা হল। এরপর ১৭ এপ্রিল, ২০০৬ তারিখে স্কুল থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

১৯৩৩ খ্রি. স্কুল প্রতিষ্ঠার পরে আলবার্ট গোমেজ একমাত্র ব্যক্তি যিনি একটানা ৪৬ বছর শিক্ষকতা জীবনের ২৮ বছরই প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে হয়তো হাতে গোনা কয়েকজনকে খুঁজে পাওয়া যাবে যারা এই দীর্ঘ সময় একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। শিক্ষা বিস্তারে তিনি ছিলেন নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। তৎকালীন সময়ে তাঁর বাসায় বসবাস করে বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের কুয়াকাটার রাখাইন সম্প্রদায়ের সুবিধা ও শিক্ষাবঞ্চিত সমাজের যুবকেরা পড়াশুনার সুযোগ পেয়েছিলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের রাখাইন সম্প্রদায়ের যুবকেরা, তাদেরকে আলোকিত করে তোলার জন্য কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করেন এই মহান শিক্ষাবিদকে। তাছাড়া সারা পৃথিবীতে এই মহান শিক্ষাগুরুর ছাত্ররা বিভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁর আদর্শকে ধারণ ও লালন করে। তিনি বেশ কয়েকবার বরিশালের শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক হিসেবে ভূষিত হয়েছিলেন।

স্কুল থেকে বিদায় হওয়ার এক বছর পরে কারিতাসের পক্ষ হতে বরিশালের আঞ্চলিক পরিচালক মিঃ পুনরুদ্ধান গুডা অনুরোধ জানালেন যে তিনি যেন পাদ্রীশিবপুরের ফাতিমা হাসপাতালে ২ বছরের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অন্যদিকে পাদ্রীশিবপুরের সবুজ ক্রেডিট ইউনিয়নের ডিরেক্টর বোর্ডের কর্মকর্তাগণ এবং কালবের কর্মকর্তাগণ যৌথভাবে উনাকে সভাপতির দায়িত্বের জন্য প্রস্তাব করে। উনি সম্মতি প্রকাশ করাতে এক সপ্তাহের মধ্যে সাধারণ সভার মিটিং দিয়ে উনাকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি নির্বাচন করেন।

তিনি কাথলিক মন্ডলীতে সেবা দান করেছেন বিভিন্নভাবে। তিনি প্যারিশ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি লিও ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা-চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি তৎকালীন চট্টগ্রাম ডায়োসিসের শিক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে কার্যক্রম চালিয়েছেন। তিনি কারিতাসের আরসিপি-এর এই সদস্য ছিলেন। এছাড়াও তাঁকে থানা থেকে বিভিন্ন মামলা মিমাংসা করার জন্য দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে।

কাথলিক মন্ডলীর প্রতি আজীবন বিশ্বস্ত ছিলেন। ধর্মীয় রীতিনীতি ও বিশ্বাসে তিনি ছিলেন অটল। মিশনারীদের আস্থার নাম আলবার্ট স্যার। তিনি কাথলিক সমাজের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন আজীবন। তিনি অর্থনৈতিক সুখ-স্বচ্ছন্দ্যকে বাদ দিয়ে স্বল্প বেতনে গ্রামের শিক্ষকতা চাকুরি বেছে নিয়েছিলেন। সমগ্র জীবন উৎসর্গ করলেন শিক্ষা বিস্তার ও প্রসারের কাজে। ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়া তিনি বিসর্জন দিয়েছিলন সেই যুব বয়সেই।

দেশ বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় তিনি ভ্রমণ করেছেন এবং থেকেছেন। কিন্তু তাঁর হৃদয় মনে পাদ্রীশিবপুরের মাটিকে ভালবেসেছেন অন্তর-আত্মা দিয়ে। সমগ্র জীবন পাদ্রীশিবপুরের মঙ্গলকামনা করেছেন। এই গ্রামের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি কাজ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তিনি সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও, নিজ গ্রাম রক্ষার্থে বিভিন্ন কর্মকান্ডে পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। জন্ম ঋণ শোধে তিনি অন্তিমকালেও শায়িত হয়েছেন এই মাটিরই কোলে ৬ই জুন এবং মৃত্যুবরণ করেন ঢাকাতে ৫ই জুন, ২০১৯ তারিখে।

মার্টিন কর্ণেল গোমেজ (মার্টিন স্যার)

জন্ম: ৩রা জুলাই, ১৯৪৮; মৃত্যু: ২৭শে আগস্ট, ২০২০ খ্রি.

– ডেভিড টমাস গোমেজ ও কিরিট সেবাস্তিন গোমেজ

জন্ম ও শিক্ষা জীবন: মার্টিন কর্ণেল গোমেজ, ১৯৪৮ সালের ৩রা জুলাই ঝালকাঠি জেলার নলসিটি উপজেলার রাজাবাড়ীয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। একই বছর পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীতে ৫ আগস্ট বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন। তিনি স্বর্গীয় হিউবার্ট গোমেজ ও গ্রেসি গোমেজের একমাত্র সন্তান। তিনি রাজাবাড়ীয়া গ্রামের গোহাইল বাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তারপর মায়ের চাকরির সুবাদে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন। ১৯৬৭ সালে রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি, ১৯৭০ সালে রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ১৯৭২ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ডিগ্রী লাভ করেন। শিক্ষা জীবনে তিনি দেশে বিদেশে বহু প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

১৯৭৮ সালে ফিলিপাইনের Xavier University, Searsolin থেকে Rural Social Leadership এর উপর ডিপ্লোমা ডিগ্রী অর্জন করেন। একই সময় ফিলিপাইনে বিভিন্ন সংস্থায় শর্ট কোর্স করেন, যেমন: Searsolin Consumers Cooperative থেকে Certificate of Appreciation, Southeast Asia Interdisciplinary Development Institute-Philippines থেকে Organization Development & Decision Making Course. LA Ignariana Apostolic Center-Manila, Philippines থেকে Approaches to Human Development Training, Xavier University, College of Agriculture-Manila, Philippines থেকে Coconut Hybridization And Replanting Training, The International Rice Research Institute- Philippines থেকে Rice Production এর উপর কোর্স সম্পন্ন করেন। ফিলিপাইনের The Rotary Club of West Cagayan de Oro থেকে Guest of Honor and Speaker নির্বাচিত হন।

কৃষি ক্ষেত্রে অর্জন, কর্মজীবন ও গ্রামীণ উন্নয়নে অবদান: ১৯৭৪ সালে "বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্র" থেকে ১ বছর মেয়াদি কোর্স, ১৯৭৬ সালে "বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট" থেকে ধান উৎপাদন প্রশিক্ষণ কোর্স করেন। ১৯৮২ সালে "সিবা- গেইগী বাংলাদেশ লিঃ" হতে শস্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কোর্স সম্পন্ন করেন। ১৯৯০ সালে "বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড" কর্তৃক 'পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড' পরিচালনার উপর পরিচালক প্রশিক্ষণ ও ১৯৯১ সালে একই প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক প্রতিবেদন ও নীতিমালা প্রণয়ন কোর্স করেন। ১৯৮৮ সালে VHSS (Voluntary Health Service Society) থেকে Top Level Managers Training সম্পন্ন করেন।

তিনি ১৯৭৩ সালের ১১ জুন 'কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্র' (সংক্ষেপে এডিসি বলা হতো), পাদ্রীশিবপুরে কো-অর্ডিনেটর প্রশিক্ষণ পদে যোগদান করেন। ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত প্রশাসক পদে কর্মরত থাকেন। পরবর্তীকালে ১৯৮৫ সালের ১ মে থেকে ২০০৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আন্ডার-ফাইভস এন্ড ম্যাটারনিটি ক্লিনিক প্রজেক্টে কর্মরত ছিলেন।

এডিসিতে কর্মকালীন সময়ে স্থানীয় কৃষকদের উচ্চ ফলনশীল কৃষিজাত শস্য (যেমন ধান, টমেটো, বাঁধা কপি, ফুল কপি, মিষ্টি কুমড়ো ইত্যাদি) এবং উচ্চ ফলনশীল উদ্ভিদ (যেমন: নারিকেল, সুপারি, কলা ইত্যাদি) এর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এবং চাষাবাদ পদ্ধতি নিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন। স্থানীয় সরকারি কৃষি অফিস থেকে কৃষকরা যাতে উন্নতজাতের শস্য বীজ পেতে পারেন তার জন্য সেই বীজ সংগ্রহ করে তা কৃষকদের মাঝে বিতরণ করতেন। কৃষিজাত শস্যে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ দমনে বা উদ্ভিদের রোগ-বালাই সম্বন্ধে তিনি ছিলেন বিশেষ প্রশিক্ষিত। তারই ধারাবাহিকতায় কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের পোকা-মাকড় এবং রোগ-বালাই চিহ্নিত করে তার প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ের উপর তিনি প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন। শস্য বা উদ্ভিদের পাতার রং দেখে (কালার পোষ্টার দেখিয়ে ও হাতে কলমে) কৃষকগণ যাতে জৈব বা রাসায়নিক সার কোন সময়ে কোনটা প্রয়োগ করতে হবে তা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন সেই বিষয়ে পরামর্শ দিতেন।

কৃষকদের আত্মনির্ভনশীলতায় অবদান: অনগ্রসর সাধারণ জনগণের উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি পোলট্রি ও গবাদি পশু প্রতিপালনের মাধ্যমে যাতে নিজেরা স্বাবলম্বী হতে পারে সে বিষয়ে মি: মার্টিন গোমেজ সব সময় চেষ্টা করতেন। কৃষকদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। বছরে কোন জমিতে কি ধরনের ফসলের চাষ করতে হবে এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকরা যাতে লাভবান হতে পারে সে বিষয়ে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করতেন। কৃষকদের মধ্যে ব্যবসায়িক হিসাব-নিকাশ এবং সঞ্চয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন। স্থানীয় ভাষায় কড়া (২ শতাংশে ১ কড়া) প্রতি জমিতে কি পরিমাণ খরচ করলে, কি ধরনের ফসলের চাষ করলে, বছরের কোন সময় শস্য চাষ করলে, কখন বাজারজাত করলে কিভাবে লাভবান হওয়া যায় তার ধারণা প্রদান করতেন এবং বিক্রিত অর্থ থেকে পরবর্তী চাষের জন্য বা পরিবারের বিপদ-আপদের জন্য সঞ্চয় কিভাবে করতে হবে ইত্যাদি বিষয়েও তিনি প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন। শুধু তাই নয় "বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট" থেকে উন্নত জাতের ধান বীজ সংগ্রহ করে ধানের জাত উন্নয়নের নিমিত্তে কৃষকদের মধ্যে তা বিতরণ করতেন।

গবাদি পশু, পোলট্রি ফার্ম ও গ্রামীণ উন্নয়নে ভূমিকা: উন্নত জাতের পশু, পোলট্রি পালনে ও তার ছিল বিশেষ প্রশিক্ষণ। তাই তৎকালীন সময়ে তার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জ্ঞান দিয়ে স্থানীয় কৃষকদের উন্নতজাতের যার দিয়ে গ্রামের গরুর জাত উন্নয়নে তিনি ব্যাপক অবদান রেখেছিলেন।

এডিসির কর্মীদের নিয়ে তিনি সমিতি গঠন করেছিলেন এবং সেই সমিতির অর্থ দিয়ে সমিতির মাধ্যমে স-মিল এবং রাইসমিল পরিচালনা করতেন। তৎকালীন সময়ে কর্মীদেরকে মাত্র ১ টাকা প্রদানে উৎসাহিত করে প্রতি টাকায় ১টি করে গাছের চারা তাদের বাড়িতে বাড়িতে রোপন করাতে পেরেছিলেন যার সুফল তাদের অবসর গ্রহণকালীন সময়ে সেই সমস্ত বৃক্ষ বিক্রি করে বিভিন্ন অর্থ চাহিদার সমাধান করতে পেরেছিলেন এবং এলাকার লোকজনকে তিনি বৃক্ষ রোপনে সর্বদা উৎসাহিত ও সহযোগিতা করতেন।

স্বাস্থ্য সেবায় অবদান: গ্রামের মানুষকে তিনি স্বাস্থ্য সচেতনতার বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। 'কারিতাস' এর সহযোগিতায় আন্ডার-ফাইভস এন্ড ম্যাটারনিটি ক্লিনিক প্রজেক্টের মধ্য দিয়ে অজ-পাড়াগায়ে নাম মাত্র মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা (প্রিভেনশন হেলথ কেয়ার ও ইমিউনাইজেশন ইত্যাদি) পরিচালনা করেছেন। ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রামের অপুষ্টি শিশুদের দীর্ঘ বছর (১৫ বছর) পুষ্টির চাহিদা পূরণে তিনি বিশেষ অবদান রেখেছিলেন।

বিদ্যুতের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়ন: আলোকিত দেশ, আলোকিত মানুষ। তিনি চেয়েছিলেন কৃষকদের ও কৃষি জীবন আলোকিত করতে। "বরিশাল পল্লী উন্নয়ন বোর্ড"-এ দীর্ঘ বছর বিভিন্ন পদে (সদস্য সচিব, পরিচালক ইত্যাদি পদে নির্বাচিত) পাদ্রীশিবপুর, রংগশ্রী, নেয়ামতি ও ভরপাশা ইউনিয়নের সরাসরি দায়িত্বে থেকে গ্রামের অজ-পাড়াগায়ে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য কাজ করে গিয়েছেন। অনেক সময় সরাসরি ইউনিয়নের দায়িত্বে না থেকেও তার স্বভাব-সুলভ মিশুক মন-মানসিকতার মাধ্যমে দায়িত্বে না থাকা অন্য ইউনিয়নের জন্য যদি সত্যিকার অর্থে বিদ্যুতের প্রয়োজন হতো তবে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালকদের যুক্তিযুক্ত কারণ দেখিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন, যেমন করেছেন নলসিটি উপজেলার রাজাবাড়ীয়া গ্রামে, ফলে উপকৃত হয়েছেন খ্রিস্টভক্তদেরও এলাকা।

মূল্যবোধ ও মানবিকতা: সৎ কর্মই একজন মানুষকে মহৎ করে তোলে। তেমনই একজন মানুষ ছিলেন মার্টিন কর্ণেল গোমেজ। তিনি ছিলেন সমাজ সেবক। তিনি মনে করতেন গ্রামীণ উন্নতি মানেই কৃষকদের জীবন মানের উন্নতি, তাইতো তিনি তাঁর প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ছড়িয়ে দিতেন কৃষকদের মাঝে। কৃষকদের নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের পরামর্শ দিতেন। তিনি আপদ-মস্তক লোক দেখানো সাহায্য-সহযোগিতায় একেবারেই পছন্দ করতেন না। ধর্ম-বর্ণ বিভেদ ভুলে যেখানে দেখতেন অসহায় পরিবার অসুস্থতার সাথে লড়াই করছে, বিবাহযোগ্যা মেয়েকে গরীব পিতা বিবাহ দিতে পারছেন না, অর্থের অভাবে কোনো ছেলেমেয়ের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেখানেই তিনি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। নিজ ধর্মপল্লী তথা সমাজের যে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে তা প্রাথমিকভাবেই সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতেন।

বহুমাত্রিক নেতৃত্ব: সমাজের একজন শিক্ষিত, প্রশিক্ষিত, দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং সুপরামর্শক হিসেবে অধিকাংশ গ্রামবাসি তাকে দেখেছে। সমাজের সমস্যা বুঝতে, সমাজের অবস্থাকে বিশ্লেষণ করতে এবং উপযুক্ত সমাধান খুজতে তিনি পারদর্শী ছিলেন। সমাজের কোন বিশেষ সমস্যা ও আলোচনায় তিনি যদি কোন কারণে উপস্থিত না থাকতেন তখন তার অভাব সমাজ নির্মমভাবে উপলব্ধি করত। মানুষের এবং বিশেষ করে মিশনের জমিজমা সম্বন্ধে তার অনেক জ্ঞান ছিল। তার মতামত ছাড়া সিদ্ধান্ত নিতে সমাজের নেতৃবৃন্দ অস্বস্তি অনুভব করত। গির্জায় উপাসনাতে শাস্ত্রপাঠ ও বক্তব্য দিতে তিনি নিখুত ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই কিছু মানুষ ঈর্ষা পরবেশ হয়ে তাঁর নেতৃত্বের সমালোচনা করেছে। এ বিষয়ে অভিমান করে অনেক সময়ে অনুপস্থিত থেকেছেন। তবে আবার মন পরিবর্তন করে সমাজের সাথে একাত্ম হয়ে সমাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন। পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান সমাজ এখন তাকে আরও গভীরভাবে স্মরণ করে।

সন্তান: মি. মার্টিন কর্ণেল গোমেজ ২ জন পুত্র সন্তানের জনক। মি. ডেভিড টমাস গোমেজ ও মি. কিরিট সেবাস্তিন গোমেজ।

প্রভুতে নিদ্রিত: মি. মার্টিন কর্ণেল গোমেজ ২৭ আগস্ট, ২০২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রভুতে নিদ্রিত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর ১ মাস ২০ দিন। মহৎ প্রাণ এই মানুষটি পেয়েছেন অগণিত মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। তাঁর মহাপ্রয়াণে হাজার হাজার উপকারভোগী, সুবিধাভোগী কৃষক, অশ্রুজলে আশীর্বাদ করেছেন। তিনি বেঁচে থাকবেন মানুষে মনে ঈশ্বর তাঁকে আশীর্বাদ করবেন। তিনি স্বর্গবাসী হবেন।

খ্রীষ্টফার রবি ডি'কস্তা

জন্ম: ১১/১০/১৯৫৬ খ্রি. এবং মৃত্যু: ০৭/১১/২০১৮ খ্রি.

– প্রীতি ডি'কস্তা

জন্ম: ভারতের কলকাতার পার্কস্ট্রিটে খ্রীষ্টফার রবি ডি'কস্তা'র জন্ম হয় ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ই অক্টোবর তারিখে। পিতার চাকরিজনিত কারণে তাদের পরিবার তখন কলকাতায় ছিল। তার ধর্মপিতা ছিলেন একজন মাদ্রাজী। জন্মের পর পরই খ্রীষ্টফার রবি ডি'কস্তা'র মা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। এরপর তারা স্বপরিবারে বাংলাদেশে দেশের বাড়ি পাদ্রীশিবপুরে ফিরে আসেন। কিন্তু দেশে আসার পর তার মা আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

জন্ম নিয়ে কিছু কথা: খ্রীষ্টফার রবি ডি'কস্তা সহভাগিতা করতেন যে, তার ঠাকুরমা ভির্জিয়ানা ডি' কস্তা তাকে বলেছেন যে, তার জন্ম হয়েছিল শক্ত একটি থলি সদৃশ বস্তুর মধ্যে। ঐ থলি দেখে সকলে ভয় পেয়ে যায় এবং থলিটি নর্দমায় ফেলে দেয়। এটা শুনে লোকেরা হায় হায় করে ওঠে এবং বলে এই থলি ফেলে দেয়া ঠিক না, এটি সৌভাগ্যের প্রতীক। একথা শুনে থলিটি নর্দমা থেকে তুলে এনে রেখে দেয়া হয়। যাহোক, থলি কেটে ক্ষুদ্রাকার পুত্র শিশু খ্রীষ্টফার রবি ডি'কস্তা'কে বের করেন। জন্মের পরে তিনি খুব দূর্বল ছিলেন। তাকে তুলার মধ্যে জড়িয়ে আস্তে আস্তে অতি যত্নে লালন-পালন করা হয়। দেশে ফিরে তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে বড় হতে থাকেন।

ভাই-বোন: চার ভাই-বোনের মধ্যে খ্রীষ্টফার রবি ডি'কস্তা ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। বড় বোন ইলা ডি'কস্তা বর্তমানে চট্টগ্রাম নিবাসী। পরবর্তী বোনটি কলকাতায় মারা যায়। পরবর্তী ভাই উইলিয়াম বাবুল ডি'কস্তা ফেনীতে মারা যান।

শৈশব: কলকাতা থেকে ফিরে এসে তার মা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। শিশু খ্রীষ্টফার রবি ডি'কস্তা যখন দুধ পান করতে চাইতো, মা তখন অনেক কষ্ট করে দুধ পান করাতেন। কিন্তু সে যখন দুধে টান দিত তখন মা ক্যান্সারের যন্ত্রণায় তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতেন। ধীরে ধীরে তার মা যখন খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন তাকে ঢাকা হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আর সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শুনেছি তার বাবার সাথে তার মায়ের শেষ দেখা হয়নি। কারণ তার বাবা তখন গিয়েছিলেন ঔষধ কিনতে। তার মা মারা গিয়েছিলেন ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ শে ডিসেম্বর তারিখে। তাদের বাড়িতে এক মীনা বুড়ি ছিলেন। তিনিই তাদের ভাই-বোনদের দেখাশোনা করতেন। তার বাবা সেন্ট আলফ্রেড স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। স্কুল থেকে ফিরে এসে তিনি তাদের কোলে নিয়ে ঘুরতেন, যত্ন করতেন। তখনকার সময়ে এক হিন্দু ভদ্রলোক সতীশ বাবু ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি রবি ডি'কস্তা'র বাবাকে মাসে ১০ টাকা বেতনে চাকুরীটি দিয়েছিলেন। তার বাবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে মাস্টার্স করেছিলেন। সন্তানদের নিয়ে তিনি যখন সব দিক সামলাতে পারছিলেন না তখন ২য় বার বিয়ে করেন। সে'সময় রবি ডি' কস্তা ২য় শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ছিলেন।

কৈশোর ও ছাত্রজীবন: কৈশোরে অনেক বন্ধু বান্ধবের সাথে সে বড় হতে থাকে। সে অনেকের ভালবাসা পেয়েছে। ৪র্থ এবং ৫ম শ্রেণিতে যখন পড়তেন, তখন স্কুলের শিক্ষিকা ভেরোনিকা দিদি ও রুথ মেরী দিদি স্কুল ছুটির পর তাকে তাদের বাড়ি নিয়ে গিয়ে আদর যত্ন করতেন ও মায়ের ভালোবাসা দিতেন। ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ওঠার পর শ্রদ্ধেয় হাবিব স্যার বিনা বেতনে তাকে গণিত প্রাইভেট পড়াতেন।

স্কুলে 'কাব' এবং 'স্কাউট' দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। সেখান থেকেই তিনি নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতা শিখেছেন। সংগ্রাম ও দরিদ্রতার মধ্যে তাকে বেড়ে উঠতে হয়েছিল। বাবা তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছু দিতে না পারলেও লেখাপড়া শিখাতে চেষ্টা করেছেন; মূল্যবোধ, সততা, কঠোর পরিশ্রমী হতে শিখিয়েছেন। লেখাপড়ায় ভালো ছিল বলে তিনি সরকারী বৃত্তি পেতেন। এছাড়া স্কুলের ছোটখাটো কাজ করে দিয়ে তাদের দুই ভাই এর লেখাপড়ার খরচ যোগাতো। অন্যের পুরানো বই দিয়েই তাদের ছাত্রজীবন কেটেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় কিশোর রবি খ্রীষ্টফার ডি'কস্তা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে খাবার ও রুটি পৌছে দিতেন বলে শুনেছি।

স্কুল জীবন শেষ করে ঢাকা নটর ডেম কলেজে ভর্তি হন। সেখানেও অর্থ সংকট। টিউশন করে লেখাপড়ার খরচ যোগাতে হতো। এরই মধ্যে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর তার বাবা মারা যান। তিনিও ঢাকা হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে মারা যান। বাবা মারা যাবার পর তার দ্বিতীয় পক্ষের মা বোনদের নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন। মা তখন সি.আর.পি.'তে চাকুরী নেন। মা-বোনদের লালন-পালন করার জন্য তাকে আরো বেশী টিউশনি ও পরিশ্রম করতে হতো। এমনকি ঘরের কাজ ও রান্না-বান্নাও তাকে করতে হতো।

চাকুরি জীবন: ঢাকা থাকাকালীন সময়ে হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে তার যখন যোগদান চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে, তেমন একটি সময়ে ব্রাদার এলবারিক, সিএসসি'র আহ্বানে তিনি চলে আসেন নারিকেলবাড়ীতে। সেখানে স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। একাধারে তিনি হোস্টেল মাস্টার, স্কুল শিক্ষক ও ক্লার্কের কাজ করতেন। ১৯৭৩-১৯৭৬ সময়টা সেখানে কাজ করে তিনি আবার ঢাকায় ফিরে আসেন ও একটি টিউটোরিয়ালে কাজ শুরু করেন। পাশাপাশি তিনি সিস্টার মার্গারেট শিল্ড, সিএসসি'র সাথে বিভিন্ন পালকীয় কর্মসূচীতে যেতেন। এভাবে তিনি বাইবেল সহভাগিতা, যুব সম্মেলন, ইত্যাদিতে নিয়মিত হতে থাকেন। তেরো বছর ঢাকায় থেকে চাকরী করে তিনি বোনদের লেখাপড়া চালাতে সাহায্য করেন।

সে'সময় ফাদার প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি (বর্তমানে কার্ডিনাল) পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারি, বনানীর অধ্যাপক ছিলেন। তার আহ্বানে তিনি ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের নবগঠিত 'পালকীয় সেবাদল' এর একজন সেবাকর্মী হিসেবে নতুন জীবন শুরু করেন। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ মণ্ডলী কর্তৃক গৃহীত পালকীয় পরিকল্পনার মধ্যে 'গঠন' ছিল অন্যতম। এই পালকীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের রূপকল্পের একটি অংশ ছিল যাজক-সন্ন্যাসব্রতী-খ্রিস্টভক্তদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা 'পালকীয় সেবাদল' যা ধর্মপ্রদেশব্যাপী গঠন কর্মসূচীর প্রয়োজন নির্ণয়, আয়োজন ও মূল্যায়নের জন্য দায়িত্ব পালন করবে। স্বর্গীয় বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি ছিলেন এই ধারণার স্বপ্নদ্রষ্টা এবং ফাদার প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি ছিলেন দলের প্রথম পরিচালক। মায়ের সাথে আলাপ আলোচনান্তে মায়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি পালকীয় কাজে যোগদান করেন। তখনও তিনি জানতেন না এ কাজে তার বেতন কত হতে পারে! এক মাস সেবা দিয়ে যখন ১৩৫০ টাকা বেতন হাতে পেলেন, তখন তিনি কেঁদেছিলেন। এভাবে শুরু হয় তার সেবার জীবন। জীবন সায়াহ্ন পর্যন্ত তিনি পালকীয় সেবা দলের সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

বিবাহ ও পারিবারিক জীবন: ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে নোয়াখালী নিবাসী প্রীতি ব্লেইকের সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলে থিওফিল শুভ্র ডি' কস্তা ও মেয়ে ক্লারা সুমী ডি' কস্তা- কে নিয়ে তাদের ছিল একটি সুখের সংসার।

পালকীয় কাজে একজন খ্রিস্টভক্ত হিসেবে দীক্ষাস্নানের যাজকীয়, রাজকীয় এবং প্রাবক্তিক দায়িত্ব পালনে তিনি সদা সচেষ্ট ছিলেন। তিনি অত্যন্ত প্রার্থনাশীল ছিলেন। প্রতিদিন বাইবেল পাঠ ও প্রাহরিক প্রার্থনা ছিল তার নৈমিত্তিক জীবনের অংশ। পারতপক্ষে কখনোই খ্রিস্টযাগ বাদ দিতেন না। সত্য বলতে তিনি প্রবক্তার মত সাহসিকতা দেখিয়েছেন, হয়েছেন অনেকেরই বিরাগভাজন। তিনি যখন শেষ জীবনে নিজের একটি আশ্রয় তৈরীর পরিকল্পনা করেন, তখন প্রথমেই পরিকল্পনা করেন যেন তার ঘরে একটি ছোট চ্যাপেল থাকে যেখানে তিনি নিভৃতে প্রভুর সান্নিধ্যে কিছু সময় কাটাতে পারবেন।

আগ্রহ, উদ্যম ও সাহস নিয়ে তিনি সেবা কাজ করেছেন। বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি; সিস্টার মিরিয়াম, সিএসসি; এবং সিস্টার ডরথী, এলএইচসি'র সাথে তিনি পালকীয় সেবা দলের কাজ শুরু করেন। বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ পরিচালনা, ঐতিহ্যবাহী সভা পরিচালনা, বাইবেল শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা, বিশ্বাস ও সাক্রামেন্তের শিক্ষা প্রস্তুত করা ও বিলিয়ে দেয়াই ছিল তার ধ্যান, জ্ঞান ও সেবা। খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে বাইবেলে বিশেষ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি দেশব্যাপী পরিচিত ছিলেন। চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ এবং এর বাইরেও বাংলাদেশের সর্বত্র, বলা যায় টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত তিনি বাণী প্রচার করেছেন। এতে তার তৃপ্তি, মহাতৃপ্তি ছিল। পারিবারিক জীবনে টানাটানি থাকলেও তার সেবাকাজ, মানুষের সাথে যোগাযোগ, মানুষের অন্তরে খ্রিস্টের স্পর্শ দান, সাহস ও দৃঢ়তার সাথে বাণী প্রচারই ছিল তার সুখ ও পরমানন্দ। প্রতিদিন প্রার্থনা, ঐশবাণী পাঠ ও অনুধ্যান ছিল তার শক্তি ও সাহস। ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র কোনো কিছুই তার সেবা কাজকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। গ্রামে গঞ্জে হাঁটু জল, কাদা, সাপের উপদ্রব কোনো কিছুই তাকে দমাতে পারেনি কারণ সে ভাবতো সে ঈশ্বরের বাণী'র সেবক এবং ঈশ্বরের মানুষের সাথে একাত্ম। অনেক বয়স্ক ব্যক্তি, যুবক-যুবতী, শিশু-কিশোর তার বাণী প্রচারে মোহিত হয়ে তাকে ভালোবেসেছে। অনেক মানুষ প্রাণভরে তাদের মনের কথা তাকে খুলে বলতে পারতো। বানী প্রচার করতে গিয়ে অনেক জ্ঞানী, গণ্যমান্য ও পণ্ডিত ব্যক্তির সাথে একই মঞ্চে বক্তব্য দিয়েও সে কখনো নিজেকে অহংকারী মনে করেননি। তিনি সবসময়ই ভাবতেন, শিক্ষা দেয়ার মতো জ্ঞান ও কৌশল যদি ঈশ্বর দান করেন, তবে মানুষকে বাণীর স্বাদ দেয়া সম্ভব।

জ্ঞান অর্জন: বই কিনতে, সংগ্রহ করতে ও পড়তে তার কার্পন্য ছিলনা, সময়ের অভাব ছিলনা। বই উপহার পেতে যেমন ভালোবাসতেন, তেমনি কাউকে বই দিয়েও আনন্দ পেতেন। বাইবেল ছিল তার জীবন ও প্রাণ। লেখালেখিতে বিশেষ আগ্রহ ছিল তার। প্রচার করে লিখতে না পারলে যেন বাণী প্রচারে সার্থকতা আসেনা। মাঝে মাঝে লিখতে লিখতে ভোর হয়ে যেতো। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার লেখা ছাপা হতো। ফাদার পরিমল পেরেরা, সিএসসি; ফাদার লাপ্রাদ, সিএসসি, ফাদার পিও, এবং আরো অনেকে তাকে বই উপহার দিতেন। রোমের মেরিয়ান হিলের ফাদার হুমগার্ড তার লেখা একটি বই উপহার পাঠানোয় সে যে কী আনন্দ পেয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এগুলো ছিল তার প্রচার জীবনের প্রেরণা।

কিছু বাস্তব ঘটনা: রাজশাহীর এক নেশাগ্রস্ত যুবকের সাথে একবার তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বিভিন্নভাবে তাকে সাহায্য করেন, অনুপ্রেরণা দান করেন। তখন তিনি পান খেতেন। তিনি যুবকটির কাছে প্রতিজ্ঞা করেন, যুবকটি যদি নেশা ছেড়ে দিতে পারে তবে তিনিও আর কোনদিন পান খাবেন না। তিনি তার কথা রেখেছিলেন। তার সাহচর্যে এসে সত্যিই ছেলেটি নেশা ছেড়ে সুস্থ জীবনে ফিরে আসে। অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে তিনি নিয়মিত কম হলেও পড়ালেখার জন্য সাহায্য করতেন। অনেক দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে তিনি সংসার খরচের টাকা থেকে সাহায্য করেছেন, তাদের জন্য প্রার্থনা করেছেন। মানুষ এখনো তাই তাকে ভুলে যায়নি।

একবার তিনি যখন ঢাকা থেকে বরিশালে বাসে আসছিলেন, সেদিন তিনি ডাকাত দ্বারা আক্রান্ত হয়। গতানুগতিক ভাবে তিনি সামনের দিকে আসনে বসা ছিলেন। হাতে ছিল রোজারি মালা, আঙুলে বিয়ের সোনার আংটি, বাইবেলের কভারে সাতশত টাকা (বিভিন্ন বই এর ভাজে টাকা রাখা তার অভ্যাস ছিল)। ডাকাত দল অনেককে মেরেছে। সবার কাছ থেকে যার যা আছে নিয়েছে। তার সামনে এসে কিছু না বলেই নেমে গিয়েছে।

অনেক হিন্দু ও মুসলমান ভাইয়েরা তার সাথে কথা বলে তৃপ্তি পেত। তাকে দেখেছি সকালে ঘরে এসেই আবার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই প্রচারের জন্য ছুটে চলে গিয়েছে। জীবনে খুব কম সময়ই তিনি বিশ্রাম করেছেন। তিনি অত্যন্ত মিতব্যয়ী, শৃঙ্খলাপূর্ণ, প্রার্থনাশীল, ও জনদরদী ব্যক্তি ছিলেন। মানুষকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন, সম্মান করতেন।

২০১৮ খ্রিস্টাব্দে ৭ই নভেম্বর তিনি এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে ওপারে চলে যান পরিবার ও বহু মানুষকে কাঁদিয়ে। আজও বহুজনে কাঁদে তার জন্য। একবার তিনি বলেছিলেন, 'আমি ঈশ্বরের নামে কাজ করছি; হয়ত এ জগতে হেরে গেছি, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে যা ন্যায্য তা-ই পাবো।' তার এই উক্তিই আমাদের শান্তি।

॥ খ ॥ ভারত: প্রয়াত বিশেষ ব্যক্তি[১৫]

পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর প্রয়াত বিশেষ ব্যক্তিবর্গ

ক্রমিক	নাম	গ্রামের বাড়ীর নাম	প্রকৃত গ্রাম	জন্ম তারিখ	মৃত্যু তারিখ	স্থায়ী বাসিন্দা	পেশা	সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত
১	Richard Edward Gomes	মিস্ত্রী বাড়ী	পাদ্রীশিবপুর	০২/০৩/১৯২১	১৪/১২/১৯৮০	তালতলা কলিকাতা	সাঁতরাগাছিতে ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগে কর্মরত ছিলেন।	সমাজসেবী, কলিকাতায় পাদ্রীশিবপুর কাথলিক অ্যাসোসিয়েসনের অন্যতম কর্ণধার।
২	Lawrence D'Rozario		পাদ্রীশিবপুর			এন্টালী কলিকাতা	ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগে কর্মরত ছিলেন।	দয়ালু সমাজসেবী, কলিকাতায় পাদ্রীশিবপুর কাথলিক অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম কর্ণধার।
৩	Peter D' Costa	পশ্চিমে ডি'কস্তার বাড়ী	পাদ্রীশিবপুর			তালতলা কলিকাতা	সেন্ট আলফ্রেড থেকে ম্যাট্রিক পাশ (১৯৪৩) হাওড়া জেলায় অবস্থিত।	সাতরাগাছিতে ভারত সরকার দ্বারা পরিচালিত ছাপাখানায় বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ও হোটেল ব্যবসায়ী

[১৫] কলকাতার যোয়াকিম অসীম কাম্পু: সংযোজনে: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও

৪	Martin Gomes	মোক্তার বাড়ী	পাদ্রীশিবপুর		০৭/০৭/১৯৯৫	তালতলা, কল্যাণপুর	সেন্ট আলফ্রেড থেকে ম্যাট্রিক পাশ (১৯৪৫) ৭০ দশকে গৃহ-মন্ত্রীর সহায়ক ছিলেন।	ইংরেজী, ইতিহাস বিষয়ে দক্ষ ছিলেন
৫	Joseph Gomes	ছেমু হাওলাদার বাড়ী	মাটিভাঙ্গা		১৩/০৯/১৯৯১	তালতলা-কলিকাতা	সেন্ট আলফ্রেড থেকে ম্যাট্রিক পাশ (১৯৩৯) ভারতীয় শুল্ক বিভাগীয় Superintendent রূপে কর্মরত ছিলেন।	সমাজসেবী, কলিকাতায় পাদ্রীশিবপুর কাথলিক অ্যাসোসিয়েসনের অন্যতম কর্ণধার। সংস্কৃতি-পরায়ণ ব্যক্তি, বাংলা ভাষায় দক্ষ ছিলেন।
৬	Sebastian Gomes	জোলা বাড়ী	পাদ্রীশিবপুর	০৪/০৪/১৯২৫	০১/০৭/১৯৯৭	তালতলা, কল্যাণপুর	সেন্ট আলফ্রেড থেকে ম্যাট্রিক পাশ (১৯৪৫) হাওড়া জেলায় অবস্থিত সার্ভেরাগাছিতে ভারত সরকার দ্বারা পরিচালিত ছাপাখানায় বিভাগীয় proof Reader ছিলেন।	১৯৮৫ সালে কল্যাণপুরে প্রতিষ্ঠিত St. Stephen's Assocation এর প্রবর্তক এবং প্রথম কার্যকরী সভাপতি ছিলেন।
৭	Reginal D'Rozario	পাড়ের বাবুর বাড়ী	পাদ্রীশিবপুর	০৪/০১/১৯২২	২৪/১০/২০০৪	তালতলা, কল্যাণপুর	নিরক্ষর হলেও তিনি দক্ষ: Engineer Structural fabrication, erection Dismantling, Civil Engineering.	তার কাজে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯৮১ সালে তিনি পরীক্ষা মূলক ভাবে Gobar Gas Plant প্রস্তুত করেছিলেন। যেখানে দৈনিক ৫ কিলোগ্রাম গোবর গ্যাস উৎপন্ন করা হ'ত অনেক জায়গায় গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করেছেন।
৮	Norman Gomes	আলিচন বাড়ী	পাদ্রীশিবপুর		০৪/১১/১৯৮৩	তালতলা কলিকাতা	মালামাল পরিবহনের গাড়ীর ব্যবসা	৬০-৭০ দশকের সময়ে পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর ব্যক্তিগণ যারা কলিকাতায় বসবাস করতেন, তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি ছিলেন।
৯	George Hennessey Gomes	মিস্ত্রী বাড়ি	পাদ্রীশিবপুর	২৫/০৪/১৯৩২	২৭/০৬/২০১১	তালতলা কলিকাতা	প্রথমে কলকাতার Assembly of God Church বিদ্যালয়ে Vice Principal ছিলেন পরবর্তীতে উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরে ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছিলেন।	পাদ্রীশিবপুরবাসীদের মধ্যে প্রথম এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি আইন বিষয়ে স্নাতক এবং ইংরেজী বিষয়ে স্নাতকোত্তর ছিলেন।
১০	Norbert Gomes	নায়েব বাড়ি	পাদ্রীশিবপুর			তালতলা কলিকাতা	ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগে কর্মরত ছিলেন এছাড়া সাধী তেরেজার গির্জার অন্তর্গত St. John Berchmans School (Primary) <Z 4R[c cF[S[	সমাজসেবী, কলিকাতায় পাদ্রীশিবপুর কাথলিক অ্যাসোসিয়েসনের অন্যতম কর্ণধার। তার মেয়ে বেনেডিক্টা একজন লরেটো সিস্টার। তার ছেলে দীপক গোমেজ একজন জেসুইট ফাদার।

১১	Augustin Gomes (পত্রী)	পত্রী বাড়ী	পাদ্রীশিবপুর			সাধ্বী তেরেজার গির্জা- কলকাতা		সাধ্বী তেরেজার গির্জায় দক্ষতার সাথে পত্রীর কাজ করেছেন। নিজের ছোট ঘরে পূর্ব পাকিস্থানে/বাংলাদেশ থেকে আগত মানুষদের স্থান দিতেন স্বভাবে স্পষ্টবাদী ছিলেন।
১২	Silvera Gomes	হালদার বাড়ি	পাদ্রীশিবপুর		০১/০১/২০২০	তালতলা, কল্যাণপুর	সেন্ট আলফ্রেড থেকে ম্যাট্রিক পাশ (১৯৪৫) House Keeping কর্মী	দয়ালু সমাজসেবী, ১৯৮৫ সালে কল্যাণপুরে প্রতিষ্ঠিত St. Stephen's Association এর প্রথম কার্যকরী সম্পাদক ছিলেন পাদ্রীশিবপুর কাথলিক অ্যাসোসিয়েসনের অন্যতম কর্ণাধার।
১৩	Eric Gomes	জোলা বাড়ী	পাদ্রীশিবপুর	১৭/০১/১৯৫৩	২০/১২/২০২১	তালতলা, কল্যাণপুর	Biecco Lawrie Co. Ltd. এ বিভাগীয় হিসাব রক্ষক ছিলেন।	সংস্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তি, বাংলা ভাষায় সৃজনশীল লেখক, ইংরেজী ও হিসাবশাস্ত্রে দক্ষ ছিলেন। ৭০ দশকে নাট্য অভিনয়ে অসাধারণ ছিলেন।
১৪	Martin Gomes	বিসাই বাড়ী	পাদ্রীশিবপুর	২০/০৯/১৯২৬	২০/১২/১৯৮৬	ঠাকুরপুকুর	সেন্ট আলফ্রেড থেকে ম্যাট্রিক পাশ (১৯৪৬)	জিপিও পোস্ট অফিস রেলওয়ে মেইল সার্ভিসে কাজ করতেন। সরকারি চাকরি থেকে অবসরে গেছেন। একজন সমাজকর্মী ব্যবসায়ী, প্যারিশের সেন্ট ভিনসেন্ট দ্য পল সংঘে ছিলেন। তার মেয়ে ইভন গোমেজ একজন লরেটো সিস্টার।
১৫	Patrick Harry D' Rozario	পারের বাবুর বাড়ী	পাদ্রীশিবপুর	১৮/০২/১৯২৫	১১/০৩/২০২০	তালতলা, কল্যাণপুর	প্রাইমারী স্কুল	ইন্ডিয়ান আর্মিতে মেইল নার্স হিসেবে কাজ করেছেন। সরকারি চাকুরি থেকে অবসরে গেছেন। তার অভিজ্ঞতার জন্য সাধারণ রোগের জন্য সুস্থতার জন্য ঔষধের পরামর্শ দিতেন সবাইকে। কল্যাণপুরে এস.ভি.পি সংঘের আজীবন সদস্য ছিলেন।

॥ গ ॥ চট্টগ্রাম: প্রয়াত বিশেষ ব্যক্তি

পিটার পল গোমেজ - বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক

জন্ম: ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৩ খ্রি. এবং মৃত্যু: ৫ই জুলাই, ১৯৯২ খ্রি.

– ফাদার টেরেন্স রড্রিক্স

বর্তমান প্রজন্ম বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক প্রফেসর পিটার পল গোমেজ এর নাম অনেকেই শুনেনি। তিনি পাদ্রীশিবপুরের সন্তান। লেখাপড়া সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুল। পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কোলকাতা যান। কোলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ও ইংরেজী উভয় বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। পড়াশুনা শেষে তিনি কোলকাতা থেকে পাদ্রীশিবপুর গ্রামে ফিরে আসেন, পরে পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামে চলে আসেন। চট্টগ্রামে পাদ্রীশিবপুর-অভিবাসীর মধ্যে তিনিই প্রথম পথিকৃত।

শ্রদ্ধেয় পিটার পল গোমেজ এর জন্ম ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর, বরিশালের বাকেরগঞ্জের রাজাবাড়ীয়া কালাদা গ্রামের তাপাল বাড়ী। পিতার নাম চার্লস গোমেজ। পরবর্তীতে কালাদা থেকে পাদ্রীশিবপুর গ্রামের পশ্চিমে জায়গা কিনে বাড়ী করেন। বাড়ীর নাম শিকদার বাড়ী। উচ্চশিক্ষার পর মি: পিটার পল গোমেজ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি পাদ্রীশিবপুর গ্রামের দক্ষিণে পোস্ট মাষ্টার বাড়ীর আলেক্সজান্দ্রিয়া ডি' কস্তা (জান্দ্রা) কে জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করে সংসার জীবন শুরু করেন। বিবাহিত জীবনে তাঁদের সংসারে আসে ২ ছেলে ও ৪ মেয়ে সন্তান। তারা হলেন হেনরীয়েটা গোমেজ (বোটন), ডরথী গোমেজ (রুনু) (চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন আর্চডায়োসিসের ভিকার জেনারেল ফাদার টেরেন্স রড্রিক্স এর মাতা), আরনল্ড গোমেজ (অরুণ), রত্না গোমেজ, এ্যালেন গোমেজ (কবি) ও জাসিন্তা গোমেজ (ছবি)। সন্তানরা সকলেই শিক্ষিত ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত এবং নাতি ও নাতনীরাও সকলে প্রতিষ্ঠিত।

মি: পিটার পল গোমেজ চট্টগ্রাম এসে প্রথমে সেন্ট প্ল্যাসিডস্ হাই স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। তিনি ছিলেন ঐ স্কুলের প্রথম বাঙ্গালী শিক্ষক। তিনি চট্টগ্রাম সিটি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি কলেজে বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় ক্লাশ নিতেন। খ্রিস্টানদের মধ্যে তিনিই প্রথম কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি প্রফেসর হিসেবে অবসর নেন। তিনি একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে চট্টগ্রামের পাথরঘাটা ব্রিকফিল্ড রোডে অবস্থিত সিএনবি কলোনীতে প্রবেশ মুখে পাথরঘাটা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর নাম স্কুলের নাম ফলকে আছে।

চট্টগ্রামের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক অধ্যাপক পিটার পল গোমেজ শিক্ষাসেবার পাশাপাশি সাহিত্য রচনায় প্রচুর সময় দিয়েছেন এবং আমৃত্যু লিখে গিয়েছেন। নদী, পাহাড়, খাল, বিল আর সমুদ্র নিয়ে চট্টগ্রাম বা চট্টলায় তিনি থেকে গিয়েছেন জীবন জীবিকার নিমিত্তে। কর্ণফুলী নদীর স্রোতধারা, পতেঙ্গায় মহিসোপান ও সমুদ্রের অবিরাম ঢেউ এবং সীতাকুন্ডের পাহাড় তাঁকে মোহিত করেছে।

১৯৫৬ / ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তারা ৪ বন্ধু চট্টগ্রামে ৪ (চার) পিটারের সেই ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "জ্যোতি" পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। চট্টগ্রামে ৪ (চার) পিটারের সেই গল্প হচ্ছে ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "জ্যোতি" পত্রিকা। ১) পিটার পল গোমেজ : (আরনল্ড গোমেজ, এলেন গোমেজ, হেনরীয়েটা বেলাজো টিচার এর বাবা, ফা: টেরেন্সে রড্রিক্স এর দাদু) ২) পিটার সাহা: (বার্থোলোমিয় সাহা, আইরিন সাহা নোটনের বাবা) ৩) পিটার ব্লেইক: (রোমিয়ো ব্লেইকের বাবা) ৪) পিটার বিশ্বাস: (পাসকেল বিশ্বাস, এলড্রিক বিশ্বাস, বাবরা চিনু বিশ্বাস এর বাবা) সেই সময়ে এটি ছিল একটি সাহসী উদ্যোগ, বিশেষভাবে চট্টগ্রামের বুকে। মোট ৪ টি সংখ্যা "জ্যোতি" প্রত্রিকা ছাপা আকারে প্রকাশিত হয়।

১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে মি: পিটার পল গোমেজ চট্টগ্রাম কাথিড্রাল ধর্মপল্লীর মুখপত্র "সেবক" প্রকাশ করেন। তিনি "সেবক" এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। "সেবক" ও "গ্লিনিংস" ৫৫ বছর যাবৎ নিয়মিত / অনিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। তিনি চট্টগ্রামের দি খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ থ্রিফ্ট এন্ড ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম কমিটির একজন ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি চট্টগ্রামের পাদ্রীশিবপুর খ্রীষ্টিয় সমাজ সংঘের উপদেষ্টা ছিলেন। "সেবক" ও "গ্লিনিংস"-এর ও সাপ্তাহিক "প্রতিবেশী"র একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন।

বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নান বলেছেন যখন তিনি চট্টগ্রামের সেন্ট প্ল্যাসিডস্ হাই স্কুলের ছাত্র ছিলেন তখন মি: পিটার পল গোমেজ তাঁর শিক্ষক ছিলেন। তাঁর ছাত্র ছিল কারিতাসের সাবেক নির্বাহী পরিচালক জেফরী এস পেরেরা। দাদু পিটার পল গোমেজের অনুপ্রেরণায় ফাদার হয়েছেন ফাদার টেরেন্স রড্রিক্স যিনি এখন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন আর্চডায়োসিসের ভিকার জেনারেল।

মন্ডলীর বিভিন্ন কাজ বিশেষভাবে ২য় ভাতিকান মহাসভার আলোকে স্থানীয় মন্ডলীতে ভক্তজনগণের অংশগ্রহণকে তিনি প্রধান্য দিতেন যা তিনি বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি এর সাথে প্রায়ই আলোচনা করতেন। বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মন্ডলীর কাজে স্থানীয় মন্ডলীর বাস্তবায়ন ও সামাজিক প্রসারকে তাঁরা দু'জনেই অন্তরে ধারণ করেছিলেন।

তিনি নিয়মিত খ্রীষ্টযাগে যোগদান করতেন। তিনি অনেক ছাত্র ছাত্রীকে পড়াতেন ও গোপনে আর্থিক সহায়তা করতেন। তিনি ছিলেন ঐ সময়ের একজন বুদ্ধিজীবি। পিটার পল গোমেজ পরিবারে ছিলেন ২ ভাই ও ১ বোন। বেনেডিক্ট ফ্রান্সিস গোমেজ (বেনী) ও ফিলিপ গোমেজ। বোনের নাম জানা জায়নি। ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুলাই পিটার পল গোমেজ ৮৯ বৎসর বয়সে চট্টগ্রামে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি।

জীবনী কথা ও ধারা ভাষ্য : ফাদার টেরেন্স রড্রিক্স, ভিকার জেনারেল, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন আর্চডায়োসিস, চট্টগ্রাম। অনুলিখন : এলড্রিক বিশ্বাস, লেখক ও সাংবাদিক, ঢাকা / চট্টগ্রাম। কৃতজ্ঞতা স্বীকার: মি: এ্যালেন গোমেজ (কবি), পিটার পল গোমেজের ছোট সন্তান।

ভিনসেন্ট গোমেজ (ডিআইবি)

জন্ম: ৯ জুলাই, ১৯০৯ খ্রি. এবং মৃত্যু: ১৩ই জানুয়ারি ১৯৮০ খ্রি.

– মানিক উলভার ডি'কস্তা এবং জুলিয়ান গোমেজ

সান্তা মারিয়া গোমেজ এবং ক্যারোলিনা গোমেজের সন্তান ভিনসেন্ট গোমেজ। ২ ভাই ও ৪ বোনের পরিবারে তিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠ। পারিবারিক জীবনে তিনি ফিলোমিনা গোমেজের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। যতদূর জানা যায়, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি সেন্ট ক্রিসোস্তম উচ্চ বিদ্যালয় হতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। অতঃপর ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তিনি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। এরপরে তিনি বৃটিশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। পরবর্তীতে দেশভাগের পরে তিনি পূর্ব পাকিস্তান পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে যোগদান করেন ও তার প্রাথমিক কর্মস্থল ছিল বরিশালে। সেই থেকে তিনি ডিআইবি ভিনসেন্ট নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে তিনি চট্টগ্রামে বদলী হয়ে আসেন। চট্টগ্রামে পাদ্রীশিবপুর-অভিবাসীর মধ্যে তিনি দ্বিতীয় পথিকৃত। তিনি কানাডিয়ান মিশনারি যাজক ও ব্রাদারদের গোয়েন্দা বিভাগে ত্রৈমাসিক রিপোর্টিং করার ব্যাপারে সহায়তা করতেন এবং এ'কারণে যাজক ও ব্রাদারদের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা তৈরী হয়। তিনি একসময় সেন্ট প্লাসিডস্ স্কুলের পরিচালনা পরিষদ সদস্য হিসেবেও সেবা দিয়েছেন। তার অন্যতম দূরদর্শিতা ছিল ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের ইকবাল রোডে তাদের পারিবারিক বাসস্থান হিসেবে যে ৪ গন্ডা প্লটটি ব্যবহৃত হচ্ছে তা ৮,০০০.০০ টাকা মূল্যে ক্রয় করেন। তখন এই প্লটটি ছিল পানিতে নিমজ্জিত এবং পাশেই ছিল 'ডোম' পাড়া, যেখানে এখন ওয়ার্ড কাউন্সিলর ভবন গড়ে উঠেছে। রাস্তার উপরে শুকর চড়ে বেড়াত। অত্যন্ত নোংরা ছিল এলাকাটি। তিনি এখানে প্লট কেনায় সবাই হাসাহাসি করেছিল। তার চাইতে অনেক স্বচ্ছল কাথলিক পরিবার চট্টগ্রামে থাকলেও তারা জায়গা-জমি ক্রয়ে উৎসাহ দেখায়নি। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে নতুন বাড়ী আশীর্বাদ করা হয়। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি পুলিশ বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করেন ও পুলিশ কোয়ার্টার ছেড়ে ইকবাল রোডের বাড়ীতে পরিবার নিয়ে চলে আসেন। চট্টগ্রামে অবস্থানকালীন মান্ডলিক নানাবিধ কার্যক্রমে তিনি অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। বিশেষতঃ এসভিপিতে তিনি নিবেদিত প্রাণ হয়ে সেবা দিয়েছেন। তখন এসভিপির কার্যক্রম ছিল ব্যাপক। এসভিপি'র একজন সদস্য হিসেবে তিনি সকল খ্রিস্টভক্তদের তালিকা তৈরী করে ঈঙজজ এর দেয়া রিলিফ প্রতিমাসে ইকবাল রোড ও গুর্খা ডাক্তার লেন এলাকায় বিতরণ করতেন। সেবা সংঘে তিনি ফাদার রেমন্ড ড্যাজারিয়ের-এর প্রথম সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। একবেলা তিনি সেখানে সেবা দিতেন।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ভিনসেন্ট গোমেজ ও তার পরিবারের সকলে ইকবাল রোডের বাড়ীতে ছিলেন। তার ছোটবোন তখন ৩নং গেইট এলাকায় থাকতেন। সেখানে জেটি কলোনী ছিল। ভিনসেন্ট গোমেজের মেজো ছেলে জেরাল্ড গোমেজ তাদের দেখতে গিয়ে যুদ্ধকালীন ডামাডোলে কলোনীতে আটকে পড়ে। পরে ফাদার রড্রিগ্স গাড়ী নিয়ে গিয়ে তাদের উদ্ধার করেন ও ইকবাল রোডের বাড়ীতে পৌছে দেন। এরপর সবাই মিলে এ'বাড়িতেই বসবাস করতে থাকেন। তখন মিলিটারি ও রাজাকাররা প্রায়ই বাড়িতে বাড়িতে তল্লাশি চালাতেন। ভিনসেন্ট গোমেজের বাড়ির পাশেই ছিল অনেক হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ। বাড়ির দেয়াল নীচু থাকায় মিলিটারি ও রাজাকার আসার সংবাদ পেলেই হিন্দুরা, বিশেষভাবে

মেয়েরা এসে ভিনসেন্ট গোমেজের বাড়ীতে আশ্রয় নিত। রাজাকাররা এলে তিনি দরাজ গলায় বলতেন, nobody is here! মিলিটারি ও রাজাকারদের ভিনসেন্ট গোমেজের সাথে উগ্র আচরণ করতে দেখা যায়নি!

সেবা সংঘে সেবাদানরত সময়ই ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জানুয়ারি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। চট্টগ্রামের ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর কবরস্থানেই তাকে সমাধিস্ত করা হয়। পুলিশ হিসেবে কর্মরত থাকলেও ব্যক্তিজীবনে তিনি অত্যন্ত সৎ ছিলেন। ফলে ছোট্ট একটি প্লট ও বাড়িই তিনি সম্পদ হিসেবে রেখে যেতে পেরেছেন মাত্র। তবে ছেলে-মেয়েদের উচ্চ শিক্ষাদানে তিনি কোন কার্পন্য করেননি।

বার্নার্ড ডি'রোজারিও (স্যার)

জন্ম: ১১ই নভেম্বর, ১৯১২ খ্রি. মৃত্যু: ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৮৫ খ্রি.

- সিন্থিয়া ডি'রোজারিও

আমার বাবা বার্নার্ড ডি'রোজারিও, জন্মগ্রহণ করেন ১১ই নভেম্বর ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে বরিশালের পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীতে। তিনি পাদ্রীশিবপুর গ্রামেই পড়াশুনা করেছেন এবং ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। আমার মায়ের নাম আন্না মারিয়া ডি'রোজারিও।

বাবা ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম আসার পর ভলকাড ব্রাদার্স জার্মানি কোম্পানিতে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে কাজ করেন। চট্টগ্রামে নালাপাড়া বসবাস করতেন। মানুষকে তিনি অনেক ভালবাসতেন। পাদ্রীশিবপুর গ্রামের কোন লোক চট্টগ্রাম আসলেই আমাদের বাসায় উঠতেন এবং মাসখানেক থাকতেন, কিন্তু কোন কিছুই তাদের কাছ থেকে নিতেন না। তাদের জন্য চাকরির সুযোগ করে দিতেন, অনেক সময়ই তাদেরকে নিজ বাসায় রাখতেন।

অনেককেই তিনি দেশের বাইরে কাজ করতে পাঠাতেন এবং তিনি তাদের টিকেট কিনে দিতেন। আমরা দেখেছি অনেক লোকজন ঘরে আসত ইংরেজিতে চিঠি লেখাতে আর তিনি লিখে দিতেন। বার্নাড ডি'রোজারিও একজন বিশিষ্ট সমাজ-সেবী ছিলেন। চট্টগ্রাম ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠনে তার অবদান ছিল অনেক। তিনি চট্টগ্রাম খ্রিষ্টিয়ান কো অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের অন্যতম নেতা ও বিনা পারিশ্রমিকে কর্মীর দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া পাদ্রীশিবপুর খ্রিষ্টিয় সমাজ সংঘ প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধের সময় দেখেছি অনেক হিন্দু পরিবারকে আমাদের বাসায় থাকতে দিয়েছেন। মণ্ডলীর কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সাথে পরিচিত ছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি মনে করতেন ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের চলাচল করা দরকার।

ঈশ্বরের উপর গভীর নির্ভরশীল ছিলেন। পরিবারের সদস্যদের সাথেও তার গভীর ভালবাসা ছিল। তাদের পড়াশুনা, ভাল খাবার-দাবার ও অসুখ-বিসুখের জন্য যত্ন নিতেন। বরিশালে পাদ্রীশিবপুর গ্রামের বাড়িতে বছরে একবার আমাদের নিয়ে যেতেন। পারিবারিক মালা প্রার্থনা, বাইবেল পাঠ,

মৌখিক প্রার্থনা উৎসর্গ করতে আমরা শিখেছিলাম ছোটবেলায় বাবার কাছ থেকেই। তিনি একজন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। আমরা মনে করি তার এই সকল সেবাকাজের জন্য আমরা সবাই ঈশ্বরের আশীর্বাদে ভাল আছি। আমরা চার-বোন ও তিন-ভাই। তিন-ভাই সবাই প্রয়াত হয়েছে।

আমাদের বোন প্রভাতি দিদি মণ্ডলীতে একজন আদর্শ ব্যক্তি ছিলেন। অ্যাংলো-বাঙালি সবার বাড়িতে তিনি যেতেন, প্রার্থনা চালাতেন, সবার কাছে খুবই সাদরে গৃহীত ছিলেন। রোগী ও মৃতব্যক্তিদের বাড়িতে গিয়ে তাদের যত্ন নিতেন এবং প্রার্থনা চালাতেন। ছোটদেরকে নিয়ে পাদ্রীশিবপুরে "ব্রাদার আন্দ্রে"র সংঘ করে পরিচালনা ও শিক্ষা দিয়েছেন। এক মুহূর্তে প্রভাতী ডি'রোজারিও "ঐশবাণী বন্ধু সংঘে" "চির-কৌমার্য ব্রত" গ্রহণ করে নিবেদিত হয়েছিলেন এবং আজীবন তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন।

বাবা বার্ণাড ডি'রোজারিও অত্যন্ত সহজ-সরল, সাধারণ ও পরোপকারী একজন বিশ্বস্ত খ্রিস্টভক্ত ছিলেন। তিনি প্রয়াত হয়েছেন ৮ই ডিসেম্বর ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে এবং পাথরঘাটা কবরস্থানে তিনি সমাহিত হন। আমরা বিশ্বাস করি তিনি ঈশ্বরের কাছে আছেন।

উইলসন গোমেজ

জন্ম: ২৯শে মে, ১৯৩৮ খ্রি. এবং মৃত্যু: ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রি.

– অস্কার অর্ক গোমেজ

জেরমান গোমেজ এবং ক্যাথেরিনা গোমেজের দ্বিতীয় সন্তান উইলসন গোমেজ ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মে বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার পাদ্রীশিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুল থেকে এস.এস.সি. এবং নটর ডেম কলেজ থেকে এইচ.এস.সি. পাস করে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে পড়ালেখা শেষ না করেই চাকরিতে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ মে নায়েব গুরুমহাশয়ের নাতিন ও বর্তমান মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও এর ভাগিনী প্যাট্রোলিনা গোমেজের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের সংসার আলোকিত করে জন্ম হয় তিন সন্তানের। বড় মেয়ে চম্পা মারিয়া গরোটি গোমেজ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে, মেজো ছেলে জেমস্ গোমেজ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে এবং ছোট মেয়ে আন্না পাপড়ি গোমেজ ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

চাকরির কারণে তিনি তার সংসার জীবনের অনেকটা সময় পরিবার থেকে দূরে কাটিয়েছেন। কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় কোম্পানিতে নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে কাজ করেছেন। তিনি তার সুদীর্ঘ কর্মজীবনে সুইস বোরিং এবং পরবর্তীতে সয়েলটেক ইন্টারন্যাশনাল এ কাজ করেছেন। কর্মকালীন সময়ে তিনি নিষ্ঠা ও সততার কারণে কোম্পানির কর্তৃপক্ষের নিকট আস্থা অর্জন করতে পেরেছিলেন উদাহরণস্বরূপ তাকে সাইটে গিতে কোম্পানির শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি দেয়ার জন্য টাকা ভর্তি বাক্সের দায়িত্ব দেয়া হত সাইটে গিয়ে লেবার পেমেন্ট করার জন্য এবং শেষ কর্মদিবস পর্যন্ত সেই আস্থা তিনি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। সবশেষে তিনি কোম্পানির অর্থবিভাগে হিসাবরক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে সম্মানের সঙ্গে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন।

জীবদ্দশায় তিনি খুবই সাধারণ জীবন কাটিয়েছেন এবং অনেক ত্যাগস্বীকার করে তার পরিবারকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি এবং তার স্ত্রী সর্বদাই তাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন এবং সন্তানদের শিক্ষিত করে গড়ে তুলেছেন। বর্তমানে তার জ্যেষ্ঠ সন্তান যুক্তরাষ্ট্রে স্বপরিবারে অবস্থান করছেন এবং তার মেজো সন্তান কারিতাস বাংলাদেশের একটি ট্রাস্ট মটস এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। দুঃখজনক হলেও সত্যি তার কনিষ্ঠ সন্তান ২০০১ খ্রিস্টাব্দে ইহলোকের মায়া ত্যাগ করেছেন।

ধর্মীয় জীবনযাপনে তিনি সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। প্রতিদিন গির্জায় যাওয়া তার দৈনন্দিন কাজের মধ্যে একটি অন্যতম কাজ ছিল। বিভিন্ন প্রার্থনা সভা পরিচালনা করা, পাদ্রীশিবপুরের এক ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠান (মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে) "রেজবার" পরিচালনা, কীর্তন-ভজনে অংশগ্রহণ এবং তা পরিচালনা করাসহ বিভিন্ন সমিতি ও সংঘের নেতৃত্ব প্রদানে তিনি সর্বদাই সক্রিয় ছিলেন।

পাদ্রীশিবপুর গ্রামের নতুন গির্জা নির্মাণের জন্য চট্টগ্রামস্থ-পাদ্রীশিবপুর গ্রামের জনগণের কাছ থেকে দান সংগ্রহ এবং তার সঠিক হিসাব রেখে গির্জা নির্মাণ কমিটির কাছে বুঝিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তার সুমিষ্ট কণ্ঠের অসাধারণ গায়কী সকল মানুষের হৃদয় জয় করত। বড়দিন এর সময় চট্টগ্রামস্থ-পাদ্রীশিবপুরের কীর্তন দলের নেতৃত্বে তাকে সর্বদাই দেখা যেত। চট্টগ্রামের খ্রিস্টান অ্যাংলো-ইন্দিয়ান সমাজ, চট্টগ্রামস্থ-পাদ্রীশিবপুর সমাজ এবং চট্টগ্রামের মূল বাসিন্দা সমাজ সকলের সঙ্গেই তার সুসম্পর্ক এবং যোগাযোগ ছিল।

তিনি দীর্ঘ ৫৫ বছর চট্টগ্রামে থাকার পর ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে তার মেঝ সন্তানের কর্মক্ষেত্র বদলির কারণে স্বপরিবারে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঢাকায় স্থানান্তরিত হন। কিন্তু তিনি বেশিদিন ঢাকায় থাকতে পারেননি কারণ ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি এক সপ্তাহ হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর সৃষ্টিকর্তার ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি জমান। করোনা ভাইরাসের প্রকোপ থাকা সত্ত্বেও চট্টগ্রাম ক্যাথিড্রালের গির্জায় অসংখ্য মানুষ তাকে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে আসেন; এতে সুস্পষ্ট হয় তার প্রতি মানুষের অকৃত্রিম ভালবাসা। নিষ্ঠাবান, সৎ, ধার্মিক, নিঃস্বার্থ, সক্রিয়, সৃজনশীল ও পরিশ্রমী জীবনযাপন করা উইলসন গোমেজ সর্বদা পরিবার, সমাজ এবং খ্রিস্টমন্ডলীর মঙ্গলের স্বার্থে কাজ করে মানুষের মনে সম্মানের সঙ্গে জায়গা করে নিয়েছেন এবং একটি সার্থক ও সফল জীবনের উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন।

ক্যাপ্টেন লিওনার্ড টিটাস গোমেজ (সানু)

জন্ম: ৪ জানুয়ারি, ১৯৪৬ খ্রি. এবং মৃত্যু: ৯ই নভেম্বর ২০০৫ খ্রি.

– মানিক উলভার ডি'কস্তা এবং জুলিয়ান গোমেজ

ভিনসেন্ট গোমেজ এবং ফিলোমিনা গোমেজের ছেলে লিওনার্ড (ডাকা হয় লেনার্ড) টিটাস গোমেজের জন্ম হয় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ৪ তারিখে। ৫ ভাই ও ১ বোনের পরিবারে তিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠ । ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে বরিশালের ব্যাপ্টিস্ট মিশন স্কুলে তিনি তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু করেন।

পরবর্তীতে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের সেন্ট প্লাসিড স্কুলে তিনি ২য় থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। এরপর তিনি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোর-এ সারগোদা পিএএফ (পাকিস্তান এয়ার ফোর্স) কলেজে যোগদান করেন। সেখান থেকেই তিনি ১৯৬১ সালে সিনিয়র কেমব্রিজ সমাপ্ত করেন। এরপর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা নটর ডেম কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। এরপর বাংলাদেশ মেরিন একাডেমিতে ভর্তির সুযোগ পাওয়ায় তিনি ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ৩য় ব্যাচে (নটিক্যাল সেকশন) যোগদান করেন। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ডেক ক্যাডেট হিসেবে তৎকালীন ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশন-এর (বর্তমানে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন) বানিজ্যিক জাহাজে যোগদান করেন। এরপর করাচি থেকে ১৯৬৯ সালে সেকেন্ড মেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সেকেন্ড অফিসার পদ লাভ করেন।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে যখন স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়, তখন তার জাহাজ এমভি তারবেলা বাংলাদেশের জলসীমার বাইরে ছিল। এ'সময় দীর্ঘদিন পরিবারের কারো সাথে তার কোন যোগাযোগ ছিল না। তৎকালে, টেলিফোন ও মোবাইল না থাকায় চিঠি ছাড়া যোগাযোগের আর কোন মাধ্যম ছিল না। কোনো বন্দরে জাহাজ ভিড়লে তখন তিনি পরিবারে চিঠি পাঠাতে পারতেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানের মালিকানাধীন বানিজ্যিক জাহাজটির সর্বোচ্চ পদধারী বাঙ্গালী অফিসার ছিলেন লেনার্ড গোমেজ। এছাড়াও জুনিয়র অফিসার, খালাসি, বাবুর্চি, পরিচারক পদে আরো কিছু বাঙ্গালী জাহাজে ছিলেন। খ্রিস্টান অফিসার হওয়ার সুবাদে জাহাজের পাকিস্তানি অফিসাররা লেনার্ড টিটাস গোমেজকে তেমন সন্দেহের চোখে দেখতেন না। তিনি অফিসারদের সাথে আলোচনা করে শান্তিপূর্ণভাবে সমস্ত বাঙ্গালী কর্মীদের নিয়ে ব্যাংকক বন্দরে জাহাজ থেকে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হন। এই সংবাদটুকু পরিবারের কাছে পৌঁছলেও এরপরে আবার দীর্ঘদিন কোন যোগাযোগ ছিল না। ১৯৭১ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে তিনি চট্টগ্রামে পরিবারের কাছে ফিরে আসেন। লম্বা দাড়ি ও গোঁফে ভরা লেনার্ড গোমেজকে তখন পরিবারের লোকেরাই চিনতে পারেনি।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পরে বানিজ্যিক জাহাজের কোন কার্যক্রম না থাকায় তিনি খুলনা বিআইডবি-উটিএ-তে যোগদান করে conservancy and piloting superintendent পদে কাজ করেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকায় অবস্থানরত পাদ্রিশিবপুরের মি. উইলিয়াম আলবিন গোমেজের মেয়ে মনিকা গোমেজের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং এক ছেলে ও এক মেয়ের পিতা হন। ছেলে রিচার্ড রিকি গোমেজ বর্তমানে আমেরিকা এবং মেয়ে ক্যারোলিন জেনিফার পিনেরো কানাডা প্রবাসী ও উভয়েই সংসারী। ১২ই জুলাই ১৯৭২ ক্রিস্টাব্দে নবগঠিত বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের বানিজ্যিক জাহাজ এমভি ঢাকাতে ভারপ্রাপ্ত চিফ অফিসার হিসেবে আবার সমুদ্র জীবন শুরু করেন। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে স্কলারশিপ লাভ করে যুক্তরাজ্যের সাউথশিল্ডস টেকনিকাল কলেজে ভর্তি হন এবং First Mate's Certificate of Competency লাভ করেন। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্কলারশিপ পেয়ে সাউথ্যাম্পটনের "নটীক্যাল কলেজ ওয়ারস্যাশ" থেকে ক্লাস ওয়ান মাস্টার মেরিনার সার্টিফিকেট লাভ করেন এবং এমভি "বাংলার প্রগতি" তে 'ফার্স্ট কমান্ড' (ক্যাপ্টেন) হিসাবে নিয়োগ পান। তিনিই ছিলেন বাঙ্গালী খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রথম ক্যাপ্টেন। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন জাহাজে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই নভেম্বরে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন এবং ২০০১ সালে তিনি MIST এ প্রশিক্ষক হিসাবে যোগ দেন ও মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেখানেই কর্মরত ছিলেন। ৯ই নভেম্বর

২০০৫ খ্রিস্টাব্দে হৃদযন্ত্রের জটিলতা সংক্রান্ত কারণে ঢাকার ল্যাবএইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পরদিনই তাকে চট্টগ্রামের ক্যাথিড্রাল কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। ব্যক্তিজীবনে ক্যাপ্টেন লেনার্ড টিটাস গোমেজ ছিলেন অত্যন্ত সহজ, সাধারণ, সদালাপী ও ধর্মপরায়ন। যখনই কোন বন্দরে জাহাজ ভিড়তো, খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করার সুযোগ তিনি হাতছাড়া করতেন না। যৌথ পরিবারে থাকার জন্য তিনি সবসময় চেষ্টা করেছেন।

জেরাল্ড রুফাস গোমেজ

জন্ম: ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ এবং মৃত্যু ১৭ জানুয়ারি, ১৯৯১ খ্রি.

– মানিক উলভার ডি'কস্তা এবং জুলিয়ান গোমেজ

ভিনসেন্ট গোমেজ এবং ফিলোমিনা গোমেজের ছেলে জেরাল্ড (যাকে জেরেল বলা হত) গোমেজ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জেরেল গোমেজ সেন্ট প্ল্যাসিডস্ স্কুলে পড়ালেখা করেন। তবে তিনি সেখান থেকে এসএসসি পাশ করেননি। তিনি শিক্ষক টি.টি. হালদার-এর কাছে প্রাইভেট পড়ে তার ব্যবস্থাপনায়ই প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে এসএসসি পাশ করেন। এসএসসি'র পরে তিনি চট্টগ্রাম কমার্স কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই তিনি ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। এরপরই শুরু হয় দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ। যুবক ছেলেদের বাড়ীতে রাখা তখন খুব ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় তার বাবা ভিনসেন্ট গোমেজ তাকে চট্টগ্রাম ফিশারিজে একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। তবে, স্বাধীনতার পরে তিনি চাকরিটি ছেড়ে দেন। ফাদার (বর্তমানে কার্ডিনাল) প্যাট্রিক ডি'রোজারিও পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারিতে থাকা অবস্থায় তাকে সেখানে নিয়ে যান কাজের জন্য। তবে বারে বারে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি সেখানে বেশীদিন কাজ করতে পারেননি। দেড় থেকে দুই বছর পরে তিনি চট্টগ্রামে ফিরে আসেন।

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহিত জীবনে তাদের একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে সন্তান হয়। চট্টগ্রামে এসে তিনি 'সি রিসোর্স' নামক একটি প্রতিষ্ঠানে তিনি চাকরি শুরু করেন। একই সময়ে তিনি সামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়েন। তৎকালে বেকার যুবকদের কারিগরী প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত "সেবা সংঘ" নামক প্রতিষ্ঠানে বেশ কয়েক মেয়াদে জেরেল গোমেজ সেক্রেটারি এবং প্রেসিডেন্ট পদে সেবা দান করেছেন। সেসময় পাস্কাল বিশ্বাস, সুবীর কর্মকারের সাথে তার সখ্যতা তৈরী হয়। মৃত্যু বরণের দিন পর্যন্ত তিনি "সেবা সংঘে"র সেক্রেটারি হিসেবে সেবা দান করেছেন।

এরপর তিনি একটি তেল কোম্পানীতে চট্টগ্রাম ব্রাঞ্চের ম্যানেজার হিসেবে যোগদান করেন। এই চাকরিটি ভালই ছিল। কোম্পানী থেকে তাকে গাড়ী দেয়া হয়েছিল। তেল কোম্পানী এবং সেবা সংঘ– এই নিয়েই তিনি ব্যস্ত জীবন কাটাতেন। তৎকালে পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টিয় সমাজ সংঘ খুবই সক্রিয় ছিল এবং এর নানাবিধ সামাজিক কার্যক্রম ছিল। জেরেল গোমেজ এই সংঘের একজন সক্রিয় সংগঠক ছিলেন। এছাড়াও তৎকালে জেরম গোমেজ, বাদল গোমেজ, ক্যামেলিয়াস বেনু গোমেজ, প্রমুখ সংগঠকগণসহ আরো অনেকে এই সংঘের সাথে জড়িত ছিলেন। পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টিয় সমাজ সংঘের

আয়োজনে তখন নিয়মিত মঞ্চ নাটক, বড়দিন পুনর্মিলনী, পুনরুত্থান পুনর্মিলনী ইত্যাদি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হতো। স্বাধীনতার পরে দেশের অর্থনীতির অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়ে। চট্টগ্রামের খ্রিস্টভক্তরা খুব কঠিন দিন কাটাচ্ছিল। তখন তারা সংঘের প্যাডে আবেদন করে লিভার ব্রাদার্স এবং অন্যান্য বিভিন্ন কোম্পানীর কারখানা থেকে পাইকারী দামে চাল, ডাল, তেল ইত্যাদি সংগ্রহ করতেন এবং খ্রিস্টভক্তদের কাছে অর্ডার অনুযায়ী কম দামে পৌঁছে দিতেন। এভাবে খ্রিস্টভক্তদেরও কিছু উপকার হতো এবং সংঘের তহবিলেও কিছু লাভ জমা হতো। এছাড়া, চট্টগ্রাম ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লী বাংলা উপাসনা সঙ্গীত দলেরও তিনি একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ঘূর্ণিঝড়ে জেরেল গোমেজের তেল কোম্পানীর একটি ট্যাংকার তেল সহ কর্ণফুলীর শিকলবাহা খালে আটকে যায়। এই বিষয়টি নিয়ে তিনি প্রচণ্ড দুঃশ্চিন্তায় দিন কাটাতেন শেষ দিনগুলোতে। মৃত্যুর দিন সকালে তিনি অফিসে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। বাড়ীতে আর কেউ ছিল না। তার স্ত্রী ছিলেন স্কুলে। বড় ছেলে তখন মাত্র ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলের এসএসসি পরীক্ষার্থী। সে স্কুলের হোস্টেলেই থাকতো। মেয়ে তখন সম্ভবত তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী। সে-ও তখন স্কুলে। তার ভাইয়েরাও তখন যে যার কর্মস্থলে কর্মরত। অর্থাৎ, বাড়ীতে কেউই ছিল না। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি তারিখে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মিঃ নরবাট গোমেজ এবং মিঃ গাব্রিয়েল গোমেজ

– এমরোজ গোমেজ

প্রয়াত মিঃ নরবাট গোমেজ এবং মিঃ গাব্রিয়েল গোমেজ ১৯৪৯ খ্রি. চট্টগ্রামে আসেন। মিঃ নরবাট গোমেজ সেন্ট যোসেফ প্রেসে এবং মিঃ গাব্রিয়েল গোমেজ কুঠি বাড়িতে বাবুর্চীর কাজে নিয়োজিত হন। পরে ১৯৫৭ খ্রিঃ মিঃ নরবাট গোমেজ পরিবার নিয়ে এসে অবস্থান করতে থাকে। এসময় থেকে পাদ্রিশিবপুর হতে আগত সকলের আশ্রয় ছিল মিঃ নরবাট গোমেজের ঘর পরে এঘরের নাম হয়ে উঠে নরবাটের ম্যাচে। অনেকে আশ্রয় পেয়ে বিশেষ উপকৃত হয়েছে। উল্লেখ্য এসময় ২/৩টি পরিবার ছাড়া পরিবার নিয়ে বাস করার সামর্থ এবং মানাসিকতা অনেকেরই ছিল না। কারণ সবারই চিন্তা ছিল বাড়িতে ঘর-বাড়ি ছেড়ে আসা সঠিক নয় এবং দরকারও নাই।

পরে সন্তানদের ভবিষ্যত বিবেচনা করে মিঃ গাব্রিয়েল গোমেজ ১৯৬২ খ্রিঃ এর পরিবার নিয়ে বাস করতে শুরু করে। পরবর্তিতে এ পরিবারটা হয়ে উঠে বৃহত্তর পাদ্রীশিবপুরবাসীদের আশ্রয় স্থান। পাদ্রীশিবপুর, দেশন্তরকাঠি, রাজাবাড়িয় ও ছোট বিগাই গ্রাম থেকে কেউ চট্টগ্রামে আসলে সবাই এ পরিবারে এসে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। এ পরিবারের পরিচয় ছিল পাদ্রীশিবপুর গ্রাম থেকে যাদের আগমন হতো তাদের নিকট গাব্বার ঘর আর দেশন্তারকাঠি, ছোট বিঘাই ও রাজাবাড়িয়া গ্রাম থেকে যারা আসতেন তাদের জন্য কেরোর ঘর। অভাবে ছিল সত্য কিন্তু আদর আপ্যায়নে কোন কমতি ছিল না । সকলে আনন্দে ও স্বাচ্ছন্দে থাকত। সকলে এপরিবারকে নিজের মত ভাবতেন এবং মিসেস ক্যারেলিনা সকলকে কোন না কোন ভাবে তার আত্মীয় বলে দাবি করতেন। তাঁর মন ছিল খুবই উদার, আপ্যায়নে তিনি পেতেন আনন্দ ও পরিতৃপ্তি। তিনি বলতেন অতিথি আমাদের খাওয়া খায় না খায়

তাদের ভাগ্যে। সংগত কারনে তিনি আশ্রয় প্রার্থী সকলকে আদর আপ্যায়নে কৃপনতা করেননি। পাদ্রীশিবপুরের ঐতিহ্য অনুসারে উপবাসকালীন সময়ে গৃহদারে প্রার্থনা এপরিবার থেকেই চট্টগ্রামে শুরু হয় পরবর্তীতে ওয়াইসিএস এর মাধ্যমে প্রসারিত হয়। পরিবারে ৫ সন্তানেরাও মা-বাবার শিক্ষা অন্তরে ধারন করে সমাজে বিভিন্ন ভাবে অবদান রেখে চলেছে।

(ঘ) ঢাকা: প্রয়াত বিশেষ ব্যক্তিবর্গ

উইলিয়াম আলবিন গোমেজ (শিকদার বাড়ি)

জন্ম: ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২২ খ্রি.; মৃত্যু: ২৭শে মার্চ, ১৯৯৭ খ্রি.

– ড. মনিকা গোমেজ

উইলিয়াম গোমেজ পাদ্রীশিবপুর শিকদার বাড়ির ম্যানুয়েল এবং ভার্জিনিয়া গোমেজ এর দশ সন্তানের মধ্যে ছিলেন অষ্টম এবং পরিবারের মাঝে আলবিন নামেই পরিচিত ছিলেন । তিনি ১৯২২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি পাদ্রীশিবপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেন্ট আলফ্রেড উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট আলফ্রেড স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন এবং সেখানে তিনি তার আই.এ (ইন্টারমিডিয়েট অফ আর্টস) এবং বিএ (ব্যাচেলর অফ আর্টস) সম্পন্ন করেন। তার বড় ভাইয়েরা কলকাতায় পড়াশোনা ও কাজ করতেন এবং তার দ্বিতীয় ভাই জর্জ বেনেডিক্ট গোমেজ তার উচ্চ শিক্ষার জন্য তাকে সার্বিক সহায়তা করেছিলেন। তিনি ১৯৪৫ সালে বি.এ. ডিগ্রী অর্জন করেন এবং পাদ্রীশিবপুর থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে এই ডিগ্রি অর্জন করে ছিলেন, যেটি ছিল তখনকার দিনে একটি বড় অর্জন।

উইলিয়াম গোমেজ ২১ এপ্রিল ১৯৪৫ সালে কলকাতার সেন্ট তেরেজা চার্চে ফরিদপুর নারিকেল বাড়ির রাজেন্দ্রনাথ বাড়রির কন্যা তেরেজা শতদল বাড়রিকে বিয়ে করেন। সেই সময়, তেরেজা বাড়রি কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর উইমেনস অক্সিলিয়ারি কর্পস (ডব্লিউএসি) তে কর্মরত ছিলেন। দেশ ভাগের সময়, উইলিয়াম গোমেজ তার স্ত্রী এবং বড় ছেলেকে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে আসার সিদ্ধান্ত নেন এবং ডিআইবি পুলিশের (জেলা গোয়েন্দা শাখা) ঢাকা অফিসে যোগদান করেন। তারা বেশ কয়েক বছর পুরাতন ঢাকার ওয়ারী এবং লক্ষ্মীবাজারে বসবাস করে ১৯৫৭ সালে স্থায়ীভাবে তেজগাঁও চলে আসেন এবং সেখানেই তিনি তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ছিলেন। উইলিয়াম এবং তেরেজার দশ সন্তান, চার পুত্র (মাইকেল, রাফায়েল, গাব্রিয়েল, জন) এবং ছয় কন্যা (মেরি, মনিকা, মেবেল, জ্যাসিন্তা, লুসিয়া, ভার্জিনিয়া) দ্বারা আশীর্বাদিত ছিলেন। তিনি তার সন্তানদের সর্বদা উচ্চ শিক্ষার জন্য উৎসাহিত করেছেন এবং তাদের অনেকেই এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় বসবাস করছেন, যেখানে তাদের তিনি দেখতে গিয়েছিলেন ও তাদের সাথে খুব সুন্দর একটা সময় অতিবাহিত করেছিলেন।

উইলিয়াম গোমেজ সবসময় ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেরামত জাতীয় কাজে আগ্রহী ছিলেন তারই ধারাবাহিকতাই পরবর্তীতে তিনি তেজগাঁওতে তার নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলেন যাহা সেন্ট মাইকেল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস নামে পরিচিত ছিল। তার কর্ম এবং পারিবারিক জীবনের পাশাপাশি, উইলিয়াম গোমেজ তেজগাঁও চার্চের প্যারিশ কমিটি, হলিক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজ কমিটির সদস্য এবং

পাদ্রীশিবপুর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। গ্রাম থেকে ঢাকায় বেড়াতে আসা আত্মীয়-স্বজনদের জন্য তার বাড়ি ছিল সবসময় উন্মুক্ত। তার পরবর্তী বছরগুলিতে, তিনি প্রায়শই তার গ্রামের বাড়িতে যেতেন এবং সেখানে বেশ কয়েক বছর বসবাসও করেছিলেন।

তিনি ১৯৯৭ সালের ২৭ মার্চ ৭৫ বছর বয়সে তেজগাঁয়ের ফার্মগেটে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। দিনটি ছিল ইস্টার সপ্তাহের পবিত্র বৃহস্পতিবার এবং পরে তাকে তেজগাঁও হলি রোজারি চার্চ কবরস্থানে কবর দেয়া হয়। উইলিয়াম গোমেজ পরকালে চলে গিয়েও রেখে গিয়েছেন, কঠোর পরিশ্রম ও সৎ জীবনের দৃষ্টান্ত, একজন প্রেমময় ও যত্নশীল বাবা, দাদা এবং পরিবার প্রধানের আদর্শ।

লিখেছেন: মনিকা গোমেজ (উইলিয়াম গোমেজ এর ২য় কন্যা), টরন্টো, কানাডা এবং ডেরিক আলেকজান্ডার গোমেজ (উইলিয়াম গোমেজ এর নাতি), তেজগাঁও, ঢাকা।

উইলিয়াম আলবিন গোমেজ (সাক্ষাৎকার)[১৬]

– সাক্ষাৎকার গ্রহণে: খ্রিস্টফার ডিঃ কস্তা ও জোসেফ ডিঃ রোজারিও

গোধূলি তখন অতিক্রান্ত। হেমন্তের হিমেল সন্ধ্যা। কোন কিছু না জানিয়ে আমরা হঠাৎ করে আমাদেরই একজন প্রবীনের বাসভবনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। প্রবীন বর আর কেহ নয় আমাদেরই একজন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র, সর্বদা হাস্যজ্জল যার মুখ মি: উইলিয়াম আলবিন গোমেজ। সবেমাত্র নৈশভোজ সমাপন করেছেন। আমাদের উপস্থিতি তার কাছে হঠাৎ করে দেখা দিলেও কোন ভাবান্তর হলো না। নিত্যকার সে হাসি-মাখা মুখে আমাদের বসার জন্য আহবান জানালেন। আমরা তাকে জানালাম যে আমরা তার কাছ থেকে কিছু জানতে চাই। তিনি এ প্রস্তাবে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব না করেই উৎসাহের সাথে আমাদের সহযোগিতা দিতে রাজি হলেন। তারপর আমরা আলোচনা পর্বে উপনীত হলাম।

প্রশ্ন: পাদ্রীশিবপুরের লোক হিসেবে আপনি কি মনে করেন যে ঢাকাতে কোন ওয়ারলেস এসোসিয়েশন দরকার?

উত্তর: এটা অবশ্যই দরকার। একান্তই দরকার। আমি বলব নিশ্চয়ই এর বড় রকমের প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ আমাদের গ্রাম পাদ্রীশিবপুর ওখানে যারা বাস করে তাদের শিক্ষিতদের সংখ্যা অল্প এবং অপরিণত বয়স্ক ছেলেমেয়ে। বেশিরভাগ শিক্ষিত লোকই শহরে, বিশেষ করে ঢাকা শহরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরিতে নিয়োজিত। গ্রামের উন্নতির জন্য তাদের সহযোগিতা করা একান্ত দরকার। কারণ, যদি সরকারি পর্যায়ে কোন পদক্ষেপ নেয়া আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায় তবে এখান থেকেই নেয়া সুবিধাজনক ও সম্ভবপর। নিজেদের উন্নয়ন ও গ্রামোন্নয়নের জন্য একটা একান্তই স্বীকার্য্য যে, ঢাকাতে এরকম এসোসিয়েশন দরকার।

[১৬] শ্রীমন্ত তটে – ১৯৮০ খ্রি.

প্রশ্ন: আপনি এ এসোসিয়েশনের সাথে কতদিন থেকে জড়িত?

উত্তর: দিন ও তারিখ আমার ঠিক মনে নেই, তবে এ অ্যাসোসিয়েশনের জন্মলয় থেকেই প্রথমে সাধারণ সদস্য এবং পরে কার্যকরি পরিষদের সভাপতি হিসেবে কিছুদিন ছিলাম।

প্রশ্ন: এ এসোসিয়েশন কোথায় ও কখন প্রথম আরম্ভ হয়?

উত্তর: এ এসোসিয়েশন অবিভক্ত ভারতের কলিকাতা শহরে আনুমান ১৯৪৫ সালে প্রথম আরম্ভ হয়।

প্রশ্ন: তখন এর উদ্দেশ্য কি ছিল?

উত্তর: তখন ওখানে যারা প্রবাস জীবন যাপন করতো তাদের মধ্যে যোগাযোগ এবং নিজেদের সমস্যার সমাধান করা হতো। তাছাড়া পাদ্রীশিবপুর এর কিছু উন্নতি করা যায় কিনা তাও চিন্তাভাবনা করা হতো।

প্রশ্ন: এ এসোসিয়েশনের পূর্বে অন্যকোন নাম ছিল কি?

উত্তর: হ্যাঁ পূর্বে ওয়েলফেয়ার শব্দ ব্যবহার করা হতো না তখন মাত্র পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান এসোসিয়েশন ঢাকা এ নামে ছিল।

প্রশ্ন: ওয়েলফেয়ার শব্দ কখন ও কেন যুক্ত হয়?

উত্তর: ১৯৭৩ সনে যখন আমরা ব্যাংকে হিসাব খুলি তখন তারা আমাদের এসোসিয়েশনের নিয়মাবলী সম্বন্ধে জানতে চাইলে আমরা কল্যাণ বা ওয়েলফেয়ার শব্দটি যুক্ত করে নিয়মাবলী পেশ করি।

প্রশ্ন: চট্টগ্রাম এসোসিয়েশনের সাথে যোগাযোগ করেও কোনো জবাব পাই না কেন?

উত্তর: তার দুটো কারণ থাকতে পারে প্রথমত হইতো তারা চিঠি পায় না। দ্বিতীয়ত উত্তর দিতে চেষ্টা বা প্রয়োজন অনুভব করে না।

প্রশ্ন: ঢাকার বর্তমান এসোসিয়েশনের উপর আপনার মন্তব্য আমাদের অনুগ্রহ করে জানাবেন কি?

উত্তর: বর্তমান পর্যায়ে যে কাজ হচ্ছে তা সন্তোষজনক ও উন্নয়নমুখী এবং আরো বেশি উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে হবে। কিছুটা ত্যাগস্বীকারও করতে হবে।

এরপর আমরা তাকে আমাদের এসোসিয়েশনের বড়দিনের পরিকল্পনা কথা জানাই। তিনি শুনে সত্যই খুব আনন্দিত হন। পরে আমরা ধন্যবাদ জানালাম বিনিময়ের ধন্যবাদ পেলাম। যখন রাস্তায় এলাম তখন অনেক রাত।

আগষ্টিন গোমেজ : "জন্মলোক নিয়ে যিনি ছিলেন, আজও তিনি আছেন" [১৭]

সাক্ষাৎকার গ্রহণে: খ্রীস্টফার ডিঃ কস্তা এবং যোসেফ ডিঃ রোজারিও

রবিবার। আজ ছুটির দিন। সুযোগ বুঝে আবার উপস্থিত হলাম আমাদেরই একজন অভিজ্ঞ সদস্য মিঃ আগষ্টিন গমেজের কাছে। সারারাত নৈশ ডিউটি করে আলস্যে দেহখানি চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা তাকে জানালাম আমাদের মানস অভিপ্রায়, তিনি একজন অক্লান্ত সেবা কর্মী যিনি প্রথম থেকে আমাদের সাথে ছিলেন আর আজও আছেন ;আমাদের সহযোগিতা ধানে তিনি প্রফুল্ল চিত্তে রাজি হলেন। আমরা আলোচনা পূর্বে উপনীত হলাম।

প্রশ্ন: ঢাকাতে কখন প্রথম এ এসোসিয়েশন শুরু হয়?

উত্তর: ১৯৫৯ ঢাকার পশ্চিম তেস্তরী বাজারে বসে প্রথম এ এসোসিয়েশন আরম্ভ হয়েছে।

প্রশ্ন: তখনকার কমিটিতে কে কে এবং কোন কোন পদে ছিলেন?

তখনকার কার্যকরী পরিষদে মিঃ ক্লেমেন্ট গমেজ প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মিঃ লুকাস ডিঃ রোজারিও সভাপতি হিসেবে এবং আমি সহ-সভাপতি হিসেবে মিঃ মিলিগেন ডিঃ রোজারিও সাধারণ সম্পাদক ও মিঃ পৌল গমেজ সদস্য হিসেবে ছিলেন।

প্রশ্ন: তখনকার উদ্দেশ্য কি ছিল?

উত্তর: যতটা সম্ভব গ্রামের লোকদের সাহায্য করা ও গ্রামের মিশনকে গাইড করা।

প্রশ্ন: তখন এ এসোসিয়েশনের সাথে চট্টগ্রামের কোন যোগাযোগ ছিল কি?

উত্তর: না । কারণ চট্টগ্রামে তখন কোন শাখা ছিল না।

প্রশ্ন: তখনকার চাঁদা ও ভর্তি হার কি ছিল?

উত্তর: তখন ৫০ পয়সা চাঁদা ও ভর্তি বাবদ ১.০০ টাকা দিতে হতো।

প্রশ্ন: যুবকরা কি কোন উন্নতি করতে পারে?

উত্তর: পারে ইচ্ছা থাকা চাই এবং ইচ্ছাটাও নিঃস্বার্থ হতে হবে।

প্রশ্ন: আচ্ছা প্রাথমিক পর্যায়ে ঢাকাতে শিক্ষার ব্যাপারে কোন সহযোগিতা দান করা হতো কি?

উত্তর: এ ব্যাপারে কিছু করা যায়নি, যেহেতু মানুষ ও টাকা উভয়ই কম ছিল।

প্রশ্ন: কলকাতা এসোসিয়েশনের সাথে কোন যোগসূত্র ছিল কি?

উত্তর: না ।

প্রশ্ন: ঢাকাতে আমরা কি সমবায় সমিতি করতে পারি?

উত্তর: যদি করা যায় তো ভালো। তবে নিঃস্বার্থ ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন এসোসিয়েশন ধ্বংস হয়ে যায় ।তাছাড়া এটা অবশ্যই রেজিষ্টার্ড হতে হবে এবং উপযুক্ত লোক বেতন দিয়ে রাখতে হবে।

---

[১৭] শ্রীমন্ত তটে – ১৯৮০ খ্রি.

প্রশ্ন: পাদ্রীশিবপুরে ইদানিং যে মহিলা সমিতির উন্মেষ ঘটেছে এটা সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

উত্তর: এটা খুবই ভালো এবং এর দ্বারা সমাজের উপকার হয়।

প্রশ্ন: বেকার সমস্যার ব্যাপারে আমাদের করণীয় কি?

উত্তর: বর্তমানে আমাদের সংগতি নেই। এর জন্য দরকার শিল্প।

প্রশ্ন: আমাদের গ্রামের অবৈধ বিবাহ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তর: আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। জনগণের ধর্মের প্রতি অনীহা ও অন্ধবিশ্বাস। আমাদের মানসিকতা খ্রিস্টান হিসেবে গড়ে ওঠেনি। আমরা অনুকরণ প্রিয়। এ যদি সমাধান করতে হয় প্রথমেই সামাজিক প্রথার পরিবর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন: ঢাকা-চট্টগ্রাম ও খুলনা এর তিন স্থানের এসোসিয়েশন একত্র হয়ে যদি একটি কেন্দ্রীয় কিছু করা যায় সমাজের উপকার হবে কি?

উত্তর: যদি যোগাযোগ ঠিক থাকে তবেই সম্ভব।

প্রশ্ন: এই কেন্দ্রীয় করণ করতে যেয়ে সংকলন কি কিছু করতে পারবে?

উত্তর: তাদের মানসিকতায় রেখাপাত করবে ও চেতনা দান করবে।

প্রশ্ন: পারিবারিক সমঝোতার অভাব কি মাত্র অর্থনৈতিক কারণেই?

উত্তর: হ্যাঁ। প্রধানত অর্থনৈতিক। কারণ আয় নিত্যান্তই কম অথচ ব্যায় প্রচুর। আই অনুপাতে দ্রব্যমূল্য অধিক। তাছাড়া বেতনের হারনদ্রব্যমূল্যের হারেসবৃদ্ধি পায়নি।

প্রশ্ন: ঢাকার এসোসিয়েশন সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

উত্তর: এটা ভালোই চলছে। যদিও দৈহিক সহযোগিতা দিতে পারি না তবুও আমার মন ঠিকই এসোসিয়েশনের উন্নতি ও প্রগতি চায় ।

পরে কিছুক্ষণ ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনা করলাম। তাকে ধন্যবাদ জানালাম। তিনি উত্তর করলেন। যখন ঘর ছাড়লাম তখন দুপুর।

লুকাছ ডি'রোজারিও[১৮]

জন্ম: ২৮ শে নভেম্বর ১৯২৩ খ্রি.; মৃত্যু: ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭৮ খ্রি.

– রক ফার্ডিনাণ্ড গোমেজ

পাদ্রীশিবপুর খ্রীষ্টান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন এই প্রথমবারের মতো "শ্রীমন্ত তটে " নামকরণে একটি ক্ষুদ্র সংকলণ করার উদ্যোগ নেয়। নিঃসন্দেহে এসোসিয়েশনের ইতিহাসে এইটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সফল প্রচেষ্টার মাধ্যমেই প্রকাশ পায় এসোসিয়েশন তার দীর্ঘ একুশ বছর ঘাত-প্রতিঘাতময় পথ অতিক্রম করে এখন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই আনন্দময় মুহূর্তে আমার মনে পড়ে একজনের কথা। আমরা কেউ তাকে আংকেল বলে ডাকতাম, কেউ দাদা বলে, কেউবা শখ করে বলতো নানা। পুরো নাম লুকাচ ডি রোজারিও। সুন্দর স্বাস্থ্য, চশমা পরেন, সাদা মিষ্টি হাসির এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। যিনি সর্বদাই ভাবতেন গ্রামের কথা, গ্রামের লোকদের কথা।

১৯৫৯ সন। মাত্র গুটিকয়েক পাদ্রীশিবপুর নিবাসী ঢাকায় চাকরীরত। শহরটি তখন আজকের মত এত বড় ছিল না, ছিল না এত কর্ম-কোলাহলময়। অবসর সময়ে আমরা সকলে যেতাম তার বাসায়। সেখানে দেশের লোকদের সংঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হত, আলাপ হতো নানা বিষয়, কথা উঠত গ্রামের বিষয় নিয়ে, গ্রামের লোকদের বিষয় নিয়ে। সময়টা বেশ ভালই কাটত। আমরা ভাবতে শুরু করলাম কি ভাবে গ্রামের জন্য কিছু কাজ করা যায়, গ্রামের অসহায় লোকদের কিছুটা উপকার করা যায়। এইভাবে একদিন আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি যে একটা এসোসিয়েশন গঠন করব। উদ্দেশ্য গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন। যে কথা সেই কাজ। কিছুদিনের মধ্যেই আমরা এসোসিয়েশন গঠনের সমস্ত আনুসাঙ্গিক কাজ সম্পন্ন করি আর এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচন করা হলো আমাদের পরম প্রিয় স্বর্গীয় লুকাচ আঙ্কেলকে। ২৮ শে নভেম্বর ১৯২৩ সনে আড়াইবাকী গ্রামে তার জন্ম। পিতা নিকোলাস ডি রোজারিও কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন তিনি। ১৯৪৪ সালে পাদ্রীশিবপুর সাধু আলফ্রেড উচ্চ বিদ্যালয় হতে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় যান চাকুরীর উদ্দেশ্যে। সেখানে তিনি কিছুদিন তৎকালীন ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীতে কাজ করেন। পরে ইন্ডিয়ান পোস্ট এন্ড টেলিগ্রাম সার্ভিসের চাকরি নেন। কলকাতায় থাকাকালীন সময়ে সেখানকার পাদ্রীশিবপুর এসোসিয়েশনের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। দেশ বিভাগের পরে তিনি ঢাকায় চলে আসেন। আজকের এসোসিয়েশনের তিনি ছিলেন তখন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

কিন্তু তিনি আমাদের মাঝে নেই। দীর্ঘদিন রোগশয্যায় থাকার পর ১৯৭৮ সনের ৮ই ডিসেম্বর লুকাচ আঙ্কেল সকলের কাছ থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে যান পরপারে। কিন্তু রেখে গেলেন তার মিষ্টি হাসি, সুন্দর অবয়ব, তার আদর্শ। তাই এসোসিয়েশনের সকল কাজে আজও যেন আমরা তাহার উপস্থিতি অনুভব করি। আসুন, এই মহান দিনে তাকে আমরা স্মরণ করি। পরম করুনাময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তার আত্মার শান্তির জন্য।

---

[১৮] শ্রীমন্ত তটে – ১৯৮০ খ্রি.

আরনল্ড সি. গোমেজ

জন্ম: ২০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ খ্রি.: মৃত্যু: ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০১৩ খ্রি.

- জেভিয়ার গোমেজ এবং যোসেফ ডি'রোজারিও

একজন সমাজ দরদী নেতা আরনল্ড অরুন গোমেজ: পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লী সত্যই একটি মানব গঠনের চারণক্ষেত্র। এখান থেকেই অনেক বড় বড় নেতৃত্ব বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। তাদেরই একজন প্রয়াত আরনল্ড অরুন গোমেজ। তিনি পশ্চিম পাদ্রীশিবপুর বেনেডিক্ট গোমেজ দোকানদার বাড়ির পিটার পল গোমেজ ও আলেকজান্দ্রা গোমেজের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। জীবনের একটি বড় সময় তিনি চট্টগ্রামে অতিবাহিত করেছেন। শৈশবে তিনি সেন্ট প্লাসিড স্কুলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি কানাডায় উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন। পাকিস্তান আমলে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ এর কাজ করেন। তিনি পরবর্তীতে কেয়ার বাংলাদেশে উচ্চপদে চাকুরী করেন। এবং সবশেষে তিনি এনাম এন্টারপ্রাইজে চাকুরী করে অবসর গ্রহণ করেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে তিনি চাকুরীরত অবস্থায় পাদ্রীশিবপুর, দেশান্তরকাঠি, রাজাবাড়িয়া ও মাটিভাঙ্গার অনেক যুবকদের চাকুরী দিয়েছেন। যাদের অনেকেই এখন প্রতিষ্ঠিত।

আরনল্ড অরুন গোমেজ ছিলেন একজন সমাজ সেবক। তিনি পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান এসোসিয়েশন, ঢাকা এর বোর্ড অব ডিরেক্টর, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্ট ও উপদেষ্টা হিসেবে সেবাদান করেছেন অনেক বছর। তিনিই ঢাকাতে পাদ্রীশিবপুরের যুবকদের নিয়ে একটি ফুটবল টিম গঠন করেছিলেন এবং তার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তিনি যখন পাদ্রীশিবপুর এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখনই ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম শ্রীমন্ত-তটে প্রকাশনা আত্মপ্রকাশ করে যা আজও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। পাদ্রীশিবপুর ও ঢাকা যৌথভাবে যে সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছিল তিনি তার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন।

কেবল নিজের ধর্মপল্লীর সংগঠন নয় তিনি ঢাকা ক্রেডিটের ডিরেক্টর এবং ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবেও বেশ কয়েক বছর সেবাদান করেছেন। তিনি দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তার সদস্য নম্বর ছিলো ২। তিনি এই সোসাইটির একটানা একযুগেরও বেশী সময় উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি হাউজিং সোসাইটির বেশ কয়েকটি নির্বাচনে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কনভেনরের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ঢাকা ওয়াইএমসিএ এবং ন্যাশনাল ওয়াইএমসিএ-এর নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাংলাদেশের বৃহত্তম ধর্মপল্লী তেজগাঁও এর প্যারিশ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন দুই যুগেরও বেশী সময়। তিনি একজন ভালো নেতা ছিলেন। আমাদের পাদ্রীশিবপুর চার্চ বিল্ডিং, রাজাবাড়িয়া চার্চ বিল্ডিং এবং মাটিভাঙ্গা চার্চ বিল্ডিং এর নির্মাণের জন্যে ফান্ড রেইজিং কমিটির অন্যতম নেতা ছিলেন এবং যে টিম কাজ করেছে তাদের সাথে তিনি একাত্ম হয়ে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। তিনি ছিলেন আলাপী ও সদাহাস্যময় একজন ব্যক্তি। মানুষকে তিনি সহজেই আপন করে নিতে পারতেন। গরিব দুঃখীদের তিনি সর্বদা যথাসাধ্য সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করেছেন উদার হস্তে। আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও তিনি ছিলেন একজন আদর্শ ব্যক্তি। প্রতি রবিবারে তিনি ধর্মীয় উপাসনায় যোগদান করতেন এমনকি একাধিক খ্রীষ্টযাগেও তাঁকে যোগদান করতে দেখেছি। পাদ্রীশিবপুরে যখন বেড়িবাধের জন্য মিশন এলাকা ক্ষতিগ্রস্থ হবার উপক্রম হয় তখন

তিনি জোরালো ভূমিকা রাখেন এবং দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে প্রকল্পটি স্থগিত করে মিশনের বড় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করেন। এসময় প্রফেসর গাব্রিয়েল মানিক গোমেজ, পিটার গোমেজ, আব্রাহাম গোমেজসহ আমরা কিছু লোক এই প্রতিবাদ কাজটি করেছিলাম। তিনি পারিবারিক জীবনেও ছিলেন সুখী মানুষ। তিনি তিন কন্যা ও এক পুত্রের জনক ছিলেন। দুই কন্যা ও এক পুত্র বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে এবং অপর কন্যা ঢাকাতেই চাকুরীরত আছে। তার সমাজ কর্মের মাঝেই তিনি বেঁচে থাকবেন।

গাব্রিয়েল মানিক গোমেজ, মাটিভাঙ্গা

জন্ম: ১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২ খ্রি. মৃত্যু: ২৩ শে জুন ২০১৭ খ্রি.

– সহধর্মিনী শান্তি গোমেজ

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক গাব্রিয়েল মানিক গোমেজ পটুয়াখালী জেলার মাটিভাঙ্গা গ্রামে ১৯৪২ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিঃ স্যামুয়েল গোমেজ ও মিসেস ফিলোমিনা গোমেজ এর পঞ্চম সন্তান।

তিনি বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ থানার পাদ্রীশিবপুর গ্রামের সেন্ট আলফ্রেড স্কুল থেকে এস এস সি পাস করেন ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে। পরবর্তীতে ঢাকার বিখ্যাত নটের ডেম কলেজ থেকে এইচ এইচ সি পাস করেছেন। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭১ ও ১৯৭২ সালে তিনি ঢাকার অন্যতম হলি ক্রস কলেজে প্রভাষক হিসেবে কর্তব্যরত ছিলেন। এরপর তিনি দীর্ঘ ৩৪ বছর নটের ডেম কলেজে বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে অধ্যাপনা করে ২০০৬ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

শিক্ষকতা করার পাশাপাশি তিনি দেশবরেণ্য একজন জনপ্রিয় নেতাও ছিলেন। খ্রিষ্টান সমাজের এমন কোনো সংগঠন নেই যেখানে তাঁর বিচরণ ছিলনা। তিনি খ্রিস্টান সমাজের সকল প্রধান সংগঠনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সমাজ সেবক হিসেবে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ছিল। তিনি জাতীয় পর্যায়েও নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। এক সময়ে তিনি আওয়ামী লীগের কোষাধক্ষ্য ছিলেন। চিরজীবন তিনি আওয়ামী লীগ এর সাথে যুক্ত থেকে খ্রিস্টান সমাজের পক্ষে কাজ করে গেছেন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের প্রাক্কালে রেসকোর্স ময়দানে সু-উচ্চ মঞ্চে তিনি পবিত্র বাইবেল পাঠ করেছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত মহান স্বাধীনতার পূর্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের পটুয়াখালী জেলায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনা সহ অন্যান্য জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্ক ছিল।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ই এপ্রিল তিনি দি মেট্রোপলিটন খ্রিস্টান কো অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটির লিমিটেডের প্রতিষ্ঠা লগ্নে অন্যতম ২৭ জন সদস্যদের একজন ছিলেন। সোসাইটির প্রথম পর্যায়ের বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণে তিনি প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেছেন। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একাধারে ৯ বছর তিনি সোসাইটির উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য হিসেবে ব্যবস্থাপনা

কমিটিকে সহায়তা দান করেছেন। তিনি বাংলাদেশ খ্রিষ্টান এসোসিয়েশন এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি দি খ্রিস্টান কো অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড এ ঢাকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ছিলেন। আবার, ঢাকার ওয়াই এম সি-তেও প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এছাড়াও, তিনি পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান ওয়েলফার এসোসিয়েশন এ প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কো চেয়ারম্যান ছিলেন। খ্রিস্টমণ্ডলীর বিভিন্ন কাজে তিনি সর্বদা সহায়তা দান করেছেন। দি মেট্রোপলিটন খ্রিস্টান কো অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটির লিমিটেড থেকে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ২৮ সেপ্টেম্বর সোসাইটির ২৭ জন প্রতিষ্ঠাতার সাথে তাঁকেও অরুনোদয়ের সেবক হিসেবে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অধ্যাপক গাব্রিয়েল মানিক গোমেজ ২০১৭ সালের ২৩ জুন মৃত্যুবরণ করেন এবং ২৮ জুন ঢাকার জপমালা রানীর গির্জায় তাঁকে সমাহিত করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৭ সালের ৮ ই সেপ্টেম্বর পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান ওয়েলফার এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত তাঁর শোকসভায় তাঁকে "পাদ্রীশিবপুর রত্ন" উপাধিতে ভুষিত করা হয়। অধ্যাপক গাব্রিয়েল মানিক গোমেজ আজীবন সমাজে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত আলো ছড়িয়ে যাবেন।

ছিন্তিয়া সরকার (সরকার বাড়ী)

জন্ম: ২০/০২/১৯৪৮ খ্রি.; মৃত্যু: ৩১/০১/২০১৪ খ্রি.

- জুলিয়েট লিপিকা সরকার

ছিন্তিয়া সরকার ২০শে ফ্রেব্রুয়ারী ১৯৪৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাদ্রীশিবপুর নিবাসী চার্লস ও কারোলিনা গমেজ এর সর্বকনিষ্ঠ কন্যা ছিলেন। জন্মের ১০ মাসের মধ্যে তিনি তার মাকে হারান এবং তার ছোট বৌদি প্রয়াত কলেট গোমেজ তাকে মাতৃস্নেহে বড় করেন। তিনি সেন্ট আলফ্রেড স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেনী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। তখন পাদ্রীশিবপুর স্কুলে মেয়েদের জন্য ৬ষ্ঠ শ্রেনী পর্যন্তই ছিল।

১৯৬৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী ছিন্তিয়ার সাথে একই গ্রামের প্রয়াত নিকোলাস নগেন্দ্রনাথ সরকার ও বিনোদিনী সরকারের দ্বিতীয় ছেলে আগষ্টিন সুবাস সরকারের সঙ্গে শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। তখন আগষ্টিন সুবাস ঢাকায় কর্মরত ছিলেন। সেই সুবাদে ছিন্তিয়া বিবাহের কিছু দিনের মধ্যে স্বামীর সাথে ঢাকায় চলে আসেন ও সাধনপাড়া, ইন্দিরা রোডে বসবাস শুরু করেন। এর কিছুদিনের মধ্যে আগষ্টিন সুবাস ফার্মগেট এলাকায় নিউ ভ্যেনচার নামে ইলেকট্রনিক্স রিপেয়ারিং সপ স্থাপন করেন। পরবর্তিতে এর নাম হয় পি আর ইলেকট্রনিক্স যেখানে অনেক পাদ্রীশিবপুর নিবাসি যুবককাজ শেখার ও তাদের কর্মজীবন গড়ার সুযোগ পেয়েছেন। ছিন্তিয়া ও আগষ্টিন সুবাস চার সন্তান - দুই কন্যা (ঝর্ণা ও লিপি) এবং দুই পুত্র (পিংকু ও রিংকু) দ্বারা আর্শিবাদিত ছিলেন। তারা অনেক বেশী লেখাপড়ার করার সুযোগ পাননি কিন্তু তারা চেয়েছেন যেন তাদের সন্তানেরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়। ছিন্তিয়া ও সুবাসের দুই মেয়ে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, এক ছেলে কানাডা ও এক ছেলে ঢাকায় বসবাস করছে। তারা সকলেই

তাদের স্ব স্ব পেশায় সম্মানের সাথে কর্মরত আছে।

ছিন্তিয়া তার স্বামী আগষ্টিন সুবাস সরকারের ব্যবসার যাবতীয় কাজে সার্বক্ষণিক তার পাশে ছিলেন। সেইসাথে তার পারিবারিক কাজের পাশাপাশি তিনি তেজগাঁও চার্চের প্যারিশ কমিটি, সেনাসংঘ, মহিলা সমিতি এবং পাদ্রীশিবপুর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হিসাবে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। গ্রাম থেকে আসা পরিচিত/অপরিচিত অনেকেই তাদের সহায়তা পেয়েছে। তিনি পাদ্রীশিবপুর ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। প্রায়শই তার বাসায় অ্যাসোসিয়েশনের সভা হতো। সেইসাথে চাদা সংগ্রহ, অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, ছাত্র/ছাত্রীদের বিভিন্নভাবে সহায়তা দেওয়া তার সার্বক্ষণিক কাজ ছিল। তিনি বিয়ের পরপরই পাদ্রীশিবপুর থেকে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেও তার আত্মায় ছিল পাদ্রীশিবপুর ও সেখানে বসবাসরত তার আত্মীয় পরিজন। তিনি সারা জীবন ঈশ্বরের উপর নির্ভর ও বিশ্বাস নিয়ে জীবনযাপন করেছেন। প্রার্থনা নিয়ে তিনি সকলের পাশে থাকতেন। তিনি ২০০৭ সালে সেলেশিয়ান সিষ্টার সংঘের লে ব্রাঞ্চে যোগ দেন ও মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে কাজ করে গেছেন।

২০১৪ সালের ৩১শে জানুয়ারী মাত্র ৬৫ বছর বয়সে দীর্ঘ রোগভোগের পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাকে তেজগাঁও হলি রোজারি চার্চে কবরস্ত করা হয়। ছিন্তিয়া পরপারে চলে গিয়েও রেখে গেছেন তার প্রার্থনাশীল জীবন, মানুষের পাশে দাড়ানো ও তাদের জন্য কাজ করার দৃষ্টান্ত। পারিবারিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশিও যে সকলকে নিয়ে চলা যায় তাই ছিল তার শিক্ষা।

দশম ভাগ

সমাজ, দেশ ও মণ্ডলীতে পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর অবদান

লেখক: মি যোসেফ ডি'রোজারিও

আলোচ্য বিষয়সূচির সারসংক্ষেপ

॥ ক ॥ পাদ্রীয়ান তালুক-এর অবদান

॥ খ ॥ পাদ্রীশিবপুরের সন্তান বা বংশোদ্ভূত ধর্মীয় সেবক-সেবিকাদের অবদান

॥ গ ॥ পাদ্রীশিবপুরের সেবা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অবদান

ভূমিকা

পরম করুণাময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এজন্যে যে তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন পরম যত্নে এবং আমাদের দিয়েছেন একটি অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ধর্মপল্লী পাদ্রীশিবপুর। এই ধর্মপল্লীর বুকে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই আমাদের জীবনযাপনের প্রায় প্রতিটি দিকই আলো হয়ে সকলের কাছে দীপ্তি ছড়াচ্ছে। পাদ্রীশিবপুর এমন একটি ধর্মপল্লী যেখানের জনগণ স্থানীয় সমাজ গঠনে রেখেছে অনন্য ভূমিকা। সেই সাথে ব্রিটিশ আমল থেকে অবিভক্ত ভারত, পাকিস্তান এবং সবশেষে বাংলাদেশে এই ধর্মপল্লীর সদস্যগণ বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন। আবার ধর্মপল্লী যেমনটি আমাদের উজার করে সেবা দিয়েছেন তেমনি এখানকার খ্রিস্টভক্তগণও মণ্ডলীকে সমৃদ্ধ করেছে তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রভুর কাজে উৎসর্গ করার মাঝে। তাই আমাদের গ্রামে, দেশে ও মণ্ডলীতে এই পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর অবদান সত্যই প্রশংসনীয়। আরও একটু যদি আমরা বিস্তৃতম ক্ষেত্রে যাই তবে দেখতে পাই যে বিশ্বের যেখানেই আমাদের ধর্মপল্লীর লোকজন বসবাস করছেন সেখানেই তারা তাদের নিজস্ব একটি অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। তাই আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও আমাদের এই ধর্মপল্লীর কিছুটা অবদান রয়েছে। পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টান সমাজের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে আজ থেকে প্রায় শতবছর আগে আমাদের এই এলাকার কোন ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টার ছিলেন না।

॥ ক ॥ পাদ্রীয়ান তালুক-এর অবদান

উমেদপুর বাকেরগঞ্জের একটি পুরাতন পরগানা। আগা বাকের খাঁ এর আমলের অনেক আগেই বুজুর্গ উমেদপুর একটি উল্লেখযোগ্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত পরগনা হিসেবে পরিচিত ছিল। এই পরগনার সাথে পাদ্রীশিবপুরের একটি সম্পর্ক রয়েছে। বুজুর্গ উমেদপুরের উৎপত্তি হয়েছে খান নামক ব্যক্তির থেকে। বুজুর্গ উমেদ খান ছিলেন বাংলার নবাব শায়েস্তা খানের পুত্র। শায়েস্তা খাঁন রাজত্ব করেছেন সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে। আগা বাকের খাঁ-এর মৃত্যুর পর আলীবর্দী খানের ভাই পো এবং জামাতা শাহামত জং বুজুর্গ উমেদপুর পরগনার মালিক হন। রাজা বল্লভসেন বুজুর্গ উমেদপুরের নায়েব রূপে দায়িত্ব পালন করেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে মি. হেনরী লজ নামক এক ব্যক্তি এক সময় বুজুর্গ উমেদপুরের কালেক্টরের দায়িত্ব লাভ করেছিলেন। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে রাজা বল্লভ সেনের মৃত্যুর পরে তার প্রপৌত্র নিতাম্বর সেন ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে অত্র এলাকার জমিদারী লাভ করেন। এক সময় এই এলাকা ছোট্ট

পরগনা ছিল। ক্রমে ক্রমান্বয়ে তা বিশাল আকার ধারন করে। এক সময় উমেদপুর ২ টি জমিদারী, ৪৩১ টি তালুক এবং আরও ১১ টি খাস এলাকায় বিস্তৃতি লাভ করে। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে রাজা নিতাম্বরের আমলে পুরো বুজুর্গ উমেদপুর বৃটিশ সরকারে অধীনে চলে যায়।

আমাদের এলাকায় পাদ্রীদের আগমনের পরে কর আদায়, প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের কাজ পূর্ণমাত্রায় চলতে থাকে। সেই সময়কার পাদ্রীগণই প্রথম খ্রিস্টান ধর্মের বীজ বপন করেন, পাদ্রীশিবপুরে বৃহৎ একটি জনপদ গড়ে তুলতে অবদান রাখেন এবং যার ফসল আমরা এখনও ভোগ করছি। সেই সময়ের ফাদারগণ ধর্মপ্রচারের পাশাপাশি গরীবদের আর্থিক সহায়তা দান করতেন। ফলে তাদের ভালাবাসা, দয়া-দান এবং সেবার মানসিকতা স্থানীয় জনগণের হৃদয় স্পর্শ করে এবং তারা সানন্দে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। পাদ্রোয়াদো বলতে বুঝায় পোপ দশম লিও এবং পর্তুগীজ রাজার মধ্যে ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তিকে। এই চুক্তির ফলেই আমাদের এলাকায় মিশনারী প্রেরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। সেই সাথে মিশনারীগণ যেন চার্চ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন এবং প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করতে পারেন সেই বিষয়টিও এই চুক্তির মাধ্যমে নিশ্চিত হয়।

ফাদার ফ্রান্সেসকো ফেরনানডেস প্রথম মিশনারী পুরোহিত যিনি ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম আগমন করেন। বুজুর্গ উমেদপুর পরগনার মধ্যে পাদ্রীশিবপুর তালুকটি গুরুত্বপূর্ণ। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে হুগলী ব্যান্ডেল মিশনের কাছে রাজা বল্লভ সেন কয়েকজন খ্রিস্টান লোক চেয়ে আবেদন করলে চারজন খ্রিস্টানকে এখানে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে তাদের আধ্যাত্মিক যত্ন ও ধর্মীয় চর্চার জন্য পুরোহিত চাওয়া হলে একজন পুরোহিতকে পাঠানো হয়। এই সকল লোকদের ভরণপোষনের জন্যে রাজা বল্লভসেন চার খন্ড জমি বা হাওলা প্রদান করেন। হুগলী থেকে আসা চারজন খ্রিস্টানদের মধ্যে এক পর্যায়ে বিবাদের সৃষ্টি হয়। ফলে চারটি হাওলাকে একত্র করে একটি তালুক প্রতিষ্ঠা করা হয় যার নাম "পাদ্রীয়ান তালুক" বা ''শিবপুর মিশন তালুক''। শিবপুরের পুরোহিতের নামে ৭ই ফাল্গুন ১১৭১ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে এটি পাট্টা করে তালুকটি দেয়া হয়।

সেই থেকেই মিশনারীদের যাত্রা পাদ্রীশিবপুরে শুরু হয় এবং প্রায় দুইশত বছর যাবৎ এই মিশনারীগণ একদিকে যেমন জমিদারী পরিচালনা করেন সেই সাথে খ্রিস্টবাণী প্রচার এবং ব্যাপক প্রসার ঘটাতে সক্ষম হন। আমাদের এলাকায় দীক্ষিত খ্রিস্টানদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এক সময় তাদের উপাসনার জন্যে একটি গৃহের একান্ত প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে শিবপুরে ছোট আকারের একটি গির্জা নির্মিত হয়। এই গির্জাটি নির্মাণ করেন পেদ্রো গনসালভেস। তবে প্রথম থেকেই এই গির্জাটির নাম ''পথ প্রদর্শিকা কুমারী মারীয়ার গীর্জা'' ছিল কিনা সেই ইতিহাস পাওয়া যায়নি।

পালক পুরোহিত হিসেবে এই ধর্মপল্লীতে যিনি প্রথম নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি ছিলেন আগষ্টিনিয়ান ফাদার রাফায়েল আঞ্জোস। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ১৮৩৬ পর্যন্ত এই মিশনারীগণ দায়িত্বে ছিলেন। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে পোপ মহোদয় ''প্রোপাগান্ডা ফিদে'' এর অধীনে ''বেঙ্গল অ্যাপস্টলিক ভিকারিয়েট'' প্রতিষ্ঠা করেন।

এ পরে ধারাবাহিকবাবেই মিশনারীগণ পাদ্রীশিবপুরে তাঁদের সেবাদান করেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই আমাদের ধর্মপল্লীতে এক হাজার খ্রিস্টভক্ত বসবাস করতেন। এরই মধ্যে এখানে সেন্ট আন্তনী প্রাইমারী স্কুল এবং মেয়েদের জন্য সেন্ট যোসেফস্ প্রাইমারী স্কুল চালু হয়। সাথে সাথে রবিবাসরীয় স্কুলও চালু ছিলো। দেখা যায় পরবর্তীতে ডি'সিলভা পরিবার আমাদের পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টানদের সহায়তার জন্যে অনেক অবদান রাখেন । সেই সাথে নবু নাহেব, ডেভিড সাহেব, জাকু সাহেবসহ অনেকেই আমাদের ধর্মপল্লিতে অবদান রেখেছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে ম্যানুয়েল ডি'সিলভা ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় গির্জা নির্মাণ করেন। এভাবেই বৃটিশ শাসনামলে পাদ্রীশিবপুরে যেমন পাদ্রীদের অবদান ছিল তেমনি ছিলো আমাদের স্থানীয় প্রভাবশালীদের সহযোগিতা।

একটি সমাজে অনেক লোক বসবাস করে। পাদ্রীশিবপুরও তার ব্যতিক্রম নয়। এখানে ব্রিটিশ শাসন আমলের পূর্ব থেকে বিদেশী মিশনারীদের বিচরণ ছিল উল্লেখযোগ্য। তারা প্রথম দিকে আগষ্টিনিয়ান সংঘের মিশনারি ছিলেন। তারা কেউ ছিলেন পর্তুগীজ, কেউ স্প্যানিশ, কেউ ভারতের গোয়া বা দক্ষিণ ভারত থেকে আগত সন্ন্যাসসংঘের এবং ধর্মপ্রদেশীয় যাজক মিশনারী। তাদের উপস্থিতি ছিল ধর্মপল্লীর গোড়াপত্তন থেকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

পাদ্রোয়াদো ব্যবস্থাপনার সমাপ্তিতে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে পবিত্র ক্রুশ সংঘের বিশপ, ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের পাদ্রীশিবপুরে আগমন হয় যারা অধিকাংশই ছিলেন কানাডার হলিক্রশ সম্প্রদায়ের ফাদার। তারা সবাই আমাদের প্যারিশে সেবাদান করেছেন এবং সাথে ছিলেন চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের কয়েকজন ধর্মপ্রদেশীয় বাঙালি যাজক, ব্রাদার এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ যার মধ্যে আছেন, মণ্ডলীর ক্ষুদ্র সেবিকা সংঘের বাঙালি সিস্টারগণ এবং সর্বশেষে ভারত থেকে আসা লরেটো সংঘের সিস্টারগণ। তারা আমাদের ধর্মপল্লীতে সেবাদান করেছেন এবং মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গঠনে তারা বিশেষ অবদান রেখেছেন।

প্রথমতঃ পাদ্রীশিবপুরে আগস্টিনিয়ান ফাদারদের আগমনের পরে মিশনারিরা পাদ্রীয়ান তালুকের দায়িত্ব লাভ করেন। সেই সুবাদে তাদেরকে জমিদারের ভূমিকায় থাকতে হয়েছে এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিকট শুল্ক ও কর দেওয়াসহ দেওয়ানী দায়িত্ব পালন করতে হয়। তারা স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকে কর আদায়ের দায়িত্ব পালন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় এক সময় স্থানীয় জনগণ তাদের সাথে সংযুক্ত হয়। প্রথমত: ধর্মীয় কারণে তাদের সাথে মিলনের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। সাথে সাথে স্থানীয়দের মধ্যে কেহ কেহ তাদের আনুকুল্যে প্রশাসনিক দায়িত্বও লাভ করেন। অর্থাৎ আমরা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের যে জমিদারীর কথা, নায়েবগিরির কথা বা মোক্তারি কথা শুনতে পাই এই সকল কাজে স্থানীয় জনগণ সম্পৃক্ত ছিলেন। অন্যভাবে বলা যায় যে অনেক আগ থেকেই প্রশাসনিক কাজে আমাদের ধর্মপল্লীর সদস্যগণ স্থানীয়ভাবে অবদান রেখেছেন। এর পর থেকে ধর্মপল্লীর প্রতিটি কাজেই স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ছিল ব্যাপক। আমাদের চার্চ বিল্ডিং যখন ২য় বার নতুন করে তৈরি হয় তখন ধর্মপল্লীর ফাদারদের সাথে খ্রিস্টান তৎকালীন জমিদারগণ কাজ করেছেন, সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

এ কথ্য অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লী চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের সাথে যুক্ত হওয়া পূর্ব পর্যন্ত জমিদারি প্রথায় ধর্মপল্লী পরিচালিত ছিল। অভিজাত কিছু ব্যক্তি যারা ছিলেন জমিদার তারা গির্জা নির্মাণে ও দরিদ্রদের সেবায় আর্থিক সহায়তা দান করেছে। তবে জনগণ তেমন একটা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেনি বা করার সুযোগ ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত (১৯২৭) চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের সাথে যুক্ত হওয়ার পর, প্যারিশের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের ধারা শুরু হয়েছে এবং সেখানে খ্রিস্টানদের অংশগ্রহণ ও সক্রিয়তা বেড়েছে।

॥ খ ॥ পাদ্রীশিবপুরের সন্তান বা বংশোদ্ভূত ধর্মীয় সেবক-সেবিকাদের অবদান

এই গ্রন্থের অষ্টম ভাগে আগষ্টিনিয়ান ফাদারগণসহ ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে যে পবিত্র ক্রুশ সংঘের ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণ এবং ধর্মপ্রদেশীয় যাজকগণ পাদ্রীশিবপুরে কাজ করেছেন তাদেরকে আমরা স্মরণ করেছি। এখন আমরা উল্লেখ করতে চাই তাদেরকে যারা হয় পাদ্রীশিবপুরের সন্তান অথবা পাদ্রীশিবপুর বংশোদ্ভূত ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণ যারা বৃহত্তর সমাজে ও দেশে-বিদেশের মণ্ডলী ধর্মীয় জীবন ও সেবা দ্বারা বিরাট একটা অবদান রেখে যাচ্ছেন। আমরা তাদের জন্য অত্যন্ত গর্বিত।

পাদ্রীশিবপুর-নিবাসী ফাদারগণ: প্রয়াত ফাদার লিও গোমেজ, প্রয়াত ফাদার বাট্রাম নেলসন, সিএসসি, প্রয়াত ফাদার ফিলিপ ডি'রোজারিও, কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি, ফাদার লাজারুস গোমেজ, সিএসসি (যাজকীয় জীবন ত্যাগ করেছেন), ফাদার যেসেফ জীবন গোমেজ, ফাদার লরেন্স বরুন গোমেজ, ফাদার লাজারুস কানু গোমেজ, ফাদার জেরম রিঙ্কু গোমেজ, ফাদার লরেন্স লেকাভেলিয়ের গোমেজ, ফাদার লিটন গোমেজ, ফাদার ক্লেমেন্ট রিগ্যান ডি'কস্তা, ফাদার জার্মেন সঞ্জয় গোমেজ এবং ফাদার রুবেন ম্যানুয়েল গোমেজ, সিএসসি – এরা সবাই পাদ্রীশিবপুর গ্রামের স্থানীয় ফাদার।

ভারতে (পশ্চিমবঙ্গ) কর্মরত যাজকগণ: পাদ্রীশিবপুরের সন্তান পশ্চিমবঙ্গে অবস্থানরত যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী যাজক যারা আছেন তারা হলেন: ফাদার দীপক গোমেজ, এসজে, ফাদার তপন গোমেজ, এসজে, ফাদার অনিল গোমেজ, এসজে, ফাদার মলয় ডি'কস্তা, এসজে, ফাদার তুষার গোমেজ, এসডিবি।

ভারতে (পশ্চিমবঙ্গ) অবস্থানরত সিস্টারগণ: সিস্টার বেনেডিক্টা স্বপ্না গোমেজ, আইবিভিএম, (লরেটো) এবং সিস্টার ইভন আগ্নেস গোমেজ,আইবিভিএম, (লরেটো)।

বাংলাদেশে অন্য ধর্মপ্রদেশে কর্মরত যাজকগণ: ফাদার টেরেন্স রড্রিক্স, ফাদার ম্যাক্সওয়েল টমাস, ফাদার রিপন আন্তনী ডি'রোজারিও, ফাদার ডেভিড রকি গোমেজ, ফাদার জুয়েল ম্যাকফিল্ড।

মাদ্রাজে পাদ্রীশিবপুর সিস্টারগণ: মাদ্রাজে যারা সিস্টার হয়েছেন তারা আমাদের জানামতে হয়তো প্রায় সবাই প্রয়াত হয়েছেন। তারা ছিলেন: মাদার বর্জিয়ানা ডিঃ রোজারিও (বার্নার্ড স্যারের বোন), সিস্টার অ্যানেট গোমেজ (রামুয়েল গোমেজের বোন), সিস্টার মেরী স্টেলা কৈলু (এন্টনী কৈলুর মেয়ে) এবং সিস্টার ক্লারা আরাতোনিয়া গোমেজ (ফাদার লাজারুস কানুর পিসি)।

বাংলাদেশে কর্মরত পাদ্রীশিবপুরের সিস্টার ও ব্রাদারগণ: সিস্টার মেরী লিলিয়ান গোমেজ, এসএমআরএ, সিস্টার অনু ক্লারিস গোমেজ, এলএইচসি, সিস্টার আরতী ডি'কস্তা, এলএইচসি, সিস্টার জসিন্তা বেবী ডি'রোজারিও, এলএইচসি, সিস্টার মারলিন মুন্না গোমেজ, এলএইচসি, সিস্টার মেরী এলইসিয়াস, এমসি, সিস্টার মার্লিন নোরা গোমেজ, এমসি, সিস্টার জেনিফা হেলেন গোমেজ, এমসি, সিস্টার রানী শ্রুতি ভিক্টোরিয়া ডি'কস্তা, এমসি, মাদার রিচেল গোমেজ, আরএনডিএম, সিস্টার শিউলী রোজারিও, আরএনডিএম, সিস্টার বেবী ট্রিজা, আর এনডিএম, সিস্টার জ্যাকলিন গোমেজ, এসসি, সিস্টার কর্নেলিউস শ্যামলী গোমেজ, এসসি, সিস্টার ফিলোমিনা শিউলী গোমেজ, এসসি, সিস্টার প্রমিলা গোমেজ, সিএসসি, সিস্টার ক্যাথরিন কণিকা সরকার, সিএসসি, সিস্টার রুমা গোমেজ, ব্রাদার লিনুস ডি'রোজারিও, সিএসসি, ব্রাদার প্রিন্স ম্যাকফিল্ড, সিএসসি এবং ব্রাদার জেমস গোমেজ, কেবিজে।

সিস্টারগণ যখন তাদের কাজ নিয়ে এগিয়ে গেছেন তখন আমাদের সমাজের নারীরাও তাদের সহযোগিতা করেছেন সেই প্রথম থেকেই। ফলে তাদের কাজ সহজ হয়েছে। ধর্মপল্লীর সেবায় আমাদের জনগণ সর্বদাই এগিয়ে এসেছেন। যখন সেই পুরাতন কালে সমবায় সমিতি গঠন করা হয় তখন নারী-পুরুষ সবাই একাজে অংশগ্রহণ করে এবং সকলের সাথে একত্রে যে জেগে ওঠা যায় তা ধর্মপল্লীবাসীকে বুঝাতে সক্ষম হয়। এভাবে ধীরে ধীরে আমাদের সমাজের লোকজন মিশনের প্রতিটি কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তবে একথা আমাদের বিনীতভাবে স্বীকার করতেই হয় যে, কানাডার ফাদারগণ ও হলিক্রশ সিস্টারগণ আমাদের গ্রামের জন্যে আর্শীবাদ হয়ে এসেছিলেন। যার জন্যে স্থানীয় জনগণের এই সমাজে অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এজন্যে মিশনারীদের হাতে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করেছে। প্রথমতঃ গঠন প্রশিক্ষণে এবং পরবর্তীতে তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে।

স্থানীয় যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী যাজক-ব্রাদার-সিস্টারদের অবদান: এই পুস্তকে আমাদের ধর্মপল্লীর যাজক, ব্রাদার ও সিস্টারদের পরিচিতি ইতোমধ্যেই তুলে ধরা হয়েছে। তাই নতুন করে তা আবার তুলে ধরার আবশ্যকতা নেই। কিন্তু তাদের অবদানের কথা আমাদের শ্রদ্ধার সাথেই স্মরণ করতে হয়। প্রথমেই যাঁর নাম উচ্চারণ করতে হয় তিনি শ্রদ্ধেয় ফাদার লিও গোমেজ। আমাদের ধর্মপল্লী থেকে প্রথম অভিষিক্ত যাজক। তিনি আমাদের ধর্মপল্লীতে অবস্থান না করলেও তাঁর অবদানের অপরিসীম ক্ষেত্র রয়েছে। তিনি যখন আমেরিকায় ছিলেন তখন তিনি বিশেষভাবে মনোযোগী হন স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা। তিনি তাঁর জীবনকালে আত্মীয়-স্বজনদের যথাসাধ্য সহযোগিতা করতে চেষ্টা করেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ-পরিসম্পদ ফাদার লিও ট্রাস্ট নামে একটি তহবিল খুলে তাতে দান করে যান। এই ট্রাস্ট থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গরীবদের সহযোগিতা করার ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। এই ট্রাস্ট এখনও বিদ্যমান। তবে এর কার্যক্ষেত্র বর্তমানে কিছুটা সীমিত রয়েছে।

আমাদের ফাদারগণের মধ্যে ফাদার ফিলিপ ডি'রোজারিও ছিলেন অন্যতম। তিনি বেশ কতক বছর চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনিও তাঁর সাধ্যমত সকলকে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। সেই সাথে ধর্মপ্রদেশের উন্নয়ন ও বিভিন্ন কর্মসূচি সার্থক

করতে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি পাদ্রীশিবপুরে অবস্থান করেন এবং দুঃস্থদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। "প্রতিবন্ধীদের সেবাকেন্দ্র" তারই অবদান। তিনি ফাদার হিসেবে ছিলেন নরম স্বভাবের মানুষ। সকলের সাথেই তিনি হাসি মুখে কথা বলতেন। তিনি কিছু বছর বরিশাল ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিতের দায়িত্বও পালন করেন।

ফাদার যোসেফ জীবন গোমেজ আমাদের আর একজন সন্তান যিনি তাঁর অক্লান্ত সাধনা ও অধ্যাবসায় দিয়ে অনেক কিছু সংগ্রহ করেছেন। তাঁর সংগ্রহে প্রাচীন অনেক কিছুই ছিলো। যা তিনি এক পর্যায়ে জাতীয় যাদুঘরে দান করেছেন। বিশেষভাবে তাঁর অন্যতম অবদান হলো পাদ্রীশিবপুরের বিখ্যাত ''মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিস্টের পালাগান'' সংগ্রহ করা এবং তা প্রকাশ ও প্রচার করা। এই পালাগান আমাদের সকলের কাছে রামুর পালা হিসেবেই পরিচিত। প্রয়াত রামুয়েল গোমেজ এই পালাগাণের প্রধান কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। তাই এই পালাটি রামুর পালা নামে পরিচিত। এই পালাগান ব্যাপকভাবে প্রকাশ ও প্রচারের জন্য ফাদার যোসেফ জীবন গোমেজের অবদান সত্যিই প্রশংসনীয়।

ফাদার লাজারুস কানু গোমেজ পাদ্রীশিবপুরের সন্তান। চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ীদের মধ্যে তার মিশনারী কাজ সবার স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রায় পয়ত্রিশবার ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছেন কিন্তু মিশন দায়িত্ব ছাড়েন নি। বরিশাল ডাইয়োসিসের ভিকার জেনারেল হিসেবে তিনি প্যারিশে এবং ধর্মপ্রদেশীয় প্রশাসনিক কাজে ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন।

এছাড়াও আমাদের অন্যান্য যাজকগণ তাঁদের দায়িত্বপ্রাপ্ত নিজ নিজ ধর্মপল্লীতে সেবাদান করে যাচ্ছেন। আমাদের ভালো লাগে এজন্যে যে আমাদের ধর্মপল্লী থেকে অনেক সন্তান যাজকীয় জীবনে প্রবেশ করেছেন। এই যাজকদের মধ্যে আমাদের উপ-ধর্মপল্লী রাজাবাড়িয়ার যাজকও রয়েছেন। যেখানেই তারা দায়িত্ব পালন করুন না কেন, তাদের পরিচয় তারা পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর সন্তান আর মণ্ডলীতে তাদের সেবাদান আমাদের তৃপ্তি দান করে।

আমাদের সমাজ থেকে বেশ কয়েকজন সিস্টার আমরা পেয়েছি যারা মাণ্ডলিক কাজে প্রতিনিয়তই সহায়তা দান করছেন। এখানে এলএইচসি সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ সেবাদান করে চলেছেন। পাদ্রীশিবপুরে লরেটো সম্প্রদায়ের সিস্টারগণও আছেন। তারা মূলত সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলে সেবাদান করে থাকেন। তাদের মধ্যে সিস্টার ইভন আমাদের গ্রামের সন্তান। যদিও তাদের বর্তমান অবস্থান ভারতের কলকাতার ঠাকুরপুকুরে। তার বিশেষ অবদান হলো তিনি সেন্ট আলফ্রেডস্ স্কুলকে কলেজে উন্নীত করেছেন এবং কলেজের প্রিন্সিপালের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। তার সময়েই সেন্ট আলফ্রেডস্ স্কুল এণ্ড কলেজের ৭৫ তম বার্ষিকী জাঁকজমক সহকারে পালিত হয়।

এলএইচসি সিস্টারদের মধ্যে সিস্টার অনু গোমেজ একজন প্রবীণ সিস্টার। তিনি বর্তমানে বরিশালে অবস্থান করছেন। তিনি আমাদের ধর্মপল্লীতে উপাসনা সঙ্গীত পরিচালনা করতেন এবং স্থানীয় ছেলে-মেয়ে এবং যুবক-যুবতীদের সঙ্গীত প্রশিক্ষণও দিতেন। সিস্টার আরতীর কথা আলাদাভাবে বলতেই হয়। তিনি ফাতেমা হেলথ সেন্টারের পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন অনেক বছর। তিনি একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ নার্স। যদি অন্যভাবে বলি তিনি প্রাথমিক চিকিৎসার জন্যে গ্রামের লোকদের ডাক্তার হিসেবেও সেবা দিয়েছেন। তিনি উৎসাহ দিতেন যেন গ্রামের মেয়েরা নার্স হিসেবে সেবাদান

করেন। আমাদের ধর্মপল্লীতে তার অবদান সত্যই প্রশংসার দাবী রাখে। বর্তমানে বয়সের ভারে কিছুটা ক্লান্ত থাকলেও তিনি মানুষের সেবায় অবিরত কাজ করে যাচ্ছেন। এলএইচসি সংঘের প্রধান হিসেবে ১৬ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সংঘের অস্তিত্ব রক্ষা ও তার উন্নয়নে বিশেষ উপদেষ্টা হিসেবে ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন। এছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়েও আমাদের সমাজের দু'একজন সিস্টার রয়েছেন এবং তারাও মণ্ডলীতে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। এলএইচসি সিস্টারগণ পাদ্রীশিবপুর, বরিশাল, গৌরনদী, চট্টগ্রাম, বান্দরবান, রোয়াংছড়ি, লামা, আলিকদম ও রাজশাহীর চালাপাড়া, ইত্যাদি অঞ্চলে তাদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন এবং এদের মধ্যে আমাদের পাদ্রীশিবপুরের সন্তানগণও রয়েছেন।

ব্রাদার হিসেবে আমাদের গ্রাম থেকে রয়েছেন ব্রাদার লিনুস ডি'রোজারিও, সিএসসি। তিনি দীর্ঘকাল ধরে নারিন্দা টেকনিকালে তার সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি খুব মিতভাষী কিন্তু কাজের বেলাতে অনেক প্রত্যয়ী ও নিষ্ঠাবান। আমাদের গ্রামের বেশ কিছু কিশোর ও যুবক তার অনুপ্রেরণায় নারিন্দা টেকনিক্যাল থেকে প্রশিক্ষিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে কাজ করে যাচ্ছেন। তাই একজন হলেও আমাদের সমাজের জন্য ও মণ্ডলীর জণ্য তার অবদান আমরা কখনোই ভুলবো না।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি: পাদ্রীশিবপুরের জন্য ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠদান পরম পুজ্যপাদ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি। তিনি সেবা দিয়েছেন বাংলাদেশ মণ্ডলীকে। বর্তমানে অবসর জীবনেও তিনি তাঁর সেবার হাত উন্মুক্ত রেখেছেন। প্রথমতঃ যাজক হিসেবে তিনি গৌরনদী, বরিশাল, পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে দায়িত্ব পালন করেছেন কখনো সহকারী পালক পুরোহিত হিসেবে আবার কখনো বা পালক পুরোহিত হিসেবে। বিশেষতঃ গৌরনদীতে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যখন দেশ গঠনের প্রয়োজন হয় তখন তিনি রিলিফ কাজে হাত দেন। তাঁর এই অবদানের ফলে অনেক গৃহহীন গৃহ পেয়েছেন, রাস্তাঘাট, সেতু ইত্যাদি সংস্কার করে যোগাযোগ ব্যবস্থায় যথেষ্ট উন্নতি করেছেন। সেজন্যে ঐএলাকার মানুষ শ্রদ্ধার সাথে তাঁকে স্মরণ করে। তিনি ভজন নৃত্যের প্রচলন করেন। তিনি বনানী মেজর সেমিনারীতে শিক্ষকতা করেন ১৪ বছর ধরে। "কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা" বাংলায় অনুবাদে প্রধান সম্পাদক ছিলেন। এই কাজে ৬ বছর তিনি পরিশ্রম করেছেন।

১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহীকে নতুন ধর্মপ্রদেশ করা হলে তিনি এই ধর্মপ্রদেশের প্রথম বিশপ নিযুক্ত হন। ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের বিশপ মনোনীত হন এবং সবশেষে ২০১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ অক্টোবর পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক কার্ডিনাল হিসেবে মনোনয়ন লাভ করেন এবং ১৯ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে কার্ডিনাল পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি বিশপ সন্মিলনীর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনসহ অনেক কমিশনের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি শিক্ষা জীবন ও বিভিন্ন সভা সেমিনারে অনেকবার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করেন। তিনি একজন সুদক্ষ লেখক। বনানী সেমিনারীতে অধ্যাপনাকালীন তিনি ছিলেন প্রদীপনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। এই পুস্তকেরও অনেকগুলো চ্যাপ্টার তিনি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। তিনি কার্ডিনাল-পরম্পরা এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং উপদেষ্টা। তিনি এত বেশীগুণে গুনান্বীত যে তা প্রকাশ করতে হলে আলাদা একটি পুস্তক রচনা করতে হবে। সবচেয়ে বড়কথা তিনি পাদ্রীশিবপুরের সন্তান এবং বিশ্বের প্রথম বাঙালি কার্ডিনাল। এক জীবনে এমন অনন্য অবদান রাখার ব্যক্তিত্ব আমাদের মণ্ডলীর জন্যে বিরল। তিনি বাংলাদেশের প্রথম অভিষিক্ত যাজক,

নবগঠিত রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের প্রথম বিশপ, ঢাকা ধর্মপ্রদেশের বাহির থেকে পুণ্যপিতা পোপ কর্তৃক মনোনীত দেশীয় প্রথম আর্চবিশপ এবং বাংলাদেশ থেকে মনোনীত প্রথম কার্ডিনাল। তাই তাঁর জীবন সাধনায় রয়েছে বহুবিধ কর্মকাণ্ডের প্রজ্জ্বল ভাণ্ডার। তাঁর জীবনের প্রতিটি পত্রপল্লবে বিদ্যামান বিশাল কর্মযজ্ঞ। তিনি আমাদের ধর্মপল্লীকে একটি অন্যতম উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। আমরা তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

আসলেই আমাদের ধর্মপল্লী গোটা বাংলাদেশ মণ্ডলীতে আলো হয়েই বিরাজ করছে। আমাদের সকলেরই এই বিষয়ে কমবেশী অবদান রয়েছে। আমাদের শিক্ষকগণ মণ্ডলীর বিভিন্নকাজে সর্বদা সহায়তা দান করে থাকেন। উপাসনা পরিষদ, গানের দল এবং বিশেষ করে আমাদের পালকীয় পরিষদ মণ্ডলীর সেবায় যুগ যুগ ধরে কাজ করে যাচ্ছেন। ঈশ্বর এই সকল সেবাদানকারী ভক্তদের অনেক আশীর্বাদ করুন।

॥ গ ॥ পাদ্রীশিবপুরের সেবা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অবদান

সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলঃ সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুল আমাদের এলাকার মানুষের শিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছে। এই যে শিক্ষার সুযোগ করে দেয়া এবং এর জন্যে যে বিশাল আয়োজন তার সাথে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণও ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় প্রয়াত যোসেফ গোমেজ (শ্রদ্ধেয় আলবার্ট স্যারের বাবা) সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলের প্রথম থেকেই অর্থাৎ সৃষ্টি থেকেই এই মহাকর্মযজ্ঞের সাথে সংযুক্ত ছিলেন এবং তাঁর অবদানকে আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। এই স্কুল থেকেই শিক্ষা লাভ করে পরবর্তীতে অনেকেই এই হাই স্কুলেই সেবাদান করেছেন বা শিক্ষকতা করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন সিলভেস্টার গোমেজ, ভেনানসিও ডি'কস্তা, পিটার পল গোমেজ, ফ্রান্সিস গোমেজ, ক্লেমেন্ট গোমেজ, রেমণ্ড মধু, স্টিফেন গোমেজ, লরেন্স গোমেজ, জিতা গোমেজ, ইয়াং গোমেজ, সুশীল সরকার, রেনু গোমেজ, জুষ্টিনা গোমেজ, আলবার্ট গোমেজসহ আরও অনেকেই। এর পরে যুগ যুগ ধরে আমাদের খ্রিস্টান সমাজের অনেক পুরুষ ও নারী সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন বা এখনও করে যাচ্ছেন। এমনকি সিস্টার ইভন যিনি কলকাতার লরেটো সম্প্রদায়ের সিস্টার এবং পাদ্রীশিবপুরের মেয়ে তিনি সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুল এণ্ড কলেজের প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে আজিধর বাবু গোমেজ ভাইস-প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করছেন। এই যে সেবাদান এতো আমাদের সমাজের জন্যে একটি বিশেষ অবদান। যেমনটি স্কুল আমাদের গঠনদান করেছে তেমনি সুগঠিত বা সুশিক্ষিত হয়ে এই স্কুলেই আগামী প্রজন্মকে গঠন করার জন্যে সচেষ্ট হয়েছেন আমাদেরই গ্রামের সন্তানগণ। অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের ধর্মপল্লীর লোকজন স্থানীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। আবার এই শিক্ষকগণই প্যারিস কাউন্সিল, শিক্ষা কমিটি, উপাসনা কমিটিসহ নানা সমাজকর্মে নিয়োজিত আছেন। তাই স্থানীয় সমাজের জন্যে সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুলে পড়ুয়া সন্তানদের অবদান সত্যই সমৃদ্ধ।

নারী শিক্ষায় অবদানঃ সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই অর্থাৎ ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে এক সময়ে সেই সময়কার ফাদারগণ অনুভব করেন যে প্রকৃত উন্নয়নের জন্যে নারী শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। বিশেষ করে পরিবার গঠনে নারীদের ভূমিকা প্রধান। উল্লেখ করা যেতে পারে যে

ছেলেদের শিক্ষার জন্যে সেন্ট আন্তনী প্যারিশ স্কুল ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত চালু ছিল। এর পাশাপাশি মেয়েদের শিক্ষার জন্য চালু করা হয়ে সেন্ট যোসেফস্ প্রাইমারী স্কুল। আমাদের গ্রামের অনেক মেয়েই এই স্কুলে লেখাপড়া করেছে। এই স্কুলটি তখন মিশন বাড়িতেই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতো। যারা এই স্কুলে লেখাপড়া করেছে তাদের মধ্য থেকে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য অনুসারে জানা যায় যে এই সেন্ট যোসেফস্ প্রাইমারী বিদ্যালয়ে তখন ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান করা হতো। আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে সেসময়ে ৫ম শ্রেণীর ছাত্রীরা বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে এবং তাদের মধ্যে মেধাবী মেয়েরা বৃত্তি লাভ করেছে। এখানেও আমরা দেখতে পাই যে আমাদের সমাজের নারীগণ এই শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও অবদান রেখেছেন। এই সেন্ট যোসেফস্ প্রাইমারী স্কুলে সেবা দিয়েছেন মোক্তার বাড়ির আইরিস গোমেজ, জানি মাষ্টার, তেরেজা কৈলু এবং লুসিয়ানা ডি'কস্তা। তাহলে দেখা যায় যে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের পর আমাদের নারীগণও সমাজে অবদান রেখেছেন বিশেষ করে নারী শিক্ষার উন্নয়নের স্বার্থে। তাঁদের এই অবদানের ফলে স্থানীয় মেয়েরা অন্ততপক্ষে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করার সুযোগ পেয়েছে। তাদের মাঝে কিছুটা হলেও শিক্ষার আলো প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। এই যে স্থানীয় নারীদের দ্বারা স্থানীয় মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান তা অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবদানঃ হলিক্রশ সিস্টারগণ স্বাস্থ্যসেবায় পাদ্রীশিবপুরে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সেকারণেই এক সময় ফাতিমা স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এখানে প্রথমত হলিক্রশ সিস্টারগণ সেবা দিলেও তারা স্থানীয় নারীদের প্রশিক্ষণ দান করেন। তাদের মধ্যে ব্রিজেট ব্রিতু ("বিজিমানা" নামে পরিচিত) অন্যতম। বিশেষ করে ধাত্রী প্রশিক্ষণ দানের ফলে পাদ্রীশিবপুর গ্রামের বেশ কয়েকজন নারী ধাত্রী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে তারাই স্থানীয় প্রসূতিদের নিরাপদ সন্তান জন্মদান নিশ্চিত করেন। ফলে স্থানীয় জনমনে স্বস্তি আসে। এই ধাত্রীগণ যে কেবল খ্রিস্টানদের সেবা দিয়েছেন তাই নয় বরং বাখেরগঞ্জ থানা এলাকার বহু প্রসূতিকে তারা সেবা দিয়ে সন্তানের মুখ দেখতে সাহায্য করেছেন। এই যে একটি শিশুর নিরাপদ জন্মগ্রহণ ও মায়ের জীবন রক্ষা এমন মহৎ কাজে আমাদের গ্রামের নারীগণ অবদান রেখেছেন। এছাড়াও নার্স প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও সিস্টারগণ করেছিলেন। ফলে পরবর্তীতে ফাতিমা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আমাদের গ্রামের মহিলারাই সেবিকা হিসেবে রোগীদের সেবা দান করেছেন এবং বর্তমানেও সেই সেবা অব্যাহত আছে। এই ক্ষেত্রে পাদ্রীশিবপুরে কর্মরত এলএইচসি সিস্টারগণও বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাদের সকলের অবদানের কথাই আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

কৃষি উন্নয়ন ক্ষেত্রে অবদানঃ আমাদের এলাকা অনেক আগে থেকেই ছিল কৃষিনির্ভর। তবে আমাদের মানুষদের প্রধানতঃ দু'টি ফসলের উপর নির্ভর করতে হতো। আধুনিক চাষাবাদ সম্পর্কে তাদের তেমন কোন ধারণা ছিলনা। কিন্তু ব্রাদার কন্সট্যান্ট এডিসি (কৃষি উন্নয় কেন্দ্র) চালু করেন এবং যান্ত্রিক চাষাবাদ ও আধুনিক কৃষিপদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন শুরু হয়। এই এডিসিতে আমাদের এলাকার অনেকেই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ফলে ট্রাক্টর চালনা থেকে শুরু করে সারের ব্যবহার, কীটনাশক ব্যবহারসহ বীজ ও চারা উৎপাদনের কলা-কৌশল এলাকার অনেকেই রপ্ত করেন। আর এর পরেই তাদের তিনটি ফসল বা ইরি ধানের চাষ শুরু হয়। আমাদের গ্রামের কৃষকেরাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে এই কাজ দক্ষতার সাথে সম্পাদন করে এবং এলাকাবাসীর খাদ্যের যোগান দিতে সক্ষম হন।

এই কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রভাব আমাদের সারা গ্রামেই পরিলক্ষিত হয়। ফলে প্রতিটি বাড়িতে বাগান করার প্রবণতা দেখা দেয়। পাশাপাশি সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুলেও কৃষি বিভাগ চালু করা হয়। বলতে গেলে পাদ্রীশিবপুরে আমাদের গ্রামের লোকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই কৃষি বিপ্লব দেখা দেয়। যদিও চাকুরীর প্রতি অতিশয় আসক্তির ফলে সেই ধারাটি এখন প্রবলভাবে নেই কিন্তু যতটুকু আছে তাতেও আমাদের কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন এখনও যথেষ্ট ভালো।

সামাজিক নেতৃত্বঃ পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে স্থানীয় মণ্ডলীর চর্চা শুরু হয়েছিল মাননীয় বিশপ যোয়াকিমের হাত ধরেই। সাথে সাথে ঐ সময়কার ফাদার বর্তমান মহামান্য কার্ডিনাল পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ কাউন্সিলের জন্যে একটি সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন। যার মাঝে প্রধান বিষয় ছিলো নিজেদের ধর্মপল্লী নিজেরাই সক্রিয় উদ্যোগে চালানো। কেবল মিশনের প্রতি নির্ভর না করে যাতে করে ধর্মপল্লীর কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে তার জন্যে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ থাকা দরকার। সেই সময় থেকেই ধর্মপল্লীর যেকোন অনুষ্ঠান, সভা, সেমিনার, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি স্থানীয় নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে পরিচালিত হয়ে থাকে। কেবল তাই নয় পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ কাউন্সিল বর্তমান গির্জা নির্মাণে উদ্যোগ গ্রহণ করে বিশপ মহোদয়ের চাহিদা মোতাবেক আর্থিক সহযোগিতা দিয়েছেন। একইভাবে রাজাবাড়িয়া গির্জা ও মাটিভাঙ্গা গির্জা নির্মাণেও পাদ্রীশিবপুরের নেতৃবৃন্দ সানন্দে এগিয়ে এসেছেন এবং এ'দুটি গির্জাতেও তাদের পক্ষে যথাসম্ভব অবদান রেখেছেন। বর্তমানেও সমাজের শান্তি, শৃংঙ্খলা ও সংহতি বজায় রাখার জন্যে গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

এভাবে যদি বিবেচনা করি গ্রামের উন্নয়নে, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে যেমন বিবাহ, যাজকবরণ, বিশপগণের আগমন, জুবিলি পালন, রাস্তাঘাট সংস্কার, মৃতদের সৎকার এবং অন্য যেকোন সামাজিক কাজেই আমাদের নেতৃবৃন্দ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থকেন।

পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টান লোকজন বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করেন প্রধানত জীবন ও জীবিকার তাগিদে। আবার আমাদের যুব সম্প্রদায় বিভিন্ন শহরে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে। তবে তারা যেকাজই করে না কেন, তাদের অন্তরে পাদ্রীশিবপুরের যে আলোকবর্তিকা বিদ্যমান তার সানন্দ প্রকাশ ঘটাতে তারা কখনো পিছনে পড়ে থাকে না। এর অনেক উদাহরণ আমরা দিতে পারি। কেবল যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই তাদের সেবাকর্মের বা বিভিন্ন পেশায় থেকে অবদান রাখার বিষয়টি প্রাধান্য পায় তা নয়। দেশ ছেড়ে ভারতেও অনেক আগ থেকেই পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টান লোকজন উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন এবং এখনও রেখে চলেছেন।

''পাদ্রীশিবপুর খ্রীষ্টান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, ঢাকা'' সংগঠনের অবদানঃ পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টান বাসিন্দারা ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কলকাতায় অনেক আগ থেকেই সুসংগঠিত। আর এজন্যে তাদের সুনাম সারা বাংলাদেশে সুবিদিত। দক্ষিণাঞ্চলের একটি ধর্মপল্লী থেকে এসেও, অভিবাসী হয়েও, রাজধানী শহর ঢাকাতে নিজেদের প্রতিভা ও গুণাবলী দ্বারা জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনে নেতৃত্ব বা সেবাদানের মতো ক্ষেত্র তৈরি করা সহজ নয়। সেই কাজটি আমাদের লোকেরা সার্থকতার সাথেই করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টান জনগণ একটি সংগঠনের জন্ম দেয় যার নাম ''পাদ্রীশিবপুর খ্রীষ্টান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, ঢাকা''। এই সংগঠনটির নেতৃবৃন্দ প্রথম থেকেই পাদ্রীশিবপুরের আর্তমানবতার সেবায় কাজ করে আসছে। বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও দারিদ্র্যতার ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা পাদ্রীশিবপুরের অনেকের জন্যই

সত্যিকার কল্যাণ বয়ে এনেছে। ঢাকাতে তাদের কার্যক্রম তেজগাঁও ধর্মপল্লী থেকেও স্বীকৃতি পেয়েছে এবং একটি আদর্শ সংগঠন হিসেবে সকলের কাছে পরিচিতি লাভ করেছে। প্রয়াত লুকাস ডি'রোজারিওর সভাপতিত্বে গঠিত এই সংগঠনটি আজও প্রশংসার সাথেই তার সেবার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন: পাদ্রীশিবপুরের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্যে ঢাকাতে ১৯৯৩ সনের দিকে প্রথমে যৌথভাবে পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠিত হয়। পরবর্তীতে কেবলমাত্র ঢাকায় বসবাসরত খ্রিস্টান লোকজনদের জন্যে এই সমিতি আত্মপ্রকাশ করে। যা বর্তমানে ''ঢাকাস্থ পাদ্রীশিবপুর খ্রিষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ'' নামে পরিচিত। এই সমিতিটি বাংলাদেশ সরকারের সমবায় অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধিত। এই সমিতির মাধ্যমে ঢাকায় বসবাসরত পাদ্রীশিবপুবাসীদের আর্থিক মুক্তি নিশ্চিত হয়েছে। এখন আর কেহ ব্যক্তি পর্যায়ে ঋণের চিন্তা না করে সমিতির মাধ্যমে সহজ শর্তে স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণ করে উপকৃত হচ্ছে। এই সমিতি হওয়ার ফলে আমাদের লোকজন জমিক্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা, গৃহনির্মাণসহ নানা প্রয়োজনে ঋণ সহায়তা গ্রহণ করছেন। এই সমিতির উচ্চ শিক্ষা ঋণ গ্রহণ করে পাদ্রীশিবপুরের বেশ কয়েকজন ছেলে-মেয়ে দেশে ও বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে। সমিতিটি সত্যিকার অর্থেই পাদ্রীশিবপুরবাসীর অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। আর এই কাজের মাধ্যমেই আমাদের সমাজের লোকজনদের উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছে। মি. আব্রাহাম গোমেজ এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। যিনি অদ্যাবধি সমিতিকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

''পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান যুব সংঘ'': পাদ্রীশিবপুরের যে সকল যুবক-যুবতী ঢাকায় বসবাস করে তাদের রয়েছে একটি সংগঠন ''পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান যুব সংঘ''। এই সংগঠনটি বিগত দুই যুগেরও বেশী সময় ধরে ঢাকাতে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পাদ্রীশিবপুরে তারা অনেকগুলি সেমিনার ও কর্মশালা করেছে। তারা প্রতিবছর রামুরপালা গানের আয়োজন করে পাদ্রীশিবপুরের ঐতিহ্যকে লালন করে আসছে। বিভিন্ন সময় তারা পাদ্রীশিবপুরের ছাত্রদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান করেছে। তারা প্রতি বছরই বড়দিনে কীর্তন গান ঢাকাতে ঘরে ঘরে গিয়ে পরিবেশন করে বড়দিনের আনন্দকে সকলের সাথে ভাগ করে নেয়ার সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। যদিও তাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতা আছে তবুও তারা গরীবদের যথাসাধ্য সহায়তা দিতে চেষ্টা করে। তাদের আরও একটি উত্তম দিক হলো আমাদের লোকেরা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যদি রক্তের অভাব বোধ করে তখন এই যুব সংঘের সদস্যরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করে থাকে।

বাংলাদেশ মণ্ডলীর মধ্যে পাদ্রীশিবপুরের অবদান: ঢাকাতে জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনেও আমাদের পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান লোকজনদের অবদান সত্যিকার অর্থেই উজ্জ্বল। ঢাকার সর্ববৃহৎ খ্রিস্টান সমবায় সমিতি ''দি খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা''। এই সমিতিতে আমাদের পাদ্রীশিবপুরের বেশকিছু সদস্য নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং তাদের সেবাদানের কথা আজও মানুষ বিশেষ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন; প্রয়াত প্রফেসর গাব্রিয়েল মানিক গোমেজ, প্রয়াত আরনল্ড এ. গোমেজ, প্রয়াত আইজেক গোমেজ, প্রয়াত পল শিকদার, প্রয়াত ইগ্নসিয়াস এলুইসিয়াস মনু গোমেজ, প্রয়াত পিটার গোমেজ, মিস্ মারীয়া গোমেজ, মি. অঞ্জন বাড়ৈ এবং বার্নার্ড পঙ্কজ ডি'রোজারিও। এমন এক সময় গেছে যে আমাদের ৫ জন ডিরেক্টর একযোগে এই সমিতিতে নেতৃত্ব

দিয়েছেন। তাদের সেবার জন্য যেমন সারা দেশের মানুষ উপকৃত হয়েছে তেমনি তারা পাদ্রীশিবপুরের প্রতিনিধি হয়ে সারা দেশের মানুষের কাছে পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন। পাশাপাশি পাদ্রীশিবপুরের অনেক সদস্যই এই সমিতির উপদেষ্টা পরিষদে, নারী কমিটিতে, পরিকল্পনা ও অর্থ কমিটিতে রয়েছেন। আর আমাদের মহামান্য কার্ডিনাল মহোদয় অন্যতম উপদেষ্টা হিসেবে ''ডিভাইন মার্সি হাসপাতালে'' সপ্তাহে দু'দিন আধ্যাত্মিক ও পরামর্শমূলক সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। একই ভাবে বাংলাদেশে খ্রিস্টানদের সর্ববৃহৎ গৃহায়ন ভিত্তিক সোসাইটি ''দি মেট্রোপলিটান খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ''-এ আমাদের সদস্যগণ সেবা দিয়েছেন। বিশেষ করে প্রফেসর গাব্রিয়েল মানিক গোমেজ ও আরনল্ড এ. গোমেজ এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে এই সোসাইটি গঠনে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন। পরবর্তীতে আইজেক গোমেজ, মিস্ মারীয়া গোমেজ, সিলভেস্টার গোমেজ বাবু ও ফ্রান্সিস গোমেজ বাবুল এই সোসাইটিতে নেতৃত্ব দিয়েছে। সেই সাথে পাদ্রীশিবপুরের অনেকেই এই সোসাইটিতে উচ্চপদে চাকরি করে আমাদের লোকজনদের জন্যে বিশেষ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিতে অবদান রেখেছেন। বর্তমান নিবন্ধের রচয়িতারও প্রচুর অবদান আছে ঐসব সংগঠনে।

ঢাকাতে আরও একটি সংগঠন **''দি ওয়াই এম সি এ''**। এই সংগঠনটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। এখানেও আমাদের অনেকেই নেতৃত্ব দিয়েছেন। ফলে তাদের এই সানন্দ বিচরণ আমাদের ধর্মপল্লীকেই সকলের সামনে তুলে ধরেছে। এই সংগঠনের ঢাকা ও জাতীয় উভয় ওয়াই এমসি এ এর নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রফেসর গাব্রিয়েল মানিক গোমেজ, আরনল্ড অরুন গোমেজ ও মারীয়া গোমেজ। সেই সাথে আমরা আরও স্মরণ করতে পারি যে ঢাকাতে ''বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশন'' এ প্রফেসর গাব্রিয়েল মানিক গোমেজ প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও আমাদের লোকজন বিভিন্ন এনজিও এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে চাকরি করে কেবল তাদের নিজ নিজ পরিবারের উন্নতিই সাধন করেননি, পাশাপাশি পাদ্রীশিবপুরের অনেককেই চাকরি দিয়েছেন। সেই সাথে আরও স্মরণ করা যায় যে এক সময় যখন পাদ্রীশিবপুরের লোকজন ঢাকাতে সীমিত ছিলো তখন রক ফার্ডিন্যান্ড গোমেজ, বেনেডিক্ট গোমেজ, সিলভেস্টার ডি'রোজারিও এবং আলেকজান্ডার গোমেজ পাদ্রীশিবপুর থেকে আসা লোকদের আত্মীয় অনাত্মীয় নির্বিশেষে সকলকে প্রাথমিকভাবে আশ্রয় দিয়েছেন এবং অনেকেই কর্মস্থান করে দিয়েছেন। আমাদের গ্রামের লরেন্স গোমেজ বিদেশী গার্মেন্টস্ কোম্পানির বাংলাদেশ শাখার উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন ও রোজ গোলাপী গোমেজ হলিক্রশ হাই স্কুল ঢাকায় শিক্ষকতা করেছেন এবং নটর ডেম কলেজে প্রফেসর গাব্রিয়েল মানিক গোমেজ সেবা দিয়েছেন ও প্রফেসর ব্রায়েন ডি'রোজারিও বর্তমানে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। তাদের এই অবস্থানের ফলে আমাদের গ্রামের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও সহায়তা পেয়েছে। জেমস গোমেজ, বাংলাদেশ কারিতাসের রিজিওনাল ডিরেক্টর, জাতীয় পর্যায়ে প্রোগ্রাম ডিরেক্টর এবং বর্তমানে মট্স-এর ডিরেক্টর হিসেবে কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম ওয়াইডব্লিউসিএ এর জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে ছিন্থিয়া ডি'রোজারিও বহু বছর ধরে সাফল্যের সাথে কাজ করেছেন এবং নারী উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখেছেন। সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে ইদানিং প্রফেসর হিসেবে উন্নীত হয়েছেন। প্রফেসর সুইটি বৃজেট গোমেজ ঢাকাতে বিশেষ অবদান রাখছেন। তিনি আমাদের গর্ব এজন্য যে বিসিএিস ক্যাডার হিসেবে প্রথম এবং তিনি শিক্ষায় অবদান রাখছেন। পাদ্রীশিবপুরে মাত্র দুইজন পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেছেন। তার মধ্যে একজন হচ্ছেন: ড. মেরী মনিকা গোমেজ, যিনি এই গ্রন্থের একজন লেখক ও সহ-সম্পাদক। তার পরিচয় লেখক পরিচিতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

''পাদ্রীশিবপুর সমাজ সংঘ – ঢাকা'' ''পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান এসোসিয়েশন – খুলনা'': তা ঢাকার মতোই চট্টগ্রামে আমাদের রয়েছে ''পাদ্রীশিবপুর সমাজ সংঘ'' খুলনায় ''পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান এসোসিয়েশন'' তাদের কার্যক্রম চালু রেখেছে। এক সময় এই দুটি শহরেই আমাদের লোকজনদের আধিক্য এবং সেবাদানের বা নেতৃত্ব দানের লোকজনদের স্বপ্রণোদিত উদ্যোগে অনেক কল্যাণ কর্ম সাধিত হয়েছে। কালক্রমে খুলনাতে আমাদের লোকজনের সংখ্যা কমতে থাকে এবং এক পর্যায়ে এতই সীমিত হয়ে যায় যে, এখানে সংগঠনটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তবে চট্টগ্রামে এখনও তাদের সংগঠনটি পাদ্রীশিবপুরের জনগণের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে এবং তারা প্রতিবছরই বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়ে তা বাস্তবায়ন করছেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে, প্রয়াত উইলসন গোমেজ ও প্রয়াত জেরোম গোমেজ যখন এই সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন তারা ঐ সময়ে চট্টগ্রামে কেবল সমাজ সংঘ নয় বরং পাথরঘাটা ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতেও বিশেষ অবদান রেখেছেন। বর্তমানে যারা আছেন তারাও তাদের সামর্থ্য অনুসারেই লোকজনদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

প্রবাসীদের অবদান: বাংলাদেশের বাইরেও আমাদের লোকজনদের অবদান রয়েছে। বিশেষ করে কলকাতায় অনেক আগে থেকেই সুসংগঠিত ছিলো আমাদের পাদ্রীশিবপুরের লোকজন। তাদের সহযোগিতায় আমাদের গ্রামের অনেকেই চাকরির সুযোগ লাভ করেছে। বিশেষ করে বৈঠকখানায় আমাদের লোকজনদের ছিল মিলনক্ষেত্র। তাছাড়া কল্যাণপুরে প্রয়াত মার্টিন গোমেজ, প্রয়াত এরিক গোমেজ ও প্রয়াত ডেজমন্ড তপন গোমেজ মানুষের সেবা করেছেন তাদের সাধ্যমত। যেকোন কর্মসূচি হাতে নিয়ে তারা নিষ্ঠার সাথেই তা সফল করে তুলেছেন। পাদ্রীশিবপুরের রেজিনাল্ড ডি'রোজারিও বায়োগ্যাস পাওয়ার প্লান্ট আবিষ্কার করে সমস্ত কলকাতায় জাগরণ তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনিই প্রথম এই বায়োগ্যাসের প্রচলন করেন। কল্যাণপুর ধর্মপল্লীতেও পালকীয় পরিষদের সদস্য হিসেবে আমাদের গ্রামের লোকজন সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়াও আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, লন্ডনসহ বিভিন্ন দেশে আমাদের লোকজন অবস্থান করে যার যার মতো করে আমাদের ধর্মপল্লীর জন্য কিছুটা হলেও অবদান রেখে যাচ্ছেন। বিশেষ করে তারা আমাদের গ্রামের বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে ও অনুষ্ঠানে আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে থাকেন।

উপরোক্ত বিষয়ে আরও বিশদ আলোচনা হতে পারে। আরও অনেকেই নিরবে নিভৃতে মানুষের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন যাদের নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। তাদের প্রতিও রইলো আমাদের গভীর শ্রদ্ধা। পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লী সত্যই ঈশ্বরের আশীর্বাদে ধন্য। মাতা মণ্ডলীতে পাদ্রীশিবপুরবাসীর অবদান নি:সন্দেহে প্রশংসনীয়।

উপরন্তু, এই গ্রন্থে নবম ভাগে প্রয়াত বিশেষ ব্যক্তিত্বদের আমরা স্মরণ করেছি তাদের পরিচিতি দিয়ে, তাদের লেখা লিপিবদ্ধ করে এবং তাদের ভূমিকা ও অবদান বিভিন্ন পর্যায়ে উল্লেখ করে। তাদের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ জনেরই অধিক হবে। স্থানীয়ভাবে, দেশের মধ্যে, মণ্ডলীর মধ্যে এবং প্রবাসে তারা নানা ক্ষেত্রে তাদের অবদান রেখে গেছেন ও অবদান চলমান আছে। তাই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানিয়ে স্মরণ করছি আজ।

একাদশ ভাগ

পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ: উপসংহার ও ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা

সংকলনে ও সম্পাদনে: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

আলোচ্য বিষয়সূচির সারসংক্ষেপ

প্রথম অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুর-নিবাসী ও পাদ্রীশিবপুর-অভিবাসীদের প্রত্যাশাসমূহ

(১) "শ্রীমন্ত নদীর বানে রামুর পালাগানে আমাদের আত্মানুসন্ধান" – পারাবত

(২) পাদ্রীশিবপুরবাসীর জনসংখ্যা ও অভিবাসন বিশ্লেষণ: চ্যালেঞ্জ ও প্রত্যাশা-কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও

(৩) External Migrants of Padrishibpur: Canada and USA - Dr. Mary Monica Gomes

(৪) পাদ্রীশিবপুরবাসীর আর্থিক জীবন: অতীত, চ্যালেঞ্জ ও প্রত্যাশা – মি. মাথিয়াস গোমেজ

(৫) পাদ্রীশিবপুরবাসীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ও নেতৃত্ব - মি. যোসেফ ডি'রোজারিও

(৬) পাদ্রীশিবপুরবাসী ছেলেমেয়েদের শিক্ষা: চ্যালেঞ্জ ও প্রত্যাশা – প্রফেসর সুইটি ব্রিজেট গোমেজ

(৭) কারিগরি শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা ও প্রত্যাশা – মি. জেমস গোমেজ

(৮) পাদ্রীশিবপুর অধিবাসী ও অভিবাসীদের খ্রিস্টীয় জীবন: বর্তমান ও প্রত্যাশা – কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও

(৯) পাদ্রীশিবপুরের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য: সংরক্ষণ ও প্রত্যাশা- মি. যোসেফ ডি'রোজারিও

(১০) মা মারীয়ার প্রতি বর্তমানের ভক্তি ও ভবিষ্যতের প্রত্যাশা – ফাদার রুবেন গোমেজ

দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রত্যাশা ও প্রস্তাবনাসমূহের সারসংক্ষেপ

অবতারণা:

"শ্রীমন্ত-বাটে পাদ্রীশবপুর ঃ ঐতিহ্যবাহী একটি খ্রিস্টান জনপদ" গ্রন্থের একাদশ ভাগ এর শিরোনাম হচ্ছে "পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ: উপসংহার ও ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা"। এই অংশটা সমগ্র গ্রন্থের খানিকটা উপসংহার স্বরূপ। অতীত ও বর্তমান নিয়ে গ্রন্থের পূর্ব দশটি ভাগে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্যের মধ্যে ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা নিয়ে কিছু স্বপ্ন দেখাও ছিল অন্যতম। এই উদ্দেশ্যের জন্য কয়েকজনের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। বেশ কয়েকজন অপারগতা স্বীকার করেছেন। কিন্তু খুবই আনন্দিত যে, অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকজন তাদের সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লিখে আমাদের বাধিত করেছেন। তাদের প্রতি আমাদের অনেক কৃতজ্ঞতা। প্রথম লেখাটি ছদ্মনামে একটি অনুধ্যানমূলক, কাব্যিক এবং আত্মার অনুসন্ধানী প্রত্যাশা ব্যক্ত করে লেখা। পূর্ব লেখা থেকে এটি একটি উপসংহারের ভাব ইঙ্গিত করে। তথ্যসূত্র কবিতাটির সমাপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য লেখাগুলি খুবই সমসাময়িক ও সময়োপযুক্ত, বিশ্লেষণমূলক ও চ্যালেঞ্জ-উল্লেখ্য এবং পাদ্রীশিবপুর -নিবাসী ও পাদ্রীশিবপুর-অভিবাসীদের জন্য ভবিষ্যৎ প্রত্যাশাপূর্ণ আহ্বান বহন করছে। পরিসমাপ্তিতে সংক্ষিপ্ত আকারে কয়েকটি প্রত্যাশা উল্লেখ করে ভবিষ্যৎ আলোচনার আহ্বান জানাচ্ছি। (কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, সিএসসি)

প্রথম অধ্যায়
পাদ্রীশিবপুর-নিবাসী ও পাদ্রীশিবপুর-অভিবাসীদের প্রত্যাশাসমূহ

শ্রীমন্তনদীর বানে রামুর পালাগানে আমাদের আত্মানুসন্ধান[১]

– লেখক: পারাবত

কালীপ্রসন্ন চক্কোত্তি জাত - ব্রাহ্মণ ছিলেন বটে, কিন্তু ছুঁৎমার্গের অতিক্রমণে তাঁর জুড়ি মেলা ভার;
তাইতো সুতালড়ি থেকে শিবপুরের পাদ্রিবাড়ি, তাঁর অন্তরের অনুধাবন করবার দূরত্ব মাত্র;
পুরুতের পৈতে কখন যেন নতুন সুরের লহরী তোলে, জীবন সাধনার পরতে পরতে,
তখন সেটা সেই বামুনের শারীরিক ভূগোল আবেষ্টনে, শান্তি পায় না বলেই সবাই জড়িয়ে রাখে;
আপাদমস্তক নিপাট ভাল-মানুষটা, এক-সময় 'ঠাকুর' মর্যাদা লাভ করেন শুধু কীর্তনের দৌলতে।
অর্চনার আলাদা জগতে তাঁর বসবাস, নিত্যদিন পরিচিত সব কালিমা পাশ কাটিয়ে,
সেখানে কৃষ্ণের সঙ্গে খ্রীষ্টের আদান-প্রদান, এক অমোঘ সত্যে প্রাণ পায়;
তাই জীবনের আঙিনায় নতুন নতুন সুরেলা পাখির রব ওঠে, সব পরিচিত আকাঙ্খায়।
আস্তে আস্তে গান দানা বাঁধে, ফসলি খ্রীষ্টানের জমিতে সম্মিলিত আবাদের অভিপ্রায়ে,
অকাতরে সেচ দিয়ে যায় সুশীলা শ্রীমন্ত, নিজেকে একেবারে নিরাভরণ নিঃস্ব করে।

তাইতো র‍্যামুয়েল নামটা, তার বিদেশী নির্মোক আর গন্ধ ঝেড়ে ফেলে
সহসাই পরিচিত আবহের আবেদনে, 'রামু' নামে দীক্ষা গ্রহণ করে শ্রীমন্তর পবিত্র পানিতে;
তখন আমরা তাকে চিনে নিই, আমাদের পরমাত্মীয় বলে- কারও সন্তান কারও পিতা।
মহাপ্রভুর জীবন পালাগানের অনুষঙ্গ হলে, প্রভু-যীশুর লীলা কেন পারবে না ছুঁতে
আবহমান ঐতিহ্যে লালিত, আমাদের আকাঙ্খায় মিশে থাকা পাদ্রিশিবপুরের মাটিজল?

এমন প্রশ্নে সদুত্তর খুঁজতে খুঁজতে, দীঘির পাড়ের মাস্টার বাড়ির ছেলে,
ফিলিপ ডি'কস্তা অবলীলায় 'পোস্ট মাস্টার' বনে যান, আমাদের আদুরে আহ্বানে।
রামুর দোকানে লোকেরা আসে পণ্য কিনতে নয়, শুধু সুরের সওদা করতে,
খ্রীষ্টান, হিন্দু, মুসলমান – চেনা-পরিচিত আবার আগন্তুক অনেকেই আসে সময়ে অসময়ে;
ব্যবসার লাভ যখন লাটে ওঠে, তখন সুরযন্ত্র ঠাঁই পায় কাছাড়ি-বাড়ির পুকুরের পানিতে-
ঠিক তখনই পিউত্তা আর পোউল্লার শীত-সরানো সাহসের কাছে হার মানে পিতৃরোষের দম্ভ।

দোকানের মুহুরী কালু ঠাকুর লক্ষীর সাধক হয়েও, স্বরস্বতীর বরপুত্র এক সার্থক 'সরকার' এ রূপান্তরিত,
খোল-করতাল-বেহালায় তান তুলে, উন্মাদ কৃষ্ণকাঠির পাটনী বাড়ির সন্তান- উমেশ, যোগেশ, যামিনী;
আত্মনিবেদনের লক্ষ নিয়ে দশকোষী, লোভা আর ঝুলনের সমুচিত সম্মানে সর্বাঙ্গসুন্দর পরিবেশন;
আবার পশ্চিমের ধোপাবাড়ির অশ্বিনী আর শশীভূষণ, রামুর সঙ্গ-সান্নিধ্যে অদীক্ষিত খ্রীষ্টানুসারী।
শিকদার বাড়ির পিতর, পল আর পিও - নাওয়া খাওয়া বেমালুম ভুলে গিয়ে শখের গানে রাতদিন আত্মস্থ,

[১] উদয়: পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান যুবসংঘ, ঢাকা, ২০১৭ খ্রি.

তাদের সঙ্গে হরিহর আত্মা হলো - মার্ক, বার্থু, মিলাট, পিতু, পন্ডিত আর যোসেফ - সবাই।
জন কস্তা, জার্মান বয়াতি, চুলওয়ালা পিটার, আড়াইবেকি কিংবা পবরি কাউল্লা-
এই গানকে মাথায় তুলে নিয়েছে ফিরি করেছেন - দেশান্তরকাঠি, মাটিভাঙা, কালাদা ছাড়িয়ে
বাংলাদেশের প্রান্তঃসীমানায় খুলনা, চট্টগ্রাম আর রাজধানীর চাক্‌চিক্যে।
তাদের হাত ধরে আসরে এসে দাঁড়িয়েছে এই সময়ের সাহসী সন্তানেরা:
দাঁড়াকবি উপাধি না পেলেও, নিজেদের অ্যান্টনী ফিরিঙ্গির সার্থক উত্তরসূরী ভাবতে পারে-
আমাদেরই ঘরের লোক- ডমিনিক, আলবারিস, এন্টনি, নরবার্ট, মেলকাম, মিডিন, গিলবার্ট;
ঢাকা শহরের ঢক্কানিনাদ ছাপিয়ে, তাদের কণ্ঠ শোনা যেত সবার হৃদয়ে হৃদয়ে।

সেই যে গলা ছেড়ে গাইতে শুরু করল, গ্রামীণ প্রবক্তাদের দৃপ্ত কণ্ঠস্বর;
"আমি কোন সাধনে তোমায় পাব, আমি সাধন জানি না"- নিজের সত্যিকার আমি তখন
জীবন উত্তরণের এই আকুতি, শুধু কথা আর সুরের অসভ্য আদিখ্যেতা হ'য়ে না থাকুক;
আমাদের আটপৌরে জীবনের নিঃসঙ্গ ব্যক্তি, অশান্ত পরিবার, ঘুণধরা সমাজ আর চোখবন্ধ মন্ডলীতে।
'অন্ধ জীবের গতি নাই রে'- বলার পরও, অর্থবিত্তে গতি খুঁজে বেড়াই অহরহ পরিচিত অভব্যতায়,
তারই ফলশ্রুতিতে অগতির গতি আজ, অবস্থা বেগতিক দেখে পালাবার পথ করে অন্বেষণ।

'দীনদরিদ্র মোরা কিছু তো নাহি সম্বল, চরণ ধোয়াতে প্রভু রেখেছি নয়ন জল'-
ক্ষয়িষ্ণু সময়ের সামনে দাঁড়িয়ে, দিশেহারা সত্তা সমস্ত অবলম্বন হারাবার ব্যথা ভোলে;
শুধু চোখের সামনে লোকদেখানো আয়োজনে, অশ্রুবারি ফেলবার একমাত্র আনুষ্ঠানিকতায়।
'আজ জগত জুড়িয়া নরকের আগুন জ্বলছে ধু ধু'- সেই আগুনের তাপ সবার শরীরে সমান সক্রিয়;
শ্রীমন্ত নদীর সুশীতল জল বুঝি, পারে না শান্তি স্বস্তির প্রলেপ নিয়ে এসে জুড়িয়ে দিতে।
'ধন রত্ন যত পাব এখন হরিয়া লব'- এই কামনা বাসনা অবদমিত আস্কারায় বোধবুদ্ধি লোপ পেয়ে
আজ আমাদের দেনা-পাওনার হিসেব নিকেশ সব এলোমেলো অন্ধকারে লোপাট।

তাই নতুন করে আশায় বুক বাঁধতে চেয়েও, দেখে হতাশার লালবাতি জ্বলে দূরের পোতাশ্রয়ে;
'আমার এ জীবনে কাজ কি আছে'- এমন অবান্তর প্রশ্ন এই ডিজিটাল প্রজন্মের মুখে বেমানান,
তারপরও ফেসবুকের শরীরে তৃপ্তির চাহনি কোন সহজ সমীকরণ এনে দেয় না।
'তোমার মাথায় পড়বে বাজ'- প্রবীণ প্রজন্মের এই সাবধান বাণী শুনে আমরা হেলায় হেসে উঠি;
বিবেকের দংশনে হয়তো-বা প্রমাদ গুনি, রংচটা সোহাগী শরীরে আর মরচে-পড়া অন্তরাত্মার গহ্বরে।
আশে পাশে কতই-না আছে, জীবনযুদ্ধে পরাজিত সব আদর্শবাদী সৈনিকের দল,
তাদের মুখেও নৈঃশব্দের উচ্চারণ, আমাদের এক-মুহূর্ত ভাববার অবকাশ দেয় না - তাই,
'এই অনিত্য সংসারে কেহ নয় কার' - জানার পরও হাত ধরার কামনাবিহ্বল সন্ন্যাসীসুলভ ভন্ডামী
আমাদের দ্বিতীয় আচরণের মাপকাঠি হয়ে, বেশ বাজারে চলছে চাউর চাটুকারিতায়।
'মায়ার বিকার মাত্র এই ভব নাট্যালয়'- বলেই আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে রাখতে চান আমাদের নাট্যকার ঈশ্বর,
নাটক পরিচালনার ভার নাকি, এক প্রকার জোর-জবরদস্তি ক'রেই নিয়ে গেছে শয়তানের সরদার;
চরিত্রগুলো আমাদেরই লোকেরা ফুটিয়ে তোলবার, তাচ্ছিল্য প্রয়াস করছে গোপনে আর প্রকাশ্যে।

তারপরও আমাদের সামনে, শুকতারার আলো জ্বালিয়ে জেগে থাকেন ছোট্ট একদল ভালমানুষ -
যাদের প্রচলিত পোষাকী নাম দিতে পারি 'সংখ্যালঘু', তবে শুধু আচারধর্মের দিক-বিচারে নয়
তারাই দৈববাণী শুনিয়ে যান রাতের গভীরে, কালো মেঘের আকাশে কিংবা ঝড়ের ঝাপটায়;
'মোদের দুঃখের নিশি পোহাইবে' - অতএব এমন আশার বাণীর সুর শুনে নিশ্চিত বুক বাঁধতে পারি
আমরা অন্ততঃ গুটিকতক সুস্থ-সংস্কৃতিকামী সূর্যসৈনিক সন্তান, আমাদের দুখিনী নদীর আঁচল ধরে।

আজও পাদ্রীশিবপুরের মাটিতে, কান পাতলে শোনা যায় স্বর্গীয় সুরের সেই গান রামুর পালা,
আমাদের পিতৃপুরুষেরা বুকে ধারণ ক'রে, শুয়ে আছেন কত নিশ্চিন্তে এই মাটির বুকে;
যাকে রূপে-রঙে-রসে জারিত করার, একমাত্র দায়িত্ব নিয়েছিল রসবতী শ্রীমন্ত;
আজ মানুষের অবদমিত স্বার্থসিদ্ধির বেহায়াপনায়, দিন দিন শীর্ণকায়া হচ্ছে সবার চোখের সামনে।
সে জানে নিশ্চয় - যারা গান শুনতে আগ্রহী নয়, তারা তো ভালবাসতে পারে না কোন নারী,
সে মানে নিশ্চয় - যারা গান শুনতে চায় না, তারা তো আপন করতে পারে না কোন নদী,
নারী আর নদীতে যে একাত্ম আলিঙ্গন তার সার্থক উদাহরণ আমাদের প্রাণের শ্রীমন্ত।

গানের রস প্রাণের রস, জোগায় আমাদের প্রিয়তমা শ্রীমন্ত -
মানুষের কাছ থেকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির মত, কিছু পাবার সমস্ত প্রত্যাশাকে অগ্রাহ্য করে,
মানবীয় কোন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা লাভের, অহেতুক বাসনাকে অনায়াসে তুচ্ছ করে,
এগিয়ে চলে গভীর জলের বিশাল ব্যাপ্তিকে একমাত্র অবলম্বন করে;
তার অতল তলের ঠান্ডা প্রাণের স্পর্শ, আমাদের হিমায়িত সত্তাকে বুঝি আরও অবশ করে দেয়।
আমাদের সব কন্যা-জায়া-জননীর নাম শ্রীমন্ত রাখলেও, তার ঋণ শোধ হবার নয়,
তাদের কাপড়ের প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে, শাড়ির আচলের সমস্ত ছোঁয়ায় ছোঁয়ায়,
শুধু মাতৃত্ব নিয়ে গভীর সুরে, গানের সুধারাশি বিলিয়ে কোন ক্লান্তি নেই তার।
শুধুই প্রশান্তির একমাত্র লক্ষণ দেখি, তার পরিষ্কার আর ঘোলাটে জলের মধ্যে ঝিলিক মারে
শত শত কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক, কেঁচো, সাপ, ব্যাঙ-
আরও দেখি তাদের সঙ্গে কী অবলীলায় ঘর করে, আমাদের পরিচিত মায়েদের পরিবার।

পলির প্রলেপ প'ড়ে প'ড়ে, উর্বরা হয় পোড়োমাটির বন্ধ্যা সব ভূমি,
জীবনের অগনিত বেসুরো বাঁশি, নতুন সুরের আবাহনে হেসে উঠে,
আর রামুর গানের রাগে, রাগিণী মেলায় গোটা পাদ্রিশিবপুর।
শ্রীমন্তর শান্ত বুকে মাঝি-মাল্লারা, দাঁড় টানে, বৈঠা বায়, পাল তোলে-
তখন গানের সুরে ভুলে যায় তাদের আসল গন্তব্য কিংবা স্বপ্ন-বাসরের ঘর,
মাতাল করা মাদকতায় চোখ বুজে আসে, অশীতিপর বৃদ্ধার দৃপ্তমান অস্থির সান্তনা;
উদাসী আবেদনের উন্মুখ যৌবনভরা যুবক, দয়িতার মুখ ভুলে যায় এক অজানা ভালো-লাগায়।
এদিকে দেখা যায়, রাত জেগে গান শোনে আমাদের প্রিয় জনগণ,
তাদের বাড়িঘর, জামি-জিরেত, গবাদিপশু; কিংবা ঘুমন্ত শিশুদের পাহারা দেয় মাতৃময়ী শ্রীমন্ত।
রামুর পালা আর শ্রীমন্ত নদী - দুই সহোদরা পাদ্রিশিবপুরের সমস্ত সাজানো উঠোনে;
আলতা মেখে, নূপুর পরে উলুধ্বনি দেয় অভ্যর্থনার আবেদনময়ী নারীত্বে।

আজ দিন বদলে গেছে সামাজিকতায় আর ধর্ম-ধারণায় - যার নির্বাণ সম্ভব উদার মানসিকতায়।
তার বাইরেও কত জীবন, খড়কুটোর মত ভেসে যায় এই শ্রীমন্তর পবিত্র জলকে কলুষিত করে;
তারাই আজ ধর্মরক্ষার মহান দায়িত্ব পেল, ঘুষখোর কোন ধর্ম-ব্যবসায়ীর কাছে:
তাইতো রামুর গানে, হেঁদুয়ানি খোঁজার মতন আহাম্মকী চৌকিদারী
আমাদের এই হিমশীতল সোনার মাটিতে, কম হয়নি কস্মিনকালে।
খ্রীষ্টীয় পদাবলী কীর্তনের, প্রাচীন রীতির গর্বিত দৃষ্টান্ত হ'য়ে থাকার অহঙ্কারে-
কালিমা লেপনের অনেক বেহিসেবী প্রচেষ্টা, পাশ কাটিয়ে গিয়েও শেষতক বাঁচার পথ পায়নি।
আমাদের এই ঐতিহ্য ভুলে যেতে যেতে কিংবা সংস্কৃতির গলায় দড়ি দিতে দিতে,
সিংহাসন কিংবা স্বর্গে আরোহন সেতো নিজেকে বিকিয়ে দেবার ফন্দি-ফিকির মাত্র।

আমরা যতই ঘুমাতে চাই না কেন নাকে তেল দিয়ে, সেই তেল আসবেই ফিরে চামড়ায়:
আঘাত হয়ে, যন্ত্রণা বঞ্চনা হয়ে, আমাদের পারিবারিক প্রতিবেশের পরিচিত আঙিনায়।
আমাদের নিজস্ব গৌরবের আঞ্চলিক-ভাষা, একুশের ছলচাতুরীতে পরিণত হবে নিমেষেই,
শহীদ মিনারগুলো সব সাজানো আলমারির মতই মনে হবে শুকনো ফুলের সারিতে:
আমরা আর গান গাইব না, কবিতা লিখব না, বই পড়ব না, নাটক-সিনেমা দেখব না-
শুধু জি-বাংলার আঁচলে মুখ লুকিয়ে, সুড়সুড়ি খাব কোন রমণী আশ্লেষের ভুল নিরিখে।

তখন আমাদের রামুর পালা, আর কিনতে চাইবে না কোন সংস্কৃতির ফেরিওয়ালা,
মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্যের মতই, পিতৃপুরুষের গর্বের ধন হয়ে পড়ে থাকবে আমাদের মাটির উঠোনে,
অবহেলা আর অনাদরের অপমান সহ্য করতে না পেরে কাগজের দোকানে বেমালুম
সেরদরে বিক্রি হয়ে যাবে, আমাদের অহঙ্কারী আভিজাত্যকে অভিশাপ দিতে দিতে।

কাতুকুতু খাওয়া প্রেমিক-প্রেমিকা, পালাগানের দুনিয়া থেকে পালিয়ে বাঁচে,
কোথায় গিয়ে যে তারা নিষিদ্ধ মাদকতায়, মেতে ওঠে তার হদিস মেলা ভার।
গানের ফাঁকে ফাঁকে, শ্রোতাদের কেউ কেউ আলগোছে কেটে পড়ে,
পাশের বাড়ির ঘুলঘুলিতে, চুপিসারে গলায় ঢালে সাদা কিংবা রঙিন মদিরা,
টুংটাং শব্দের সম্ভ্রম বাঁচিয়ে চারিদিকের আলো-আঁধারিতে মোচ্ছব চলে অজান্তে।
আমড়া খেতে খেতে কোন কিশোরী, শুনতে চায় না আর কোন কবিয়ালের কণ্ঠস্বর,
সারাদিনমান ছটফট কোনো বাজারি অভিপ্রায়ে, চপল দৃষ্টিতে ডানে বাঁয়ে তাকায় নিরন্তর;
ফুটবল কোন প্রাগৈতিহাসিক বিনোদন মনে ক'রে, ক্রিকেট-খেলিতে কারচুপির ঢেউ তোলে
আমাদেরই কিশোরদল, আর সদ্য গোঁফ-ওঠা তরুণের আড্ডাবাজ আন্দোলন।

তখন শ্রীমন্ত নদী তার গতি বদল করার দুঃসাহস দেখায় গোপন বিদ্রোহে,
তখনও তার নজর এড়াতে পারে না রামুর গান নষ্টদের অধিকারে যাবার আয়োজন,
এই একটিই মাত্র সান্তনার আঁচল যার পরতে পরতে বাঁধা প'ড়ে গেছে ব'লে
আজও কোন যোগ্য সম্মানের প্রেমিকা খুঁজে পায়নি আমাদের এই পাশ্চাত্য-প্রেমিক পাঠশালায়।

মাঝে মাঝে কতিপয় ক্ষমতাশালীর অর্থনৈতিক আনুকূল্যে, প্রাণ পায় চিরায়ত গান-
ঢাকা শহরের ইট-কাঠ-পাথর তখন নিথর হ'য়ে শোনে জীবনের আঙিনায় যীশুর কাহিনীগীতি;
সব আয়োজনেই আন্তরিকতার অহেতুক আতিশয্য ছাপিয়ে, বড় হ'য়ে দেখা দেয়
মানুষের অবদমিত দম্ভের নির্লজ্জ সামাজিকতায় বোনা বেহুদা আস্ফালন।
আস্তে আস্তে বিদায় নেয় একান্ত স্বীকরণের বাণীদূর লোক-কবিদের সব সাদামাটা জীবনাচরণ,
নিঃশব্দে এগিয়ে যায় মৃত্যুর মর্মান্তিক মিছিলে, সমস্ত পিছুটান অনায়াসে ভুলে ফেলে।

অপমানহীন জীবন যাপনের ভীরু আর্তনাদ, পিছু ছাড়ে না শহুরে ভদ্রতার মুখোশ,
মুখগুলো যখন দূরে সরে যায়, তখন মুখোশের প্রতিই বাড়ে মানুষের আল্‌গা আদিখ্যেতা:
তাই ধর্মের চেয়ে ধার্মিকতাকে, বড্ড বেশি জায়গা ছেড়ে দিতে হয় হানাহানির আবশ্যিকতায়;
শুধুমাত্র মৌলবাদী আপোষের সীমানায় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে আনাগোনা আমাদেরও,
তখন শ্রীমন্ত নদীর সবুজাভ জল সহসাই কালো হ'তে শুরু করে বঙ্গোপসাগরের ঠিকানায়।
আর পরিচিত মাছগুলো উজানের তীর্থযাত্রা বন্ধ ক'রে দেয়
আমাদের পুরনো গীর্জার চূড়া দেখা যায় না ব'লে;
এক-সময় অনশন ধর্মঘটে নোনাজলের বালিতে চাপা প'ড়ে,
আহত অভিমানের আত্মহত্যা ক'রে মুক্তি পায়।

শ্রীমন্ত নদীর বুকে পালতোলা কোন নৌকা আর কখনও থামবে ব'লে মনে হয় না,
আজ গানের সুরে অসুর খেলা করে তার নিজস্ব কুকর্মের চিরাচরিত অভ্যাসে।
আমরা যারা আধুনিকতার আব্রু খুলে ঠুনকো সেক্যুলার সাজবার মেনিমুখো আন্দোলনে;
পাদ্রিশিবপুরকে 'শিবপুর' বানাবার দাবী তুলি তখন মনে হয় এই প্রতীতি জন্মাবার আগেই
আমাদের সামগ্রিক সম্ভাবনার সমূহ-মৃত্যু কামনা করি সতত।

তবুও আমরা আশায় বুক বাঁধতে পারি রামুর গানের বাণীকে শিরোধার্য করে,
আত্মত্যাগের মহিমায় মহিয়ান হ'তে চেয়ে জীবন বাজি রাখতে হয়;
কোন খেতাব বা সম্মানের কাঙালি আয়োজনে কাজ নেই কোন।
যদি বলতে পারি সমস্ত দাবী আর প্রত্যাশার তর্জনীকে উপেক্ষা করে;
এই নাও, সব প্রিয় খাবার- দোদল, বিন্দালু, মরিচ-টেঙা, পাত-খোলা কিংবা চর্চরি - সব নাও,
বিনিময়ে যদি পারো ফিরিয়ে দাও সেই রামুর পালাগান,
এই নাও, নরম কিংবা শক্ত যে-কোন পানীয়ের বিশাল ভান্ডার - সব নাও,
বিনিময়ে যদি পারো ফিরিয়ে দাও শ্রীমন্ত নদীর বান।
একটি গানের চরণ কিংবা একঘটি শীতল জল, প্রাণ-প্রবাহ দিয়ে সুরের মাধুরী নিয়ে ফিরে আসুক,
আমরা সবাই রামুর গানের সঙ্গে শ্রীমন্তর বানের সঙ্গে গলাগলি ধ'রে জড়াজড়ি ক'রে শু'য়ে থাকি।

এবার আসুন সবাই নিজেকে শুধু একটি প্রশ্ন করি;
'যে দেশে হিংসা, নিন্দা ও অবিশ্বাস নাই'- সেই দেশের নাম কি হ'তে পারে পাদ্রিশিবপুর?
যদি তা-ই হয়, তবে আসুন পূর্ব-পুরুষের প্রত্যয়ে নিজেদের সামিল ক'রে বলি, এই পাদ্রিশিবপুরে-
'মোদের মানব জনম সফল হল'।

পাদ্রীশিবপুরবাসীর জনসংখ্যা ও অভিবাসন: চ্যালেঞ্জ ও প্রত্যাশা

লেখক: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

॥ ক ॥ পাদ্রীশিবপুরবাসীর জনসংখ্যা ও অভিবাসন এর বর্তমান অবস্থা

"শ্রীমন্ত-বাটে পাদ্রীশিবপুর ঃ ঐতিহ্যগত একটি খ্রিস্টান জনপদ" শীর্ষক গ্রন্থের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার জন্য যারা পাদ্রীশিবপুর গ্রামে, পশ্চিমবঙ্গে (ভারত), চট্টগ্রাম, ঢাকা ও খুলনা ধর্মপ্রদেশে এবং প্রবাসে, অর্থাৎ কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে, জন্মগত অথবা বংশোদ্ভূত পাদ্রীশিবপুরবাসী বাস করছেন তাদের ওপরে একটি জরিপ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। "সম্পাদনা কমিটি" এই পরিকল্পনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। জরিপের জন্য বিশেষ ফরম এবং মতামত সংগ্রহের জন্য ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) প্রশ্নের সহায়তায় আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হয়। সাথে সাথে কিছু কিছু ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারেরও ব্যবস্থা নেয়া হয়। উপরোক্ত পদ্ধতির ফলাফল মূলত দ্বাদশ ভাগে – পরিশিষ্ট-১ অংশে বিশদভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যের প্রেক্ষিতে এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচনায় প্রথমত, আমরা অভিবাসীদের বর্তমান পরিস্থিতি উপস্থাপন করছি; দ্বিতীয়ত, তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে কী সব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছি তা উল্লেখ করার প্রয়াস পাচ্ছি এবং সাথে সাথে ভবিষ্যতের জন্য আমাদের প্রত্যাশা কী তা উল্লেখ করা প্রভৃতি হচ্ছে এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। উক্ত বিষয়ে এই গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। তবে প্রেক্ষাপট স্বরূপ পূর্বের দেওয়া কিছু পরিসংখ্যান ও মন্তব্য পুনরায় উল্লেখ করছি।

বিগত ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ১৮ সেপ্টেম্বর মাসে পাদ্রীশিবপুরে সারাদিন ব্যাপী একটি কর্মসূচিতে যে তথ্য পাওয়া গিয়েছিল তা নিম্নের ছকে তুলে ধরছি:

(১) ধর্মপল্লীর বাড়ি, ঘর ও জনসংখ্যার সারাংশ[২]

ধর্মপল্লীর নাম: পাদ্রীশিবপুর ওয়ার্ড নং = ১-৮ উপকেন্দ্র নং = ১-৩

১	২	৩	৪	৫	৬
ওয়ার্ড নং	বাড়ির সংখ্যা	ঘরের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	নিয়মিত বসবাসকারী সংখ্যা	উৎসবে বাড়তি সংখ্যা
১ নং	৭	১৯	২০	৪৯	১২৪
২ নং	১৩	১৭	১৭	৫০	১০৯
৩ নং	১৪	৪০	৪২	৪৯	২০২
৪ নং	২৫	৫৮	৬২	১৭৩	২০১
৫ নং	২৫	৪৬	৬০	১০৬	১৩৩
৬ নং	১৫	৩৩	৩৫	৯৫	৮৫
৭ নং	১৭	৪১	৩৬	১১১	৮৩
৮ নং	২১	৩৩	৩৫	৯৪	১৮৭
মোট ওয়ার্ড ৮	**১৩৭**	**২৮৭**	**৩০৭**	**৭২৭**	**১১২৪**
উপকেন্দ্র					
দেশান্তরকাঠি	৬	৭২	৭২	১৯৩	২০৪
রাজাবাড়িয়া	৫	২৫	২৭	৪২	১০৬
মাটিভাঙ্গা	১৩	৩০	৭২	৭৩	১৫৮
সোনাতলা	১৫	১৫	১৭	৬২	৯
মোট	*২৮*	*৪৫*	*৮৯*	*১৩৫*	*১৬৭*
উপকেন্দ্র-৪	**৩৯**	**১৪২**	**১৮৮**	**৪১০**	**৪৭৭**
সর্বমোট-১২	**১৭৬**	**৪৯২**	**৪৯৫**	**১১৩৭**	**১৬০১**

বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয়:

* পাদ্রীশিবপুর গ্রামে সর্বশেষ জরিপ অনুসারে ১৩৭ টি বাড়ি উল্লেখ করা হয়েছে: কয়েকটি বাড়ি ছাড়া অধিকাংশ বাড়ির নাম জমিদারি প্রথায় পেশা বা দায়িত্ব বা পর্তুগীজ নাম অনুসারে নামকরণ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি বাড়ির নাম উল্লেখ করা হল: জমিদার বাড়ি (মিশন), নায়েব বাড়ি, দারোগা বাড়ি, মোক্তার বাড়ি, পঞ্চায়েৎ বাড়ি, শিকদার বাড়ি, পণ্ডিত বাড়ি, পিওন বাড়ি, পোস্টমাস্টার বাড়ি, পেদা বাড়ি, চাপারাশি বাড়ি, হাওলাদার (হালদার) বাড়ি, তালুকদার বাড়ি, চৌকিদার বাড়ি ইত্যাদি। অন্য শ্রেণির বাড়ির নাম: সাহেব বাড়ি, ডি'সিলভা বাড়ি, জোলা বাড়ি, পারের বাবুর বাড়ি, আলিচান বাড়ি, পবরী বাড়ি, সান্তামারীয়ার বাড়ি, ভক্ত বাড়ি, কৈলু বাড়ি, মিস্ত্রি (মেস্তারা অর্থাৎ ধর্মশিক্ষক/কাটেখিস্ট) বাড়ি, বোচার বাড়ি, কৈলু বাড়ি, ইত্যাদি।
* আজও প্রচলিত একটি ধারণা আছে যে পাদ্রীশিবপুরে রয়েছে ৩৬০ ঘর খ্রিস্টান। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে বাস্তব জরিপে দেখা যাচ্ছে যে ঘরের সংখ্যা ২৮৭ এবং পরিবারের সংখ্যা ৩০৭ টি।
* আরেকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় যে পাদ্রীশিবপুর কেন্দ্রে সর্বদা স্থায়ীভাবে যারা বাস করে তাদের সংখ্যা মাত্র ৭২৭ জন। আর যারা বড় বড় উৎসবে বাড়ি আসে তাদেরকে গণনায় ধরলে ১১২৪ জনসংখ্যাতে দাঁড়ায়।

[২](তথ্যসূত্র: গ্রন্থ-সম্পাদনা কমিটি – পাদ্রীশিবপুর)

(২) প্রথম অভিবাসন থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিবাসন[৩]

পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টান জনগণ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মূলত কোন কোন জায়গায় তাদের অবস্থান দেখা যায়, সেই সব জায়গা উল্লেখ করে যে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তার একটি চিত্র নিম্নে দেওয়া হল। এই পরিসংখ্যানের মধ্যে আছে তিনটিরও অধিক বংশ যাদেরকে ১ম, ২য় এবং তৃতীয় অভিবাসন বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

১	২	৩	৪	৫	৮	৭	৯
পরিবার সংখ্যা	পাদ্রীশিবপুর অধিবাসী এবং অভিবাসী হয়ে গমন	প্রথম অভিবাসীদের সংখ্যা	ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৭-এর পূর্বে	পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-১৯৭১)	বাংলাদেশ আমলে (১৯৭১-অদ্যাবধি)	বর্তমান অধিবাসীদের সংখ্যা	অন্যত্র চলে গেছে
৯০	ভারতে পাদ্রীশিবপুর বাসী	১৫৪ ১১%	৬৪ ৫%	২৪ ২%	৭ ০.৫%	১৩৮৩ ১০০%	১৫৪ ভারতে ১৩%
২৩৬	চট্টগ্রামে অভিবাসী	১৭০৭ ১০০%	১১ ০.৬%	৯৭ ৬%	১২৪ ৭.৪%	১০২৮ + ৬৭৯ = (২৩২+৪৪৭)	২৩২ (৩৪%) বিদেশে: দেশের মধ্যে ৪৪৭ (৬৬%)
১৮	খুলনাতে অভিবাসী	৭৫	০	১৭	১	৫৭	১৮ অন্যত্র ১.২%
৩৮১	ঢাকাতে অভিবাসী	১৫২৪ ১০০%	৯ ০.৬%	৯৪ ৬%	১০৪ ৮%	১২৪০ ৮১%	২৮৪ বিদেশে ২৩%
৯৫	যুক্তরাষ্ট্র	১৭৩	৮	৬৫	২২	৩০৮	০
৮০ ১৭৫	কানাডা মোট	১৪৯ ৩২২ ৫৯%	১০ ১৭ ৩%	৫৬ ১২১ ২২%	১৪ ৩৬ ৬%	২৫১ ৫৫৯ ১০০%	০
২৫	অষ্ট্রেলিয়া+এশিয়া মধ্যপ্রাচ্য+ইউরোপ	৭৪				৭৪	৭৪ বিদেশে ৬%
৯১৯	সর্বমোট	৩৮৫৬ ১০০%	১০১ ৩%	৩৫৩ ৯%	২৭২ ৭%	৪২৬৭ - ৪১১ ৩৮৫৬	৮০৬ জন (১৯%) প্রথম অভিবাসী

বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয়

* ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগে, অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে পাদ্রীশিবপুরবাসী যারা কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতে বসবাস করছিলেন তারা কিন্তু অভিবাসী হয়ে সেখানে যায়নি। দেখা যাচ্ছে যে, কলকাতাতে পাদ্রীশিবপুর অধিবাসী পরিবারের সংখ্যা ছিল ৯০ টি এবং জনসংখ্যা ছিল ১৫৪ জন এবং তাদের জনসংখ্যা বর্তমানে হচ্ছে ১৩৮৩ জন। তবে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৬৪ জন (৫%) ব্রিটিশ আমলে কলকাতা অবস্থান করছিল; পাকিস্তান আমলে ২৪ (২%) জন এবং বাংলাদেশ আমলে ৭ জন (০.৫%) অভিবাসী। বাকীরা সবাই অর্থাৎ ১২৯২ (৯৩%) ভারতে জন্মগ্রহণ করেছে (এর সবাই দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্মের সন্তান-সন্ততি)।

[৩] (তথ্যসূত্র: গ্রন্থ-সম্পাদনা কমিটি – পাদ্রীশিবপুর)

* পাদ্রীশিবপুর থেকে চট্টগ্রামে প্রায় ২৩৬ টি পরিবার অভিবাসনে চলে গেছে এবং জনসংখ্যায় তারা ছিল ১৭০৭ জন। লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, সেই সংখ্যা থেকে ৩৮৫ জন (৩২%) দেশের মধ্যে অন্যত্র চলে যায়। আর চট্টগ্রাম ও ঢাকা যৌথভাবে ২৯৪ জন (২৪%) আবার দ্বিতীয় অভিবাসন করে প্রধানত আমেরিকা ও কানাডা চলে গেছে।
* পাদ্রীশিবপুর থেকে ঢাকাতে যারা অভিবাসী হয়ে চলে গেছে তাদের সংখ্যা ১৫২৪ জন কিন্তু তার মধ্য থেকে ২৮৪ জন (২৩%) বিদেশে চলে গেছে।
* লক্ষ্য করা যায় যে, পাদ্রীশিবপুর থেকে ১৮ টি পরিবার খুলনা ধর্মপ্রদেশের বাসিন্দা হয়েছে, যাদের মোট সংখ্যা ছিল ৭৫ জন। তাদের মধ্যে ১৮ জন লোক (১.২%) দেশের অন্যত্র চলে যায়)
* পাদ্রীশিবপুর ও চট্টগ্রাম থেকে ৩৮১ টি পরিবার ঢাকাতে অভিবাসন করে যাদের সংখ্যা ১৫২৪ জন। তাদের থেকে ২৮৪ জন (২৩%) প্রধানত বিদেশে চলে গেছে।
* বাংলাদেশ থেকে ২৫ টি পরিবার বা একক ব্যক্তি যার সংখ্যা ৭৪ জন, তারা অষ্ট্রেলিয়া, এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপে চলে গেছে যারা ছিল পাদ্রীশিবপুরের আদি বাসিন্দা।
* পাদ্রীশিবপুরের সর্বমোট অভিবাসী ৩৮৫৬ জন। এই সংখ্যা থেকে কোলকাতায় ১৫৪ জন (৪%), চট্টগ্রামে অভিবাসী ১৭০৭ (৪৪%), খুলনায় অভিবাসী ৭৫ জন (২%), ঢাকাতে অভিবাসী ১৫২৪ জন (৪০%); বিদেশে ৩৯৬ জন (১০%) যার মধ্যে আছে পাদ্রীশিবপুর + অন্যান্য জায়গা থেকে।
* পাদ্রীশিবপুর-অভিবাসী থেকে যারা নতুন প্রজন্ম হয়ে পাদ্রীশিবপুর বংশোদ্ভূত অভিবাসী হিসেবে বিদেশে অবস্থান করছে তাদের সংখ্যা হল: ৪১১ জন।

(৩) পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টভক্তদের সামগ্রিক পরিসংখ্যানের সার-সংক্ষেপ

বিগত শতবর্ষ মেয়াদকালে ১৯২২-২০২৩ খ্রি. পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের জনগণের কয়েকটি বিশেষ পরিসংখ্যান সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরছি:

* পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে বিগত একশত বছরে দীক্ষিতদের ক্রম-যুক্ত সংখ্যা হচ্ছে: ৫৩৯৬ খ্রিস্টভক্ত।
* পাদ্রীশিবপুরে বর্তমানে (২০২৪ খ্রি) স্থায়ী বাসিন্দাদের সংখ্যা: উপকেন্দ্রসহ ১১৩৭ জন এবং কেবলমাত্র পাদ্রীশিবপুরে স্থায়ী ভাবে বাস করে ৭২৭ জন।

॥ খ ॥ পাদ্রীশিবপুরবাসীর অভিবাসন সমীক্ষা

অভিবাসন বিশ্বের মধ্যে একটি প্রধান যুগলক্ষণ। মানুষ আর এক জায়গায় বসবাস করে না। অভিবাসনের কারণে অনেক আদি বাসভূমি বা জনপদ আজ শূন্য হয়ে গেছে আবার সৃষ্টি হয়েছে অনেক নগর ও জনপদ। অভিবাসনের প্রভাব প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় এবং এই ক্ষেত্রে পাদ্রীশিবপুরের মতো একটা ঐতিহ্যবাহী জনপদও ব্যতিক্রম নয়।

পাদ্রীশিবুরবাসীরা কেন তাদের নিজস্ব গ্রাম, ভিটা-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন. ইত্যাদি ত্যাগ করে পাদ্রীশিবপুর থেকে অন্যত্র চলে গেছে এবং সেখান থেকে আবার দেশের ভেতরে অন্যত্র অথবা দেশের বাইরে প্রবাসী হয়ে চলে গেছে।

(১) কলকাতায় অবস্থান করার কারণসমূহ

পাদ্রীশিবপুরবাসীদের অভিবাসন বিষয়ে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই কলকাতায় যারা বাস করছে তাদের কথা বলতে হয়। ভারত-পাকিস্তান বিভাগের সময় পাদ্রীশিবপুরবাসী অনেকেই পশ্চিমবঙ্গে রয়ে গেছেন। তাদের সংখ্যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কারণগুলো কী ছিল? প্রথমত জীবিকা অর্জনের জন্য। চাকরির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা এবং নিজের ব্যক্তিগত খরচ বহন করা এবং পরিবারকে সহযোগিতা করা। এছাড়া বেশ কিছু মানুষ কলকাতায় রয়ে গেছেন বা এসেছেন উন্নতমানের শিক্ষা গ্রহণের জন্য। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন তারা যাদের পিতারা বা নিকট আত্মীয়রা কলকাতায় চাকরি করতেন; তাই তাদের সন্তানদের এই কলকাতায় কোন আবাসিক শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি করে পড়াশোনা করাতেন। আবার কিছু কিছু অভিভাবক তাদের সন্তানদের বিবাহ প্রদানের জন্য ভারতবর্ষে তথা কলকাতায় এসেছিলেন। আবার কেউ কেউ বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে এই কলকাতাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

এক শ্রেণির মানুষ সুচিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসতেন বা এখনও আসেন। পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ আমলে যারা ভারতবর্ষে এসেছেন এনাদের মধ্যে সেই সময় বেশি সংখ্যক মানুষই ভারতবর্ষে তথা কলকাতাতে বিনা পাসপোর্টে প্রবেশ করেছিলেন। অনেকে মনে করেন যে বাংলাদেশে স্বাধীনতার আগে বা স্বাধীনতার পরেও সমাজে মহিলাদের নিরাপত্তার অভাব ছিল। সেই কারণে বেশ সংখ্যক মহিলাদের বা তাদের অভিভাবকগণ তাদের কন্যা সন্তানদের এই পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে এসে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখেছিলেন।

ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতবর্ষে বা কলকাতা এসে থাকা বা সঠিক চাকরি পাওয়া বা ন্যায্য মজুরি পাওয়া এবং চলনসই জীবনযাপন করা, এই সকল বিষয়গুলি বেশ চ্যালেঞ্জেরই ছিল। যারা দেশ ভাগ হওয়ার সময়ে ভারতে রয়ে গেছেন তাদের একটা বিরাট ত্যাগস্বীকার করতে হয়েছে। জমিজমা ও সম্পত্তির সব হারিয়েছে; নিজেদেরকে শূন্য থেকে শুরু করতে হয়েছে। তাদের সবকিছু পাদ্রীশিবপুরে রেখে যাওয়া এবং কোন অধিকার দাবি না করাটা ছিল তাদের আপন আপন পরিবারের প্রতি বিরাট ত্যাগস্বীকার ও অবদান।

(২) পাদ্রীশিবপুর থেকে অন্যত্র অভিবাসী হওয়ার কারণ কী

বিগত শতাব্দীর সত্তর ও আশি'র দশকে পাদ্রীশিবপুরে কর্মসংস্থানের খুব একটা সুযোগ ছিল না। মূলত ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যই পাদ্রীশিবপুরের মানুষ দেশের বিভিন্ন এলাকায় অভিবাসী হয়েছে। কেউ কেউ বদলিজনিত কারণে হয়েছে অভিবাসী, যারা মূলত সরকারী চাকুরিজীবি ছিলেন। উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যেও একটি বড় অংশ অভিবাসী হয়েছে। কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে এসে অনেকে সেখানেই থেকে গিয়েছে, এমন সংখ্যাও আছে। আবার কেউ কেউ বিভিন্ন মিশনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করার উদ্দেশ্যেও চট্টগ্রামে এসেছেন। যে সময়টায় ব্যাপকহারে অভিবাসন ঘটেছে, সেই সময়ে তুলনামূলকভাবে কর্মসংস্থানের বেশি সুযোগ ছিল সেখানে। অভিবাসনের জন্য আরও কিছু কারণ উল্লেখ করা যায়, যেমন: জীবিকা নির্বাহ, শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, নিরাপত্তা, বৈবাহিক বন্ধন, পারিবারিক সমস্যা, সামাজিক নিরাপত্তা (চুরি, ডাকাতি), ইত্যাদির কারণে পাদ্রীশিবপুর ছাড়তে হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে স্থায়ীভাবে থাকার উদ্দেশ্য নিয়ে পাদ্রীশিবপুর নিবাসীরা বাংলাদেশের অন্যত্র চলে যায় নি।

কিন্তু, শিক্ষা-দীক্ষা, কর্মসংস্থানের স্থায়িত্ব, নতুন আর্থিক সম্ভাবনা শুরু হওয়ায় অনেকে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছে এবং প্রিয়জনদের বাড়ী থেকে চট্টগ্রাম, ঢাকা ও খুলনাতে নিয়ে এসেছে।

(৩) অভিবাসী হওয়ার সুফল ও কুফলসমূহ[৬]

বিভিন্ন আলোচনায় যে বিষয়গুলো সুফল ও কুফল হিসেবে জনগণ ব্যক্ত করেছে তা হল নিম্নরূপ:

সুফল: শিক্ষার হার বৃদ্ধি, আর্থিক উন্নতি, বৃহত্তর ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের সুযোগ, জীবনযাত্রার উন্নতি, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, সুসম্পর্ক, সংলাপ, শিক্ষা অর্জন, সম্প্রীতি, নেতৃত্ব তৈরি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সুচিকিৎসা, পদমর্যাদা লাভ, সামাজিক উন্নয়ন, স্থানীয় লোকদের সাথে বৈবাহিক সূত্রে নতুন পরিবার গঠন ইত্যাদি।

কুফল: দেশে অনেক বাড়ি ফাঁকা পড়ে আছে, যৌথ পরিবারের বিলুপ্তি, আত্মীয়তার বন্ধন শিথিল, নতুন প্রজন্মের মধ্যে অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, যাতায়ত না থাকায় অনেকে বাড়িতে কৃষি জমি হারাচ্ছে, গ্রামীণ আন্তরিকতা হ্রাস, দেশের বাড়িতে আনাগোনা কম, পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন, ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে, গ্রামের জমি/সম্পত্তি হারাচ্ছে, গ্রামীণ আন্তরিকতা শহরে নেই, গ্রামের বাড়িতে যাওয়া আসা কমে যাচ্ছে, যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি, শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া, ভাষাগত বৈষম্য, সহানুভূতির অভাব, বর্তমান ঠিকানায়/স্থানে নিজস্ব স্থায়ী বাসস্থান তৈরি করতে না পারা, ভিন্ন ধর্মের সাথে সম্পর্ক (মিশ্র-বিবাহ), স্বার্থপরতা বৃদ্ধি বা একতার অভাব, মাদকাসক্তি (মাদকের সহজলভ্যতার কারণে) ইত্যাদি।

॥ গ ॥ অভিবাসীদের চ্যালেঞ্জসমূহ:

বিশদ আলোচনায় না গিয়ে অতি সংক্ষেপে পাদ্রীশিবপুর-অভিবাসীরা যে চ্যালেঞ্জ অনুভব করছে তা কয়েকটি মোটা দাগে নিম্নে চিহ্নিত করা যায়:

(১) অভিবাসীদের শিক্ষা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ: ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পেতে ও মান-সম্পন্ন শিক্ষা লাভ করতে এবং চাকরিরত বাবা-মা, ভাই-বোনদের সাথে একত্রে বাস করে শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য পাদ্রীশিবপুর ছেড়ে শহরের দিকে ধাবিত হয়েছে। পূর্বে আশে-পাশে তেমন কোন কলেজ ছিল না, এখন পাদ্রীশিবপুরে মিশনেই তার সুযোগ আছে। কিন্তু নানা কারণে শহরে চলে যাচ্ছে। শহরের শিক্ষা ব্যয়সাপেক্ষ, পরিবেশ অনেক সময় নেই, যাতায়তের দূরত্ব বেশি, ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ কম, শিক্ষার জন্য ত্যাগ, ধৈর্য, কষ্ট, মেধার অভাব বা তার বিকাশের অভাব, প্রতিযোগিতাপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশ, শহুরে জীবনযাত্রার ধরন ভিন্ন, মাদকাসক্তির সম্ভাব্যতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও অভিভাবকদের নিয়ন্ত্রণ কম, ইত্যাদি। এই সবকিছু অনেকে সামলে নিয়ে পড়াশুনা চালিয়ে গিয়ে সফল হয়েছে আবার অনেকে পিছিয়ে পড়েছে। পাদ্রীশিবপুর নিবাসীদের শিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য নেই। আজ পর্যন্ত মাত্র দুইজন পিএইচডি করতে পেরেছেন। বিসিএস পাশ করা মাত্র দুইজন আছে। নানা কারণে হতে পারে যুক্তিগত কারণে, শিক্ষা ছেড়ে দিয়েছে এবং চাকরি বা ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রবেশ করেছে কিন্তু তার জন্য প্রয়োজনমাফিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে নি।

[৬](তৃতীয় ভাগ-এ আলোচিত হয়েছে)

২) **অভিবাসীদের কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ:** আপাতত লক্ষ্য করা যায় যে, যারা কর্মসংস্থানের কারণে অতীতে এবং বর্তমানে বাংলাদেশের মধ্যে অভিবাসী হয়ে আছে তারা অনেকে চাকরি করছেন এবং তাদের কর্মসংস্থান হচ্ছে। কিন্তু অনেকে আছে মানসম্মত চাকরি পাচ্ছেন না, পেশাজীবনকে উন্নত করতে পারছেন না, পেশাজীবনের দক্ষতা তারা অনেকেই অর্জন করতে পারেন নি। তবে কিছু সফলতা দেখা যাচ্ছে এবং স্বউদ্যোগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে প্রবেশ করে আর্থিক দৈন্যতার উত্তরণ ঘটিয়েছে। তবে ভবিষ্যতে পেশার জন্য যদি প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করা না হয়, তাহলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে টিকে থাকা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকবে।

৩) **আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের চ্যালেঞ্জসমূহ:** পাদ্রীশিবপুরের গ্রামীণ পরিবেশ থেকে শহুরে জীবনে প্রবেশ করা অনেক চ্যালেঞ্জপূর্ণ। অতীতে ও সাম্প্রতিককালেও দেখা যায় যে, আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের প্রাথমিক চ্যালেঞ্জগুলো সফলতার সাথে মোকাবেলা করে, পাদ্রীশিবপুর অভিবাসীরা সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনযাপন সঠিকভাবে করে আসছে এবং তাদের সাক্ষ্য অনেকের সামনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। অভিবাসীরা আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন রক্ষা করার জন্য এবং সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থা সংগঠন স্থাপন করা হয়েছে এবং নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পরস্পরকে সেবা করে আসছে। তবে বর্তমানের চ্যালেঞ্জসমূহ বহুমাত্রিক ও বিস্তৃত হওয়ায় সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন অনেক ভাবে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। বিক্ষিপ্ত আবাসন, যাতায়াতের দূরত্ব ও খরচ, শিক্ষা-ব্যয় বৃদ্ধি ও পরিবেশের অবনতি, কর্মব্যস্ততা, একত্রে সমবেত না হওয়ার নানা কারণ, ধর্মশিক্ষার অভাব, খ্রিস্টযাগে নিয়মিত যোগদান না করা, ধর্মানুশীলনের প্রতি অনীহা ও উদাসীনতা, পারিবারিক প্রার্থনার অভাব, অনৈতিক জীবন, পরিবারে ভাঙ্গন, নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সুনেতৃত্বের অভাব, পারস্পরিক সম্পর্কের অভাব, মাদকাসক্তি বৃদ্ধি, পাদ্রীশিবপুরের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক হ্রাস পাওয়া, নতুন প্রজন্মের পাদ্রীশিবপুরের সাথে যোগাযোগ অনুভব না করা ইত্যাদি।

॥ ঘ ॥ ভবিষ্যতের জন্য প্রত্যাশা ও সুপারিশ

অভিবাসনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করার জন্য এফজিডি আলোচনা ও নানা লেখালেখিতে যে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাশা ও সুপরিশ উল্লেখ করছি:

(১) গ্রামীণ পরিবেশে খ্রিস্টান হওয়া আর নগরে বা মহানগরে খ্রিস্টান হওয়া বা খ্রিস্টীয় জীবনে বিশ্বস্ত থাকা একই নয়। প্রথমত, পাদ্রীশিবপুরের প্রত্যেক অভিবাসীকে একটি বিষয়টি সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। নগরে বা মহানগরে খ্রিস্টান থাকা বা হওয়ার জন্য প্রত্যেককে একটা ব্যক্তিগত ও দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং সেই সিদ্ধান্ত রক্ষা করার জন্য কষ্ট ও ত্যাগস্বীকার করে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সচেতন হতে হবে যে, অভিবাসনের অবস্থায় তারা যিশুর শিষ্য, তারা যেখানে আছে যিশু তাদেরকে সেই অবস্থানে মিশনারী রূপে প্রেরণ করেছেন।

(২) গির্জার কাছে বাস করা অথবা গির্জা থেকে দূরে বাস করা সেটা বড় কথা নয়। পিতামাতা ও সন্তান উভয়ের জন্য একান্ত প্রয়োজন হচ্ছে প্রতি ঘরে যেন প্রার্থনা ও ঐশবাণী পাঠ করা হয়। সমবেতভাবে একসঙ্গে প্রার্থনা না করতে পারলেও, ব্যক্তিগত জীবন যেন প্রার্থনা শূন্য না হয়।

পাদ্রীশিবপুর-অভিবাসীদের একটি প্যারিশের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে এবং সেখান থেকে প্রদত্ত সেবাগুলো যেমন, ধর্মশিক্ষা, সংস্কার গ্রহণ, পার্বণোৎসবের মিলন, গঠন প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি গ্রহণ করা।

(৩) পাদ্রীশিবপুর অভিবাসীদের দ্বারা পরিচালিত অথবা যে প্যারিশের আওতায় তারা বাস করে সেখানকার সামাজিক সংগঠন ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো অভিবাসীদের জন্য একান্ত প্রয়োজন। কাজেই প্রয়োজন অনুসারে কোন না কোন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকা এবং প্যারিশের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা উচিত। সমাজ ছাড়া অভিবাসীরা একাকীত্ব অনুভব করবে, মণ্ডলীর সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং এভাবে একদিন বিশ্বাস না হারালেও খ্রিস্ট বিশ্বাস ও খ্রিস্টান সমাজের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়বে।

(৪) পাদ্রীশিবপুর অভিবাসী হয়ে যারা বসবাস করছে তাদের কিছু করণীয় আছে বলে অভিবাসীরা মনে করেন। প্রথমত পাদ্রীশিবপুর নিবাসীদের প্রতি তাদের পরামর্শ: স্থানীয় খ্রিস্টভক্তরা জায়গা সম্পত্তি নিয়ে যেন পরস্পরের মধ্যে মামলার মকোদ্দমায় জড়িয়ে না পড়ে; স্থানীয় ভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে; খ্রিস্টানরা যেন অন্য ধর্মের মানুষের কাছে জমি-বাড়ি বিক্রি করে গ্রামে যেন তাদের বসতি স্থাপনের সুযোগ করে দেয়া না হয়; কম মূল্য পেলেও গ্রামবাসীরা যেন খ্রিস্টানদের কাছে জমি বিক্রি করে। যারা অভিবাসী তাদের করণীয় বিষয় হচ্ছে: বাড়ির সঙ্গে পরিবারের সকলকে নিয়ে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা, শিক্ষা, নিরাপত্তা, দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করা, একতা বজায় রাখা ও পারিবারিক বন্ধন বৃদ্ধি করা, গরিব পরিবারে আর্থিক সাহায্য দান করা, উৎসবের সময় ও সুখে দুঃখে পাদ্রীশিবপুরের জনগণের সাথে মিলিত হওয়া, ধর্মপল্লীর সাথে সংযুক্ত থেকে মাণ্ডলীক কাজে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, সংগঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কাজ করা।

(৫) পাদ্রীশিবপুর লোকদের অভিবাসনের গতি ও হাল বিবেচনা করে, বিভিন্ন কথাবার্তায় প্রকাশ করা হয়েছে যে, পাদ্রীশিবপুর থেকে যারা উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত অভিবাসী আছে তারা যেন পাদ্রীশিবপুরে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়িক কিছু উদ্যোগ ও বিনিয়োগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর ফলে গ্রাম মেধাশূন্য হবে না, সমাজে নেতৃত্ব দেওয়ার লোকজন বসবাস করবে এবং তাতে পাদ্রীশিবপুরের ঐতিহ্যবাহী জনপদ একেবারে শেষ হয়ে যাবে না।

(৬) পাদ্রীশিবপুরবাসী যেখানেই বাস করুক, তারা যেন তাদের ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য অনেক আগ্রহী হয়। পাদ্রীশিবপুরবাসীর শিক্ষিতের হার ১০০%। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তবে সরকারি চাকুরির জন্য বি.সি.এস পাশ করা, কারিগরি শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন করা এবং পেশাদারী যোগ্যতা অর্জন করা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

পরিশেষে পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের ঐতিহ্যবাহী জনপদ সংরক্ষণ করার দায়িত্ব স্থানীয় খ্রিস্টভক্তদের যেমন পাদ্রীশিবপুর অভিবাসীদেরও তেমনি। এটা হতে হবে সম্মিলিত প্রচেষ্টা। আজ যারা অভিবাসী হয়ে, হতেও তো পারে, তারা একদিন ওখানেই পুনরায় বসতি স্থাপন করবে। সুতরাং এই লক্ষে পাদ্রীশিবপুর নিবাসী, পাদ্রীশিবপুর অভিবাসী এবং পাদ্রীশিবপুর প্রবাসী সকলে মিলে পাদ্রীশিবপুরকে শক্তিশালী, স্থায়ী, স্বাবলম্বী ও সম্পদশালী করে তোলার দায়িত্ব সকলের।

External Migrants of Padrishibpur: Canada and USA

Dr. Mary Monica Gomes
Toronto, Canada

Nota Bene: Below are some significant findings summarized from the detailed study presented in Part Four on External Migration of the Padrishibpurians, Written by Dr. Mary Monica Gomes, Toronto, Canada.

1. Pattern and history of migration from Padrishibpur to urban centers and other countries

The study on 'External Migrants of Padrishibpur: Canada and USA' is part of the narrative of the historical Christian settlement of Padrishibpur that grew up on the banks of the river Srimonto over the past three hundred or more years ago that is described in the book titled, 'Srimonto-Bate Padrishibpur: Legacy of Christian Inhabitants'.

The study looked at the pattern and history of migration through a series of surveys, focus group discussions and interviews conducted with present day migrants in these countries from November 2023 to July 2024. The study showed that dispersion of local inhabitants from Padrishibpur to other cities and urban centers have occurred throughout its history. When traveling was difficult and modes of transport were few and slow, people only went as far as cities and urban centers which were close-by or within the country. But, with the expansion of modern means of transport, population dispersion and migration happened more widely.

Surveys conducted on Padrishibpurians (defined as people with origins or roots in Padrishibpur) currently living in Canada and USA have shown that most of them are second or third generation migrants, whose parents or grandparents were the original migrants who travelled out of their village home in search of better opportunities in jobs, education or living standards in cities within or outside the country such as Dhaka, Chittagong (Chattogram), Khulna and Calcutta (Kolkata). Many family members from these groups later moved to other countries, particularly to USA and Canada. The surveys traced the journey of the migrants and their families out of Padrishibpur, the highlights of which are given below.

2. Survey information highlights – Canada versus USA Migrants

a) Number of family heads & family members with Padrishibpur roots in CA & USA

The surveys showed that 80 family heads who were residents/citizens of Canada, and 95 family heads who were residents/citizens of USA had direct roots or origins in Padrishibpur, being either son/daughter or grandson/granddaughter of their parents or grandparents originally residents of Padrishibpur. Along with their spouses, children,

children's spouses and grandchildren, these families have increased to 251 members in Canada (mostly living in Toronto, Montreal & other places) and to 308 members in USA (living in New York, Connecticut, Maryland, Virginia, California & other places).

- Total No. of family heads who are currently residents = CA 80; USA 95
- Total No. of family members of migrants now (family head, spouse, children, children's spouses, grandchildren) = CA 251; USA 308
- Total No. of original migrants (family head, spouse, children) = CA 149; USA 173

b) Period of migration from Padrishibpur and their destinations

From among those who migrated out of Padrishibpur, the data was categorized in the following manner:

- o A = those who left Padrishibpur during British period (before 1947) = CA 10 families; USA 8 families
- o B = those who left Padrishibpur during Pakistan period (1947-1971) = CA 56 families; USA 65 families
- o C = those who left Padrishibpur since Bangladesh (after 1971) = CA 14 families; USA 22 families

c) Place where family head migrated to, from Padrishipbur

- o Dhaka = CA 44; USA 69
- o Chittagong = CA 25; USA 22
- o Barishal, Khulna, Padrishibpur, Noakhali = CA 5; USA 3
- o Calcutta = CA 6; USA 1

d) Migration to Canada/USA – how long they have resided in Canada/USA

- o A= 30 years & above = CA 42 families; USA 27 families
- o B= 10 years & above = CA 23 families; USA 51 families
- o C= less than 10 years = CA 15 families; USA 17 families

e) Different generations of migrants in Canada and USA

- o No. of 1st generation migrants = CA 9; USA 12
- o No. of 2nd generation migrants = CA 43; USA 39
- o No. of 3rd generation migrants = CA 27; USA 44
- o No. of 4th generation migrants = (mostly living with parents)

Among the migrant families in Canada, 56 had ancestors or family members who left Padrishibpur during Pakistan period and settled mostly in Dhaka (44 families) and Chittagong (25 families). During Bangladesh period most of them migrated to Canada, USA and other places.

Among the families in USA, 65 had ancestors who left Padrishibpur during Pakistan period, and 22 families left during Bangladesh period. Of these, 69 families settled in Dhaka, while 26 families settled in Chittagong and other places.

The number of first generation migrants who came to Canada or USA directly from Padrishibpur was comparatively very low, only 9 in Canada and 12 in USA. In Canada 4 of the first generation migrants came here more than 30 years ago, while the most of the other first generation migrants came to Canada and USA more recently.

Second generation migrants, whose parents migrated out of Padrishibpur and settled in different cities and urban centers in Bangladesh or India, and their children migrated to Canada and USA, was quite high. The number of 2nd generation migrants in Canada was the largest group of 43 family heads, while in USA also it was high with 39 members.

The third generation migrants are mostly the grandchildren of the first migrants who left Padrishibpur and settled in different cities and urban centers in Bangladesh or India. Their parents lived in Dhaka, Chittagong, Khulna, and Calcutta from where they migrated to Canada and USA. The number of 3rd generation migrant family heads in Canada is 27, while in USA, this generation constituted the largest group of migrants with 44 members.

3. Life of the Migrants: struggles, achievements and learnings

The early migrants came to Canada and the USA mostly in the 1970s and 1980s. Among the reasons they cited for migrating to a foreign land were: i) better life and job opportunities, ii) education and future of next generation, iii) civil unrest, political upheaval and war in Bangladesh, iv) religious-based discrimination against minorities. Others mentioned the deteriorating conditions and situation in the village including economic hardships, breakup of village-based life and social structure, and loss of hope in a better future.

Those who had left behind their village home and their native country had a lot of nostalgic memories of life, festivities, traditional celebrations and rituals that reaffirmed that the migrants had a very strong bond and link with their roots and culture. They talked of their heritage and history that they would like to uphold and pass on to the next generation.

Migrants felt that their biggest sacrifice was to leave their parents, family and home; and having lived in one land and culture they had to start from zero in a new land. Many had to live in difficult circumstances such as living in basements, cramped quarters, sharing apartments, doing odd jobs in order to establish themselves. They had to gain Canadian or American job experience, skills training, language skills and other qualifications. They also mentioned the bitter cold winters and hard life, having no household help or extended family members to share in the housework, and competing in the workforce with local people who were better equipped with education and skills.

Their biggest achievement they felt was being able to come to a new land, being part of a developed world lifestyle, having access to clean water and air, having security, no political unrest. They had a feeling of a sense of security in social welfare opportunities and facilities, having rights, and having a voice. The young adult migrants who have now established themselves described that with appropriate education, skills training, and job experience many have moved to management positions with job satisfaction and comfortable lives. They were able to settle down and build and support their new family life. Their goals are that their new generation gets good education in different fields and jobs that will lead to better life. Their aspirations are mostly to lead a stable job and comfortable life and for their future generation to be successful too.

Among the new behaviors, attitudes, skills that they learned were the following:

- Wearing clothes that are culturally and weather appropriate, not sarees or shalwar kameez, or lungi, but wearing pant, shirt, dress.
- Food and cuisine habit changes, children preferring fast food and eating out
- Learning English, French and other language skills, driving, work-related skills
- New social norms and etiquette such as respecting privacy, taking permission before going to others' homes, giving children space and respecting their wishes, no physical punishment of children, accepting influence of friends and society on the children
- Following work ethics, social policies and rules, including health insurance, taxation
- Accepting modern and liberal social values, inter-cultural and inter-religious marriages of children, divorce, civil unions, respecting diversity and being non-judgmental

4. New generation migrants' vision for the future: Community and family values along with cultural diversity, multiple perspectives and freedoms

The young generation of migrants appreciate that the people from Padrishibpur are very connected, community-based and family-based, and stays in touch with each other. The Bengali Christians are strong believers in church and stay connected with religious leaders. In Canada, the Padrishibpur community is still very observant of religious and social functions and events and the younger generation are associated with these. Thus, they want to keep these values, carry on these traditions for the future, and build on them from their own experiences.

Comparing the value systems of the two cultures in their lives, the migrants highlighted those that they feel are needed in the modern days and would like to see their next generation carry them on:

a) Family values: From their motherland, the migrants carry strong family values that they want to pass on. They value the connectivity, friendliness and hospitality values of our culture.

b) Bangla language and culture: The migrants cherish their own Bangali culture and history, festivities, songs, instruments, Bangla Mass and choir. Christmas pithas, kirton, dodol. They feel that their children are deprived of Bangla culture, and this will create a vacuum in their minds of all that their ancestors had learned throughout the ages and passed on to them. They speak Bangla with children in the homes to teach them their language. They observe Pohela Boishakh and other cultural festivities.

c) New values they appreciate: In their new country, the migrants cherish their freedom, having a voice, traveling freely, especially women's freedom. Our culture values maintaining bond, connection with family, but places less emphasis on women's rights and freedom. In this country, diversity is appreciated and accepted and this value should be promoted.

5. Conclusion

In their new land and culture, the migrant young generation has developed a new vision for their future that blends some of their traditional values with new attitudes, skills and viewpoints. They are placing more emphasis on getting higher incomes, openness to entrepreneurship, the skill and ability to understand humans, and to

understand the 'why' behind everything. They want to have high aspiration, to develop better skills and to do better. However, they also placed importance on being happy and having better mental health along with material wealth.

The young generation recognizes that they are a community of migrants from another culture, and it takes time to accept that some of their values are different. However, the sense of community is very important to them. While they bask in the freedom of a new country and opportunities, they are equally determined to work hard, blend into the culture that accepted them, accept norms and values that are needed for a modern lifestyle. But, their grounding in the values of their homeland culture, and their appreciation of their traditional food, clothing, festivities and rich heritage, give hopes that the migrants will continue to enrich their new land with a blend of their traditional values and lifestyle and new modern era perspectives and knowledge. They hope for a bright future for the coming generations!

Having crossed great distances from the tiny village of Padrishibpur in Bangladesh to the most modern and developed countries in the world, Canada and USA, the migrants have experienced a life-changing shift which they described in this study. While they faced many challenges in adjusting to this new lifestyle, they met all the adversities with a brave spirit and determination to succeed. Amid all this, the spirit that kept them going was the heritage of their homeland and the values that were inculcated in them through their religion, culture, and their strong family bonds of collective strength and unity. Their optimism and willingness to discover and explore is the foundation upon which the migrants have successfully accepted and adjusted to a new life in distant lands, while holding dear all the wonderful values and memories they brought with them from their dear motherland!

পাদ্রীশিবপুরবাসীর আর্থিক জীবন: অতীত, চ্যালেঞ্জ ও প্রত্যাশা

লেখক: মি. মাথিয়াস গোমেজ

ভূমিকাঃ পাদ্রীশিবপুর একটি গ্রামের নাম, একটি ইউনিয়নের নাম। পাদ্রীশিবপুর গ্রামটি বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের বরিশাল বিভাগের বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলাধীন ১৩ নং পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের একটি ঐতিহ্যবাহী নামকরা গ্রাম। গ্রামটি বেশ বড় এবং এখানে মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান মিলেমিশে পাশাপাশি ধর্মীয় সম্প্রীতি নিয়ে শান্তিতে বসবাস করছে। এই গ্রামে ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে কয়েকজন বিদেশী খ্রিস্টবিশ্বাসী এসেছিলেন এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে পুরোহিতগণ এসে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন এবং এক সময় এটি পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান ধর্মপল্লী নামে পরিচিতি লাভ করে। এটি একটি অতি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী প্যারিশ বা ধর্মপল্লী যা বর্তমানে বরিশাল ডায়োসিসের আওতাধীন দূর দূরান্তের কয়েকটি গ্রামে সেবা দিয়ে আসছে।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ এ ধর্মপল্লীর সকল পরিবারই এক সময় কৃষি নির্ভর ছিল। যদিও সবার পর্যাপ্ত চাষযোগ্য কৃষি জমি ছিল না কিন্তু সবারই কম বেশি বসতবাটির জায়গা ছিল, সেখানে তারা ধানের বিচালি বা নাড়া বা খড়, কেউ কেউ আবার ছন দিয়ে ঘর বানাতো। যাদের অবস্থা কিছুটা ভালো ছিল তারা গোলপাতার ছাউনি দিয়ে ঘর বানাতো, যার চাল আবার প্রতি বছরই নতুন করে ছাইতে হতো বা মেরামত করতে হতো। তবে সামান্য কিছু পরিবারে টিনের ঘরও ছিল। এখানে অল্প কিছু লোকের কাছে বেশির ভাগ চাষযোগ্য কৃষি জমি ছিল। অন্যেরা তা ভাগে বর্গা চাষ করত। বেশির ভাগ বর্গাচাষী মহাজনের জমি বর্গা চাষ করে ভাগে যে ফসল পেত তা দিয়ে কোন রকম বার্ষিক খোড়াকির খাবার মিটাত, তবে তাতে তাদের বছরের খাবার হতো না। তাই তার কোন ভাবে অর্ধাহারে বা অনাহারে বহুকষ্টে জীবনযাপন করত। বেশিরভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করত। তারা জীবন যুদ্ধে কঠোর পরিশ্রম করতে প্রস্তুত ছিল এবং করতে বাধ্য ছিল। অল্প কিছু জমিদার ও প্রতাপশালী মহাজন ছিল তারা সাধারণ ও সামান্য কৃষকদের উপর প্রভাব ও ক্ষমতাও খাটাতো, মাতব্বারি পোদ্দারি করত। যেহেতু অল্প কিছু লোকের কাছে জমাজমি ছিল এবং তাদের আয়ের তেমন কোন উৎস ছিল না তাই বাধ্য হয়েই দরিদ্র কৃষকরা মহাজন ও জমিদারদের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং এ অত্যাচার মেনে নিতে বাধ্য ছিল। সেই সময় কিছু কেছু লোক আবার মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করে কোন রকম সংসার চালাত। অনেকে আবার মানুষের বাড়িতে ছয় মাস চুক্তিতে হালুটি কাজ করত। তখন এ এলাকায় প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রজাতির ছোট বড় কচ্ছপ পাওয়া যেত এবং কেউ কেউ এ কচ্ছপ ধরে বাড়ি বাড়ি বিক্রি করেও সংসার চালাত। তখনকার দিনে সাংসারিক জীবন ছিল বড় কঠিন ও সংগ্রামী। যদিও তৎকালীন বিদেশী পালপুরোহিতগণ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় কিছু কিছু সাহায্য সহযোগিতা করতেন কিন্তু তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে দেশে আসে নানা পরিবর্তন ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের আগেই অল্প কিছু সংখ্যক ক্যাথলিক খ্রিস্টান পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মিশনে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাবুর্চি ও মালির কাজ করে বাংলাদেশে তাদের সংসার চালানোর জন্য টাকা পাঠাত এবং পরিবারগুলো কোন রকমে কষ্ট করে সংসার চালাত। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বাংলাদেশে ফের এসেছে এবং কেউ কেউ ভারতেই স্থায়ী বসতি স্থাপন করে সেখানেই অভিবাসী হয়েছে।

বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ ১৯৭১ খ্রি. স্বাধীনতা যুদ্ধের পরপরই কিছু যুবক কারিগরি কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করেছে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বা স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বে এখানে খ্রিস্টান সমাজে তেমন শিক্ষিত লোক ছিল না। যাও ছিল তা ছিল হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র। সরকারি চাকরিতে তেমন কোন উল্লেখ্যযোগ্য কেউ ছিল না। মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন পোস্ট অফিসে, পুলিশের নিচু পদে ও সরকারি সংস্থায় বাবুর্চি চাকুরি করত। ১৯৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধের পরপরই বেশ কিছু খ্রিস্টান ঢাকামুখী হতে আরম্ভ করে এবং কারিগরি কাজের সাথে যুক্ত হয় যেমন: ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার মেরামত ও ফিক্সিং এবং ইলেকট্রিক কাজে প্রশিক্ষণ নিয়ে কেউ কেউ চাকুরি নিয়েছে, আবার কেউ কেউ উদ্যোক্তা হয়েছে, তাদের অনেকেই নিজ নিজ ব্যবসার সাথে জড়িত হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে পাদ্রীশিবপুরে সেন্ট আলফ্রেড মিশনারি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং খ্রিস্টানদের জন্য একটি বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হয়, শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয় কিন্তু অতীব দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় খ্রিস্টান সমাজ থেকে তেমন উল্লেখ্যযোগ্য ছাত্র ছাত্রী ভালো ফলাফল করতে পারেনি, এমনকি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতেও পারেনি। ভালো কোন চাকরিও করতে পারেনি। এর কারণ অনুসন্ধান করলে বোঝা যায় তখনকার দিনে কিছু কিছু ছেলে মেয়ে এখান থেকে মেট্রিক পাশ করলেও মাত্র কয়েজন ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়াশোনা করে কোন রকম একটা চাকরি খুঁজে নিয়েছে। মাত্র কয়েকজন গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করলেও উচ্চতর ডিগ্রী পর্যন্ত যেতে পারেনি। এর মুল কারণই ছিল সচেতনতার অভাব ও অর্থনৈতিক দৈন্যতা। বিগত শতকের আশির দশকের পর থেকে এ অঞ্চলের খ্রিস্টান যুব সমাজ শহরমুখী হতে আরম্ভ করে এবং অনেকেই ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনায় গিয়ে নিজ নিজ প্রচেষ্টায় নিয়মিত পড়াশোনা করে, কেউ কেউ আবার টেকনিক্যাল কাজ শিখে চাকরি ও ব্যবসা শুরু করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে জীবনের চাকা ঘুরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য এদের অনেকেই আবার ঢাকা ক্রেডিট, ঢাকা মেট্রোপলিটন খ্রিস্টান হাউজিং সোসাইটির সাথে এবং নিজেদের গ্রামের নামে ঢাকাস্থ পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনিয়নের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে এবং সঞ্চয়ী হয়েছে। এরা সমিতিগুলো থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করে এবং বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে আজ অনেকটাই আত্মনির্ভরশীল এবং সম্পদশালী। এদের মধ্যে আবার অনেকেই ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা জেলায় নিজের নামে ফ্ল্যাট ক্রয় করে স্থায়ী হয়েছে। এখন অনেকেই অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী এবং সফল।

পাদ্রীশিবপুরের বর্তমান অবস্থাঃ কৃষি প্রধান বাংলাদেশ হলেও, কৃষি প্রধান পাদ্রীশিবপুরে এখন অনেকেই আর কৃষি কাজ করতে চায় না এবং করেও না। যারা কৃষি কাজ করে তারাও সামান্য কিছু কৃষি জমি চাষাবাদ করে এবং এতে সারা বছরের খোড়াকির ব্যবস্থা হলেই খুশি। একবিংশ শতাব্দিতে পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান সমাজে আমুল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বেশ কয়েকজন দেশে বিদেশে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে উচ্চ শিক্ষিত হয়েছে এবং সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে, ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীতে উচ্চ পদস্থ অফিসার, ডাইরেক্টর পদে চাকরি করছে। কেউ কেউ সফল ব্যবসায়ীও হয়েছে বটে। কৃষি কাজ থেকে সরে আসলেও অর্থনৈতিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন এসেছে, উন্নতি হয়েছে। অনেকেই ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল জেলা শহরসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় নিজেদের জন্য জমিজমা কিনেছে এবং স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছে। সফলতা ও সুনামের সাথে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলছে। অনেকেই এখন উচ্চ শিক্ষিত। পাদ্রীশিবপুরে এখন অনেক নারীরাও শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিত

হচ্ছে। অনেক নারীরাই এখন সরকারি বেসরকারি চাকরি করছে ও পরিবারে অর্থের যোগান দিচ্ছে এটা একটি বিরাট আনন্দের সংবাদ। এখন এখানে প্রায় ক্ষেত্রেই নারী পুরুষ এক সাথে পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে সম্মিলিতভাবে কাজ করছে। অনেকেই আবার বিভিন্ন জেলায় শহরের সাথে যুক্ত হয়েছে এবং সাথে সাথে নিজ গ্রামে ও মাতৃভূমিতে একতলা, দ্বিতলা, আবার কেউ কেউ তিনতলা পর্যন্ত পাকা বাড়ি নির্মাণ করেছে। যা অত্যন্ত সুন্দর ও সাজানো গোছানো। এখন আর কোন খড়ের ঘর, ছনের ঘর, গোল পাতার ঘর নেই, একটাও নেই। বেশ কিছু সেমি পাকা বিল্ডিং ঘর নির্মিত হয়েছে। তবে কিছু কাঠের ও টিনের ঘরও আছে। শিক্ষা দীক্ষায় পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টানরা অন্যান্য মিশনের সাথে তাল মিলিয়ে বেশ ভালোই এগিয়ে চলছে, ভালোই আছে। আগে যেমন একটা বড় অংশ শতকরা হারে ৩০% দারিদ্র্য সীমার নীচে ছিল, সমাজে এখন। আর সেই চিত্র নেই। দারিদ্র্য সীমার নিচের পরিবারের শতকরার হার অনেকটাই কম।

পাদ্রীশিবপুরে অন্যান্য ধর্মালম্বীদের পাশাপাশি খ্রিস্টান সমাজেও বেশ অনেক উচ্চ শিক্ষিত আছে, তেমনি আছে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা। এটাও অনিস্বীকার্য, পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টান সমাজের সরকারি বেসরকারি, ব্যাংক, বীমা কোম্পানীতে উচ্চ পদে চাকুরিরত আছে অনেকেই। আমাদের সমাজের উন্নতি নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। তবে দুঃখের বিষয় এখানে এখন আর আগের মতো সেই আন্তরিকতা, প্রেম, ভালোবাসা, ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীরর্যতা নেই। ঐক্য বা একতারও যথেষ্ট অভাব। অর্থের সাথে সাথে স্বার্থপরতা ও আমিত্বভাবটা অনেকটাই বেড়েছে, যার লক্ষণ মোটেই ভালো নয়। এটা ভবিষ্যৎ সমাজের জন্য ভয়।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

(ক) দক্ষ জনশক্তিঃ নিজ নিজ অঞ্চল, সমাজ ও দেশকে এগিয়ে নিতে হলে এবং সমাজের উন্নতি করতে হলে দক্ষ জনশক্তির কোন বিকল্প নেই। দক্ষ জনশক্তি হলে দেশে বিদেশে কর্মসংস্থান সহজ হবে এবং বেকারত্ব কমে যাবে, বেকারত্ব নির্মূল করা সম্ভব। আসুন সবাই মিলে মানব সম্পদকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করতে একতাবদ্ধ হই। দক্ষ জনশক্তি মানেই অর্থনৈতিক উন্নতি, সমাজের ও দেশের স্বাবলম্বীতা, স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ ও দেশ।

(খ) একতা ঃ বর্তমানে এ সমাজে ঐক্য বা একতার খুবই অভাব। খ্রিস্টান সমাজে এখন বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়, যা আগে এমনটা ছিল না। একতাই শক্তি, একতাই বল, একতাবদ্ধ হয়ে সামনে এগিয়ে চল, চলরে চল, দল বেঁধে এক সাথে চল। মনে এবং মুখে এ শ্লোগান নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে অবিচল। সমাজের ও দেশের উন্নতি ও জয় হবেই হবে এটাই মোদের মনোবল। খ্রিস্টান সমাজে বৈষম্য বন্ধ হউক এবং সমাজ একতাবদ্ধ ও শক্তিশালী হোক। আমরা আরো সচেতন হব, সবাই মিলে একে অপরকে সচেতন করব। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হব, খ্রিস্টান সমাজে বৈষম্য নয়, খ্রিস্টান সমাজ এক ও অভিন্ন। হাতে হাতে হাত ধরে চলব এবং নতুন পৃথিবী সমাজ ও নতুন দেশ গড়ব।

(গ) সঠিক ও শুদ্ধ নেতৃত্ব ঃ সমাজে, জাতিতে ও দেশে ভালো কিছু দেখতে চাই? ভালো কিছু করতে চাই? তাহলে সঠিক, সুস্থ ও শুদ্ধ নেতৃত্বের বিশেষ প্রয়োজন। এটা অবশ্যই সত্য এবং বিশ্বাসযোগ্য আমাদের পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান সমাজে সঠিক, সুস্থ ও শুদ্ধ নেতৃত্বের বিশেষ অভাব। শুধু অভাব নয়,

এমন নেতৃত্ব নেই বললেই চলে। ফলে একতারও মারাত্মক অভাব। মনে হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, পরচর্চা, পরনিন্দা যতটা বেশি, আধ্যাত্মিকতা ও ধার্মিকতা ততটাই কম। পারিবারিক মিল মহব্বত ও সুশৃঙ্খলতারও বেশ অভাব রয়েছে। এ বিষয় গবেষণা ও বিশ্লেষণপূর্বক সম্মিলিতভাবে কাজ করা একান্ত দরকার। আগে পরিবারগুলোতে প্রচুর অর্থনৈতিক অভাব ছিল কিন্তু যথেষ্ট আন্তরিকতা ছিল। এখন অর্থনৈতিক অভাব কম, সম্পদ বেশি কিন্তু আন্তরিকতা ও মিল মহব্বত খুবই কম। অহংকার ও স্বার্থপরতাও বেড়েছে সমাজে অনেক। এটা শুধু টাকার গরিমা ও অহংকার। এখনই লাগাম টেনে না ধরতে পারলে ভবিষ্যতে আরো খারাপ দিন আসতে পারে।

(ঘ) পারিবারিক গঠন, নৈতিকতা ও মূল্যবোধঃ আমরা খ্রিস্টান তবে ধার্মিকতা তেমনটা নেই, নেই পারিবারিক সঠিক গঠন, সঠিক নৈতিকতা ও মূল্যবোধ। ফলস্বরূপ যা হবার তাই হচ্ছে। আগে নম্রতা, সৌজন্যতা, ভদ্রতা, বাধ্যতা ছিল, ছিল ধার্মিকতা, উপাসনায় অংশগ্রহণ ও প্রতিটি পরিবারে সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা। এখন এগুলো নেই বললেই চলে। আগে ছোটরা বড়দের যথেষ্ট সম্মান করত কিন্তু এখনকার যুব সমাজের কাছে তা অনেকটাই না করার মতো। এভাবে সমাজ চলতে পারে না। ডিজিটাল বলতে বলতে এখন সব কিছুই মোবাইল কেন্দ্রিক হয়ে গেছে, যা মোটেই কাম্য নয়। স্বার্থপরতা ও আমিত্বভাবটা অনেক বেশি। এখানে যথেষ্ট সময় নিয়ে কাজ করতে হবে অন্যথায় খ্রিস্টান সমাজে বড় ধরনের বিপর্যয় নেমে আসতে পারে, হতে পারে সামাজিক বিপদ। সমাজে মন্ডলীর নিয়ম ও আজ্ঞা অবজ্ঞা করে অনেকেই অবৈধভাবে বিয়ে সাদী করছে। কেউ কেউ আবার অন্যের বিবাহিত বৌ নিয়েও সংসার করছে। সামাজিক নৈতিক অবক্ষয়ও বেড়েছে। সমাজে যত সমস্যা তার বেশির ভাগই পারিবারিক, সামাজিক গঠনের অভাব ও মূল্যবোধের অভাব।

(ঙ) পৈত্রিক জমিজমা ও সম্পদ সংরক্ষণঃ যৎসামান্য হলেও আমাদের খ্রিস্টান সমাজে বেশ পৈত্রিক জমিজমা ও সম্পদ ছিল ও আছে যা যথাযথ সংরক্ষণ ও নিরাপদে রাখা আমাদের একক ও যৌথ দায়িত্ব। অনেকেই এ বিষয় তেমন একটা গুরুত্ব দিচ্ছে না। হয়তো ভাবছে নিজে বাঁচলে বাপের নাম। আসলে কিন্তু তা নয়। এখানেও সম্মিলিতভাবে জোর দিয়ে কাজ করা একান্ত প্রয়োজনীয় ও জরুরি। বর্তমান প্রজন্ম অনেক বিষয়ে এগিয়ে থাকলেও, জমিজমার দলিল, সিএস, এসএ, বিএস পর্চা, খতিয়ান, দাগ – এ সব নিয়ে চিন্তিত নয়। এমন কি এর গুরুত্বও তাদের কাছে নেই, কিন্তু যখন সমস্যায় ও বিপদে পড়ে তখন হিমশিম খেতে হয় কোর্ট, কাচারি, ভূমি অফিস, তফসিল অফিস এমন কি এসি ল্যান্ড অফিসও চিনে না। ফলে যারা জমিজমা সমন্ধে একটু ভালো বুঝে এবং জানে তারা এ সুযোগে সেই সকল শিক্ষিত ও পয়সাওয়ালাদের কাছ থেকে বিরাট অংকে টাকা হাতিয়ে নেয়। আর যারা মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত তারা ধরা খেয়ে বিপদে পড়ে সর্বহারা হয়। এ বিষয় সচেতনতামূলক কাজ করা একান্ত জরুরি দরকার।

(চ) স্থানীয় সম্পদ সংরক্ষণঃ আমরা উন্নয়ন দেখতে চাই, উন্নয়নই আমাদের কাম্য; কিন্তু উন্নয়নের জন্য যে ধারাবাহিকতা রয়েছে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো স্থানীয় সম্পদ চিহ্নিত করে তা নিয়ে উন্নয়ন যাত্রা করা। সেক্ষেত্রে সমাজের একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্থানীয় সম্পদ চিহ্নিত করতঃ সংরক্ষণ ও সঠিক ব্যবহার।

(ছ) অপ্রয়োজনীয় খরচ বর্জন করাঃ একটি গুরুত্বপূর্ণ বচন 'অপচয়কারী শয়তানের বন্ধু'। আমাদের সমাজে এখন অনেক সম্পদ তাই বলে ইচ্ছে মতো অপ্রয়োজনে বেশি বেশি খরচ করার কোন মানে হয় না। কেউ কেউ তো বিত্তবানদের সাথে তাল মিলাতে গিয়ে ঋণ ধার করেও অপ্রয়োজনীয় খরচ করে ফেলে, ফলে পরবর্তীতে তার ফল তাকে ও তার পরিবার এমন কি পরবর্তী প্রজন্মকেও ভোগ করতে হয়। এ বিষয়ে সমষ্টিগতভাবে বিশ্লেষণপূবর্ক উপমার মাধ্যমে সমাজকে সচেতন করতে পদক্ষেপ নেয়া খুবই জরুরি।

(জ) মন্ডলীর বিশেষ ফান্ড তৈরিঃ বাইবেল ভিত্তিক শিক্ষা সেই দ্রাক্ষালতার উদাহরণ দিয়েই বলা দরকার, যদিও আমরা এক একজন ভিন্ন ও স্বতন্ত্র কিন্তু আমরা খ্রিস্টেতে এক এবং অভিন্ন। আমরা একজন অন্যের পরিপূরক। আমরা জানি না কার, কখন, কি ধরনের সমস্যা হতে পারে। তাই পূর্ব প্রস্তুতি একান্ত দরকার। মানে সাবধানের বিনাশ নেই। তাই সম্মিলিতভাবে সিনোডাল মন্ডলীর কথা চিন্তা করে মন্ডলীর আপদকালীন বিশেষ ফান্ড তৈরি করার কথা এখনই ভাবা দরকার। এ বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ নেয়া জরুরী। তারা কমিটি গঠন করে পদক্ষপ নিলে সফল হবে এবং মন্ডলীর মনোবল বেড়ে যাবে। তৈরি হোক মন্ডলীর আপদকালীন বিশেষ ফান্ড।

(ঝ) স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের সৃষ্টির উদ্যোগঃ উন্নয়নের জন্য দরকার পরিবারের ও সমাজের সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। এ বিষয়কে সামনে রেখে প্রস্তুতি নেয়া দরকার এবং স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা উদ্যোগ নেয়া এখন সময়ের দাবী। যত অংশগ্রহণ তত লাভবান। পরিবারের সবাই মিলে পরিবারের জন্য আয় করুক, বৃদ্ধি পাক পরিবারের আয়, সম্পদশালী হোক প্রতিটি পরিবার। সবাই মিলে মিশে করি কাজ, সফল হয়ে আনন্দে হই মাতোয়ারা। জয় হোক আমাদের সমাজের, জয় হোক মন্ডলীর, ধন্য হই আমরা সকলে, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক প্রতিটি পরিবারে।

(ঞ) পাদ্রীশিবপুর খিস্টান সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাঃ একটি সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলো সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। এককভাবে কেউ পুরো সমাজের উন্নয়ন করতে পারবে না, পারেনি। পূর্বে বলা হয়েছে পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টান সমাজ এক সময় দারিদ্য সীমার নিচে ছিল, বর্তমানে এ অবস্থা তুলনামূলক অনেক ভালো এবং দারিদ্র্য সীমার নিচের লোকের সংখ্যা খুবই কম। বলাবাহুল্য এ মিশনের বেশ কিছু খ্রিস্টান লোক ভারতের পশ্চিম বঙ্গে, কানাডা, আমেরিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাস করছে। কেউ কেউ সেখানে চাকরি করছে কিন্তু স্থায়ী হয়নি, আবার কেউ কেউ কানাডা, আমেরিকা, ভারতের পশ্চিম বঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। তবে ১৯৪৭ খ্রিস্টব্দে দেশ বিভাগের পরে একটি বড় অংশ ভারতের পশ্চিম বঙ্গে স্থায়ী অভিবাসী হয়েছে যাদের সাথে আগে যোগযোগর একমাত্র মাধ্যম ছিল চিঠিপত্রে, যা ছিল অনেক কঠিন। আর এখন ডিজিটাল পৃথিবীতে, আধুনিকতার ছোঁয়ায় তাদের পারিবারিকভাবে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। এটা একটি ভালো লক্ষণ ও ভালো খবর। এ মিশনের অনেক লোক এখন বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বসবাস করছে এবং কেউ

কেউ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনাসহ বিভিন্ন জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছে এবং যে যেখানে স্থায়ীভাবে বাস করছে সেখানেও তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটাই ভালো, স্বাবলম্বী ও সচ্ছল। ইচ্ছে করলে তারা নিজ জন্মভূমি বা মাতৃভূমির অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে এবং অনুদানও দিতে পারে। এখন দরকার উদ্যোক্তা নিঃস্বার্থ আহবান এবং যোগ্য আহবায়ক। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে শুধু অর্থের নগদ লেনদেন বড় কথা নয়। বিভিন্নভাবে পরিকল্পনা মাফিক এগিয়ে আসতে হবে। আগেই বলা হয়েছে মানব সম্পদকে জনশক্তিতে পরিণত করতে হবে। এটাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্ব শর্ত। মেধা, বুদ্ধি ও পড়াশুনা ডিগ্রী অনুসারে মানব সম্পদকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারিগরি ভাবে দক্ষ করতে হবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবারিক সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পারিবরিক আয় বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করতে হবে। ৯০ বছরের উর্ধ্বে আমাদের স্বনামধন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুল) থাকা সত্ত্বেও পাদ্রীশিবপুরে কোন খ্রিস্টান শিক্ষা ক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়নি, তেমন উল্লেখযোগ্য পদে ছিল না এবং এখনো নেই। উল্লেখযোগ্য পদ মানে - সচিব, ডিসি, এসপি, সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক, সরকারি কোন বড় অফিসার, বড় কোন ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার বুঝানো হয়েছে।

গ্রাম ও মিশন নিয়ে স্বপ্ন দেখতে হবে, পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, যেমনঃ প্রতিটি খ্রিস্টান পরিবারে যেন কমপক্ষে একজন গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করে এবং একজন উচ্চ শিক্ষা সম্পন্ন করে। কারিগরি শিক্ষার উপরও জোরালো পদক্ষেপ নেয়া জরুরী। উচ্চ শিক্ষার জন্য অবশ্যই ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে ১টি মেয়েদের হোস্টেল ও ১ টি ছেলেদের হোস্টেল খুবই দরকার। এ হোস্টেল স্থানীয় নেতৃত্বে পরিচালিত হবে। এখানে প্রবাসীদের সাথে কার্যকরী যোগাযোগ হলে অর্থের যোগান সহজ হতে পারে। এসব বিষয় নিয়ে দেশীয় ও অভিবাসীদের নিয়ে অন্তত বছরে একবার বার্ষিক সম্মেলন হতে পারে। অর্থের যোগান কিন্তু বড় কোন সমস্যা নয়, মিশনের যথেষ্ট সম্পদ রয়েছে তার সঠিক ব্যবহার হতে হবে। এখানে শক্তিশালী স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করতে হবে, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান, দক্ষ, চৌকশ ও সৎ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে দিনব্যাপী কর্মশালা করে অংশগ্রহণমূলক প্রয়োজনীয় নীতিমালা তৈরি করতে হবে। দায়িত্বশীল ও শক্তিশালী, সৎ ও নিষ্ঠাবান, কর্তব্যপরায়ণ ও জবাবদিহিতামূলক কমিটি গঠন করতে হবে। জীবনে যাদের একটাও কালো দাগ আছে তারা কোনভাবেই এ কমিটির সদস্য হতে পারবে না। অর্থ কোন সমস্যা নয়, দরকার যোগ্য ও স্বচ্ছ নেতৃত্বের। দরকার উদ্যোক্তার বলিষ্ঠ আহবান। দরকার জনগণের অংশগ্রহণ। তবেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজ হবে, মাঠ পর্যায়ে শত শত জনগণের ইতিবাচক অংশগ্রহণ পাওয়া যাবে।

সকলের তরে সকলে মোরা, প্রত্যেকে মোরা পরের তরে। পরিশ্রমে ধন আনে পূণ্যে আনে সুখ। সুখী ও শান্তিময় সংসার, আদর্শ সমাজ ও আদর্শ মন্ডলী গড়তে পরিশ্রম, একতাবদ্ধতা, ঐক্য ও মিলনের কোন বিকল্প নেই। চলো, আমরা সকলকে নিয়ে এগিয়ে যাই। পারব মোরা সবাই মিলে পারব, নতুন সমাজ ও মন্ডলী গড়বো। জয় দেখব হেসে খেলে, আনন্দিত হবে সবাই মিলে।

পাদ্রীশিবপুরবাসীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ও নেতৃত্ব

লেখক: মি. যোসেফ ডি'রোজারিও

বাংলাদেশের দক্ষিণবঙ্গের একটি আদর্শ খ্রিস্টান গ্রামের নাম পাদ্রীশিবপুর। এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করে আমরা গর্ববোধ করি, আমাদের জীবনে ঈশ্বরের অশেষ আশীর্বাদ অনুভব করি। এই গ্রামটি বহুকাল আগে থেকেই সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক বিবেচনায় সমৃদ্ধ। ব্রিটিশ শাসন আমলে আমাদের পূর্বপুরুষগণ এই এলাকায় প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছেন। সেই দিক বিবেচনা করলে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আমাদের বিচরণ অতি প্রাচীন। সেই সাথে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় খ্রিস্টানদের সামাজিক অবস্থানও ছিলো একেবারে মজবুত। এ সবই সম্ভব হয়েছে আমাদের পূর্বপুরুষদের সুদৃঢ় মনোবল ও নিষ্ঠার সাথে সমাজ ও দেশের সেবা করার কারণেই। তাই পাদ্রীশিবপুরবাসীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ও নেতৃত্ব নিয়ে আমরা সত্যি গর্ব করতেই পারি।

আমাদের খ্রিস্টান সমাজের গোড়া পত্তন হয়েছিলো পতুর্গীজদের হাতে। আবার সাথে সাথে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো হলিক্রস ফাদার ও সিস্টারগণের সেবার আদর্শ। এই আদর্শ আমাদের জন জীবনে প্রভূত প্রভাব ফেলেছে। এজন্যে আমাদের খ্রিস্টান সমাজ ব্যবস্থায় মিশনারীদের পরিচ্ছন্ন পরিচালনা ও পরিসেবা প্রভাব বিস্তার করেছে এবং আমাদের সামাজিক কর্মকান্ডের মূলকেন্দ্রই ছিল ফাদার বাড়ি। একথা সত্য যে ফাদারদের সাথে স্থানীয় জনগণও একাত্ম হয়ে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছে। বৃটিশ আমলে গুরুদের কাছে শিক্ষা নেয়া এবং তাঁদের পরামর্শ অনুসারে সমাজ পরিচালনার একটি ঐতিহ্য ছিল। তাইতো আমাদের গ্রামের ইতিহাসে গুরুগৃহের কথা আমরা জানতে পারি। এই গুরুদের একজন ছিলেন নায়েব মহাশয় চার্লস গোমেজ যিনি গুরুমহাশয় নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন আমাদের সমাজের প্রথম মেম্বার। তিনি সামাজিক নেতৃত্ব দিয়েছেন বৃটিশ শাসন আমলেই, সেই সাথে তিনি নায়েব হিসেবে দায়িত্ব পালন করে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন। কেবল তিনি নন সেই সময়ের ডি'সিলভা পরিবারও প্রশাসনিক কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। আরও দেখতে পাই যে খ্রিস্টান অনেকেরই জমিদারী ছিল যারা প্রজাদের মাঝে তাদের জমি বরাদ্দ দিয়ে সাংবার্ষিক খাজনা আদায় করতেন। আবার সামাজিক ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই মনু পন্ডিত, পোস্টমাষ্টার, নিঙ্গাল সাধু, মোক্তারবাড়ির এরমান ও জার্মান, শিকদার বাড়ির লোকজন সমাজ পরিচালনায় যুক্ত ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই। পরবর্তীতে লালজন স্যার, সিলভেস্টার স্যার, ভেনানসিও স্যার, ডাক্তার ফ্রান্সিস, ফ্রান্সিস স্যার, ক্লেমেন্ট স্যার, বেনেডিক্ট স্যার, আলবার্ট স্যার, মার্টিন স্যারসহ আরও অনেকেই সামাজিক নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই সময় আমাদের সমাজে নিয়ম শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষায় তাদের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়।

এই ধারাবাহিকতা পরবর্তী প্রজন্মও বহন করে এসেছে। তাইতো দেখি যে ১৩ নং পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়ন কাউন্সিলে পাকিস্তান আমলেই মেম্বার নির্বাচিত হয়েছিলে মৌজেস গোমেজ। তিনি আমাদের নেতৃত্ব যা দিয়েছন তার চেয়ে সেবা করেছেন বেশি। তিনি প্রতিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে লোকজনের সুখ দুঃখের খবর নিয়েছেন এবং যাদের প্রয়োজন ছিলো তাদের জন্য ইউনিয়ন কাউন্সিল থেকে প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছেন। তার সময়ে রেশন কার্ডের মাধ্যমে কমমূল্যে জিনিসপত্র কেনা যেতো। তিনি খ্রিস্টান সমাজের সকলের রেশন কার্ডের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে ইউনিয়ন

কাউন্সিল পর্যায়ে খ্রিস্টান সমাজ থেকে মেম্বার নির্বাচিত হয়ে সেবাদান করেছেন ক্লোভিন আলেকজান্ডার গোমেজ মন্টু, মার্ক রনি ডি'রোজারিও এবং মিঠু ডি'কস্তা। অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবেই খ্রিস্টান সমাজের নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে। আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে মাটিভাঙ্গা ছোট বিঘাই ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন উইলসন গোমেজ এবং পরবর্তীতে মহিলা মেম্বার ও ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন দীপ্তি গোমেজ। এরা সবাই আমাদের সমাজের লোক যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সেবা দিয়েছেন। তাদের সেবাদানের কথা মানুষ এখনও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

সামাজিক নেতৃত্বে পরবর্তী প্রজন্মের অনেকেই ছিলেন তাদের মধ্যে আরনল্ড এ. গোমেজ, প্রফেসর গাব্রিয়েল মানিক গোমেজ, বাবু সুশীল সরকার, ক্লারেন্স গোমেজ এসপি, চার্লস ভিক্টর গোমেজ, ব্রায়ের স্যার, ফ্লাবিয়ান গোমেজ, এরিক ডি'কস্তা, আব্রাহাম গোমেজ, বুলবুল গোমেজসহ আরও অনেকেই। বর্তমানেও সামাজিক নেতৃত্বে দেখতে পাই বেসিল গোমেজ, অমল গোমেজ, মার্ক রনি ডি'রোজারিও, বাবলু ডি'কস্তা, লিনা গোমেজ, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এবং পাদ্রীশিবপুর খ্রীষ্টান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, ঢাকা, ঢাকাস্থ পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ও যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

বর্তমান পর্যন্ত বিবেচনা করলে আমাদের সামাজিক কাঠামোতে ধর্মপল্লীর ৮ টি ওয়ার্ড চেয়ারম্যান আমাদের প্রয়োজনীয় সেবা দিতে সচেষ্ট আছেন। আমাদের সাথে অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকদেরও সুসম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব সব সময় বিশেষ অবদান রেখেছে। আমরা তাই একটি মিলন সমাজে শান্তিতে বসবাস করছি।

পাদ্রীশিবপুরবাসী ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও গঠন ঃ চ্যালেঞ্জ ও প্রত্যাশা

লেখক: প্রফেসর সুইটি ব্রিজেট গোমেজ
সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা

পাদ্রীশিবপুরবাসীর শিক্ষা ও গঠন, চ্যালেঞ্জে ভরা প্রতিদিনের জীবন:
স্বপ্নে ভরা নতুন আলো, অপেক্ষায় থাকি কবে মিলবে ভালো।

শিক্ষা শব্দটির সাথে আমরা কম বেশি সকলেই পরিচিত। সাধারণ ধারণা অনুযায়ী মানুষ বা ব্যক্তি যা কিছু শেখে তা-ই শিক্ষা। শিক্ষা হলো ক্রমবিকাশের এমন একটি প্রক্রিয়া যা মানুষের শৈশব থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত এবং এই প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি তার প্রাকৃতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের সঙ্গে ক্রমশ সঙ্গতি স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

আমেরিকার সমাজ-দার্শনিক জন ডিউই এর ধারণা মতে, শিক্ষা শুধু জীবন প্রস্তুতের উপায় নয়, তা জীবনযাপন প্রণালীও বটে। এজন্য শিক্ষাকে তিনি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন এবং অভিজ্ঞতা-কে শিক্ষা লাভের স্বাভাবিক কৌশল হিসেবে গণ্য করেছেন। বিদ্যালয়কে তিনি আনুষ্ঠানিক

শিক্ষার প্রধান প্রতিষ্ঠান তথা সমাজের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে গণ্য করেছেন।

শিক্ষা মানেই জীবন আর জীবন-ই শিক্ষা। শিক্ষা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। কেউ এ কথা বলতে পারে না যে, 'এখান থেকে শিক্ষার শুরু আর সেখানে শেষ।'

পাদ্রীশিবপুরবাসী ছেলেমেয়েদের (স্থানীয় ও অভিবাসী) শিক্ষা ও গঠন বিষয়ে আলোকপাত করতে হলে এর ঐতিহাসিক পটভূমির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা প্রয়োজন।

পাদ্রীশিবপুর একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। পর্তুগীজ আমল থেকে এখানে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের ইতিহাস শুরু। ঐতিহ্যগতভাবে এ গ্রামের অধিবাসীদের পেশা ছিল কৃষি কাজ। ক্রমান্বয়ে পাদ্রী বাড়িতে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হতেন। রান্না, বাগানের কাজ, গির্জায় বিভিন্ন কাজে তারা নিয়োজিত থাকতেন। সম্ভবত ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে অত্র এলাকায় তেমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। পন্ডিতদের শিক্ষায় কিছুটা অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন হতো। যদিও সঠিক জানা যায়না কোন সময় থেকে আনুষ্ঠানিক প্রাইমারী শুরু হয়েছিল; তবে এটা নিশ্চিত যে, বহু বছর ধরে সেন্ট আন্তনী নামে একটি স্কুল ছিল এবং পাশাপাশি সেন্ট যোসেফ নামে প্যারিশের মেয়েদের জন্য একটি স্কুল ছিল যা ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলতে থাকে। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ সেন্ট আলফ্রেড উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ছেলেদের জন্য শিক্ষা গ্রহণ শুরু হতে থাকে। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ - ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ম্যাট্রিক পাশ করা পাদ্রীশিবপুরের শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৫৪ জন যা মোট পাশ করা শিক্ষার্থীর ১২%। তবে এ সংখ্যা ঐ সময়ের প্রেক্ষিতে নেহায়েত কম নয়।

দেশ বিভাগের পূর্বে পাদ্রীশিবপুরের খ্রিষ্টভক্তদের মধ্যে একটি বড় অংশ কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন যাদের সন্তানেরা সেন্ট আলফ্রেড্স উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতেন। হোস্টেলের সুব্যবস্থা থাকায় চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের বিভিন্ন প্যারিশ থেকে এসে ছাত্ররা সেন্ট যোসেফ বোর্ডিং-এ থেকে এই বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ - ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ ডায়োসিসের অন্য প্যারিশের কাথলিক ছাত্রদের মধ্যে ম্যাট্রিক পাশ করেছে ৭৬ জন যা মোট পাশ করা শিক্ষার্থীর ১৮%। ঐ সময়ে এ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাস করে পরবর্তীতে অনেকেই বিভিন্নভাবে শিক্ষার আলো ছড়িয়েছেন।

পর্যাপ্ত তথ্য না থাকায় ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ পরবর্তী কাথলিক ছাত্রদের পরিসংখ্যান উপস্থাপন সম্ভব হয়নি। তবে পরবর্তী পচিশ বছরে, অর্থ্যাৎ ১৯৫৯-১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সর্বমোট ৮৯৫ জন ছাত্র সেন্ট আলফ্রেড থেকে ম্যাট্রিক পাস করে বেরিয়েছে।

আরেকটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, সেন্ট আলফ্রেড স্কুলে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে জেএসসি পরীক্ষায় পাশ করেছে মোট ২০৮ জন এবং তাদের মধ্যে কাথলিক ছাত্রদের সংখ্যা ছিল ৩৮ জন। আবার ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে এসএসসি পরীক্ষায় শতকরা শতভাগ পাশ করে। কাথলিক ছাত্র ৩৪ জন সহ মোট সংখ্যা ছিল ২২৫ জন।[৫]

পাদ্রীশিবপুরবাসীর একটি বড় অংশ বিভিন্ন কারণে দেশের ভিতরে ও বাইরে অভিবাসনের ফলে গ্রামে বসবাসকারী খ্রিস্টভক্তের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে নিম্নমুখী। এর প্রভাব স্থানীয় বিদ্যালয়েও পড়ছে।

[৫] (শ্রীমন্ত তটে – ২০১৪)।

ঢাকার অভিবাসীদের ক্ষেত্রে

বর্তমানকালে অভিবাসন ঢাকামুখী। প্রতি বছর সেন্ট আলফ্রেড্স উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাশ শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনুমানিক প্রায় ৬০% ছেলেই নটরডেম কলেজ, ঢাকায় এইচএসসি-তে ভর্তি হয়। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মার্টিন হলে থেকে পড়াশুনা করে। অন্যরা বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজনের বাসায়, মেসে, হোস্টেলে কিংবা অন্য কোথাও থেকে পড়াশুনা করে। সে তুলনায় হলিক্রস কলেজে কম সংখ্যক মেয়েদের ভর্তি হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে আবাসন সমস্যাই বড় একটি কারণ বলে মনে হচ্ছে। আবার মেয়েদের কোথাও থাকার সাথে নিরাপত্তার বিষয়টিও জড়িত। সেক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় মেয়ের নিরাপত্তার স্বার্থে মা ঢাকায় চলে আসেন। একসময় পুরো পরিবার-ই ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। এছাড়া বাকী শিক্ষার্থীরা স্থানীয়/পার্শ্ববর্তী জেলা/বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে সাধারণ শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

এইচএসসি পাশের পরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা আনুমানিক ১% এর বেশি নয়। তবে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশিরভাগই বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি কলেজগুলোতে পড়াশুনা করে। অর্থনৈতিক সচ্ছলতা রয়েছে এমন শিক্ষার্থীরা (আনুমানিক প্রায় ১০%) উচ্চ শিক্ষার্থে আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়াতে জায়গা করে নেয়। কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী নার্সিং-এ ভর্তি হয়; তবে এক্ষেত্রেও বেশিরভাগই বেসরকারি মেডিকেল কলেজে সুযোগ পায়। তবে মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে কিংবা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থী সংখ্যা খুবই নগন্য।

সাধারণ শিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে একাংশ স্নাতক পাশ করে কোনো বেসরকারি সংস্থায় সাধারণ চাকুরিতে প্রবেশ করে। যারা নিয়মিতভাবে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় সম্মানজনক কোনো পদে জায়গা করে নেয়।

চট্টগ্রামের অভিবাসীদের ক্ষেত্রে

১৯৪৭ খ্রি. দেশ বিভাগের পরে অনেকে চট্টগ্রামে পাড়ি জমিয়েছে, কারণ হিসাবে দেখা যায় ঐসময় বরিশাল চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের আওতাভুক্ত ছিল। চট্টগ্রামে অনেক দেশি বিদেশি খ্রিস্টভক্ত সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন এবং তাদের ঘরের বিভিন্ন কাজে সাহায্যকারী প্রয়োজন হতো। পাদ্রীশিবপুর থেকে আসা খ্রিষ্টভক্তগণ মিশনারীদের সহায়তায় ঐসকল কাজে নিয়োজিত হতেন। এবং যারা কিছুটা শিক্ষিত ছিল অর্থাৎ হাই স্কুল পড়ুয়া তারা অফিসে ও স্কুলে শিক্ষকতা এবং অন্যান্য কাজে নিয়োজিত হতেন। সার্বিকভাবে বলা যায় যে, কর্মসংস্থানের জন্যেই তারা অভিবাসী হয়েছেন।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে এসএসসি পাশ খ্রিস্টভক্তের সংখ্যা খুবই কম ছিল। সঙ্গত কারণে কৃষি কাজের পাশাপাশি বয়-বেয়ারা ও বাবুর্চি কাজ ছিল প্রধান পেশা। কিছু সংখ্যক যারা হাই স্কুল ও এসএসসি পাশ ছিলেন তারা অফিসে, স্কুলে শিক্ষকতায় ও অফিসের কাজে নিয়োজিত হতেন। অন্যেরা কুঠিবাড়িতে বয়, বাবুর্চি কাজে নিয়োজিত হতেন। কিন্তু ৮০-এর দশকের পর এসএসসি, এইচএসসি পাশ শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ৯০-এর দশকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাশ শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি

পেতে থাকে, যা ২০০০ খ্রিস্টাব্দে ক্রমান্বয়ে আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে উচ্চ শিক্ষায় মেয়েরা এগিয়ে আছে। বর্তমানে প্রায় সকল পরিবারে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন এমন সন্তান রয়েছে। এর ফলে অধিকাংশ শিক্ষিত খ্রিস্টভক্ত পেশার পরিবর্তন ঘটিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পদস্থ কর্মকর্তা, প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। এখন সকলেরই প্রচেষ্টা সন্তানকে শিক্ষিত করা, তবে উচ্চ শিক্ষা থাকে প্রত্যাশা। দরিদ্রতার কারণে এবং পরিবারকে সহায়তার জন্য অর্থ উপার্জন করতে চাকুরি করতে হয় ফলে ছেলে সন্তানেরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে ঝরে যায় ।

চট্টগ্রামে অবস্থানরত প্রায় ৪০০ পরিবারের শিক্ষা গ্রহণ ও অর্জিত ফলাফলের একটি চিত্র নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

এস এস সি	২৪৪ জন
এইচ এস সি	৩৭৮ জন
স্নাতক	১৩৪ জন
স্নাতকোত্তর ও সমমান	৩১ জন

পেশা

ব্যাংকার, শিক্ষকতা, অধ্যাপনা/প্রভাষক, ডাক্তার, এ্যাডভোকেট, ইঞ্জিনিয়ার, সেফ, কেটারিং, ক্ষুদ্র ব্যবসা, ঠিকাদারী, এনজিও কর্মী ও কর্মকর্তা, শিপিং সার্ভিস ও ম্যানেজার, সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে সেবা ও নেতৃত্ব দান, ব্রতধারী/পালপুরোহিত, দিনমজুর, বাবুর্চি, টেইলারিং, ইলেকট্রিশিয়ান, কেয়ারটেকার ও গার্ড ইত্যাদি পেশায় যোগ্যতা অনুসারে নিয়োজিত।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় পেশা বিশ্লেষণ করলে একটি প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষা মানুষকে প্রশস্ত করে। এক সময় চট্টগ্রামে পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টভক্তগণের মধ্যে হাতে গোনা ২/৩ জন সমাজে স্থান পেতেন। বর্তমানে সমাজের সর্বস্তরে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিচালক, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। এমনকি বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানেও পদস্থ কর্মকর্তা, বিভাগীয় প্রধান ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করে চলেছেন।

চট্টগ্রামের অভিবাসীদের মতামত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যাদের বাবা-মা বেঁচে আছেন, বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন বেঁচে আছেন ও তাদের সাথে সম্পর্ক রাখেন, গ্রামে ঘরবাড়ি আছে তারা যোগাযোগ কম হলেও রাখছেন। কিন্তু যাদের বাবা-মা বেঁচে নেই, দেশে ঘরবাড়ি নেই, নিকট আত্মীয় বেঁচে নেই বা পরিচয় নেই তারা পাদ্রীশিবপুরের সাথে যোগাযোগ রাখার ব্যাপারে তেমন কোনো আগ্রহ অনুভব করেন না।

এছাড়াও দেশের অন্যান্য জেলায়ও পাদ্রীশিবপুরবাসীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন যার সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন অনুভব করছি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার সংগঠনগুলোর কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

সার্বিকভাবে বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, শিক্ষার ও পেশা পরস্পর সম্পর্কিত। অর্থনৈতিক সফলতার জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে যেসকল চ্যালেঞ্জ রয়েছে বলে মনে করছি তা হলো ঃ

চ্যালেঞ্জ

* সঠিক গাইডেন্সের অভাবে শিক্ষার্থীদের ভিশন ঠিক করার ক্ষেত্রে অদূরদর্শিতা
* উদ্দেশ্যহীনভাবে সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের প্রবণতা
* উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য নিজ এলাকা সংলগ্ন মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা
* এসএসসি পাশের পরে শহরমুখী হওয়া
* হোস্টেল স্বল্পতা
* উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার ক্ষেত্রে অপারগতা
* বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস)-এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য না জানা
* প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষাগুলোতে ধৈর্যসহকারে অংশগ্রহণে অনীহা
* বিভিন্ন সংগঠনে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য সংরক্ষণের অভাব
* বিভিন্ন সংগঠনগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব
* অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা
* কারিগরি শিক্ষা, নার্সিং, ব্যবসা ও উদ্যোক্তা হিসেবে কাজের প্রবণতা কম
* বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এনজিও/বেসরকারি সংস্থায় চাকরির প্রবণতা
* উচ্চ শিক্ষা লাভের পরে গ্রামে না ফেরার প্রবণতা

প্রত্যাশা ঃ

* ভিশন নির্ধারণের পূর্বে অভিজ্ঞ কারও কাছে পরামর্শ নেওয়া/তথ্য নেওয়া
* কোন ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করলে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে তা আগে থেকেই জেনে নেওয়া
* এসএসসি পাসের পরে নিজ এলাকা সংলগ্ন কলেজে পড়াশুনার মানসিকতা তৈরি
* বিভিন্ন সংগঠনগুলোর উদ্যোগে ছেলেমেয়েদের থাকার জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা করা
* উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং মোটিভেশন দেওয়া
* বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস)-এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ এবং বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেওয়া
* ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা বিভিন্ন শহরে পাদ্রীশিবপুরবাসীদের নিয়ে গঠিত সংগঠনগুলোতে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের তথ্যসমূহ (যেমন- শিক্ষাগত, পেশাগত) সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা
* বিভিন্ন সংগঠনগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন
* সমিতিগুলোতে বিনা সুদে/স্বল্প সুদে শিক্ষা ঋণ প্রদান
* কারিগরী শিক্ষা, নার্সিং, ব্যবসা ও উদ্যোক্তা হিসেবে ক্যারিয়ার গঠনে উৎসাহিত করা
* সেমিনারের মাধ্যমে শিক্ষা ও পেশা সংক্রান্ত নির্দেশনা, বিভিন্ন তথ্য আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে যুবসমাজকে সমৃদ্ধ করা
* উচ্চ শিক্ষা লাভের পরে উদ্যোক্তা হিসেবে গ্রামে ফিরে গিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা (ব্যক্তি উদ্যোগে বা সাংগঠনিকভাবেও হতে পারে)
* গ্রামে বসবাসের উপযোগী নিরাপদ পরিবেশ তৈরি এবং আধুনিক চিকিৎসা/এমার্জেন্সি চিকিৎসা সেবা প্রদানের সুব্যবস্থা করা (ব্যক্তি উদ্যোগে বা সাংগঠনিকভাবেও হতে পারে)।

সাধারণ শিক্ষা আমাদের সমাজের ভবিষ্যৎ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও এই পথচলায় অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তবে আমাদের প্রত্যাশা এবং উদ্যোগগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা একটি উন্নত সমাজ গড়ে তুলতে পারব এই প্রতীক্ষায়।

কারিগরি শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা ও প্রত্যাশা

লেখক: জেমস্ গোমেজ, পরিচালক, মট্স

কারিগরি শিক্ষা

প্রযুক্তির সাহায্যে বাস্তবধর্মী ও হাতে কলমে শিক্ষাকে কারিগরি শিক্ষা বলে। মূলত যে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে তথ্য প্রযুক্তি, শিল্প, কৃষি ও কলকারখানার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মতভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সে শিক্ষাই কারিগরি শিক্ষা। কারিগরি শিক্ষা একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষতার সাথে ব্যবহারিকভাবে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। এই শিক্ষা মানুষকে হাতে কলমে কাজ করতে প্রশিক্ষণ দেয়। এটি প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে বোঝায় যা শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট ক্যারিয়ারের জন্য প্রস্তুত হতে সহায়তা করে। এ শিক্ষা সরাসরি হাতে-কলমে অর্জন করতে হয়। এছাড়া এটা একটি পেশাগত শিক্ষা। অর্থাৎ এখানে যে কাজটি শিখনো হয় বা যে দক্ষতা অর্জন করা হবে সেটাই প্রধানত হবে পেশার জায়গা বা তার মাধ্যমেই জীবিকা অর্জনের জায়গা তৈরি হবে। কারিগরি শিক্ষা বিভিন্ন বিষয় বা টেকনোলজির উপর হতে পারে। আবার এটি বিভিন্ন মেয়াদের হতে পারে। এটার জন্য পড়াশুনার ক্ষেত্রেও পার্থক্য হতে পারে। যেমন কামার-মুচির জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন একাডেমিকভাবে প্রকৌশলী হতে গেলে তার থেকে বেশি শিক্ষার প্রয়োজন। এটা কেবল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বা ক্লাসরুমে নিতে হবে এমন নয়; এটা নানাভাবেই শিখতে পারা যায়। তবে অবশ্যই হাতে কলমে হতে হয়।

বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রম

আমাদের দেশে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মান প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ, মূল্যায়ন ও উন্নয়নের সার্বিক দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উপর। বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কেন্দ্রীয়ভাবে দেশের সকল পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করে। বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষার স্তর চারটি- দুই বছর মেয়াদী এসএসসি ভোকেশনাল, দুই বছর মেয়াদী এইচএসসি ভোকেশনাল/ বিজনেজ ম্যানেজমেন্ট, চার বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা এবং স্বল্প মেয়াদী ট্রেড কোর্স। বিভিন্ন টেকনোলজি বা ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করা যায়। চার বছর মেয়াদী ডিপ্লোমার ক্ষেত্রে রয়েছে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা-ইন-টুরিজ্যম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট, ডিপ্লোমা-ইন-এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা-ইন-ফিশারিজ, ডিপ্লোমা-ইন-হেলথ টেকনোলজি এন্ড সার্ভিসেস, ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইলস ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা-ইন-ফরেস্ট্রি, ডিপ্লোমা-ইন-লাইভস্টক, ডিপ্লোমা-ইন-জুট টেকনোলজি, ডিপ্লোমা-ইন-জুট সার্ভেয়িং, ডিপ্লোমা-ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশন।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ছাড়াও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-এনএসডিএ (National Skill Development Authority-NSDA) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদার ভিত্তিতে দক্ষতা উন্নয়ন সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির কাজ করে থাকে। ২০৩০ খ্রিস্টাব্দের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ২০৩১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ খ্রিস্টাব্দে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে এনএসডিএ। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং দক্ষতার পূর্ব অভিজ্ঞতার সনদ প্রদান করে থাকে। এনএসডিএ এর আওতায় ১ থেকে ৬ স্তরের কোর্স এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে দক্ষতা সম্পর্কিত শর্ট কোর্সের মাধ্যমে কারিগরি দক্ষতা প্রদান করা হচ্ছে। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে অনেকেই আছেন যারা হাতের কাজে দক্ষ কিন্তু তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কোন সার্টিফিকেট নেই তাদেরকেও দক্ষতার পূর্ব অভিজ্ঞতার সনদ প্রদান করে থাকে এনএসডিএ।

এছাড়াও বাংলাদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনবলের অভাব এবং ব্যাপক চাহিদার কথা বিবেচনা করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম-সেইপ (Skills for Employment Investment Program -SEIP) এর আওতায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক), ঢাকায় মেশিনসপ, ওয়েল্ডিং ও ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স ট্রেডে কর্মসংস্থান উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। সেইপ এর আর্থিক সহায়তায় বাসি (Bangladesh Association of Construction Industry-BACI), বাইওয়া (Bangladesh Engineering Industry Owners' Association-BEIOA), বাংলাদেশ ব্যাংক (Bangladesh Bank) ও পিকেএসএফ (Palli Karma-Sahayak Foundation-PKSF) প্রজেক্টের আওতায় বিভিন্ন বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধমে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। নারী, আদিবাসী ও প্রতিবন্ধীদের সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী প্রশিক্ষণার্থীদেরকে শিল্প কারখানায় কর্মসংস্থানের সার্বিক সহযোগিতাও প্রদান করা হয়।

উক্ত প্রতিষ্ঠানের বাইরেও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিজস্ব কারিকুলামের দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। তন্মধ্যে মট্স (মিরপুর এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং স্কুল), নারিন্দা সেন্ট যোসেফ টেকনিক্যাল, সাভারের ব্রাদার ডোনাল্ড টেকনিক্যাল স্কুল, চট্টগ্রামের ব্রাদার ফ্রেবিয়ান টেকনিক্যাল স্কুল, দিনাজপুরের শহীদ ফাদার লুকাস টেকনিক্যাল স্কুল, বরিশালের ফাদার চার্লস জে. ইয়াং টেকনিক্যাল স্কুল, খুলনার বয়রা টেকনিক্যাল স্কুল, গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল, মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল, ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল, নাটোরের বড়াইগ্রাম টেকনিক্যাল স্কুল, দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট ভোকেশনাল টেকনিক্যাল স্কুল, যশোর টেননিক্যাল স্কুল, রাজশাহীর আড্ডা এবং আরও ২০টি মোবাইল টেকনিক্যাল স্কুল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কারিগরি অঙ্গনে মট্স (মিরপুর এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং স্কুল) একটি সুপরিচিত নাম। বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সামাজিক প্রতিষ্ঠান কারিতাস বাংলাদেশের একটি ট্রাস্ট হিসেবে মট্স পরিচালিত হচ্ছে। গ্রামীণ যুবকদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ হতে মট্স এর যাত্রা শুরু হয় CORR (কারিতাস বাংলাদেশ) ও কারিতাস সুইজারল্যান্ডের সহায়তায়। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে হতে মট্স এর বুনিয়াদি কোর্স - তিন বছর মেয়াদী লং টার্ম মেকানিক্যাল কোর্স (LTMC) এর কার্যক্রম শুরু হয়। যেকোন বিভাগ থেকে এসএসসি উত্তীর্ণ/ অনুত্তীর্ণ এলটিএমসি কোর্সের অটোমোবাইল ও মেকানিক্যাল ট্রেডে ভর্তি হওয়ার সুযোগ রয়েছে। ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয় প্রতি বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে এবং ক্লাস শুরু হয় জানুয়ারি মাসে। তিন বছর মেয়াদী এই কোর্সের শেষ বর্ষে প্রশিক্ষণার্থীরা মট্স এর উৎপাদন বিভাগে কাজের মাধ্যমে বাস্তব ও প্রায়োগিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে, যা চাকরি ক্ষেত্রে যেকোন প্রতিষ্ঠানের উপযোগী অভিজ্ঞতা লাভে সহায়তা করে। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ সময়ে মট্স এ স্বল্প মেয়াদী মডুলার কোর্স প্রসার লাভ করে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপযোগী বর্তমানে ওয়েল্ডিং, প্লাম্বিং, সিভিল কনস্ট্রাকশন, ইলেকট্রিক্যাল, পেইন্টিং, রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং, অটোমোবাইল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল এবং কম্পিউটার, আরএমজি ও অন্যান্য বিষয়ের ১০ টি মডিউলের ৭৭ টি ট্রেডে (১-১৪ সপ্তাহ ব্যাপী) ও বর্তমানের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে সময়োপযোগী মডুলার কোর্সের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১৮ বছরের উর্ধ্বে যেকোন ব্যক্তি এই কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে এবং প্রশিক্ষণ শেষে এ সকল প্রশিক্ষণার্থীরা বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানে যুক্ত হচ্ছে ও দেশের রেমিট্যান্স বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। পাশাপাশি ট্রেড টেস্ট সার্টিফিকেট কার্যক্রমও চলমান রয়েছে। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় চার বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমে অটোমোবাইল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স ও মেকানিক্যাল টেকনোলজিতে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়; যার প্রসার লাভ করে বর্তমানে সিভিল ও কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির সংযোজন হয়েছে। এসএসসি অথবা সমমান যেকোন বিভাগ হতে উত্তীর্ণ যে কোন ব্যক্তির এই কোর্সে ভর্তির সুযোগ রয়েছে। এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পরবর্তী সময় থেকে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয় এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী ক্লাস শুরু হয়।

২০১৫ খ্রিস্টাব্দ হতে Skills for Employment Investment Program- SEIP প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (ISC) যেমন BACI, BEIOA, Bangladesh Bank, PKSF এর অধীনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এছাড়াও National Skills Development Authority-NSDA এর অধীনে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও এসেসমেন্ট চলমান রয়েছে। মট্স সবসময়ই যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে; তারই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা কোর্স- জাপানি, কোরিয়ান, চীনা, ইংরেজি ইত্যাদি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব/ প্রয়োজনীয়তা

দেশের শ্রমবাজারকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর ও দেশের শিল্পায়নে কারিগরি শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বর্তমান ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে সারা বিশ্বের ন্যায় আমাদের দেশেও কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব অনেক বেশি। বর্তমান বিশ্বে চাকরির বাজারে উৎপাদনশীল খাতই সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে। উন্নয়নের ধারায় আমাদের দেশে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে আর তাতে কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারিগরি শিক্ষা একটি উৎপাদনভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা যা দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। কারিগরি শিক্ষা ব্যক্তির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে কারণ একজন ব্যক্তি এতে সহজেই দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে প্রবেশ করে দক্ষ জনশক্তিতে নিজেকে রূপান্তরিত করতে পারে। বর্তমানে কারিগরি শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে উৎপাদনমূলক কাজের সাথে যুক্ত হয়ে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ব্যবহার ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে শিল্প ও কৃষিতে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটাচ্ছে।

কারিগরি শিক্ষা শিক্ষার্থীকে কর্মমুখী শিক্ষায় দক্ষ করে তোলে। কর্মমুখী শিক্ষা কাজের নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মোচন করে। চাকরির আশায় চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করতে হয় না। এ শিক্ষা বেকারত্ব নিরসন করে, দারিদ্র্য বিমোচন করে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রেখে থাকে। এছাড়াও কারিগরি শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেকোন বিষয়ে হাতে কলমে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে স্বনির্ভর হতে শিখে। কারিগরি শিক্ষায় ব্যবহারিক ও হাতে কলমে শিক্ষার সুযোগ থাকায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে।

শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রকৌশলীরাই চাকরির বাজার দখল করে রাখবে বিষয়টি আসলে এরকম নয়। বিভিন্ন প্রযুক্তিকে অবলম্বন করে সৃষ্টি হয়ে থাকে অনেক কর্মসংস্থানের। আর এ সকল কাজের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশিক্ষণ না নিয়েও স্বল্পমেয়াদী বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব। যেমন- মোবাইল ফোন কিংবা কম্পিউটারের কোন সমস্যা সমাধানের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যেকোন ব্যক্তিই কাজটি করতে পারবেন। আর চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের এই যুগে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব দিন দিন বেড়েই চলেছে।

কর্মক্ষেত্রের সম্ভাবনা

কারিগরি দক্ষতা অর্জন করে সরকারি বেসরকারি যেকোন প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ রয়েছে। আমাদের দেশে বিভিন্ন শিল্প কলকারখানা ও উৎপাদনমুখী কারখানা যেমন- নির্মাণ শিল্প ও হাউজিং, পর্যটন শিল্প, পরিবহন শিল্প, অটোমোবাইল সার্ভিসিং, ইস্পাত ও প্রকৌশল শিল্প, কেমিক্যালস ও ফার্মাসিউটিক্যালস শিল্প, ইলেকট্রনিক্স শিল্প, গ্লাস ও সিরামিক শিল্প, সার শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, কাগজ শিল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন শিল্প, গার্মেন্টস শিল্প, চা শিল্প, পাট ও বস্ত্র শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, মৃৎ শিল্প, খাদ্য ও সহায়ক শিল্প, দুগ্ধ ও পোল্ট্রি উৎপাদন কারখানা, হস্ত শিল্প, চামড়া ও রাবার শিল্প, বন শিল্প, আইসিটি শিল্প, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, নবায়নযোগ্য শক্তি (সোলার পাওয়ার, উইন্ড মিল) শিল্প, বায়ুগ্যাস শিল্প, সেবামূলক শিল্প,

হাসপাতাল ও ক্লিনিক, টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি ইত্যাদি ক্ষেত্রে কারিগরি দক্ষ ব্যক্তির কাজের সুযোগ রয়েছে।

এছাড়াও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোতেও কারিগরি দক্ষ ব্যক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে বহুজাতিক কোম্পানি, প্রাইভেট কোম্পানি, এনজিওগুলোতে কাজের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার মাধ্যমে চাকরি ছাড়াও নিজেদেরকে উদ্যোক্তা হিসেবেও তৈরি করতে পারে।

পাদ্রীশিবপুর এলাকায় কারিগরি শিক্ষার বিস্তার

* প্রথম কারিগরি শিক্ষা গ্রহণকারী ব্যক্তিদের তথ্য: নারিন্দা সেন্ট যোসেফ টেকনিক্যাল থেকে ইলেকট্রিক্যাল ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন বেঞ্জাবিন ডি'রোজারিও (মৃত); তিনি পাদ্রীশিবপুরের গেসফল ডি'রোজারিও এর সন্তান। একই সাথে ইলেকট্রনিক্স ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন সুবাস সরকার (মৃত); তিনি নিকোলাস নগেন্দ্রনাথ সরকার ও লুসি সরকারের সন্তান।
* কোন ওস্তাদের কাছ থেকে কিংবা নারিন্দা, মট্স এবং অন্যান্য টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠান থেকে অদ্যাবধি কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ ব্যক্তির সংখ্যা:

ক্রম	প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১.	মিরপুর এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং স্কুল (মট্স) লং টার্ম মেকানিক্যাল কোর্স (এলটিএমসি)- ৪৫ জন ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম- ৪৫ জন প্রজেক্ট- ৩ জন	৯৩ জন
২.	নারিন্দা সেন্ট যোসেফ টেকনিক্যাল	৩৫ জন
৩.	বাকেরগঞ্জ ট্রেড স্কুল	১০ জন
৪.	হোপ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, খুলনা	৩৩ জন
৫.	বরিশাল টেক্সটাইলস	১ জন
৬.	বরিশাল ইনফা পলিটেকনিক	১ জন
৭.	চট্টগ্রাম	৪ জন
৮.	অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	২ জন
	মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	**১৭৯ জন**

এছাড়াও বিভিন্ন সময় কাজের সুবাদে কোন দোকান থেকে বা কোন ওস্তাদের সাথে কাজ করতে গিয়ে কারিগরিভাবে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হয়েছে এমন ব্যক্তিদের সংখ্যাও রয়েছে।

কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তগণ বর্তমানে অনেকে দেশে এবং বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও বহুজাতিক কোম্পানিতে কর্মরত রয়েছেন। আবার কেউ আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজের এবং অন্যের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্য থেকে আবার কেউ পরলোকগত হয়েছেন।

প্রত্যাশা

এলাকার অন্যান্যদেরকে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব বুঝিয়ে কারিগরি শিক্ষায় তাদেরকে উৎসাহিত করা। কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ শনাক্ত করা ও তা মোকাবিলা করার পদক্ষেপ নেওয়া। যারা কারিগরি দক্ষতা অর্জন করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন তাদের মধ্যে নেটওয়ার্ক তৈরি করা। তাদেরকে নিয়ে সোস্যাল মিডিয়াতে বিভিন্ন গ্রুপ তৈরি করা যাতে কর্মসংস্থানের তথ্য আদান প্রদান করার সুযোগ থাকে। যারা চাকরি সন্ধানী এতে করে তারা লাভবান হবেন। এই এলাকা থেকে যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মী, কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী সবাইকে নিয়ে ফোরাম করা; আর ফোরামটি প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক অথবা প্যারিশ পর্যায়েও হতে পারে যাতে উপযোগী তথ্যের যথাযথ বিস্তরণ ঘটানো সম্ভব হতে পারে।

নিজ এলাকায় সম্ভাবনা

কারিগরি শিক্ষা লাভ করে দক্ষতা অর্জন করে উদ্যোগী হয়ে নিজ এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি এবং অন্যদেরকেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া। বিশেষত যারা উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তারা নিজ এলাকায় কর্মসংস্থানের পথ সৃষ্টি করতে পারেন। এতে করে বেকারত্ব হ্রাস পাবে, দারিদ্র্য বিমোচিত হবে, আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে; ব্যক্তি নিজে আর্থিক উন্নয়ন করবে এবং সমাজের উন্নয়ন ঘটবে।

পাদ্রীশিবপুর অধিবাসী ও অভিবাসীদের খ্রিস্টীয় জীবন: বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রত্যাশা

লেখক: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

অবতারণা:

একটি প্যারিশ হচ্ছে মণ্ডলীর মধ্যে এমন একটি অবকাঠামো যেখানে ডাইয়োসিসের ধর্মপাল দ্বারা নিযুক্তাধীন পাল-পুরোহিতের দায়িত্বে কিছু সংখ্যক খ্রিস্টবিশ্বাসীরা একটি মিলন সমাজ হিসেবে বাস করে। পাদ্রীশিবপুর প্যারিশও তাই। প্যারিশের সদস্য-সদস্যরা খ্রিস্টান, অর্থাৎ খ্রিস্টের অনুসারী ভক্তশিষ্য। দীক্ষাস্নান ও হস্তার্পণ সংস্কার দ্বারা পবিত্র আত্মায় তারা অভিষিক্ত হয়েছে। প্রতিদিন খ্রিস্টভক্ত খ্রিস্ট যিশুর কাছ থেকে পাওয়া যাজকীয় দায়িত্ব দ্বারা নিজেকে ও অপরকে পবিত্রীকরণ, প্রাপ্ত প্রাবক্তিক দায়িত্ব দ্বারা শিক্ষা ও সাক্ষ্যদান করে এবং প্রাপ্ত রাজকীয় দায়িত্ব দ্বারা পরিচালনা ও সেবা করে। এভাবে তারা খ্রিস্ট যিশুর মর্যাদা ও ভূমিকার অংশীদার। তারা পবিত্র জাতি, প্রাবক্তিক ও রাজকীয় যাজকসমাজ। দীক্ষাস্নাত খ্রিস্টবিশ্বাসীরাই হচ্ছে খ্রিস্টমণ্ডলীর গোড়া ও তৃণমূল ভিত্তি। মণ্ডলীতে তাদের সংখ্যা ৯৯.৪%। তারা ঈশ্বরের জনগণ। যেখানে তারা বাস করে সেখানে, অর্থাৎ পরিবারে ও স্থানীয় সমাজে খ্রিস্ট মণ্ডলী হয়ে ওঠবে, তাদের আপন পরিচয় বহন করবে ও তাদের মিশন দায়িত্ব পালন করবে। সেবাকারী যাজক যারা প্যারিশের পুরোহিত হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন তারাও খ্রিস্ট যিশুর মতো তাদের যাজকীয়, প্রাবক্তিক ও রাজকীয় মর্যাদা অনুসারে ভক্তজনগণের যাজকীয়, প্রাবক্তিক ও রাজকীয় জীবনের সেবা করে থাকেন।

প্রতিজন খ্রিস্টবিশ্বাসী যেমন অভিষিক্ত তেমনি আবার প্রেরিত। খ্রিস্টের মিশন পালন করার জন্য তারাই খ্রিস্টমণ্ডলীর অগ্রভাগে অবস্থান করে। মণ্ডলীর ফ্রন্টলাইনে থেকে তারাই খ্রিস্টের শিক্ষা ও সাক্ষ্য দান করবে। তাদের দ্বারাই মূলতঃ খ্রিস্টের মিশন সম্পন্ন হবে।

॥ ক ॥ পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের খ্রিস্টীয় জীবন

প্যারিশ-মণ্ডলী হচ্ছে মিলন ও মিলন-সমাজ। খ্রিস্টসমাজের আপন পরিচয় ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: পবিত্র আত্মার সহায়তায়, খ্রিস্টযীশুর অনুসরণে পরম পিতার সাথে মিলন। পবিত্র ত্রিত্বের সঙ্গে মিলন-রহস্য, ভাইবোন মানুষের সাথে মিলন ও একাত্মতার দৃশ্যমান করে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের সম্মিলিত জীবনযাপনের প্রকাশ ঘটে ও উপাসনায় তা সংস্কাররূপে উদ্‌যাপিত হয়। মণ্ডলী সম্পর্কে উপরোক্ত ধারণা কিন্তু দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার শিক্ষা থেকে এসেছে।

(১) পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের বর্তমান অবস্থা

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পূর্বে মণ্ডলী সম্বন্ধে ধারণা ভিন্ন ছিল যেখানে প্যারিশের পুরোহিতরাই ছিলেন সকল কিছুর কিছুর প্রধান, একমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ধর্মীয় ও প্রশাসনিক ক্ষমতা সব তার হাতে, তিনি সামাজিক, আর্থিক ও ধর্মীয় বিষয়ে প্রধান কর্তা। তখনকার দিনে প্যারিশের বিষয়ে কোন আলোচনা, জনগণের পরামর্শ বা তাদের মতামত গ্রহণের প্রয়োজন ছিল না। ফাদারগণ ছিলেন সবকিছুর দাতা এবং জনগণ ছিল মাত্র গ্রহীতা। মিশার ভাষা, গান, জনগণের আসন, অঙ্গ-ভঙ্গি ও ক্রিয়াসমূহ ছিল ভিন্ন ধরনের। এই ধারায় পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ গোড়াপত্তন থেকে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এফজিডি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার সময়ে প্যারিশের অধিবাসী ও অভিবাসী উভয়ই মতামত ব্যক্ত করেছে যে, সেই ধরনের মণ্ডলীর মডেল থেকে তারা দূরে চলে এসেছে এবং অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে। এই ধরনের ভাবধারা দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পরেও কিছুটা দেখা গেছে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার শিক্ষা তখনও যাজক, সন্ন্যাসব্রতী এবং ভক্তজনগণের কাছে পৌঁছে নি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা বিধেয় যে, আলোচনা-সভায় পাদ্রীশিবপুরবাসীরা বলেছেন যে, নানা পরিবর্তনের সাথে কিছু কিছু বিষয়ে পরিবর্তন হয়েছে তা বড়ই দুঃখজনক, যেমন: পারিবারিক প্রার্থনা ও জপমালা প্রার্থনা হ্রাস পেয়েছে, আগের ভক্তিভাব অনেকটা কমে গেছে, খ্রিস্টযাগে যোগদানে অনীহা দেখা যায়, ভক্তিমূলক গান-বাজনা কম, গ্রামে গ্রামে তপস্যাকালীন ও আগমনকালীন প্রার্থনায় অংশগ্রহণ কম, কুমারি মারীয়া ও সাধু আন্তনীর থান (প্রতিস্থান) দিয়ে নিশিজাগরণ তেমন একটা হয় না, উপবাস রাখার প্রতি অনীহা, পারিবারিক সম্পর্কে এবং পরিবারের মধ্যে ভাঙ্গন, ছেলেমেয়েদের ধর্মশিক্ষা ও জীবন গঠনের চর্চা অনেক কম, ধর্মীয় জীবনের প্রতি অনীহা, মোবাইলের প্রতি আসক্তি ও মাদকাসক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, সাংগঠনিক কার্যক্রম ও সামাজিক উৎসব কমে গেছে, সামাজিক বন্ধন কমে যাচ্ছে, স্থানীয় পরিবারগুলো অভিবাসনের ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ইত্যাদি।

বর্তমানের চ্যালেঞ্জ হলো উপরে বর্ণিত বর্তমান অবস্থায় কী করে ধর্মীয় ঐতিহ্যকে রক্ষা ও প্রাণবন্ত করা যায়? কী পদ্ধতিতে খ্রিষ্টবিশ্বাসে গভীরতা, ধর্মসংস্কারের প্রতি অনুরাগ, খ্রিস্টীয় নৈতিক জীবনের উন্নয়ন এবং প্রার্থনা ও ধর্মানুশীলন আরও নিয়মিত ও অর্থপূর্ণ করা যায়।

(২) নতুন প্রক্রিয়ায় পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লী হওয়া: "ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ"

খ্রিস্টমণ্ডলীকে তার আপন পরিচয় ও মিশনে গঠিত হতে হলে নতুন পদ্ধতি বা নতুন প্রক্রিয়া গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। প্রচলিত ও ঐতিহ্যগত পালকীয় পদ্ধতি খ্রিস্টমণ্ডলী আপন স্বরূপে ও মিশনদায়িত্বে গড়ে তুলতে আধুনিক কালে যথেষ্ট ফলপ্রসূ নয় বলে গোটা মণ্ডলীতে এখন স্বীকৃত। তাই স্থানীয় মণ্ডলীগুলো নতুন পদ্ধতিতে খ্রিস্টমণ্ডলী হওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ" বা "মৌলিক সমাজ" গঠন করা খিস্টমণ্ডলীর হওয়ার একটি নতুন পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ারূপে গৃহীত হয়েছে।

ধর্মপল্লীর মণ্ডলীকে বলা যায়,"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজগুলোর মিলন, যেখানে ভক্তজনগণ, সন্ন্যাসব্রতী ও যাজকগণ একে অন্যেকে ভাইবোন বলে গ্রহণ করে। তারা ঐশবাণী দ্বারা পুনরুত্থিত প্রভু যীশুর সংস্কারতুল্য উপস্থিতি ঘোষণা করে এবং খ্রিস্টীয় সমাজ গঠন করতে অনুপ্রাণিত করে"।

ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ বলতে কি বুঝি? ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ হচ্ছে: (ক) খ্রিস্টবিশ্বাসীদের সমাজ; (খ) নিয়মিতভাবে তারা একত্রে সম্মিলিত হয়; (গ) ভক্তজনগণের নেতৃত্বে; (ঘ) সমবেত উপাসনায় তাদের ধর্মবিশ্বাস উদ্‌যাপন করে; (ঙ) তাদের জীবনের সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সমস্যা ও সুযোগগুলো নিয়ে ধর্মবিশ্বাসের আলোকে চিন্তা-ভাবনা ও আলাপ-আলোচনা করে; (চ) তাদের সমস্যা ও সুযোগের বিষয়গুলো সম্বন্ধে ধর্মবিশ্বাসের আলোকে গৃহীত কর্মকান্ডে নিজেদেরকে নিয়োগ করে। (ছ) এ সবকিছুই তারা করে নিজস্ব সমাজের মধ্যে ও সম্মিলিতভাবে।

ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর সংবিধান রচনা করা হয়েছিল। এই সংবিধানটি দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার শিক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল; মণ্ডলীর সঠিক ধারণার উপর ভিত্তি করে সংবিধানটি লেখা হয়েছিল; ধর্মপল্লীকে স্থানীয় ভাবে ৮ টি ওয়ার্ডে এবং তিনটি উপকেন্দ্রে ১১টি ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজের ভাগ করে পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ যেন একটা মিলন সমাজ হয়ে ওঠে সেই আদর্শে সংবিধানটি রচনা করা হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে নিয়োগকৃত পালকদের আগ্রহের অভাবে, তাদের যত্নের অভাবে, জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে, জনগণের কিছু উদাসীনতার কারণে এবং বর্তমান পোপ ফ্রান্সিসের বলিষ্ঠ উক্তি "ক্লারিকালিজম" বা "যাজকতন্ত্রবাদ"-এর কারণে ঐ সমস্ত চিন্তাধারা ও অবকাঠামো অনেকটাই নিঃশেষ হয়ে গেছে। অথচ বর্তমান মণ্ডলীতে "সিনড-বিশিষ্ট" মণ্ডলীর কথা বলি, একসঙ্গে পথচলার কথা বলি; মণ্ডলী মিলন-সমাজ, অংশগ্রহণমূলক, প্রত্যেক দীক্ষার্থী খ্রিস্টানরা মিশনারী ইত্যাদি কথা বলি, অথচ পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর সংবিধানটি "সিনড মণ্ডলী"র আদলেই রচিত হয়েছিল। বিরূপ সমালোচনা করছি না, কিন্তু যা-কিছু ঐতিহ্যবাহী, ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচারণকে সক্রিয় করে রাখে, প্রাণবন্ত করে রাখে সেটার উপরই তো সবাইকে গুরুত্ব দিতে হয়।

অতএব পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের জন্য ভবিষ্যত প্রত্যাশা হচ্ছে বর্তমানের প্রয়োজন বিবেচনা করে অতীতে যা কিছু মঙ্গলকর ও প্রশংসাযোগ্য ছিল তার ওপর ভিত্তি করে খ্রিস্টীয় জীবনযাপন করা এবং পালকীয় সেবা ও যত্ন দান করা।

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ধর্মপাল দ্বারা অনুমোদিত সংবিধান অনুসারে ধর্মপল্লীর জীবন ও কাঠামোকে গড়ে তোলা। উক্ত কাঠামোতে পরিবার ও ক্ষুদ্র সমাজকে ফোকাস করে পালকীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা। ক্ষুদ্র সমাজগুলো নিজস্ব সামাজিক অবকাঠামো আছে যা সমাজকে চলমান করে রাখে। ক্ষুদ্র এই সমাজগুলো "খ্রিস্টান" কেননা খ্রিস্টবিশ্বাসীরূপে ভক্তজনেরা সমবেতভাবে (ক) প্রার্থনা–উপাসনা করে, (খ) ঐশবাণী শোনে ও মণ্ডলীর শিক্ষা গ্রহণ করে, (গ) একমন, একপ্রাণ হয়ে মিলনের সমাজ হিসেবে জীবনযাপন করতে চেষ্টা করে এবং (ঘ) সমাজ পরিচালনায় ও প্রয়োজনীয় সেবাকাজে তারা নিয়োজিত থাকে। ছোট ছোট এই খ্রিস্টান সমাজগুলো ধর্মপল্লীর "মৌলিক সমাজ" যা ধর্মপল্লীকে মূল থেকে সুদৃঢ় করে রাখে। এই সমাজগুলো মণ্ডলীর ভক্তজনগণের জীবন ও সংস্কৃতিতে ভিত্তিমূল হয়ে থাকে। ভক্তজন দ্বারা পরিচালিত এই খ্রিস্টান সমাজগুলোর মধ্যে খ্রিস্টমণ্ডলী ক্ষুদ্রাকারে উপস্থিত। মণ্ডলীর পালকদের সাথে মিলন–বন্ধনে আবদ্ধ থেকে এই ক্ষুদ্র সমাজগুলো তৃণমূল পর্যায়ে অবস্থান করে। মণ্ডলী হওয়ার প্রক্রিয়ায় তারা সক্রিয় এবং মণ্ডলীর মিশন কর্মে তারা নিয়োজিত। তৃণমূল পর্যায়ে এই খ্রিস্টান সমাজগুলোর সাক্ষ্যদানে মণ্ডলী জীবন্ত ও অন্যের কাছে পরিচিত।

প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য ৭-৯ জন ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি পালকীয় টিম গঠন করা। স্থানীয় সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিদের, অর্থাৎ শিশু, যুব, দম্পতি, রোগী ও বৃদ্ধ, উপাসনা, এবং সামাজিক বিষয়ে দেখাশুনা করার জন্য পরিচালক বা পরিচালিকা মনোনীত করা হবে এবং একজনের উপর সভাপতি বা সভানেত্রীর দায়িত্ব অর্পণ করে উক্ত পালকীয় টিম গঠন করা হবে। এই পালকীয় টিম ধর্মপল্লীর পালকদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দায়িত্ব পালন করবে।

মৌলিক সমাজের বিভিন্ন পরিচালক পরিচালিকাদের গঠন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যাতে তারা নিয়মিতভাবে সভা পরিচালনা করতে পারে। তাদেরকে জীবন-পর্যালোচনা পদ্ধতি, বাইবেল সহভাগিতা পদ্ধতি, নেতৃত্ব দানের স্টাইল সম্বন্ধে, আপন দায়িত্ব সম্পর্কে এবং ক্ষুদ্র সমাজের আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে গঠন-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(৩) "ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ"-এর বিশেষত্ব ও লক্ষণ

তৃণমূলে "ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ" এমনভাবে গড়ে উঠবে যেখানে বিশেষ করে নিম্নোক্ত চারটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হবে:

১) ক্ষুদ্র দলে খ্রিস্টভক্তেরা ঐশবাণী শ্রবণে মিলিত হয়: ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজে ঈশ্বরের বাণী কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে থাকে। খ্রিস্টযীশু, যিনি ঈশ্বরের বাণী, মানবদেহ গ্রহণ করে তিনি জগতে প্রবেশ করেছেন। সুতরাং খ্রিস্টভক্তেরা যেখানেই মিলিত হবে সেখানে সর্বাগ্রে ও সবকিছুর কেন্দ্রে থাকবে ঈশ্বরের বাণী। ঈশ্বরের বানী শ্রবণ ক'রে ও তা সহভাগিতা ক'রে খ্রিস্টভক্তেরা ঈশ্বরের সন্তান হয়ে পরিপক্কতা লাভ করে ; জগতের সকল জটিল বিষয়গুলো মঙ্গলসমাচারে আলোকে দেখতে, চিনতে ও যাচাই করতে সক্ষম হয়।

২) ক্ষুদ্র দলে খ্রিস্টভক্তেরা মিলিত হ'য়ে পরস্পরের মধ্যে সমাজ গঠন করে: ধর্মপল্লী পর্যায়ে সকল ভক্তের সঙ্গে ব্যক্তি সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজদলে ভক্তের সংখ্যা সীমিত থাকায় খ্রিস্টভক্তেরা পরস্পরের সাথে প্রেমসম্পর্ক ও মিলনবন্ধন অনুভব করে, সমাজবোধে অন্তর জাগ্রত হয় একই বিশ্বাসের কারণে একাত্মতা উপলব্ধি হয়।

৩) ক্ষুদ্র দলে একাত্ম হয়ে খ্রিস্টভক্তেরা প্রার্থনায় মিলিত হয়: ক্ষুদ্র সমাজে খ্রিস্টভক্তেরা একসঙ্গে নিয়মিতভাবে প্রার্থনা করে এবং এভাবে তাদের আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি ঘটে। ক্ষুদ্র সমাজে দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা সহভাগিতার ফলে ভক্তেরা অপরের আধ্যাত্মিকতার স্পর্শে সমৃদ্ধ হয়। ক্ষুদ্র সমাজ মিলনের আধ্যাত্মিকতার পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং আধ্যাত্মিকতাও হয়ে ওঠে মিলনধর্মী।

৪) ক্ষুদ্র দলে খ্রিস্টভক্তেরা আপন জীবনে ও সমাজে মঙ্গলসমাচার সত্য করে তোলে: ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজের ভক্তেরা নিত্যদিনের জীবনাবস্থায় ঈশ্বরের বাণী অনুসারে জীবন যাপন করতে চেষ্টা করে। ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে বাইবেল সহভাগিতা করা এবং বাইবেলের আলোকে সামাজিক ও মাণ্ডলিক বিষয়গুলো সহভাগিতা করার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। তবে সকল পদ্ধতিরই উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরের বাণী কেবলমাত্র ধ্যান করা নয়, বরং ধ্যানে প্রাপ্ত জ্ঞান দৈনন্দিন জীবনাচারণে প্রয়োগ করা, যাতে সংসার জীবনের বাস্তবতায় ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

॥ খ ॥ পাদ্রীশিবপুর-অভিবাসীদের জন্য খ্রিস্টীয় জীবনধারা

অভিবাসন এলাকার প্যারিশের সাথে সম্পৃক্ততা: পাদ্রীশিবপুর থেকে যারা অভিবাসী হয়ে জীবনযাপন করছে তাদেরকে অবশ্যই একটি প্যারিশের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে, প্যারিশের কর্মকাণ্ডে যোগদান করতে হবে। শহরে হারিয়ে যাওয়ার বা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার প্রলোভন অনেক বেশি; তাই সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে। প্যারিশের দ্বারা প্রদত্ত সকল সেবাসমূহ গ্রহণ করা খ্রিস্টীয় জীবনের দায়িত্ব। শহরেও একটি এলাকার খ্রিস্টসমাজের সাথে সংযুক্ত থাকা, সক্রিয় খ্রিস্টজীবনেরই অঙ্গস্বরূপ।

ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের জন্য অভিবাসীদের আগ্রহ: বয়স্ক খ্রিস্টবিশ্বাসীর জন্য প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে ধর্মশিক্ষা, যার মাধ্যমে তারা তাদের আপন পরিচয়, মর্যাদা, আহ্বান, ভূমিকা মিশনদায়িত্ব সম্পর্কে নিয়মিতভাবে ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করবে। তবে বয়স্কদের জন্য ধর্মশিক্ষার পদ্ধতিও নতুন হতে হবে যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী ও সক্ষম হয়। তাদের শিক্ষা যেন বাস্তবমুখী হয় এবং শিক্ষাকালে তারা সর্বদা কর্মে সক্রিয় ও সৃজনশীল হয়।

ধর্মশিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব পালনে পরিবারগুলো অনেক সময় অপারগ ও অসমর্থ। বয়স্করা তাদের জীবন অবস্থা ও পেশা অনুযায়ী খ্রিস্টীয় জীবনযাপন করার জন্য উপযোগী শিক্ষা পাচ্ছে না। আধুনিক জীবনের নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর তারা সঠিকভাবে দিতে পারছে না। নিজের ধর্মবিশ্বাস অন্যের কাছে বলার সামর্থ্য তেমন নেই। জগত-সংসারের শিক্ষায় যত অগ্রসর হয়েছে ধর্মীয় শিক্ষায় তারা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে। এ সব পরিস্থিতি সম্বন্ধে মণ্ডলী অনেকটা সচেতন। ধর্মশিক্ষাদানের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে মণ্ডলী আগ্রহী।

অভিবাসীদের সমন্বিত গঠন প্রশিক্ষণ: পরিচালক ও পরিচালিকাদের উপযুক্ত গঠন-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। গঠন প্রশিক্ষণের মধ্যে যে দিকসমূহ গুরুত্ব পাবে তা হল: আধ্যাত্মিক জীবন, ব্যবহারিক জ্ঞান, মানবিক উন্নয়ন ও কাজে কৌশল ও দক্ষতা। গঠন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে ফল প্রত্যাশা করা হবে তা হল নিম্নরূপ: গঠন ও প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থীকে মুক্ত করবে: অপরের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করবে, বিশেষজ্ঞ না করে তাদের মধ্যে সমতা ও সহ-দায়িত্ববোধ জাগ্রত করবে; শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে; তার আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে এবং সৃজনশীল, সহকর্মীর মনোভাব বৃদ্ধি করবে।

অভিবাসীদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবন: মণ্ডলীতে অনেক ভক্তপ্রাণ ও খ্রিস্টবিশ্বাসী পুরুষ ও নারী আছেন যারা তাদের বর্তমান ধর্মীয় জীবন ও আচরণ নিয়ে বেশ চিন্তিত। ভোগবাদ, বস্তুবাদ, লোকায়তাবাদ, কর্মব্যস্ততা, যুক্তিবাদ, উদাসীনতা, আধুনিক ও তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার ইত্যাদি চিরাচরিত "ধর্মীয়" ঐতিহ্য, চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যকে আবছা করে ফেলছে। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের এই উৎকণ্ঠা তাদের ধার্মিকতারই প্রকাশ।

পরিবার ও পারিবারিক জীবন: মণ্ডলীর ভিত্তিমূলে রয়েছে খ্রিস্টীয় পরিবার। এই পরিবারগুলো হচ্ছে মণ্ডলীর প্রাণকেন্দ্র। ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিকল্পনায়ও পরিবার বিশেষ গুরুত্ব পাবে। পরিবারকে কেন্দ্র বা ফোকাস করে ধর্মপ্রদেশগুলো পালকীয় কার্যক্রম নির্ধারণ করতে হবে। বিবাহিত বা পারিবারিক জীবনে মানবিক, সামাজিক, ধর্মতাত্ত্বিক, সংস্কারিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে সেমিনার, সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। পরিবারকে পরিচর্যা করার জন্য কর্মীদের গঠনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

খ্রিস্টান পরিবারের মধ্যে যে মূল্যবোধগুলো সচরাচর দেখা যায় সেগুলোকে বলা যায় ঈশ্বরের কাজ, ঐশরাজ্যের নিদর্শন এবং আত্মার সক্রিয়তার প্রমাণ। পরিবারের মধ্যে যে মূল্যবোধগুলো কমবেশি দেখা যায় তা হলো: ঐশ ব্যবস্থায় বিবাহের স্থান, বিবাহের স্থায়ীত্ব ও অবিচ্ছেদ্যতা, সন্তান ঈশ্বরের দান, পিতামাতার ত্যাগ ও আত্মদান, পারিবারিক সম্পর্ক, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা, যত্ন ও তাদের জন্য কষ্টস্বীকার, পরিবারের আতিথ্য, সমস্যা সংকট কালে ধীরতা, স্থিরতা, ধৈর্যশীলতা ও আশাবাদ, ধর্মভিরুতা ও ঈশ্বরবোধ, দারিদ্র্য ও জীবন বিনাশক নানা শক্তির মধ্যেও পরিবারের স্থিতিশীলতা, ধর্মীয় আহ্বানের প্রতি পরিবারের আগ্রহ ও তাদের অবদান, ইত্যাদি। এই সব মূল্যবোধ অধিকাংশ পরিবারকে ধারণ ও লালন করছে।

বর্তমান সময়ে আবার খ্রিস্টীয় পরিবার বিরাট হুমকি বা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। পরিবার ও পারিবারিক জীবনকে নানা নাশকতামূলক শক্তি আক্রমণ করছে। এই শক্তিগুলো হচ্ছে: দারিদ্র্য, ভূমি ও পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে উৎখাত, অভিবাসন, লৌকিকতা, ভোগবাদ, বস্তুবাদ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাব, জ্ঞানের দারিদ্র্য, আধ্যাত্মিকতার দারিদ্র্য, মৌলবাদ, পিতৃতান্ত্রিকতা, নারী পুরুষের বৈষম্য, পরিবারের মধ্যে সহিংসতা ও নির্যাতন, "জন্ম নিয়ন্ত্রণ মনোভাব", পরিবারের মধ্যে গণ-মাধ্যমের অশুভ চাপ, যুবদের মধ্যে সংকট, দেশ ও সমাজের মধ্যে সংঘাতময় পরিবেশ ইত্যাদি।

পরিবার–বিরোধী এই শক্তিসমূহ সম্বন্ধে অনেক গৃহ মণ্ডলী এবং সামগ্রিকভাবে মণ্ডলী বেশ সচেতন। এই সচেতনতা পবিত্র আত্মারই কাজ। এই সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিচর্যা দিয়ে প্রতিটি খ্রিস্টান পরিবারকে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য সামর্থবান করে তোলা হচ্ছে মণ্ডলীর আশু চ্যালেঞ্জ।

মণ্ডলীতে অভিবাসীদের অংশগ্রহণ: পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মণ্ডলী হচ্ছে মিলন–সমাজ। এই মিলন–সমাজে আছে তিনটি জীবন অবস্থা: যাজক, ধর্মব্রতী ও ভক্তজনগণ। প্রত্যেকেরই আপন জীবন–অবস্থা অনুসারে মণ্ডলীতে তাদের ভূমিকা রয়েছে। ভক্তজনগণের অংশগ্রহণের ব্যাপারে আমরা দুটো ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারি: (ক) খ্রিস্টবিশ্বাসী ভক্তজনের নিজস্ব জীবন অবস্থায় অংশগ্রহণ, যেমন বিবাহিত ও পারিবারিক জীবন, পেশাগত জীবন, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অংশগ্রহণ। (খ) খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে মাণ্ডলীক সেবাকাজে অংশগ্রহণ, যেমন মণ্ডলীর বিভিন্ন কাজে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ত্রাণ ও উন্নয়নমূলক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসেবে অংশগ্রহণ; ধর্মপল্লী, ধর্মপ্রদেশ বা জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কমিশন, পরিষদ, উপ–পরিষদ, কমিটির সদস্যরূপে বিভিন্ন সেবাদানে অংশগ্রহণ; মণ্ডলীর আর্থিক প্রয়োজনে অর্থ–সাহায্য দানে অংশগ্রহণ; কাটেখ্রিস্ট, ধর্মশিক্ষক, প্রার্থনা পরিচালক, প্রভৃতি কর্মীদলরূপে অংশগ্রহণ। জীবন অবস্থা মাণ্ডলীক সেবাকাজে এই উভয় ক্ষেত্রে ভক্তজনগণের অংশগ্রহণ আগের চাইতে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাছাড়া মণ্ডলীতে রয়েছে ভক্তজনগণের অনেক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান। এই সংগঠনগুলো বিভিন্ন নামে পরিচিত। তবে সামগ্রিকভাবে নিম্নোক্ত শ্রেণির আওতায় বিবেচনা করা যায়, যেমন, ক্রেডিট ইউনিয়ন, এন.জি.ও., বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ণমূলক প্রকল্প, সেবামূলক কর্মসূচী, পুরুষ ও নারী ভক্তজনগণের ধর্মীয় সংঘ সমিতি, শিশু ও যুবসংঘ/ক্লাব/ আন্দোলন, ইত্যাদি। এই সংগঠনগুলোর মাধ্যমে ভক্তজনগণ খ্রিস্টীয় আদর্শ প্রচার ও সেবাদানের উদ্দেশ্যে কাজ করবে।

ভবিষ্যতে মণ্ডলীতে ভক্তজনগণের অংশগ্রহণের ব্যাপারে নিম্নোক্ত বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া একান্ত প্রয়োজন : আপন জীবন পেশা, কর্মক্ষেত্র এবং আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে খ্রিস্টাদর্শ অনুযায়ী ভূমিকা রাখার জন্য ভক্তজনগণের মধ্যে সচেতনতা; খ্রিস্টান সংঘ–সংগঠনে খ্রিস্টীয় আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় আরও গুরুত্ব দেওয়া; খ্রিস্টীয় সেবা, পরিচালনা ও নেতৃত্বে গঠন ও তার বিকাশ, খ্রিস্টান সংগঠনগুলোর জন্য আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতা ব্যবস্থা; ভক্তজনগণের অংশগ্রহণের প্রতি মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের বিশেষ মনোযোগ; পালকীয় পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নে পুরুষ ও নারী উভয়ের অংশগ্রহণ আরও জোরদার করা।

উপসংহার: দুটো বিষয় সংক্ষিপ্ত মোটা দাগে উল্লেখের মধ্য দিয়ে প্রবন্ধটি শেষ করতে চাই:

গ্রামীণ পরিবেশে খ্রিস্টান হওয়া আর নগরে বা মহানগরে খ্রিস্টান হওয়া ও থাকা একই নয়। প্রথমত, এ বিষয়ে প্রত্যেক অভিবাসীকে সচেতন হতে হবে। নগরে বা মহানগরে খ্রিস্টান থাকা বা হওয়ার জন্য প্রত্যেককে একটা ব্যক্তিগত ও দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তাদের সচেতন হতে হবে যে, অভিবাসনের অবস্থায় তারা যিশুর শিষ্য, তারা যেখানে আছে যিশু তাদেরকে সেই অবস্থানে মিশনারী রূপে প্রেরণ করেছেন।

গির্জার কাছে বাস করা অথবা গির্জা থেকে দূরে বাস করা বড় কথা নয়। পিতামাতা ও সন্তান উভয়ের জন্য একান্ত প্রয়োজন হচ্ছে প্রতি ঘরে যেন প্রার্থনা ও ঐশবাণী পাঠ করা হয়। সমবেতভাবে একসঙ্গে প্রার্থনা না করতে পারলেও, পরিবার যেন প্রার্থনা-শূন্য না হয়। মনে রাখতে হবে প্রতিটি পরিবার একটি গৃহ-মণ্ডলী। সেই মণ্ডলীতে খ্রিস্টান হওয়া প্রাথমিক বিষয়।

পাদ্রীশিবপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রত্যাশা

লেখক: মি. যোসেফ ডি'রোজারিও

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য একটি সমাজ ব্যবস্থাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে থাকে। এই পুস্তকের পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে পাদ্রীশিবপুরের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পাদ্রীশিবপুরের এই মহামূল্যবান সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের লালন পালন তথা সংরক্ষণ করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। আমরা যদি লক্ষ্য করি অতীতের অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে একেবারে। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের যেমনটি হারিয়েছি তেমনটি তাদের সময়ে যে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তারা ধারণ করেছিলেন তাও হারিয়ে ফেলেছি।

''শ্রীমন্ত-বাটে ঃ পাদ্রীশিবপুর ঐতিহ্যবাহী একটি খ্রিস্টান জনপদ'' শীর্ষক গ্রন্থে পাঠকগণ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে অতীতের অনেক কিছুই এখানে প্রকাশিত হয়েছে। তারপরেও অনেক কিছুই আমাদের অগোচরে রয়ে গেছে যা সকলের সামনে তুলে ধরা যেতো। আর এখানেই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির সূত্রপাত আমরা আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য কিভাবে সংরক্ষণ করতে পারি। সাথে সাথে প্রত্যাশার ক্ষেত্রটিও বিবেচনায় আনতে হবে। প্রথমত: একটি কাজের সুচনা হয়েছে এই পুস্তক প্রকাশের মাধ্যমে। সাথে সাথে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মিসেস মনিকা গোমেজ, জার্মান তরুন গোমেজ, এলিন গোমেজসহ আরও কিছু ব্যক্তি পাদ্রীশিবপুরের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে কম বেশি কাজ করে চলেছেন। এভাবেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধরে রাখার বিষয়টি বাস্তবায়িত হতে পারে। পুরাতনকে ফেলে না দিয়ে তাকে ধরে রাখা, বর্তমানকেও সংরক্ষণ করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে রেখে যাওয়া আমাদের দায়িত্ব।

এজন্য যেসব পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে তাহলো প্রথমতঃ আমাদের প্রতিটি পরিবারের একটি পরিচিতি আছে, আমাদের বংশ পরিচয় যদি প্রতিটি পরিবার তুলে ধরে এবং তা একসাথে মিলে মিশে প্রকাশ ও প্রচারসহ কোনভাবে লিখিত আকারে সংরক্ষণ করে তবে প্রতিটি পরিবারের ইতিহাস রয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের প্রতিটি পরিবারেই কিছু না কিছু প্রাচীন দ্রব্য রয়েছে যা আমাদের পুর্বপুরুষগণ ব্যবহার করেছেন। এখন হয়তো তাতে ধুলোর আস্তরণ জমেছে। এগুলোতো আমাদের পরিবারে ঐতিহ্যকে ধারণ করে। যদি পাদ্রীশিবপুরে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় যে প্রতিটি পরিবারের ঐতিহ্যবাহী যা কিছু তা আমরা সংগ্রহ করবো এবং একটি নির্দিষ্ট স্থানে তা সংরক্ষণ করবো। এই কাজে বিশেষ করে ধর্মপল্লী ও যুব সমাজ বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে বলেই আমার বিশ্বাস।

আমাদের সংস্কৃতি যাতে হারিয়ে না যায় সেদিকে আমাদের যত্নবান হওয়া দরকার। আমাদের বিভিন্ন গান, আমাদের বিভিন্ন খেলাধুলা, আমাদের বিভিন্ন লাইফ স্টাইলের সামগ্রী যেন আমরা রক্ষা করি। আশার বিষয় হলো এই যে রামুর পালাগান এখনও সুন্দরভাবে সংরক্ষিত ও প্রচারিত হচ্ছে। এই পালাগান পাদ্রীশিবপুরের সীমানা পেড়িয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এটা অবশ্যই ভালো দিক। এভাবেই আমাদের হয়লার গান, জারিগান, নাট্যাভিনয়, নৃত্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি রক্ষা করা প্রয়োজন। যেমনটি ময়মনসিংহ গীতিকায় প্রাচীন বাংলার অনেক ঐতিহ্য সংরক্ষিত হয়েছে তেমনি আমাদেরও একটি সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আর সত্যি যদি আমরা এমন একটি উদ্যোগ নিতে পারি তা হবে আমাদের জন্য একটি বিশাল সম্পদ। হয়তো মনে হতে পারে যে, এজন্য একটি আর্থিক ব্যয় রয়েছে। আসলে আর্থিক সমস্যার সমাধান করা খুব দুরুহ নয়। বরং এই কাজ হাতে নিয়ে বাস্তবায়ন করাটাই কঠিন। সেই সে কঠিনেরে ভালোবেসে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। সেই সে দিনের প্রত্যাশায় রইলাম।

মা মারীয়ার প্রতি বর্তমানের ভক্তি ও ভবিষ্যতের প্রত্যাশা

ফা: রুবেন ম্যানুয়েল গমেজ, সিএসসি

ভূমিকা: যুগে যুগে খ্রিস্টভক্তগণ মা মারীয়ার প্রতি বিশেষ ভক্তি, ভালবাসা, বিশ্বাস প্রদর্শন করে আসছে। অনেকেই গভীরভাবে মা মারীয়াকে প্রার্থনায় অভিজ্ঞতা করেছে ও তাঁর ভালবাসায় ও আশীর্বাদে তাদের জীবন ধন্য হয়েছে। তাই মা মারীয়া খ্রিস্টভক্তদের অন্তরে অনেক বড় স্থান দখল করে আছে। কারণ তিনি আমাদের সবার মা। যিশু আমাদের সবাইকে তাঁর মায়ের ভাগ দিয়েছেন। তিনি একাধারে প্রার্থনার মহাশক্তির রাণী, ঈশ্বর নন্দিনী, সহায়িনী, কল্যাণময়ী। তার মাতৃত্ব সর্বজনীন। কুমারী মারীয়া হলেন প্রকৃত অর্থেই ঈশ্বর ও মুক্তিদাতার মা হিসাবে স্বীকৃত ও সম্মানিত। মারীয়া হলেন মণ্ডলীর প্রতীক। তাই মারীয়ার জীবনের রহস্যগুলোই হয়ে উঠেছে মণ্ডলীর জীবনের রহস্য। মারীয়া শুধু মানব যীশুর মা-ই নন, তিনি ঈশ্বর যিশুরও মা। সেই সাথে তিনি খ্রিস্ট মণ্ডলীরও মাতা, অর্থাৎ সকল ঐশ জনগণ - খ্রিস্টভক্ত ও পালকদেরও মাতা। তিনি তাঁর ভালবাসা দ্বারা খ্রিস্টমণ্ডলীতে বিশ্বাসীদের জন্মদানে সাহায্য করেছেন। খ্রিস্টের সঙ্গে মারীয়ার মিলন যেমন অবিচ্ছেদ্য, তেমনি মণ্ডলীর সাথে তার বন্ধনও অবিচ্ছেদ্য। একজন খ্রিস্টভক্ত হিসেবে আমদেরই মঙ্গলের জন্য তাঁর প্রতি আমাদের এই ভক্তি ভালাবাসা, বিশ্বাস দিনে দিনে আর বৃদ্ধি করা খুবই প্রয়োজন।

মারীয়ার প্রতি আমাদের ভক্তি: "যুগে যুগে সকলে আমাকে ধন্যা বলবে।" তিনি পিতার ইচ্ছার প্রতি, পুত্রের মুক্তিদায়ী কাজের প্রতি ও পবিত্র আত্মার সার্বক্ষণিক সকল নির্দেশের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত থেকে মণ্ডলীর বিশ্বাস ও ভালবাসার আদর্শ হয়েছেন। তাই তিনি খ্রিস্টমণ্ডলীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সম্পূর্ণরূপে অনন্য সদস্যা। প্রকৃতপক্ষে তিনি খ্রিস্টমণ্ডলীর আদর্শ বাস্তবায়ন। তিনি তার বাধ্যতা, বিশ্বাস, আশা এবং জলন্ত প্রেম দ্বারা মানুষের জন্য ঐশ্বরিক জীবন ব্যবস্থার জন্য সহযোগিতা করেছেন এবং এখনো প্রার্থনা ও অনুনয়নের মাধ্যমে আমাদের উদ্দেশ্যে সর্বদা কাজ করে যাচ্ছেন। তাই তিনি সহায়িকা, সাহায্যকারিণী, মঙ্গলকারিণী, মধ্যস্থতাকারিণী বলে আখ্যায়িত। মাতামণ্ডলী বিশ্বাস ও আশা নিয়ে

মারীয়ার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করতে অনুপ্রাণিত করে। মারীয়া আমাদের আদর্শ, আমাদেরই মাতা। তাই তাঁর আদর্শ ও মাতৃত্বের প্রতি আমাদের প্রত্যেকেরই থাকা উচিত গভীর ভক্তি, ভালবাসা ও বিশ্বাস। সন্তানের মা ডাকে মারীয়া আর নীরব, নিষ্ক্রিয় ও দূরে থাকতে পারে না; তাই বিপদে-আপদে এমনকি জীবনের সর্ব অবস্থাতেই মারীয়ার কাছে বিশ্বাস নিয়ে প্রার্থনা করলে তা পূর্ণ হবেই হবে। আমাদের মুখে উচ্চারিত প্রতিটি প্রণাম মারীয়া প্রার্থনা-ধূপের ধোয়ার ন্যায় স্বর্গপানে ছুটে চলে এবং এর ফলে স্বর্গীয় অনুগ্রহ আমাদের জীবনে নেমে আসে। প্রার্থনা ও মারীয়ার প্রতি ভক্তির মাধ্যমে যে অনুগ্রহ পাওয়ার সুযোগ রয়েছে তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা আমাদের উচিত হবে না।

মারীয়ার জপমালায় খ্রিস্টকে লাভ: পোপ দ্বিতীয় জন পল বলেন: জপমালা প্রার্থনায় রয়েছে পূর্ণভাবে মঙ্গলসমাচারের গভীর বার্তা। ধন্যা কুমারী মারীয়ার জপমালা প্রার্থনাটি খ্রিস্ট-কেন্দ্রিক। এটি এমনই ভক্তি, যা খ্রিস্টবিশ্বাসের খ্রিস্টীয় কেন্দ্রের দিকে নির্দেশ করে। তাই বিশ্বাস ও প্রেমে বেড়ে উঠতে জপমালা প্রার্থনা নিতান্ত জরুরী। আমরা কল্পনা করতে পারি যে, এমন একজন মায়ের সাথে জপমালা প্রার্থনা করি, যিনি সম্পূর্ণভাবে তার পুত্রের কাছে উৎসর্গীকৃত বা নিবেদিত। আমরা তার সাথে অবস্থান বা বাস করে যোহনের (আমাদের) প্রতি ক্রুশের উপর দেয়া যীশুর আদেশ "ঐ দেখ তোমার মা" (যোহন ১৯:২৬) আমাদের জন্যও প্রযোজ্য। প্রকৃত অর্থে জপমালায় শুধু মারীয়াকে স্মরণ করা নয় কিন্তু এ প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা পরম পিতাকে স্মরণ করি ও পবিত্র ত্রিত্বের মহিমা কীর্তন করি। ফলে মণ্ডলী জপমালা প্রার্থনা আরও অধিক মনোযোগ ও বিশ্বাসের সহিত করার জন্য ভক্তদের উৎসাহিত করেন, যেন এ প্রার্থনার সাহায্যে কুমারী মারীয়ার মধ্যস্থতায় আমরা যিশুর সান্নিধ্য লাভ করি।

সাধু পোপ দ্বিতীয় জন পল বলেন "পবিত্র জপমালা প্রার্থনা হলো পবিত্র মঙ্গলসমাচারের সার-সংক্ষেপ।" মা মারীয়ার সাথে আমরা যীশুর জীবন ধ্যান করি। "মারীয়ার প্রতি জপমালা প্রার্থনা হল সেই মধুর শিকল, যা ঈশ্বরের সাথে আমাদের সংযুক্ত করে দেয়। সাধু পোপ দশম পিউস বলেন: "তুমি যদি তোমার অন্তর ও মনে তোমার ঘরে, তোমার দেশে শান্তি চাও; তবে প্রতি রাতে সম্মিলিতভাবে জপমালা প্রার্থনা কর"।

পরিবার জীবনে জপমালার গুরুত্ব: জপমালা হল একটি আধ্যাত্মিক শক্তি। খাদ্য ছাড়া যেমন শরীরকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয় তেমনিভাবে আধ্যাত্মিক জীবনকে সুস্থ, সবল ও প্রাণবন্ত রাখতে জপমালা প্রার্থনা তথা পারিবারিক জপমালা প্রার্থনা ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করা যায়না। জপমালা আমাদের স্বর্গের দিকে নিয়ে যায় ও পৌছে দেয়। মধ্যস্থানের আত্মাকে স্বর্গে নিয়ে যায়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, গোটা বিশ্বে তথা বাংলাদেশে শত শত খ্রিস্টভক্তরা হলেন জপমালা প্রার্থনার আশ্চর্য ফল পাওয়ার জীবন্ত সাক্ষী। জপমালা করে আমাদের পরিবার গুলি সে সব কৃপা লাভ করতে পারে তা হল: আধ্যাত্মিকভাবে শান্তি লাভ, একান্ত মনোবাঞ্ছা পূরণ, রোগশোক থেকে নিরাময়, প্রলোভন জয়, মনপরিবর্তন সাধন, সুসম্পর্ক ও বিবাহ বন্ধন দৃঢ় করণ ইত্যাদি। পারিবারিক জীবনের আধ্যাত্মিক খাদ্য হল জপমালা প্রার্থনা। ভাটিকানের একজন যাজক ফাদার গাব্রিয়েল আর্মোত, যিনি অপদূত তাড়িয়ে বেড়ান; একবার শয়তান তাকে বলেন: "খ্রিস্টানরা যদি জানতো যে জপমালার কত শক্তি আছে তবে; এটা হত আমার নিঃশেষ হবার সময়।" জপমালা প্রার্থনা হল পরিবারের প্রধান শক্তি।

প্রতিটি খ্রিস্টীয় পরিবারই হলো ক্ষুদ্র "গৃহ-মণ্ডলী"। "যে পরিবার একত্রে প্রার্থনা করে, সেই পরিবার একত্রে বাস করে" – এটি 'জপমালা-যাজক' ফাদার প্যাট্রিক পেইটনের সুবিখ্যাত ও সুপরিচিত উক্তি। প্রতিটি জীবনের বিশ্বাসের ভিত গড়ে ওঠে একটি পরিবারে তাই পরিবারে পিতামাতা যদি বিশ্বাসে দূর্বল হন তবে তাদের সন্তানও বিশ্বাসে দূর্বল হবে। মা মারীয়া ও সাধু যোসেফের বিশ্বাসের জীবন দৃঢ় হওয়ায় যীশুর জীবনটা খুব শক্ত ভিতের ওপর গড়ে ওঠে। পরিবার ও প্রার্থনা হলো খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রাণকেন্দ্র।' জপমালা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে খ্রিস্ট পরিবারের মধ্যে উপস্থিত থাকেন এবং সকলকে একত্রিত করে রাখেন। যে পরিবার প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা করে সে পরিবার যীশু, মা মারীয়া ও সাধু যোসেফের মত আদর্শ পরিবার হিসেবে গড়ে উঠে। প্রার্থনাকে বলা হয় হৃদয়ের জীবন। পারিবারিক জপমালা প্রার্থনা পরিবারের সকল সদস্য-সদস্যাকে এক গভীর প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে এবং একে অপরের ভুল-ত্রুটি'কে ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখতে শক্তি যোগায়।

সুসম্পর্ক ও বিবাহ বন্ধন ধরে রাখতে জপমালা: আমরা দেখি সবাইকে একসাথে রাখার জন্য মা মারীয়া নিজে প্রার্থনা করতেন বিশেষ করে যীশুর শিষ্যদের নিয়ে (শিষ্যচরিত ১:১৪)। বর্তমান বাস্তবতায় পরিবারে স্বামী স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে সুসম্পর্ক ধরে রাখতে চাইলে জপমালার বিকল্প কিছু নাই; না হলে পরিবার গুলোতে আরও অনেক বিবাহ বিচ্ছেদ দেখা দিবে। সকল প্রকার সমস্যা, অশান্তি, কলহ বিবাদ থেকে মুক্ত হতে জপমালা প্রার্থনা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। জপমালা প্রার্থনায় মিলন শান্তি, ও একতা ও ভালবাসার বন্ধন দৃঢ় হয়। কেবলমাত্র পার্থিব মোহ-মায়া ও জিনিসের পিছনে না ছুটে আমরা যেন আধ্যাত্মিক সুখের সন্ধান করি। সুতরাং পারিবারিক সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় রাখতে ও রক্ষা করতে পারিবারিক জপমালা প্রার্থনার উপর জোর দিতে হবে।

পরিবারে ও ধর্মপল্লীতে প্রত্যাশিত বার্ষিক ও মাসিক কার্যক্রম: ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিতদের সাথে যোগাযোগ করে মা মারিয়ার জন্মদিন, মা মারীয়ার পর্ব দিবস উদ্‌যাপন, মা মারীয়ার মাস উদ্‌যাপন, নিশিজাগরণ, ঘরে আসন দান, উপবাস, নির্জন ধ্যান ও জপমালা প্রার্থনা, নভেনা, মা মারীয়ার গান রচনা, মা মারীয়ার নতুন ও পুরাতন গান শেখা ও গাওয়া, সম্মিলিত রোজারীমালা প্রার্থনা, র‍্যালী, রচনা, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা; যার লক্ষ্য হবে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক পারিবারিক জীবন এবং পারিবারিক প্রার্থনার জীবনকে দৃঢ়করণ ও নতুন প্রজন্মকে বিশ্বাসের ঐতিহ্যকে প্রদান করা ও বিশ্বাসের জীবনে এগিয়ে যাবার প্রত্যয়। বিশেষ ভাবে প্রতিটি পরিবার ও ব্যক্তিকে প্রতিদিন জপমালা ও অনন্য প্রার্থনা করতে আগ্রহী ও অনুপ্রাণিত হওয়া। ধর্মপল্লীগুলোতে অবশ্যই প্রার্থনা দল ও মা মারিয়ার সেনাসংঘ সক্রিয় থাকা। মে মাস ও অক্টোবর মাস মা মারীয়ার মাস এই বিশেষ সময় বিশ্বাসীগণ ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভবে তাঁর চরণে শ্রদ্ধা জানাবে ও ভক্তি নিবেদন করবে ও তাঁর মধ্যস্থতায় প্রার্থনা নিবেদন করবে। এই সময়ে ভক্তি সহকারে জপমালা করতে করতে তারা মায়ের মধ্যস্থতায় যীশুর মুখশ্রী'কে গভীরভাবে অনুধ্যান করবে।

শেষ কথা: এই জপমালা প্রার্থনাই প্রতিটি ভক্তদের জীবনে হয়ে উঠেছে অনাবিল শান্তি, পারিবারিক একতা, মিলন ও ভ্রাতৃত্বের শক্তিশালী মাধ্যম। পবিত্র জপমালাই হয়ে উঠুক আমাদের দৈনন্দিন জীবনের শক্তির উৎস। জপমালা প্রার্থনা হোক প্রতিটি পরিবারের প্রতিদিনের আধ্যাত্মিক খাদ্য। স্বর্গীয় বিশপ মাইকেল ডি' রোজারিও, সিএসসি, পারিবারিক জপমালার উপর একটি সুন্দর স্লোগান রচনা

করেছেন: "প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলা, প্রতি গৃহে জপমালা"। তাই আসুন আমরা মা মারীয়ার অনুরোধ রক্ষা ও প্রতিজ্ঞা করি যে, আমি প্রতিদিন জপমালা করবো। মারীয়াই হচ্ছেন যীশুর কাছে যাওয়ার নিশ্চিত, সরাসরি ও মধুর পথ। এই পথ ধরে বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে গেলেই যীশুকে পাওয়া যায়। কারণ আমরা মারীয়ার কোলেই যিশুকে খুজে পাই। তাই মারীয়ার প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি প্রতিদিনের জীবনে বৃদ্ধি করা সকলেরই দায়িত্ব।

(পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে এবং পাদ্রীশিবপুরবাসী যারা চট্টগ্রাম, ঢাকা, ভারত এবং প্রবাসী হয়ে জীবনযাপন করছেন, তারা, তথ্য সংগ্রহের সময় সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন তাদের পরিবারে পূর্বে যেমন জপমালা প্রার্থনা ও মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি-অর্চনা ছিল এখন আর সেই প্রচলন নেই, যার ফলে পরিবারের মধ্যে দেখা দিয়েছে বহুমাত্রিক সমস্যা। পথ প্রদর্শিকা কুমারী মারীয়ার ধর্মপল্লীবাসী, তারা যেখানেই বাস করুক-না-কেন, তারা যেন পরিবারে পারিবারিক প্রার্থনায় জপমালাকে স্থান দেয়। ফাদার রুবেন গোমেজ এই কথাটিই ভবিষ্যতের প্রত্যাশারূপে আমাদের জন্য ব্যক্ত করেছেন – সম্পাদক)

দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রত্যাশা ও প্রস্তাবনাসমূহের সারসংক্ষেপ

সম্পাদনে: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এবং আলোকে এই অংশে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রায় আটটি বিষয়ে আমাদের প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি। ভবিষ্যতে বিভিন্ন সভা সমিতিতে এবং আলাপ-আলোচনায় এই প্রত্যাশাগুলো নিয়ে আরও ভাবনা-চিন্তা করে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এটাই আমরা প্রত্যাশা করছি। এই ক্ষেত্রে সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ অতীতের ঐতিহ্য ভবিষ্যতে প্রত্যাশা সৃষ্টি করবে এবং গ্রন্থের উদ্দেশ্য চলমান করে রাখবে।

১.০: অভিবাসন: ভবিষ্যত প্রত্যাশা

১.১. পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের জন্য অভিবাসন একটি বাস্তবতা। পাদ্রীশিবপুর বংশোদ্ভূত খ্রিস্টানদের মধ্যে বিগত শতবর্ষের মধ্যে পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে স্থানীয়ভাবে বাস করছে মাত্র ২১% খ্রিস্টান জনগণ এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করছে ৪২% পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টান জনগণ; অর্থাৎ দেশের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করছে ৬৩%। আর ৩৭% দেশের বাইরে ভারতে ও প্রবাসী হয়ে বাস করছে। এই বাস্তবতা সবাইকে স্বীকার করে নিতে হবে এবং ভবিষ্যৎ সকল চিন্তা ভাবনা ও পরিকল্পনায় এই বাস্তবতা স্মরণ রাখতে হবে।

১.২. অভিবাসন করা এবং না করার স্বাধীনতা সবার আছে। অভিবাসনের যেমন আছে কুফল তেমন আছে সুফল। সুতরাং সুফল পরিবৃদ্ধি করা এবং কুফল পরিবর্জন করা সবার দায়িত্ব।

১.৩. অভিবাসনের কুফল বর্জন করার জন্য প্রয়োজন সুফলের সুযোগগুলো পাদ্রীশিবপুর গ্রামের মানুষের কাছে নিয়ে আসা জমি-জমা রক্ষা করা, স্থানীয় জনগণের উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক বিনিয়োগ

বৃদ্ধি করা, মাতৃ-পিতৃ ভিটার সাথে যোগাযোগ নিয়মিত ও ঘনিষ্ঠ করা, ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ চর্চা ও অনুশীলন করা, কর্মসংস্থান ও উপার্জনমূলক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা ও প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া, গ্রামের বাড়িতে ছুটি ও অবসর জীবন কাটানো, যে যে সুযোগ আছে তার শতভাগ ব্যবহার, যেমন স্কুল ও কলেজের শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, ইত্যাদি।

১.৪. আপন জনপদ এবং শেকড়ের টান, আকর্ষণ ও ভালবাসা গভীরভাবে অনুভব করা। আধুনিক জীবনের মিথ্যা চাকচিক্য বর্জন করা।

১.৫. পাদ্রীশিবপুর থেকে যে-হারে অভিবাসন হচ্ছে (একশত বছরের ৭৯%) তা চলতে থাকলে, খ্রিস্টান জনপদের অস্তিত্ব নিয়ে হবে শঙ্কা। পাদ্রীশিবপুরের ঐতিহ্যবাহী খ্রিস্টান জনপদ যেন শ্রীমন্ত কালপ্রবাহিকায় "শ্রী" হারিয়ে না যায়, ডুবে গিয়ে বিলুপ্ত হয়ে না যায়, তার জন্য চিন্তাশীল মানুষকে সম্মিলিতভাবে চিন্তাভাবনা করে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২.০. আর্থিক জীবন: ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা

২.১. আর্থিক স্বচ্ছলতা সমাজের নিশ্চয়তা অনেকভাবে স্থায়ী করে। অতএব অভিবাসীদের জীবন যেমন আর্থিক জীবনের উন্নয়ন সাধন করেছে, সেই ভাবে, পাদ্রীশিবপুর গ্রামের উন্নয়ন আর্থিক জীবনকে আরও মজবুত করবে। অতএব গ্রামে আর্থিক জীবনের উন্নয়নের জন্য একতাবদ্ধ হয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২.২. আর্থিক জীবনের উন্নয়নকল্পে প্রয়োজন হবে: আর্থিক বিনিয়োগ, পৈত্রিক জমি-জমা ও সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদনশীল ব্যবহার, উৎপাদনশীল গ্রাম, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, বসতবাড়ি হাতছাড়া না করা, একসঙ্গে চলার মনোভাব, দক্ষ জনশক্তি, লক্ষ্য-বিশিষ্ট সঠিক ও শুদ্ধ নেতৃত্ব, আধুনিকতা চাক-চিক্য ও অপচয় বর্জন, প্রকৃতির যত্ন ও বৃক্ষরোপন, ইত্যাদি।

২.৩. আর্থিক জীবনের উন্নয়নকল্পে প্রয়োজন অভিজ্ঞ, জ্ঞানবান ও বিত্তশালীদের একত্রে চিন্তাভাবনা করা, প্রকল্প গ্রহণ করা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২.৪. আর্থিক জীবনের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা, প্রয়োজনীয় সংগঠন, ফাণ্ড তৈরী, আর্থিক সহায়তা, ইত্যাদি।

৩.০. সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন: ভবিষ্যৎ প্রত্যাশ

৩.১. সমাজের একতা এবং পরস্পরের সহযোগিতা সামাজিক জীবনকে করবে সবল কেননা একতাই মহাবল, অন্যথায় সবই দুর্বল।

৩.২. সমাজে ভালো মানুষের উদ্ভব ঘটানো, তাদের সু আদর্শ ও পরহিতে নিবেদিত প্রাণের নিদর্শন হয়ে ওঠা। এই সমস্ত ভাল মানুষকে চিহ্নিত করে, গোটা সমাজ এক হয়ে, একতাবদ্ধভাবে খ্রিস্টান সমাজ জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য মাত্র একজনকে মনোনীত করবে এবং সে নির্বাচন করবে। অন্যকোন কারণে নয় বরং সৎ, নেতৃত্ববান, সাহসী, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে সৎ-সম্পর্কযুক্ত,

সমাজ-দরদী ও নিবেদিত ব্যক্তি হওয়া শক্তি নিয়ে তারা নির্বাচন করবে। এই সমস্ত মানুষ রাজনীতিতে প্রবেশ করবে এবং সমাজের সেবা করবে।

৩.৩. রাজনীতির ক্ষেত্রে জন-প্রতিনিধি বেছে নেওয়ার জন্য সমঝোতার নীতিতে প্যারিশ কাউন্সিল বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

৪.০. সাধারণ শিক্ষা: ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা

৪.১. ছেলেমেয়েরা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করবে: তারা তাদের জীবনের লক্ষ্য ঠিক করবে, কোথায় পড়াশোনা করবে, কোন বিষয়ে পড়াশোনা করবে, জীবনের ক্যারিয়ার হিসেবে কী বেছে নেবে, ইত্যাদি।

৪.২. পড়াশোনার করার জন্য চাই: বলিষ্ঠ মনমানসিকতা, আগ্রহ-উদ্যম, প্রতিযোগিতামূলক ও পরিশ্রমী মনোভাব, লক্ষ্য দ্বারা তাড়িত প্রচেষ্টা, গভীর অধ্যাবসায়, ত্যাগ ও কষ্ট দ্বারা অর্জন করার মনোভাব শিক্ষার্থীরা পোষণ করবে।

৪.৩. ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য প্রয়োজন সহায়তা: আর্থিক সহায়তা, প্রয়োজনে শিক্ষা ঋণ, বিভিন্ন সংগঠনের সমর্থন, হোস্টেলের সুযোগ-সুবিধা, চিকিৎসা-সেবা, প্রণোদনা, পরিবেশ ও সুব্যবস্থা, ইত্যাদি।

৪.৪. উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিযোগিতা করবে। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পরীক্ষায় অনেক প্রস্তুতিসহ অংশগ্রহণ করবে।

৪.৫. দক্ষতা, পেশাদারিত্ব ও শিক্ষিত সমাজের নেতৃত্ব দেবার মনোভাব পোষণ করবে এবং সর্বোত্তম উপায় খোঁজ করার জন্য অভিভাবক ও বিজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করবে।

৫.০. কারিগরি শিক্ষা: ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা

৫.১. কারিগরি শিক্ষাকে জীবন নির্বাহের জন্য অধিক মনোযোগ দিতে হবে। বড় বড় ডিগ্রী লাভ প্রত্যেকের লক্ষ্য হতে পারে না। যারা পারবে তারা সেদিকে যাবে। তবে কারিগরি শিক্ষাটা জীবন নির্বাহ করার জন্য একান্ত প্রয়োজন।

৫.২. কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হলে বেকার সমস্যা থেকে মুক্ত তারা থাকবে। যে-কোন পরিবেশে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে জীবন নির্বাহ করতে পারবে। কারিগরি শিক্ষা শিক্ষার্থীকে কর্মমুখী করে এবং দক্ষতা অর্জন করতে সহায়তা করে। কারিগরি দক্ষতা অর্জন করে সরকারি বেসরকারি যেকোনো প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ রয়েছে।

৫.৩. কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব বুঝিয়ে কারিগরি শিক্ষায় তাদেরকে উৎসাহিত করা। কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ শনাক্ত করা ও তা মোকাবিলা করার পদক্ষেপ নেওয়া।

৫.৪. যারা কারিগরি দক্ষতা অর্জন করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন তাদের মধ্যে নেটওয়ার্ক

তৈরি করা। তাদেরকে নিয়ে সোস্যাল মিডিয়াতে বিভিন্ন গ্রুপ তৈরি করা যাতে কর্মসংস্থানের তথ্য আদান প্রদান করার সুযোগ থাকে। যারা চাকরি সন্ধানী এতে করে তারা লাভবান হবেন। নিজের এলাকা থেকে যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মী, কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী সবাইকে নিয়ে ফোরাম করা; আর ফোরামটি প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক অথবা প্যারিশ পর্যায়েও হতে পারে যাতে উপযোগী তথ্যের যথাযথ বিস্তরণ ঘটানো সম্ভব হতে পারে।

৫.৪. কারিগরি শিক্ষা লাভ করে দক্ষতা অর্জন করে উদ্যোগী হয়ে নিজ এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি এবং অন্যদেরকেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া। বিশেষত যারা উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তারা নিজ এলাকায় কর্মসংস্থানের পথ সৃষ্টি করতে পারেন। এতে করে বেকারত্ব হ্রাস পাবে, দারিদ্র্য বিমোচিত হবে, আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে; ব্যক্তি নিজে আর্থিক উন্নয়ন করবে এবং সমাজের উন্নয়ন ঘটবে।

৬.০. খ্রিস্টীয় জীবন: ভবিষ্যৎ প্রত্যাশ

৬.১. পাদ্রীশিবপুর প্যারিশকে ওয়ার্ডভিত্তিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের সমন্বয়ে, সিনোডাল মণ্ডলীর আদলে, এমন একটি খ্রিস্টান সমাজে রূপান্তরিত করা যা হবে মিলন-সমাজ, অংশগ্রহণ-মূলক সমাজ এবং মিশনারি সমাজ। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল কর্তৃক অনুমোদিত "প্যারিশ সংবিধান"টি পুনরুদ্ধার করে এবং সেই অনুসারে যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীরা সেবাদান করবে এবং "ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ" গঠন প্রক্রিয়ায় নতুন মণ্ডলী গঠন করতে চেষ্টা করবে যা হবে: ঐশবাণীজাত সমাজ, খ্রিস্টবিশ্বাসের সমাজ, মিলন-সমাজ এবং সেবার সমাজ।

৬.২. পোপ মহোদয়ের কথা অনুসারে, যাজকদের "যাজকতান্ত্রিকতা" বাদ দিয়ে, কেবলমাত্র প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন না করে, ধর্মপল্লীর জনগণকে মিলন-সমাজ, অংশগ্রহণমূলক এবং মিশনারী হবার জন্য "সেবা" প্রদান করবেন। ভক্তজনগণের চলমান গঠন, অংশগ্রহণ ও মিশন-দায়িত্ব পালনের জন্য "প্যারিশ সংবিধান" মোতাবেক নিয়মিত পালকীয় অধিবেশন অনুষ্ঠান করা।

৬.৩. পাদ্রীশিবপুর থেকে যারা অভিবাসী হয়ে জীবনযাপন করছে তাদেরকে অবশ্যই একটি প্যারিশের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে, প্যারিশের কর্মকাণ্ডে যোগদান করতে হবে। শহরে হারিয়ে যাওয়ার বা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার প্রলোভন অনেক বেশি; তাই সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে। প্যারিশের দ্বারা প্রদত্ত সকল সেবাসমূহ গ্রহণ করা খ্রিস্টীয় জীবনের দায়িত্ব। শহরেও একটি এলাকার খ্রিস্টসমাজের সাথে সংযুক্ত থাকা, সক্রিয় খ্রিস্টজীবনেরই অঙ্গস্বরূপ।

৬.৪. গ্রামীণ পরিবেশে খ্রিস্টান হওয়া আর নগরে বা মহানগরে খ্রিস্টান হওয়া ও থাকা একই নয়। প্রথমত, এ বিষয়ে প্রত্যেক অভিবাসীকে সচেতন হতে হবে। নগরে বা মহানগরে খ্রিস্টান থাকা বা হওয়ার জন্য প্রত্যেককে একটা ব্যক্তিগত ও দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তাদের সচেতন হতে হবে যে, অভিবাসনের অবস্থায় তারা যিশুর শিষ্য, তারা যেখানে আছে যিশু তাদেরকে সেই অবস্থানে মিশনারী রূপে প্রেরণ করেছেন।

৬.৫. গির্জার কাছে বাস করা অথবা গির্জা থেকে দূরে বাস করা অভিবাসীদের জন্য বড় কথা নয়। পিতামাতা ও সন্তান উভয়ের জন্য একান্ত প্রয়োজন হচ্ছে প্রতি ঘরে যেন প্রার্থনা ও ঐশবাণী পাঠ করা হয়। সমবেতভাবে একসঙ্গে প্রার্থনা না করতে পারলেও, পরিবার যেন প্রার্থনা-শূন্য না হয়। মনে রাখতে হবে প্রতিটি পরিবার একটি গৃহ-মণ্ডলী। সেই মণ্ডলীতে খ্রিস্টান হওয়া প্রাথমিক বিষয়।

৭.০. সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য: ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা

৭.১. পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টীয় জনপদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য যতদূর সম্ভব ধরে রাখা সবার দায়িত্ব বলে প্রত্যাশা করছি। প্রথমত আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্বসূরীদের কাছ থেকে যাকিছু পেয়েছি তা যদি ভাল হয় তাহলে তা অন্তরে ধারণ করা, সেই অনুসারে জীবন-যাপন করা সেটাই হবে প্রথম সংরক্ষণ, যেমন: আমাদের খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ, নৈতিক জীবনের মূল্যবোধ, পারিবারিক জীবনের মূল্যবোধ প্রভৃতি রক্ষা করে জীবন নির্বাহ করা।

৭.২. আমাদের প্রত্যেক আপন পরিবারের একটি বংশ-তালিকা প্রস্তুত করা এবং তাদেরকে স্মরণ করে বংশ-পরম্পরার প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আমরা উপলব্ধি করব যে ঈশ্বর বংশের মধ্যে দিয়ে আমাদের সাথে পথ চলেছেন। ঠিক একই ভাব ভাবী প্রজন্মের কাছেও পৌঁছে দেওয়া।

৭.৩. পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে একটা সংরক্ষণাগার তৈরি করা প্রয়োজন, যেখানে গির্জার বা ধর্মীয় পুরনো পবিত্র দ্রব্যাদি, সমাজে ও পরিবারে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, মূর্তি, ছবি, ইতিহাস, রচনাদি, লিপিফলক ইত্যাদি সংরক্ষণ করা। এই সংরক্ষণাগার স্থাপন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা উচিত এবং দেশি, বিদেশি ও প্রবাসের অভিবাসীদের সম্মিলিত সহায়তা নিশ্চিত করা উচিত।

৭.৪. যা-কিছু সুন্দর, মূল্যবান ও অনুশীলনযোগ্য তা জীবনে চর্চা করে অতীতকে চিরন্তন করে রাখা, যেমন: রামুর পালা, গান-সঙ্গীত, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মঞ্চায়ন, ইত্যাদি।

৮.০. ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা: ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা

৮.১. পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের প্রতিপালিকা "পদপ্রদর্শিকা কুমারী মারীয়া"। যুগ যুগ ধরে মা মারীয়া আমাদের জন্য পথ প্রদর্শন করেছেন। তাঁকে আমাদের গির্জায়, আমাদের বাড়িতে ও ক্ষুদ্র সমাজে আমরা "থান" বা স্থান দিয়ে এসেছি। আমাদের প্রত্যাশা, পাদ্রীশিবপুরে থাকি বা অভিবাসী হয়ে দেশের মধ্যে ও দেশের বাইরে থাকি, মা মারীয়াকে যেন ব্যক্তিজীবনে, ঘরে, পরিবারে স্থান দিয়ে রাখি। তিনিই তো আমাদের ভবিষ্যৎ পথ প্রদর্শন করবেন আমাদের প্রত্যাশা পুরণ করবেন।

৮.২. পরিবারে জপমালা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে কুমারী মারীয়াকে ঐতিহ্যগতভাবে স্থান দিয়ে এসেছি। আধুনিক যুগে মা মারীয়ার সেই স্থান অনেকটাই কমে গেছে। অথচ আমরা জানি, রোজারিমালা সবচেয়ে সহজ-সরল প্রার্থনা সবার জন্য। যে পরিবার একত্রে প্রার্থনা করে সেই পরিবার একসঙ্গে থাকে। অতএব এই লৌকিক জগতে এই সহজ-সরল প্রার্থনা আমাদের পরিবারের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

৮.৩. পরিবারে রোজারিমালা আবৃত্তি করার অর্থ হচ্ছে যিশুর জীবনের রহস্যগুলো ধ্যান করা, যে-রহস্যের সাথে আমাদের জীবনের রহস্যেরও অর্থ খুঁজে পাই। যিশুকে অনুসরণ করার অন্যতম উপায় হচ্ছে জপমালা প্রার্থনা। অতএব এই যান্ত্রিক ও লৌকিক জগতে ধর্মিষ্ঠ মানুষ হয়ে বাস করার সর্ব-সহজ উপায় হিসেবে প্রতিটি পরিবার রোজারিমালা প্রার্থনা করবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

উপসংহার: পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর ভক্তজনগণের প্রার্থনা

হে প্রেমময় স্বর্গীয় পিতা
পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর প্রতিষ্ঠার দুইশত ষাট বছর বর্ষ-পূর্তিতে
আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি:
বাণীপ্রচারক সকল ধর্মপাল, ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের জীবন ও সেবা;
কত শত লোক তোমার পুত্র যিশুতে দীক্ষা লাভ করে
যুগ যুগ ধরে খ্রিস্টবিশ্বাসের জীবন যাপন করেছে।
আর রচনা করেছে শ্রীমন্ত-বাটে এতিহ্যবাহী খ্রিস্টান জনপদ।

পাদ্রীশিবপুরবাসী সকলের প্রতি
তোমার অফুরান ভালবাসা ও দয়ার জন্য আমরা তোমার ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি।
তুমি তাদের সঙ্গে পথ চলেছো
তাদেরকে তুমি করে তুলেছো তোমার আপনজন
এবং তাদের জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলেছো
ঐতিহ্যবাহী একটি খ্রিস্টান জনপথ, শ্রীমন্ত বাটে।
'তোমার দয়া সে-তো চিরকালেরই দয়া'!

আমাদের ধর্মপল্লীতে যুগযুগ ধরে
বিবাহিত ও পারিবারিক জীবনে তুমি আহ্বান করেছো
পরিবার থেকে তুমি আবার কাউকে যাজকীয় ও সন্ন্যাসব্রতী জীবনে ডেকেছো,
তুমি আবার কাউকে মনোনীত করেছো ধর্মপালরূপে,
এ সব আহ্বান, অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ আমাদের প্রতি তোমার ভালবাসা ও দয়ার প্রকাশ,
আমরা তোমার ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি ॥
অনুনয় করি প্রভু,
আমাদের আপনজন, যারা মৃত্যবরণ করেছেন
তাদেরকে তুমি অনন্ত পুরস্কার ও শান্তি দান কর।
ধর্মপল্লীর সকল নিবাসী, অভিবাসী ও প্রবাসী ভক্তবিশ্বাসীদের প্রতি
তোমার ভালবাসা ও দয়া, ক্ষমা ও পরিত্রাণ দান কর।

সকল পরিবার, সন্ন্যাসব্রতী, যাজক ও ধর্মপালকে আশীর্বাদিত কর,
শিশু, কিশোর ও তরুণ-তরুণীকে আপন জীবন আহ্বানে পরিচালিত কর ॥

এই পুস্তকে যাদের কথা আমরা স্মরণ করেছি
কতো সন্তর্পণে তাদের জীবনে দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করেছি যে,
তাদের অতীতের জীবনপথ ধরে তুমি পথ চলেছে।
এ ইতিহাস তাদের বিশ্বাসেরই ইতিহাস
এ ইতিহাস তাদের মাঝে তোমার মুক্তিকর্মের সাক্ষ্যদান।

আজ পাদ্রীশিবপুরের জনগণ বিশ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বিক্ষিপ্ত ভাবে,
আবার তুমিই তাদের একত্র করে রেখেছো তোমার আপন পরিচালনায়।
পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীকে আজ তোমার কাছে সমর্পণ করি:
ভবিষ্যতে তোমাকে নিয়েই যেন এই ক্ষুদ্র মণ্ডলী পথ চলতে পারে
তোমার পরিচালনায় ও প্রত্যাশায় তারা আশান্বিত হয়ে থাকতে পারে।

পাদ্রীশিবপুর জনগণকে তুমি দয়া কর, আশীর্বাদ কর
এই জগতের তীর্থের সমাপ্তিতে তারা যেন তোমার প্রতিশ্রুত দেশে,
তোমার রাজ্যের মহাভোজে একত্রিত হতে পারে।
আমাদের এই অন্তরের বাসনা ও প্রত্যাশা পূরণ কর।

হে ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা, পথ প্রদর্শিকা কুমারী মারীয়া,
তোমার মুখ দেখাও, কোন পথে আমরা চলব সেই পথ দেখাও।
তোমার সন্তানদের পথচলা কালে আগলে রাখ।
তুমিই আমাদের ভরসা, তুমিই আমাদের প্রত্যাশা।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি
ডিসেম্বর ২৫, ২০২৪ খ্রি.: ২০২৫ পুণ্যবর্ষের উদ্বোধন,
পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ-প্রতিষ্ঠার ২৬০তম বর্ষপূর্তি

দ্বাদশ ভাগ

সংগৃহীত পরিসংখ্যান ও দলীয় আলোচনার ফলাফল ও তথ্যপ্রদানকারী

সংকলনে ও সম্পাদনে: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

আলোচ্য বিষয়সূচির সারসংক্ষেপ

প্রথম অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুরের অধিবাসী
॥ ক ॥ পাদ্রীশিবপুরের বর্তমান অধিবাসী – জরিপের পরিসংখ্যান
॥ খ ॥ পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর অভিবাসীদের পরিসংখ্যান
॥ গ ॥ পাদীশিবপুরে এফজিডি আলোচনার ফলাফল
॥ ঘ ॥ আলোচনা সভা ও অংশগ্রহণকারীগণ
দ্বিতীয় অধ্যায়: পশ্চিমবঙ্গে পাদ্রীশিবপুরবাসী
তৃতীয় অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুরবাসী – চট্টগ্রামে অভিবাসী
॥ ক ॥ চট্রগ্রামে পাদ্রীশিবপুর অভিবাসীদের পরিসংখ্যান
॥ খ ॥ চট্টগ্রামে এফজিডি আলোচনার ফলাফল
॥ গ ॥ আলোচনা সভা ও অংশগ্রহণকারীগণ
চতুর্থ অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুরবাসী – ঢাকাতে অভিবাসী
॥ ক ॥ পাদ্রীশিবপুরবাসী: ঢাকস্থ অভিবাসীদের পরিসংখ্যান
॥ খ ॥ ঢাকাতে এফজিডি আলোচনার ফলাফল
পঞ্চম অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুরবাসী – খুলনাতে অভিবাসী

অবতারণা

"শ্রীমন্ত-বাটে পাদ্রীশিবপুর ঃ এতিহ্যবাহী একটি খ্রিস্টান জনপদ" গ্রন্থটি রচনার পরিসমাপ্তিতে যে মূলচিন্তাটা হৃদয়-চিত্তে খুব গভীরভাবে উপলব্ধি হচ্ছে, তাহল এই গ্রন্থের প্রধান রচয়িতা আসলে তারা যারা পাদ্রীশিবপুরের এই ঐতিহ্যবাহী খ্রিস্টান জনপদের সূচনা থেকে অদ্যাবধি ইতিহাসে বিভিন্ন যুগে বাস করেছেন, কাজ করেছেন এবং সম্পৃক্ত ছিলেন। অতীতে যারা ছিলেন তাদের অনেককে সমষ্টিগতভাবে ইতিহাসে স্মরণ করেছি, সহস্র সহস্র ব্যক্তিদের মধ্যে কারো কারো নাম উল্লেখ করেছি, কারো কারো কথা ও জীবন-চরিত লেখনীর মাধ্যমে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পরবর্তী ত্রয়োদশ ভাগে বিভিন্ন বংশাবলীর মাধ্যমে অনেককে স্মরণ করার সুযোগ আছে।

তবে এই গ্রন্থ-রচনার সমসাময়িক কালে যারা পাদ্রীশিবপুর নিবাসী – দেশে ও ভারতে, যারা পাদ্রীশিবপুর-অভিবাসী হয়ে চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনাতে বাস করছে, এবং যারা প্রবাসে অভিবাসী হয়ে জীবিত আছে, যাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যারা তথ্য সংগ্রহে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন, যারা আলোচনায় তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন তাদের নাম উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং তাদের নাম এই গ্রন্থটিতে লিপিবদ্ধ করে স্মরণীয় ও সংরক্ষিত করতে চাই বলেই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যে চতুর্থ ভাগে প্রবাসীদের কথা স্মরণ করা হয়েছে। তবে আবারও বিনম্রভাবে বলি হতে পারে সবার নাম তালিকাতে নেই বা কোনভাবে অন্য কোন জায়গায় উল্লেখ করা হয়নি তাদের কাছে আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

প্রথম অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ ও উপকেন্দ্রসমূহ

॥ ক ॥ পাদ্রীশিবপুরের বর্তমান অধিবাসী – জরিপের পরিসংখ্যান

(১) পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর বাড়ি, ঘর ও জনসংখ্যা জরিপের ফলাফল:

ধর্মপল্লীর নাম: পাদ্রীশিবপুর ওয়ার্ড নং – ১

ক্রম নং	বাড়ির নামসমূহ	ঘরের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	নিয়মিত বসবাসকারীর সংখ্যা	উৎসবে আগত বাড়তি সংখ্যা
১	কালা সওদার বাড়ি	০৪	০৫	০৭	২৮
২	বাবুর বাড়ি	১০	১০	২৩	৪৯
৩	রামুর বাড়ি	০১	০১	০৩	০৬
৪	পিও সাধুর বাড়ি	০১	০১	০৫	১২
৫	এডবিনের বাড়ি	০১	০১	০৩	০৩
৬	মেনো ডি'কস্তার বাড়ি	০১	০১	০৪	১৪
৭	লাভলী ডি'কস্তার বাড়ি	০১	০১	০৪	১২
	মোট বাড়ি - ৭	**১৯**	**২০**	**৪৯**	**১২৪**

ধর্মপল্লীর নাম: পাদ্রীশিবপুর ওয়ার্ড নং – ২

ক্রম নং	বাড়ির নামসমূহ	ঘরের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	নিয়মিত বসবাসকারীর সংখ্যা	উৎসবে আগত বাড়তি সংখ্যা
১	মতির বাড়ি	২	২	৮	৮
২	লালজন স্যারের বাড়ি	১	১	৪	৯
৩	চাপরাশী বাড়ি	৪	৪	১২	১১
৪	ছেমু ডি'কস্তার বাড়ি	১	১	৩	১০
৫	মামুদালীর বাড়ি	১	১	১	৫
৬	রামু দোকানদার বাড়ি	১	১	৩	৯
৭	ক্লেমেন্ট স্যারের বাড়ি	১	১	২	৮
৮	ফিনুর বাড়ি	১	১	৪	১১
৯	ছেমু গোমেজের বাড়ি	১	১	২	৬
১০	লুকাস গোমেজের বাড়ি	১	১	২	১২
১১	সরকার বাড়ি	১	১	৫	১২
১২	কাম্পু বাড়ি	১	১	২	৩
১৩	মাইকেল গোমেজের বাড়ি	১	১	২	৫
	মোট	১৭	১৭	৫০	১০৯

ধর্মপল্লীর নাম: পাদ্রীশিবপুর ওয়ার্ড নং – ৩

ক্রম নং	বাড়ির নামসমূহ	ঘরের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	নিয়মিত বসবাসকারীর সংখ্যা	উৎসবে আগত বাড়তি সংখ্যা
১	মেলকাম ডি'কস্তা বাড়ি	২	২	৪	৯
২	জুলিয়ানার বাড়ি	২	১	৪	৪
৩	কুবুরতনের বাড়ি	১	১	৩	৫
৪	মিডিনের বাড়ি	২	২	৩	২২
৫	যোসেফ/ আনাচীর বাড়ি	৪	৪	১২	১৯
৬	রিনুর বাড়ি	২	৪	৬	২০
৭	আলিচানের বাড়ি	১	১	৭	৭
৮	আনেলের/মৃধা বাড়ি	৬	৭	১৮	২৭
৯	মনু চাপরাসী বাড়ি	২	২	৩	১০
১০	গ্রাহামের বাড়ি	১	১	৪	১০
১১	পণ্ডিত বাড়ি	১০	১০	১৯	৩৩
১২	আলফ্রেডের বাড়ি	২	২	৫	১১
১৩	পাঙ্খাওয়ালা বাড়ি	৪	৪	৯	২২
১৪	যোহনের বাড়ি	১	১	২	৩
	মোট	৪০	৪২	৪৯	২০২

ধর্মপল্লীর নাম: পাদ্রীশিবপুর ওয়ার্ড নং – ৪

ক্রম নং	বাড়ির নামসমূহ	ঘরের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	নিয়মিত বসবাসকারীর সংখ্যা	উৎসবে আগত বাড়তি সংখ্যা
১	দারোগা বাড়ি -১	৫	৬	১৫	১২
২	দারোগা বাড়ি -২	৩	৪	১০	৮
৩	নায়েব বাড়ি	২	২	৭	৫
৪	জিতার বাড়ি	১	১	৪	৬
৫	রাফায়েলের বাড়ি	২	২	৪	৪
৬	আলবার্ট গোমেজ স্যারের বাড়ি	২	১	৪	৪
৭	যোসেফ গোমেজের বাড়ি	৩	৩	৯	৫
৮	দিপঙ্কর গনসালভেসের বাড়ি	১	১	৩	২
৯	বিনীতা গোমেজের বাড়ি	১	১	৪	২
১০	পিওর বাড়ি	২	২	৪	৮
১১	ফ্যালিক্সের বাড়ি	৩	৩	৯	৪
১২	পবরী বাড়ি	২	২	৫	৬
১৩	লুকাসের বাড়ি	১	১	৩	৮
১৪	নবু সাহেবের বাড়ি	১	১	১	২৫
১৫	বিশাই বাড়ি	৩	৩	৯	৬
১৬	জনের বাড়ি	২	৩	৭	৮
১৭	ভক্ত বাড়ি	৩	৪	১২	৮

১৮	মারীয়া বাড়ি	২	২	৭	৩
১৯	হালদার বাড়ি	৪	৪	৯	৬
২০	বার্নাড ডি'রোজারিও স্যারের বাড়ি	১	১	৫	৪
২১	ভানুর বাড়ি	৩	২	৫	৪
২২	পল মিস্ত্রি বাড়ি	২	২	৬	৪
২৩	ডা. ডমিনিক গোমেজের বাড়ি	২	২	৩	৩
২৪	মোক্তার বাড়ি	৩	৩	১০	৫
২৫	কৈলু বাড়ি	৬	৬	২৫	৪১
	মোট	**৫৮**	**৬২**	**১৭৩**	**২০১**

ধর্মপল্লীর নাম: পাদ্রীশিবপুর ওয়ার্ড নং – ৫

ক্রম নং	বাড়ির নামসমূহ	ঘরের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	নিয়মিত বসবাসকারীর সংখ্যা	উৎসবে আগত বাড়তি সংখ্যা
১	মিস্ত্রী বাড়ি	৫	১২	১২	১২
২	আলিচান বাড়ি	৩	১	১	৩
৩	পারসি বাড়ি	২	৪	৪	৮
৪	সিরিল বাড়ি	৪	২	৫	৪
৫	শিকদার বাড়ি	২	৬	৬	১০
৬	ডি'কস্তা বাড়ি	১	২	২	৪
৭	জোলা বাড়ি/রাজকালাই বাড়ি	২	২	১	৪
৮	কালুস পবরি বাড়ি	২	২	১	১০
৯	ধনুর বাড়ি	৩	১৩	১৩	২
১০	ধোপা বাড়ি	৪	১২	১২	৪
১১	এরিমন ডি'কস্তা	১	৪	৪	২
১২	অ্যালেক্সি বাড়ি	১	১	৪	৩
১৩	রাণী মহল	১	১	৩	৫
১৪	ইন্নোসেন্ট ডি'কস্তা বাড়ি	১	১	৩	৬
১৫	আলবিনা আবাস - অমল	১	১	২	১২
১৬	উত্তম বাড়ি	১	১	৪	০
১৭	স্বপন ডি'রোজারিও বাড়ি	১	১	২	৩
১৮	অলি গোমেজ/জোলা বাড়ি	১	১	৩	১
১৯	মাকুর বাড়ি	১	১	৪	৪
২০	গিবুর বাড়ি	১	১	৫	৮
২১	লুইসের বাড়ি	২	২	৬	৮
২২	আঞ্জেলিনা/জেকী বাড়ি	১	১	৩	৬
২৩	বাসিল গোমেজ বাড়ি	২	২	৪	৬
২৪	ভেনানসিও/রনজিৎ ডি'কস্তা বাড়ি	১	৪	০	৬
২৫	তাজবিন বাড়ি	২	২	৪	২
	মোট	**৪৬**	**৬০**	**১০৬**	**১৩৩**

ধর্মপল্লীর নাম: পাদ্রীশিবপুর ওয়ার্ড নং – ৬

ক্রম নং	বাড়ির নামসমূহ	ঘরের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	নিয়মিত বসবাসকারীর সংখ্যা	উৎসবে আগত বাড়তি সংখ্যা
১	পণ্ডিত বাড়ি	৬	৬	১৩	১০
২	কালাই মাঝি বাড়ি	২	২	৬	৪
৩	গ্রেগরী পিওনের বাড়ি	১	১	৩	৫
৪	নয়া বাড়ি	২	১	৪	৩
৫	পিটার পিওনের বাড়ি	৩	২	৬	১২
৬	মিলাট গোমেজ বাড়ি	১	১	৩	৪
৭	রামুয়েলের বাড়ি	২	২	৭	৩
৮	যোহনের বাড়ি	১	১	৫	২
৯	পাড়ের বাবুর বাড়ি/ছাড়াবাড়ি	৪	৭	১০	১৩
১০	যাকবের বাড়ি	৩	৩	১২	৪
১১	আকুর বাড়ি	২	১	২	২
১২	পল সাহেবের বাড়ি	১	১	৩	৩
১৩	বোবার মা-এর বাড়ি	২	৩	৯	৬
১৪	সোন্তনের/ফ্রান্সিসের বাড়ি	২	২	৭	১২
১৫	রাজেনের বাড়ি	১	২	৫	২
	মোট	৩৩	৩৫	৯৫	৮৫

ধর্মপল্লীর নাম: পাদ্রীশিবপুর ওয়ার্ড নং – ৭

ক্রম নং	বাড়ির নামসমূহ	ঘরের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	নিয়মিত বসবাসকারীর সংখ্যা	উৎসবে আগত বাড়তি সংখ্যা
১	জোলা বাড়ি	১০	১১	২৪	১২
২	পিটার গোমেজের বাড়ি	১	১	৬	২
৩	মাকু চৌকিদার বাড়ি	২	২	৫	৬
৪	ঝরুর বাড়ি	২	২	৬	৪
৫	সিমনের বাড়ি	১	১	২	৩
৬	আইরিনের বাড়ি	৩	৩	৩	৪
৭	ছেমুর বাড়ি	১	১	১	২
৮	ভক্ত বাড়ি	২	২	২	২
৯	মিলাট পেদা বাড়ি	৩	১	৯	৮
১০	সেবাস্তিনের বাড়ি/ প্রদীপ	১	১	২	৪
১১	ফাদার লিও'র বাড়ি	১	১	১	৪
১২	পিটার হাওলাদারের বাড়ি	৪	৩	১৩	২
১৩	এন্টনি হাওলাদার বাড়ি	৩	৩	১১	৩
১৪	ছান্তার বাড়ি	৩	১	৯	২
১৫	বুধাই/কাম্পু বাড়ি	১	১	৯	৭
১৬	জ্যারাল্ড বাড়ি	১	১	৩	৫
১৭	সিলভেষ্টার/যুথিকা বাড়ী	২	১	৫	১৩
	মোট	৪১	৩৬	১১১	৮৩

ধর্মপল্লীর নাম: পাদ্রীশিবপুর ওয়ার্ড নং – ৮

ক্রম নং	বাড়ির নামসমূহ	ঘরের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	নিয়মিত বসবাসকারীর সংখ্যা	উৎসবে আগত বাড়তি সংখ্যা
১	জানির বাড়ি	১	১	১	৪
২	দেবেন ডাক্তারের বাড়ি	১	১	২	৮
৩	নিশিবাবুর বাড়ি	১	১	৩	৮
৪	মার্টিন স্যারের বাড়ি	১	১	১	৮
৫	আন্দ্রিয়'র বাড়ি	১	১	৪	৪
৬	সেবাস্তিয়ানের বাড়ি	১	২	৫	১০
৭	বার্ণাডের বাড়ি	৩	৩	১২	১৮
৮	গেছফলের বাড়ি	২	৩	১০	১২
৯	রেমণ্ডের বাড়ি	১	১	৩	৫
১০	পাসকালের/সুজির বাড়ি	১	১	২	৮
১১	প্রদীপের বাড়ি	১	১	২	৩
১২	গ্রেগরী মাস্টারের বাড়ি	২	২	৮	১০
১৩	চৌকিদার বাড়ি	১	১	২	৪
১৪	ফাদার ফিলিপের বাড়ি	৩	৩	১৫	২০
১৫	সদাই মাঝির বাড়ি	৫	৫	১৬	২০
১৬	ব্রাদার লিনুসের বাড়ি	২	২	৫	১২
১৭	মিল্টন দর্জির বাড়ি	২	২	৭	১৫
১৮	সান্তা মারীয়া বাড়ি	১	১	২	৫
১৯	ভিনসেন্ট ভিলা	১	১	০	৫
২০	প্রতিবন্ধী আশ্রয় কেন্দ্র	১	১	৪	৪
২১	উইলসনের বাড়ি	১	১	০	৪
২১	মোট	৩৩	৩৫	৯৪	১৮৭

ধর্মপল্লীর নাম: পাদ্রীশিবপুর উপকেন্দ্রের নাম: দেশান্তরকাঠি

ক্রম নং	বাড়ির নামসমূহ উল্লেখ করা হয় নি	ঘরের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	নিয়মিত বসবাসকারীর সংখ্যা	উৎসবে আগত বাড়তি সংখ্যা
	কাম্পু বাড়ি (পশ্চিম গ্রাম) – ২২				
১	সন্ধ্যা কাম্পু - কাম্পু বাড়ি	১	১	১	৩
২	শিমন কাম্পু - কাম্পু বাড়ি	১	১	৪	২
৩	রমা কাম্পু - কাম্পু বাড়ি	১	১	২	৩
৪	গেস্টিন কাম্পু - কাম্পু বাড়ি	১	১	২	২
৫	পিন্টু কাম্পু - কাম্পু বাড়ি	১	১	১	১০
৬	উজ্জ্বল কাম্পু - কাম্পু বাড়ি	১	১	৫	১
৭	খোকন ডি'কস্তা - কাম্পু বাড়ি	১	১	৫	০
৮	ছিল্টু কাম্পু - কাম্পু বাড়ি	১	১	৪	২

৯	সেলেস্টিন কাম্পু - কাম্পু বাড়ি	১	১	০	৫
১০	যাকোব গোমেজ - কাম্পু বাড়ি	১	১	৩	০
১১	অব্রোহাম কাম্পু - কাম্পু বাড়ি	১	১	০	৫
১২	অমল কাম্পু - কাম্পু বাড়ি	১	১	৪	১
১৩	মেলকাম কাম্পু - কাম্পু বাড়ি	১	১	২	১
১৪	নন্দিতা কাম্পু - কাম্পু বাড়ি	১	১	৪	১
১৫	উইফ্রেড কাম্পু - কাম্পু বাড়ি	১	১	০	৪
১৬	নিকসন কাম্পু - কাম্পু বাড়ি	১	১	৩	১
১৭	ম্যাগডন কাম্পু - কাম্পু বাড়ি	১	১	২	২
১৮	এলড্রিক কাম্পু - কাম্পু বাড়ি	১	১	৫	৬
১৯	নয়ন কাম্পু - কাম্পু বাড়ি	১	১	২	২
২০	মিল্টন কাম্পু - কাম্পু বাড়ি	১	১	২	০
২১	মনি কাম্পু - কাম্পু বাড়ি	১	১	১	১
২২	কানন কাম্পু - কাম্পু বাড়ি	১	১	১	৪
২২	**মোট**	**২২**	**২২**	**৫৩**	**৫৬**
	মাঝ গ্রাম - ১৭				
২৩	আগ্নেস গোমেজ - মাঝ গ্রাম	১	১	১	০
২৪	শান্তি গোমেজ - মাঝ গ্রাম	১	১	২	৪
২৫	শিমন গোমেজ - মাঝ গ্রাম	১	১	৩	২
২৬	দুলাল গোমেজ - মাঝ গ্রাম	১	১	৫	৫
২৭	পলাশ গোমেজ - মাঝ গ্রাম	১	১	৩	১
২৮	জুয়েল গোমেজ - মাঝ গ্রাম	১	১	৩	১
২৯	কানু গোমেজ - মাঝ গ্রাম	১	১	২	১
৩০	রূপালী গোমেজ - মাঝ গ্রাম	১	১	২	১
৩১	সুবাস কাম্পু - মাঝ গ্রাম	১	১	৪	১
৩২	অসীম গোমেজ - মাঝ গ্রাম	১	১	০	৪
৩৩	শিমন গোমেজ – মাঝ গ্রাম	১	১	২	৩
৩৪	স্বপন গোমেজ – মাঝ গ্রাম	১	১	৫	১
৩৫	পিন্টু গোমেজ – মাঝ গ্রাম	১	১	২	২
৩৬	লেন্টু গোমেজ – মাঝ গ্রাম	১	১	০	৫
৩৭	ব্রায়েন গোমেজ – মাঝ গ্রাম	১	১	২	২
৩৮	জেরম গোমেজ – মাঝ গ্রাম	১	১	৩	২
৩৯	মিন্টু গোমেজ – মাঝ গ্রাম	১	১	৩	৩
১৭	**মোট**	**১৭**	**১৭**	**৪২**	**৩৮**
	উত্তর বাড়ি - ১১				
৪০	মথি গোমেজ - উত্তর বাড়ি	১	১	৩	২
৪১	সেন্টু গোমেজ - উত্তর বাড়ি	১	১	৪	১
৪২	মার্টিন গোমেজ - উত্তর বাড়ি	১	১	০	৪
৪৩	জন মিন্টু গোমেজ - উত্তর বাড়ি	১	১	৫	০
৪৪	পিন্টু গোমেজ - উত্তর বাড়ি	১	১	২	৩
৪৫	শ্যামলী গোমেজ - উত্তর বাড়ি	১	১	১	২
৪৬	বেঞ্জামিন গোমেজ - উত্তর বাড়ি	১	১	৩	১
৪৭	শিমন গোমেজ - উত্তর বাড়ী	১	১	২	১

৪৮	অমিত গোমেজ - উত্তর বাড়ী	১	১	৫	১০
৪৯	যোহন গোমেজ - উত্তর বাড়ী	১	১	৩	৪
৫০	শান্তি গোমেজ - উত্তর বাড়ী	১	১	১	১
১১	**মোট**	**১১**	**১১**	**২৯**	**২৯**
	বড়ো বাড়ি - ৬				
৫১	এরিমন গোমেজ - বড়ো বাড়ি	১	১	২	৪
৫২	এলিয়াস গোমেজ - বড়ো বাড়ি	১	১	৮	২
৫৩	বুলু গোমেজ - বড়ো বাড়ি	১	১	১	০
৫৪	বুল বুল গোমেজ - বড় বাড়ি	১	১	১	৩
৫৫	সিমসন গোমেজ - বড় বাড়ি	১	১	২	২
৫৬	সেন্টু গোমেজ - বড় বাড়ি	১	১	১	৬
৬	**মোট**	**৬**	**৬**	**১৫**	**১৭**
	চরের বাড়ি - ২				
৫৭	প্যাট্রিক কাম্পু চরের বাড়ি	১	১	৩	৬
৫৮	মানিক গোমেজ – চরের বাড়ি	১	১	৭	৬
২	**মোট**	**২**	**২**	**১০**	**১২**
	মৃধা বাড়ি - ১৪				
৫৯	শিমন গোমেজ - মৃধা বাড়ি	১	১	৬	৩
৬০	পিটার গোমেজ - মৃধা বাড়ি	১	১	১	১০
৬১	রুবেন গোমেজ - মৃধা বাড়ি	১	১	০	৮
৬২	নাগর গোমেজ - মৃধা বাড়ি	১	১	৪	১
৬৩	শিমন গোমেজ - মৃধা বাড়ি	১	১	২	৪
৬৪	বিজয় গোমেজ - মৃধা বাড়ি	১	১	০	৪
৬৫	ভানিবেল গোমেজ - মৃধা বাড়ি	১	১	৫	৫
৬৬	লিয়ন গোমেজ - মৃধা বাড়ি	১	১	৬	৪
৬৭	এনসেন গোমেজ - মৃধা বাড়ি	১	১	১	২
৬৮	গিলবার্ট গোমেজ - মৃধা বাড়ি	১	১	৭	৫
৬৯	নিপু গোমেজ - মৃধা বাড়ি	১	১	৩	১
৭০	অমূল্য গোমেজ - মৃধা বাড়ি	১	১	২	১
৭১	উত্তম গোমেজ - মৃধা বাড়ি	১	১	৫	২
৭২	অঞ্জন গোমেজ - মৃধা বাড়ি	১	১	২	২
১৪	**মোট**	**১৪**	**১৪**	**৪৪**	**৫২**
	মোট: বাড়ির সংখ্যা: ৬	**৭২**	**৭২**	**১৯৩**	**২০৪**

ধর্মপল্লীর নাম: পাদ্রীশিবপুর উপকেন্দ্রের নাম: মাটিভাঙ্গা;

ক্রম নং	বাড়ির নামসমূহ	ঘরের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	নিয়মিত বসবাসকারীর সংখ্যা	উৎসবে আগত বাড়তি সংখ্যা
১	কান্দার বাড়ী (১)	২	২	৩	৪
২	কান্দার বাড়ি (২)	২	২	৪	৫
৩	কান্দার বাড়ি (৩)	২	৫	২	১২
৪	বাবলুর বাড়ি	১	৪	২	৯
৫	আলবিন কাম্পু বাড়ি	১	৪	৩	১১
৬	সাগর বাড়ি	১	১	২	৩
৭	সিপ্রিয়ান বাড়ি	১	৩	৪	৯
৮	নয়া বাড়ি	১	২	৭	১২
৯	উত্তমের বাড়ি (পাদ্রীশিবপুর)	০	০	০	০
১০	জর্জ বেনেডিক্ট বাড়ি	২	৩	৬	৭
১১	কাম্পু বাড়ি	১১	৩১	২৬	৫১
১২	সলোমনের বাড়ি	৩	৬	৬	১৫
১৩	তালগাছিয়া বাড়ি	৩	৯	৮	২০
	বাড়ির সংখ্যা - ১৩	৩০	৭২	৭৩	১৫৮

ধর্মপল্লীর নাম: মাটিভাঙ্গা; উপকেন্দ্র: সোনাতলা ও সাদারপুর উপধর্মপল্লী

ক্রম নং	বাড়ির নামসমূহ	ঘরের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	নিয়মিত বসবাসকারীর সংখ্যা	উৎসবে আগত বাড়তি সংখ্যা
১	রূপচাঁদ বাড়ৈ	১	২	৪	৪
২	রিপন বাড়ৈ	১	১	৩	০
৩	মনয় বাড়ৈ	১	১	৩	০
৪	শিশির বাড়ৈ	১	১	৩	০
৫	নোয়েল বাড়ৈ	১	২	৪	৪
৬	সমির বেপারী	১	১	৪	০
৭	স্টিফেন বেপারী	১	১	৪	
৮	মানিক বিশ্বাস	১	১	৪	০
৯	কুমকুম বিশ্বাস	১	১	৭	০
১০	সোহাগ বিশ্বাস	১	১	৪	০
১১	নোয়েল বিশ্বাস	১	১	৫	০
১২	প্রমোদ বিশ্বাস	১	১	৬	০
১৩	যতন বাড়ৈ	১	১	৬	০
১৪	মিঠু বিশ্বাস	১	১	২	১
১৫	টিটু যুগান্ত বিশ্বাস	১	১	৩	০
		১৫	১৭	৬২	৯
	মোট: মাটিভাঙ্গা ২৮	৪৫	৮৯	১৩৫	১৬৭

ধর্মপল্লীর নাম: পাদ্রীশিবপুর উপকেন্দ্রের নাম: রাজাবাড়িয়া

ক্রম নং	বাড়ির নামসমূহ জোলা বাড়ি	ঘরের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	নিয়মিত বসবাসকারীর সংখ্যা	উৎসবে আগত বাড়তি সংখ্যা
১	তরুন গোমেজ	১	১	১	৪
২	অরুন গোমেজ	১	১	৪	১
৩	যোহন গোমেজ	১	১	২	১
৪	সাগর গোমেজ	১	১	৩	৫
৫	এলিজা গোমেজ	১	১	১	৩
৬	জুয়েল গোমেজ	১	১	৩	১
৭	প্রদীপ গোমেজ	১	১	৪	১
৮	মালতী গোমেজ	১	১	২	৪
৯	রাণী গোমেজ	১	১	২	৫
১০	মায়া গোমেজ	১	১	০	৪
	তোফা বাড়ি				
১১	বিমল গোমেজ	১	২	২	২
১২	শ্যামল গোমেজ	১	২	২	১১
১৩	জেভিয়ার গোমেজ	১	১	০	৫
১৪	যোহন গোমেজ	১	১	১	৪
১৫	জসিন্তা গোমেজ	১	১	১	৭
১৬	লাজারুশ গোমেজ	১	১	১	০
১৭	রিপন গোমেজ	১	১	২	১
১৮	সুমন গোমেজ	১	১	০	২
১৯	পলাশ গোমেজ	১	১	৩	০
২০	তপন গোমেজ	১	১	০	৪
২১	নরবার্ট গোমেজ	১	১	২	১০
২২	প্রশান্ত গোমেজ	১	১	১	২
২৩	ঝন্টু গোমেজ	১	১	৩	১৩
২৪	খোকন গোমেজ	১	১	১	১
২৫	ডমিনিক গোমেজ	১	১	১	১৫
	মোট বাড়ি = ৫	২৫	২৭	৪২	১০৬

(৩) ধর্মপল্লীর বাড়ি, ঘর ও জনসংখ্যার সারাংশ

ধর্মপল্লীর নাম: পাদ্রীশিবপুর ওয়ার্ড নং – ১–৮ উপকেন্দ্র নং ১-৩

ওয়াড নং	বাড়ির সংখ্যা	ঘরের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	নিয়মিত বসবাসকারীর সংখ্যা	উৎসবে আগত বাড়তি সংখ্যা
১ নং	৭	১৯	২০	৪৯	১২৪
২ নং	১৩	১৭	১৭	৫০	১০৯
৩ নং	১৪	৪০	৪২	৪৯	২০২
৪ নং	২৫	৫৮	৬২	১৭৩	২০১
৫ নং	২৫	৪৬	৬০	১০৬	১৩৩
৬ নং	১৫	৩৩	৩৫	৯৫	৮৫
৭ নং	১৭	৪১	৩৬	১১১	৮৩
৮ নং	২১	৩৩	৩৫	৯৪	১৮৭
মোট ওয়ার্ড ৮	**১৩৭**	**২৮৭**	**৩০৭**	**৭২৭**	**১১২৪**
উপকেন্দ্র					
দেশান্তরকাঠি	৬	৭২	৭২	১৯৩	২০৪
রাজাবাড়িয়া	৫	২৫	২৭	৪২	১০৬
মাটিভাঙ্গা	১৩	৩০	৭২	৭৩	১৫৮
সোনাতলা	১৫	১৫	১৭	৬২	৯
উপকেন্দ্র-৪	**৩৯**	**১৪২**	**১৮৮**	**৪১০**	**৪৭৭**
সর্বমোট-১২	**১৭৬**	**৪৯২**	**৪৯৫**	**১১৩৭**	**১৬০১**

সংকলনে: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও: চূড়ান্ত সংকলন: ১৫/০৪/২০২৪ খ্রি.

তথ্যসূত্র:

১) পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে জনগণের অবস্থান পরিসংখ্যান: ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ অনুষ্ঠিত আলোচনার ফলাফল: দেশান্তরকাঠি ও রাজাবাড়িয়া ২৭/১০/২০২৩ সরেজমিনে কাটেখিস্ট কর্তৃক সংগ্রহ।

২) মাটিভাঙ্গা ধর্মপল্লী (সোনাতলাসহ) ১৩/০৪/২০২৪: পালপুরোহিত ফাদার মিন্টু বৈরাগী কর্তৃক সংগৃহীত।

॥ খ ॥ পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর অভিবাসীদের পরিসংখ্যান (পাদ্রীশিবপুরের স্থানীয় জনগণ)

ধর্মপল্লীর নাম: পাদ্রীশিবপুর ওয়ার্ড নং: ১

ক্রম নং	অভিবাসী পরিবারের নাম	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	+ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৭ পূর্বে	+পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-৭১)	+বাংলাদেশ আমলে (১৯৭১ অদ্যাবধি)	কোথায় এখন বাস করছে উল্লেখ করুন	মন্তব্য
১	রিপন গোমেজ	৩			বাংলাদেশ	চট্টগ্রাম	
২	মার্টিন গোমেজ	৪			বাংলাদেশ	চট্টগ্রাম	
৩	রানা গোমেজ	৪			বাংলাদেশ	ঢাকা	
৪	জনি গোমেজ	৩			বাংলাদেশ	ঢাকা	
৫	শুভ্র গোমেজ	৫			বাংলাদেশ	ঢাকা	
৬	পিন্টু গোমেজ	৪			বাংলাদেশ	ঢাকা	
৭	রিমা গোমেজ	১			বাংলাদেশ	ঢাকা	
৮	ক্লারা মেরী গোমেজ	১			বাংলাদেশ	বরিশাল	
৯	জনি গোমেজ	৩			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১০	রনি গোমেজ	২			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১১	প্রদীপ গোমেজ	২			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১২	সন্দীপ গোমেজ	২			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১৩	টিনা গোমেজ	১			বাংলাদেশ		থাইল্যান্ড
১৪	ফিলিপ গোমেজ	২			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১৫	ফ্রান্সিস গোমেজ	৪			বাংলাদেশ	যশোহর	
১৬	বার্টিন গোমেজ	৩			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১৭	ব্রাউন গোমেজ	৩			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১৮	বেরোনিকা গোমেজ	১			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১৯	আলবিন গোমেজ	৩			বাংলাদেশ	ঢাকা	
২০	নান্টু গোমেজ	৬			বাংলাদেশ	চট্টগ্রাম	
২১	র‍্যাফ্সি গোমেজ	৩			বাংলাদেশ	চট্টগ্রাম	
২২	পিন্টু ডি' কস্তা	৩			বাংলাদেশ	চট্টগ্রাম	
২৩	বেনেডিক্ট ডি'কস্তা	৯			বাংলাদেশ	ঢাকা -২:	আমেরিকা ৭
২৪	জোনাস ডি'কস্তা	২			বাংলাদেশ	ঢাকা	
২৫	মৃত আলবারিস গোমেজ	৬			বাংলাদেশ	ঢাকা	
২৬	নীপা গোমেজ	১			বাংলাদেশ	ঢাকা	
২৬	**মোট - পরিবার**	৮১			২৬	ঢাকা-১৮: চট্টগাম ৫:	অন্য ২: প্রবাসী - ২

ধর্মপল্লীর নাম: পাদ্রীশিবপুর ওয়ার্ড নং: ২

ক্রম নং	অভিবাসী পরিবারের নাম	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	+ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৭ পূর্বে	+পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-৭১)	+বাংলাদেশ আমলে (১৯৭১ অদ্যাবধি)	কোথায় এখন বাস করছে উল্লেখ করুন	মন্তব্য
১	খোকন গোমেজ	৪		পাকিস্তান		ভারত	
২	ফার্ডিনান্ড গোমেজ	৯		পাকিস্তান		ঢাকা	
৩	ফিডেলিস গোমেজ	৮			বাংলাদেশ	ঢাকা	
৪	ফেলিক্স গোমেজ	৩			বাংলাদেশ	ঢাকা	
৫	মন্টু ডি'কস্তা	১		পাকিস্তান		ভারত	
৬	লিটন গোমেজ	৪			বাংলাদেশ	ঢাকা	
৭	জর্জ গোমেজ	৭		পাকিস্তান		ঢাকা	
৮	রাফিয়েল গোমেজ	৫		পাকিস্তান		ভারত	
৯	মিখায়েল গোমেজ	৫		পাকিস্তান		ভারত	
১০	সুবাস সরকার	১০		পাকিস্তান		ঢাকা	
১১	হিউবার্ট সরকার	৬		পাকিস্তান		চট্টগ্রাম	
১২	প্রদীপ গোমেজ	৪			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১২	মোট	৬০		৮	৪	ঢাকা-৭; ভারত-৪	চট্টগ্রাম-১

ধর্মপল্লীর নাম: পাদ্রীশিবপুর ওয়ার্ড নং: ৩

ক্রম নং	অভিবাসী পরিবারের নাম	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	+ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৭ পূর্বে	+পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-৭১)	+বাংলাদেশ আমলে (১৯৭১অদ্যাবধি)	কোথায় এখন বাস করছে উল্লেখ করুন	মন্তব্য
১	সুমন্ত ডি'কস্তা	১			বাংলাদেশ	ঢাকা	
২	অবন্তী/জয়ন্তী ডি'কস্তা	৪		পাকিস্তান		ভারত	
৩	তপন গোমেজ	৪		পাকিস্তান		ভারত	
৪	স্বপন গোমেজ	৪			বাংলাদেশ	ঢাকা	
৫	লিটু গোমেজ	২			বাংলাদেশ	ঢাকা	
৬	টিপু গোমেজ	৫			বাংলাদেশ	কক্সবাজার	
৭	শিশির গোমেজ	১			বাংলাদেশ	ঢাকা	
৮	প্রদীপ গোমেজ	৪			বাংলাদেশ	ঢাকা	
৯	সদীপ গোমেজ	৫			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১০	নয়ন গোমেজ	৩			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১১	বিউটি গোমেজ	২			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১২	মানিক গোমেজ	৩			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১৩	রতন গোমেজ	৩			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১৪	প্রদীপ গোমেজ	১			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১৫	হারবার্ট গোমেজ	৩			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১৬	জনি গোমেজ	৩			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১৭	প্যাট্রিক গোমেজ	২			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১৮	ডেমার্চ ডি'রোজারিও	৩			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১৯	জুয়েল ডি'রোজারিও	৪			বাংলাদেশ	সৌদি	
২০	দিলিপ ডি'রোজারিও	৪			বাংলাদেশ	দুবাই	
২১	রেমণ্ড গোমেজ	৪			বাংলাদেশ	ঢাকা	
২১	মোট	৬৫		২	১৯	ঢাকা-১৬;	ভারত-২; অন্য ৩

ধর্মপল্লীর নাম: পাদ্রীশিবপুর ওয়ার্ড নং: ৪

ক্রম নং	অভিবাসী পরিবারের নাম	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	+ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৭ পূর্বে	+পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-৭১)	+বাংলাদেশ আমলে (১৯৭১ অদ্যাবধি)	কোথায় এখন বাস করছে উল্লেখ করুন	মন্তব্য
১	নরবার্ট গোমেজ	১	ব্রিটিশ আমল			ভারত	
২	ভিক্টর গোমেজ	১			বাংলাদেশ	বরিশাল	
৩	অল্টার গোমেজ	১			বাংলাদেশ	ঢাকা	
৪	রিচমেণ্ড গোমেজ	১	ব্রিটিশ আমল			ইংল্যাণ্ড	
৫	এরিক গোমেজ	১			বাংলাদেশ	ঢাকা	
৬	ম্যাথিয়াস ডি'কস্তা	১	ব্রিটিশ আমল	পাকিস্তান		ভারত	
৭	রবি ডি'কস্তা	১			বাংলাদেশ	ঢাকা	
৮	তপন গোমেজ	১			বাংলাদেশ	ব্যাংকক	
৯	লিটন গোমেজ	১			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১০	রতন গোমেজ	১			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১১	স্বপন গোমেজ	১			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১২	অরুন গোমেজ	১			বাংলাদেশ	ভারত	
১৩	দুলাল গোমেজ	১			বাংলাদেশ	চট্টগ্রাম	
১৪	হ্যাভেন গোমেজ	১			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১৫	ফিলিপ গোমেজ	১			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১৬	জন ডি'কস্তা	১			বাংলাদেশ	বরিশাল	
১৭	পল ডি'কস্তা	১			বাংলাদেশ	বরিশাল	
১৮	টাক্কু ডি'কস্তা	১			বাংলাদেশ	বারিশাল	
১৯	কিশোর গোমেজ	১			বাংলাদেশ	চট্টগ্রাম	
২০	চপল গোমেজ	১			বাংলাদেশ	চট্টগ্রাম	
২১	জর্জ গোমেজ	১		পাকিস্তান		ভারত	
২২	লেনার্ড গোমেজ	১			বাংলাদেশ	আমেরিকা	
২৩	আব্রাহাম গোমেজ	১			বাংলাদেশ	ঢাকা	
২৪	আবেল গোমেজ / তরুন	১			বাংলাদেশ	আমেরিকা	
২৫	অল্টার গোমেজ	১			বাংলাদেশ	ঢাকা	
২৬	অগিভার গোমেজ	১			বাংলাদেশ	চট্টগ্রাম	
২৭	লিনুস গোমেজ	১			বাংলাদেশ	ঢাকা	
২৮	লিংকন গোমেজ	১			বাংলাদেশ	চট্টগ্রাম/খাগড়াছড়ি	
২৯	এমব্রোজ গোমেজ	১			বাংলাদেশ	ঢাকা	
৩০	রনি কৈলু	১			বাংলাদেশ	ঢাকা	
৩১	তনি কৈলু	১			বাংলাদেশ	ভারত	
৩২	টমাছ গোমেজ	১			বাংলাদেশ	চট্টগ্রাম	মৃত
৩৩	পিটার গোমেজ	১		পাকিস্তান		চট্টগ্রাম	মৃত
৩৪	মার্টিন গোমেজ	১		পাকিস্তান		ভারত	
৩৫	ডা. ডমিনিক গোমেজ	১			বাংলাদেশ	আমেরিকা	মৃত

৩৬	গাব্রিয়েল ডি'রোজারিও	১		পাকিস্তান		ভারত	মৃত
৩৭	সিলভেরা গোমেজ	১		পাকিস্তান		ভারত	মৃত
৩৮	অঞ্জন গোমেজ	১		পাকিস্তান		ভারত	
৩৯	মার্টিন গোমেজ	১	ব্রিটিশ আমল			ভারত	মৃত
৪০	লাজারেস গোমেজ	১	ব্রিটিশ আমল			ভারত	মৃত
৪১	ভিনসেন্ট গোমেজ	১	ব্রিটিশ আমল			ভারত	মৃত
৪২	রাফায়েল গোমেজ	১	ব্রিটিশ আমল			ভারত	মৃত
৪৩	গডফ্রে কৈলু	১			বাংলাদেশ	ঢাকা-সাভার	
৪৪	আইরিছ কৈলু	১	ব্রিটিশ আমল			কানাডা	মৃত
৪৫	তেরেজা কৈলু	১	ব্রিটিশ আমল			কানাডা	
৪৬	মেরী কৈলু	১	ব্রিটিশ আমল			ভারত	মৃত
৪৭	এরো কৈলু	১	ব্রিটিশ আমল			ভারত	মৃত
৪৮	মাতো কৈলু	১	ব্রিটিশ আমল			ভারত	মৃত
৪৯	শান্তি কৈলু	১	ব্রিটিশ আমল			ভারত	
৫০	জনি কৈলু	১	ব্রিটিশ আমল			চট্টগ্রাম	
৫০	মোট	৫০-সঠিক না	১৪	৭	২৯	ঢাকা-১৪; চট্টগ্রাম-৮;	ভারত-১৭; প্রবাসী-৭; অন্য-৪

ধর্মপল্লীর নাম: পাদ্রীশিবপুর ওয়ার্ড নং: ৫

ক্রম নং	অভিবাসী পরিবারের নাম	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	+ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৭ পূর্বে	+পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-৭১)	+বাংলাদেশ আমলে (১৯৭১অদ্যাবধি)	কোথায় এখন বাস করছে উল্লেখ করুন	মন্তব্য
১	আলবিন গোমেজ	২		পাকিস্তান		ঢাকা	
২	রাফায়েল গোমেজ	১			বাংলাদেশ	আমেরিকা	
৩	জন গোমেজ	১			বাংলাদেশ	আমেরিকা	
৪	জর্জ অ্যালুইসিয়াস	১	ব্রিটিশ আমল			ঢাকা	
৫	বিচর্ড অ্যালুইসিয়াস	১			বাংলাদেশ	ইতালি	
৬	ইগ্নেসিয়ার অ্যালুইসিয়াস	১			বাংলাদেশ	ঢাকা	
৭	মিডিন গোমেজ	২		পাকিস্তান		চট্টগ্রাম (?)	মৃত
৮	তপেশ গোমেজ	১		পাকিস্তান		ভারত	
৯	জুয়েল ? জেমস গোমেজ	১			বাংলাদেশ	?	
১০	জাভিয়ার গোমেজ	১			বাংলাদেশ	চট্টগ্রাম	
১১	পলি গোমেজ	১		পাকিস্তান		ভারত	
১২	বাবুল গোমেজ	১			বাংলাদেশ	ঢাকা -পাগাড়	
১৩	জন্টু গোমেজ	১			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১৪	শুভ্র গোমেজ	১	ব্রিটিশ আমল			ভারত	
১৪	মোট	১৬	২	৪	৮	ঢাকা-৫;চট্ট-২;অন্য১	ভারত-৩; প্রবাসী-৩

ধর্মপল্লীর নাম: পাদ্রীশিবপুর ওয়ার্ড নং: ৬

ক্রম নং	অভিবাসী পরিবারের নাম	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	+ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৭ পূর্বে	+পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-৭১)	+বাংলাদেশ আমলে (১৯৭১অদ্য াবধি)	কোথায় এখন বাস করছে উল্লেখ করুন	মন্তব্য
১	পন্ডিত- মার্টিন গোমেজ	১	ব্রিটিশ আমল			ভারত	
২	ডাইমন্ড গোমেজ	১	ব্রিটিশ আমল			ভারত	
৩	বেনেডিক্ট গ্রেগরী পিওন	১	ব্রিটিশ আমল			ভারত	
৪	নরমান ডি'রোজারিও	১	ব্রিটিশ আমল			ভারত	
৫	রেজিনাল্ড ডি'রোজারিও	১	ব্রিটিশ আমল			ভারত	
৬	হ্যারাল্ড ডি'রোজারিও	১	ব্রিটিশ আমল			ভারত	
৭	যোসেফ ডি'রোজারিও	১			বাংলাদেশ	ঢাকা	
৮	পঙ্কজ ডি'রোজারিও	১			বাংলাদেশ	ঢাকা	
৯	রবিন ডি'রোজারিও	১		পাকিস্তান		ঢাকা-হাসনাবাদ	
১০	ডমিনিক ডি'রোজারিও	১			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১১	মিলাটের বাড়ি লাজারুস	১			বাংলাদেশ	আমেরিকা	
১২	ভিনসেন্ট গোমেজ	১	ব্রিটিশ আমল			ভারত	
	মোট	১২ –সঠিক না	৭	১	৪	ভারত-৭; ঢাকা-৪	প্রবাসী - ১

ধর্মপল্লীর নাম: পাদ্রীশিবপুর ওয়ার্ড নং: ৭

ক্রম নং	অভিবাসী পরিবারের নাম	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	+ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৭ পূর্বে	+পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-৭১)	+বাংলাদেশ আমলে (১৯৭১ অদ্যাবধি)	কোথায় এখন বাস করছে উল্লেখ করুন	মন্তব্য
১	সেবাস্তিন গোমেজ	৩	ব্রিটিশ আমল			ভারত	
২	আইজেক গোমেজ	১			বাংলাদেশ	কানাডা	
৩	আগস্টিন গোমেজ - চৌকিদার বাড়ি	১	ব্রিটিশ আমল			ভারত	
৪	রেজিনা গোমেজ – ঝরুর	৪	ব্রিটিশ আমল			ভারত	
৫	নরবার্ট গোমেজ –ভক্তবাড়ি	২	ব্রিটিশ আমল			ভারত	
৬	বেনেডিক্ট গোমেজ	৩	ব্রিটিশ আমল			ভারত	
৭	তপন গোমেজ –পেদাবাড়ি	২			বাংলাদেশ	আমেরিকা	
৮	লিও ও সদা গোমেজ	৪	ব্রিটিশ আমল			ভারত	
৯	জেরম গোমেজ –সান্তার	২			বাংলাদেশ	কানাডা	
১০	অরুন প্লাসিড গোমেজ	৩			বাংলাদেশ	চট্টগ্রাম/ঢাকা	
১১	পল মাইকেল গোমেজ	১			বাংলাদেশ	চট্টগ্রাম	
১২	মাইকেল সমীর গোমেজ	১			বাংলাদেশ	চট্টগ্রাম	
১৩	রিংকু/সেবাস্তিয়ান গোমেজ	৩			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১৪	বরুন গোমেজ	১			বাংলাদেশ	খুলনা	
১৫	পল গোমেজ	১			বাংলাদেশ	খুলনা	
১৫	মোট	৩২	৬		১০	ভারত-৬;চট্ট-৩;ঢা-১	খুলনা-২;প্রবাসী-৩

ধর্মপল্লীর নাম: পাদ্রীশিবপুর ওয়ার্ড নং: ৮

ক্রম নং	অভিবাসী পরিবারের নাম	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	+ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৭ পূর্বে	+পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-৭১)	+বাংলাদেশ আমলে (১৯৭১অদ্যাবধি)	কোথায় এখন বাস করছে উল্লেখ করুন	মন্তব্য
১	জনির বাড়ি – আইভান	১			বাংলাদেশ	কানাডা	
২	দেবেন ডাক্তারের বাড়ি	৩			বাংলাদেশ	আমেরিকা	
৩	উইলসন গোমেজ	৩			বাংলাদেশ	চট্টগ্রাম / ঢাকা	
৪	ভিনসেন্ট ভিলা	৩			বাংলাদেশ	আমেরিকা/কানাডা	
৫	সান্তা মারীয়া	২			বাংলাদেশ	কানাডা+কাতার	
৬	লুকাস ডি'রোজারিও	১			বাংলাদেশ	ঢাকা	
৬	মোট	১৩			৬	ঢাকা-১, চট্ট-১	প্রবাসী-১১

ধর্মপল্লীর নাম: পাদ্রীশিবপুর উপকেন্দ্র: দেশান্তরকাঠি

ক্রম নং	অভিবাসী পরিবারের নাম	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	+ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৭ পূর্বে	+পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-৭১)	+বাংলাদেশ আমলে (১৯৭১ অদ্যাবধি)	কোথায় এখন বাস করছে উল্লেখ করুন	মন্তব্য
১	শালমন গোমেজ	৩			বাংলাদেশ	চট্টগ্রাম	
২	আব্রাহাম গোমেজ	৪		পাকিস্তান		চট্টগ্রাম	
৩	অবনী গোমেজ	৪			বাংলাদেশ	চট্টগ্রাম	
৪	জনি গোমেজ	৪			বাংলাদেশ	ঢাকা	
৫	আইজেক গোমেজ	৪		পাকিস্তান		ঢাকা	
৬	নরবার্ট গোমেজ	৪			বাংলাদেশ	খুলনা	
৭	ডা: ডমিনিক গোমেজ	২			বাংলাদেশ	আমেরিকা	
৮	আব্রাহাম গোমেজ	৩			বাংলাদেশ	কুষ্টিয়া	
৯	অনু গোমেজ	৪			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১০	সমির গোমেজ	৩			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১১	রঞ্জন গোমেজ	৪			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১২	লিও গোমেজ	৫		পাকিস্তান		ভারত	
১৩	জেরমান গোমেজ	৫		পাকিস্তান		ভারত	
১৪	দুস্তি গোমেজ	৮		পাকিস্তান		ভারত	
১৫	মুকুল গোমেজ	৪			বাংলাদেশ	ভারত	
১৬	ম্যাকলিন গোমেজ	৪		পাকিস্তান		ভারত	
১৭	মিডিন গোমেজ	৪		পাকিস্তান		ভারত	
১৮	আলবিন গোমেজ	৪		পাকিস্তান		ভারত	
১৯	টমাস লিন্টু গোমেজ	৬			বাংলাদেশ	আমেরিকা	
২০	রবিন গোমেজ	৪		পাকিস্তান		বরিশাল	
২১	দিলিপ গোমেজ	৪			বাংলাদেশ	খুলনা	
২২	মিডিন কাম্পু	৪			বাংলাদেশ	পাদ্রীশিবপুর	
২৩	জর্জ বেনেডিক্ট	৪			বাংলাদেশ	ভারত	
২৪	ভিক্টর কাম্পু	৪			বাংলাদেশ	ভারত	
২৪	মোট	৯৯	০	৯	১৫	ঢাকা-৫; চট্টগ্রাম-৩;	ভারত-৯; প্রবাসী-২; অন্য -৫

ধর্মপল্লীর নাম: পাদ্রীশিবপুর **উপকেন্দ্র: মাটিভাঙ্গা (বর্তমানে প্যারিশ)**

ক্রম নং	অভিবাসী পরিবারের নাম	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	+ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৭ পূর্বে	+পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-৭১)	+বাংলাদেশ আমলে (১৯৭১ অদ্যাবধি)	কোথায় এখন বাস করছে উল্লেখ করুন	মন্তব্য
১	মাইকেল গোমেজ	৫			বাংলাদেশ	পাদ্রীশিবপুর	
২	যোয়াকিম গোমেজ	৪			বাংলাদেশ	ঢাকা	
৩	রনি গোমেজ	৪			বাংলাদেশ	চট্টগ্রাম	
৪	রবি কাস্পু	৩			বাংলাদেশ	খুলনা	
৫	মারীয়া গোমেজ	১			বাংলাদেশ	ঢাকা	
৬	সিলভেস্টার গোমেজ	৪			বাংলাদেশ	ঢাকা	
৭	সুরেশ গোমেজ	৪			বাংলাদেশ	চট্টগ্রাম	
৮	পরেশ গোমেজ	৪			বাংলাদেশ	চট্টগ্রাম	
৯	ঝন্টু গোমেজ	৪			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১০	জ্যোৎস্না গোমেজ	৩			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১১	হিরন গোমেজ	৪			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১২	প্যাট্রিক গোমেজ	৪			বাংলাদেশ	ঢাকা	
১৩	দিলিপ গোমেজ	৫			বাংলাদেশ	কানাডা	
১৪	উত্তম গোমেজ	৫			বাংলাদেশ	পাদ্রীশিবপুর	
১৪	**মোট**	৫৪			**বাংলাদেশ ১৪**	ঢাকা-৭; চট্টগ্রাম-৩ প্রবাসী-১; পাদ্রী-২ খুলনা-১	
	সোনাতলা – উপকেন্দ্র						
১	পিটার চিরান	৪			বাংলাদেশ	গোপালগঞ্জ	
২	লিউটন বাড়ৈ	৩			বাংলাদেশ	খুলনা	
৩	রতন বাড়ৈ	২			বাংলাদেশ	ঢাকা	
৪	রতন বাড়ৈ	৩			বাংলাদেশ	পাদ্রীশিবপুর	
৫	অঞ্জন বাড়ৈ	২			বাংলাদেশ	ঢাকা	
	মোট	১৫			**বাংলাদেশ - ৫**	ঢাকা-২; খুলনা-২; পাদ্রী-১	

ধর্মপল্লীর নাম: পাদ্রীশিবপুর **উপকেন্দ্র: রাজাবাড়িয়া**

ক্রম নং	অভিবাসী পরিবারের নাম	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	+ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৭ পূর্বে	+পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-৭১)	+বাংলাদেশ আমলে (১৯৭১ অদ্যাবধি)	কোথায় এখন বাস করছে উল্লেখ করুন	মন্তব্য
১	মৃত মার্টিন গোমেজ	৫		পাকিস্তান		ভারত	
২	আইজাক গোমেজ	৬			বাংলাদেশ	ভারত	
৩	পবন গোমেজ	৪			বাংলাদেশ	ভারত	
৪	হ্যারল গোমেজ	৪			বাংলাদেশ	ভারত	
৪	মোট	১৯	০	১	৩	ভারত - ৪	

অভিবাসীদের পরিসংখ্যান – সারসংক্ষেপ (পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের আলোচনা)

ধর্মপল্লীর নাম: পাদ্রীশিবপুর ওয়ার্ড নং: ১ – ৮; উপকেন্দ্র - তিনটি

ওয়ার্ড নং	পরিবারের সংখ্যা	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	+ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৭ পূর্বে	+পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-৭১)	+বাংলাদেশ আমলে (১৯৭১ অদ্যাবধি)	কোথায় এখন বাস করছে উল্লেখ করুন
১ নং	২৬	৮১			২৬	ঢাকা-১৮; চট্টগ্রাম-৫; ভারত- প্রবাসী-২; অন্য-
২ নং	১২	৬০		৮	৪	ঢাকা-৭; চট্টগ্রাম-১; ভারত-৪ প্রবাসী-২; অন্য-
৩ নং	২১	৬৫		২	১৯	ঢাকা-১৬; চট্টগ্রাম- ; ভারত-২ প্রবাসী- ; অন্য-৩
৪ নং	৫০	১২৫+	১৪	৭	২৯	ঢাকা-১৪; চট্টগ্রাম-৮; ভারত-১৭ প্রবাসী-৭; অন্য-৪
৫ নং	১৪	৩৫ +	২	৪	৮	ঢাকা-৫; চট্টগ্রাম-২; ভারত-৩ প্রবাসী-৩; অন্য-১
৬ নং	১২	৩০ +	৭	১	৪	ঢাকা-৪; চট্টগ্রাম- ; ভারত-৭ প্রবাসী-১; অন্য-
৭ নং	১৫	৩২	৬		১০	ঢাকা-১; চট্টগ্রাম-৩; ভারত-৬ প্রবাসী-৩; অন্য-২
৮ নং	৬	১৩			৬	ঢাকা-১; চট্টগ্রাম-১; ভারত- প্রবাসী-১৮; অন্য-
দেশান্তরকাঠি	২৪	৯৯	৯০	৯	১৫	ঢাকা-৫; চট্টগ্রাম-৩; ভারত-৯; প্রবাসী-২; অন্য-৫
রাজাবাড়িয়া	৪	১৯	০	১	৩	ভারত-৪
মাটি ভাঙ্গা সোনাতলা	১৪ ৫	৫৪ ১৫			১৪ ৫	ঢাকা-৭; চট্টগ্রাম-৩; প্রবাসী-১; পাদ্রী-২; খুলনা-১ ঢাকা-২; খুলনা-২; পাদ্রী-১
মোট	**১৭৭**	**৫১০**	**২৯**	**২২**	**১২৫**	**ঢাকা-৭৭; চট্টগ্রাম-২৬; ভারত-৪৩; প্রবাসী-১৪; অন্য-২১**

+ গড় ধরে সংশোধন করা হল।

তথ্যসূত্র:

১) পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে জনগণের অভিবাসী পরিসংখ্যান: ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ অনুষ্ঠিত আলোচনার ফলাফল

২) দেশান্তরকাঠি, রাজাবাড়িয়া ও মাটিভাঙ্গা: অক্টোবর ২০২৩ থেকে ১৬ এপ্রিল, ২০২৪।

॥ গ ॥ পাদ্রীশিবপুরে এফজিডি আলোচনার ফলাফল

১। পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের পরিচিতি

১.১ পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের অতীত ও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য/পরিবর্তন হয়েছে? উত্তর হ্যাঁ হলে পরিবর্তনগুলো কি কি?

অতীত ও বর্তমানের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে:

অতীতে যৌথ পরিবার বেশি ছিল, এখন একক পরিবার বেশি; প্রশাসনের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে; গির্জায় বাইবেল পাঠ, চাকরি ক্ষেত্রে, শিক্ষা ক্ষেত্রে, সভা/সংগঠন, বিচার সালিশীতে, বিভিন্ন কমিটিতে ইত্যাদি। অতীতে সমাজ ব্যবস্থা বিচার সালিশী প্যারিশে হতো ও সবাই মেনে নিত, এখন মানে না। বর্তমানে আইনের ব্যবস্থা নেয়। বিবাহ বিচ্ছেদ বৃদ্ধি পেয়েছে; নেশার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। নৈতিক মূল্যবোধ/ শ্রদ্ধার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা/ চিকিৎসা ব্যবস্থার/ সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.২ পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের জনগণের / বাসিন্দাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে? উত্তর হ্যাঁ হলে পরিবর্তনগুলো কি কি?

অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন সমূহ:

বাড়ি ঘরের পরিবর্তন: কাঁচা মাটির, ছনের/গোলপাতার ও টিনের ঘর ছিল। এখন Building বেশী। তিনবেলা পেট ভরে খাবার পেতো না, এখন পেটভরে খাবার পায়। ১০০% বিদ্যুৎ ও পানির ব্যবস্থা আছে। সঞ্চয় করতে পারছে, ঋণের বোঝা কমেছে। সম্পত্তি/ সম্পদ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.৩ পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের ধর্ম ও কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? বর্তমানে ধর্ম ও কৃষ্টিগত কোন পরিবর্তন হয়েছে? উত্তর হ্যাঁ হলে পরিবর্তনগুলো কি কি?

গীর্জায় অংশগ্রহণ কমেছে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে সহ-অবস্থান। প্রতি ঘরে ঘরে রোজারিমালা করা হতো এখন হয় না। কলাপাতায় খাওয়া, হোগলায় বসে খাওয়া, মাটির হাড়িতে খাদ্য বিতরণ/ পরিবেশন হতো কিন্তু এখন এটা আর নেই। পূর্বে হ্যাজাক লাইট জ্বালিয়ে পয়সাবার হতো, পানফুলের সাজি, সিরাপ, ঝাড়বাতি হতো, গ্রামের পালাগান হতো, এখন হয় না। স্পিরিটু সান্তের রোজা পালনে এখন অংশগ্রহণ বেড়েছে। গাছের প্রথম ফল/শস্য গীর্জায় দিত। যাত্রা, নাটক, জারিগান কমেছে। একই অঞ্চলের সাথে বিবাহ বন্ধন। ভিনদালু, টেমপোরাদু, পাতখোলা, নাড়ু, বিচকী, ভৌদ্দা, মরিচ টেংগ্যা, দোদল, বিরিংকা ইত্যাদি কৃষ্টিগত খাদ্য ছিল।

১.৪ পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের বাসিন্দাদের অতীত ও বর্তমান পেশা কি পরিবর্তন হয়েছে? উত্তর হ্যাঁ হলে পরিবর্তনগুলো কি কি?

অতীতের পেশা: কৃষি ও বাবুর্চি।

বর্তমানে পেশার পরিবর্তনসমূহ: সরকারী সেক্টরে চাকরি। নার্সিং, শিক্ষকতা, ড্রাইভিং, ইলেকট্রিশিয়ান। বিভিন্ন এনজিও / বেসরকারি সংস্থায় চাকরি। নিজেদের ব্যবসা-ফার্ম, মৎস্য চাষ ইত্যাদি। নারীদের চাকরিতে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ।

১.৫ পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের অতীত ও বর্তমান কৃষি ব্যবস্থা কি? কৃষি কাজের কোন পরিবর্তন হয়েছে? উত্তর হ্যাঁ হলে পরিবর্তনগুলো কি কি?

কৃষি গবেষণা কেন্দ্র ছিল (ADC)

অতীত ও বর্তমানের কৃষি ব্যবস্থা

অতীত	বর্তমান
১। গরু মহিষ	১। ট্রাক্টর
২। লাঙ্গল জোয়াল	২। রাসায়নিক সার
৩। মই	৩। ধান মাড়াই মেশিন
৪। গোবরের ফাস/সার	৪। পানির পাম্প/ সেচ ব্যবস্থা
৫। বাঁশ/ বেতের বেড়া	৫। নিড়ানী দিয়ে জমি পরিষ্কার
৬। বেড় কেটে সীমানা দেয়া	৬। হাই ব্রীড বীজ
৭। গরুর ঠুঁই	৭। ধান রোপন মেশিন
৮। জোংরা	৮। ধান ভাঙ্গানোর যন্ত্র
৯। পান্তাভাত, ভুরা মিডা, মরিচ পোড়া	
১০। হোক্কার আগুন	
১১। ঢেঁকি	

১.৬ পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের অতীত ও বর্তমান রাস্তাঘাট/যোগাযোগ ব্যবস্থার কি উন্নয়ন হয়েছে? উত্তর হ্যাঁ হলে উন্নয়নগুলো কি কি?

বর্তমান: রাস্তাঘাটের উন্নয়ন। আধুনিক ডিভাইস, মোবাইল টেলিফোন; Online Banking; বিকাশ, নগদ; আধুনিক যানবাহন কালভার্ট/ ব্রিজ ইত্যাদি।

অতীত: একমাত্র বাহন নৌকা; পাঁয়ে হেটে পথ চলা; তাল গাছের ডোংগা ছিল

২ পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস

২.১ পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনে অতীতের তুলনায় কোন পরিবর্তন দেখা যায়? উত্তর হ্যাঁ হলে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়?

পরিবর্তন দেখা যায়: পারিবারিক প্রার্থনার অভাব (সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা ও জপমালা প্রার্থনা); রবিবারের খ্রিষ্টযাগে উপস্থিতি কম। পাপস্বীকারে অনিহা। মান্ডলিক কাজে অংশগ্রহণ কম (বিসিসি) প্রার্থনা বিলুপ্ত। মন্ডলীর আর্থিক সাহায্যে অনিহা।

২.২ পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর কাঠামো কি? গ্রাম সমজের পূর্ব ব্যবস্থা কি ছিল? এবং বর্তমান ব্যবস্থা কি?/ পরিবর্তনগুলো কি?

বর্তমানে আটটি ওয়ার্ড দ্বারা ও পালকীয় পরিষদ দ্বারা পরিচালিত। (উপাসনা কমিটি, শান্তি কমিটি, ল্যান্ড কমিটি); পূর্বে প্যারিশের সংবিধান অনুসারে (১৯৮৩) পালকীয় পরিষদ গঠিত হত (যা ছিল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া) বর্তমানে এই সংবিধান বাতিল হওয়ায় জনগণের মান্ডলিক কাজে অংশগ্রহণ কম।

২.৩ পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের সাথে অন্য ধর্মের মানুষের সম্পর্ক কেমন?

ভালো: যেকোনো ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। সামাজিক যেকোনো সমস্যার সমাধানে অংশগ্রহণ। জমি চাষাবাদের কারণে সুসম্পর্ক স্থাপন। শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবার মাধ্যমে সুসম্পর্ক স্থাপন।

২.৪ পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টানদের আর্থিক অবস্থার কি উন্নতি হয়েছে? তাহলে কোন খাতে তা লক্ষ্য করা যায়?
আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে: শিক্ষার হার বৃদ্ধি। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উদ্যোগী। সঞ্চয়ের মনোভাব বৃদ্ধি। সমবায় সমিতি বা ঋণদান সমিতির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। পরনির্ভরশীলতা পরিহার করে স্বনির্ভর মনোভাব বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩. পাদ্রীশিবপুরের অতীত ও বর্তমান কৃষ্টি, ভাষা ও সংস্কৃতি

৩.১ পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে কি কি অনুষ্ঠান/ উৎসব পালন করা হতো? বর্তমানে কি কি উৎসব পালন করা হয়?

অতীত কৃষ্টি: ছেলের জন্য মেয়ে আনা হত পন দিয়ে। অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব হতো। পয়সাবারে পানফুলের হাজি নেয়া হতো, তার মধ্যে মেয়ে সাজানোর জিনিসপত্র নেয়া হতো। পয়সাবারের রাতে ঝাড়বাতি নেয়া হতো। বিবাহের পরের দিন কাদামাটি খেলা হতো। যেকোন অনুষ্ঠানে মঙ্গল আর্শীবাদের জন্যে জলঘট রাখা হতো। তার মধ্যে থাকতো দূর্বাঘাস, মঙ্গল প্রদীপ, আমপরাতি ব্যবহার হতো। বিবাহ বা যেকোন অনুষ্ঠানে কলাপাতায় খাওয়ানো হতো। বিবাহের তিনদিন পর পান দুধের নাইওর নেয়া হত। প্রার্থনা করতে হতো এবং তিনি রাতের বেলা বাহিরে যেতে পারতেন না। লোক মারা গেলে তার নামে র‍্যাজবার দেয়া হতো। অতীতে বাচ্চা হওয়ার তিনদিন পর কামানী অনুষ্ঠান করা হতো। ইসপিরিসাতু সান্ত রোজা রাখা হতো জ্যৈষ্ঠ মাসে, এই রোজা শাক, ডাল ও ফল ফলাদী দিয়ে খোলা হতো এবং ছেলে মেয়ের মঙ্গলের জন্য ঘরের যাবতীয় জিনিস পত্র ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হতো। ১৪ই আগষ্ট শ্রীমন্ত নদীতে নৌকা বাইচ হতো। বড়দিনের পরের দিন নাটক করা হতো।

বর্তমান
জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী, জুবিলী এবং ৩১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বারবিকিউ পার্টি করা হয়। দীক্ষাস্নান, প্রথম কমুনিয়ন, খুব ঘটা করে অনুষ্ঠান করা হয়। লোক মারা যাবার চল্লিশদিন পরে চল্লিশা পালন করা হয়। যেকোনো অনুষ্ঠানে ঢোল বাজনা বাজানোর পরিবর্তে ডেকসেট বাজানো হয়। রেস্টুরেন্ট বা ডেকরেটরের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের খাবারের আয়োজন করা হয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ধর্মের লোকেরা অংশগ্রহণ করে। বর্তমানে আন্তঃমন্ডলীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আকাশ সংস্কৃতিতে আমাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.২ পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে সংগঠন, সংস্থা কয়টি? সংগঠন সংস্থার নাম কি?

সংগঠনসমূহ: শিশু মঙ্গল; বেদী সেবক সেবিকা; Y.C.S; B.C.S.M; যুব সংঘ; মারিয়ার সেনা সংঘ; S.V.P

সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান: পাদ্রীশিবপুর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:; পাদ্রীশিবপুর ক্রেডিট ইউনিয়ন; পাদ্রীশিবপুর খ্রিষ্টান ক্রেডিট ইউনিয়ন; কারিতাস; বিডিএস; ফাতিমা স্বাস্থ্য কেন্দ্র; প্রতিবন্ধী আশ্রয় কেন্দ্র; মুসলিম বোর্ডিং (অতীতে ছিল); সেন্ট আলফ্রেড স্কুল এন্ড কলেজ; দীপ্তি হোস্টেল; পবিত্র জপমালা সেমিনারী; হস্তশিল্প (পাটের কাজ); এডিসি; পল্লী গণউন্নয়ন কেন্দ্র।

৩.৩ পাদ্রীশিবপুরের ইতিহাস ভাষা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রাখার জন্য আমাদের করণীয় কি?

অনুশীলন করা ও প্রচার করা। পুস্তিকার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে প্রচার করা। সংলাপ, সভা/সেমিনার করা।

৪. পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের সেবা প্রতিষ্ঠানের অতীত ও বর্তমান

৪.১ পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে দরিদ্রদের জন্য কি কি সেবা ব্যবস্থা আছে?

এসভিপি প্রার্থনা, আর্থিক সাহায্য দান ও রোগীদের সেবাদান। ফাদার লিও ট্রস্ট: শিক্ষা ওস্বাস্থ্যসেবা। শিক্ষা কমিটি: শিক্ষা সহায়তা। কারিতাস: গৃহায়ন, শিক্ষাসহ অন্যান্য সহায়তা দান। এমসি সিস্টারস্: স্বাস্থ্য, খাদ্য ও আশ্রয় সেবাদান। প্রতিবন্ধী আশ্রয় কেন্দ্র: প্রতিবন্ধীদের সহায়তা। কার্ডিনাল পরম্পরা: শিক্ষা ও দরিদ্রদের সহায়তা। পাদ্রীশিবপুরে সামাজিক, অর্থনৈতিক, অবকাঠামোগত এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নে খ্রিস্টান সমাজের অবদান/ভূমিকা কি ছিল এবং বর্তমানে কি আছে?

পূর্বের সামাজিক অবস্থা	বর্তমান সামাজিক অবস্থা
১. ধর্মীয় সম্প্রীতি ছিল।	১. ধর্মীয় সম্প্রীতি কমে গেছে।
২. সামাজিক সমস্যা সমাধানে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির ভূমিকা ছিল।	২. বর্তমানে বিভিন্ন কমিটি এই ভূমিকা রাখে।
৩. সামাজিক সমস্যা নিজেরাই সামাজিকভাবে সমাধান করতো।	৩. বর্তমানে যেকোন সমস্যা হলেই আদালতের শরণাপন্ন হয়।
৪. সামাজিক, অর্থনৈতিক যেকোন সমস্যা সমাধানে পালপুরোহিতের উপরে নির্ভরশীলতা ছিল।	৪. বর্তমানে তা বিভিন্ন কমিটি ও সংগঠন নির্ভর হয়েছে।
৫. পূর্বে সমষ্টিগত বিনোদন বেশি ছিল।	৫. বর্তমানে তা একক ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছে।
৬. পূর্বে যৌথ পরিবার ছিল।	৬. বর্তমানে একক পরিবারের আধিক্য দেখা যায়।
৭. পারিবারিক প্রার্থনা ও বিশ্বাসের গভীরতা এবং পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় ছিল।	৭. বর্তমানে তা বিলুপ্তির পথে।
৮. আগে ছিল কৃষিনির্ভর অর্থনীতি।	৮. চাকরি ও ব্যবসা নির্ভর অর্থনীতি।
৯. আগে ধর্মান্তরিত হতো না।	৯. বর্তমানে হচ্ছে।
১০. জাতীয় পর্যায়ে ও বিভিন্ন সংগঠনে এই প্যারিশের সদস্যগণ নেতৃত্ব দিতেন।	১০. বর্তমানে তা নেই।
১১. পূর্বের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল কৃষি নির্ভর।	১১. বর্তমানে তা চাকরি নির্ভর।
১২. আগেকার পেশা ছিল কৃষক, বাবুর্চি, শ্রমজীবী, দিনমজুর ও শিক্ষকতা।	১২. বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পেশায় দেশে ও বিদেশে কর্মরত।
১৩. পূর্বে এডিসি কৃষি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূখ্য ভূমিকা পালন করতো।	১৩. বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি নেই।
১৪. আগে মহাজনী ব্যবসা ছিল।	১৪. বর্তমানে ক্রেডিট ইউনিয়ন সেই চাহিদা পূরণ করছে।
১৫. আগে বিভিন্ন কুটির শিল্প ছিল।	১৫. বর্তমানে তা আর নেই।
১৬. আগে খেলাধুলা/ সাংস্কৃতিক চর্চা ব্যাপক ছিল।	১৬. বর্তমানে তা সীমিত হয়ে এসেছে। পুরাতন খেলাগুলো নেই।
১৭. ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান (কীর্তন, পালাগান, হয়লা) ছিল।	১৭. বর্তমানে তা নেই।

৪.২ শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং প্যারিশের অন্যান্য সেবায় পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ একটি সেবাকেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা রাখে? উত্তর হ্যাঁ হলে কিভাবে?

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শিক্ষা বিস্তারে সেন্ট আলফ্রেডস্ স্কুল এন্ড কলেজের ভূমিকা। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ফাতেমা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভূমিকা। কারিতাস ও এমসি সিস্টারদের স্বাস্থ্যসেবা। ফা: জে. ইয়াং এর কারিগরি শিক্ষা। দিশু হোস্টেলের আবাসিক সুবিধা। পবিত্র জপমালা সেমিনারী, লরেটো সিস্টারদের নবিসিয়েট। সেন্ট ভিনসেন্ট দ্য' পলের সাহায্য। প্রতিবন্ধী আশ্রয় কেন্দ্র। প্যারিশ কাউন্সিল ও অন্যান্য কমিটি। মারীয়ার সেনা সংঘ।

৪.৩ পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে, আমাদের স্থানীয় সমাজে, দেশে এবং খ্রিস্ট মন্ডলীতে কি কি অবদান রয়েছে বলে মনে হয়?

আমাদের প্যারিশ থেকে অনেক আগে থেকেই বেশ কিছু সংখ্যক ফাদার দেশে ও বিদেশে সেবা দিয়েছেন এবং বর্তমানেও দিচ্ছেন। আমাদের প্যারিশ থেকে অনেক মেয়েরো বিভিন্ন সিস্টার সম্প্রদায়ে আছেন এবং সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের প্যারিশ থেকেই একজন কার্ডিনাল মনোনীত হয়েছেন যিনি সারা বিশ্বে তাঁর সেবা দান করে যাচ্ছেন বিশেষভাবে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে। আমাদের প্যারিশ থেকে অনেকেই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশে বিদেশে সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদের প্যারিশের লোকেরাই বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে সমবায় সমিতি গঠন ও তাতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

রাজাবাড়িয়া

১.১ পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের অতীত ও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য/পরিবর্তন হয়েছে? উত্তর হ্যাঁ হলে পরিবর্তনগুলো কি কি?

পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ধর্মীয় মূল্যবোধ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.২ পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের জনগণের /বাসিন্দাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে? উত্তর হ্যাঁ হলে পরিবর্তনগুলো কি কি?

অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন সমূহ: পেশা পরিবর্তন হয়েছে, জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। চাকরি করে অনেকে ধনী হয়েছে। নতুন নতুন পাকা বাড়ি হয়েছে।

১.৩ পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের ধর্ম ও কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? বর্তমানে ধর্ম ও কৃষ্টিগত কোন পরিবর্তন হয়েছে? উত্তর হ্যাঁ হলে পরিবর্তনগুলো কি কি? (উত্তর দেয়া হয় নি)

১.৪ পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের বাসিন্দাদের অতীত ও বর্তমান পেশা কি পরিবর্তন হয়েছে? উত্তর হ্যাঁ হলে পরিবর্তনগুলো কি কি?

আগে ছিল কৃষি নির্ভর। বর্তমানে তা চাকুরী নির্ভর হয়েছে। অনেকে ব্যবসায় মনোনিবেশ করেছে।

১.৫ পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের অতীত ও বর্তমান কৃষি ব্যবস্থা কি? কৃষি কাজের কোন পরিবর্তন হয়েছে? উত্তর হ্যাঁ হলে পরিবর্তনগুলো কি কি?

আগে কৃষি ব্যবস্থা ছিল সনাতনী পদ্ধতির বর্তমানে তা আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর হয়েছে। আগে যোগাযোগ ব্যবস্থায় নৌকা প্রধান ছিল কারণ রাস্তাঘাট তেমন ছিল না। বর্তমানে পাকা রাস্তাঘাট হয়েছে এবং যাতায়াতের সুবিধা হয়েছে।

২.১ পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনে অতীতের তুলনায় কোন পরিবর্তন দেখা যায়? উত্তর হ্যাঁ হলে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়?

হ্যাঁ পরিবর্তন দেখা যায়। মানুষ এখন নিজেদের নিয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবন থেকে পাদ্রীশিবপুর পিছিয়ে পড়ছে।

২.৩ পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের সাথে অন্য ধর্মের মানুষের সম্পর্ক কেমন?

পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের সাথে অন্য ধর্মের মানুষের সম্পর্ক চমৎকার।

২.৪ পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টানদের আর্থিক অবস্থার কি উন্নতি হয়েছে? তাহলে কোন খাতে তা লক্ষ্য করা যায়?

হ্যাঁ আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে।

॥ ঘ ॥ দলীয় আলোচনা সভা ও অংশগ্রহণকারীগণ

তথ্য সংগ্রহের জন্য পাদ্রীশিবপুরে ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে সারাদিনব্যাপী সেন্ট আলফ্রেড স্কুলের আয়োজনে পাশ্ববর্তী প্যারিশ হলে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনায় পালপুরোহিত এবং সহকারী পালপুরোহিতসহ উপস্থিত ছিলেন: ফাদার রবার্ট দিলিপ গমেজ, সিএসসি (পালপুরোহিত), ফাদার গাব্রিয়েল খোকন নকরেক, সিএসসি (সহকারী), ফাদার জেরোম রিংকু গোমেজ (পাদ্রীশিবপুরের পুরোহিত), সিস্টার আরতি ডি'কস্তা, এলএইচসি, সিস্টার বিনু পালমা, এলএইচসি, সিস্টার রূপালী পিউরিফিকেশন, এলএইচসি, সিস্টার প্রণালিকা ত্রিপুরা, এলএইচসি, সিস্টার হানিমা ত্রিপুরা, এলএইচসি, আজিধর বাবু গোমেজ (স্যার), হেলেনা লীনা গোমেজ, রেবা গোমেজ, ডরথী গোমেজ, মাথিয়াস গোমেজ, রনি ডি'রোজারিও, জন অমল গোমেজ, আন্দ্রিয় গোমেজ, ইভা গোমেজ, অরলেন্ডো গোমেজ, হার্বার্ট স্বপন ডি'রোজারিও, জেভিয়ার গোমেজ, গাব্রিয়েল ডি'রোজারিও, আলবিন গোমেজ, লায়ন গোমেজ, পিটার গোমেজ, ফ্রান্সিস কৈলু, রতন বাড়ৈ, ফ্লোরেন্স লিলি সরকার, জন গোমেজ, কমলী গোমেজ, সিসিলিয়া রেখা ডি'রোজারিও, এগ্নেস রীনা মিত্র, আন্না এলুইসিয়াস।

তথ্য সংগ্রহের সহযোগিতা: ইভন ছিলু ডি'রোজারিও, মীরা মেরীলিন ডি'রোজারিও, ফ্লোরিন্ডা ডি'রোজারিও, পল তপন গোমেজ, জন গোমেজ, রোজী গোলাপী গোমেজ, আন্না রাণী ডি'রোজারিও। **সেন্ট আলফ্রেড স্কুল:** সি. অর্চনা, আই.বি.ভি.এম, আজিধর বাবু গোমেজ (স্যার) লিংকন ডি'রোজারিও, প্রিয়াঙ্কা গোমেজ, শিমকী গোমেজ।

সাক্ষাৎকার: সি. মাদলেন বিশ্বাস, এল.এইচ.সি, প্রাক্তন সি: শিখা সরকার, সি: অনু ক্লারিস গোমেজ, মি. অরুন ব্যারেল (চ্যাটার্জি)।

পরিচালনায় উপস্থিত ছিলেন: গ্রন্থ-সম্পদনা কমিটি: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি (পরিচালক), যোসেফ ডি'রোজারিও (সেক্রেটারি), জেমস গোমেজ, যোয়ান্না ডি'রোজারিও, শ্যামল লরেন্স গোমেজ, বানার্ড পংকজ ডি'রোজারিও এবং ইভন ছিলু ডি'রোজারিও।

দ্বিতীয় অধ্যায়: পশ্চিমবঙ্গে পাদ্রীশিবপুরবাসী

॥ ক ॥ পশ্চিমবঙ্গে অবস্থানরত পাদ্রীশিবপুরের বাসিন্দাদের পরিসংখ্যান

SL	FAMILY HEADS	PADRI SHIBPUR BARI	BIRTH PAD' PUR	BRITISH PERIOD	PAK PERIOD	B'DESH PERIOD	TOTAL INDIAN	REMARKS
1	Augustin D'Rozario (Brown)	Parer Babur Bari	1	British			1	Taltola
2	Reginald D'Rozario Wife Offspring+Spouse+Gnd Children	Parer Babur Bari	1 1 1	British British British			88	Kalaynpur
3	Herald D'Rozaro Wife Offsprings+Spouse	Parer Babur Bari	1 1 1	British			35	Kalaynpur
4	Sebastian Gomes Wife Offsprings+Spouse	Jola Bari	1	British	Pakistan Pakistan		59	Kalaynpur
5	Norman D'Rozaro Wife Offsprings+Spouse	Greg. Peon Bari	1 1	British British			23	Dumdum
6	Benedict D'Rozario Wife Offsprings+Spouse	Above	1 1	British British			19	Dumdum
7	Shoda Gomes Wife Offsprings+Spouse	Howlader Bari, West	1 1 5	British British British			48	Barackpore
8	Leo Gomes (Pipe Rd) Wife Offsprings+Spouse	Above	1 1 1	British British British			42	Barackpore
9	Napier D'Costa Wife Offsprings+Spouse	Post Master	1 1	British			3	Taltola
10	Lakkhi D'Costa Wife Offsprings+Spouse	Above	1	British			1	Taltola
11	Clement Gomes Wife Offsprings+Spouse	Alichan Bari	1 1	British			85	Taltala
12	Norman (Noru) Gomes Wife Offsprings+Spouse	Aboce	1 1	British			24	Taltala

13	Blase Gomes Wife Offsprings+Spouse	0	1 1		Pakistan		10	Kalaynpur
14	Sebastian Gomes Wife Offsprings+Spouse	Bhakta Bari	1 1		Pakistan		22	Kalaynpur
15	Pushpa Gomes Wife Offsprings+Spouse	Padit Bari West	1	British	Pakistan		4	Thakurpukur
16	Victor Campoo Wife Offsprings+Spouse	Deshantor Kathi	1 1		Pakistan		13	Thakurpukur
17	Martin Gomes Wife Offsprings+Spouse	Bishai Bari	1 1	British			11	Thakurpukur
18	Lazarus Gomes Wife Offsprings+Spouse	Bishai Bari	1 1	British			9	Thakurpukur
19	Joseph Gomes Wife Offsprings+Spouse	Mati bhanga	1 1 1	British			16	Taltola
20	Benedict Gomes Wife Offsprings+Spouse	Peda Bari	1 1	British			3	Taltola
21	Bhulla Gomes Wife Offsprings+Spouse	Pad'pur	1 1	British British			20	Taltola
22	Joseph Gomes Wife Offsprings+Spouse	Pankha Bari	1		Pakistan		10	0
23	Peter D'Costa Wife Offsprings+Spouse	D'Costa Bari	1 1	British			19	Behala
24	Lawrence D'Costa Wife Offsprings+Spouse	Above	1 1	British			10	Behala
25	Richard E. Gomes Wife Offsprings+Spouse	Mistry Bari	1 1	British			15	Taltola
26	Hennessy Gomes Wife Offsprings+Spouse	Above	1	British			7	Goltala
27	Thomas Gomes Wife: Luciana Offsprings+Spouse	Pad'pur	1		Pakistan Pakistan		21	Kalaynpur
28	Vincent Gomes Wife Offsprings+Spouse	Bishai Bari	1	British			38	Kalaynpur
29	Raphael Gomes Wife Offsprings+Spouse	Above	1 1	British			13	Dumdum
30	Alvarers Gomes Wife Offsprings+Spouse	Bishai Bari	1 1	British			10	Kalaynpur

31	Thomas D'Costa Wife Offsprings+Spouse	Samu D'Costa	1 1	British British			20	Taltola
32	Benedict Gomes Wife Offsprings+Spouse	Deshantor Kathi	1 1				9	Kolkata
33	Sebastin Gomes Wife Offsprings+Spouse	Shikdar Bari	1	British			21	Gobra
34	Albert Gomes Wife Offsprings+Spouse	Above	1	British			1	Gobra
35	Benjamin Gomes Wife Offsprings+Spouse	Above	1 1	British			18	Gobra
36	Dr. B. Medlicot Gomes Wife Offsprings+Spouse	Above	1	British			12	Gobra
37	Hubert D'Costa Wife Offsprings+Spouse	Semu D'Costa	1	British			2	Taltola
38	Norbert Gomes Wife Offsprings+Spouse	Nayeb Bari	1	British			12	Taltola
39	Martin Gomes Wife Offsprings+Spouse	Moktar Bari	1 1	Bristish			7	Kalaynpur
40	Banas Brito (Bitu) Wife Offsprings+Spouse	Pad'pur	1 1	British			22	Kalaynpur
41 - 48	Kollaynpur Collony Eight Families Wife Offsprings+Spouse	Deshantor Kathi	7		Pakistan		22	Kalaynpur
49	Peter Gomes (Bata) Wife Offsprings+Spouse	Pad'pur	1 1	British			13	Batanagar
50	Sebastian (Blaidda) Wife Offsprings+Spouse	Pad'pur	1 1	British			13	Baruipur
51	Justin Gomes Wife Offsprings+Spouse	Deshantor Kathi	1 1	British			26	Kalaynpur
52	Martin Gomes Wife Offsprings+Spouse	Dhopa Bari	1 1	British			14	Kalaynpur
53	German Gomes Wife Offsprings+Spouse	Deshanto Uttarbari	1 1	British			12	Kalaynpur
54	Peter Gomes Wife Offsprings+Spouse	Deshanto Kathi	1 1	British			12	Kalaynpur
55	Bernard Gomes Wife Offsprings+Spouse	Deshantor Uttarbari	1 1	British			7	Kalaynpur

56	Martin Gomes Wife Offsprings+Spouse	Rajabaria	1 1		Pakistan		6	Kalaynpur
57	Harold Gomes Wife Offsprings+Spouse	Rajabaria	1 1			B'desh	16	Kalaynpur
58	Offsprings-Tonna Gom Wife Offsprings+Spouse	Deshantor Kathi	1 1			B'desh	24	Multiple Places
59	Vincent Gomes Wife Offsprings+Spouse	Pad'pur	1 1	British			19	Multiple Places
60	Deunga Peter Gomes Wife Offsprings+Spouse	Pad'pur	1 1	British			38	Multiple Locations
61	Albin Gomes Wife Offsprings+Spouse	Pad'pur	1 1	British			24	Multiple Locations
62	Bony Rozario Wife Offsprings+Spouse	Pad'pur	1 1				15	Multiple Locations
63	Norman Gomes Wife Offsprings+Spouse	Pad'pur	1 1	British			15	Kalaynpur
64	Augustin Gomes Wife Offsprings+Spouse	Pad'pur	1 1	British	Pakistan		5	Kalaynpur
65	Sebastian Gomes Wife Offsprings+Spouse	Digir Par	1 1		Pakistan		14	Kalaynpur
66	Noresh Gomes Wife Offsprings+Spouse	Pad'pur	1 1			B'desh	24	Kalaynpur
67	Sylvera Gomes Wife Offsprings+Spouse	Halder Bari	1 1		Pakistan		20	Kalaynpur
68	Epiphian Gomes Wife Offsprings+Spouse	Halder Bari	1	British			15	Kalaynpur
69	Mathew D'Costa Wife Offsprings+Spouse	Pad'pur	1 1		Pakistan		24	Kalaynpur
70	Khokon Gomes Wife Offsprings+Spouse	Jola Bari	1 1		Pakistan		8	Taltola
71	Santa Maria Wife Offsprings+Spouse	Santamaria Bari	1 1	British			36	Multiple Locations
72	Claudin Gomes Wife Offsprings+Spouse	Pad'pur	1 1	British			6	Boithok Khana
73	Benjamin+Pauline Wife Offsprings+Spouse	Pad'pur	1 1		Pakistan		2	Unknown Location

74	Francis Allay D'Rozario Wife Offsprings+Spouse	Near Shikdar Bari	1 1 4	British British			22	Unknown Location
75	Eugeb Gomes Wife Offsprings+Spouse	Pad'pur	1		Pakistan		10	Unknown Location
76	Benedict Gomes Notta Wife Offsprings+Spouse	Charer Bari	1 1		Pakistan		6	Ranaghata
77	Alo Ranjan Gomes Wife Offsprings+Spouse	Pad'pur	1			B'desh	7	Krishna Nagar
78	Manuel Gomes Wife Offsprings+Spouse	Kalada			Pakistan		15	Multiple Locations
78	**TOTAL**		**147**	**62**	**20**	**4**	**1293**	
7	Addition – Approximate		7	2	2	3	90	
85	**Estimated Total**		**154**	**64**	**24**	**7**	**1383**	

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

* উপরোক্ত তথ্য সংকলন হয়েছে ২০২৩ খ্রি. সেপ্টেম্বর থেকে জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি. মধ্যে

* সংকলনে: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি'এর পরিচালনায় এখানে উল্লেখিত ব্যক্তিদের সাথে ব্যক্তিগত অথবা দলগত আলাপের মাধ্যমে: আইরিছ গমেজ, যোসেফিন বেবী ভট্টাচারিয়া, মন্টু গমেজ, লাজারেস গমেজ, রুফিনা গমেজ, মীরা গমেজ, বাণী গমেজ, অসীম কাম্পু, রুবি গোমেজ, রানু গমেজ, আন্দ্রেয়া গমেজ এবং গেস্ গমেজ, ডাক্তার মেডলিকট-এর স্ত্রী লীনা গোমেজ এবং টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগের মধ্যে।

॥ খ ॥ এফজিডি আলোচনার ফলাফল

গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে

॥ গ ॥ দলীয় আলোচনা সভা ও অংশগ্রহণকারীগণ

গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে

তৃতীয় অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুরবাসী চট্টগ্রামে অভিবাসী

॥ ক ॥ চট্টগ্রামে পাদ্রীশিবপুর অভিবাসী পরিসংখ্যান

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৯	১০
ক্রঃনং	অভিবাসী পরিবারের নাম (পাদ্রীশিবপুর থেকে অভিবাসন করেছে সেই পরিবার- প্রধানের নাম	অভিবাসী পরিবারের মোট সংখ্যা	ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৭-এর পূর্বে	পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-১৯৭১)	বাংলাদেশ আমলে (১৯৭১-অদ্যাবধি	বর্তমানে অভিবাসীদের মোট সংখ্যা	যারা অন্যত্র চলে গেছে সেই স্থানের নাম উল্লেখ +	মন্তব্য
১	স্বর্গীয় পিটার পল গোমেজ	৭৬	১৯৪০†			৭৭	৭৩	ঢাকা, অস্ট্রেলিয়া(১৯৪০)
২	স্বর্গীয় বার্নার্ড ডি' রোজারিও	৪১		†		৪২	৩৮	কোলকাতা,ঢাকা, আমেরিকা ,পাদ্রীশিবপুর
৩	স্বর্গীয় জাস্টিন ডি'কস্তা (দুর্জয়)	৮৭	† 1926			৭৯		ঢাকা,কক্সবাজার
৪	স্বর্গীয় মার্ক লেনসেন	৩১		†		৩২	০	ঢাকা
৫	স্বর্গীয় ভিনসেন্ট গোমেজ (ডিএসবি)	৫২		†		৫৩	৪৫	ঢাকা ও আমেরিকা
৬	স্বর্গীয় অনু ক্রাউলী	১৪		†		১৫		
৭	স্বর্গীয় গিলবার্ট হুইলী	১৪		†		১৫	৫	ঢাকা ও অস্ট্রেলিয়া
৮	স্বর্গীয় নরবার্ট গোমেজ	২৪		†		২৫	৩	পাদ্রীশিবপুর, ঢাকা ও দক্ষিণ আফরিকা
৯	স্বর্গীয় গাব্রিয়েল গোমেজ	২৩		†		২৪	১৭	ঢাকা
১০	স্বর্গীয় এফেফেনি গোমেজ (এফু)	২৫		†		২৬	১৭	পাদ্রীশিবপুর, ঢাকা ও কানাডা
১১	স্বর্গীয় পিরিমিলা গোমেজ	৭			†	৮		
১২	**স্বর্গীয় ফান্সিস গোমেজ**							
১৩	স্বর্গীয় খোকন গোমেজ	১১			†	১২		
১৪	মুকুল গোমেজ (বাবুল ও ফ্রান্সিস)	৫			†	৬	ঢাকা ও কোলকাতা	
১৫	স্বর্গীয় বেনেডিক্ট গোমেজ (বিডি স্যার)	৪৪			†	৪৯	৫জন ঢাকা	
১৬	স্বর্গীয় ক্যামিনিয়াস গোমেজ (বেনু)	২২			†	২৩		
১৭	স্বর্গীয় অরুন গোমেজ	৭			†	৮	নোয়াখালী	

১৮	স্বর্গীয় মিল্টন গোমেজ	১০			†	১১		
১৯	স্বর্গীয় লায়নেল গোমেজ (লায়ন)	১১			†	১২	ঢাকা ৫	
২০	স্বর্গীয় জেরম গোমেজ	১২	†			১৩	১৩ কানাডা	
২১	স্বর্গীয় মনিকা মিনি গোমেজ	৭		†		৮	১ পাদ্রীশিবপুর	
২২	স্বর্গীয় ছিপ্রিয়ান গোমেজ	৩			†	৪	৩ পাদ্রীশিবপুর	
২৩	স্বর্গীয় ডনেল গোমেজ (ডনেল সাধু)	১৩		†		১৪	৬ পাদ্রীশিবপুর	
২৪	স্বর্গীয় মেনুয়েল গোমেজ (মাউল্লা)	২৩		†		২৪	২০	ঢাকা, পাদ্রীশিবপুর
২৫	স্বর্গীয় পল গোমেজ (পউল্লা)	৩৮		†		৩৯		
২৬	স্বর্গীয় যোসেফ গোমেজ (যুইস্যা)	১৭		†		১৮	৪ ঢাকা	
২৭	স্বর্গীয় ডরথি মার্টিন (ডরু)	৮		†		৯		
২৮	স্বর্গীয় ক্যালেরিস গোমেজ (গেলা)	৮		†		৯		
২৯	স্বর্গীয় মেরী গোমেজ/পিনারু	৯		†		১০	৮ জন নোয়াখালী	
৩০	স্বর্গীয় ক্লেমেন্ট গোমেজ	৪১		†		৪২		
৩১	স্বর্গীয় এন্টনী গোমেজ (এন্টু)	৩৮	†			৩৯		
৩২	স্বর্গীয় এলফু গোমেজ	১৭	†			১৮	পাদ্রীশিবপুর /ঢাকা	
৩৩	স্বর্গীয় বাদল গোমেজ	১৪		†		১৫	৪ জন ঢাকা ও পাদ্রীশিবপুর	
৩৪	স্বর্গীয় যোসেফ গোমেজ	২৭		†			২৮	
৩৫	স্বর্গীয় পিটার ডি'কস্তা	১৩		†			১৪	
৩৬	স্বর্গীয় বেঞ্জামিন ডি' কস্তা	১১		†			১২	পাদ্রীশিবপুর
৩৭	স্বর্গীয় গেছ পল ডি' কস্তা	১৫		†			১৬	পাদ্রীশিবপুর
৩৮	স্বর্গীয় উইলসন গোমেজ			†				

৩৯	স্বর্গীয় ইউজিন গোমেজ	১৪		†		১৫	৩জন ঢাকা	
৪০	মিঃ পিটার গোমেজ	৬		†		৭	৭ ঢাকা পাদ্রীশিবপুর	
৪১	স্বর্গীয় আবেল গোমেজ	৩৮		†		৩৯	৩২ ঢাকা ও পাদ্রীশিবপুর	
৪২	মিঃ আগষ্টিন গোমেজ	১৬		†		১৭	১৪ ঢাকা ও পাদ্রীশিবপুর	
৪৩	মিঃ আব্রাহাম গোমেজ	১০		†		১১	১১ ঢাকা ও বরিশাল	
৪৪	স্বর্গীয় জর্জ গোমেজ	৮		†		৯	ঢাকা	
৪৫	স্বর্গীয় এরিক গোমেজ	১৩		†		১৪	১১ ঢাকা ও বরিশাল	
৪৬	মিসেস সিসিলিয়া গোমেজ/ বৈদ্য	১২			†	১৩		
৪৭	স্বর্গীয় ফ্রানিচস গোমেজ	১৮			†	১৯	৭ বরিশাল কোলকাতা	
৪৮	স্বর্গীয় দিলিপ গোমেজ	৭			†	৮	২ জন ঢাকা	
৪৯	স্বর্গীয় জর্জ গোমেজ	১			†		কোলকাতা	
৫০	স্বর্গীয় সিজার জন পল গোমেজ	২৫			†	২৬	৬ পাদ্রীশিবপুর	
৫১	স্বর্গীয় রাজেমস পল গোমেজ (রাজে রুথ মেরী পিতা)	১১			†	১২	৯ পাদ্রীশিবপুর ও কুমিল্লা	
৫২	স্বর্গীয় ভিক্টর গোমেজ	৬		†		৭		
৫৩	মিঃ মুকুল গোমেজ	৭			†	৮	২ কোলকাতা /ঢাকা	
৫৪	স্বর্গীয় আলবিন গোমেজ	৭		†		৮		
৫৫	মিঃ এন্ড্রু অরুন গোমেজ	১৮			†	১৯	২ পাদ্রীশিবপুর	
৫৬	স্বর্গীয় রেচস্যান গোমেজ	৩১		†		৩২		
৫৭	স্বর্গীয় কালুচ গোমেজ (কাইল্লা)	১৩			†	১৪	১৪ পাদ্রীশিবপুর/ ঢাকা	
৫৮	স্বর্গীয় আলবার্ট গোমেজ (বিডিআর)	১৭			†	১৮	১৭ পাদ্রীশিবপুর	

৫৯	স্বর্গীয় রেজিন গোমেজ	১৩		†		১৪		
৬০	মিঃ ব্যাবুল গোমেজ	৮			†	৯	৬ ঢাকা	
৬১	স্বর্গীয় গাব্রিয়েল গোমেজ	১১			†	১২	১২ ঢাকা	
৬২	স্বর্গীয় ছাবু গোমেজ	৯			†	১০	ঢাকা	
৬৩	স্বর্গীয় বাবুল গোমেজ	১			†	১	ঢাকা	
৬৪	স্বর্গীয় রাফেয়েল গোমেজ	৮			†	৯	৭ জন ঢাকা/ আমরিকা	
৬৫	মিঃ আলবার্ট গোমেজ (বিডিআর)	১৩		†		১৪	১৩ পাদ্রীশিবপুর	
৬৬	মিঃ জাস্টু গোমেজ	২		†		৩	৩ পাদ্রীশিবপুর	
৬৭	মিঃ লিটন গোমেজ	৬			†	৬		
৬৮	স্বর্গীয় বাবুল গোমেজ	২			†	৩		
৬৯	রাফিয়েল গোমেজ (রাফ্ফা)	৮		†	৯	৯	৭ আমরিকা/ ঢাকা	
৭০	স্বর্গীয় মাইকেল সমীর গোমেজ	৯		†	১০			
৭১	মিঃ মাতায়োচ গোমেজ (মাতু)	১১		†	১২	৭		
৭২	স্বর্গীয় ডানিয়েল ডি'রোজারিও (ডানু)	৫		†	৬	৬	পাদ্রিশিবপুর/ ঢাকা	
৭৩	মিঃ ডানু গোমেজ	৪		†	৫	৫		
৭৪	স্বর্গীয় এরমান গোমেজ	১৪	†		১৫	৪	২ জন পাদ্রীশিবপুর	
৭৫	স্বর্গীয় পিউস ক্রুস	৪	†		৫			
৭৬	মিঃ রুবেন গোমেজ	৮	†		৯	৯	৯ জন পাদ্রীশিবপুর	
৭৭	স্বর্গীয় সেবাস্টিন গোমেজ (ভিকসেনারী)	৬	†		৭	৭	৭ জন পাদ্রীশিবপুর	
৭৮	স্বর্গীয় ভেনাচ গোমেজ	১৭	†		১৮	১৮		
৭৯	মিঃ আলবিন (নইস্তা আলবিন)	৯	†		১০	১০	৭ জন পাদ্রীশিবপুর	

৮০	স্বর্গীয় মন্টু (ভিক্টর) গোমেজ	৭			†	৮	৮ ঢাকা	
৮১	স্বর্গীয় ডমিনিক গোমেজ	১১			†	১২	১১ পাদ্রীশিবপুর	
৮২	স্বর্গীয় রুথ মেরী গোমেজ (শিক্ষিকা)	১			†	২	১১ পাদ্রীশিবপুর	
৮৩	স্বর্গীয় ব্রায়েন গোমেজ (স্যার)	১৪			†	১৫	১১ পাদ্রীশিবপুর	
৮৪	স্বর্গীয় মোজেস গোমেজ মেম্বার	৯			†	১০	১০ পাদ্রীশিব পুর	
৮৫	স্বর্গীয় বার্নার্ড গোমেজ	১৬			†	১৭		
৮৬	স্বর্গীয় আলবার্ট গোমেজ	১১			†	১২		
৮৭	স্বর্গীয় নরবার্ট গোমেজ	৭			†	৮		
৮৮	স্বর্গীয় হিউবার্ট গোমেজ	৬			†	৭		
৮৯	স্বর্গীয় পিটার ডি' রোজারিও	৮			†	৯	৯	ঢাকা / পাদ্রীশিবপুর
৯০	মিঃ বেঞ্জামিন ডি' রোজারিও	২১			†	২২	৮ পাদ্রীশিবপু র	
৯১	স্বর্গীয় মার্টিন গোমেজ	১			†	২	২ পাদ্রীশিবপু	
৯২	স্বর্গীয় রেজিন গোমেজ	৭			†	৮	৮ পাদ্রীশিবপুর	
৯৩	স্বর্গীয় ডানিয়েল (ডেনিচ)	১৬			†	১৭	১৭ ঢাকা/ পাদ্রীশিবপুর	
৯৪	স্বর্গীয় নেপি ডি কস্তা	৬			†	৭	৪ কোলকাতা	
৯৫	মিসেস ডেমী গোমেজ/রড্রিক্স ছন্দরিয়া	৩			†	৪		
৯৬	স্বর্গীয় পিটার গোমেজ (পিতু)	১১			†	১২		
৯৭	মিঃ শিমন গোমেজ	৩			†	৪	৪ পাদ্রিশিবপুর	
৯৮	স্বর্গীয় টমাস গোমেজ (টমুয়া)	১৪			†	১৫		
৯৯	স্বর্গীয় পিটার গোমেজ	১৩			†	১৪		
১০০	স্বর্গীয় সেবাস্টিন গোমেজ (সেভন)	১৪			†	১৫	১২ পাদ্রীশিবপুর/ কোলকাতা	

১০১	স্বর্গীয় রেজিন গোমেজ	১৩			†	১৪	৪ ঢাকা	
১০২	মিঃ মন্টু গোমেজ	৫		†		৬	৬ পাদ্রীশিবপুর	
১০৩	মিঃ উবাল্ডু গোমেজ	১১		†		১২	৪ পাদ্রীশিবপুর	
১০৪	স্বর্গীয় বেলাইটেন ডি'রোজারিও	৯		†		১০	১০ ঢাকা	
১০৫	স্বর্গীয় নিম্বেল ডি' রোজারিও (সাধু)		†					
১০৬	স্বর্গীয় কেমি ডি' রোজারিও			†				
১০৭	স্বর্গীয় টমাচ গোমেজ (দিলিপের বাবা)	১০		†		১১	১১ ঢকা/পাদ্যশিবপুর	
১০৮	স্বর্গীয় অপিলিয়া (অপি)	১১		†		১২		
১০৯	মিঃ সিমন গোমেজ	৩		†		৪	পাদ্রীশিবপুর	
১১০	মিঃ রুবেন গোমেজ	৬		†		৭		
১১১	স্বর্গীয় ফিরিডি ডি'কস্তা	১		†		২		
১১২	মিঃ মানিক ডি'কস্তা	৪		†		৫		
১১৩	স্বর্গীয় সিলভেস্টার ডি' রোজারিও	৪		†		৫		
১১৪	মিঃ আগিলা ডি' রোজারিও	৯		†		১০	৭ অস্টেলিয়া/ ঢাকা	থোকন সহ
১১৫	মিসেস জাসিন্তা ডি' রোজারিও	৮		†		৯	৩ ঢাকা	
১১৬	স্বর্গীয়া সেবী গোমেজ	১		†		২		
১১৭	স্বর্গীয় আলবার্ট গোমেজ	২০		†		২১		
১১৮	স্বর্গীয় গিলবার্ট গোমেজ	১০		†		১১	১১ পাদ্রীশিব পুর	
১১৯	মিঃ মন্টু গোমেজ	৬		†		৭	৭ টাঙ্গাইল	
১২০	স্বর্গীয় বেনেডিক্ট গোমেজ (ভিন্ডি)	১৩		†		১৪	১৪ পাদ্রীশিবপুর	

১২১	স্বর্গীয় মাইকেল ডি'রোজারিও	৯		†		১০	১০ পাদ্রীশিবপুর/ ঢাকা	
১২২	স্বর্গীয় নরেস ডি' রোজারিও	৬			†	৭	৭ পাদ্রীশিবপুর	
১২৩	স্বর্গীয় পল ডি' রোজারিও (পল খ্রিষ্টান)	১৪			†	১৫		
১২৪	মিঃ মাথায়াস গোমেজ (তোমার পর)	৫			†	৬	৬ পাদ্রীশিবপুর/ ঢাকা	
১২৫	মিঃ রুপাট গোমেজ	৭			†	৮	৮ পাদ্রীশিবপুর/ ঢাকা	
১২৬	ডমিঃ ভানু গোমেজ	৬			†	৭	৭ পাদ্রীশিবপুর	
১২৭	স্বর্গীয় সেবাস্টিন গোমেজ	১৩		†		১৪	ঢাকা	
১২৮	স্বর্গীয় পেতাই মাস্টার	৭	†			৮	পাদ্রিশিবপুর/ ঢাকা	
১২৯	স্বর্গীয় ফ্রান্সিস গোমেজ	২১		†		২২		
১৩০	মিঃ জেভিয়ার গোমেজ	৭			†	৮	পাদ্রিশিবপুর	
১৩১	স্বর্গীয় মাটিন গোমেজ ??	১৫			†	১৬	৪ খুলনা	
১৩২	স্বর্গীয় কেনেত গোমেজ ??	৮			†	৯		
১৩৩	স্বর্গীয় আইভেন গোমেজ ??	৭			†	৮		
১৩৪	আইরিন গোমেজ	৭			†	৮		
১৩৫	মিঃ ভেনাচ গোমেজ	১৬			†	১৭	১৬ পাদ্রীশিবপুর	
১৩৬	মিঃ আলবিন গোমেজ	৭			†	৮	৮পাদ্রীশিবপুর	
১৩৭	মিঃ (মেডিস বাড়ীতে কর্মরত)	৮			†	৯	৯পাদ্রীশিবপুর	
১৩৮	স্বর্গীয় কালো গোমেজ	২১			†	২২	২২ ঢাকা/পাদ্রীশিবপুর	
১৩৯	স্বর্গীয় বনি গোমেজ	৭			†	৮	৭ ঢাকা/আমরিকা	
১৪০	স্বর্গীয় সেবাস্টিন ডি'কস্তা (ব্রাদার সেবাস্টিন)	৩৮		†		৩৯	৪ জন কানাডা	

১৪১	স্বর্গীয় সেলাস্টিন ডি' কস্তা	৭		†		৮		
১৪২	স্বর্গীয় আবেল ডি'কস্তা	১		†		২		
১৪৩	মিঃ জোনাচ ডি'কস্তা	২		†		৩		
১৪৪	ফাঃ রিগ্যান এর ভাই			†				
১৪৫	ভেজি গোমেজ	১		†	২	২		
১৪৬	স্বর্গীয় মাটিন গোমেজ	৪		†	৫	৫	পাদ্রিশিবপুর/ ঢাকা	
১৪৭	স্বর্গীয় রমেশ ডি' রোজারিও	৮		†		৯	৭ ঢাকা/কক্সবা জার	
১৪৮	স্বর্গীয় সুরেশ ডি' রোজারিও	৬		†		৭	ঢাকা /পাদ্রীশিবপুর	
১৪৯	মিঃ রেমন্ড ডি' রোজারিও	২		†		৩	৩ ঢাকা	
১৫০	স্বর্গীয় মুকুল ডি' রোজারিও	৭		†		৮	৭ পাদ্রীশিবপুর	
১৫১	মিঃ সেবাস্টিন ডি' রোজারিও	৪		†		৫	৫ পাদ্রীশিবপুর	
১৫২	স্বর্গীয় সেবী ডি' রোজারিও	৭		†		৮	৮ পাদ্রীশিবপুর	
১৫৩	স্বর্গীয় দেলোর চাচা	৪		†		৫		
১৫৪	স্বর্গীয় জন গোমেজ (দিয়াং)	৬		†		৭		
১৫৫	স্বর্গীয় ক্ল্যারেন্স গোমেজ	৪		†		৫	৫ পাদ্রীশিবপুর	
১৫৬	স্বর্গীয় তনি গোমেজ	১		†		৩	ঢাকা/কোলক াতা	
১৫৭	স্বর্গীয় সালমন গোমেজ	৭		†		৮	৪ পাদ্রীশিবপুর	
১৫৮	স্বর্গীয় ডিঙ্কো	১৯		†	২০	২০ ঢাকা		
১৫৯	স্বর্গীয় মুক্তিযোদ্ধা কেভোট গোমেজ	৫			†	৬	পাদ্রীশিবপুর	
১৬০	স্বর্গীয় রবিন ডি'রোজারিও	৩৩			†	৩৪	৮ ঢাকা	
১৬১	স্বর্গীয় পিটার গোমেজ (বিসাই বাড়ি)	১৭			†	১৮	৫ পাদ্রীশিবপুর	

১৬২	মিঃ				†			
১৬৩	মিঃ পিন্টুর ভাইরা	১			†	২	পাদ্রীশিবপুর	
১৬৪	মিসেস				†			
১৬৫	স্বর্গীয় রবিন ডি'কস্তা	১৩		১৯৬৫	†	১৪		
১৬৬	স্বর্গীয় লুকাস ডি' কস্তা	১১		১৯৬৬	†	১২		
১৬৭	স্বর্গীয় রেজিন ডি' কস্তা	৫			†	৬		
১৬৮	স্বর্গীয় কউলু	৫			†	৬		
১৬৯	মিঃ জেভিয়ার গোমেজ	৩			†	৪	ঢাকা	
১৭০	স্বর্গীয় গাব্রিয়েল গোমেজ (জন্যরা বাড়ি)	৩		†		৪	পাদ্রিশিবপুর/ ঢাকা	
১৭১	স্বর্গীয় ফেসিচ গোমেজ	১৩		†		১৪		
১৭২	স্বর্গীয় প্লাসিড গোমেজ	১৪		†		১৫		
১৭৩	স্বর্গীয় মাটো স্বামীর নাম ??			†				
১৭৪	স্বর্গীয় আলবিন গোমেজ (লুকুর ছেলে)			†				
১৭৫	স্বর্গীয় নেপ ডি' কস্তা	৪		†	৫		কোলকাতা	
১৭৬	স্বর্গীয় আলবারিচ গোমেজ	১		†	২		ঢাকা	
১৭৭	স্বর্গীয় আগষ্টিন গোমেজ	৩		†	৪	পাদ্রীশিবপুর		
১৭৮	স্বর্গীয় ফ্লোরী গোমেজ (ডায়েস)	১১		†	১৩			
১৭৯	স্বর্গীয় মেবেল গোমেজ (বেনির বাড়ি)	৭		†	৮			
১৮০	স্বর্গীয় ফাদার যোসেফের মা	১		†	২		পাদ্রিশিবপুর	
১৮১	মিঃ মাটিন গোমেজ (চট্টগ্রাম ক্লাব)	৪			†	৫		
১৮২	মিঃ আলবারিস গোমেজ (রামুর পালা)	৫			†	৬	ঢাকা	

১৮৩	মিঃ মাটিন গোমেজ (টাইপ রাইটার মেকানিক)	১১			†	১২		
১৮৪	স্বর্গীয় উরসি কাস্পু (সার্মিনের নানি)	২৩			†	২৪	১৯৫২	
১৮৫	স্বর্গীয় বেঞ্জাবিন কাস্পু	৩			†	৪		
১৮৬	মিঃ অরুন কাস্পু	৩			†	৪		
১৮৭	ঐ বোন	৩			†	৪		
১৮৮	মিঃ গেস্টিন কাস্পু	৪			†	৫	২ পাদ্রীশিবপুর	
১৮৯	স্বর্গীয় ম্যাকজেট কাস্পু	৩			†	৪	পাদ্রীশিবপুর	
১৯০	মিঃ রডিক্স কাস্পু (কালো)	৫			†	৬		
১৯১	মিঃ উজ্জ্বল কাস্পু (সুমন)	২			†	৩		
১৯২	মিঃ খোকন ডি' কস্তা	১				†	১	পাদ্রীশিবপুর
১৯৩	স্বর্গীয় রেডিন গোমেজ (ভানাবেল)	৮				†	৯	৫ পাদ্রীশিবপুর
১৯৪	মিঃ শিমন গোমেজ	১				†	২	২ পাদ্রীশিবপুর
১৯৫	মিঃ ভেলরুয়া	৩				†	৪	৪ পাদ্রীশিবপুর
১৯৬	স্বর্গয় আগস্টিন গোমেজ (ডাক্তারের বাবা)	৫				†	৬	৪ পাদ্রীশিবপুর
১৯৭	মিঃ রঞ্জন গোমেজ	২				†	৩	
১৯৮	মিঃ ভানাবেল (ভাইন্না)	২				†	২	
১৯৯	মিঃ রুবেন গোমেজ	৩				†	৪	
২০০	মিঃ মার্ক রনি গোমেজ	৩				†	৪	
২০১	স্বর্গীয় এলিজাবেৎ গোমেজ	৪		১৯৬৫		†	৫	
২০২	মিঃ বেঞ্জাবিন গোমেজ/ তার মা	১৭			†	১৮	১২	
২০৩	মিঃ মাটিন গোমেজ	৭			†	৮		

২০৪	মিঃ এন্ড্রু আন্দ্রিয় গোমেজ	১৯			†	২০	৯	
২০৫	মিঃ সেন্টু গোমেজ	৪			†	৫	৫	
২০৬	মিঃ রবার্ট জান্টু গোমেজ	৪			†	৫	৪	
২০৭	মিঃ শিমন গোমেজ	১৩			†	১৪	৬	
২০৮	মিঃ বার্নার্ড গোমেজ	১১			†	১২	১২	
২০৯	স্বর্গীয় জেভিয়ার গোমেজ (মুনগুশীর স্বামী)	১২			†	১৩	৬	
২১০	মিঃ ধল্যুয়া	৬			†	৭	৭	
২১১	স্বর্গীয় ডানিয়েল গোমেজ	১৮			†	১৯		
২১২	স্বর্গীয় আবেল গোমেজ	২১			†	২২	১৮	
২১৩	স্বর্গীয় জন গোমেজ	১৭			†	১৮	৮	
২১৪	স্বর্গীয় রুবেন গোমেজ	২			†	৩		
২১৫	মিঃ গাব্রিয়েল গোমেজ (মা ও বোন ??)	১১			†	১২		দিয়াং
২১৬	মিঃ হেরন গোমেজ	৫			†	৬	৪	
২১৭	মিঃ সিমসন গোমেজ	৩			†	৪	৪	
২১৮	মিঃ পলিনা গোমেজ /পেনায়োটি	৭			†	৮	৭	
২১৯	মিঃ এরিক গোমেজ	৫			†	৬	২	
২২০	মিঃ মাথায়াচ গোমেজ	৬			†	৭	৭	
২২১	মিঃ							
২২২	স্বর্গীয় মাটিন কাস্পু (ধোনাই)	২৪		†		২৫	৩ নোয়াখালী	মাটিভাঙ্গা/ ছোট বিগাই
২২৩	মিঃ নান্টু কাস্পু	৩			†	৪		
২২৪	মিঃ খোকন কাস্পু	৪			†	৫	২ ছোট বিগাই	

২২৫	মিঃ শংকর কাস্পু	৫			†	৫	২ ছোট বিগাই	
২২৬	মিঃ আব্রাহাম বাবু কাস্পু	৪			†	৫		
২২৭	মিঃ রিন্টু কাস্পু	২			†	৩	দিয়াং	
২২৮	মিঃ সুরেশ গোমেজ	৭			†	৮		
২২৯	মিঃ মিডিন গোমেজ	৯			†	৩	বরিশাল	
২৩০	মিঃ আলবারিচ গোমেজ	৩			†	৪		
২৩১	স্বর্গীয় এডোয়ার্ড গোমেজ (মুইন্না)	২৩			†	২৪	৪	কালাদা/ রাঙ্গাবাবিয়া
২৩২	স্বর্গীয় বেনেডিক্ট গোমেজ	২৩			†	২৪	৬	বরিশাল/ঢাকা
২৩৩	স্বর্গীয় গিলবার্ট গোমেজ	১৭			†	১৮	১৫	
২৩৪	স্বর্গীয় হিউবার্ট গোমেজ	১০			†	১১	৭	বরিশাল
২৩৫	স্বর্গীয় গাব্রিয়েল গোমেজ	৫			†	৬	৪	ঢাকা
২৩৬	মিঃ খোকন গোমেজ	১			†	১	১	বরিশার
২৩৭	মিঃ বাবুল গোমেজ	৩			†	৪	২	ঢাকা /বরিশ
২৩৮	মিঃ মোহন গোমেজ	৪			†	৫	৩	
২৩৯	মিঃ সেফালী গোমেজ/রড্রিক্স	৪			†	৫	১	ঢাকা
২৪০	মিঃ দিলিপ গোমেজ	২			†	৩		
২৪১	মিঃ অঞ্জলী গোমেজ/দাস	৬			†	৭		
২৪২	মিঃ যোহন গোমেজ	১			†	২	১	ঢাকা
২৪৩	মিঃ পিটার গোমেজ	১৩			†	১৪		
২৪৩	মোট	১৭০৭	১১	৯৭	১২৪	১০২৮	৬৭৯	

পরিসংখ্যান সংকলনে: মোজেস শ্যামল গোমেজ এবং এমরোজ গোমেজ

॥ খ ॥ চট্টগ্রামে এফজিডি আলোচনার ফলাফল

বিষয়: ০১: পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের পরিচিতি

১.১ পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের অতীত ও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য/পরিবর্তন হয়েছে? উত্তর হ্যাঁ হলে পরিবর্তনগুলো কি কি?

উত্তর: হ্যাঁ; অর্থনৈতিক উন্নয়ন; শিক্ষার হার উন্নয়ন।

১.২ পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের জনগণের/বাসিন্দাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে? উত্তর হ্যাঁ হলে পরিবর্তনগুলো কি কি?

উত্তর: হ্যাঁ; আবাসনের ভাল ব্যবস্থা (পাকা বাড়ি); পেশাগত পরিবর্তন, দেশ/বিদেশ ভ্রমণ।

১.৩ পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের ধর্ম ও কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? বর্তমানে ধর্ম ও কৃষ্টিগত কোন পরিবর্তন হয়েছে? উত্তর হ্যাঁ হলে পরিবর্তনগুলো কি কি?

উত্তর: হ্যাঁ; সনাতন, ইসলাম ও খ্রিস্টান ক্যাথলিক; দেশিয় কৃষ্টির সাথে পর্তুগীজ ও গোয়ানিজদের কৃষ্টির সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়।

১.৪ পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের বাসিন্দাদের অতীত ও বর্তমান পেশা কি পরিবর্তন হয়েছে? উত্তর হ্যাঁ হলে পরিবর্তনগুলো কি কি?

উত্তর: হ্যাঁ; সরকারি, এনজিও ও কর্পোরেট এর বিভিন্ন পদে যাচ্ছে; ব্যবসায়; দেশের বাইরেও অনেকে কর্মরত আছে।

১.৫ পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের অতীত ও বর্তমান কৃষি ব্যবস্থা কি? কৃষিকাজের কোন পরিবর্তন হয়েছে? উত্তর হ্যাঁ হলে পরিবর্তনগুলো কি কি?

উত্তর: হ্যাঁ; আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার হচ্ছে।

১.৬ পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের অতীত ও বর্তমান রাস্তাঘাট/যোগাযোগ ব্যবস্থার কি উন্নয়ন হয়েছে? উত্তর হ্যাঁ হলে উন্নয়নগুলো কি কি?

উত্তর: হ্যাঁ; এখন সুন্দর পাকা রাস্তা হয়েছে।

বিষয় নং- ০২: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস

১) পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর খ্রিস্টানদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনে অতীতের তুলনায় কোন পরিবর্তন দেখা যায়? উত্তর হ্যাঁ হলে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়?

আলোচনা: এ'কথা স্বীকার্য যে অতীতের তুলনায় পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর খ্রিস্টানদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনে কিছুটা শিথিলতা এসেছে। যেমন রবিবারের খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ ও পারিবারিক প্রার্থনা কমেছে। তথাপি, চট্টগ্রামে অবস্থানরত বেশীরভাগ পাদ্রীশিবপুর পরিবারে এখনো পারিবারিক জপমালা প্রার্থনা চলমান আছে, রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণের চেষ্টা আছে। চট্টগ্রামের অন্যান্য

খ্রিস্টভক্তদের সাথে আনুপাতিক হারে তুলনা করলে এই সংখ্যা এখনো সন্তোষজনক।
পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লী থেকে অনেকেই প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করতে আহ্বান লাভ করেছে। আমরা পেয়েছি কার্ডিনাল, ফাদার, ব্রাদার এবং সিস্টারদের। বর্তমান সময়ে সারা দেশে আহ্বান কমে যাওয়ার যে প্রবণতা, সেই একই ধারায় আহুত জীবনে আগের মত বেশি সংখ্যক যুবক-যুবতী আগ্রহী হচ্ছেনা। তথাপি, একটানা দীর্ঘ সময় ধরে পাদ্রীশিবপুর কখনো আহ্বান শূন্য থাকেনি, সাড়াদান চলমান আছে।

২) পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর কাঠামো কী? গ্রাম সমাজের পূর্ব ব্যবস্থা কী ছিল? বর্তমান ব্যবস্থা কী? পরিবর্তনগুলো কী?

পাল-পুরোহিত থাকাকালে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর কাঠামোকে ক্ষুদ্র সমাজে বিভক্ত করেছিলেন। ক্ষুদ্র সমাজের প্রতিনিধিগণকে নিয়েই গঠন করা হতো ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদ। সেসময়ে তিনি ধর্মপল্লী একটি সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন। আমরা দীর্ঘ সময় চট্টগ্রামে অভিবাসী হওয়ায় সেখানে এই কাঠামো এখনো টিকে আছে কি না, সে ব্যাপারে সঠিক তথ্য নেই।

৩) পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের খ্রিস্টভক্তদের সাথে অন্য ধর্মের মানুষের সম্পর্ক কেমন?
আমরা যারা চট্টগ্রামে আছি, তারা বিভিন্ন এলাকায় অন্য ধর্মাবলম্বীদের মাঝেই আছি। প্রতিবেশী হিসেবে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে আমাদের প্রায় আত্মীয়তার মতই সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের পার্বণে তারা যেমন আনন্দে যোগ দেয়, তাদের পার্বনেও আমরা আনন্দ অনুষ্ঠানে যোগ দেই। তাছাড়া একে অন্যের পারিবারিক বিভিন্ন জরুরী প্রয়োজনে আমরা পরস্পর এগিয়ে আসি।

৪) পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টানদের আর্থিক অবস্থার কি উন্নতি হয়েছে? তাহলে কোন খাতে তা লক্ষ্য করা যায়?

যারা পাদ্রীশিবপুর থেকে অভিবাসী হয়েছে, তাদের আর্থিক অবস্থা বিগত সময় থেকে অবশ্যই উন্নতি হয়েছে। তাছাড়া অভিবাসীদের অনেকেই বাড়ীতে পাকা বাড়ি করেছে যা আগে কাঁচা ছিল। যে প্রজন্ম অভিবাসী হয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে শিক্ষিত খুব একটা ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় প্রজন্ম থেকে শিক্ষায় যথেষ্ট অগ্রগতি হওয়া তাদের অনেকেই ভাল চাকরি করছে। ব্যবসায় কয়েকজন জড়িত থাকলেও, মূলত চাকরি খাত থেকেই আর্থিক উন্নতি দৃষ্টিগ্রাহ্য। তবে সামগ্রিকভাবে বলতে হয়, দুই একজন ছাড়া পাদ্রীশিবপুরের মানুষ যারা চট্টগ্রামে আছে তারা যে খুব স্বচ্ছল তা-ও নয়। অনেকের জন্ম চট্টগ্রামে হলেও তাদের বেশিরভাগই এখন পর্যন্ত এখানে তারা নিজেদের বাড়ি ঘর করতে সক্ষম হয়নি।

৫) পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টানদের অতীত ও বর্তমান পেশাসমূহ কী কী? পেশাজীবনে কী কী পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়?

এক্ষেত্রেও মাপকাঠি হচ্ছে শিক্ষায় অগ্রসরতা। অভিবাসীদের প্রথম প্রজন্ম চট্টগ্রামে মূলত বাসা-বাড়ি ও হোটেলের কাজ, নিম্ন স্তরের সরকারি চাকরি, বিভিন্ন বেসরকারি অফিসের পিয়ন-দারোয়ান, এবং দিনমজুরি কাজ করতো এমন সংখ্যা বেশী। যারা শিক্ষিত ছিল, তারা উচ্চ পর্যায়ে কাজ করেছে। পক্ষান্তরে বর্তমান প্রজন্ম বিভিন্ন বেসরকারি ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যম থেকে উচ্চ পর্যায়ে চাকুরি করছে। অন্যান্য পেশায়ও তারা নিয়োজিত আছে, যেমন: শিক্ষক, প্রকৌশলী, আইনজীবি, আইটি এক্সপার্ট, আউটসোর্সিং, পেশাদার প্রশিক্ষক, অধ্যাপক, নার্স, নৌযান চালক, খালাসি। কয়েকজন ব্যবসার সাথেও জড়িত আছে।

বিষয় নং - ০৩: পাদ্রীশিবপুরের অতীত ও বর্তমান কৃষ্টি, ভাষা ও সংস্কৃতি

৩.১ পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে কি কি অনুষ্ঠান/ উৎসব পালন করা হতো ? বর্তমানে কি কি উৎসব পালন করা হয়?

গ্রামীণ কীর্তন, তেলবাতি (২৪ ডিসেম্বর), বড়দিন উৎসব, খ্রিস্টরাজার পর্ব (নভেনা) সাথে শোভাযাত্রা, পুণ্য শুক্রবারে বিশেষ উপবাস (আল্লান রুটি, শাক রান্না ছেস্কী), ক্রুশের পথ গ্রাম ভিত্তিক, রামুরপালা, সাধু আন্তনীর নভেনা, পবিত্র আত্মার উপবাস (ইসপিরিতু সান্তের রোজা), মা মারীয়ার নভেনা (গ্রাম ভিত্তিক), মৃতলোকের জন্য র‍্যাজবার।

৩.২. পাদ্রীশিবপুরের অভিবাসী হয়ে পাদ্রশিবপুরের কোন কোন্ অনুষ্ঠানে তারা সাধারণত যোগদান করে? এবং বছরে তাদের আনুমানিক সংখ্যা কত?

সংখ্যা ৩০০ জন (আনুমানিক); অনুষ্ঠানসমূহ: বড়দিন, ইস্টার, নভেনা, বিভিন্ন পর্ব, মানত, মৃত্যুবার্ষিকী, বিবাহ বার্ষিকী, সমাধি দেওয়া, ইত্যাদি।

৩.৩. পাদ্রীশিবপুরের ইতিহাস, ভাষা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রাখার জন্য আমাদের করণীয় কি?

নিজ পরিবারে শিকড়ের সাথে যোগাযোগ, নিজস্ব পরিবারে শিকড়ের সম্পর্ক চর্চা করা, ঐতিহ্যগত খাবার পরিবেশন ও ইতিহাস পর্যকেক্ষণ বা সকলের কাছে তুলে ধরা।

বিষয় নং- ০৪: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের সেবা প্রতিষ্ঠানের অতীত ও বর্তমান
এটি আলোচ্য বিষয় হিসেবে দেয়া হয়নি।

বিষয় নং- ০৫: অভিবাসন বিষয়ে প্রশ্ন

১) পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লী থেকে অনেকে অভিবাসী হয়ে (ভারত/ চট্টগ্রাম/ ঢাকা/ খুলনা/ দেশের মধ্যে অন্যত্র/ প্রবাসে) স্থানান্তরিত/ দেশান্তরিত হয়েছেন। কী কারণে?

তৎকালে পাদ্রীশিবপুরে কর্মসংস্থানের খুব একটা সুযোগ ছিল না। মূলত ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যই পাদ্রীশিবপুরের মানুষ দেশের বিভিন্ন এলাকায় অভিবাসী হয়েছে। কেউ কেউ বদলিজনিত কারণে হয়েছে অভিবাসী, যারা মূলত সরকারী চাকরিজীবি ছিলেন। উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যেও একটি বড় অংশ অভিবাসী হয়েছে বলে মনে করি। কারিগরী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে এসে চট্টগ্রামেই থেকে গিয়েছেন, এমন সংখ্যাও আছে। আবার কেউ কেউ বিভিন্ন মিশনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করার উদ্দেশ্যেও চট্টগ্রামে এসেছেন। যে সময়টায় ব্যাপকহারে অভিবাসন ঘটেছে, তখন চট্টগ্রামে কর্মসংস্থানের সুযোগ এমনকি ঢাকার চাইতেও বেশী ছিল। এ'কারণে এই এলাকায় অনেক অভিবাসন হয়েছে। বর্তমান সময়ে অভিবাসন চট্টগ্রাম নয়, ঢাকামুখী।

জীবিকা নির্বাহ, শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, বৈবাহিক সূত্রে, পারিবারিক সমস্যা, সামাজিক নিরাপত্তা (চুরি, ডাকাতি)

২) পাদ্রীশিবপুর থেকে খ্রিস্টানরা অভিবাসী হওয়ায় কী কী সুফল ও কুফল দেখা যাচ্ছে?

সুফল: শিক্ষার হার বৃদ্ধি, আর্থিক উন্নতি, বৃহত্তর ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের সুযোগ, জীবন-যাত্রার উন্নতি, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, সুসম্পর্ক, সংলাপ, শিক্ষা অর্জন, সম্প্রীতি, নেতৃত্ব তৈরি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সুচিকিৎসা, পদমর্যাদা লাভ, সামাজিক উন্নয়ন, বৈবাহিক সুত্রে পরিবার গঠন।

কুফল: দেশে অনেক বাড়ি শূন্য পড়ে আছে, যৌথ পরিবার বিলুপ্তি, আত্মীয়তার বন্ধন শিথিল, নতুন প্রজন্ম সমৃদ্ধ, ঐতিহ্য সম্পর্কে জানে না, যাতায়ত না থাকায় অনেকে বাড়িতে কৃষি জমি হারাচ্ছে, গ্রামীণ আন্তরিকতা হ্রাস, দেশের বাড়ীতে আনাগোনা কম, পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন, ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে, গ্রামের জমি/সম্পত্তি হারাচ্ছে, গ্রামীণ আন্তরিকতা শহরে নেই, গ্রামের বাড়িতে যাওয়া আসা কমে যাচ্ছে, যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবার, শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া, ভাষাগত বৈষম্য, সহানুভূতির অভাব, বর্তমান ঠিকানায়/স্থানে নিজস্ব স্থায়ী বাসস্থান তৈরি করতে না পাড়া, ভিন্ন ধর্মের সাথে সম্পর্ক (মিশ্র-বিবাহ), স্বার্থপরতা বৃদ্ধি বা একতার অভাব, মাদকাসক্তি (মাদকের সহজলভ্যতা)।

৩) নিজস্ব এলাকায় অভিবাসীদের মধ্যে কী কী সংগঠন রয়েছে? তা কী? এবং তাদের কাজ কী কী?

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে 'পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টিয় সমাজ সংঘ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শুরুতে সংগঠনটি খুবই সক্রিয় ছিল। কিন্তু বর্তমানে এর কার্যক্রম নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে ৫-৬ বছর যাবত। এই সংগঠনটি সক্রিয় থাকাকালে পাদ্রীশিবপুর পরিবারের তালিকা প্রণয়ন ও তাদের সাথে যোগাযোগ, বড়দিনের কীর্তন, ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি পালন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রামুর পালা, নাটক মঞ্চায়ন, বার্ষিক পুনর্মিলন অনুষ্ঠান, ইত্যাদি নিয়মিত আয়োজন করতো।

দেশান্তরকাঠি খ্রিষ্টীয় সমাজ সংঘ আছে। এই সংঘটির কার্যক্রম হচ্ছে: যোগাযোগ স্থাপন, সাংস্কৃতিক চর্চা, শিক্ষায় সহযোগিতা, দরিদ্রদের আর্থিক সহযোগিতা।

বিভিন্ন সমবায় সমিতি (পাড়া ভিত্তিক–পাদ্রীশিবপুরের সদস্য দ্বারা)। কাজসমূহে হচ্ছে: সমাজ সেবা, একত্রিত হওয়া, যোগাযোগ রক্ষা।

৪) পাদ্রীশিবপুরের ভবিষ্যৎ-উন্নয়নের জন্য অভিবাসীদের ভাবনা কী? অভিবাসীদের কী করণীয় আছে?

শুনি যে স্থানীয় খ্রিস্টভক্তরা জায়গা সম্পত্তি নিয়ে পরস্পরের সাথে মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ছে। আদালতে না গিয়ে স্থানীয়রা যদি বিষয়গুলো স্থানীয় ন্যায় ও শান্তি কমিটির মাধ্যমে সমাধান করে, খুব ভাল হয়। নয়তো সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য হারিয়ে যাবে যা আমাদের সমাজের একটি অলঙ্কার ছিল।

অভিবাসীদের করণীয়: কেউ যখন জমি বিক্রি করে, তারা যদি একটু আর্থিক ক্ষতি হলেও খ্রিস্টানদের কাছে বিক্রি করে তাহলে আমাদের সমাজের মাঝে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রবেশটা বন্ধ হবে। কোন ধরনের বিরোধ উদ্ভূত হলে স্থানীয়ভাবে মীমাংসার চেষ্টা করা।

জমিজমা নিয়ে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন করা, পারিবারিক সম্পর্ক রক্ষা করার ব্যবস্থা করা, জমিজমা বিক্রির ক্ষেত্রে খ্রিস্টীয় সমাজে বিক্রির চেষ্টা করা, সম্ভব হলে বিক্রি না করা, বাড়ীতে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা, শিক্ষা, নিরাপত্তা, যোগাযোগ বৃদ্ধি, দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করা, একতা বজায় রাখা ও পারিবারিক বন্ধন বৃদ্ধি করা, সমস্যাপূর্ণ পরিবারে আর্থিক সাহায্য দান করা, ধর্মপল্লীর সাথে সংযুক্ত থেকে মাণ্ডলিক কাজে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, সংগঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তি।

৫) যারা অভিবাসী হয়ে চলে গেছে তারা কী পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের সাথে এবং পাদ্রীশিবপুরে অবস্থানরত পরিবারের সাথে সম্পর্ক রাখে? কীভাবে রাখে?

যাদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা পাদ্রীশিবপুরে তারা অভিবাসী হলেও মূল হতে ছিন্ন হয়নি, নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। আত্মীয়-স্বজনদের খবর নেয়া, তাদের বিপদে-আপদে সাহায্য করা এবং উৎসব পার্বনে স্বপরিবারে পাদ্রীশিবপুরে উপস্থিতির মাধ্যমে তারা এই যোগাযোগটা রাখছে।

ধর্মীয় পর্ব বাড়িতে পালন করা, সুখে দু:খে বাড়িতে পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখা, যাদের বাড়িঘর নেই তাদের যোগাযোগ খুবই কম, যোগাযোগ আছে কিন্তু আশানুরূপ না, ব্যক্তিগত ও পারিবারিকভাবে, ধর্মপল্লীর কর্তৃপক্ষের সাথে, অভিবাসীগণ পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ ও পরিবারের সাথে সম্পর্ক রাখছে: বিভিন্ন অনুষ্ঠান বড়দিন, ইস্টারে ও প্যারিশের বিভিন্ন পর্বে যোগদান করা।

৬) অভিবাসী সন্তানেরা যারা পাদ্রীশিবপুরে জন্মগ্রহণ করেনি, তারা পাদ্রীশিবপুরের সাথে কোন যোগাযোগ রাখে, কীভাবে?

যাদের বাবা-মা বেঁচে আছে, বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজন বেঁচে আছে ও তাদের সাথে সম্পর্ক রাখে, দেশে ঘরবাড়ী আছে তারা যোগাযোগটা কম হলেও রাখছে। কিন্তু যাদের বাবা-মা বেঁচে নেই, দেশে ঘরবাড়ী নেই, নিকটাত্মীয় বেঁচে নেই বা পরিচয় নেই– তারা পাদ্রীশিবপুরের সাথে যোগাযোগ রাখার ব্যাপারে তেমন কোন আগ্রহ অনুভব করে না। পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন ও বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখছে নানা ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠনের মাধ্যমে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে খুবই কম, যোগাযোগ করার মানুষ নেই, সাধারণত রাখে না।

বিষয় নং- ০৬: শিক্ষা বিষয়ক তথ্য

১) নিজস্ব এলাকায় (ঢাকা, চট্টগ্রাম, অন্যত্র অবস্থানরত) পাদ্রীশিবপুর অভিবাসীদের মধ্যে শিক্ষিতদের সংখ্যা।

পিএইচডি: ড. মনিকা গোমেজ (এই মুহূর্তে কানাডায় অবস্থানরত); পি.এইচ ডি.: আরও একজন;
বিসিএস পাশ: প্রফেসর সুইটি গোমেজ।
মাস্টার্স ও গ্রাজুয়েট: বর্তমানে যথেষ্ট আছে কিন্তু সঠিক পরিসংখ্যান জানা নেই।
সরকারী চাকুরিরত: সরকারি নার্স আছেন বেশ কয়েকজন কিন্তু পরিসংখ্যান নেই।
ডিগ্রী ব্যতীত বিশেষ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও স্বনামধন্য ব্যক্তি: কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী, জেনারেল ও মেরিন টেকনিশিয়ান।

২) পাদ্রীশিবপুর থেকে বিশেষ অবদানকারী মৃত ব্যক্তিরা কারা? প্রত্যেকের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে একটি পরিচিতি লিখিতভাবে রক্ষা করা প্রয়োজন।

নামের তালিকা: ডি.আই.ভি. ভিনসেন্ট গোমেজ, বানার্ড ডি'রোজারিও, পিটার পল গোমেজ, ক্যাপ্টেন লেনার্ড গোমেজ, জেরেল্ড গোমেজ, ক্যামেলিয়াস বেনু গোমেজ, উইলসন গোমেজ, ডরোথি মার্টিন, জাস্টিন ডি' কস্তা, মার্ক নেলসন, জেরম গোমেজ, কেমেলিয়া গোমেজ, ডরোথি মার্টিন, এন্ড্রু গোমেজ (অরুন)। তথ্য প্রদান করবে: মি. জুলিয়ান গোমেজ ও মি. মানিক উইলভার ডি'কস্তা

॥ গ ॥ আলোচনা সভা ও অংশগ্রহণকারীগণ

তথ্য সংগ্রহের জন্য চট্টগ্রাম আর্চবিশপ ভবনে, ১ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে একবেলা একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনায় পালপুরোহিত এবং সহকারী পালপুরোহিতসহ উপস্থিত ছিলেন: রেভা: ফাদার রিগান ডি' কস্তা (পালপুরোহিত), মি: মোজেস শ্যামল গোমেজ, মি: এমরোজ গোমেজ, মি: সিপ্রিয়ান ডি' কস্তা, মিস ছিন্থিয়া ডি' রোজারিও, মি: এলেন কবী গোমেজ, মি: এন্ড্রু গোমেজ, মি: জুলিয়ান গোমেজ, মি: মানিক উইলভার ডি' কস্তা, মি: লিংকন গোমেজ, মি: বেঞ্জামিন গোমেজ, মি: ডানিয়েল ছিপু গোমেজ, মি: লিটন গোমেজ, মি: মার্টিন গোমেজ, মি: রঞ্জন গোমেজ, মি: এলেন রোজারিও, মি: ফেড্রিক গোমেজ, মি: ভিক্টর নান্টু কাম্পু, মি: এডোয়ার্ড অরুন কাম্পু, মি: ফ্রাঙ্কলিন গোমেজ, মি: ফ্লেবিয়ান ডি' কস্তা, মিসেস আন্না মিনু গোমেজ, মিসেস সাথী গোমেজ, মিসেস তেরেজা সরকার, মি: এন্ড্রু আন্দ্রিয় গোমেজ।

দায়িত্বে ছিলেন: মি: মোজেস শ্যামল গোমেজ ও মি: এমরোজ গোমেজ

আয়োজনে ও পরিচালনায় উপস্থিত ছিলেন: গ্রন্থ-সম্পাদনা কমিটি: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি (পরিচালক), যোসেফ ডি'রোজারিও (সেক্রেটারি), জেমস গোমেজ, যোয়ান্না ডি'রোজারিও, শ্যামল লরেন্স গোমেজ এবং বানার্ড পংকজ ডি'রোজারিও।

চতুর্থ অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুরবাসী – ঢাকাতে অভিবাসী

॥ ক ॥ পাদ্রীশিবপুরবাসী: ঢাকস্থ অভিবাসীদের পরিসংখ্যান

ঢাকস্থ অভিবাসীদের পরিসংখ্যান তালিকা - ১

১	২	৩	৪	৫	৮	৭	৯	১০
ক্রম নং	অভিবাসী পরিবারের নাম (পাদ্রীশিবপুর থেকে অভিবাসন করেছে সেই পরিবার-প্রধানের নাম।	অভিবাসী পরিবারের মোট সংখ্যা মাত্র	ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৭-এর পূর্বে	পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-১৯৭১);	বাংলাদেশ আমলে (১৯৭১-	বর্তমানে অভিবাসীদের মোট সংখ্যা	যারা অন্যত্র চলে গেছে	মন্তব্য
১	মনেট মতি গোমেজ	৪				৪		
২	লিংকন নয়ন গোমেজ	৩				৩		
৩	আলেক্সজান্ডার মিন্টু ডি'কস্তা	৪				৪		
৪	এনসলি গোমেজ	৩						
৫	নরবার্ট গোমেজ	৬				৬		
৬	টিটু গোমেজ	৪				৪		
৭	মিতা গোমেজ	৩				৩		
৮	রেমণ্ড বরুন গোমেজ	৬				৬		
৯	শিমন তরুন গোমেজ	৪				৪		
১০	মাইকেল রনি গোমেজ	৫				৫		
১১	নমিতা অধিকারী	৩				৩		
১২	রমেশ গোমেজ	৭				৭		
১৩	শংকর গোমেজ	৫				৫		
১৪	স্বপন ক্রাস্পু	৪				৪		
১৫	বল্টু গোমেজ	৫				৫		
১৬	শিমন ডি'রোজারিও	৪				৪		
১৭	ম্যাক্সওয়েল গোমেজ	২				২		
১৮	বাপ্পি গোমেজ	৪				৪		
১৯	জন খোকন গোমেজ	৪				৪		
২০	তুষার গোমেজ	৩				৩		
২১	ডেভিড বাবু গোমেজ	৪				৪		
২২	রকি গোমেজ	৪				৪		
২৩	ক্লিটন গোমেজ	২				৩		
২৪	তরুন গোমেজ	৪				৪		
২৫	রঞ্জীত গোমেজ	৪				৪		
২৬	রাফায়েল গোমেজ	৩				৩		
২৭	আন্দ্রীয় ডি'রোজারিও	১				১		
২৮	রিপন গোমেজ	১				৫		
২৯	জেরম গোমেজ	২						
৩০	সুমন গোমেজ	১				১		
৩১	অনিক গোমেজ	১				১		
৩২	পারুল গোমেজ	৪				৪		
৩৩	রিপন গোমেজ	৫				৫		
৩৪	শোভা গোমেজ	৩				৩		
৩৫	জনি গোমেজ	৪				৪		
৩৬	রানা গোমেজ	৪				৪		
৩৭	রনি গোমেজ	৩						

৩৮	রাফায়েল গোমেজ	৮				৮		
৩৯	শিউলি গোমেজ	৪				৪		
৪০	পাট্রিক গোমেজ	৪				৪		
৪১	ডেমার্স রোজারিও	৩				৩		
৪২	জনি ডি'রোজারিও	৩				৩		
৪৩	মাথিয়াস গোমেজ	১				১		
৪৪	লিটন গোমেজ	৩				৩		
৪৫	লিংকন গোমেজ	৩				৩		
৪৬	বার্টিন গোমেজ	২				২		
৪৭	প্রদীপ গোমেজ	৪				৪		
৪৮	জর্জ ওয়াশিংটন মধু	৫				৫		
৪৯	লক্ষী গোমেজ	৩				৩		
৫০	জনি গোমেজ	৩				৩		
৫১	ডেভিড বাবু গোমেজ	৪				৪		
৫২	লিংকন গোমেজ	৫				৫		
৫৩	ব্যাঙ্কি গোমেজ	১				১		
৫৪	সমীর	১				১		
৫৫	শিল্পী গোমেজ	১				১		
৫৬	সমীর	৬				৬		
৫৭	শোভা	৫				৫		
৫৮	মিঠু	৪				৪		
৫৯	জন স্বপন গোমেজ	৫				৫		
৬০	জর্জ ক্যামেরুন গোমেজ	৩				৩		
৬১	লিটন গোমেজজন	৪				৪		
৬২	রতন গোমেজ	৩				৩		
৬৩	পিটু গোমেজ	৪				৪		
৬৪	রবি ডি'কস্তা	৪				৪		
৬৫	ব্রাইন গোমেজ	৪				৪		
৬৬	জন গোমেজ	৪				৪		
৬৭	রনি গোমেজ	২				২		
৬৮	লিউনী গোমেজ	৩				৩		
৬৯	বার্নাডেট গোমেজ	৯				৯		
৭০	কিংসলী গোমেজ	৩				৩		
৭১	এড্রিয়ান গোমেজ	৩				৩		
৭২	নেলী গোমেজ	৩				৩		
৭৩	কমল ডি'রোজারিও	৫				৫		
৭৪	শ্যামল ডি'রোজারিও	৪				৪		
৭৫	সুমন ডি'রোজারিও	৩				৩		
৭৬	ব্যানেল গোমেজ	৩				৩		
৭৭	চম্পা ডি'রোজারিও–শিল্পী+সুমী	৫				৫		
৭৮	পিটু পিটার গোমেজ	১				১		
৭৯	আলফ্রেড দিপু গোমেজ	১				১		
৮০	প্রণতি গোমেজ	৪				৪		
৮১	শিল্পী গোমেজ	৪				৪		
৮২	শিলা গোমেজ	৫				৫		
৮৩	রেমন্ড ডি'রোজারিও	৩				৩		
৮৪	প্রদীপ ডি'কস্তা	৪				৪		
৮৫	রঞ্জিত ডি'কস্তা	৪				৪		
৮৬	ফিলোমিনা গোমেজ	৯				৯		
৮৭	রেখা গোমেজ	১০				১০		
৮৮	জুয়েল ডি'রোজারিও	৬				৬		
৮৯	অনুপ ডি'কস্তা	৮				৫		কানাডা-৩
৯০	শোভা ভায়োস	৭				৭		

৯১	দীপ্তি ডি'রোজারিও	৪				৪		
৯২	সবিতা গোমেজ	২				২		
৯৩	টিপু ডি'রোজারিও	৫				৫		
৯৪	অ্যানি গোমেজ	৫				৫		
৯৫	জন সানু গোমেজ	৪				৪		
৯৬	হেনরি গোমেজ	২				২		
৯৭	রতন গোমেজ	৬				৬		
৯৮	যোসেফ অলিভার গোমেজ	৯				৫		অষ্ট্রে-৩; আমে-১
৯৯	শম্পা গোমেজ	৬				৬		
১০০	পাপিয়া গোমেজ	৫				৫		
১০০	মোট	৩৯৮				৩৯৮	৫১ Estd.	

ঢাকস্থ অভিবাসীদের পরিসংখ্যান তালিকা - ২

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ক্রম নং	অভিবাসী পরিবারের নাম (পাদ্রীশিবপুর থেকে অভিবাসন করেছে সেই পরিবার-প্রধানের নাম।	অভিবাসী পরিবারের মোট সংখ্যা মাত্র	পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-১৯৭১);	বাংলাদেশ আমলে (১৯৭১-অদ্যাবধি)	বর্তমানে অভিবাসীদের মোট সংখ্যা (কলাম: ২+৩)	যারা অন্যত্র চলে গেছে সেই স্থানের নাম উল্লেখ	মন্তব্য
১	অব্রাহাম গোমেজ	৬			৬		
২	ডানিয়েল ডি'রোজারিও	৫			৫		
৩	স্বপন গোমেজ	৪			৪		
৪	আখিলা ডি'রোজারিও	৪			২	অষ্ট্রেলিয়া -২	
৫	পঙ্কজ ডি'রোজারিও	৪			২	কানাডা-২	
৬	শ্যামল গোমেজ	৪			৪		
৭	তপন পল গোমেজ	৪			২	কানাডা-২	
৮	প্রদীপ গোমেজ	৪			০	আমেরিকা -৪	
৯	ফিলিপ ডি'কস্তা	৪			৪	কানাডা -১	
১০	জেসিকা মৌ গোমেজ/প্রান্ত	২			১	দুবাই -১	
১১	স্বপন গোমেজ	৮			৪	কানাডা-৪	
১২	শ্যামলী গোমেজ	১			১		
১৩	জন শুভ গোমেজ	২			২		
১৪	জেমস গোমেজ	৫			৫		
১৫	অরুন প্রাসিড গোমেজ	৪			৩	আমেরিকা-১	
১৬	লিংকন গোমেজ	৪			৪		
১৭	গ্লোরিয়া লিপি গোমেজ	৩			৩		
১৮	তেরেজা লিপি গোমেজ	১			১		
১৯	মুক্তা গোমেজ	৩			৩		
২০	সাইমন রবার্ট গোমেজ	৪			৪		
২১	মিলি অ্যালুইসিয়াস	৩			৩		
২২	প্রিছিল্লা গোমেজ	১			১		
২৩	সুমি ডি'কস্তা	৪			৪		
২৪	প্রেসলী গোমেজ	২			২		
২৫	রাজু গোমেজ	২			২		
২৬	রীনা গোমেজ	১			১		
২৭	নিলিমা ডি'সিলভা	৩			২	লন্ডন - ২	

২৮	জেরী বেসিল গোমেজ	৮			০	আমেরিকা -৮	
২৯	প্রীতি গোমেজ (নোয়াখালি)	৯			৭	আমেরিকা - ২	
৩০	সীমা গোমেজ	৫			৫		
৩১	মিঠু ডি'রোজারিও	৩			৩		
৩২	সানি ডি'রোজারিও	৭			৭		
৩৩	পিটার পি. গোমেজ	২			২		
৩৪	রনি ডি'রোজারিও	৪			৪		
৩৫	প্রজ্ঞা ডি'রোজারিও	২			২		
৩৬	অর্ক ডি'কস্তা	১			১		
৩৭	সিন্টু ডি'রোজারিও	৩			২	জার্মানি -১	
৩৮	এঞ্জেলিনা গোমেজ	১			১		
৩৯	স্বপন গোমেজ	৫			৪	ভারত - ১	
৪০	জাসিন্তা গোমেজ	৪			৪		
৪১	জন রিকি গোমেজ	৪			২	কানাডা - ২	
৪২	গোলাপী ডি'কস্তা	৪			৪		
৪৩	বারবারা ফ্রেজার	৯			৯		
৪৪	সীমা গোমেজ	৪			৪		
৪৫	আলবিন গোমেজ	৪			৪		
৪৬	রিচার্ড গোমেজ	৪			৪		
৪৭	মার্টিন গোমেজ	১			১		
৪৮	রুবেন ই. গোমেজ	১			১		
৪৯	রিকো ডি'রোজারিও	২			২		
৫০	জেকী গোমেজ	৩			৩		
৫১	প্রেম গোমেজ	৩			৩		
৫২	অপি গোমেজ	৪			৪		
৫৩	লিপি গোমেজ	৪			৪		
৫৪	জুয়েল গোমেজ	৪			৪	ফাওকাল	
৫৫	পিটার ডি'রোজারিও	৩			৩		
৫৬	শিল্পী গোমেজ	৫			৫		
৫৭	রিচার্ড কৈলু	১			১		
৫৮	জুলিয়াস কস্টু গোমেজ	৪			৪		
৫৯	লিন্টু গোমেজ	৪			৪		
৬০	পিন্টু গোমেজ	৩			৩		
৬১	মারীয়া গোমেজ	৪			৪		
৬২	সিলভেস্টার গোমেজ	৬			৪	কানাডা -২	
৬৩	আঞ্জেলিনা গোমেজ	১৭			৯	আমেরিকা - ৮	
৬৪	রতন গোমেজ	৪			৪		
৬৫	স্বপন গোমেজ	৪			৪		
৬৬	ডলি গোমেজ	১৩			১৩		
৬৭	জর্জ বিল ডি'কস্তা	৫			৫		
৬৮	ভৌমিক গোমেজ	১			১		
৬৯	সিন্থিয়া গোমেজ	৩			৩		
৭০	হ্যামেল কাস্পু	৪			৪		
৭১	লিয়ার্ড গোমেজ	৫			৫		
৭২	লুসী কৈলু	৫			৪	কানাডা -১	
৭৩	হেলেনা কৈলু	৪			৪		
৭৪	মমতা কৈলু	৯			৬	অষ্ট্রেলিয়া - ৩	

৭৪	মমতা কৈলু	৯			৬	অষ্ট্রেলিয়া - ৩	
৭৫	জেমস গোমেজ	৩			৩		
৭৬	জুয়েল ডি'রোজারিও	৩			৩		
৭৭	শ্যামলী গোমেজ	২			২		
৭৮	সিলভিয়া গোমেজ	৬			৬		
৭৯	অসীম গোমেজ	৯			৫	আমেরিকা - ৪	
৮০	অসীম অধিকারী	৪			৪		
৮১	সুশান্ত অধিকারী	৪			৪		
৮২	ফাল্গুনী গোমেজ	৩			২	কানাডা -১	
৮৩	সজল গোমেজ	২			২		
৮৪	অলকা ডি'রোজারিও	৪			৪		
৮৫	বিমল গোমেজ ?	৫			২	কানাডা-১ ডেনমার্ক -২	
৮৬	মনি গোমেজ	৫			১	কানাডা - ৪	
৮৭	রবিন গোমেজ	২			২		
৮৮	ডেভিড দীপু গোমেজ	৬			৫	কানাডা - ১	
৮৯	জসিন্তা ডি'রোজারিও	৮			৮		
৯০	সুষমা গোমেজ	৫			৫		
৯১	লিপি গোমেজ	৩			৩		
৯২	বার্টিন গোমেজ	৩			৩		
৯৩	রুমা গোমেজ	৩			৩		
৯৪	সন্টু ডি'রোজারিও	৬			৬		
৯৫	প্রভাতি গোমেজ	৩			৩		
৯৬	বাবুল ডি'কস্তা	৫			৫		
৯৭	বুলবুল গোমেজ	৪			৪		
৯৮	ছিছিয়া/রিংকু সরকার	১৪			৪	আমেরিকা ৬ কানাডা-৪	
৯৯	হেভেন গোমেজ	৩			৩		
১০০	মারীয়া গোমেজ	৪			৪		
	মোট	৪২০			৩৫০	৭০	

ঢাকস্থ অভিবাসীদের পরিসংখ্যান তালিকা - ৩

১	২	৩	৫	৮	৭	৯	১০
ক্র ম নং	অভিবাসী পরিবারের নাম (পাদ্রীশিবপুর থেকে অভিবাসন করেছে সেই পরিবার-প্রধানের নাম।	অভিবাসী পরিবারের মোট সংখ্যা মাত্র	পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-১৯৭১);	বাংলাদেশ আমলে (১৯৭১-	বর্তমানে অভিবাসীদের মোট সংখ্যা	যারা অন্যত্র চলে গেছে সেই স্থানের নাম উল্লেখ	মন্তব্য
১	রমিও পলাশ গোমেজ	২			৩		
২	রকি গোমেজ	৩			৪		
৩	চার্লস পলাশ গোমেজ	২			৩		
৪	জুলিয়েট বাসন্তী গোমেজ	৩			৪		
৫	জন লিও গোমেজ	৩			৪		
৬	মনিকা ডি'রোজারিও	৩			৪		
৭	রত্না গোমেজ	৪			৫		
৮	রানী গোমেজ	২			৪		
৯	সুশান্ত গোমেজ	২			৩		
১০	মাইকেল ডি'রোজারিও	৫			৫		
১১	লুই ডি'রোজারিও	৩			৪		
১২	জেভিয়ার গোমেজ	১			৫		
১৩	আনাস্তাসিয়া গোমেজ	৪			৫		
১৪	পিন্টু গোমেজ	৩			৪		
১৫	আশীষ গোমেজ	৩			৪		
১৬	জন ডিউ ডি'কস্তা	৪			৫		
১৭	জন পল ডি'রোজারিও	২			৩		
১৮	লিনুস গোমেজ	৪			২	কানাডা-২	
১৯	নভেল গোমেজ	৭			৮		
২০	পল পিন্টু গোমেজ	৩			৫		
২১	আলবার্ট প্রশান্ত গোমেজ	৪			২	অষ্ট্রে ১ কানা -২	
২২	ফিলিপ গোমেজ	২			২	কানা -১	
২৩	দিপালী রড্রিক্স	৪			৫		
২৪	দীপক ডি'রোজারিও	৩			২	আমে-১কানা -১	
২৫	যোসেফ ডি'রোজারিও	৪			২	অষ্ট্রেলিয়া-২	
২৬	মিকি ডি'কস্তা	৩			৪		
২৭	অঞ্জন বাড়ৈ	১			২		
২৮	জর্জ মিঠু গোমেজ	৩			৪		
২৯	উত্তম গোমেজ	১			১		
৩০	মার্ক মিঠু গোমেজ	১			১		
৩১	সবিতা ডি'রোজারিও	২			৪		
৩২	ঝুলি ডি'রোজারিও	১			৪		
৩৩	লিয়া গোমেজ	২			৩		
৩৪	তপতী গোমেজ	২			৩		
৩৫	গাব্রিয়েল গোমেজ	২			৩		
৩৬	খোকন গোমেজ	৩			৪		
৩৭	ক্লাইভ গোমেজ	৩			৪		
৩৮	যোসেফ স্বপন গোমেজ	১			২		
৩৯	স্টিফেন পঙ্কজ গোমেজ	১			১		
৪০	উইলিয়াম ব্রাইন ডি'রোজারিও	৩			৪	জাপান -১	
৪১	তেরেজা রুমি ডি'রোজারিও	২			৩		
৪২	এরিক ডি'কস্তা	৬			৫	কানাডা - ২	

৪৩	সুমন যাকোব গোমেজ	৩			৪		
৪৪	ভিক্টোরিয়া গোমেজ	৩			৫	কানাডা -১	
৪৫	পিন্টু ডি'রোজারিও	২			৩		
৪৬	শেলী সরকার	২			৩		
৪৭	বেসিল গোমেজ	৫			৬		
৪৮	দিলিপ ডি'কস্তা	৩			৭		
৪৯	গেটা ডি'রোজারিও	২			৪		
৫০	লিনা ডি'কস্তা	২			৬		
৫১	লেনিন গোমেজ	৩			৪		
৫২	উইলবার্ট দিপু গোমেজ	২			৪	ডেনমার্ক-১	
৫৩	দিলিপ গোমেজ	৩			৪		
৫৪	নোরা গোমেজ	২			৩		
৫৫	শিল্পী গোমেজ	৪			৫		
৫৬	নিলিমা এলোইসিয়াস গোমেজ	৭			৮		
৫৭	আলবিন গোমেজ	১২			৬	আমেরিকা-৬	
৫৮	বার্নাডেট গোমেজ	২			২		
৫৯	জনি গোমেজ	৪			৪		
৬০	ডেভিড বাবু এলইসিয়াস	৪			৪		
৬১	চন্দনা গোমেজ	৮			৮		
৬২	অপু গোমেজ	৫			৫		
৬৩	বাল্টি শিকদার	৮			৮		
৬৪	থোকন ডি'রোজারিও	৬			৬		
৬৫	বাবুল গোমেজ	৫			৩	অষ্ট্রেলিয়া -২	
৬৬	পলি ডি'রোজারিও	৮			৮		
৬৭	দিবা গোমেজ	৪			৪		
৬৮	ইভা গোমেজ	৩			৩		
৬৯	বাসন্তী গোমেজ (হারবাইত)	৫			৫		
৭০	প্রিন্স গোমেজ	১			১		
৭১	স্বপন গোমেজ	১১			৬	আমেরিকা ৫	
৭২	মাইকেল গোমেজ	৩			৩		
৭৩	লিলি গোমেজ	৩			৩		
৭৪	মুন্নি গোমেজ	৭			৭		
৭৫	মুন্নি গোমেজ ?	৬			৬		
৭৬	জার্মান তরুন গোমেজ	৪			০	কাতার - ৪	
৭৭	দীলিপ ডি'রোজারিও	৪			৪		
৭৮	তপন গোমেজ	১			১		
৭৯	রানা গোমেজ	৪			৪		
৮০	জনি গোমেজ	৩			৩		
৮১	তেরেজা গোমেজ	৭			৭		
৮২	আলবার্ট গোমেজ	২			২		
৮৩	মার্ক মিঠু ডি'কস্তা	১			১		
৮৪	কেয়া গোমেজ	৩			৩		
৮৫	টানিস গোমেজ	১			১		
৮৬	প্রদীপ গোমেজ	৪			৪		
৮৭	সুব্রত রোজারিও-এর স্ত্রী	২			২		
৮৮	জয়ন্তী গোমেজ	৪			৪		
৮৯	সেবাস্তিয়ান কিরীটি গোমেজ	৫			৫		
৯০	শ্রাবনী ডি'কস্তা	২			২		

৯১	ফিডালীস গোমেজ	৯			৯		
৯২	শোভন গোমেজ	৬			৬		
৯৩	রমেশ গোমেজ	৪			৪		
৯৪	চন্দ্রা গোমেজ	৬			৬		
৯৫	নীলিমা গোমেজ	২			২		
৯৬	গিলবার্টের ছেলে	৩			৩		
৯৭	ভানুর ছেলে (সন্ধ্য)	২			২		
৯৮	সমীর ডি'রোজারিও	৫			৫		
৯৯	শ্যামল ডি'রোজারিও	১			১		
১০০	বিউটি ডি'রোজারিও	১			১		
১০০	মোট	৩৪৭			৩১৫	৩২	

ঢাকস্থ অভিবাসীদের পরিসংখ্যান তালিকা - ৪

১	২	৩	৫	৮	৭	৯	১০
ক্রম নং	অভিবাসী পরিবারের নাম (পাদ্রীশিবপুর থেকে অভিবাসন করেছে সেই পরিবার-প্রধানের নাম	অভিবাসী পরিবারের মোট সংখ্যা মাত্র	পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-১৯৭১);	বাংলাদেশ আমলে (১৯৭১-	বর্তমানে অভিবাসী দের মোট সংখ্যা	যারা অন্যত্র চলে গেছে	মন্তব্য
১	ভানু গোমেজ	৭			৭		
২	রুপার্ট গোমেজ	৭			৭		
৩	গ্রাঞ্জ গোমেজ	২			২		
৪	ভেনসেল গোমেজ	৩			৩		
৫	এলিন গোমেজ	৮			৮		
৬	ফার্নান্ডো নেলসন	৯			৯		
৭	কিরণ গোমেজ	৬			৬		
৮	রেবা গোমেজ	৫			৫		
৯	জিতা গোমেজ	৪			৪		
১০	প্রমিলা/তপন গোমেজ	৪			৪		
১১	কমল ডি'কস্তা	১			১		
১২	মিনতি গোমেজ	৫			৩	আমেরিকা -২	
১৩	বিউটি গোমেজ	৪			৪		
১৪	সীমা ডি'রোজারিও	২			৩		
১৫	থ্রিল্স ডি'রোজারিও	২			২		
১৬	মাথিয়াস গোমেজ	২			৪		
১৭	জেসিকা গোমেজ	৪			৪		
১৮	ডায়না গোমেজ	৪			৪		
১৯	রেমন্ড গোমেজ	৪			৪		
২০	রকি গোমেজ	৪			১		
২১	শুভ্র গোমেজ	১			২		
২২	স্টিফেন গোমেজ	২			১		
২৩	সি. জ্যাকলিন গোমেজ	১			১		
২৪	লিওনার্ড গোমেজ	৩			০	আমেরিকা-৩	
২৫	পপলিন গোমেজ	৪			০	আমেরিকা-৪	
২৬	সুইটি গোমেজ	৩			৩		

২৭	আমরোজ গোমেজ	৫			৫		
২৮	ওয়াল্টার গোমেজ	৫			৫		
২৯	আনাস্তাসিয়া গোমেজ	২			২		
৩০	ডেনিস গোমেজ	২			২		
৩১	রুমকি গোমেজ	২			২		
৩২	চুমকি গোমেজ	১			১		
৩৩	ফাদার রুবেন	১			১		
৩৪	রিংকুর মেয়ে	১			১		
৩৫	ডা. বিউটি গোমেজ	১			১		
৩৬	জুলিয়েট গোমেজ	৩			৩		
৩৭	মানিক গোমেজ	৪			৪		
৩৮	মেরী গোমেজ	৪			০	বগুড়া - ৪	
৩৯	লিনুস গোমেজ	৩			৩		
৪০	শিল্পী গোমেজ	৩			৩		
৪১	লিভা গোমেজ	৪			৪		
৪২	লিজা গোমেজ	৪			৪		
৪৩	লিসা গোমেজ	২			২		
৪৪	যতন্না গোমেজ	১			১		
৪৫	দ্বীপ গোমেজ	১			১		
৪৬	মিভিন ডি'রোজারিও	৫			৫		
৪৭	রবিন ডি'রোজারিও	৪			৪		
৪৮	রোমান ডি'রোজারিও	১			১		
৪৯	রানু ডি'রোজারিও	৩			৩		
৫০	মীরা ডি'রোজারিও	১৩			৪	কানাডা -৯	
৫১	লিজি ডি'রোজারিও	৪			৪		
৫৮২	লিপি ডি'রোজারিও	৪			৪		
৫৩	কেনেট ডি'রোজারিও	৩			৩		
৫৪	শুভ্র ডি'কস্তা	৩			৩		
৫৫	জনি গোমেজ	১			১		
৫৬	অন্তু গোমেজ	১			১		
৫৭	লাজারেস গোমেজ	১			১		
৫৮	সান্তা গোমেজ	২			২		
৫৯	লাকী গোমেজ	১			১		
৬০	সুস্তি গোমেজ	১			১		
৬১	শ্যামল গোমেজ	৪			২	কানাডা-২	
৬২	পিংকু গোমেজ	১			১		
৬৩	টিংকু গোমেজ	৪			৪		
৬৪	অভি গোমেজ	৩			০	নওগা -৩	
৬৫	রাজেন গোমেজ	৩			৩		
৬৬	বাপ্পী ডি'রোজারিও	১			১		
৬৭	মিন্টু গোমেজ	১			১		
৬৮	জেমস ফিলিপ গোমেজ	২			২		
৬৯	প্রদীপ গোমেজ	১			১		
৭০	লিনা গোমেজ	৩			৩		
৭১	ডলি গোমেজ	৬			৬		
৭২	দ্বীপ গোমেজ	১			১		
৭৩	মামনি গোমেজ	৭			৭		
৭৪	বাদল গোমেজ	২			২		

৭৫	বিউটি গোমেজ	৩			৩		
৭৬	হ্যাপী গোমেজ	৪			৪		
৭৭	মানিক গোমেজ	৪			০	গৌরনদী - ৪	
৭৮	অমল গোমেজ	২			২		
৭৯	শ্রেয়া ডি'রোজারিও	৩			৩		
৮০	রিপন গোমেজ	১			১		
৮১	রোজী গোমেজ গোমেজ	৪			৪		
৮১	মোট	২৫৯			২২৮	৩১	
৩৮১	সর্বমোট	১৫২৪			১২৪০	১৮৪	

তথ্য সংগ্রহ:

১) পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন

২) ঢাকস্থ পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ লরেন্স ক্রেডিট ইউনিয়ন

৩) পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান যুব সংঘ

৪) তথ্য সংগ্রহের কাজে আরও জড়িত ছিলেন: যোসেফ ডি'রোজারিও, শ্যামল এল. গোমেজ, রোজ গোলাপী গোমেজ, পঙ্কজ ডি'রোজারিও এবং আন্না রাণী ডি'রোজারিও। ক্যাথেরিন শ্রেয়া গোমেজ এবং মেরিলীন মীরা ডি'রেজারিও (১৭/০৭/২০২৪)

এই কমিটির সঙ্গে বিশেষ সহায়তায় আছেন: আন্না রাণী ডি'রোজারিও, রোজ গোলাপি গোমেজ, ক্যাথেরিন শ্রেয়া গোমেজ ও মেরিলীন মীরা ডি'রোজারিও।

॥ খ ॥ ঢাকাতে এফজিডি আলোচনার ফলাফল

বিষয় ০১: পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের পরিচিতি

১.১ পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের অতীত ও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য/পরিবর্তন হয়েছে? উত্তর হ্যাঁ হলে পরিবর্তনগুলো কি কি?

উত্তর: পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের লক্ষণীয় কিছু পরিবর্তন হয়েছে।

* মিশনভিত্তিক সমাজ বা মিশন নির্ভর সমাজ পরিবর্তিত হয়ে জনমুখী হয়েছে।
* জনগণ নিজ নিজ আয় দ্বারা জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করছে।
* যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে গ্রামের সাথে শহরের মানুষের প্রাত্যহিক যোগাযোগ বেড়েছে। বিশেষ করে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে।
* শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেড়েছে।
* স্কুলটি কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে।
* সংগঠন, সমবায়-সমিতি বৃদ্ধি পেয়েছে।
* ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক, শিক্ষা-ব্যবস্থা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও প্রযুক্তি, ঐতিহ্য প্রভৃতির পরিবর্তন হয়েছে।
* সংগঠনগুলো মিশনভিত্তিক ছিল; এখন সেটা সামাজিকভাবে তৈরি হয়েছে।

১.২ পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের জনগণের/বাসিন্দাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে? উত্তর হ্যাঁ হলে পরিবর্তনগুলো কি কি?

উত্তর: অর্থনেতিকভাবে আমাদের সমাজ বেশ উন্নত হয়েছে।

* বিশেষ করে কৃষি নির্ভরতা কমেছে এবং চাকরির প্রবণতা বেড়েছে। অনেকেই দেশ বিদেশে চাকরি করছে। ভাল চাকরীর সুযোগ সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে।
* কেবল চাকরি নয় বর্তমানে আমাদের ইউনিয়নের বেশ কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে যা কর্মসংস্থান করছে। ব্যবসায় সফলতা নিয়ে এসেছে।
* বর্তমানে বিদেশে চাকরির পাশাপাশি অনেকেই উচ্চ শিক্ষা নিচ্ছে। ফলে একদিকে উচ্চ শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে আবার সেই সাথে তাদের আয় পারিবারিক অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে।
* চাকরিজীবিদের সংখ্যা ও প্রবাসীদের সংখ্যা বেড়েছে।
* বাড়ি-ঘরের উন্নতি হয়েছে।

১.৩ পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের ধর্ম ও কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? বর্তমানে ধর্ম ও কৃষ্টিগত কোন পরিবর্তন হয়েছে? উত্তর হ্যাঁ হলে পরিবর্তনগুলো কি কি?

উত্তর: হ্যাঁ, পরিবর্তন হয়েছে।

* আমাদের ইউনিয়নে ধর্মের দিক বিবেচনায় তিনটি ধর্মের লোক আছে খ্রিস্টান, মুসলমান ও হিন্দু। ধর্মের ভিন্নতা থাকলেও সকলের মধ্যে মিলমিশ আছে।
* খ্রিস্টান ধর্মের কথা বিবেচনা করলে বলা যায় আগে বিদেশী ফাদারদের মিশা বিশেষ করে ল্যাটিন মিশা হতো কিন্তু বর্তমানে তা বাংলায় হচ্ছে।
* কৃষ্টিগত পরিবর্তনের মধ্যে আমাদের পোশাক আশাকে ও খাবার দাবারেও পরিবর্তন দেখা যায়। এখন পান্তাভাত আর মরিচপোড়া দিয়ে কেউ আর নাস্তা করে না।
* আগের গ্রামের গান, যাত্রাপালা, নাটক ইত্যাদি ছিল এখন নাই; বর্তমানে টেলিভিশন নির্ভরতা বেশী।
* নভেনা ও পবিত্র আত্মার রোজা, কুমারী মারীয়া ও সাধু আন্তনীর থান দেওয়া, প্রায়শ্চিত্তকালীন প্রার্থনা, ইত্যাদির প্রচলন ছিল।
* গ্রামে অন্য মণ্ডলী আসার সম্ভাবনা দেখা দিছে; খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ কমেছে, বাইবেল পাঠ হয় না।
* আগে পয়সাবার ছিল এখন সেখানে দিনের বেলায় ফিরানী হয়।
* আগে নবান্ন হত এখন সেটা করেই না।
* সাধু আন্তনীর তীর্থযাত্রীদের সংখা বেড়েছে।
* বিয়ে বাড়ীতে কলাপাতায় খাওয়া হত এখন প্লেটে খাওয়ানো হয়।
* আগে বড়দিনে দোদল পিঠা সব বাড়িতে হত এখন সব বাড়িতে হয় না।

১.৪ পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের বাসিন্দাদের অতীত ও বর্তমান পেশা কি পরিবর্তন হয়েছে? উত্তর হ্যাঁ হলে পরিবর্তনগুলো কি কি?

উত্তর: হ্যাঁ, পরিবর্তন দেখা যায়:

* পূর্বে ছিল কৃষিকাজ, বাবুর্চি কাজ করা। বর্তমানে প্রাইভেট চাকরি, ক্ষুদ্র ব্যবসা, নার্সিং পেশা।
* চাকরির জন্য মানুষ শহরমুখী তাই গ্রামে পুরুষ খুব কম; বিদেশে অনেকে চাকরি করছে।
* কিছু লোক ব্যবসা করছে; ছোট বড় ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বেড়েছে।

১.৫ পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের অতীত ও বর্তমান কৃষি ব্যবস্থা কি? কৃষিকাজের কোন পরিবর্তন হয়েছে? উত্তর হ্যাঁ হলে পরিবর্তনগুলো কি কি?

উত্তর: হ্যাঁ, পরিবর্তন হয়েছে:

* আগে লাঙ্গল জোয়াল দিয়ে চাষবাদ হত এখন নেই বললেই চলে। গরু দিয়ে চাষ চলে গেছে।
* যান্ত্রিকভাবে ট্রাক্টরের মাধ্যমে চাষ, ধান মাড়াই এবং জমিতে মই দেয়ার কাজ হচ্ছে।
* বর্তমানে বছরে তিনটি ফসল ছাড়াও রবি শস্য করা হয়, মৎস্য এবং পশু খামারের সংখ্যা বেড়েছে। বসতবাড়ির কৃষি কাজ কমে গেছে।
* বর্তমানে হাইব্রিড জাতের চাষ করা হয়।
* আগে গোবর সার বা সবুজ সার ব্যবহার করা হতো বর্তমানে রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয়।
* আগে আউশ ও আমন ধান, মুগডাল, কলাই, সরিষা ও মরিচ উৎপাদন করা হত, এখন খুব কম।

১.৬ পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের অতীত ও বর্তমান রাস্তাঘাট/যোগাযোগ ব্যবস্থার কি উন্নয়ন হয়েছে? উত্তর হ্যাঁ হলে উন্নয়নগুলো কি কি?

উত্তর: হ্যাঁ, পরিবর্তন হয়েছে:

* বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। বিশেষ করে রাস্তাঘাট পাকা হয়েছে।
* মানুষ আগে মাটির রাস্তায় পায়ে হেঁটে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেত, বর্তমানে রাস্তাঘাট পাকা ও প্রশস্ত হওয়ার কারণে বাস, রিক্সা বা ব্যাটারীর গাড়িতে যায়। আন্তঃর্জেলা যানবাহন হওয়ায় যাত্রায় সুবিধা হয়েছে।
* এখন ঢাকা থেকে বাড়ি পর্যন্ত বাসে করে চলে যাওয়া যায়। আগে লঞ্চ এবং নৌকাই ভরসা ছিল।
* অনেকে এখন ব্যক্তিগত যানবাহনেও শহর থেকে গ্রামে যায়।

বিষয় নং ২: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস

২.১ পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর খিস্টানদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনে অতীতের তুলনায় কোন পরিবর্তন দেখা যায়? উত্তর হ্যাঁ হলে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়?

উত্তর: হ্যাঁ, দেখা যায় যেমন:

* সন্ধ্যা প্রার্থনা আগে প্রতি ঘরে ঘরে হত এখন তুলনামূলকভাবে কম, অনেক সময় সন্ধ্যা-প্রার্থনা হয়-ই না।
* গির্জায় উপস্থিতি ও খ্রিস্টযাগে লোক সংখ্যা আগের তুলনায় কমে গেছে।
* বিবাহ বিচ্ছেদ বেড়েছে, বাড়িতে বাড়িতে মিশ্র-বিবাহ বেড়ে গেছে।

* মোবাইলের প্রতি আসক্ত হচ্ছে।
* একটা নতুন মণ্ডলী চালু হওয়ার পথে।

২.২ পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর কাঠামো কি? গ্রাম সমাজের পূর্ব ব্যবস্থা কী ছিল? এবং বর্তমান ব্যবস্থা কী?/ পরিবর্তনগুলো কি?

* তেমন কোনো পরিবর্তন নেই। তবে পাদ্রীশিবপুর থেকে মাটিভাঙ্গাকে পৃথক করে নতুন একটি ধর্মপল্লী হয়েছে।
* পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীকে ৮টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করে অনেক ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যক্রমকে ওয়ার্ড পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

২.৩ পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের সাথে অন্য ধর্মের মানুষের সম্পর্ক কেমন?

* সম্পর্ক মোটামোটি ভাল। ধর্মীয় উৎসব-পার্বনে পরস্পরের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়েছে।

২.৪ পাদ্রীশিবপুরের খ্রিস্টানদের আর্থিক অবস্থার কি উন্নতি হয়েছে? তাহলে কোন খাতে তা লক্ষ্য করা যায়?

* চাকরী, প্রাইভেট ব্যবসা, প্রবাসী চাকরির সংখ্যা বৃদ্ধি।
* চাকরি, প্রাইভেট ব্যবসা, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও প্রবাসী চাকরি থেকে আয় বেড়েছে।

২.৫. পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টানদের অতীত ও বর্তমান পেশাসমূহ কী কী? পেশাজীবনে কী কী পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়?

* অতীতে ছিল কৃষি ও বাবুর্চি ও চাকরি। বর্তমানে ব্যবসা, চাকরি, নার্সিং, কেটারিং, ইলেক্ট্রিক ডিপ্লোমা, মেকানিকাল ডিপ্লোমা, কম্পিউটার ট্রেনিং, ধর্মীয় পেশা।
* ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বেড়েছে।

বিষয় নং ৩: পাদ্রীশিবপুরের অতীত ও বর্তমান কৃষ্টি, ভাষা-সংস্কৃতি

৩.১ পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে কি কি অনুষ্ঠান/ উৎসব পালন করা হতো? বর্তমানে কি কি উৎসব পালন করা হয়?

* বড়দিনে ও ইস্টারে নাটক হতো
* কোন বিশপ বা ফাদারের আগমনে ও বিদায়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো
* পর্বে বা নতুন বছরে গীতি নকশা হতো
* ২৪ ডিসেম্বর কীর্তনগান হতো। সন্ধ্যাবেলা তেলবাতি দেয়ার পর পরই। এই সন্ধ্যায় প্রচুর বাজি ফুটানো হতো।
* বড়দিনে সবাই বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আত্মীয় স্বজনের বাড়ি বাড়ি যেতো আর্শীবাদ নিতে ও মজা করে পিঠা খেতে।
* পাদ্রীশিপুরে মিশনের পর্বদিনে অনেক আনন্দ হতো। বিশেষ করে ঘরে ঘরে ভালো খাবারের আয়োজন থাকতো।

* পাদ্রীশিবপুরে শেষ শুক্রবার মানে পুণ্য শুক্রবারে বাড়ি বাড়ি আল্লান রুটি খাওয়া ছিল বিশেষ আকর্ষণ।
* আগে পুণ্য শুক্রবারে সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত রামুরপালা গান হতো। এই গানে হিন্দুরাও কয়েকজন পাইলদার ছিলেন।
* ইসপিরিতু সান্তে রোজা এটা পাদ্রীশিবপুরের ঐতিহ্য হিসেবে যুগ যুগ ধরে পালিত হচ্ছে।
* আগে বড়দিনে, ইস্টার, রামুর পালা, নভেনা, পয়সাবার, ধারা শিন্নি, ফুলইজ্জা, বনভোজন, রাইত্তা শিন্নি হত।
* বর্তমানে বড়দিন, ইস্টার, রামুর পালা, সাধু আন্তনীর পর্ব পালন করা হয়।

৩.২. পাদ্রীশিবপুরের অভিবাসী হয়ে পাদ্রশিবপুরের কোন কোন অনুষ্ঠানে তারা সাধারণত যোগদান করে? এবং বছরে তাদের আনুমানিক সংখ্যা কত?

* পাদ্রীশিবপুরে সারা বছরই ঢাকার লোকজন আসা যাওয়া করে। তবে উল্লেখযোগ্য হারে বিভিন্ন বিবাহ অনুষ্ঠানে লোকজন বেশী যায়। আর বড়দিনে এবং ইস্টার, জুবিলী উপলক্ষে ঢাকা ও অন্যান্য শহর থেকে প্রায় ৪০০/৬০০ লোক যোগদান করে।

৩.৩. পাদ্রীশিবপুরের ইতিহাস, ভাষা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রাখার জন্য আমাদের করণীয় কি?

* পাদ্রীশিবপুরের ইতিহাস ভাষা ও সংস্কৃতি ধরে রাখার জন্য এখনও যারা প্রবীন আছেন তাদের ভূমিকা থাকতে হবে। নিজ নিজ সন্তানদের নিজেদের বংশ, চার্চের ইতিহাস, ভাষার ব্যবহার ইত্যাদি জানাতে হবে। আর একটা হতে পারে যে, নিজ নিজ ঘরে পাদ্রীশিবপুরের ভাষা, গান ইত্যাদি চর্চা করা।
* পাদ্রীশিবপুরের কিছু নিজস্ব অনুষ্ঠান আছে যেমন রেজবার, পয়সাবার ইত্যাদি – এই সমস্ত কিছুর সাথে বর্তমান প্রজন্মকে জানাতে হবে।
* চর্চা করা, সংলাপ করা, প্রশিক্ষণ দেওয়া, ম্যাগাজিন প্রকাশ
* প্রবাসী এবং স্থানীয়দের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে হবে।

বিষয় নং- ০৪: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের সেবা প্রতিষ্ঠানের অতীত ও বর্তমান

৪.১ পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে দরিদ্রদের জন্য কি কি সেবা ব্যবস্থা আছে?

* এস.ভি.পি, ওয়েলফেয়ার, যুবসংঘ, ফাদার লিও ট্রাস্ট, পাদ্রীশিবপুর ক্রেডিট ইউনিয়ন, কারিতাস, পল্লী গণ-উন্নয়ন, মাটিভাঙ্গা ওয়েলফেয়ার, মাটিভাঙ্গা সবুজ সংঘ, রাজবাড়িয়া যুব সংঘ।

৪.২. শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং প্যারিশের অন্যান্য সেবায় পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ একটি সেবাকেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা রাখে? উত্তর হ্যাঁ হলে কিভাবে?

* হ্যাঁ, ফাতেমা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ওয়েলফেয়ার, কারিতাস, পাদ্রীশিবপুর ক্রেডিট, যুব সংঘ, মাটিভাঙ্গা ওয়েলফেয়ার, মাটিভাঙ্গা সবুজ সংঘ, পল্লী গণ-উন্নয়ন কেন্দ্র, রাজাবাড়িয়া যুব-সংঘ;
* শিক্ষা সহায়তা, চিকিৎসা সহায়তা, কারিগরি সহায়তা, প্রভৃতি ক্ষেত্রে সেবা দিয়ে থাকে।

৪.৩. পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে, আমাদের স্থানীয় সমাজে, দেশে এবং খ্রিস্টমণ্ডলীতে কি কি অবদান রয়েছে বলে মনে হয়?

* সেন্ট আলফ্রেড স্কুল এন্ড কলেজ, দীপ্তি হোস্টেল, প্রতিবন্ধী আশ্রম, সেমিনারী, ফাতেমা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সেনা সংঘ, ব্রতধারী ও ব্রতধারিণী, ট্রেড স্কুল, প্যারিশ কমিটি, ইউনিয়ন সদস্য/মেম্বার।

বিষয় নং - ০৫: অভিবাসন বিষয়ে প্রশ্ন

৫.১. পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লী থেকে অনেকে অভিবাসী হয়ে (ভারত/চট্টগ্রাম/ঢাকা/খুলনা/দেশের মধ্যে অন্যত্র/প্রবাসে) স্থানান্তরিত/দেশান্তরিত হয়েছেন। কী কারণে?

* জীবন-জীবিকার তাগিদে, উচ্চ শিক্ষা, সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, শহরের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার জন্য, বিদেশের সুযোগ সুবিধা ও উন্নত জীবনের আশায় অভিবাসী হয়েছে।
* পাদ্রীশিবপুরে বর্তমানে মাত্র স্কুলে কাজের সুযোগ আছে। সেখানে যে লোক লাগে তার চেয়ে বেশি আছে। ফলে গ্রাম ছেড়ে কাজের খোঁজেই ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে এবং কেহ কেহ দেশের বাহিরে চলে যায়।
* অনেকেই আবার বিদেশে তাদের স্থায়ী নিবাস করেছে। যেমন ভারত, আমেরিকা, কানাডা ইত্যাদি
* কাজের জন্য কারণ গ্রামে কাজ নাই।
* এলাকায় উচ্চ শিক্ষার জন্য ভালো কোন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় নাই তাই শিক্ষার জন্য লোকেরা তাদের সন্তানদের ঢাকা বা অন্য শহরে পাঠায়।
* কিছু কিছু পরিবার ঢাকা বা অন্য শহরের লোকদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।
* অনেকে পারিবারিক সমস্যা এড়ানোর জন্য বাড়ি ছেড়ে শহরে আসে।

৫.২ পাদ্রীশিবপুর থেকে অভিবাসী হওয়ায় কী কী সুফল ও কুফল দেখা যাচ্ছে?

* সুফল: উন্নত জীবন, পরিবারকে সহায়তা, জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি, অন্যত্র সমাজের সাথে সুসম্পর্ক
* কুফল: পুরুষ শূণ্য হয়ে পড়েছে, পরিবারের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গেছে, পারিবারিক অশান্তি।

৫.৩. নিজস্ব এলাকায় অভিবাসীদের মধ্যে কী কী সংগঠন রয়েছে? তা কী? এবং তাদের কাজ কী কী?

* ঢাকাস্থ পাদ্রীশিপুর খ্রিস্টান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন, পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান যুবসংঘ, প্রার্থনা দল।
* মাটিভাঙ্গা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, মাটিভাঙ্গা যুব সংঘ
* দেশান্তরকাঠি যুব সংঘ
* রাজাবাড়িয়ার সাধু আন্তনীর কমিটি

কাজসমূহ:

* ঢাকাস্থ এবং পাদ্রীশিবপুরের লোকদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা করা।
* সঞ্চয়ী মনোভাব তৈরি করা; সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক উন্নতি করা
* স্বনির্ভরতার জন্য ব্যবসা ও বাসস্থানের জন্য উৎসাহিত করা

* গরীবদের আর্থিক সহযোগিতা দান করা
* মানুষের দরিদ্রতায়, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কোন বিশেষ সমস্যায় আর্থিক সাহায্য দান করা।
* রোগীদের সেবা ও হাসপাতাল ভিজিট করা

৫.৪. পাদ্রশিবপুরের ভবিষ্যৎ-উন্নয়নের জন্য অভিবাসীদের ভাবনা কী? অভিবাসীদের কী করণীয় আছে?

* ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ দিক চিন্তা করে শিক্ষা গ্রহণের দিক নির্দেশনা দেওয়া, গ্রামে ও শহরের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা। পাদ্রীশিবপুরে নিজস্ব জায়গা কিনে খ্রিস্টানদের জমিজমা রক্ষা করা।
* শহর ও গ্রামের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে যৌথভাবে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা।
* পাদ্রীশিবপুরের বিভিন্ন সংগঠনের সাথে ঢাকার সংগঠনের যোগাযোগ ও সমন্বয় সংরক্ষণ করা।
* পাদ্রীশিবপুরের পালকপুরোহিতের সাথে যোগাযোগ রেখে প্যারিশের প্রয়োজনে সহায়তা দান করা।
* তাদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার, বিশেষ করে কারিগরি প্রশিক্ষণ দরকার যাতে চাকরি নির্ভর না হয়ে নিজে কিছু করতে পারে।
* উচ্চশিক্ষার জন্য দেশে ও বিদেশে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ঋণ প্রদান করা।

৫.৫. যারা অভিবাসী হয়ে চলে গেছে তারা কী পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের সাথে এবং পাদ্রীশিবপুরে অবস্থানরত পরিবারের সাথে সম্পর্ক রাখে? কীভাবে রাখে?

* যোগাযোগ ও সম্পর্ক রাখে কিন্তু যথেষ্ঠ পরিমাণে নয়
* অর্থনৈতিক সহযোগিতা, তথ্য আদান-প্রদান, কুশলাদি বিনিময়।
* ঢাকায় যারা থাকেন তাদের বেশিরভাগই কোন না কোন ভাবে গ্রামের আত্মীয়স্বজনের সাথে প্রায়ই যোগাযোগ রাখেন। এবং সংগঠনগুলো নিয়মিত পালকপুরোহিতের সাথে যোগাযোগ রাখেন।
* নাড়ীর টানেই শহরের মানুষ বড়দিন, ইস্টার ও বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গ্রামে যায়।
* ব্যক্তিগত ও পারিবারিকভাবে যোগাযোগ রাখে
* সকলেই বর্তমানে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন।
* বিকাশের মাধ্যমে লেনদেন করেন।

৫.৬. অভিবাসীদের সন্তানেরা যারা পাদ্রীশিবুপরে জন্মগ্রহণ করেনি, তারা পাদ্রীশিবপুরের সাথে কোন যোগাযোগ রাখে, কীভাবে?

* যোগাযোগ রাখে কিন্তু যথেষ্ট না। পিতামাতার ও আত্মীয় স্বজনের সাহায্যে যোগাযোগ রাখে।
* বয়স্করা বিভিন্নভাবে যোগাযোগ রাখছে। তা পারিবারিক প্রয়োজনে, ফাদারের সাথে আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে এবং জমিজমার জন্যও বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ রাখছেন।
* ঢাকায় এ সমস্যা আছে। তাদের গ্রামের প্রতি টান কম।

বিষয় নং - ০৬: শিক্ষা বিষয়ক তথ্য

৬.১. নিজস্ব এলাকায় (ঢাকা, চট্টগ্রাম, অন্যত্র অবস্থানরত) পাদ্রীশিবপুর অভিবাসীদের মধ্যে

* পি.এইচ.ডি কতজন: ২ জন: মনিকা গোমেজ এবং লিলি গোমেজ (নরবার্ট গোমেজের মেয়ে)
* মাস্টার ডিগ্রী পাশ কতজন?: অনেক তবে সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান নেই।
* বিসিএস ক্যাডার আছে প্রফেসর সুইটি ব্রিজেট গোমেজ।
* গ্রাজুয়েট পাশ: অনেক
* সরকারি চাকরিরত: অনেক
* ডিগ্রী ব্যতীত বিশেষ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও স্বনামধন্য ব্যক্তি: ব্যবসা ক্ষেত্রে লরেন্স শ্যামল গোমেজ, বার্নাড পংকজ ডি'রোজারিও, জেভিয়ার গোমেজ, আব্রাহাম গোমেজ, যোসেফ তপন গোমেজ (অটোমোবাইল), ইত্যাদি।
* বিষয়টি সঠিক জরীপের মাধ্যমে তুলে ধরা আবশ্যক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে, মি আমব্রোজ গোমেজ চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশে অবস্থানরত অভিবাসীদের মধ্যে: এস এস সি: ২৪৪ জন: এইচ এস সি: ৩৭৮ জন: স্নাতক ১৩৪ জন: স্নাতকোত্তর ও সমমান ৩১ জন। তবে এই তথ্য কতটুকু যথার্থ তার প্রমাণ করে দেখতে হবে। (সম্পাদক)

৬.২. পাদ্রীশিবপুর থেকে বিশেষ অবদানকারী মৃত ব্যক্তিরা কারা? প্রত্যেকের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে একটি পরিচিতি লিখিতভাবে রক্ষা করা প্রয়োজন।

* তাদের নামের তালিকা: উইলিয়াম আলবিন গোমেজ, লুকাস ডি'রোজারিও, আগস্টিন গোমেজ, আরনল্ড অরুন গোমেজ, মার্টিন স্যার, নরবার্ট গোমেজ, উইলসন গোমেজ, পিটার গোমেজ, মেলকাম ডি'কস্তা, ফার্ডিন্যান্ড গোমেজ, মি. আলেকজান্ডার গোমেজ, মি. সিলভেস্টার ডি' রোজারিও, মি. এলুইসিয়াস মনু গোমেজ। প্রফেসর মানিক গাব্রিয়েল গোমেজ (মাটিভাঙ্গা), উইলসন গোমেজ (মাটিভাঙ্গা), পিটার গোমেজ (মাটিভাঙ্গা)।

॥ ঘ ॥ আলোচনা সভা ও অংশগ্রহণকারীগণ

তথ্য সংগ্রহের জন্য গ্রান্ডমহল থাই এন্ড চাইনিজ হোটেল তারিখ: ২৫ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে একসন্ধ্যায় একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন: পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, ঢাকস্থ পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান কোপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন এবং পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান যুব সংঘ-ত্রয়ের নিম্নোক্ত প্রতিনিধিরা আলোচনা-সভায় যোগদান করেন:
আব্রাহাম গোমেজ, জেভিয়ার গোমেজ, ইভেন গোমেজ, আলবিন গোমেজ, তুহিন গোমেজ, জর্জ মিঠু গোমেজ, এরমণ্ড জহর গোমেজ, রতন গোমেজ, রাফায়েল স্বপন গোমেজ, রত্না আন্না গোমেজ, যোসেফ তপন গোমেজ, এলবার্ট প্রশান্ত গোমেজ, এরিক ডি'কস্তা, প্লাসিড গোমেজ, দানিয়েল ডি'রোজারিও, জেরী গোমেজ।

আয়োজনে ও পরিচালনায় উপস্থিত ছিলেন: সম্পাদনা কমিটির সদস্য: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি (পরিচালক), যোসেফ ডি'রোজারিও (সেক্রেটারি), জেমস গোমেজ, যোয়ান্না ডি'রোজারিও, শ্যামল লরেন্স গোমেজ, বানার্ড পংকজ ডি'রোজারিও।

পঞ্চম অধ্যায়: পাদ্রীশিবপুরবাসী – খুলনাতে অভিবাসী

অভিবাসীদের পরিসংখ্যান

১	২	৩	৪	৫	৮	৭	৯
ক্রম নং	অভিবাসী পরিবারের নাম	অভিবাসী পরিবারের মোট সংখ্যা মাত্র	ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৭-এর পূর্বে	পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-১৯৭১);	বাংলাদেশ আমলে (১৯৭১-অদ্যাবধি)	বর্তমানে অভিবাসীদের মোট সংখ্যা	যারা অন্যত্র চলে গেছে সেই স্থানের নাম উল্লেখ
১	মি: পিটার পার্সি গমেজ			√			
২	মি: ফ্রান্সিস মঙ্গল গমেজ			√		৬	
৩	মি: জীবন গমেজ			√		৪	
৪	মি: পল গমেজ			√		৫	
৫	মি: বরুন গমেজ				√	৪	
৬	মি: রেজিন ম্যাকফিল্ড			√		৭	
৭	মি: জর্জ বেনেডিক্ট গমেজ			√			
৮	মি: ফ্রান্সিস ম্যাকফিল্ড			√		৬	
৯	মি: বেঞ্জামিন ম্যাকফিল্ড			√		৬	বরিশাল
১০	মি: এলাইসিস ম্যাকফিল্ড			√		৬	
১১	মি: শিমন ম্যাকফিল্ড			√		৪	
১২	মি: যোসেফ ম্যাকফিল্ড			√		৮	
১৩	মি: এডবিন ম্যাকফিল্ড			√			
১৪	মি: পল ম্যাকফিল্ড			√		৮	ঢাকা
১৫	মি: পিটার ম্যাকফিল্ড			√		৪	চট্টগ্রাম
১৬	মি: হেরন ম্যাকফিল্ড			√			
১৭	মি: ভিনসেন্ট গমেজ			√		৭	
১৮	মি: রুবেন গমেজ			√			
১৮	মোট			১৭	১	৭৫	

খুলনাতে কোন এফজিডি প্রশ্ন নিয়ে কোন আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। পাদ্রীশিবপুর বংশোদ্ভূত ফাদার জুয়েল ম্যাকফিল্ড উপরোক্ত পরিসখ্যান তিনি প্রদান করেছেন। (১৮/৪/২০২৪)

ত্রয়োদশ ভাগ
পরিশিষ্ট-তথ্য-সংকলন

পরিশিষ্ট - ১ ঃ রামুর পালা
সম্পাদনেঃ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

অবতারণা:

"শ্রীমন্ত বাটে পাদ্রীশিবপুর ঃ ঐতিহ্যগত একটি খ্রিস্টান জনপদ" গ্রন্থটির সকল সংগ্রহ অপূর্ণ থাকবে যদি "রামুর পালা"টি পূর্ণাঙ্গভাবে এই গ্রন্থে স্থান না দিই। ইতিমধ্যে এই গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে "রামুর পালা" সম্বন্ধে বেশ কিছু লেখা হয়েছে। তথাপি সম্পাদনা কমিটি মতামত ব্যক্ত করেছেন যেন পুরো রামুর পালাটি এই গ্রন্থে পরিশিষ্ট হিসেবে স্থান দিই। কারণসমূহ আমার কাছে খুবই স্পষ্ট: প্রথমত, "রামুর পালা" একটি ঐতিহ্যবাহী সম্পদ; দ্বিতীয়ত, এটি হচ্ছে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের একটি স্থানীয় নিদর্শন; তৃতীয়ত, "রামুর পালা" হচ্ছে পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টসমাজকে দেশীয় ও সংস্কৃত্যায়ন করার একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ; চতুর্থত, তৎকালীন সমাজে খ্রিস্টকে সর্বধর্মের মানুষের কাছে মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে তুলে ধরার দৃষ্টান্ত; আর পঞ্চমত, হারিয়ে যাওয়ার অতি নিশ্চিত প্রক্রিয়া থেকে উদ্ধার করে, সংরক্ষিত রেখে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে কী উদ্দেশ্যে পৌঁছে দেওয়া হবে? এ প্রশ্নের উত্তর নানা জনের কাছে নানা রকম হতে পারে। কিন্তু আমার কাছে যে কারণটা বড়ো হয়ে দেখা দিচ্ছে সেটা হল বিভিন্ন যুগে ঈশ্বর খ্রিস্টান সমাজে কাউকে না কাউকে পাঠান এই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে যে, পবিত্র আত্মা বাণীপ্রচারের জন্য নিজেই ঐতিহ্যগতভাবে সক্রিয় ছিলেন এবং তিনি আজও সক্রিয় আমাদের বিভিন্ন জনার মধ্য দিয়ে। যারা ঐতিহ্যবাহী এই সম্পদকে সৃষ্টি করেছেন, রক্ষা করেছেন এবং রক্ষা করে যাচ্ছেন তাদের নাম প্রকাশনায় লেখা আছে। তাদের প্রতি রইল আমাদের কৃতজ্ঞতা। (কার্ডিনাল)

মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রীষ্ট ঃ ধর্মীয় পালা গান

রচনায় : শ্রী কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী
কীর্তনীয়া : র‍্যামুয়েল গোমেজ
উদ্যোক্তা ও তথ্য সংগ্রাহক : ফা: যোসেফ এম জীবন গোমেজ
সম্পাদনায়: যোসেফ ডি' রোজারিও
প্রকাশনা দপ্তর :
মি: আব্রাহাম গোমেজ; ফাদার যোসেফ জীবন গোমেজ; মি: আরনল্ড এ. গোমেজ; মি: কেমিল ডি' কস্তা; সিলভেষ্টার ডি' রোজারিও, মি: বার্টিন গোমেজ।
প্রথম সংস্করণ :
২৫ শে ডিসেম্বর ১৯৯৩ খ্রি.; ১১ ই পৌষ - ১৪০০ বঙ্গাব্দ
মূল্য : দশ টাকা মাত্র।
ডিজাইন ও প্রসেসিং : ডট সাইন, ৯৩, আরামবাগ, ঢাকা। ফোন : ৪১২০৯৩
প্রিন্টিং : জননী আর্ট প্রেস, সবুজবাগ, ঢাকা।
প্রকাশনায় : পাদ্রীশিবপুর খ্রীষ্টান ডেভলপমেন্ট কমিটি, ঢাকা।

উৎসর্গ

স্বর্গীয় র‍্যামুয়েল গোমেজ

জন্ম : ১৩/১১/১৮৯১ খ্রি. মৃত্যু : ১১-০৮-১৯৮১

খ্রিস্টীয় পালা কীর্তনের সুনিপুন শিল্পী, কীর্তনগুরু স্বর্গীয় র‍্যামুয়েল গোমেজের চরণ কমলে।

মুখবন্ধ

পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তদের নিকট রামুর পালা সম্পর্কে কিছু বলা মায়ের কাছে মামা বাড়ীর খবর বলারই সামিল। যদিও অনেক বছর হলো যে রামুর পালা দেখা ও শোনার সৌভাগ্য হয়নি, তবুও এখনো আমার চোখে ও কানে ছোট বেলায় দেখা ও শোনা রামুর পালার আয়োজন ও বিভিন্ন পদগুলো ভেসে উঠে। সেদিন মাত্র জানলাম যে, রামুর পালার প্রকৃত লেখক স্বর্গীয় র‍্যামুয়েল গোমেজ নন বরং প্রয়াত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী। আমরা র‍্যামুয়েল গোমেজকে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য্য সহকারে রামুর পালা উপস্থাপন করতে দেখেছি, যা দেখে শুনে খ্রিস্টভক্তগণ আবেগে ও দুঃখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন। সারা দিন-রাত ধরে রামুর পালা শুনে কাউকেই ধৈর্য্যহারা হতে দেখেনি। রামুর পালা খ্রিস্টভক্তদের ধর্মীয় বিশ্বাস গঠনে ও ধর্মীয় ভিত্তি তৈরিতে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। আর এই পালা গান প্রকাশের মাধ্যমে আমরা আমাদের ধর্মপল্লীর গর্ব এ রামুর পালার সুফল অন্যান্য ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তদের সাথে সহভাগিতা করতে যাচ্ছি।

রামুর পালা আমাদের ঐতিহ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। এর প্রকাশনার সামান্য দায়িত্ব পালন করতে পারায় আমরা ধন্য মনে করেছি। আমাদের সাধ্য, সামার্থ ও যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা আছে। কাজেই আন্তরিকতা ও চেষ্টার কোন ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও এই পুস্তকে ভুল ত্রুটি থাকলে তার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। তবে পুস্তকটি প্রকাশের ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে আমাদের পূর্ব পুরুষের অতি মূল্যবান এই ঐতিহ্যটি টিকিয়ে রাখতে পারলে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

রামুর পালা যুগ যুগ ধরে পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর একটি ঐতিহ্যবাহী সম্পদ হলেও আজ পর্যন্ত পাদ্রীশিবপুর এর স্থায়ী সংরক্ষণের কোন পদক্ষেপ নেয়নি। যতটুকু করার কথা তা স্বর্গীয় র‍্যামুয়েল গোমেজই করেছেন। বেশ কয়েক যুগ পরে আমাদেরই কৃতি সন্তান ফাদার যোসেফ গোমেজ রামুর পালা স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের সর্বপ্রথম এ মহান উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, পান্ডুলিপি নিয়ে ফা: যোসেফ গোমেজ অনেকের দ্বারস্থ হয়ে প্রায় হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এমতাবস্থায় বিষয়টি পাদ্রীশিবপুর খ্রীষ্টান ডেভেলপমেন্ট কমিটি বা পিসিডিসি বিবেচনায় এনে এর প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রকাশনা কমিটিতে আমি কেবল নাম মাত্র সভাপতি ছিলাম। কিন্তু কঠোর পরিশ্রম দ্বারা পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব পালন করেন মি: যোসেফ ডি' রোজারিও। মি: সিলভেস্টার ডি' রোজারিও, মি: বার্টিন গোমেজ, মি: কেমিল ডি' কস্তা এবং সর্বোপরী পিসিডিসি -এর সভাপতি মি: আরনল্ড সি গোমেজ সার্বক্ষণিক তাঁদের মূল্যবান সময় ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেনে। আমি

উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মূল পান্ডুলিপি সংগ্রহ ছাড়াও ফা: যোসেফ গোমেজ বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে প্রকাশনা কমিটিতে আর্থিক সহযোগিতা করেছেন। তাঁকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। মোট খরচের বেশির ভাগই যোগান দিয়েছেন পিসিডিসি এর কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ । প্রকাশনা কমিটির পক্ষ থেকে তাঁদেরও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পুস্তকটির বাজার মূল্য ধরা হয়েছে ১০ টাকা মাত্র। যদিও বিদেশি কাগজে সম্পূর্ণ অফসেটে মুদ্রিত প্রকৃত খরচের হিসাবে মূল্য আরো বেশি। তথাপি সাধারণ আয়ের মানুষের কথা চিন্তা করেই বিক্রয় মূল্য খুবই সাধারণ করা হয়েছে, যেন সব ধরনের খ্রীষ্টভক্ত পুস্তকটি কেনার সুযোগ পান। আশা করি বাংলাদেশের খ্রীষ্টভক্তগণ পুস্তকটির একটি কপি ক্রয় করে ফা: যোসেফ গোমেজেকে এই ধরনের কাজকর্মে উৎসাহ যোগাবেন।

রামুর পালা এক সময় পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তদের মুখে মুখে শোনা যেত। প্রতিবছর মন্ডলীর বিভিন্ন পার্বণে রামুর পালার আয়োজন করা হতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল আর এই পালাগান আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হয় না: যার ফলশ্রুতিতে ঐতিহ্যবাহী এই পালাগান আমাদের মধ্য থেকে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সবারই দায়িত্ব রয়েছে এই ঐতিহ্যকে ধরে রাখা এবং সাধ্যমত অবদান রাখা।

পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীতে বর্তমানে যারা রামুর পালাগান করতে পারেন তারা হলেন: মি: ডমিনিক গোমেজ, মি: আলবারিচ গোমেজ, ফা: যোসেফ গোমেজ, মি: উইলসন গোমেজ(ধলু) প্রমুখ।
আমরা মনে-প্রাণে আশা করি যে, পুস্তকটি বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টভক্তদের মধ্যে প্রেরণা যোগাবে।

মি: আব্রাহাম গোমেজ, সভাপতি (প্রকাশনা কমিটি), পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান ডেভেলপমেন্ট কমিটি (পিসিডিসি), ঢাকা।

রামুর পালার ইতিবৃত্ত

লেখক: ফাদার যোসেফ ম. গোমেজ (জীবন)

চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত বরিশাল জেলার পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীতে রামুর পালার নামে যে পদাবলী কীর্তন প্রচলিত আছে, তার রচয়িতা শ্রী কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন একজন হিন্দু পুরোহিত। তাঁর বাড়ি ছিল বর্তমান ঝালকাঠি জেলা (তৎকালীন বাখেরগঞ্জ) শহরের উত্তর পূর্বে অবস্থিত সুতালড়ী গ্রামে।

শ্রী কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী কলকাতায় পড়াশুনা করেছিলেন। তিনি বহু বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তিনি নিজে কীর্তন রচনা করতেন, সুরারোপ করতেন এবং গাইতেন। শুনা যায়, তিনি বহু ভাষায়ও পারদর্শী ছিলেন। পাদ্রীশিবপুরের শ্রীমন্ত নদীর পূর্ব পাশ্বের গ্রাম কৃষ্ণকাঠির হাওলাদার বাড়ীর সাথে তাঁর আত্মীয়তা ছিল। হাওলাদার বাড়ি এ অঞ্চলে পাটনীবাড়ী নামেও অনেকের কাছে পরিচিত। এ বাড়ীতে তিনি মাঝে মাঝে গানের আসর বসাতেন ও পূজা অর্চনা পরিচালনা করতেন।

তৎকালে কোন পূজা আরোধনায় উপস্থিত থাকতে খ্রিস্টানদের তেমন উৎসাহ দেয়া হতো না। কিন্তু দীঘির পাড়ের পোষ্ট মাষ্টার স্বর্গীয় ফিলিপ ডি' কস্তা, যিনি এ অঞ্চলে পোষ্ট মাষ্টার নামে সুপরিচিত ছিলেন, তাকে তার চাকরির জন্য এ অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় থাকতে হতো এবং এ সমস্ত পূজা-পার্বণে তার বন্ধু বান্ধবদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য তাদের বাড়ীতে যেতেন। তখনকার দিনে পূজা-পার্বণ উৎসবে গ্রাম বাংলায় এ ধরনের কীর্তন আসরে যোগদান করতেন। এ সমস্ত দেখতে দেখতে তার মনে একদিন চিন্তা আসে বাংলা সংস্কৃতির এক অন্যতম আকর্ষণ পদাবলী ও পালাকীর্তনে খ্রীষ্টীয় রূপায়ন সম্ভব কি-না। এ চিন্তা নিয়ে তিনি একদিন কৃষ্ণকাঠি হাওলাদারের বাড়িতে যান। হাওলাদার বাড়ীতে তখন কোন এক পূজা উপলক্ষে কীর্তন চলছিল এবং কালীপ্রসন্ন স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাকে সবাই ঠাকুর বলে ডাকত। ফিলিপ ডি' কস্তা হাওলাদার বাড়ীর উমেস চন্দ্র ও তার ভাইদের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করেন। উমেস চন্দ্র ও তার ভাইয়েরা ছিলেন অত্যন্ত সংস্কৃতিমনা। তারা এ অঞ্চলে কীর্তন, যাত্রা, থিয়েটার ইত্যাদি করে বেড়াতেন । তাদের সাথে আলোচনার পর পোষ্ট মাষ্টার ফিলিপ ডি' কস্তা কালীপ্রসন্নের কাছে এ ব্যাপারে প্রস্তাব দেন এবং এ নিয়ে আলোচনা করেন। কালীপ্রসন্ন তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে যান। এভাবে হাওলাদার বাড়ীতেই এ কীর্তন রচনা শুরু হয়ে যায়।

যদিও কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী একজন শিক্ষিত লোক ছিলেন, তথাপি তিনি খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে তেমন কিছু জানতেন না। তখন বাংলা ভাষায় মুদ্রিত বাইবেল সব জায়গায় পাওয়া যেত না, এমনকি অনেক গীর্জায়ও বাংলা বাইবেল ছিল না। তাই খ্রিস্টধর্ম তথা যীশুর জীবনী আয়ত্তে আনার জন্য তিনি সর্বপ্রথমে 'স্বর্গদ্বার' নামে একটি ধর্মপুস্তক সংগ্রহ করেন। পুস্তকখানি তৎকালে ক্যাথলিক ধর্মশিক্ষার অন্যতম প্রধান পুস্তক রূপে পরিচিত ছিল। তিনি পুস্তকটি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং যীশুর জীবনী নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ ও গান রচনা করেছিলেন। এদিকে ফিলিপ ডি' কস্তা বাংলা বাইবেলের সন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি পাদ্রীশিবপুরের পশ্চিম গ্রামের শিকদার বাড়ির রবার্ট শিকদারের কাছে বাংলা ভাষার একমাত্র বাইবেল সংগ্রহ করে বাবু কালীপ্রসন্নের হাতে দেন। তিনি (কালীপ্রসন্ন)

বাইবেল ও স্বর্গদ্বার থেকে যিশুর জীবনী আলাদাভাবে লিপিবদ্ধ করেন ও গান রচনা করেন। তিনি দক্ষিণ পাদ্রীশিবপুরের (দক্ষিণপাড়া) পন্ডিত বাড়ীর জার্মান পন্ডিত (যার পুরো নাম জার্মান ডি' রোজারিও) - এর সাথে আলাপ করেন। জার্মান পন্ডিত শিক্ষকতা করতেন, তাই তাকে 'পন্ডিত' ডাকা হতো। তিনিও সেকালে একজন সংগীত ও কীর্তন রচয়িতা ছিলেন। তিনি এ কীর্তনখানা রচনা করতে কালীপ্রসন্নকে সহযোগিতা দান করেন। এভাবে রামুর পালা রচিত হয়। এ সমস্ত কাজ ঠিক কোন সময়ে হয়েছে তা এখন সঠিকভাবে কেউ বলতে পারে না। তবে অনুমান করা হয় যে, ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যেবর্তী সময়ে এসব হয়েছে।

এ সময় র‍্যামুয়েল ফ্রান্সিস গোমেজ (রামু) ছিলেন যুবক। তিনি ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ১৮ বছর বয়সে বিয়ে করেন। তার প্রথমা স্ত্রী কোন সন্তানাদি না রেখে মারা গেলে তিনি ২য় বার ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন থেকে তিনি এ গান গাওয়া শুরু করেন। তাহলে আমরা আরও অনুমান করতে পারি যে, সম্ভবত: ১৯২৫-১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে মধ্যবর্তী সময়ে কীর্তনখানি রচিত হয় এবং গাওয়া শুরু হয়। র‍্যামুয়েল গোমেজ ব্যবসা করতেন। তিনি খুব সংগীত পিপাসু লোক ছিলেন। যেহেতু তখন গির্জায় ল্যাটিন ভাষায় গান গাওয়া হতো, তাই তিনি গির্জার গান চালাতে পারতেন না। কিন্তু গ্রাম বাংলার গান তিনি রীতিমত চর্চা করতেন এবং গাইতেন। যার ফলে তিনি হারমোনিয়াম বাজানোর কৌশল আয়ত্ত করে ফেলেন। এ কারণে ও আত্মীয়তার টানে ফিলিপ ডি' কস্তা র‍্যামুয়েলকে কালীপ্রসন্নের কাছ থেকে এ কীর্তন শিখতে বলেন এবং যুবক রামু এতে সম্মত হয়ে যান। এরপর থেকে তিনি কীর্তন নিয়ে মত্ত হয়ে পড়েন। এ কীর্তন শিক্ষার আসর তার দোকানে বসতো এবং এর জন্য যাবতীয় খরচ র‍্যামুয়েল ও ফিলিপ ডি' কস্তা বহন করতেন। এ কীর্তন নিয়ে র‍্যামুয়েল এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, তার ব্যবসার যথেষ্ট ক্ষতি হতো। তাই তার বাবা রেগে গিয়ে একবার তার হারমোনিয়ামটি দোকানের পাশ্ববর্তী কাছারী পুকুরে ফেলে দেন (এখন যেখানে প্রাইমারী স্কুল)। চারদিন পর যুবক রামুর সহযোগিরা কাছারী পুকুরে নিমজ্জিত হারমোনিয়ামটি পুনরুদ্ধার করে। শুনা যায়, পিটার ও পল, (যাদের পিউত্তা ও পৌউল্লা বলে ডাকা হতো) যুবক দু'ভাই শীতের রাত্রে প্রচুর পরিশ্রম করে উহা পুকুর থেকে উত্তোলন করেছিল।

র‍্যামুয়েল গোমেজ (রামু) একজন দক্ষ ও সুনিপুন কীর্তনীয়া হওয়ার জন্য প্রথম থেকেই যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। তিনি কালীপ্রসন্নের পরামর্শে রাত্রে কাছারী পুকুরের গলা পানিতে নেমে তার গান কণ্ঠ সাধনা করতেন। রাত্রি বেলা এভাবে কণ্ঠ সাধনার কারণও ছিল। তা হলো, দিনের বেলা কণ্ঠ সাধনা করলে স্থানীয় পল্লীবাসীর অধিক টিটকারি ও উপহাস তাকে হজম করতে হতো। সঙ্গীতে অজ্ঞ সরল পল্লীবাসী এতে পুলকিত হয়ে, না বুঝে তাকে কেউ কেউ পাগল বলতেও দ্বিধা করতো না। কিন্তু তখন তারা বুঝতো না যে, এ ধরনের একাগ্রতা না থাকলে কোন কাজেই সফলতা আসে না। যেহেতু র‍্যামুয়েল গোমেজ ব্যবসায়ী ছিলেন, তাই তাকে মাঝে মাঝে এ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ঝালকাঠিতে যেতে হতো এবং সেখান থেকে তিনি অনেকবার বাবু কালীপ্রসন্নের যেতেন ও গান করতেন। সমস্ত কীর্তনটি শিখতে তার ১ বছরকাল সময় লেগেছিল।

সর্বপ্রথম যুবক রামু ফিলিপ ডি' কস্তার বাড়ীতে কীর্তন পরিবেশন করেন। সেখানেই ফিলিপ ডি' কস্তা এ কীর্তনখানি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। এরপর থেকে বিভিন্ন সময়ে র‍্যামুয়েল ও কালীপ্রসন্ন কীর্তন

পরিবেশন করতেন। বিভিন্ন বাড়ি থেকে তাদের নিমন্ত্রন আসতো এবং গ্রামের প্রায় সবাই এ কীর্তন শুনার জন্যে উদগ্রীব থাকতো। এমনকি স্থানীয় হিন্দু-মুসলিমগণ খ্রিস্টনদের মধ্যে এ ধরনের গান দেখতে পেয়ে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে যেতো এবং তারাও কোথাও গানের আসর হলে সেখানে উপস্থিত হতো।

ফা: এফ ফিনো সিএসসি-এর সময় সর্ব প্রথম গীর্জা বাড়ীতে এ কীর্তনপালা পরিবেশন করা হয়। (১৯৩০-১৯৩৫ সালের মধ্যবর্তী যে কোন সময়)। কালাদা নামক পাড়ায় পাদ্রীশিবপুরের বাইরে সর্ব প্রথম গান পরিবেশন করা হয়। সেখানকার জর্জি (আসল নাম জর্জ গমেজ) রামুর দলকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যায়। তখন এ গান অত্যন্ত জমজমাট হতো। একবার স্বর্গীয় বিশপ লারোজ সিএসসি, পাদ্রীশিবপুর এসে দুর থেকে শুনতে পান, কোন এক বাড়ীতে কীর্তন চলছে। গীর্জা বাড়ীতে না গিয়ে তিনি সেখানে সরাসরি গান শুনতে চলে যান এবং কিছুক্ষণ গান শুনে পরে ফাদার বাড়ী আসেন। ফা: রড্রিক্সের সময়কালে এ কীর্তন কমবেশী গাওয়া হতো (১৯৪৫ সালের পরবর্তী কয়েক বছর)। তৎকালীন দু'চারজনের সাথে আলাপ করে দেখা যায় এ গানের ফলে তারা যীশুর জীবনী অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যাখা করতে পারে এবং তা জীবন বাস্তবতায় ব্যবহার করে। অথচ তারা কেউ কেউ একেবারেই নিরক্ষর। তাই এ থেকে আমরা এ ধরনের গানের আসরকে তৎকালীন মৌলিক খ্রীষ্টীয় সমাজের আসর বলতে পারি (তৎকালীন বিসিসি)। তাদের কথা ও জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে আমার মতে এ ধরনের আসরে এ দেশের এবং খ্রিস্টীবাণীর পর্যাপ্ত মৌলিকত্ব ছিল।

'রামুর পালা' মূলতঃ 'যীশুর পালা ছিল' কারণ যীশু খ্রিস্টের জীবনী অবলম্বনে এ কীর্তন রচিত হয়েছে। যেহেতু স্বর্গীয় র‍্যামুয়েল গোমেজ রামু এ কীর্তনখানি গাইতেন, তাই কালক্রমে এটি লোক মুখে 'রামুর পালা' বলেই আখ্যায়িত হয়। রামুর পালা মূলতঃ একখানা খ্রীষ্টিয় পদাবলী কীর্তন। তবে র‍্যামুয়েল গোমেজ এ কীর্তন একই সময়ে সম্পূর্ণটা খুব কম গাইতেন। তিনি খন্ড খন্ড বা পালা করে এ কীর্তন গাইতেন যা এখনও করা হয়। তাই এটি 'পালা' নামেই পরিচিত।

পদাবলী কীর্তনের নিয়ম অনুসারে কারো সামগ্রিক জীবনের ঘটনা নিয়ে পদাবলী কীর্তন রচিত হয়। রামুর পালায় যীশুর প্রায় সমগ্র জীবন স্থান পেলেও যীশুর স্বর্গারোহন সংক্রান্ত কোন পালা রচিত হয়নি মাত্র কয়েকটি কথা ছাড়া। পদাবলীর নিয়ম অনুসারে এটি সম্পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করেনি। এছাড়া যীশুর জীবনের আরো দু'একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা শিক্ষাকে উপজীব্য করে আরো পালা থাকলে এটি একটি উত্তম পদাবলীতে রূপ নিত। তবুও বাংলাদেশে খ্রীষ্টিয় পদাবলীর যতগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়, তার মধ্যে এই পদাবলীখানা উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে।

রামুর পালার ভাব, উপমা, শব্দ প্রয়োগ, বিষয়বস্তুর অবতারনা, সুর ও তাল ইত্যাদি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছে। কখনো কখনো ব্যতিক্রমধর্মী সুরের প্রয়োগে এ কীর্তনকে অধিক আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। যেমন: কোন দুঃখের ঘটনায় করুন সুরের পরিবর্তে আনন্দ সূচক সুর প্রয়োগ করা হয়েছে। এ অংশটুকু গাওয়ার সময় কীর্তনীয়া হাসতে হাসতে যদি চোখের জল ফেলতে পারে তাহলে সঠিকভাব দিয়ে এ অংশ গাওয়া হবে এবং দর্শক শ্রোতাগণও এতে অধিক আলোড়িত হবেন।

স্বর্গীয় র‍্যামুয়েল গোমেজ রামু-এর পরিপূর্ণভাব ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। যে কোন কীর্তনের উদ্দেশ্য হল শরণগতিকে স্মরণ করা। কীর্তন গাওয়ার লক্ষ্য হলো গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করা, তার প্রতি বিশ্বাস আরো সুদৃঢ় করা, নিজেকে দীন করা। কীর্তনের নিয়ম হলো ভুল অপেক্ষা সহিষ্ণু হওয়া, তরু অপেক্ষা নীচু হওয়া, অমানীকে মান্য করা। কীর্তনে তিনটি মৃদঙ্গ তালের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। দশ কোষী যার মাধ্যমে কীর্তনের সামাগ্রিকতার প্রবেশ ঘটে। 'লোভা' যার মাধ্যমে গুরুর প্রতি লোভ বা মনোযোগ সৃষ্টি করা হয়। 'ঝুলন' যার দ্বারা আত্মিক ঝুলুন বা দোলা দেয়া হয়। র‍্যামুয়েল গোমেজ উল্লেখিত নিয়ম কানুন অত্যন্ত সুন্দররূপে পালন করে কীর্তন পরিবেশন করতেন। তাই তার কীর্তন অত্যন্ত আকর্ষণীয় হতো।

স্বর্গীয় র‍্যামুয়েল গোমেজের সহযোগী ছিলেন এমন কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করলাম। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিটি ছিলেন দক্ষিণ পাদ্রীশিবপুরের কালু ঠাকুর। তিনি রামুর দোকানের মুহুরী ছিলেন এবং প্রথম থেকেই এ গানের "সরকার"-এর দায়িত্ব পালন করতেন। তার পরের উল্লেখ্যযোগ্য ব্যক্তিটি হলেন উমেস চন্দ্র হাওলাদার। তিনি করতাল বাজাতেন। তার ভাই যোগেস হাওলাদার বাজাতেন মৃদঙ্গ, আরেক ভাই যামিনী হাওলাদার বেহালা বাজাতেন, এরা কৃষ্ণকাঠির হাওলাদার বাড়ি বা পাটনী বাড়ির লোক। দক্ষিণ পাদ্রীশিবপুর শিকদার বাড়ীর পিটার শিকদার (গোমেজ), তার ভাই পল শিকদার (গোমেজ) আরেক ভাই পিও শিকদার (গোমেজ) প্রায় প্রথম অবস্থা থেকে সাথে ছিলেন। তারাও হারমোনিয়াম, মৃদঙ্গ, করতাল ইত্যাদি বাজাতেন। পশ্চিম পাদ্রীশিবপুরের মিস্ত্রী বাড়ির মারকুস গোমেজ মার্কু হারমোনিয়াম ও বেহালা বাজাতেন। বার্থলেমেয় গোমেজ বার্থ, গানের আসরে থাকতেন জান্টেরের বাড়ীর মিলাট গোমেজ, পাংখাওয়ালা বাড়ির পিটার গোমেজ, যোসেফ ডি' রোজারিও প্রমুখ এসে মাঝে মাঝে গান গাইতেন।

পশ্চিমে ধোপা বাড়ীর অশ্বনীকুমার দাশ ও শশীভূষণ দাশ প্রথম অবস্থা থেকে রামুর সাথে ছিলেন। দীঘির পাড়ের পিটার গোমেজ মাঝে মাঝে আসতেন, তাকে চুলওয়ালা পিটার বলে ডাকা হতো। গেছপার্ট ডি' রোজারিও (আড়াইবেকী) ও আরো অনেকে রামুর সাথে গান গাইতেন, যাদের নাম এখন কেউ সঠিকভাবে বলতে পারে না। এদের মধ্যে একমাত্র কৃষ্ণকাঠির উমেষচন্দ্র হাওলাদার এখনও জীবিত আছেন। তার কাছ থেকে এবং জন ডি' কস্তা (পবরী কাউল্লা)-এর কাছ থেকে উপরোক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি। উমেষচন্দ্র কীর্তন রচনায় প্রথম থেকেই এর সাথে জড়িত থেকে রামুর ডান হাত স্বরূপ কাজ করেছেন। আর জন ডি' কস্তা কীর্তন রচনা কাল থেকে রামুর প্রায় মৃত্যু পর্যন্ত মিশনের একজন কর্মচারী এবং তার একনিষ্ট সঙ্গী ছিলেন।

র‍্যামুয়েল গোমেজের আমলে পাদ্রীশিবপুরে আরও কয়েকজন গান রচয়িতা ও গায়ক ছিলেন। তাদের নিজস্ব দল ছিল। তাদের গানগুলো এখন বিলুপ্ত প্রায়। কিছু কিছু গান অবশ্য এখনও লোকমুখে প্রচলিত আছে। তাদের কয়েকজনের নাম নিম্নে দেয়া হলো:

১। শ্রী জার্মান ডি' রোজারিও (পন্ডিত), দীঘির পাড়ের পন্ডিত বাড়ী। তিনি সাধু আন্তনীর পালা, যাকোবের যাত্রাগান ও অনেক প্রার্থনা-সঙ্গীত রচনা করেন। রামুর পালা রচনায়ও তিনি সাহায্য করেন।

২। শ্রী জার্মান গোমেজ (বয়াতী), দক্ষিণ পাদ্রীশিবপুর চরের বাড়ি। তিনি সাধু আন্তনীর গান ও প্রার্থনা সঙ্গীত রচনা করতেন এবং গাইতেন।

৩। শ্রী জার্মান ডি' রোজারিও, আড়াইবেকী। তিনি জারি গাইতেন ও পুঁথি পাঠ করতেন।

৪। শ্রী কানাই মৃধা (গোমেজ) দেশান্তরকাঠি গ্রামের লোক, তিনি কবি, সারি টপ্পা ইত্যাদি রচনা করতেন ও গাইতেন।

৫। শ্রী শ্যামুয়েল হাওলাদার (গোমেজ) মাটিভাঙ্গা গ্রামের লোক, তিনি কবি, জারি, টপ্পা ইত্যাদি রচনা করতেন ও গাইতেন। এছাড়াও জন ডি' রোজারিও (ডিমু), মোনা ডি' কস্তা, ফ্রান্সিস গোমেজ (ফরাইচ্ছা) প্রমুখ ব্যক্তি গান গাইতেন।

স্বর্গীয় র‍্যামুয়েল ফ্রান্সিস গোমেজ রামু ১১ জুলাই ১৯৮২ সালে মারা যান। তার মৃত্যুর পরে যারা কীর্তন গাচ্ছেন, তাদের মধ্যে বিশেষ কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করছি। তারা হলেন ঃ মিঃ ডমিনিক গোমেজ, আলবারিচ গোমেজ, এন্টুনি গোমেজ বাবলু, নরবার্ট গোমেজ (মৃধা)। এরা কীর্তনীয়া। এছাড়াও আছেন, স্বর্গীয় পিও গোমেজ (শিকার), মেলকাম ডি' কস্তা, মিডিন ডি' রোজারিও, গিলবার্ট গোমেজ প্রমুখ। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় বসবাসরত পাদ্রীশিবপুরের লোকেরা মাঝে মাঝে এ কীর্তন আসরের ব্যবস্থা করেন। রামুর পালা আরো সুন্দর ও ভক্তিভাবে গাওয়ার আবেদন রাখছি এবং কীর্তনের মাধ্যমে খ্রিস্টবাণী প্রচার ও খ্রিস্টভক্তদের আত্মিক উন্নতি কামনা করি।

দশকোষ - আহা মরি

আসর

পদ - করুণা করিয়ে, প্রভু একবার এসো হে, এসো হৃদয় মাঝে, উদয় হও হে আমায় শক্তি দাও সর্বশক্তিমান। আমি করিব তোমায় গুনগান, তোমার সাধন ভজন নাহি জানি, আমায় নিজ গুণে দয়া কর, তুমি দয়ালের শিরমনি।

পদ - আমি পূজিব চরণ, এই আকিঞ্চন, রাখিও হৃদয় মাঝারে। (চরণ পূজা করিব) ভক্তি কুসুম লয়ে (ছেড়ে দিবনা) তোমার রাঙ্গা চরণ, ছেড়ে দিব না হৃদয় মাঝে ধরে রাখবো, তোমার রাঙ্গা চরণ ছেড়ে দিব না পূজা করিব, ছেড়ে দিব না - ঝুমইর

দশকোষী ওগো আমি সাধন জানি না
ওগো কোন সাধনে তোমায় পাবো,
আমি কোন সাধনে তোমায় পাবো
আমি সাধন জানি না।

পদ - জীবের লাগিয়ে করুণা করিয়ে, ধর্মপ্রচার সূত্রে স্বর্গে বসিয়া ভাবিল মনেতে পাঠাইব প্রাণ পুত্রে (নইলে অন্ধ জীবের গতি নাইরে), জীব ঘুরে মরবে অন্ধকারে (জীবের গতি নাইরে) সত্য ধর্ম প্রচার নইলে, অন্ধ জীবের গতি নাইরে। (কেউ পাবে না) পরম মুক্তি কেউ পাবে না। নরক জ্বালা সইবে কেবল, পরম মুক্তি কেউ পাবে না।

যিশুর জন্ম পালা

কথা - পরম করুণাময় পরমেশ্বর মানবের দুঃখ বিনাশ এবং অনন্ত পাপরাশি নাশ করে মুক্তি দিবার জন্য নিজ পুত্রকে পাঠিয়ে দেবেন মনে করে, নিজ দূত গাব্রিয়েলকে স্মরণ করলেন। গাব্রিয়েল প্রণাম পূর্বক বললেন: প্রভু আমাকে স্মরণ করেছেন কেন?

পদ - নাজারেথ নগরে মারিয়ার ঘরে
নিজ পুত্র পাঠাইব।
পবিত্র আত্মায়, তাহার আত্মায়
আত্মজ জন্মাইব ॥

(জীবের ত্রাণ লাগি) ত্রাণকর্তা পাঠাইব
গুনবতী সতী, মারিয়া যুবতী
আমার চরণ মতি ॥

নাজারেথ নগরে, সেই কুমারীরে কর দৈববাণী
যার শুকনা যষ্ঠিতে, ফুটিবে কুসুম
সে হবে মারিয়ার স্বামী।
(অন্য কেউ পাবে না) কুমারী রমনী রত্না যোসেফ বিনে।

পদ - ঈশ্বরের আজ্ঞায় দূত গমন করিল
ভজনা মন্দিরে এসে উপনীত হল
(তার অঙ্গের প্রতিভায়) মন্দির হইল আলো
(গন্ধেতে প্রাণকুল) স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ

কথা - গাব্রিয়েল বলছে, কুমারী ভয় করো না।
জগতে তুমিই ধন্যা, ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ কর

সুরে - হস্তের যষ্ঠিতে যার কুসুম ফুটিবে সেই জন মেরি তব পতি যে হইবে।

পদ - প্রভুর আদেশ তোমায় জানাইলেম (ভুলে যেন থেকনা) ভুলিলে প্রমাদ হবে।

কথা - মারিয়া বলছে, দূত বর একি অসম্ভব কথা বলছেন, শুকনা যষ্ঠিতে কি কুসুম প্রস্ফুটিত হতে পারে?

সুরে - তখন গাব্রিয়েল বলছেন, কুমারী যার আজ্ঞায় চন্দ্র সূর্য আলোক দান করেছে, মলয় মারুতের মৃদু হিল্লোল যার মহিমা গান করছে, তার কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে।

দশকোষী - ও যার কৃপাগুণে, দিবানিশি
আলো দিচ্ছে রবি শশি,
চপলার চঞ্চল হাসি
ক্ষরে সুধা করে গো বিমল সুধারাশী

লোভা - ওগো যত রবিশশী গ্রহ তারা আছে তার আজ্ঞাতে সদয় তারা ॥

পদ ঝুলন - শঙ্কিত মারিয়া সতী কম্পিত হৃদয় গো
দুনয়নে বহে ধারা, ধরা ভেসে যায় গো
(ধরা ভেসে যায়) মেরীর দুনয়নের ধারায়
(ভেসে যায় ভেসে যায়) নয়নের ধারায় ধরা
ধরায় ধরেনা ধারা।

কথা - গাব্রিয়েল বলছে কুমারী প্রভু তোমাকে শক্তি দান করবেন, শঙ্কিত হয়ো না। তখন মারীয়া বলছে

পদ - (ভজন তো জানিনা), প্রভু কোন গুণে করবেন দয়া আমি অতি অভাগিনী।

কথা - গাব্রিয়েল বলছে, মারিয়া

পদ - দুরন্ত সামন্ত সঙ্গে, মদন আসিয়া রঙ্গে যুবতী হৃদয়ে হাণে বান গো। (আকুল করে) দুকুল ভাসিয়া যায়

কথা - মারিয়া বলছে প্রভুর নামে সহ্য করব।

পদ - (ধৈর্য মানে না) যৌবনের প্রবল স্রোতে
কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলছেন - হ্যাঁ আমি পারবো। রমনী দুর্বলা হলেও ইচ্ছা থাকিলে চির কুমারী থাকতে পারে ঈশ্বর তাকে এই বলটুকু দিয়েছেন।

সুরে - তখন গাব্রিয়েল অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলেছেন মাগো

রামপ্রাসাদী- দে মা আমায় তোর পদধূলি
আমি মাখব সবার্ঙ্গে তুলি।
সত্য ধর্ম করতে প্রচার
তোর গর্ভে জন্মিবে কুমার
ঘুচবে জীবের অজ্ঞানান্ধকার
মায়ার বিকার যাবে তুলি।

গান গীতাঙ্গী-

জয় বিশ্বপতি, তুমি অগতির গতি
সহস্র প্রণতি রাতুল চরণে।
প্রহরে প্রহরে, কোকিলা কুহূরে
পাপিয়া ঝঙ্কারে, তোমার গুণগানে।
তব মহিমা গানে উথলে অম্বু।
গগনে গভীরে গরজে কম্বু।
স্থাবরে জঙ্গমে পাখী বিহঙ্গনে
মলয় পবণে করুণা নিঃশ্বনে।

পদ - সচল অচল গুরুমন্ত্র সখনে কাঁপে ত্রাসে সূর্য চন্দ্র। লক্ষ লক্ষ প্রাণী ভ্রমিছে অহরহ, লক্ষ্যভ্রষ্ট যথা কক্ষচ্যুত গ্রহ (করুণা বিতারী), পাপ অপহারি, পাঠাও তনয় তব জগত কল্যাণে।

খৎতাল - রক্ষহে বিপক্ষে মাঝে আজ আমায়
আজ বিপাকে পতিত সতী বিশ্বপতি রাখ পায়

পদঝুলন - অবলা সবলা বালা, কতবা সইবে জ্বালা, ওহে দয়াময় একবার দেও হে দেখা, প্রাণ সখা, নইলে জীবন রাখা দায়।
অবলা দূর্বলা কত সহিব জ্বালা
হল দুঃখে অন্তর ঝালাপালা
আমি পদে পদে পড়ি বিপদে, শ্রীপদে নাশ কর জ্বালা
আমি অতি অকাতরে, ডাকি সখা তোরে
কোথা রইল জগত পতি।
সতী পতিত বিপাকে রাখ নাথ তাকে
তুমি অগতির গতি।
(আমার আজ কেহ নাই) তুমি বিনে
প্রভু অসম্ভব কি সম্ভব হবে?
শুষ্ক কাষ্ঠে ফুল ফুটিবে, একি সম্ভব হয়
হেন রামু বলে, তার কৃপা হলে
অসম্ভব সম্ভব হয়।

কথা - মেরী উপাসনা শেষ করে কাতর নয়নে চতুর্দিকে অবলোকন করছে। তার অঙ্গের লাবণ্য আজ যেন শতগুণ বৃদ্ধি হয়েছে।

পদ-ঝুলন - তার বদন কমল, শশী নির্মল
দর্শন মুকতা পতি
তরুন অরুণ গাত্র চঞ্চল নেত্র
গজেন্দ্র গমনে গতি।
পশুরাজ যিনি ক্ষীণ কটি খানি
নব নবমীতে তনু
রাম রম্ভা তরু যিনি গুরু উরু
ভুরু যুগ কাম ধেনু।
(রূপের নাই তুলনা) ও তার ভূবনে মোহন রুপের ছটা
তুলনা নাই এই মহি মন্ডলে।
গোরক চোনা, কাঁচা সোনা, মেরীর রুপের নাই তুলনা
ফনির মনি বিবরে লুকায়ে গো

দেখিয়া সে তনুখানি, ক্ষণপ্রভা সেদামিনী।
মেঘের আড়ে আর নয়নে চায় গো।
(চঞ্চল হল) লাজে চপলা মেরী
মেরীর রূপের ছটা দেখে
বঙ্কিম নয়ন কোণে যার পানে চায় গো
পরাণ সহিতে টানে ঘরে থাকা দায় গো
(ঘরে রইতে নারে) আমার মেরীর রূপ যে দেখেছে
ঘরে রইতে নারে
(ডুবিয়ে গেল রে) যত কামুক যুবক দল
মেরীর রূপ সাগর পরে। ঝুমইর ----------

পদ-ঝুলন - কান্দিতে কান্দিতে ব্যাকুল চিতে
চারিদিকে মেরী চায় গো
মন্দিরের পাশে দীনহীন বেশে
যোসেফকে দেখিতে পায় গো
তার হস্তের যষ্টিতে ফুটেছে কুসুম
দেখিতে সুন্দর অতি
ভাবিছে মারীয়া ধন্য হে ঈশ্বর
মিলাইলে মমপতি
(কেউ জানে না) তোমার অপার নীলা
তুমি দয়ালের শিরমনি
তুমি অসম্ভব সম্ভব কর।
কেউ জানে না।

সুরে - এই মনে ভেবে মারীয়া - হায়রে

পদ - অমনি করে দিয়ে কর হরিষ অন্তর
ঈশ্বরের শপথ করি।
মহাযাজকের ধর্ম অনুসারে
পতিতে বরণ করি।
জনমের মত হয়ে অনুগত
তোমার হইয়ে রব
প্রতি পদে পদে সম্পদে বিপদে
তোমার সহায় হবো।
(আমি প্রাণ দিয়েছি) তোমার ঐ চরণে প্রাণ দিয়েছি

সুরে - এই বলে মারীয়া যোসেফের হাত ধরিলেন

পদ - তখন আনন্দে মাতিল, যোসেফের হৃদয়
ছল ছল করে নেত্র
বাহু তুলে গায় বিভুগুন গান
প্রেমেতে পুলকিত গাত্র
(আনন্দে মাতিল) বিভুগুন গান করে ঃ ঝুমইর ----------

গান - একতাল
জয় জয় জয় বিভু দয়াময়
জয় সর্বশক্তিময় দয়াময়
স্থুল শুক শান্ত, তুমি হে অনন্ত,
প্রান্তরে অন্ত কেবা পায়
কে জানে তবু মনের অভিলাষ
কোন ছলে তুমি কর কি লীলা
নিরাস তরুতে কুসুম বিকাশ
কে কোথায় দেখেছে দয়াময় ॥

দুটি প্রাণ আজি বাধা প্রেমসূত্রে
অবতীর্ণ হল তব কর্ম ক্ষেত্রে
হেন রামু বলে পাঠাও কর্মক্ষেত্রে
জীব মাত্র দিতে সত্য জ্ঞানোদয় ॥

কথা - তখন শুদ্ধাচারিণী মেরী পরিণয় সমাপনান্তে গৃহাভিমুখে গমন করেছেন, পথে নাজারেথ নগরবাসিনী রমনীগণের মধ্যে দেখা হয়েছে। রমণীগণ বলছে.....

গান - ওলো, ছি-ছি-ছি- লাজে মরে যাই
ওলো তোর মত আর নিলাজ মেয়ে ত্রিজগতে নাই ॥
রূপ যৌবনে গরবিনি, ছিলি বটে ওলো মেরী
বুড়ো বরে প্রাণ সপিলি, করলি কিলো ছাই
নব্য সভ্য যুবক যারা, তোর লাগিয়া আত্মহারা
বুঝিনা এ প্রেমের ধারা বলিহারি যাই ॥

কথা - তখন মেরী স্ত্রীলোকদিগের কথা শুনে সজল নয়নে করজোড়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলছে

সুরে - দয়াময়.....(৩ বার)

পদ - বলে বলুক লোকে মন্দ, তাহে ক্ষতি নাই হে
দয়া কর প্রভু যেন তব চরণ পাই হে
(আমায় করুণা কর হে) করুণাময় প্রভু
তুমি যা কর তা করতেই পার

কথা - এদিকে যোসেফ যায় আর মনে মনে ভাবছে কি ভাবছে.....

পদ - আমি এমন দেখি নাই
তাল ঝুলন -শুষ্ক কাষ্ঠে কুসুম ফুটে
(কেন বা হল) এমন অসম্ভব সম্ভব আজি ॥

কথা - চিরদিন এ যষ্ঠি আমি ব্যবহার করছি কই এমন ঘটনা তো কখনো দেখি নাই। কে জানে দয়াময় এই বৃদ্ধের বিবাহ উপলক্ষ্যে তোমার কোন উদ্দেশ্য সাধন করবে।

পদ - গুণবতী সতী মারিয়া যুবতী
হল মম অনুগত
স্পর্শ না করিব নিকটে না যাব
রব ভাই ভগনীর মত।
(এক প্রাণেতে) দুটি প্রাণ, রব মত্ত বিভুগুণ গানে ॥

কথা - এভাবে মেরী দিন যামিনী ঈশ্বরের চিন্তায় নিমগ্ন থাকলেন, এদিকে ঈশ্বর গাব্রিয়েলকে বললেন - যাও, দূত মেরীকে জানাও তার গর্ভে ত্রাণকর্তা জন্মগ্রহণ করবেন। তখন.....

পদ - ঈশ্বরের আদেশ পেয়ে, গাব্রিয়েল চলে ধেয়ে, উপনীত নাজারেথ নগরে।
(বলে ধন্য সতী) করে প্রণিপাত, দাঁড়াইল করজোড়ে ॥

কথা - তখন গাব্রিয়েলকে দেখে মারীয়া বললো

পদ - ভয় পেয়ে সতী বলছি কাতরে,
কেন প্রণমিল মোরে।
ঈশ্বরের দূত করি প্রণিপাত
ভয়েতে প্রাণ শিহরে।
(বড় ভয় পেয়েছি) তোমার কান্ড দেখে।

কথা - দূত বলছে সতী জগতে তুমিই ধন্যা, ভয় করনা, তোমার গর্ভে ত্রাণকর্তা জন্মগ্রহণ করবেন। মারীয়া বলছেন, সে কি কথা বলছেন প্রভু

পদ-ঝুলন - আমি পুরুষেরি পাশে যাই না কখনো,
না করি পুরুষের সঙ্গ।
একি বলা হায়, ভয়ে প্রাণ যায়,
আতঙ্কে শিহরে অঙ্গ ॥

(বড় ভয় হয়েছে) তোমার কথা শুনে,
কেমন করে সম্ভব হবে ॥

কথা - দূত বলছে, সতী ভয় করোনা, তোমার উপর পবিত্রাতার অধিষ্ঠান হবে, তোমার পুত্র ঈশ্বরের পুত্র নামে খ্যাত হবেন, তার নাম রাখিও যীশু। তোমার জ্ঞাতি এলিজাবেথ বৃদ্ধ বয়সে গর্ভধারণ করেছেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রত্যক্ষ দর্শন কর। মেরী বলছেন, আচ্ছা প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। আমি প্রভুর পদাশ্রিত দাসী মাত্র।

সুর - পর্বতময় প্রদেশ, যিহুদীর দেশে
উপনীত মারীয়া এলিজাবেথ তোমারে, তুমি প্রভুর প্রার্থনা কর।

কথা - এলিজাবেথ বলছে ভগনী

পদ ঝুলন - এস হে আমার কাছে ভগণী
ওখানে দাড়ালে কেন।
তুমি ধন্যা সতী, পরমা প্রকৃতি
তব সম সতী আর কে আছে।

পদ ঝুলন - জীবের লাগিয়া করুণা করিয়ে
দয়াময় প্রভুর মনে পড়েছে।
পাপতাপ নাশিতে কৃপা প্রকাশিতে
তোমার গর্ভেতে জন্ম নিয়েছে।
রমণীর মাঝে তুমি শিরমণি
শুদ্ধভক্তিগুণে বিশুদ্ধাচারিনী
তব আশির্বাদ শুনিয়ে এখনি
আমার গর্ভস্থ সন্তান নেচে উঠেছে ॥

পদ ঝুলন - স্ব-মন্দিরে আসি, মারিয়া রুপসী
রহিল পতির সনে।
তার গর্ভের লক্ষণ করে নিরীক্ষণ
যোসেফ দুঃখিত মনে
(বলে, কলঙ্ক হবে) লোক সমাজেতে
ঈশ্বরের অপরাধী।
ঝুমইর.....

পদ ঝুলন - ভেবে মরি হায়, কি করি মরি মরি প্রাণ যায়।
আমি আর যাতনা সহিতে নারি রক্ষে কর হে দয়াময়।
(হায় হায় একি হলো) আমার সকল গেল
আমার জগতে কলঙ্ক রইল,
আমার সুখের স্বপন ভেঙ্গে গেল
(প্রভু আমি নিরুপায়) কর সে উপায়
যে উপায় আমার মান রক্ষা পায়।

সুরে - যে দুঃখে জ্বলে মম কায়, সে দুঃখ জানাব বা কায়
লোকে দেখে বলবে আমায়, সেই যোসেফ ঐ তো যায়।

পদ - (হায় হায় কি করিব) আমি কোথায় যাব,
আমার এ যাতনা কারে কব
আমি জীবন ত্যাজিব।
প্রভু আমি নিরুপায়, কর সে উপায়
যে উপায় আমার প্রাণ যায়।

গান - বড় যতনে করিয়ে সাগর সিচিনু
মানিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল, মানিক লুকাল
অভাগার কর্ম দোষে ॥

বড় সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল
আমি বিশুদ্ধাচারিনী ভাবিতাম যাহারে
সেই কলঙ্কিনী হল।
হায় হায় মেরী কি করিলি,
আমার সুখের স্বপন ভেঙ্গে দিলি ॥

লোভা - অসার সংসারে, আমার আপন বলতে আর কে আছে।
ওগো আমার মনের দুঃখ মনে রইল
ওগো আমার আশার স্বপন ভেঙ্গে গেল।
ছিল বিধি অনুকূল, শুষ্ক কাষ্ঠে ফুল
প্রেমের মুকুল ফুটিল
কুসুমের হার পরিতে গলায় কন্টক ফুটিল।

দশকোষী - আমার কাজ কিরে আর এ জীবনে
জীবন ত্যাজিব জীবন গো
হায় হায় মেরী বল কি করিলি
আপন স্বপন ভেঙ্গে দিলি।

লোভা - ওরে আমার যত ছিল সুখের আশা
আমার সে আশায় হল নিরাশা
হায় গো.....

কথা - যোসেফ মনে মনে ভাবছেন, যাকে সরলতার প্রতিমূর্তি, পবিত্রতার নিখুঁত ছবি, সংসারে নন্দনের প্রস্ফুটিত পারিজাত মনে করতেম, সেই মেরী অবিশ্বাসিনী! কল্পনা করতে পারিনি, আমার এ অভিযোগ রাজদ্বারে প্রকাশ করলে মেরীর প্রাণদন্ড হতে পারে। তার গর্ভে হয়তো কোন ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। আমি তাকে জন্মের মত ত্যাগ করব।

সুর - তবে যাই.....

দশকোষী - তবে আমি যাই, যাই গো,
জনমের মত গো।
ওগো মেরী, আর তো দেখা হবে না গো
দেখে লও জনমের মত
আমার এ সংসারে আর কে আছে।
আমি দাঁড়াইবো আর কার কাছে।
আমার আর কে আছে গো
মেরী তুমি বিনে এ সংসারে
আমি বিদায় হলেম গো
এই দেখা জনমের মত।

কথা - মারীয়াকে ত্যাগ করে যোসেফ নয়ন জলে ভাসতে ভাসতে আপন মনে চলছে। এমন সময় স্বর্গীয় দূত এসে উপস্থিত হল।

ঠুংরী - কোটি সূর্য্য যিনি, প্রভা অঙ্গেরি বরণগো
ছটা দেখে যোসেফের মন উচাটন গো
(দাঁড়িয়ে রয়েছে) যোসেফ কাষ্ঠ্য পুত্তলিকার মত (রুপের ছটা দেখে)

পদ - কর জোড় করি, ভূমি তলে পড়ি
প্রণতি করিয়া বলে।
অধমের প্রতি করুনা করিয়া দেখা দিলে
ভাগ্যবলে।
(তুমি কে বটে হে) তোমায় চিনতে নারি
ভয়ে মরি।

সুরে - তখন যোসেফের ভক্তিপূর্ণ কথা শ্রবণ করে। হায়রে.....

পদ-ঝুলন - গাব্রিয়েল বলে শুন বচন আমার হে,
শুদ্ধ সতী পতিব্রতা রমনী তোমার হে,
(সন্দেহ কর না) সে যে রমনীর শিরমণি
পবিত্র আত্মায় তার গর্ভের সঞ্চার হে

পাপী তাপী ত্বড়াইতে জন্মিবে কুমার হে।
(জীবের পাপ তাপ রবে না) ত্রাণকর্তা জন্মিবে ভবে
তার (যীশু নাম রাখিও গো) নামে জগৎ মাতাইবে
তুমি ধন্য, মেরী ধন্যা, জগৎ করিলে ধন্য।

সুরে - বেথলেহেম প্রদেশে সম্রাটের আদেশে লোক গণনার তরে। বাজিল দামামা হইলো ঘোষণা। যেতে হবে রাজপুরে, যেতে হবে স্ত্রী পুরুষ, বালক যুবা, রাজাদেশে রাজধানীতে।

পদস্থলন - মেরীকে লইয়া সঙ্গে, যোসেফ চলিল রঙ্গে
নগরেতে উপনীত হল
দীন সূত্র ধর, না মিলিল কোন ঘর
পশুশালাতে গিয়ে রইল।

পদ-ঝুলন - মলয় সমীর বহে, ধীরে ধীরে
বিমল জ্যোৎস্না রাশি।
ডাকিছে পাপিয়া, থাকিয়া থাকিয়া
কুঞ্জ কাননে বসি।
কোকিলা কূহওে, কুহু কুহু স্বরে
ঝুরু ঝুরু ঝরে ফুল গো।
নাচিয়ে স্থাবর, নাচিছে জঙ্গম
নাচে কত জীব কূল গো ॥
আনন্দে মাতিল পশুপক্ষী তরুলতা
কি যেন কি নব ভাবেঃ ঝুমাইর.....

কাগমেরী ঃ এমন মধুর রাতি গো, বল কেন গো নিরখী আজ,
কার তরে এত আকুল,
কামনা কার তরে এত সাজ।
জোৎস্না মাখিয়ে বিমল অঙ্গে
সাজিয়ে ধরা নবীন রঙ্গে
আজ কার তরে এত সাজলো,
বলিতে কি এত লাজ।

পদ-ঝুলন - অতি শুভক্ষণে, জগৎ কল্যাণে
পুত্র প্রসবিল মেরী
পুলকিত সব জয় জয় রব
উঠিল জগৎ ভরি।
স্বর্গ দূতগণ পুষ্প বরিষণ

করে আনন্দিত মনে
মেরী গুণবতী, যোসেফ সংহতী
মত্ত বিভুগুণ গানে।
(আনন্দ ধরে না) প্রেমানন্দে ভেসে যায়ঃ ঝুমইর.....

গান -

কাহারবা - প্রেম কে নিবিরে আয়, প্রেমের লহর বয়ে যায়
প্রেমের লহর বয়ে যায় (২ বার)
আয় আয় পাপী, আয় আয় তাপী
অন্ধ খঞ্জ কে কোথায়
পাপী তাপী তরাইতে যীশু এল এ ধরায় ॥

পিতা পুত্র পবিত্র আত্মা, তিন এক কভু ভিন্ন নয়
যিশুর চরণ কর স্মরণ, পাপ তাপ সব দুরে যায়।
হেন রামু বলে অন্তিম কালে স্থান দিও ঐ রাঙ্গা পায়
যিশুর নামটি গাওরে সবে, মানব জনম বৃথায় যায়
হিপ হিপ হুররে বলে সবে যিশুর জনম পালা-হল সার

পদ-ঝুলন - অতি শীতল মলয়ানীল, মৃদু মন্দ মধুর বহন
আজ বুঝি মলয় দিন পেয়েছে, তাই মৃদু মৃদু বইতে আছে।
আজ গতি মৃদুমন্দ অতি, আমার যীশু ধরায় এসেছে বলে
মনের হরষে কুসুম বরষে, স্বরগে স্বর্গ দূত।
যথায় রাখে রাখাল পশুপাল, চলে এ সংবাদ দিতে
পশু চরাইতে ছিল রাখাল বালক।
উপণীত স্বর্গ-দূত তাদের সমীপে।
(বলে যারে) তোদের মানব জীবন ধন্য,
ত্রাণকর্তা এসেছে ভবে ॥

কথা - রাখাল বালকেরা বলছে, মহাত্মন, আপনি কে? কাকে দেখতে বলছেন? স্বর্গদূত বলছেন, কাকে দেখতে বলছি? তবে শোন - যাকে দেখতে জীব সর্ব পাপ হতে মুক্তি পায়, সেই ত্রাণকর্তা জন্মগ্রহণ করেছেন, তাকেই দেখতে বলছি। তখন রাখাল বালকেরা আনন্দে বিভোর হয়ে পশুপালেন দিকে যীশুর জয়গান করতে করতে ছুটছে।

গান - আয়রে ও ভাই আয়রে সবাই প্রেমানন্দে যাই
তালে তালে পাটি ফেলে যিশুর নামটি গাই।
পাপী তাপী তরাইতে আর তো কেহ নাই
ত্রাণকর্তা এসেছে ভবে আয়না ছুটে যাই
পুঁজব তারে সোহাগ ভরে চলনা সবে ভাই ॥

সুরে - মহানন্দে রাখালেরা সবে মিলে ধায় গো
যাব পাত্রে আছে শিশু দেখিবারে পায়গো
(বলে ধন্য হলেম) প্রভু তোমার দরশনে,
মোদের মানব জন্ম সফল হল।

গান - মোরা এসেছি পুঁজিতে তোমারে
মন কুসুম লয়ে ভক্তি চন্দন দিয়ে
প্রীতি স্নেহ প্রেম উপহারে
দীন দরিদ্র মোরা, কিছুতো নাহি সম্বল
চরণ ধোয়াতে প্রভু রেখেছি নয়ন জল
সতত হৃদয় মাঝে, নব প্রেম অনুরাগে
বসাইতে হৃদয় মাঝারে ॥

কথা - রাখাল বালকেরা যীশুর পূঁজা করে গমন করেছে। এদিকে পূর্বদেশী তিনজন পন্ডিত, একজন আর একজনকে বলতে আছে, ভাই শাস্ত্রে লেখা আছে যেদিন ত্রাণকর্তা জন্মগ্রহণ করবেন, সেদিন আকাশে একটি উজ্জল নক্ষত্র উঠবে।

সুরে - শাস্ত্রেতে শুনেছি, এই আছে বটে লেখা,
যীশুর জন্মকালে উঠিবে তারকা।

পদ - (আজ চেয়ে দেখি ওকি ওকি) গগণ পটে দেখা যায় কি
যীশু ধরায় এলো নাকি?

পদ-ঝুলন- সূর্য নীল কান্তমনি, তুন্দুরু ধর্য্য মনি
আর যত মনির শিরমণি
অগুরু চন্দন চুয়া, গন্ধরসে মিশাইয়া
তিনজনে চলিল তখনি।
(দুনয়নে প্রেমধারা) ভেসে যায় নয়ন তারা
তারাও ভেসে যায়,
দুনয়নে তারা, তারাও ভেসে যায়
তারাও ভেসে যায়, যীশুর প্রেমের প্রেমিক যারা।
যীশুর প্রেমে বন্যা এসেঃ ঝুমইর.....

পদ-ঝুলন - আগে আগে যায় তারা, পাছে পাছে যায় তারা (তারাও চলে যায়) তারাও চলে যায়, তারাও চলে যায় যীশুর দরশনের আশায়, তারাও চলে যায়, তারাটি লক্ষ্য করে তারাও চলে যায়। ঝুমইর.....

কথা - সেই তারাটিকে লক্ষ্য করে পন্ডিতগণ হেরোদ রাজার রাজধানীতে এসে উপনীত হয়েছে। দ্বারী গিয়ে করজোড়ে বলছে মহারাজ দ্বারদেশে তিনজন অতিথি দন্ডায়মান। কি আদেশ। রাজা বলছে যাও তাহাদিহকে সসন্মানে নিয়ে এসো।

সুরে - তখন পন্ডিতগণ এসে রাজাকে অভিবাদন করে বলছে,
মহারাজ.....

পদ-ঝুলন - মোরা করি নিবেদন বল হে রাজন
কোথায় যিহুদার রাজা
আমরা বহুদুর হতে, এসেছি দেখিতে
করিতে এসেছি পূজা
বল বল হে, সে কোথায় লভেছে জনম।

কথা - রাজা বলছে, কি বললে, যিহুদার রাজা?

পদ - (এ দেশে আর রাজা নেই) আমি যিহুদার রাজা আমি বিনে অন্য কেহ

সুরে - তখন মাগোগণ বলছেন, মহারাজ.....

কথা - শাস্ত্রে আছে যিহুদীর রাজা প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা জন্মগ্রহণ করবেন যেদিন, সেদিন আকাশে একটি উজ্জল নক্ষত্র উদিত হবে। আমরা সেই নক্ষত্র দর্শন করে এসেছি।

সুরে - এই কথা শুনে রাজা বহির্গমন পূর্বক
আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করছে।
কে বোঝে ঈশ্বরের লীলা বুঝা নাহি যায় গো
লুকায়েছে সে নক্ষত্র, গগণের গায় গো

পদ - (বলে কোথায় তারা) এই বলিল তারা।

কথা - তখন রাজা পন্ডিত এবং ধর্মযাজকগণকে বলছে দেখ দেখি মাগোগণ যা বলছে, শাস্ত্রে সেরূপ লেখা আছে কিনা? ধর্মযাজকগণ বলছে, হ্যাঁ মহারাজ শাস্ত্রে আছে প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা জন্মগ্রহণ করবেন। রাজা মনে মনে ভাবে, তাহলে তো সে আমার শত্রু। সুতরাং সর্প শিশুকে শৈশবেই বিনাশ করতে হবে। বিষবৃক্ষ অঙ্কুরে বিনাশ না করলে পরে শাখা পত্র বিশিষ্ট মহামহীরুহে পরিণত হবে। প্রকাশ্যে বলছে - আচ্ছা তোমরা যাও। যদি তার দেখা পাও তবে আমার কাছে ফিরে এসে বলবে, আমিও তার পূজা করব।

পদ - রাজধানী হতে, বাহির হইতে
সন্মুখে দেখিল তারা
যীশু দরশনে মন্থর গমনে
পশুপাল গেল তারা

(স্থির হইল তারা) পশুশালার উপরিভাগে
প্রেমেতে বিবশ তনু গৃহ মাঝে যায় গো
যাবপাত্রে আছে শিশু দেখিবারে পায় গো
(আলো করেছে) শিশুরূপে সে গৃহ

সুরে - ঐরূপ নিদর্শন করে বলে হায়রে.....

গান - কি যে রূপ অপরূপ কি যে রূপ
এরুপ হেরিনা কভু নয়নে
যেন চঞ্চল চপলা পূর্ণ শশীকলা
তুলনা নাই ত্রিভুবণে।

পদ-ঝুলন- শুধাংশু বরণ, নন্দিত বরণ, বর্ণনাতীত বর্ণে
বিমল বিকাশে, দশদিকে ভাসে,
ঢল ঢল সে লাবণ্যে
(রূপের নাই তুলনা) ভূবন আলো করা রূপের নাই তুলনা
সুধা মুখে মধু মাখা অস্ফুট বচনে।
গঞ্জনা দেয় মধুর স্বরে মধুপ গুঞ্জনে
গুণ গুণ স্বরে, অলিকূল ঘুরে ফিরে।
মৃদু মন্দ মলয় বায়, চাকর চিকুর উড়িছে তায়
অঞ্জন যিনি শঞ্জন আখি সুললিত সুষমায়
যিনি তিনফুল নাসিকা অতুল মরি কি মাধুরী তায়
অধরে মধুর হাসি ক্ষরে সুধারাশি
নাগ বিনিন্দিত কর পাপ তাপ নাশি

পদ- (এই কিরে সে) প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা যে পাপী তাপী তুড়াইতে যার
নামে জগৎ মাতাইবে।
ঝুঝি জীবের লাগিয়া করুণা করিয়া
অবতীর্ণ এ ভুবণে ॥

পদ-ঝুলন - আবেশে অবশ তনু প্রেমেতে বিহ্বল গো
করিছে যীশুর পূজা আখি ছল ছল গো
(বলে ধর ধর) ক্ষুদ্র উপহার মোদের
কি ধন আছে তোমায় দিব।

পদ - পূজা করে মাগোগণ করিছে গমন
আচম্বিতে দৈববাণী হইল তখন।
(ও পথে যেও না) দৈববাণী ছলে বলে

অন্য পথে দেশে যাও
ও পথে প্রমাদ আছে ঃ ঝুমইর.....

কথা - দৈববাণী শ্রবণ করে মাগোগণ, অন্য পথে দেশে গমন করেছে, হেরোদ রাজা মাগোগণের বিলম্ব দেখে মনে মনে ভাবছে - মাগোগণ নিশ্চয় ছলনা করেছে। এখন কি করি? দুই বৎসরের অনধিক সকল শিশুকে হত্যা করবো। তাহলে আর কোন ভয় থাকবে না। রাজা এরূপ চিন্তা করছে, এদিকে স্বর্গীয় দূত এসে যোসেফকে বলছে :

পদ-ঝুলন - জাগো জাগো ওহে যোসেফ, কত নিদ্রা যাও হে, শিশুকে লইয়া শীঘ্র মিশরে পালাও হে (বিলম্ব করনা) যদি শিশুকে বাঁচাতে চাও।

কথা - শিশু যিশুকে বক্ষে ধারণ করে মেরী এবং যোসেফ ধীর সংকচিত ভাবে মিশরে গমন করছে এদিকে হেরোদ রাজা ক্রোধে অধীর হয়ে সেনাপতিকে বলছে:

গান - যাও যাও সৈন্যগণ, যাও হে ত্বরিতে
ঘর বান খড়সান, শিশু বিনাশিতে
পলকে পলকে যেন ঝলকে এদেশবাসী
রাজ আঙ্গা শিরে মানি, মাতৃ বক্ষ হতে আনি
নাশিবে শিশুর প্রাণ, ভীষণ অসিতে।
হেরোদের জয় রবে কর ঘোর হু হু হুঙ্কারে
হুঙ্কারে ঝঙ্কারে হোক ধরা অন্ধকার
বুক বাধিয়া পাষাণে, চাহিবেনা কারো পানে
রুধিরে বহাও নদী, শিশুর শোণিতে।

কথা - তখন শিশু যিশুকে বক্ষে ধারণ করে মেরী ও যোসেফ ধীর সঙ্কিত ভাবে মিশরে গমন করছে। এদিকে হেরোদ রাজা ক্রোধে অধীর হয়ে সেনাপতিকে বলছে, যাও সেনাপতি দু'বছরের সব শিশুকে বিনষ্ট কর গিয়ে।

সুর - রাজ আজ্ঞা পাইয়া সৈন্য করে মার মার গো.....
অকস্মাৎ গ্রামের মধ্যে ওঠে হাহাকার পদ
আজ রোল উঠেছে, এল ধনের রোল উঠেছে।

সুরে - রাজ আজ্ঞা পাইয়া যত রাজার কিঙ্কর দুগ্ধ পুষ্প শিশু সব করিল সংহার গো।

পদ - বারণ মানে না, ক্রোধে দীপ্ত রক্ত আঁখি

সুরে - মারিল যত শিশু সংখ্যা নাই তার গো
ঐ রাখাল গৃহে গিয়ে হয় অস্ত্র সার গো।

কথা - তখন সৈন্যরা বলছে রাখালী শুনিয়াছি তোমার একটি সদ্য জাত শিশু আছে, শীঘ্র শিশুটিকে এনে, রাজার আদেশে তাকে হত্যা কর। তখন রাখালী একথা শুনে পাগলিনী বেশে এসে কেঁদে কেঁদে বলছে-

গান - ও রাজা বধোনা দুখিঃনী ধনে,
তোমার পায় ধরি, বিনয় করি,
তুমি বধোনা দুখিঃনী ধনে।
আমার একটি মাত্র পুত্র বিনা
আমার আর কেউ নাই রে ॥

পদ- বারণ মানেনা, সৈন্য সকল দুর্বার
কোল হইতে আনে শিশু করিল সংহার
তখন পুত্র শোকে দুরে গেল, ক্রোধের উদয় হল ॥

গান - যিশুকে নাশিবে তুমি (এমনি মহারাজ গো) (২ বার)
রাজা তোমার মাথায় পড়বে বাঁজ
ভাব মনে মহারাজ, তুমি বটে সর্ব তেজা
আছে এ পাপের সাজা।
এমনি তোমার কাজ, রাজা কি
পাপী তাপী তড়াইতে, এসেছে এ অবনীতে
তারে তুমি নাশিতে চাও,
নাইকো মুখে লাজ ॥

কথা - এদিকে যোসেফ এবং মেরী, শিশু যিশুকে বক্ষে ধারণ করে মিশরাভিমুখে গমন করছে।

পদ - চলিতে নারে একপদ ভীত ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে শিশুটিকে বক্ষে করে ॥ অস্তাচল গমন করছে দিবাকর পথশ্রান্ত ক্লান্ত, যোসেফ আছে অন্ধকার রক্ষা করতে (চলিতে পারেনা, অন্ধকারে ব্যস্ত হল)।

সুরে - তখন কর জোড়ে বলে যোসেফ, দয়াময় ঈশ্বর-

কথা - হেন কালে একদল দস্যু সেই পথে গমন করছে। একজন আর একজনের নিকট বলছে ভাই যাত্রাটা মন্দ নয়, আমাদের শিকার জুটেছে।

পদ-ঝুলন - বিলম্বেতে কিবা কাজ সুপ্রভাত হল আজ
এখনই নাশিব দুজনে।
ধন রত্ন যত পাব, এখন হরিয়া লব
ত্বরায় যাইব নিকেতনে।
(বিলম্বে কাজ নেই) ত্বরায় সাথিব কাজ ॥

কথা - মেরী বলছে নাথ, অন্ধকারে আর তো পথ চলতে পারি না। ঐ যেন কার অস্ফুট কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। একবার ডেকে জিজ্ঞাসা করুন। যোসেফ উচ্চস্বরে বলছে, আপনারা কে? আমরা বিপন্ন পথিক একবার পথের সন্ধান বলে আমাদিগকে বাধিত করুন।

পদ - চুপে চুপে চলে আয়, বুঝি পালাইয়া যায়

কথা - যোসেফ আবার বলছে মহাশয়, আমাদের পথের সন্ধান বলে দিন।

পদ - চতুর্দিকে ঘিরে ফেল, যেন পালাইতে নাহি পারে।

কথা - তখন দস্যুদল চতুর্দিকে হতে বেষ্টন করে যোসেফের নিকটবর্তী হয়েছে, একজন আর একজনের নিকট বলছে বোধ হয় বিপন্ন পথহারা, বাটিতে নিয়ে চলো, সেখানে কাজ শেষ করবো।

সুরে - তখন যোসেফ কাতর ভাবে বলছে, ভাইসব আমরা অতি দীন দরিদ্র তথাপি যা কিছু আছে স্বর্বস্ব তোমাদিগকে অর্পণ করছি।

কথা - দস্যু দল বলছে, পথিক তোমাদের কোন ভয় নেই, আমরা দস্যু নই তোমরা অন্ধকারে নির্দিষ্ট পথে যেতে পারবে না, সুতরাং এখন আমাদের বাটিতে বিশ্রাম কর, কল্য প্রত্যুষে মিশরাভিমুখে গমন করবে। যোসেফ ভাবছে এখন ইহাদের কথায়ই আমরা সম্মত হওয়া উচিত। তাহাদের আকারে প্রকারে দস্যু বলেই মনে হয়, ঈশ্বরের ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হবে। এ বলে দস্যুদের বাটিতে গমন করছে। দস্যুদল মনে মনে ভাবছে-

সুরে - দস্যু ভাবে তিনজন প্রাণেতে মারিয়া
ধনরত্ন যাহা আছে, লইব হরিয়া,

পদ - প্রাণেতে মারিব, শিশুর সহিতে।

কথা - দস্যু দলের মধ্যে ডিমাচ নামে এক ব্যক্তি বলছে-

পদ - আমি তোমাদের পায়ে ধরি, কর জোড়ে বিনয় করি অতিথিদের মেরনা পরাণে ॥
সদ্যজাত শিশু সাথে বিপদে পড়েছে পথে, অভ্যাগত মম নিকেতনে (প্রাণে মেরনা) বিপন্ন পথিকে।

কথা - তখন দস্যুদল বলছে, কিরে, তোর মাথা খারাপ হয়েছে? নিশ্চয়ই উহাদের প্রাণে মারিব।

সুরে - তখন ডিমাচ কেঁদে বলে-

পদ-ঝুলন - আমায় মার আমায় মার, তোমাদের পায়ে ধরি, বিনয় করি,
দুঃখে বক্ষ ফেটে যায়
শিশুর বদন দেখিয়ে, তোদের মারতে দিবনা
আমার এ দেহে জীবন থাকতে, আমার যায় যাবে জীবন যাবে ॥

কথা - ডিমাচের কথা শুনে, অন্যান্য দস্যুরা বলছে সত্যি বালকের মুখ দর্শন করে প্রাণে অর্ণিবচনীয় আনন্দের উদয় হয়, কত লোক মেরেছি কিন্তু কই কখনও এমন ভাব হয়নি। থাক, ওদেরকে মেরে দরকার নেই, চল, মিশর পর্যন্ত সঙ্গে করে দিয়ে আসি।

পদ-ঝুলন - যীশুকে লইয়া যোসেফ মিশরে রহিল, দিনে দিনে বাড়ে যীশু, যেন চন্দ্র কলা। (তার জ্ঞানের গরিমায়) চমৎকৃত মিশরবাসি।

কথা - এদিকে হেরোদ রাজার মৃত্যু সময় উপস্থিত। যন্ত্রনায় হেরোদের প্রাণ অস্থির হয়েছে। হেরোদ যে দিকে দৃষ্টি করছে যেন সেই দিকেই প্রলয় নরকাগ্নি দাউ দাউ করে তাকে গ্রাস করতে আসছে।

সুরে - তাই হেরোদ কেঁদে কেঁদে বলছে-

গান - আজ জগৎ জুড়িয়া নরকের আগুন (জ্বলছে ধূ ধূ ধূ) (৩ বার)
জীবন ভরিয়ে ধর্ম করিনি পাপ করেছি শুধু। আজ-------
আজ আসমান জমিনে, নরকের আগুন (জ্বলছে ধূ ধূ ধূ) (৩ বার)
যীশুকে মারিতে শিশুকে মেরেছি, গায়ের জোড়ে শুধু। আজ-
ভাবি নাই তখন নরকের আগুন (জ্বলছে ধূ ধূ ধূ) (৩ বার)

সুরে - ভীষণ গহ্বরে, ঘোর অন্ধকার, ভীষণ অনল শিখা

পদ-ঝুলন - আমার ভাই ভগিনী যত, সেনা অগণিত
পাই না কাহার দেখা
(জ্বলে মরলেম) ভীষণ নরকাগুনে, আমার কেহ নাই
আজ অন্তিম কালে।

গান - উহু জ্বলে মরি জ্বলে মরি সহিতে না পারি
কোথা হে দয়াময় দয়া কর
পশিতে যীশুর প্রাণ বধেছি শিশুর প্রাণ
তাই তার প্রতিদান ভয়ঙ্কর
হায় হায় একি হেরি চতুর্দিকে অগ্নিময় ভীষণ
অনল তাপে বুঝি প্রাণ যায় যায়
তুমি যে ঈশ্বরেরর দূত, তখন বুঝিনি হায় আজ
নিরুপায় রাখ পায় করুণা কর ॥

পদ-ঝুলন - মরিল হেরোদ রাজা যন্ত্রণা পাইয়া
স্বর্গদূত মিশরেতে উপনীত গিয়া।
(বলে স্বদেশে গমন কর) যিশুকে লইয়া শীঘ্র
(বিলম্ব করনা) মরেছে হেরোদ রাজা

পদ-ঝুলন - শিশুটিকে বক্ষে করি, ধীরে ধীরে যায় মেরী
উপনীত নাজারেথ নগরে
নাজারেথবাসী যত, সকলে প্রীত হইল
শিশু যীশু দর্শন করে।
(বলে ভাল তো ছিল হে) মিশর দেশে গিয়ে
ঈশ্বরের করুণা তাই, শিশুর জীবন রক্ষা পায়॥

কথা - এদিকে দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় যীশু পিতা-মাতার সহিত জেরুজালেমে গমন করলেন। নিস্তার পর্বের শেষে যোসেফ এবং মারিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হলেন। কিন্তু যীশু জেরুজালেমে থাকলেন। তিন দিনের পথ এসে দেখলেন যীশু তাদের সঙ্গে নেই।

সুরে - তখন মেরী যীশুকে না দেখিয়া

পদ-ঝুলন - আকুলা হইলা মেরী, দুনয়নে বহে বারি
হা হা কারে পড়িয়া ভূতলে
মনি হারা যেন ফনী হইলেন পাগলিনী
ভাসে সতী নয়নের জলে
(বলে যীশু কই যীশু কই) বল নাথ ত্বরা করে
হায় হায় একি হল, আমার কপাল বুঝি ভেঙ্গে গেল।

দশকোষী - বাচা তুই বিহনে, কাজ কি প্রাণে, জীবন ত্যাজিব
জীবনে দেখা দেরে, একবার অভাগিণী বলে
একবার মা, মা বলে আয়রে কোলে।

লোভা - ওরে একবার আয়রে যাদু আয়রে কোলে।
একবার চাঁদ মুখে ডাক মা, মা, বলে॥

পদ-ঝুলন - তখন পাগলিনীার মত ধায়, ইতিউতি ফিরে চায়
জেরুজালেমে উপনীত
দেখে আসি কি আশ্চার্য্য নিয়ে যত ধর্মাচার্য্য
আছে যীশু তাদের সহিত
(বলে কোলে আয়) কোলে আয় অভাগিনীর বাছা
তোরে খুঁজে খুঁজে হলেম সারা। ঝুমাইর.....

কথা - তখন যিশু বলছে মাগো কেন আমায় খুঁজছিলে?

পদ/সুরে - মাগো, এই অনিত্য সংসার কহে নয় কার
মায়ার বিকার মাত্র, এই ভব নাট্যালয়
করে অভিনয়, কেহ পিতা, কেহ পুত্র।

(কেউ কারো নয়) পিতামাতা পখের পরিচয়
পিতা সেই জগৎ পিতা, আমি তার কাছে রয়েছি হেথা

কথা - ধর্ম্মাচার্যগণ বলছে কি আশ্চার্য অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের শাস্ত্র জ্ঞান দেখলে বিমোহিত হতে হয়

সুরে - তখন ধর্মাচার্যগণ মেরীকে সম্বোধন করে বলছে-

পদ-ঝুলন - ধন্যা ধন্যা মেরী তুমি এ ভুবনে
শুভক্ষণে প্রসবিলে এ হেন রতনে
(ধন্য ধন্য মেরী তুমি) ধন্য যীশুর জন্ম ভূমি

কথা - তখন যীশু পিতা মাতার সহিত নাজারেথ নগরে অজ্ঞাত ভাবে বাস করতে লাগলেন এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হতে লাগলেন। যীশুর ত্রিশ বৎসর বয়ক্রম কালে জর্দান নদীর তীরে যোহন ধর্মপ্রচার করতে লাগলেন।

গান - একান্ত প্রশান্ত মনে, ভাব যে দিন তার নে।
কেন ভ্রান্ত হয়ে বসে আছ দিন গেল অকারণে
(কি আশায় ভুলেছ বল, সময় থাকতে সামলে চল স্বর্গরাজ্য নিকটে এল)
এবার ভক্তি ভরে ডাক তারে স্থান পাবে তার চরণে
আতুর তাপিত পাতকী যত, অন্ধ খঞ্জ আদি সন্তাপিত চিত
পতিত পাতকী তাড়িতে ত্বরিত, পাঠাইয়াছেন তার নন্দন
সুসময় এসেছে বড়, মন পরিবর্তন কর তোমার
দয়া করব পরমেশ্বর।

কথা - যিহুদীরা বহু সংখ্যক লোক যোহনের নিকট বাপ্তাইজ হলেন এবং করজোড়ে বললেন: প্রভু আপনি কি সেই প্রতিশ্রুত ত্রাণ কর্তা?

সুরে - তখন যোহন বললেন -

পদ-ঝুলন - আমার পশ্চাতে আসিবেন তিনি,
সর্বশক্তিমান যিনি।

কথা - কিছুদিন পর বাপ্তাইজ হবার জন্য যিশু যর্দ্দান নদীতে যোহনের নিকট উপস্থিত হইয়ে বলছে। প্রভু হে, আমায় বাপ্তাইজ করুন। যোহন বলছে, বালক একবার সম্মুখে দাঁড়াও আমি নয়ন ভরে তোমার ঐ অপরূপ রূপ দর্শন করি।

সুরে - তখন যোহন যিশুর রূপ দর্শন করে বলছেন-

পদ-ঝুলন - কি যে বিশাল বক্ষ, প্রশান্ত ললাট বঙ্কিম যুগল নেত্র
মহাত্মা লক্ষণ করি, দর্শণ তুমি কি প্রেরিত পুত্র?
(বল কেন বা ছলিতে এলে) তোমায় চিনেছি হে রূপ দেখিয়ে

কথা - যীশু বলছেন, আমি যোসেফের পুত্র নাম যীশু। তখন যোহন বলছেন, আমি তোমায় চিনেছি।

সুরে - তোমায় রূপ দেখিয়ে চিনেছিড়

পদ - (দেওনা কেন) তোমার চরণ আমার হৃদয় মাঝে!
তুমি কর না ছলনা, করনা বঞ্চনা, বৃথা ভুলাইও না ছলে
তুমি পাতকী তুরিতে মেরীর গর্ভেতে অবতীর্ণ ভূমন্ডলে
(ধরায় এসেছ) আমায় ধরা দিবে বলে,
তুমি কি শক্তি দিয়েছ আমায়, বাপ্তাইজ করিব তোমায়
(আমায় বাপ্তাইজ কর) তুমি, করলে দয়া করতে পার।

কথা - যীশু বললেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করুন আপনার নিকট আমার বাপ্তাইজ হওয়াই ঈশ্বরের ইচ্ছা। যোহন বলছে, আচ্ছা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায় হয়, তবে এস এ যর্দ্দান নদীর জলে তোমাকে বাপ্তাইজ করি-

দশকোষী - তুমি এস এই নদীর নীর, বাপ্তাইজ করি তোমারে হে,
ধন্য আমি ধন্য, নরকূলে তোমাকে বাপ্তাইজ করে হে

লোভা - ওগো যখন প্রাণ পাখি যাবে উড়ে
তখন দেখা দিও কৃপা করে ॥

পদ-ঝুলন - জল হতে উঠি প্রভু প্রার্থনা করিল
কপোত রূপে পবিত্রাত্মা অধিষ্ঠান হল
নব নভোমন্ডল উন্মুক্ত হল তখনি
অকস্মাৎ আকাশেতে হল দৈববাণী।
বলে আমায় প্রীত, নয় ইনি ছাড়া আর কেহ নয়
তার পাপ তাপের ভয় করনা, এ যারে করে করুণা।

যিশুর কর্মজীবন আরম্ভ

কথা - প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে যীশুর কর্ম জীবন আরম্ভ হয়। দ্বাদশ জন শিষ্য মনোনীত করে ধর্ম প্রচার করতে লাগলেন এবং কানান নগরে প্রথম অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করলেন-

পদ-ঝুলন - শিষ্যগণ লয়ে সঙ্গে, যায় যিশু মনোরঙ্গে
কান্না নগরেতে উপনীত
হবে শুভ পরিণয় নিমন্ত্রিত জনতায়
মিলে যীশু মেরীর সহিত

(অভাব হয়েছে) দ্রাক্ষারসের
আর উপায় নাই হে, দ্রাক্ষারস বিহনেতেঃ ঝুমইর.....

কথা - মেরী বলছে বাছা ওদের দ্রাক্ষারসের অভাব হয়েছে।

সুরে - তখন যিশু বলছেন, মাগো-

পদ - (সময় হয় নাই) এখনও জননী আমার
মাতৃ আজ্ঞা শিরধার্য্য, সাবিধ উহাদের কার্য্য

কথা - যিশু লোকদিগকে বললেন, তোমরা ছয়টি পাত্র জলে পূর্ণ কর, তৎপর ভোজাধ্যক্ষের নিকট নিয়ে যাও। বরযাত্রীগণ ছয়টি পাত্র পূর্ণ করে ভোজাধ্যক্ষের নিকট দিয়েছে। ভোজাধ্যক্ষ সে জল পান করে বলছে-

সুরে - এমন পবিত্র সুধা, খেলে দূরে যায় ক্ষুধা
(কোথা ছিল) কে আনিল, এমন উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষারস

কথা - তখন উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে বিশ্বাস করে করজোড়ে ভক্তি ভরে বলছে-

সুরে - ঈশ্বরের পুত্র তুমি জেনেছি নিশ্চয়
নইলে কি পাত্রের জল দ্রাক্ষারস হয়।

পদ - (দয়া কর হে) এই অধম পাতকী গণে
অন্ধতে নয়ন পেল, রোগী রোগ মুক্ত হল
মৃত ব্যক্তি লভিল জীবন গো।
(আমার যীশুর দয়ায়)
সত্য ধর্ম প্রচারিয়া জীবকে প্রাণ শিক্ষা দিয়া
ধর্মরাজ্য করিল স্থাপন গো ---
প্রেম বন্যায় বাসাইল জেরুজালেম বাসীগণে
সত্য ধর্ম প্রচারিয়া ॥

কথা - যিশুর প্রভাব দর্শণে মহাযাজক এবং ফরিসীগণের হৃদয় হিংসায় দগ্ধ হতে লাগল। তখন একজন ফরিসি আর এক জনের কাছে বলতে আছে -

সুরে - যিশু না জানি কি যাদু জানে
কে জানে কি ছলে ভুলায় সকলকে,
মুক্ত করে রোগী গণে।

পদ - (এখন মহাযাজক কেউ মানে না)
সকলে যিশুকে মানে
কেউ বা মানে সর্ব জীবগণকে
ধনী মানী বাছে না রে, যারে তারে করে দয়া।

লাজারের জীবন লাভ

কথা - জেরুজালেমের নিকটবর্তী বৈথনিয়া নগরে লাজার নামে যীশুর একজন বন্ধু ছিল। সে পীড়িত হওয়ায় তার ভগনীর নিকট প্রভুর কাছে সংবাদ দিলেন - প্রভু আপনি যাকে স্নেহ করেন আপনার দাসানুদাস সেই লাজার পীড়িত। কিন্তু যীশু এ সংবাদ পাইয়াও দু'দিন তথায় রইলেন। এদিকে লাজারের মৃত্যু সময় উপস্থিত।

সুরে - লাজার কাতর ভাবে মার্থা ও মেরীর নিকট বলছে-

পদ - কই কই, কই প্রভু এল কই, আর তো হল না দেখা।
ছিল বড় সাধ মনে, হেরিব নয়নে, চরণে মম সখা
(দেখা হল নারে) আমার মনের আশা মনে রইল

দশকোষী - আমার এই ছিল কি ভাগ্যে লেখা
অন্তিম কালে পেলেম না দেখা হে
অপরাধ করেছি কত, আমায় বিদায় কর হে
জনমের মত।

খয়রা - জনমের তরে শেষ দেখা করে চল্লেম সব ছেড়ে হইয়ে বিদায়
এই দেখা শেষ দেখা, আর হবে না দেখা
যেন অন্তিম সখা, রাখে রাঙ্গা পায়।
দু'দিনের তরে আসিয়ে সংসারে ভাসিয়ে ছিলেম
প্রেম সিন্ধু নীড়ে, এসে ছিলেম একা, চলে গেলেম একা
দেখা হবে না, এ জীবনে তোদের সনে
সকল ফুরালো আমার ভবের খেলা সাঙ্গ হল
আমার না পুড়িতে সাধ ঘটিল বিষাদ
বিধি এসে বাধ সাধিল।
তোমরা দিয়ে মন প্রাণ গাও যীশুর নাম
নামের সঙ্গে যেন প্রাণ চলে যায়।

লোভা - ওগো তোমরা এই করিও অন্তিম কালে
যীশুর নাম শুধাইয়া কর্ণমূলে ॥
পরকালে বান্ধব হয়ে ॥

পদ-ঝুলন - বলিতে বলিতে অবশ অঙ্গ পড়িল ধরনী তলে
হাহাকার করি মার্থা আর মেরী ধরিয়া তুলিল কোলে
(বলে কোথায় যাও) দাদা সোনার সংসার আধার করে
বিষাদিত, সব ক্রন্দনের স্বর উঠিল গগণ ভেদী
ধর্মাচার্য্য যত শাস্ত্র প্রথামত করিল তার সমাধী
(সাঙ্গ হল) লাজারের ভবের খেলা আজ।

কথা - তখন যীশু শিষ্যগণের নিকট বলছে, আমার প্রিয় বন্ধু লাজার নিদ্রিত বোধ হয়। এ জীবনে তার এ নিদ্রার আর অবসান হবে না। কাল আমি জাগাতে বৈথনিয়া গ্রামে যাচ্ছি।

পদ-ঝুলন - শিষ্যগণ সনে মন্থর গমনে উপনীত বৈথনিয়া
যীশুকে দেখিয়া চরণ ধরিয়া কান্দে মার্থা বিলাপিয়া
(আমার ভাই নাই) জনমের মত ছেড়ে গেছে,
আর কি দেখিতে এলে প্রভু?

কথা - যিশু বললেন, মার্থা ক্রন্দন করনা, ঈশ্বরকে বিশ্বাস কর - যিনি পলকে প্রলয় করতে পারেন তিনি মৃত্যুকেও জীবিত করতে সক্ষম। মার্থা বলছে প্রভু আমি বিশ্বাস করি আপনি ঈশ্বরের পুত্র আপনি এস্থানে থাকলে আমরা ভ্রাতৃ হারা হতেম না। যীশু বলছে মার্থা তোমার ভ্রাতা পুনঃ জীবন প্রাপ্ত হবে। আবার এসে তোমাকে ভগ্নি বলে সম্বোধন করবেন। মার্থা বলছে প্রভু -

পদ-ঝুলন - আর কি আসিবে ভাই
সে বিনে আমার সব অন্ধকার
এ জগতে কেহ নাই
আর কি ফিরে পাইব তারে
আমার সুখের বাজার ভেঙ্গে গেছে
আর কি আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া
আনন্দে ভাসাবে মোরে
আমার কবে বা হবে এমন দিন। ঝুমইর.....

কথা - যিশু বললেন, মার্থা জগতে আমিই পুনরুত্থান এবং আমিই জীবের জীবন। যে আমাতে বিশ্বাস করে সে মৃত হইলেও জীবিত। আর জীবিত থাকলে অমর।

পদ - (ও তার মরণ নাই হে) যে আমাকে বিশ্বাস করে, ইহকালে পরকালে)

কথা - মার্থা তার ভগ্নি মাগাদেলেনা
মারিয়াকে বলছে, ভগ্নি প্রভু এসেছেন,
তোমাকে ডাকছে মাগাদেলেনা-

পদ-ঝুলন - আলু আলু পাগলিনী আসিল ছুটিয়া
যীশুর চরণ তলে পড়িয়া লুটিয়া
(বলে এসেছে এসেছে) এতদিন পর প্রভু
মনে কি পড়েছে, এ অভাগিনীদের কথা ॥

সুরে - তোমার চরণে স্মরণ নিলেম কর করুণা
কর করুণা প্রভু কর করুণা
তুমি প্রভু জীবের জীবন, তোমার ইচ্ছায় জনম মরণ
দান কর মম ভ্রাতার জীবন, নির্দয় হয়ো না।
যে তোমায় সঁপেছে জীবন, তার যদি আজ যায় হে জীবন
তোমার নামে কলঙ্ক হবে, ঐ নাম কেউ লবে না ॥

কথা - যিশু বললেন তোমরা রোদন সম্বরণ কর আজ ঈশ্বরের মহিমা প্রত্যক্ষ দেখতে পারবে। লাজারের সমাধির নিকট আমায় নিয়ে চলো, তখন মার্থা এবং মাগদালেনা মারিয়া নয়নের জলে ভাসতে ভাসতে সমাধির নিকট চলছে -

পদ-ঝুলন - ধীরে ধীরে যায় ফিরে ফিরে চায়
চলিতে চলে না চরণ, নয়ণ জলে ভেসে যায়
বলে এলে প্রভু কি দেখিতে-
চারিদিন শব সমাধিতে
কৃমি কীট হয়েছে, তাতে গলিত দুর্গন্ধ হয়
প্রাণ যার মূরতি আঁকা, প্রস্তরে রয়েছে ঢাকা
আর কি ফিরে পাব দেখা,
বল প্রভু ধরি পায় ॥

সুরে - ঊর্ধ্বে চাহিয়া, দু'হাত তুলিয়া বলিছে
ঈশ্বর সূত, বলে তোমার করুণা কর হে
এবার কোথা হে পরম পিতা।
আজ করুণা কর হে, তোমার অকৃতি সন্ধান বলে।

পদ-ঝুলন - গিয়ে সমাধির দ্বারে, ডাকে উচ্চস্বরে
লাজার এস বাহিরে।
মম আদেশেতে সমাধি হতে
বাহির হও সত্তর।
(বাহিরে এস), আমার আদেশে লাজার
আর কান্দিও না।
আমার আদেশ পালন কর।
তোমার অভয় বন্ধুগণে।

পদ-ঝুলন - যিশুর আদেশে লাজার বাহিরে আসিল
সর্বাঙ্গ বসনাবৃত কেহ না চিনিল
(চেনা যায় না) সর্বাঙ্গে বসনে ঢাকা
যিশু বলে শিষ্যগণ, কার পানে চাও হে
শীঘ্র করে লাজারের বন্ধন খুলাও হে
বন্ধন খুলিয়া সবে চিনিল তাহারে
আনন্দে বিভোর হয়ে চরণেতে পড়ে
তোমার দয়ায় সীমা নেই দয়ালের শিরমণি
(ধরায় এসেছে) পাপী তাপী ত্বরাইতে
তুমি মৃত্যু দেহে প্রাণ দিতে।

যাতনাভোগ আরম্ভ

কথা - উপস্থিত লোকদের কেহ কেহ যীশুকে বিশ্বাস করল আর কেহ কেহ ফরিসীদের নিকট গিয়ে যীশুর এ সব অলৌকিক কার্যের সংবাদ দিল, তখন একজন লোক বলছে ভাই আমার মনে হয়, যীশু ঈশ্বরের নন্দন হবে, নতুবা এমন অসম্ভব কার্য মানুষের দ্বারা সম্ভব না, ফরিশী বলছে, বল কি কতগুলো ভেলকি দেখে তুমি তাকে বিশ্বাস কর।

সুরে - তখন যিহুদী বলছে ভাই-------
নিশ্চয় হবে যীশু ঈশ্বরের নন্দন। নইলে
কেমন করে দিল অন্ধের নয়ন ॥

কথা - ফরিশী বলছে তুমি এ দেখে ভুলছ।

পদ - সে ঔষধ জানে, চোখে ছানি পড়ার

কথা - তখন যিহুদী বলছে -

সুরে - যিশুর মত আর এমন কে আছে।
যাহার করুণা বলে মরা মানুষ বাঁচে।

কথা - ফরাসী বলছে মরা মানুষ বেঁচেছে।

পদ - তোমায় ভেলকি দিয়েছে
মন্ত্র গুণে, অনেকে জানে,
ভেলকি ভোগবাজি।

কথা - যিহুদী বলছে -

পদ - সেতো ভেলকি দেয় নাই, চুন কালি দিয়াছে
তোমাদের মুখে।

কথা - তখন ফরিসি ধর্মযাজকগণ, ক্রোধান্বিত হয়ে বলছে।

পদ-ঝুলন - এ বেটা লক্ষী ছাড়া, এদেশ না হলে ছাড়া
আমাদেরই নাহি থাকে মান।
পাপ হবে ক্ষতি নাই, অথবা নরকে যাই
নিশ্চয়ই বধিব উহার প্রাণ,
(প্রাণে মারিব) পরম শত্রু, যাই যাব নরকে যাব

কথা - ধর্মযাজকগণ যিশুকে বিনাশ করবার জন্য কৃত সংকল্প হয়ে, তাকে অন্বেষণ করতে লাগল।

পদ - (খুঁজে পায় না) যিশু কোথা থেকে কোথা যায়,
(ঘোষনা করিল) নগরে নগরে, পুরস্কার পাইবে
যীশুকে ধরিয়ে দিলে, পুরস্কার পাইবে

কথা - একদিন যুদার নামক যিশুর একজন শিষ্যের নিকট শয়তান এসে বলছে। বলি, ঘোষনা কিছু শুনেছো, যীশুকে ধরিয়ে দিলে পুরস্কার পাবে। যুদাস বলছে কি বললে পুরস্কার?

পদ - (চাই না পুরস্কার) কর তিরস্কার
পুরস্কারে কিবা প্রয়োজন, আমি পুরস্কার চাই না
তিরস্কার কর তবু।

কথা - কি বললে পুরস্কার চাও না, তুমি পাগল নাকি। ধনের গৌরব বোঝ না। তখন, যুদাস মনে মনে ভাবছে তাই তো ধন না হলে জগতে তার আদর নাই। আচ্ছা তুমি কত অর্থ দিবে? পাঁচটি মুদ্রা পাবে।

পদ - (পাঁচে হবে না) তাকে পাঁচ জনে ভাল বলে।

কথা - আচ্ছা সাতটি মুদ্রা পাবে।

পদ - সাতেও হবে না।
এমন সৎ লোককে বিনাশ করা,

কথা - অষ্ট মুদ্রা পাবে।

পদ - অষ্টেও হবে না, যিশুকে কষ্ট দেওয়া
অষ্টে হবে না

কথা - তবে দশ মুদ্রা দিব।

পদ - দশেও হবে না, বিনা দোষে বিনাশ করা
দশে হবে না।

কথা - তবে বিশ মুদ্রা দিব-

পদ - বিশেও হবে না, বিশের বিষে মিশে যাবে।
বিশে হবে না

কথা - তবে ত্রিশ মুদ্রা পাবে, ভেবে দেখো, সহজ কথা নয়। তখন যুদাস মনে মনে চিন্তা করছে। তাই তো ত্রিশ মুদ্রা। আচ্ছা যাও তোমরা প্রস্তুত থাকো, আমি উপযুক্ত সময় তোমাদের সংবাদ দেব।

সুরে - যুদাস বলিল, যবে এসব বয়ন, অন্তরে যীশু জানিল সব দুর্ঘটনা।

পদ - (আমায় যেতে হবে) পরম পিতার কাছে

কথা - মৃত্যুর পূর্ব রাত্রিতে পাস্কা ভোজন কালে পবিত্র সাক্রামেন্ত সংস্থাপিত করে তার আরাধ্য হস্তের রোটিকা গ্রহণ করে আশির্বাদ পূর্বক শিষ্যদের মধ্যে বিভাগ করতে করতে বলতে লাগলেন।

পদ - (গ্রহণ কর) আমার শরীর ইহা, ভোজন কর অরাধ্য গুরুর দেহ।

কথা - সান্ধ্য ভোজনের পর যীশু পানপাত্র লইয়া শিষ্যগণকে বললেন।

পদ - রক্তের পাত্র ধর ধর, সনাতন নিয়মের পাত্র
বিশ্বাসের রহস্য।

কথা - শিষ্যগণ বলছে প্রভু একি বলেন, ইহা আপনার রক্তের পাত্র, তাই আমরা গ্রহণ করবো। আমরা তো ইহার কিছুই বুঝতে পারছি না। যীশু বললেন, বুঝবে। স্বর্গরাজ্য নিকটে, অতঃপর পবিত্র রুটিকা সংস্থাপনের পর যীশু শিষ্যগণের সাথে জৈতুন পর্বতে গমন

করলেন এবং কতিপয় শিষ্যগণের সঙ্গে গেৎসীমানী নামক উদ্যানে প্রবেশ করলেন এবং কাতর স্বরে বলতে লাগলেন।

দশকোষী - পিতঃ আমার ত্রাণ কর হে, আমার দুঃখে জীবন
বাহির হল গো।
আমার এ জ্বালা আর সইতে নারি গো
আমায় ত্রাণ কর হে।।
আমায় স্থান দাও, তোমার শ্রীচরণে।

পদ-ঝুলন- যিশুর রক্ত বিন্দু যত ঘর্মে পরিণত
বিন্দু বিন্দু ঝরে যায় গো।
ঝরে নয়নের জল শরীর দুর্বল
ঢলিয়া পরে ধরায় গো।
(ঢলে পড়িল) শরীর দূর্বল হয়ে মর্মান্তিক দুঃখে।
প্রভুর দেহে শক্তি নাই, মাটিতে লুটায় প্রভু ॥

পদ - স্বর্গ হতে দূত তখন ধরায় আসিল।
পরসিয়া যিশুর দেহ, সবল করিল।
বলে, (কেন্দনা কেন্দনা) তোমার কান্না দেখে বুক ফেটে যায়
(চল চল) তোমার কার্য সাঙ্গ হল
স্বর্গের সিংহাসনে-

কথা - প্রার্থনা শেষ করে যীশু শিষ্যগণকে বলছে আশির্বাদ করি, তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হও, চল এ মর জগতের কার্য আমার শেষ বোধ হয়, শীঘ্রই পরম পিতার কাছে আমাকে যেতে হবে। যে আমাকে শত্রু হস্তে সমর্পণ করবে ঐ দেখ, সে আসছে।

পদ - (আর বেশী বাকি নাই)
আমায় শত্রু হস্তে যেতে হবে
তোমরা কাতর হইও না, আমার দুঃখ দেখে

কথা - এদিকে যুদাস বহু সংখ্যক সৈন্য এবং ভৃত্য সঙ্গে যীশুর কিয়ৎদুরে উপস্থিত রয়েছে। যুদাস বলছে দেখ আমি যাহাকে চুম্বন করবো তোমরা তাকেই বন্ধন করবে। জানবে সেই যীশু এ বলে যুদাস অগ্রে যীশুর নিকট উপস্থিত হয়েছে, তাকে দেখে-যীশু বলছেন -

পদ - (এসেছো এসেছো) মিত্র তুমি,
আমায় স্বর্গের পথ দেখাতে।

কথা - যুদাস বলছে, গুরু প্রণাম

সুরে - তখন যীশু বলছে - যুদাস হে

পদ - তোমায় আশির্বাদ করি,
সুখে থাক সুখে থাক, তুমি বড় অবোধ ছেলে
কি কর তা জান না হে
তুমি বড় অবোধ ছেলে

কথা - তখন যুদাস যিশুকে চুম্বন করলো এবং যীশু তাকে বলছে-

পদ - আমায় শত্রু হস্তে দিতে চাও, চুম্বন করে।

পদ - তখন যীশু সৈন্যদিগের নিকট অগ্রসর হয়ে বলছে।

পদ - কাকে অন্বেষণ কর, এত কষ্ট কেন কর
কার তরে এতো কষ্ট।

কথা - সৈন্যগণ বলছে, নাজারেথ যিশুর

পদ - ধর ধর আমায় ধর, আমিই সেই যিশু
আমাকে বন্ধন কর।

সুরে - এই কথা শুনে সৈন্য, আঁখি তুলে চায় গো, জ্বলন্ত অনল সম,
দেখিবার পায় গো

পদ - যীশুর অঙ্গে অনল ধারা, দাউ দাউ করে জ্বলছে

সুরে - তাই দেখে সৈন্যগণ ভয় ভীত হয়ে-

পদ - কাঁপিতে লাগিলো, ভয়ে ভীত হয়ে,
অমনি সৈন্য ধরায় পড়িলঃ ঝুমইর--------

কথা - যীশু তাদের নিকট অগ্রসর হয়ে বলছে

পদ - কাকে চাও কাকে চাও, কাকে অন্বেষণ কর।

কথা - সৈন্যগণ বলছে নাজারেথের যিশুকে চাই। তখন যিশু বলছে।

পদ - আমিই সেই যিশু হই,
আমি যীশু ছাড়া আর কেহ নই।
কেন এত ভয় কর, আমাকে বন্ধন কর
সকলকে যেতে দাও, আমাকে বন্ধন কর ॥

দশকোষী - যীশুকে ধরিল, হায় হায় একি হল গো
আজ রাহুতে চাঁদ গ্রাস করিল,
এ জগৎ আঁধার হল ॥

পদ-ঝুলন - তখন খড়্গ নিয়ে করে অতি ক্রোধ ভরে
পিতর আসিল তথা
বলে প্রভুর অঙ্গ করিলে পরশ
এখনি কাটিব মাথা
আজ প্রলয় হবে, আমার প্রভুর অঙ্গ পরশিলে
আজ রুধীরে বহাব নদী, নদী করে দেব।
ক্ষমা করব না, আজ মহা প্রলয় করে দেব
আমি যাই যাব নরকে যাব ॥

সুরে - বিপক্ষে যে কবে কথা, লাঠিতে ভাঙ্গিবো মাথা
উড়াব গগণে ধোপা তুলার গোসর

পদ - পদ ভরে টলাইব, পৃথি রসাতলে দিব
হুঙ্কারে নিশুদ্ধ আজি করিব অমরণ গো
ভৃত্যগণ সনে, রণে বিনা শিখা সৈন্যগণে
পদাতি সৈন্যগুলি নাশিব ভ্রুভঙ্গে
অস্থি মজ্জা করি গুড়া ভাঙ্গিব পর্বত চূড়া
তরঙ্গ মাঝে খেলাইব রঙ্গে

সুরে - ক্রোধেতে কম্পিত পিতর আখি রক্তবর্ণ
ক্রোধ ভরে মালেখের কাটে দক্ষিণ কর্ণ

পদ - রক্তে অঙ্গ ভেসে যায়, মালেখের গন্ড বাহিয়ে তার

কথা - পিতর কর কি, কর কি, কর কি তোমরা,

পদ- করে বা কি, ওরা তোমার করে বাকি
(কাছে আয় কাছে আয়) মালেখ আমার
তোর দুঃখে বক্ষ ফেটে যায় ॥

সুরে - মালের দক্ষিণ কর্ণ, পরশ করিল
যেমন আছিল কর্ণ, তেমন হইল।

পদ - কর্ণে আর ব্যাথা নাই, যীশুর দয়ার গুণে
এমন দয়াল আর কি আছে
যীশু শত্রুকে করিয়াছেন দয়া।

সুরে - শিষ্যগণ বলছে - আজ ঘটিল কি জ্বালা। যিশুকে বান্ধিয়া নিল,
আমরা সবে পালা।

পদ - ঐ দেখ বন্ধন করেছে
যার নামে ভব বন্ধন ঘো'চে।
পালাইয়া চল, সবে।

কথা - শিষ্যগণ তাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করছে, কেবল পেত্র ও (যোহন) দূরে দূরে তার অনুসন্ধান করতে লাগল। অতঃপর সৈন্যগণ যীশুকে বন্ধন করে মহাযাজক কাইফাসের নিকট নিয়ে গেল। যিহুদীদের জাতীয় মহাসভায় যাবতীয় সদস্য একত্রিত হয়ে যীশুর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্যের অনুসন্ধান করল। তখন অনেক লোকেই যীশুর বিরুদ্ধে বলতে ইচ্ছা করল, কিন্তু-

পদ - বলিতে পারে না, কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে
বলি বলি ইচ্ছা করে, বলিতে পারে না।

কথা - কাইফাস বলছেন তোমার জীবন্ত ঈশ্বরকে দিব্য বলে দেখ, তুমি ঈশ্বরের পুত্র খ্রিস্ট কিনা সত্য বল

পদ - আমি কি বলিব সত্য, তুমিই বলেছ সত্য, তখন সকলেই বলে সত্য। আমায় ঈশ্বরের পুত্র বলে।

কথা - তখন কাইফাস নিজের বস্ত্র ছিড়ে বলল তুমি ঈশ্বরের নিন্দা করেছ।

পদ - আমি নিন্দা স্তুতি নাহি জানি
আমায় যা বল তাই বলি।

কথা - কাইফাস বলছে, তুমি দন্ডযোগ্য

পদ - হতে পারি দন্ডযোগ্য, তোমার বিচারে।

কথা - কাইফাস বলছে, যিশু ক্ষতি নাহি তায়
একদিন সুবিচার হবে, সেই পরম পিতার আলয়।

যুদাসের বিলাপ

কথা - এদিকে যুদাস যিশুকে শত্রু হস্তে সমর্পণ করে তার আত্মগ্লানী হয়েছে, তখন মনে মনে ভাবছে, হায় এমন মহাপুরুষকে শত্রু হস্তে সমর্পণ করলেন।

পদ - হায় হায় আমি কি করেলেম হে।
যীশুর প্রাণ নাশিয়ে
ওগো আমি কি করেলেম
(ধনের লোভে) ওগো আমায় নরকেতে যেতে হবে।
জগতে আর স্থান পাব না।

কথা - তখন যুদাস মহাযাজকের নিকট গিয়ে বলছে-

পদ-ঝুলন - ক্ষমা কর আমায়, আজ হতে আমি
তোমাদের কাছে আর রব না ॥
আমায় খুলেছে নয়ন, বুঝেছি এখন
নরকেও আমি স্থান পাব না ॥

কথা - মহাযাজকগণ বলছে, মনে আছে তুমি আমাদের অর্থ গ্রহণ করেছো-

পদ - তোমাদের অর্থ করেছি গ্রহণ,
তার ফাঁদে বদ্ধ আছি অনুক্ষণ।
চাও যদি ফাঁদ করিব মোচন।
দিতেও জীবন কাতর হব না ॥

কথা - মহাযাজক বলছে, যুদাস আবার বলছি মনে রেখ তুমি আমাদের অর্থ গ্রহণ করেছ।

পদ - আমি বুঝেনি তখন, করেছি গ্রহণ
তোমাদের সামান্য অর্থ
এখন নির্দোষির প্রাণ দিয়ে বলিদান
হারায়েছি পরামর্থ
আমি অর্থ চাই না, পরামর্থ হারাইয়া
(শোণিত বিক্রয় করে) গ্রহণ কর
তোমাদের সামান্য অর্থ।

কথা - যুদাস বলছে ধরো, তোমাদের অর্থ গ্রহণ কর, এ মহাপুরুষকে মুক্তি দাও। তার পরিবর্তে অধম নারকি আমি। আমায় দন্ড দান কর।

পদ - আমায় দন্ড দাও, অধম নারকি আমি
আমার নরক জ্বালার ভয় হয়ে

কথা - মহাযাজক বলছে, যুদাস তা হতে পারে না, তুমি অর্থ গ্রহণ করেছ, তার জন্য দায়ী তুমি আমরা তার কি জানি।

সুরে-পদে - পাপীগণে মিলে যিশুর নয়ন বন্দিল
মুখে থু থু দিল, আর মুষ্ঠাঘাত করল।

কথা- তাই দেখে যুদাস বলল-

পদ - হায় হায় তোরা কি করিলি রে,
এমন সুধা মুখে থু থু দিলি
তোদের পরকালে গতি নাই
যিশুর অঙ্গে আঘাত করিলি।

দশকোষী - নাশিতে সামান্য ক্ষুধা, যে মুখে দিয়েছে সুধা
কেমন করে থু থু দিলে মুখে,
হায় হায় মরি, মরি হে,
মরি মনের দুঃখে

লোভা - ওগো আমি কি করিলেম ধনের লোভে
ওগো আমার নরকেতে যেতে হবে
আমার এ পাপের আর ক্ষমা নাই হে ॥

কথা- তখন যুদাস মনের কষ্টে মন্দিরের মধ্যে মুদ্রাগুলো ফেলে দিয়ে নগরের বাহিরে একটি বৃক্ষের সহিত রজ্জু লম্বিত করল এবং উর্দ্ধদিকে চেয়ে করজোড়ে বলতে লাগল-

গান - অধম পাতকী নারকী আমি,
আমায় কর প্রভু পরিত্রাণ,
পেয়ে অর্থ প্রলোভন বুঝিনি তখন
করেছি শত্রু হস্তে তোমায় দান।
প্রভাতে তোমায় ক্রুশে আরোপিবে
মধ্যাহ্নে তপন অস্তাচলে যাবে।
কেহবা হাসিবে, কেহবা কাঁদিবে
জেরুজালেম হইবে শ্মশান
পাপেতে তাপিত সন্তাপিত চিত
ভয়েতে আকুল হয়েছে প্রাণ
যে পাপ নাশিতে, হাসিতে হাসিতে
নিজ প্রাণ দিব বলিদান।

সুরে - এতেক বলিয়া রজ্জু গলে লাগাইল
উদ বন্ধনে হতাভাগা প্রাণ তেযানিল

পদ - সব জ্বালা এড়াইল, এ সংসারে
কেবল নরক জ্বালার ভয় রহিল ॥

বিচার পালা

কথা - প্রভাত হইবার মাত্র প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীনবর্গ যীশুকে পন্তিত পিলাতের নিকট বিচারার্থে উপস্থিত করলেন ও পিলাত বলতে লাগলেন-

পদ - কিবা অপরাধ কেন সাধ বাদ
যীশু প্রাণদন্ড যোগ্য কিসে
আমি প্রাণে না মারিব কশাঘাত করিব
মুক্তি দিব অবশেষে।
(কোন অপরাধ নাই) যীশু প্রাণদন্ড যোগ্য কিসে
লোহিত বরণ বস্ত্র পড়াইল কন্টক মুকুট শিরে
প্রস্তর স্তম্ভেতে করিয়া বন্ধন কঠোর কশাঘাত করে
ভেসে যায়, সোনার অঙ্গ, রুধির ধারায় ॥

দশকোষী - কন্টক মুকুট মাথে রুধির, ধারা বইছে তাতে
কশাঘাত করিছে, পাপীগণে,
হায় হায় কোমল অঙ্গে গো
আঘাত সইতে নারে।

লোভা - ওগো শুনে যিশুর দুঃখের কথা
কাঁদে পশু পক্ষী তরুলতা
যীশুর দুঃখ দেখতে নারে।

সুরে - যিশুকে বাঁচাতে পীলাত বুদ্ধি স্থিরিল
সকলের সম্মুখে তারে উপনীত করিল।

পদ - (বলে এক সে হোম, এই দ্যাখ সেই ব্যক্তি)
তোদের দয়া কি হয় না।
নির্দোষীকে দন্ড দিতে।

কথা - প্রাচীনবর্গ এবং মহা যাজকগণ চিৎকার করে বলছে, উহাকে ক্রুশ বিদ্ধ করুন। তখন পিলাত বলছে, দেখ, জেরুজালেমবাসী।

গান - সময় থাকিতে সাবধান। (২ বার)
এখন সময় আছে বধনা যীশুর প্রাণ
বিনা দোষে করিয়াছ যীশুর অঙ্গে কশাঘাত
আর করিও না মিছে ধার্মিকের রক্তপাত
হবে শিরে অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত।
এখন এ দেশে শশী বিতরে কিরণ রাশি
এখন মলয় বায়ু ধীরে ধীরে বয়ে যায়।
এখনো পাপিয়া ধরে পঞ্চমে তান।
এখনো ঈশ্বর আছে, রৌদ্র দীপ্ত মুর্তিমান
পাপী যিহুদীর বংশ সবংশে হইবে ধ্বংস
জানিবে ন্যায়ের দন্ড যিনি সর্বশক্তিমান ॥

কথা - তখন পিলাত হস্ত প্রক্ষলণ পূর্বক বলছে - হায় যিহুদী তোমরা এখন বুঝতে পার নাই যে এই ধার্মিকের রক্তপাত কি সর্বনাশ সাধন করলে। যাক, হে ঈশ্বর যিশুর মৃত্যু সমন্ধে আমি নির্দোষ, তা শুনে সমস্ত লোক চিৎকার করে বলছে, উহার রক্ত আমাদের উপরে এবং আমাদের সন্তানদের উপরে প্রবর্তিত হউক। তখন পিলাত সজল নয়নে যিশুকে ক্রুশ বিদ্ধ করতে উহাদের হস্তে সমর্পণ করলেন।

পদ-ঝুলন - তখন লোহিত বসন, খুলে সৈন্যগণ
যিশুর নিজ বস্ত্র পড়াইল।
সেই দারুণ ক্রুশের ভার স্কন্ধেতে তাহার
কালভারিয়া চলিল ॥
(চলিত নারে) সেই দারুন ক্রুশের ভারে
হায় হায় মাটিতে লুটিয়া পড়ে।

ক্রুশের পথের কিছু অংশ

কথা - তখন শিমোন নামের এক ব্যক্তি সে পথ দিয়ে পল্লী গ্রাম হতে আসছিল। পথি মধ্যে যিশুর এ অবস্থা দেখে কাতর ভাবে বলছে।

পদ - হায় হায় তোরা কি করিলি, তোরা পাষাণ হতে কঠিন হলি
সয় কি প্রাণে এমন কোমল দেহে ক্রুশের ভার
তোদের দয়া নাই মায়া নাই,
তোদের পাষাণে গঠিত দেহ ॥

কথা - সৈন্যগণ বলছে, কি বললি, আমাদের দেহ পাষাণে গঠিত, তোর দেহে যদি এত মায়ার সঞ্চার হয়ে থাকে তবে তুই নিজে ক্রুশ বহন কর। দাও উহার স্কন্ধে যিশুর ক্রুশটা তুলে দাও। শিমন বলছে, দে, তাই দে। আমিই ঐ ক্রুশ বহন করে নেব।

পদ - আমার প্রাণ যদি যায় সেও ভাল
(যিশুর ক্রুশ বহন করে)
আমার এ জীবনে কাজ কি আছে
আমি মরিলে স্বরগে যাব ॥

সুর - যত জেরুজালেম নারী লাজ ভয় পরিহরি
যিশু দরশন আসে যায় গো-
নাহি শুনি অন্য রোল, কেবল রোদন রোল
নয়নের ধারায় ধরা ভেসে যায়।

পদ - ভেসে যায় ভেসে যায়, নয়নের ধারায় গো
বারণ মানে না, বক্ষে করাঘাত করিলে কান্দে
যেন পাগলিনী হয়েছে,
আজ জেরুজালেম কন্যাগণ ॥
পাছে পাছে ধায় গো
কোলের ছেলে দুরে ফেলে ॥

দশকোষী - প্রভু একটু দাঁড়াও, দাঁড়াও হে
তোমার দেখে লই জনমের মত গো
মানব জনম সফল করি।
একবার দাঁড়াও দাঁড়াও হে
আমরা নয়ন ভরে তোমায় দেখি
একবার দাঁড়াও দাঁড়াও হে''''''''।

কথা - যিশু বলছেন, জেরুজালেম কন্যাগণ, রোদন সম্বরণ কর, সেই পরম পিতার ইচ্ছায় আমি নিজে এ কষ্ট বরণ করে নিয়েছি আমার জন্য রোদন কর না বরং তোমাদের নিজ নিজ সন্তানদের জন্য রোদন কর, এমন একদিন আসবে যেদিন সেই পরম পিতার বিচার আলয় তোমাদের সন্তানগণের কৃত ও মহা পাপের দন্ড গ্রহণ করতে হবে।

গান - তোমার কেন মিছে কান্দ বল, কান্দবার সময় পাবে তোমরা।
পূত্র শোকানলে জ্বলে, কেন্দ যত কান্তে পার ॥
সুখ সূর্য অস্ত যাবে, ধরা অন্ধকার হবে
হাহাকার ধ্বনি উঠবে, হবে রাজ্য ছারখার ॥
ভেবেছ দিন এমনি যাবে, এ পাপের বিচার হবে
জেরুজালেম ধ্বংশ হবে, নাহিক নিস্তার
ক্রুশে আরোহণ করি, মরি আমি পাপীর তরে
তোমরা নিজ সন্তানের তরে, ঢাল অশ্রু অনির্বার।

কথা - তখন জেরুজালেম বাসিনী ধর্ম পরায়ণা রমনীগণ বক্ষে করাঘাত করে বলছে হে আমার প্রভু। হে আমার প্রভু, আমাদের এমন বিলাপ করতে দাও যেন প্রাণ খুলে তোমার জন্য আমরা রোদন করতে পারি এবং সেই ভয়ঙ্কর মৃত্যু হতে নিষ্কৃতি পাই -

পদ - চলিতে চলিতে দুর্বল হইয়া, ভূমিতে লুটিয়া পড়ে
যত পাপীগণ, করিয়া তর্জন, ঢাংলষের বারি মারে
(সইতে নারে) দুর্বল দেহে ঢাংলষের বারি।।
বেলা দ্বিপ্রহর, মধ্যাহ্ন ভাস্কর প্রখর কিরণ ছাড়ে
ওগো যত সৈন্যগণ যীশুকে তখন, বস্ত্র উম্মোচন করে
(উলঙ্গ করিল) যিনি পবিত্রের মহাপবিত্র।

মারিয়ার বিলাপ

কথা - ক্ষত বিক্ষত দেহে ক্রুশ বহন করে যীশু কালভারিয়া পর্বতাভিমুখে গমন করছেন। পথে অসংখ্য জনতা, মাতা মারিয়া পাগলিনী বেশে উপস্থিত হয়েছেন।

পদ- ক্ষনেক হাসে ক্ষনেক কাঁদে, হিয়া ধর্য্য নাহি মানে
ওগো পাগলিনী, প্রায় হল মেরী
আলু থালু, কেশ পাশ সম্বরণ নহে বাস।
ওগো কান্দে মাতা হাহাকার করে।
(বলে কোলে আয় কোলে আয়)
তোরে বক্ষে করি জীবন জুড়াই
সয় কি প্রাণে, তোর কোমল অঙ্গে রুধীর ধারা
সয় কি প্রাণে।

সুরে - জাদুরে ---পশু পক্ষী যত আছে
সবাকে রাখিয়ে কাছে, অন্য কেহ না
পারে মারিতে ---------।

পদ-ঝুলন- আমা হেন অভাগিনী আছে কিনা নাহি জানি
নিজ পুত্র না পারি রাখিতে
আমার মত আর কে আছে,
পুত্রের দুঃখ চক্ষে দ্যাখে।

পদ-ঝুলন - আমার যে যাতনা প্রাণে, অন্যে নাহি জানে
কে বুঝে প্রাণের ব্যাথা।
আমি অনলে পুড়িব জলে ঝাঁপ দিব
পাষাণে লুটিব মাথা
(জীবন রাখবো নারে) তোর লাগিয়ে প্রাণ ত্যাজিব
আমার এছাড়া প্রাণে কাজ কি আছে।

কথা - তখন যিশু মায়ের দিকে চেয়ে বলছে মাগো জগতে তুমিই ধন্যা, এ সংসার অনিত্য, পিতা মাতা, ভাই বন্ধু কেবল পথের পরিচয় মাত্র। আমি পিতার কাছে মহাযাত্রা করছি, আর আমাকে বাধা দিও না মা। তখন মেরী বলছে কি বললে যীশু তুমি যাত্রা করেছ। আগে আমি মরি পরে তুমি, যাত্রা করিও। শুনেছি বামে শবদেহ দর্শন করে যাত্রা করলে মঙ্গল হয়।

পদ - আমার শব দেখে যাত্রা কর, তোমার যাত্রা মঙ্গল হবে।

কথা - আমার প্রভু যিশু সেই জনতার জঘন্য দৃষ্টির সম্মুখে বিবস্ত্র হয়ে জীবকে শিক্ষা দিলেন। হে মানব বৃথা লজ্জা অহংকার ও দর্পে বিস্মৃত হও। পরম পিতার আশ্রয় গ্রহণ কর সংসার অনিত্য।

পদ - সংসারে সংসাজা কেহ রাজা কেহ প্রজা।

কথা - তখন সৈন্যগণ পিত্ত মিশ্রিত দ্রাক্ষারস পান করতে দিলেন, কিন্তু প্রভু তা অস্বাদন করে পান করতে চাইলেন না।

পদ-ঝুলন - তখন মাটিতে স্থাপিল, ক্রুশকাষ্ঠ উপরে
লম্বিত করিল দেহ
কান্দে স্থাবর জঙ্গম পশু পক্ষীগণ
সহিতে না পারে কেহ ॥
(হায় হায় একি হল) আজ সুখ শশি অস্ত গেল।

পদ-ঝুলন - যত অধম নারকী পতীত পাতকী
প্রভূর হস্তপদ বিদ্ধ করে।
ক্ষতস্থানে হতে অবিরাম স্রোতে
শোণিত ঝরিয়া পরে
তখন ক্রুশের নীচেতে যোহন্নেসের সাথে
উপনীত হল মেরী
আলু থালু কেশ, পাগলিনী বেশ
কান্দে বক্ষে করাঘাত করি ॥
(বলে কোলে আয় কোলে আয়)
তোরে বক্ষে করি জীবন জুড়াই
বাছা তেমনি করে মা মা বলে।

পদ-ঝুলন - মা বলিয়ে ডাকরে যাদু, ও চাঁদ বদনে
মধুর মা কথা শুনি শ্রবণে
তুইরে আমার বুক জোড়া ধন, বুকে করে রাখি
হৃদয় পিঞ্জর শূন্য করে উড়ে যাসনে পাখী

(আমার আর কেহ নাই)
আমার তাপিত বক্ষ জুড়াইতে
কি হল কি হল আমার নয়নের মণি
কে করিল আজ আমারে মণিহারা ফনি
দেখা যায় কিরে বাপ
তার সোনার অঙ্গে রুধির ধারা
তেমনি কর মা মা বলে, কে উঠিবে মম কোলে
কে নাচিবে প্রেমের পুলকে
ও দুঃখিনী মায়ের কথা রাখ, নয়ন মেলে চেয়ে দ্যাখ
(অভিমানে কেন রে নীরবে)
বড় ব্যাথা লেগেছে প্রাণে
একবার ডাক দেখি বাপ
তেমনি করে মধুর স্বরে
তুই বিনে এ জীবন ত্যাজিব।

দশকোষী - বাছা তুই বিনে আর কেহ নাইরে
মা বলবে এই দুঃখিনীরে গো।

লোভা - এ সংসারে, আমার আর কে আছে,
আমায় জন্মের মত ছেড়ে গেলি।
আমায় ঘরে রইতে দিলি নারে ॥

পদ - আমার মত অভাগিণী আর কে বা আছে
ওগো পুত্রের মরণ চোখে দ্যাখে, দাঁড়াইয়া কাছে
আমার পাষাণে গঠিত হিয়া
তাই, নাহি যায় বিদরিয়া
আমি হেঁটে যাই পথে, চাই চারিদিকে
যদি দেখি কারো ছেলে
আমনি দুবাহু প্রসারী বক্ষে ধারণ করি
আমার প্রাণের যিশু যিশু বলে ॥

কথা - তাই বলি যিশু, তুই কি জানিবি পুত্র শোকের কি যাতনা---

পদ - কেউ জানে না, কেউ বুঝে না, ওরে পুত্র শোকের কি যাতনা
মা বিনে সন্তানের দুঃখ কেউ জানে না ॥

কথা - তবে জানে, কে জানে-

পদ - সেই সে জানে। আমার মত যার হয়েছে।
জানে যিশু, সেই সে জানে, জানে তারে জানে জানে।

সুরে - তাই বলি যিশু--যিশুরে
তোর মুখে মা বোল শুনে, যত সুখ পাই হে-
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালেতে বুঝি তত সুখ নাই হে।

পদ-ঝুলন - জানে না পুত্রের স্নেহ পৃথিবীতে অন্য কেহ
মায়ের সমান মায়া নাহি ধরে ॥
কত প্রসব প্রাণ বাহিরে হয়
সে কথা আর না বলা যায়
কত শত সেই বেদনায় মরে

কথা - আমি তোরে দশমাস দশদিন এ উদরে ধারণ করেছি

দশকোষী - একি দক্ষিণা দিলি হে।
দশ মাস দশ দিনের দক্ষিণা দিলি হে।

দশকোষী - ওগো হায় হায় আমি কোথায় যাবরে
আমার প্রাণের যীশু হারাইয়া।
আমার আর কেহ নাই এ ভুবনে
এই দুঃখিনীকে মা বলিতে
আমার প্রাণের যীশু হারাইয়ে

কথা - তখন যিশু বলেন, নারী সংসার একটা মায়ার খেলা মাত্র। আমার কথা ভূলে যাও, ঐ দ্যাখ তোমার পুত্র।

পদ-ঝুলন - এসো হে যোহনেস ভাই, আর কিবা দেখ।
অভাগা দুঃখিনী মাকে মা বলিয়ে ডাক।
আমার মা তো প্রাণে বাঁচবে নারে।
দারুন পুত্র শোকালয়ে
যোহনেস ভাই এই করিও
(তুমি) আমার মাকে মা বলিও
আমার মত করুণ সুরে, আমার মাকে মা ডাকিও
আমার মত তেমনি ভাবে---।
তখন যোহনেস কয়, মা দুঃখিনী
চল গো ঘরে অভাগিণী।
কি দেখিতে এলে, (৩ বার) পাগলিণী।
চাঁদের বাজার আধার হল, সুখ সূর্য্য অস্ত গেল
রাহুতে চাঁদ গ্রাসিল, দিন মণি, অস্ত গেল (৩ বার)
ঘরে চল ঘরে চল, পাগলিণী মা দুঃখিনী
তোর চাঁদের বাজার আধার হল।

যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যু

কথা - যিশুর সহিত ক্রুশবিদ্ধ দস্যুদ্বয়ের একজন বলল, বলি ওহে তুমি নাকি খ্রিস্ট, তবে আমাকে রক্ষা কর এবং আপনাকেও বাঁচাও অপর দস্যু বললো।

পদ - চুপ করে থাক কসনে কথা
দিসনে সাধুর মর্মে ব্যাথা
যীশ দয়াল সাধু বটে, এমন দয়াল আর কে আছে
প্রেম বিনিময়ে প্রেম জানে

কথা - হায় নির্বোধ! আমাদের সঙ্গে এ নির্দোষী সাধুর তুলনা হয়?

পদ - আমরা পাপী দুরাচার, প্রাণ দন্ড যোগ্য বটে
যিশুখ্রীষ্ট অবতার নির্দোষ পরম পুরুষ
ঈশ্বরের প্রেরিত পুত্র।

কথা - তখন যিশু বললেন, হে বিশ্বাসী তুমি আজই আমার সঙ্গে স্বর্গধামে চলে যাবে।

সুরে - ঘোর অন্ধকার হল, তৃতীয় প্রহরে পিত, পিত বলে প্রভু ডাকে উচ্চ স্বরে।

পদ - একবার আমায় নেও গো দেশে
আমি এ দেশে আর রইতে নারি-

কথা - যিশু তৃষ্ণায় কাতর হয়ে বলছে-

পদ - আমায় একটু জল খেতে দাও
আমার জল পিপাসায় প্রাণ ফেটে যায়

কথা - তখন একজন সৈন্য একখানা স্পঞ্জ সিরকায় সিক্ত করে দন্ডে সংযোগ পূর্বক মুখের নিকট ধরল, তখন যিশু পান করে বলছে।

পদ - পূর্ণ হল, খ্রিস্ট অবতার আজি-

দশকোষী - ধর ধর আমার প্রাণ ধর হে
আমি তোমার পদে প্রাণ, সঁপে দিলাম গো
আমি এ জ্বালা আর সইতে নারি ॥

পদ - নিচল পবণ নিথর গগণ, বিষাদে মগ্ন বিশ্ব
পশুপক্ষী সব নাহি করে রব, দেখে এ দুঃখের দৃশ্য
বুঝি জগৎ আধার হল, ত্রাণকর্তা অস্ত গেল
স্বর্গ হইতে এ মর জগতে পাপী নিস্তারিত এসে
জীবের লাগিয়া নিজ প্রাণ দিয়া, আরোহন করিল ক্রুশে।

ধন্য তুমি, তোমার দয়াও ধন্য, তুমি ধন্য তোমার পিতা ধন্য
তারাও ধন্য, যাদের লাগিয়া ধরায় এলে
তারাও ধন্য, যারা তোমাকে বিশ্বাস করেছে
তারাও ধন্য, যারা তোমার কৃপা লাভ করেছে
তারাও ধন্য, যারা তোমার বিরোধী হয়েছে।

কথা - যারা তোমার বিরোধী হয়েছে, তাদের ধন্য বলি কেন?

পদ - তারাই তো এনেছিল, তোমার স্বর্গ হতে মর্ত্ত ধামে

কথা - কেন এনেছিল?

কথা - অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস করাইতে এবং পাপী পাপী নিস্তারের জন্য এ পৃথিবীতে তোমার আগমন।

পদ - তবে আনন্দ ভবনে যাও নিরাপদে থাকবে কেন জীবিতের অমঙ্গল নাশ কর।

কথা - যখন পাপাত্মাগণ যিশুকে ক্রুশে দিয়াছে, তখন যীশু বললেন, হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, কেন আমাকে পরিত্যাগ করেছো। এ বলতে বলতে প্রভু যীশু প্রাণ ত্যাগ করলেন, তখন অমনি জগতে একটি মহা হুলস্থুল ব্যাপার আরম্ভ হল।

গান - আজ বুঝি জগতে ঘটিয়ে মহাপ্রলয়
চতুর্দিকে অন্ধকার কিছুই না যায় দেখা
বিদীর্ণ হইয়া গেল মন্দিরের যবণিকা
অকস্মাৎ ভূমি কম্পে, খুলির সমাধি সব
পাষাণ বিদীর্ণ হইল, জীবিত হইল সব
জগতের জীব সব, করে হাহাকার রব
দেখিয়া প্রহরী সব ভয়েতে সবের প্রায় ॥
নীরব পাখী সব পঞ্চমে না ধরে তান
বহে না মলয় বায়ু, কোকিলে গাহে না গান
কুসুম কাননে কেন, ঝরিয়া পড়িছে ফুল।
কি যেন কাহার দুঃখে জগৎ আজি শোকাকূল
শান্ত সাগর আজি তরঙ্গে ভাঙ্গে না কেন
কি যেন দুঃখের আকুল কুল কুল নাহি ধায়।

পদ - শতপতি সৈন্যপতি উর্ধ্বশ্বাসে ধায় গো
এই সমস্ত ঘটনা নগরে জানায় গো।
নগরে জানায় গো ॥

কবর দান

কথা - শঙ্কাকাশে যোসেফ নামক একজন ধনীক ব্যক্তি পিলাতের নিকট গিয়ে যিশুর মৃতুদেহের প্রার্থনা করল। তখন পিলাত বলল মৃত্যু দেহে শত্রুতা নাই। ইচ্ছা করলে তোমরা নিতে পার। এ কথা শুনে তখন যোসেফ সেই মৃত্যুদেহ হতে নামিয়ে স্কন্ধে করে বলছে -

দশকোষী - ও তার ভবের লীলা, করে সাঙ্গ
ক্রুশবিদ্ধ সোনার অঙ্গ গো।
পাপীর তরে নিজ প্রাণ ত্যাজিল
হায় হায় এমন দয়াল আর কে আছে ভবনিবে

লোভা - আমার পাপ তাপ সব দূরে গেল
আমার মানব জনম সফল হল
তোমার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করে।

পদ - তখন আপন খোদিত প্রস্তর নির্মিত
নতুন সমাধি ছিল।
শুচি মঘখলে করিয়া জড়িত
তাহাতে সমাধি দিল।
তখন যোসেফ ভাসে নয়ন জলে
আমায় দেখা দিও অন্তিম কালে ॥

যিশুর পুনরুত্থান

কথা - প্রধান যাজকেরা ও ফরিসীরা একত্রিত হয়ে পিলাতের নিকট বলল, ধর্মাবতার, যিশু যাদু মন্ত্র বিশারদ, পরম মায়াবী ছিল সে জীবিত থাকা অবস্থায় বলেছিল, মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থান করবেন, এখন যদি তার শিষ্যগণ তার ঐ মৃত্যুদেহ চুরি করে প্রকাশ করে যে তিনি পুনরুত্থান করেছেন, তাহলে আমরা ভীষণ লজ্জিত হব। সুতরাং তার মৃত্যুদেহ রক্ষার সুবন্ধোবস্ত করা হোক, তখন পিলাত বললেন, সৈন্যগণ সেনাপতি ও প্রহরিবর্গ দ্বারা তোমাদের যে রূপ অভিরুচি হয় সেরূপ কর গিয়ে।

পদ - তখন সশস্ত্র প্রহরীগণ চৌদিকে বেষ্টিত
সমাধির প্রস্তর করে মোহর অঙ্কিত।
বলে এইবার কোথায় যাবে
যাদুকরে যাদুবিদ্যা।

কথা - এদিকে ক্রমেই রাত্রি গভীর হচ্ছে, প্রহরীগণ শঙ্কিত চিত্তে পাহারা দিচ্ছে।

গান - অকস্মাৎ কাপিল মেদিনী
আঁখির পলকে ঝলকে ঝলকে

বিনা মেঘে চমকে দামিনী ॥
সেনাপতি শঙ্কিত বিষাদে চিন্তিত
ভীত চরিত্রে যত সেনানী
আকাশে ভৈরব, নিকট কলবর, ঘোর তিমিরাবৃতা
স্বর্গ হইতে যীশুকে লইতে
গাব্রিয়েল জামিনী আসিল তখনি
সুগন্ধ চন্ধনে চরণ বন্ধনে আসিল যত সুর রমনী।
নিয়ে বরণ ডালা, যত স্বর্গবালা
পুজিল যিশুর পদ তরনী
খুলিল স্বর্গের দ্বার, বলে এসো হে কুমার অন্ধকার হইল ধরনী

পদ- ঘোর তিরাবৃতা ভীষণ রজণী
পুনরুত্থান করিলেন প্রভু যিশু গুণমণি
(সুপ্রভাত যামিনী) উদয় হইল দিন যামিনী
জয় জয় কলরব, সমস্ত নগরে ॥

কথা - তখন মাগদেলেনা মারিয়া সুগন্ধ চন্দন ও কুসুমে মৃত্যুদেহ অর্চনা করতে, প্রত্যুষ্যে সমাধি ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে মনে মনে চিন্তা করছে, হায় কি করি। ভীষণ প্রস্তর সমাধি আবৃত। কেমন করে পবিত্র দেহ অর্চনা করব। এ মনে করে ধীর শঙ্কিত ভাবে সমাধির দিকে অগ্রসর হয়েছে।

পদ - শোকাকুলা বিষাদিনী, যায় ধীরে ধীরে
উপস্থিত হল গিয়ে সমাধির দ্বারে।
(দয়া কর হে) দয়াল যিশু আমার
দয়াল যীশু, পাষাণ হয়ো না।
বলে পাষাণ সরাইতে, পাষাণ হয়ো না
অবলা নারীর প্রতি, পাষাণ হয়ো না ॥

কথা - আর একটু অগ্রসর হায় দেখছে প্রস্তর উল্টানো ও সমাধির দ্বার উন্মুক্ত।

পদ - সুগন্ধ চন্দন নিয়ে কবরেতে প্রবেশ করে
সমাধি শবাধার শব শূন্য, হেরী গো (৩ বার)
দেখে তার একপাশে দাড়াইয়া মৃদু হাসে
জ্যোতির্ময় শুভ্র বৈশধারী (৩ বার)
(বলে কে তুমি পুরুষ বল, জ্যোতির্ময় কলেবর)
অবলায় দয়া কর, প্রভুর দেহ দান কর।

পদ - তখন স্বর্গ দূত বলে, নারী না হও শঙ্কিত
ঈশ্বরের পুত্র যিশু, হয়েছেন জীবিত।
(মৃতগণের মধ্যে নাই) পুনরুত্থান করেছেন।

কথা - স্বর্গদূত বলছে, রমণীগণ শঙ্কিত হইও না যীশু পূর্বে বলে গেছেন, মৃত্যুর পর তিন দিনে তিনি পুনরুত্থান করবেন। তোমরা তার শিষ্যগণকে খবর দাও এবং গালিলিয়াতে যাও, সেখানে তার দর্শন পাবে। এ কথা শুনে তখন রমণীগণের কি ভাব হয়েছে -

পদ - পুলক পূরিত তনু না স্বরে বচন
ভাবে গদ গদ অঙ্গ দু'নয়নে
(আনন্দ ধরে না) একথা শ্রবণে শুনে।

কথা - রমণীগণ বলছে প্রভু, আমরা তো তোমাগত প্রাণ, তুমি জীবিত হয়েছো, এ হত ভাগিণীগণকে দয়া করে, একবার দেখা দাও।

পদ - এই কথা রমণীগণ যখন বলিল
দয়াময় প্রভু অমনি সম্মুখে আসিল
তার চরণ সুন্দর, বরণ সুন্দও, নয়ন সুন্দর
বদন সুন্দর, সে সুন্দর, তার সকলই সুন্দর
সুন্দর মুখের হাসি সুন্দর।
মুখে মৃদু মৃদু হাসি, করিছে অমীয় রাশি
বলে শঙ্কিত হইও না, আমাকে বিশ্বাস কর
অমঙ্গল রবে না সর্ব সুমঙ্গল হবে
যে আমাকে বিশ্বাস করবে ॥

কথা - যিশু বলছেন রমণীগণ আমার ভ্রাতাদের খবর দাও, যেন তারা গালিলিয়াতে গমন করে সেখানে তারা আমার দর্শন পাবে। তখন রমনীগণ বলছে। প্রভু হে---।

পদ - মোরা পূজিব চরণ, এই আকিঞ্চন, ছিল মোদের মনে যদি দিলে দর্শন, কুসুম চন্দন, অর্পণ করিব চরণে
(দাও দাও প্রভু পদধূলী)
আনন্দে লই শিরে তুলি।।

কথা - তখন যিশু বলছেন রমনীগণ-------

পদ - আজ আমাকে ছুইও না হে, অপবিত্র দেহ লয়ে
(পরশ করনা) আমি পিতৃ দর্শনে যাব।

কথা - রমণীগণ আনন্দে অধীর হয়ে তার শিষ্যদের নিকট গিয়ে উপস্থিত হয়েছে তখন শিষ্যদের কি অবস্থা দেখেছে, তা রমনীগণ বলছে-

পদ - যেন দেহশূন্য কায়া, পতিশূন্য জায়া
বারী শূন্য যেন মীন গো
মনি শূন্য ফনি, হয়ে পাগলিনী
কান্দে যেন নিশি দিন গো

আজ শিষ্যদিগের সেই ভাব হইল
দয়াল যিশুকে হারাইয়া
সবে, শবের মত পড়ে আছে।

দশকোষী- বলে আর কি পাব তোমায় দেখে
কি আশায় জীবন রাখা
কেন, তুমি এসেছিলে, স্বর্গ হতে মর্ত ধামে
সারা বিশ্ব কান্দাইতে। ঝুমইর------

পদ - মোদের আর কেবা আছে বল।
প্রভু তুমি বিনে এ জগতে
পতিত পাতকী আতুর তাপিত, দাড়াইবে কার কাছে
আর কি সেদিন হবে বলে
মোদের দুঃখের নিশি পোহাইবে
তোমার বাতুল চরণ করে দর্শন
ভব ভয় দুরে চলে যাবে।

কথা - তখন শিষ্যগণ বলছে, হায় হায় তার দেহ ফরিসিরা নিয়াছে, প্রভুর পবিত্র দেহ কবর হতে উঠিয়ে এ কথা শুনে রমনীগণ বলছে ভাই সব আরও আশ্চর্য ঘটনা শুনি।

পদ - দেখলাম কবরের এক পাশে, দাড়াইয়া মৃদু হাসে
জ্যোর্তিময় শুভ্র বেশধারী
বচনে অমীয় ঝড়ে কহিলেন ধীরে ধীরে
কারে তুমি খুঁজিতেছ নারী
যিশু এই কারণেই কবর হতে উঠে গিয়াছেন।
জীবিত হয়ে গিয়াছেন।

কথা - শিষ্যগণ বলছে, অসম্ভব মরা মানুষ কি আর বাঁচে? কিন্তু আমাদের এমনি দুরাদৃষ্ট যে তার মৃত দেহটি আমরা দেখতে পেলাম না, তখন রমনীগণ বলছে ভাই সব-

পদ - তার আমরা পেয়েছি দেখা
চরণ সুন্দর বরণ সুন্দর, তনুখানি প্রেমে মাখা

কথা - শিষ্যগণ সে কথা বিশ্বাস করছে না তারা বলছে-

পদ - তোদের পেয়েছে ভূতে, নইলে মরা মানুষ দেখবি কেন
ভূত আছে তোদের সাথে সাথে
করে ক্রুশ আরোহন মরেছে যে জন
সেকি আর পারে বাঁচিতে।
তোদের হৃদয় অধিকার করেছে।
তোর ভূত দেখিস পথে ঘাটে।

ভূতের পাওয়া এমনি ধারা

কথা - রমণীগণ বলছে, ভাইসব, বিশ্বাস কর, সত্যিই তিনি জীবিত হয়েছেন। এসব ভূতের খেলা নয়

পদ - এ কথা শুনিয়া পেত্র ঊর্ধ্বশ্বাসে ধায় গো
সমাধির ভিতর গিয়ে উপনীত হয় গো
দেখে আভরণ বস্ত্র পড়ে আছে
সমাধির এক পার্শ্বে ॥

কথা - তখন ঐ বস্ত্রখানাকে ধরে বলছে-

সুরে - আভরন বস্ত্র------

পদ - বলি তুইতো প্রভুর অঙ্গে ছিলি
কেন অযতনে হারাইলি।

কথা - পেত্র এসব অসম্ভব দর্শন করে ভীত চিন্তিত চিত্তে গমন করছিল। অন্য আর একদিকে যিশুর অন্য দুজন শিষ্য সে পথে যিশুর আলোচনা করতে করতে যাচ্ছে। যিশু তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বলছে, ভাই তোমরা কার কথা আলোচনা করছো। তারা বলছে পথিক তুমি কি এ দেশি নও?

কথা - তখন যিশু বলছেন-

পদ - (আমি স্বদেশী) আমি এ দেশীও নই, বিদেশীও নই।

কথা - সে কি কথা তুমি এ দেশী নও বিদেশীও নও তবে তুমি কোন দেশী - যিশু বললেন।

পদ - আমার যে দেশ সেই দেশী,
যে দেশে হিংসা, নিন্দা ও অবিশ্বাস নাই।

কথা - সে দেশে তোমার আর কে আছে? তখন যিশু বললেন, আমার পিতা আছেন। তোমার পিতা কে? তার নাম কি?

পদ - আমার পিতা জগৎ পিতা
ত্রিভুবনের ভয় ত্রাতা ॥

কথা - পথিক তুমি কি নাজারেথিও কথা শুন নাই, তখন যীশু সমস্ত ভবিষ্যৎ দত্তনগণের লিখিত শাস্ত্রের মর্ম বুঝাইতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট চল্লিদিন পৃথিবীতে থেকে চলছেন, তখন প্রভু যিশু অধিষ্ঠান হয়ে গেলেন।
শিষ্যদের সামনে জৈতুন পাহাড়ে স্বর্গারোহণ করলেন।

পরিশিষ্ট - ২ ঃ কয়েকটি বংশ-তালিকা

সংগ্রহে ও সম্পাদনে: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি এবং ড. মেরী মনিকা গোমেজ

আলোচ্য বিষয়সূচির সংক্ষিপ্তসার

প্রথম অধ্যায় : পারের বাবু বাড়ির বংশ-তালিকা (কার্ডিনাল প্যাট্রিক)

দ্বিতীয় অধ্যায় : উইলিয়াম ডি'রোজারিও, পন্ডিত বাড়ির বংশ-তালিকা (কার্ডিনাল প্যাট্রিক)

তৃতীয় অধ্যায় : ফিলিপ ডি'কস্তা (পোস্টমাস্টার) বাড়ির বংশ-তালিকা (কার্ডিনাল প্যাট্রিক)

চতুর্থ অধ্যায় : গ্রেগরী পিওন ডি'রোজারিও বাড়ির বংশ-তালিকা (কার্ডিনাল প্যাট্রিক)

পঞ্চম অধ্যায় : যোসেফ গোমেজ হাওলাদার বাড়ির বংশ-তালিকা (কার্ডিনাল প্যাট্রিক)

ষষ্ঠ অধ্যায় : শিকদার বাড়ির বংশ-তালিকা (ড. মনিকা গোমেজ)

সপ্তম অধ্যায় : সান্তামারীয়ার বাড়ি এবং পঞ্চায়েত বাড়ির বংশ-তালিকা (ড.মনিকা গোমেজ)

অষ্টম অধ্যায় : দেশান্তরকাঠির একটি বংশতালিকা (নির্মলা গোমেজ)

অবতারণা (কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি)

পরিশিষ্ট – ২-এর বিষয়বস্তু হচ্ছে পাদ্রীশিবপুরের কয়েকটি বংশ-তালিকা। আরও যদি বংশ-তালিকা হাতে পেতাম তাহলে সেগুলোও এখানে সংযুক্ত করতাম। প্রস্তুত করা বা প্রস্তুত ক'রে যে সমস্ত বংশ-তালিকা হাতে পেয়েছি সেগুলোই এখানে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। বংশ-তালিকা সম্বন্ধে নিম্নে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই:

* বংশ-তালিকা আসলে মূল-গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ও অঙ্গভুক্ত নয়, তাই সেগুলো গ্রন্থের পরিশিষ্টে রাখা হয়েছে।

* বংশ-তালিকাগুলো এখানে উল্লেখ করা হয়েছে প্রধানত উদাহরণ হিসেবে। এই উদাহরণটি অনুসরণ করে যারা আগ্রহী এবং বংশের নাম-ধাম স্মরণীয় করে রাখতে চায় এবং বংশের ইতিহাসকে রক্ষা করতে ইচ্ছুক, তার এরূপ বংশ-তালিকা প্রস্তুত করতে পারে যাতে ভবিষ্যত প্রজন্ম তাদের বংশের ইতিহাস জানতে পারে। এই প্রচেস্টা শেকড়-সন্ধানের বাসনাকে চলমান করে রাখবে।

* এখানে মূলতঃ ৭টি বংশ-তালিকা সাতটি অধ্যায়ের মধ্যে তুলে ধরা হল। ৭টি বংশ-তালিকা বললেও আবার সঠিক হবে না। যদি একটি বংশের সূচনা পিতা-মাতা ধরে গনণা শুরু করা হয় তাহলে একটি বংশ-তালিকার মধ্যে আরও অনেক বংশ-তালিকা রয়েছে। মোট সংখ্যা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

* এই বংশ-তালিকাগুলোর মধ্য দিয়ে আমার অনুমান হয় যে, পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের অধিবাসী ও অভিবাসীসহ প্রায় ৬০-৭০% লোকের নাম কোনো-না-কোনো তালিকাতে উদ্ধৃত হয়েছে। এই তালিকাগুলোতে ২৮০০-৩০০০ জনের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

* আমাদের অনেকের মন্তব্য যে, পাদ্রীশিবপুরে সবাই সবার আত্মীয়, এই কথার সত্যতা উল্লেখিত বংশ-তালিকার মধ্য দিয়ে কিছুটা হলেও প্রমাণিত হয়েছে।

* পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের তিনটি উপকেন্দ্র (মাটিভাঙ্গা, দেশান্তরকাঠি ও রাজাবাড়িয়া) থেকে পূর্ণাঙ্গ ভাবে কোন বংশ-তালিকার উল্লেখ নেই এখানে। তবে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে, উপকেন্দ্রগুলোর আলোচনা-প্রসঙ্গে অনেকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

* নিম্নে উল্লেখিত সারাংশ ও বিভাজন A. B. .. I ক্রমিক নম্বরগুলো বংশতালিকাতে উদ্ধৃত ভাগগুলো বুঝতে সহায়তা করবে।

GENERATIONS IN RELATION TO FORMER AND SUCCEEDING ONES

A: Great Great Grand Father and Mother Borobaba o Boroma'r Pita o Mata

B: Great Grand Father and Mother; Borobaba o Boroma

C: Grand Father and Grand Mother; Dadu o Didi

D: Parents and Uncles & Aunties; Pita-mata, chacha-chachi

E: Brothers and Sisters and Cousin Brothers & Sisters

F: Nephews and Nieces: Bhatija-Bhajti/Bhagna-Bhagni

G: Grand Nephews and Nieces, Nati & Natin

H: Great Grand Nephews and Nieces, Puti & Putin

I: Great Great Grand Nephews and Nieces Dhuti & Dhutin

প্রথম অধ্যায়: পারের বাবু বাড়ির বংশ-তালিকা

FORMER GENERATIONS

A. Paulo D'Rozario+2nd marriage with Muslim Girl from Sayeed Gen. (1825)
Cardinal Patrick's Great Great Grand Father

B.1. Adai D'Rozario (Est. born in 1850) +Wife (?)
Cardinal Patrick's Great Grand Father

B.2. Mariano D'Rozario+Wife (?) (Est. born in 1853)

C.1. Manuel D'Rozario (Born in 1878; Died in 1930);
Parer Babur Bari named after him

Wife: Cecilia D'Rozario (D/O William D'Rozario, Pandit Bari, Dighirpar)

D.1. Alfredo (Probably Alfred but called Albert) D'Rozario (Born 1893)

Wife: Dalphina Campoo (Deshantorkathi)

E.1. Fulkiria D'Rozario (B.10/07/1918; M.15/02/1939; D.05/01/1961)

Husb. Leo Gomes (B.10/03/1910; M.15/02/1939; D.26/03/1951)

F.1. Cecilia Gomes (B.23/07/1940; D.16/06/1962)

F.2. Stephen Gomes (B.22/05/1943; M.....D.24/09/2009)

Wife: Mary Gomes (B.29/08/1948)

G.1. Konica Gomes (B.13/10/72; M.27/12/1993)

Husb. Robin Sarker

H.1. Loretto Sarker

G.2. Monica Gomes

Husb. Sushanto

H.1. Arvin Gomes (B.11/11/2009)

F.3. Mary Gomes (B.03/12/1945; D.13.12/1947)

F.4. Lawrence Gomes (B.16/09/1948; M.05/06/1974)

Wife Rezina Rani Gomes (B.14/08/1948; D.23/01/2019

G.1. Lipon Gomes (B.19/04/1977; M.17/08/2012)

Wife: Sagorika Gomes (B.29/08/1983)

H.1. Lawrence Punno Gomes (B.30/09/2016)

G.2. Fulkiria Lipi Gomes (B.01/06/1980; M.20/01/2010)

Husb. Biddut Barnabas Rodricks (B.07/11/1972; D.14/12/2019)

H.1. Biggo Leonard Rodricks (B.25/06/2009)

E.2. Elizabeth (Eli) D'Rozario

Wife: Bernard Gomes

E.3. Clarisse D' Rozario (unmarried died)

E.4. Daniel D' Rozario (unmarried died)

E.5. Ruth Mary D' Rozario

Wife: Wilfred Dias

N.B. Thanks to Joseph D'Rozario and Lawrence Gomes (Sir) for updating (Nov.2021)

D.2. Bernardo D'Rozario (Est. 1910)

Wife: Maria D'Rozario (Sister of Bernard Sir)

E.1. Camiel D' Rozario (B.3.4.1929; M.....1955; D.1.4.1996)

Wife: Angelina Maya Gomes (B. 2.3.1939; D.6.4.1988)

F.1. Joseph D'Rozario (B.4.3.1957; M.12.11.1979)

Wife: Mira Marylin Gomes (B.14.9.1960)

G.1. Florinda Sukhla D' Rozario (B.13.4.1982)

G.2. Gloria Subhra D' Rozario (B.31.7.1983; M.7.1.2011)

Husb. Clifford Jacob (B.20.4.1979)

H.1 Clestre Jacob (B.18.2.2018)

H.2. Ceilo Jacob

G.3. Patrick Sourov D'Rozario (B.19.10.1990)

F.2. Mark Roni D'Rozario (B.9.9.1959; M.10.9.1990)

Wife: Ranu (B.....)

G.1. Khokon D'Rozario (B.10.6.1982; M.30.12.2013)

Wife: Suborna (B.27.11.1988)

H.1 Rose (B.23.10.2014)

H.2. Rio Mark D' Rozario (B.25.01.2023)

G.2. Bonnya D'Rozario (17.9.1996)

F.3. Joanna Rina D'Rozario (B.25.10.1964; M.13.1.1989)

Husb. Prashanto Gomes (B.7.11.1962)

G.1. Turibuse Dipta Gomes (B.23.3.1994)

G.2. Arel Pranto Gomes (B.26.9.1995)

F.4. Theresa Shima D'Rozario, (B.12.11.1968) Rel.Prof. 1996. Left Sept. 2009 M...)
Husb. Ricky Gomes
G.1 Rhythm
F.5. Barnard Pankaj D'Rozario (B.7.5.1970; M.17.9.1993)
Wife: Anna Rani Gomes (B.21.6.1972)
G.1. Alex Angel Peale D'Rozario (B.29.10.1998)
G.2 Francisco Proly D'Rozario (B.24.1.2003)
F.6. Jacinta Baby D'Rozario (B.6.4.1972; LHC First Prof. Jan.2002)

N.B Thanks to Pankoj and Rani for updating D.2. (Nov.2021)

D. 3. Philipina D'Rozario + Francis Gomes (Est. 1912)

E.1. Laljohn Gomes + Teresa Gomes
F.1. Ferdinand Gomes + Mary D'Costa
F.2. Merenda Gomes + Regin Macfield
F.3. Fidelis Gomes+Rose Mary Gomes
F.4. Carmelina Gomes + Miligan D' Rozario
F.5. Helena Gomes + Xavier Gomes
F.6. Flavian Gomes + Jacinta Gomes
F.7. Felix Gomes + Sabita Gomes
E.2. Louis Gomes + Daisy
F.1. Alexi Gomes
F.2. Martin Gomes
F.3. Momota Gomes
E.3. Rebeca Gomes (died)
E.4. Veronica Gomes (died)
E.5. Christina Gomes + David Gomes (mar.to Mistribari,died)

N.B. Pending for Updating No.D.3

D.4. Agustine D'Rozario (Brown) (Est. 1915)

Wife: First Marriage: Agatha Gomes; Second Marriage: Rosy Gomes
He worked as wireless operator (T & T & in Ship) Brown name was given
E.1. Kenneth D' Rozario (Brown) (B.15.2.1939. M.15.6.1965. D. 4.1.2014)
Wife: Luisina Sumoti Sarker (B. 26.6.1948. M.15.6.1965)
F.1.Augustine D'Rozario (B.1.2.1970. M.17.2.1995)
Wife: Anjona Das (B.1.5.1980; M. 17.2.1995)
G.1. Dominic D'Rozario, (B.9.5.1998)
G.2. Srabonti D'Rozario (B.15.8.2004)

G.3. Eric Proshanto D'Rozario (B.14.5.2010)

F.2. Hima D'Rozario (B.1.9.1972: M.14.7.1989)

Husb. Albert Prosad Bashu (B.24.7.1993)

G.1. Mareena Moiuree Bashu (B. 24.7.1993; M.26.12.2012)

Husb. Danish Rocky Baroi (B.3.5.1989)

G.2. Victoria Uttaree Bashu (B.28.9.1999

F.3. Carolina Lina Biswas (B.3.5.1976; M.1.3.1990)

Husb. Joseph Biswas (B.1.3.1965)

G.1. Shapla Biswas (B.10.6.1995)

G.2. Mousumi Biswas (B.17.5.1996; M.14.2.2014)

Husb. Subrata Sarder (B.14.2.1990)

H.1 Gourab Sarder (B.17.1.2018)

H.2 Nirob Sarder (B.9.9.2021)

G.3. Anonnya Biswas (B.1.1.2004)

E.2. Shila D'Rozario (from 2nd mar.) (B.20/10/1946; M.....)

Husb. Albin Gomes (B.25/04/2006)

F.1. Hira D'Rozario

Wife Priya D'Rozario

G.1. Pronob D'Rozario

G.2. Porbo D'Rozario

F2. Moni D'Rozario

Husb. Sanny D'Rozario

N.B.Thanks to Joseph and Albert Bashu and Evon for updating D.4 (Nov.2021)

D.5. Flora D'Rozario (Est. 1894) + German Pandit D'Rozario

E.1. Isabella Gomes + Alexander Gomes

F.1. Peter Gomes + Monica Gomes

G.1. Jerald Gomes

G.2. James Gomes

G.3. Jewel Gomes

G.4. Pride Gomes

G.5. Jonaki Gomes

F.2. McDonald Gomes + Jeneva Gomes

G.1. Linus Gomes

G.2. Shilpy Gomes

F.3. Albert Gomes(d) + Rebeca Gomes (d)

G.1. Shomiron Gomes

G.2. Shayamoli Gomes
G.3. Priti Gomes
G.4. Sonjib Gomes

F.4.Gilbert Gomes + Maya Gomes
G.1. Papiya Gomes
G.2. Ripon Gomes
G.3. Rima Gomes

F.5.Martha Gomes + Gregory Gomes Nantu
G.1. Bernadatte Dipa Baroi
G.2. Anna Tina Baroi
G.3. Noyoni Kishor Nipa
G.4. Barnoba Tipu Gomes

E.2.Paul Gomes + Bertha Gomes
F.1. Ruth Mary Gomes
F.2. Denis Gomes
F.3. Regin Gomes
F.4. Badol Gomes
F.5. Victor Gomes(d)
F.6. Shanti Gomes

E.3. Luciana Gomes + Joseph Gomes (S/0 Francis Gomes)
F.1. Abel Gomes + Carolina Gomes
(D/O Manual and Elizabeth Gomes, Pandit bari, Digirpar)
G.1. Walter Gomes + Celine Gomes
H.1. Monica Gomes
H.2. Barnard Nayan Gomes
H.3. Mukta Gomes
G.2. Elizabeth Pushpa Gomes + Regin D'Rozario (Dighirpar)
H.1. Dona Gomes + Prodip Rozario
I.1. Deep D'Rozario
I.2. Diganto D'Rozario
H.2. Damian Gomes + Jacob Rodrigues
I.1. Jesper Rodrigues
I.2. Jeson Rodrigues
H.3. Daisy Gomes + Liton Gomes
I.1. Shattya Gomes

H.4. Linda Gomes + Leon Gomes

I.1. Samuel Gomes

H.5. Dominic Gomes

G.3. Oliver Gomes + Joyontica Gomes (Kalada)

H.1 Alfred Mithu Gomes

H.2. Jefry Gomes

H.3. Jerry Gomes

H.4. Willam Joy Gomes

G.4. Anna Maria Minu Gomes + Medin Gomes

H.1. Joseph Apu Gomes + Bernadatte Keya Gomes

I.1. Christina Dipa Gomes

H.2. Albert Shuro Gomes

H.3. Abel Dipu Gomes

H.4. Fransiska Ovi Gomes + Khokon Halsona

I.1. Aronno Halsona

G.5. Magdalin (Nilu) Gomes + Ashley Clement D'Silva

H.1. Christian Janny D'Silva

H.2. Roseline Anny D'Silva

G.6. Manuel Gomes + Maclin Shilpi Sarker

H.1. Melvin Evan Gomes

G.7. Theresa Anu Gomes

F.2. Albert Gomes + Zita Baroi (Narikel bari, Pechabari)

G.1. Nancy Gomes + Samiran Boiragi

H.1.Hayly

H.2 Rita

G.2. Sweety Juliet Gomes + Martin Boiragi

G.3. Jacqueline Gomes (SC Sister Prof. 23rd Nov.2002)

G.4. Popline + Gabriel Baroi

H.1. Golpa Baroi

H.2. Songlap Baroi

G.5. Leonard Gomes + Mita

F.3. Augustin Gomes + Veronica

G.1. Jacinta Beuty Gomes + Ambrose Gomes

H.1.Carolina Anita Gomes (Adopted)

G.2. Joanna Gomes + Simson Gomes

H.1. Anita Gomes

H.2. Protap Gomes

H.3. Mita Gomes

H.4. Sumita Gomes

G.3. John Gomes + Baby Gomes

H.1.Antora Gomes

F.4. Anthony Gomes + Menoca Gomes

G.1. Linus Gomes

G.2. Liton Gomes

G.3. Linclon Gomes

F.5. Abraham Gomes + Puspa Gomes

G.1. John Gomes

G.2. Jacob Gomes

G.3. Zoe Gomes (adopted)

F.6. Isaac Gomes + Shobha Gomes

G.1. Shumi Gomes

F.7. Andrio Gomes + Shobha Mistri

G.1. Prodip Gomes

G.2. Subho Deep Gomes

F.8. Anastasia Gomes + Mathias Gomes

G.1. Champa Gomes

G.2. Clinton Gomes

F.9. Ambrose Gomes+Joyasree

G.1. Christopher Gomes

G.2. Charles Gomes

E.4. Francis Gomes + Margaret Gomes

F.1. Rani Gomes + Lawrence Gomes

G.1. Lipon Gomes

G.2. Lipi Gomes

F.2. Peter Gomes + Anna Maria Gomes (Runu)

F.3. Lima Gomes

F.4. Theresa Magrate Gomes

F.5. Mathew Francis Gomes

F.6 Pushpa Gomes + Celestine + Gerard Gomes (Dhaka)

G.1. Golapi Gomes + Shyamol Gomes

G.2. Ujjol Gomes (from 2nd Mar.)

F.7. Amol Theotonius Gomes + Eva Rozario

G.1. Prianka Gomes

G.2. Hoimanta Gomes

G.3. Prianto Gomes

F.8. Bimol Benjamin Gomes (d) + Champa Asam (seperated)

G.1. Udy Michael Gomes

F.9. Shyamol Gomes + Sophia Roselin Gomes (Milli)

G.1. Stanley Franklin Gomes

G.2. Gregory Mark Gomes

F.10. Joanna Jhunu Gomes + Sampson Mercer

G.1. Marlyn Shujon Mercer

G.2. Cindrela Mercer

G.3. Nigel Mercer

F.11. Florence Chinu Gomes + Daniel Sarker

E.5. Theresa Gomes + Justin D'Costa

F.1. Mary D'Costa + Ferdinand Gomes*

G.1. Linus John Sylvester Gomes + Mary Agnes Gomes Piya

H.1. Rocque Maximilan Gomes

H.2. Teresa Aritri Gomes

G.2. Shikta Gomes + Omio Rodrigues

H.1. Ria Rodrigues

H.2. Rich Rodrigues

H.3. Riahana Rodrigues

G.3. Leon Gomes (died)

G.4. Leonita Christina Shipra Gomes + Brian Gomes*

H.1. Brice Claudious Gomes

H.2. Brianna Teresa Gomes*

G.5. Liberty Gomes

G.6. Lincoln Gabriel Gomes + Elizabeth Aparna Adhikary

H.1. Audree Graciana Gomes

F.2. Menoca D'Costa

F.2. Monica D'Costa + Paul Anthoy Gomes

G.1. Newton Gomes + Vanessa Rodrigues

H.I. Alicen Griffith Gomes

H.2. Ashlyn Griffin Gomes

G.2. Milton Gomes + Linda Das
G.3. Clifton Anselm Gomes
G.4. Muriel Nina Gomes + Cliford Keith Rodrigues*
G.5. Gertrude Papia Gomes + David Mong Sikder
H.1 Any Claudia Sikder
H.2. Jeremy Paul Sikder
F.3. Cyprian D'Costa + Mary D'Rozario
G.1. Vincent D'Costa + Shoma Gomes
H.1. Angel D'Costa
G.2. Videlis Sintu D'Costa
G.3. Jane D'Costa
F.4. Renu D'Costa
F.5. Dipu D'Costa + Momtaz
G.1. Mithu D'Costa
G.2. Milli D'Costa
F.6. Dorothy Ranu D'Costa + Maclean Christopher Gonsalves
G.1. Elten Larengo Gonsalves
G.2. Darlean Cindy Gonsalves
G.3. Yougen Hanic Gonsalves (D)
F.7. Hanrieta Munu D'Costa
F.8. Patrick Apu D'Costa + Clementine Gonsalves
G.1. Nichodemes Nick D'Costa
G.2. Jacinta Sraboni D'Costa
E.6. Martin Gomes + Cecilia Coilho
F.1. Joseph Gomes + Cynthia Gomes
G.1. Shoma Gomes
G.2. Roshni Gomes
G.3. Melcome Gomes
F.2. Oliver Gomes + Anjana Gomes
G.1. Banti Gomes
G.2. Pinki Gomes
F.3. Basil Gomes + Munni Gomes
G.1. Lawrence Gomes
F.4. Juliet Gomes + (husband died)
F.5. Isaac + Sunita Gomes
G.1. Alex Gomes

G.2. Punam Gomes

G.3. Christina Gomes

F.6. Michael Gomes + Sumita

G.1. Tonumita Gomes

F.7. Alexander Jibon Gomes + Nirmola Gomes

G.1. Sharita Gomes

F.8. Jharna Gomes + Robi Gomes

G.1. Monisha Gomes

E.7. Anthony Gomes + Beatrice Gomes

F.1. Dilip Gomes

F.2. Zavier Gomes

F.3. Ambrose Gomes

F.4. Maria Gomes

F.5. Lawrence Gomes

F.6. Joyanti Gomes

F.7. Reba Gomes

F.8. Shikha Gomes

E.8. Diamond Gomes + Veronica Gomes

F.1. George Gomes + Parul

F.2. Priti Gomes + Bablu D'Costa

F.3. Philomena Gomes + Lintu Gomes (Mistribari)

E.9 John Gomes + Theresa Gomes

F.1. Arun Gomes

F.2. Anu Gomes

F.3. Opu Gomes

F.4. Renu Gomes

F.5. Mona Gomes

F.6. Gerard Gomes

N.B.Pending for Updating D.5.

D.6. Dilphina D'Rozario (Est. 1897) + John Campo (Deshantarkati)

E.1. Lucas Campo + Helena Campo

F.1 John Campo+

F.2. Benedict Campo

F.3. Napi Campo

F.4. Milton Campo

E.2. George Campo + Rosy Gomes

F.1. Abraham Campo

E.3. Harriete Campo+

F.1. Salmon Gomes+

F.2. Patrick Gomes

F.3. Eugene Gomes+

F.4. Anastasia Gomes + Norbert Gomes

G.1. Linus Gomes+Sima Dias

H.1. Anthony Gomes

H.2. Kuini Gomes

G.2. Lily Gomes + Thomas D'Costa

H.1. Prince Raphael D'Costa

G.3. Shelly Gomes

G.4. Kolly Gomes + Collins Chowdhury

H.1. Tithi Flora Chowdhury

G.5. Dolly Gomes + Charles Tapan Gomes

G.6. Jolly Gomes + Jowel Boidya

H.1. Jonas Duke Boidya

G.7. Oly Lawrence + Lopa Gomes

F.5. Ruth Mary Gomes

F.6. Bridget Gomes+

E.4. Agatha Campo + Peter Gomes

F.1. Cyprian Gomes+

F.2. Stephen Gomes

F.3. Francis Bolle Gomes+

F.4. John Gomes+

F.5. Gastin Gomes

F.6. Mary Gomes

F.7. Late Rebeca Gomes

F.8. Jacinta Gomes

F.9. Noresh Gomes (lost)

E.5. Joseph Campo + Theresa Gomes

F.1. Montu Campo

F.2. Renu Campo

F.3. Rodricks Campo (late)

E.6. Benjamin Campo + Catherine D'Rozario*

F.1. Dipali Campo

F.2. Molina Campo

F.3. Cynthia Campo

F.4. Shefali Campo

F.5. Simon Campo

F.6. Anthony Campo

E.7. Paul Campoo + Doli Gomes

F.1. Rina Campo

F.2. Bina Campo

F.3. Apu Campo

F.4. Sweety Campo

N.B. Pending for updating D.6.

D.7. Dalphine Monu D'Rozario (Est. 1900)

Husb. Jacob Gomes

E.1. Richard Edward (R.E) Gomes (B. 02/03/1921; M. 14/07/1957; D. 14/12/1980)

Wife: Joytsna Veronica Gomes (B. 15/08/1938; D. 23/02/2009)

F.1. Delphine Bashuri Gomes (B. 28/07/1958; M. 10/12/1980)

Husb. Bimal Francis Gomes

G.1. Anthony Bishal Gomes (B. 08/01/1984)

G.2. Anastasia Gomes (B. 26.11.1986)

Husb. Reuben Gabrasadlg

G.3. Joanne Gomes (B. 06/07/1997)

F.2. Caroline Sagarika Gomes (B. 26/04/19670

Husb.

G.1. Bikram Srimani

G.2. Richard Srimani

F.3. Jacqueline Gomes (B. 10/11/1964; M. 15/12/1996)

Husb. Sebastian Biswas (B/ 15/09/1962)

G.1. Sreeja Noela Biswas (B. 15/07/1999)

E.2. Philip Gomes (died)

E.3. Clement (Kilu) Gomes (unmarried died)

E.4. Merju Gomes

Husb. (Tengrakhali)

E.5. George Henessay Gomes (B. 25/04/1932; M. 01/05/1960; D.....
Wife: Mercy Lucinda Gomes (B. 05.04.1933; D.....)

F.1. Brian George Gomes (B. 10/07/1962)
Wife: Aruna Cecilia Gomes (B. 05.04/1971)
G.1. Declyn Gernald Gomes (B. 08/01/19976)
G.2. Lygeia Amanda Gomes (B. 27/01/1999)
G.3. Trent Keegan Gomes (29/09/2003)

E.6. Peter Paul Alec Gomes + Agnes Gomes (Hashnabad)
Wife: Agnes Gomes (Hashnabad)

F.1. Pushpa (died)
F.2. Shikha + Mark Rozario (Tuitel)
G.1.Nondini Rozario (12 in 2016)
F.3. Sima + Vincent D'Costa (Tuitel)
G.1. Mohona D'Costa + Tony Gomes
F.4. Hima Dorothy Gomes + Francis Biplob Dias
G.1. Sandalina Dias
G.2. Branden Charles Dias

E.7. Luciana Gomes (B. 19/03/1939; M. 1957)
Husb. Thomas Gomes (B. 08/12/1927; D. 30/03/2020)

F.1. Mukul James Gomes (B. 13.01.1958)
Wife: Monju Gomes (Separated)
G.1. Jenny Gomes (B. 28/09/1986)
F.2. Nomita Gomes (B. 26/02/1964)
Husb. Suben Gomes (B. 26/07/1954)
G.1. Anthony Gomes (B. 06/10/1986)
G.2. Alex Gomes (B. 01/02/1996)
F.3. Jonas Pratul Gomes (B. 07/05/1965; M. 07/01/2005)
Wife: Shilpi Gomes (B. 16/04/1983)
G.1. Stanly Gomes (B. 04/12/2004)
G.2. Ammy Gomes (B. 05.10.2008)
F.4. Joseph Sunil Gomes (B. 29/08/1968; M. 16/02/1999)
Wife: Ajanta Tumoa Gomes
G.1. Grace Gomes (B. 05/04/2008)
G.2. Nancy Gomes (B. 26/06/2012)
F.5. Shumita Gomes (B. 27.03.1974)

Husb. Francis Kandulna (B. 29/07/1974)

G.1. Abhishek Kandulna (B. 12/12/1998)

G.2. Ankur Kandulna (B. 06/01/2005)

N.B.Thanks to Josephine Linda Bhattacharya for Updating D. 7 (Nov. 2021)

D.8. Michael Ningal D'Rozario (B. 12/8/1903; M. 1921; D. 12/6/88

Wife: Flora Espiosa Dispina Gomes (B. 11/3/1905; M. 1921; D. 19/3/1995)

E.1. Richard Reginald D'Rozario (B. 4/1/1922; M. 17/7/43; D. 31/8/2006)

Wife: Cecilia Gomes (B. 26/3/1928; D. 24/10/2004)

F.1. Seraphina Tara D'Rozario (B.6/7/1945; M. 9/2/1964)

Husb. Ignatius D'Rozario (B. 13/8/1940)

G.1. Dominic D'Rozario (B. 23.12.1964; M. 6,1,2000)

Wife: Sushoma Elizabeth (D. 24.4.1980; D. 4.6.2013)

Wife: Joyasree D'Rozario (D. 12.12.1978; 2nd Mar.)

H.1. Piali Cecilia D'Rozario (B. 13.12.2001)

Husb. Andrew Tushaer Chatterjee (D. 11.4.1998)

H.2. Mitali D'Rozario (D. 28.7.2003)

H.3. Edwin D'Rozario (B. 1.4.2009)

G.2. Roseline D'Rozario (died)

G.3. Anita D'Rozario (B. 22,8.1967)

Husb. Anthony Soren (B. 15.8.1978; M. 22.8.1998)

H.1. Puja Soren (B.5.6.1998; M. 3.11.2016)

Husb. Sushanto Ghose (B. 6.3.1992)

H.2. Joseph Soren (B.19.1.2005)

G.4. Shobita D'Rozario (B.8.4.1968; M. 3.5.1992)

Husb. Arokiadas Anthony (B. 5.8.1964)

H.1. Dibia Anthony (10.8.1993)

H.2. Donald Anthony (B.24.3.1995).

G.5. Subrata D'Rozario (B. 20.2.1971: M. 10.6.1993)

Wife: Mary Swapna D'Rozario (B. 15.8.1973)

H.1. Suporna (D. 3.2.1995)

Husb. Bappi Makhal (B. 22.6.2011; divorced)

Husb. Proloy Roy (2nd M. 54.2019)

H.2. Sukanto (B. 26.10.1996)

H.3. Swapna (D. 21.5.1998)

G.6. Lalita D'Rozario (B. 2.6.1972; M. 1.5.2002)

Husb. Shanjib Bag (B.18.7.1977)

H.1. Catherina Bag (B. 26.6.2004)

H.2. Alex Bag (22.5.2009)

G.7.Babu Alexander D'Rozario (B.14.3.1974; M. 30.4.2004)

Wife: Rekha Rani D'Rozario (B. 20.6.1985)

H.1. Lakkhi D'Rozario (B. 2.8.2005)

H.2. Alice D'Rozario (B. 1.10.2017) (Miracle boy)

G.8. Shonjoy D'Rozario (B. 2.6.1979; M. 28.11.2003)

Wife: Sntana Martha (B. 10.5.1983)

H.1. Sharon D'Rozario (B. 27.2.2006)

H.2. Florence D'Rozario (D. 19.9.2016)

G.9. Ajoy D'Rozario (B. 23.5.1984; M. 25.1.2016)

Wife: Jyoti D'Rozario (B. 5.8.1989)

H.1. Arochi D'Rozario (B 24.4.2020)

F.2. Theresa Gomes (died at 2 and half year old)

F.3. Moresh (died six months)

F.4. Pushpa D'Rozario (B. 23.2.1952; M. 16.5.1974)

Husb. Marconi Rozario (B. 13.4.1943; D. 16.11.2010)

G.1. Shondha Rozario (B. 6.11.1975; M. 18.7.1990)

Husb. Sankar Chetri (B. 15.8.1970)

H.1.Theresa Chetry (B. 28.10.1992; M. 1.11.2010)

Husb. Francis Rajesh Mondol (12.9.1989)

I.1. Alphonza Anannya Mondol

(B.28.8.2011) First Dhutin

I.2. Anthony Orpon (B. 10.5.2013) Second Dhuti

H.2. Mark Cheti

G.2. Madhobi Rozario (B. 28.8.1979; M. 11.8.2004)

Husb. Debasish Kundo (B. 12.1.1965)

F.5. Boy Child died at birth

F.6.Girl Child died at birth

F.7. Monju D'Rozario (B. 22/2/56; M. 17.10.1988)

Husb. Benjamin Rozario (B. 8.11.1938; D. 3.9.2018)

G.1. Korobi Agatha Rozario + Sunni Boidhya

Husb. Sunniu Boidya (Divorced)

H.1. Pritam Boidhya (B.26.6.2011)

G.2.Maria Rozario (died)

F.8. Boy child died

F.9. Girl child died

F.10. Khuku D'Rozario (B. 3.3.1960; M. 3.6.1984)
Husb.Ruben Rozario (B. 8.5.1945)
G.1. Patrick Bikas (B. 10.4.1986)
F.11. Mukti D'Rozario (B. 12.6.1962; M. 29.12.1982)
Husb. Francis Munu Gomes (D. 5.2.1952)
G.1. Tushar Gomes (B. 11.6.1994) (Salesian Cong.)
G.2. Tonuja Gomes (B. 26.2.1996)
F.12. Anjali Baby D'Rozario (B. 25.5.1964; M. 21.1.1989)
Husb. Rana Lews (B. 26.5.1953; D. 2019
G.1. Subrata Lews (B. 6.3.1990)
G.2. Joy Gomes Lews (B.11.4.1996)
F.13. Boy child died
F.14. Monica D'Rozario (B. 6.3.1967; M.1.5.1998)
Husb. Mithu Gomes (D. 2011)
G.1. Joel Gomes (B.13.11.1999)
F.15. Shormila D'Rozario (D. 28.2.1970; M. 20.11.1988)
Husb. Anthony Rozario (B. 17.5.1952)
G.1. Slyvia Pinki Rozario (B. 16.3.1990; M. 26.11.2017)
Husb. Gabriel Gomes (Divorced)
H.1. Amberleen Gomes (B. 1.5.2017)
G.2. Andrea Riya Rozario (B. 18.10.1994)
G.3. Grace Pria Rozario (B. 16.9.2000)

N.B. Thanks to Josephine Linda Bhattacharya for updating E-1. (March 2021)

E.2. Patrick Harold (Harry) D'Rozario (B. 18.2.1925; M.1944; D.11.3.2018)
Wife: Maria Gomes (Matibhanga) (B. 1928; D. 3.11.2013)
F.1. Michael Montu D'Rozario
(B. 22.11.1946; M. 11.12.1984; D. 16.11.2011)
Wife: Priscilla Ratna (B. 26.6.1960)
G.1. Moushumi D'Rozario (B. 5.2.1986; M. 23.1.2015)
Husb. Samarendra Halder (B. 17.1.1983)
H.1. Souryadeep Dominic (B. 13.3.2016)
H.2. Samuel (B. 12.11.2020)
G.2. Nicholas Rajib D'Rozario (B.22.5.1991)
G.3. Shonjoy D'Rozario (B. 28.10.1994)
F.2. Reba D'Rozario (B. 9.9.1952; M. 11.3.1972)

Husb. Daniel Gomes (B.5.6.1947; D. 15.6.2011)

G.1. Gabriel Gomes (B.26.4.1975; M. 27.1.2002)

Wife: Veronica Monju (B.28.1.1983)

H.1. Tanniya Christina Gomes (B. 27.3.2003)

H.2. Angela Gomes (B.16.11.2014)

G.2. Sumita Martha (Pinky) (B. 28.4.1981; M. 8.6.2007)

Husb. Venket Reddy (B. 16.3.1980)

H.1. Rose Tanvi (B. 30.7.2009)

H.2. Aradhya (B. 22.10.2016)

F.3. Lawrence Babu D'Rozario (B. 3.12.1953: M. 9.12.1984)

Wife : Nomita (B. 5.6.1961)

G.1. Manuel Bikky D'Rozario (B. 6.11.1989; M. 15.1.2021)

Wife : Agnes Gomes

F.4. Joseph Munu D'Rozario (B. 21.3.1955; M. 10.11.1993)

Wife: Sumita Florrence (B. 2.12.1968)

F.5. Ranu Mary D'Rozario (B.7.1.1957; M. 19.1.1994)

Husb. Jhantu D'Rozario (B. 24.4.1953; D. 25.8.2015)

G.1. Veronica Putu D'Rozario (B. 15.7.1995; M. 10.5.2019)

Husb. Arup Sarker (B. 12.11.1987)

F.6. Vincent Swapon D'Rozario (B. 26.2.1960)

F.7. John Chobay D'Rozario (D. 4.1.1962)

F.8. Josephine Buri D'Rozario (B. 11.8.1968; M. 14.2.1994

Husb. Ashit Das (B. 21.12.1954)

G.1. Sudeep Das (B. 26.10.1995)

N.B. Thanks to Josephine Linda Bhattacharya for updating E-2. (March 2021)

E.3. Clarence Valentine D'Rozario (B. 29.10.1927; M. 4/3/1957; D. 31.07.2011)

Wife: Philomena Gomes (B. 02.06.1943;)

F.1. Nilima D'Rozario (B. 10.02.1962; M. 10.01.1985)

Husb. Samson D'Silva (B: 15.08/1954; D. 12.3.02)

G.1. Benedict Steve D'Silva (B. 27.01.1986; M. 28.12.2012)

Wife Mouree Diana Chowdhury (Separated)

G.2. Sophia D'Silva (B. 16/10/1990 M.14/02/2020)

Husb: Anik Baroi (B. 06/06/1990)

F.2. Evon D'Rozario (B. 27/03/1964; M. 31/05/1990)

Husb. Gerald Gomes (B. 09/06/1958; D.)

G.1. Prianka Angela Gomes (B. 30/09/1992)
G.2. Dipankar Manuel Gomes (B. 24/02/1994)

F.3. Apu Catharina D'Rozario (B. 14/08/1965; M. 11/02/1983)
Husb. Bhanu Gomes (B. 21/12/1952)
G.1. Paul Micky Zicko Gomes (B. 06/02/1984; M. 25/04/2014)
Wife Annet Soma Guda (B. 18/05/1988)
H.1 Ricardo Ethan Gomes (B. 06/07/2015)
G.2. Richard Ricko Gomes (B. 03/07/1988)
G.3 Apurbo Benjamin Gomes (B. 11/10/1990)

F.4. Godfrey Dipu D' Rozario (B. 27/09/1968; M. 30/12/1996)
Wife: Octovia D' Rozario (B. 21/09/1976)
G.1. George Valentine D'Rozario (B. 10/10/1997) (M. 11/10/2024)
Wife: Loreta Sanchari Howlader (B. 28/01/2000)
G.2. Jack Jonathan D'Rozario (B. 18/08/2004)
G.3. Jesus Jordan D'Rozario (B. 24/03/2014)

F.5. Napolean Nipu D'Rozario (B.18/03/1977; M. 25/11/1998)
Wife: Rini Elizabeth D'Rozario (B. 27/03/1978)
G.1. Progga Agnes D'Rozario (B. 16/01/2000
G.2. Prottoy Emmanuel D'Rozario B. 25/12/2001

F.6. Michael Sipu D'Rozario (B. 23/11/1974; M. 02/04/2002)
Wife: Nancy Gomes (B. 10/02/1982)
G.1. Sneha Philomena D'Rozario (B. 09/09/2007)
G.2. Ador Patrick D'Rozario (B. 10/10/2010)
N.B. (Thanks to Evon for updating E-3 (Nov. 2021)

E.4. Colette D'Rozario (B. 5/2/1931; M. 24/04/1945, D. 11/03/2006)
Husb. Evelyn Gomes (D. 26.01.1991)
F.1. Dipti Gomes (B. 29.08.1946; M. 08.2.1965)
Husb. Wilson Gomes (B.11/01/1936; D. 23/05/2016)
G.1. Jhunu Scholastica Gomes (B. 11/09/1966)
Husb. Eric Gomes (B. 10/11/1965)
H.1. Mukta Margarette Gomes (B. 18/01/1989)
Husb. Tusher Gomes
H.2. Cyprian Rana Gomes (B. 28/04/1991; D. 04/09/2013)

H.3. Roni Wilson Gomes (B. 28/04/1991)

G.2. Munu Gomes (B. 20/09/1970; M 30/12/1994)
Husb. Bhanu Paul Gomes (B. 01/01/1968)
H.I. Diana Gladdice Gomes (B. 02/02/1996)
H.2. Shorna Eligabeth Gomes (B. 01/10/1997)
H.3. Richard Gomes (B. 13/12/2002)

G.3. Liton Gomes (B.14/07/1975; D. 26/06/2010)

G.4. Uttam James Gomes (B. 25/11/1978; M. 30/12/2011)
Wife: Victoria Putuli Gomes (B. 13/03/1992)
H.1. Anthony Anupom Gomes (B. 13/06/2014)
H.2. Olivia Angeli Gomes (B. 19/06/2018)

F.2. Victor Charles Gomes (B. 24/12/1949; M. 12/02/1977; D. 22/5/2007)
Wife: Theresa Gomes (B.06/12/1949)
G.1. Prayma Gloria Gomes (B. 02/12/1978; M. 23/01/2004)
Husb: Jewel Sarker (B. 05/01/1974)
H.1. Julian Prottoy Sarker (B. 28/12/2004)
G.2. Pronoy Laroch Gomes (B. 03/01/1982; M. 29/09/2003)
Wife: Natalie Deluka Nathaielsz (B. 10/08/1982)
H.1. Nibedita Prathona Gomes (B. 05/04/2005)
G.3. Silvia Purnima Gomes (B. 18/09/1985) (M. Annuled)

F.3. Petrolina Gomes (B. 07/11/1951; M. 04/05/1968)
Husb. Wilson Gomes (B. 29/05/1938; D. 03/02/2021)
G.1. Champa Maria Gorety Gomes (B. 30/09/1969; M. 05/01/1990; D.)
Husb. Robert Ranjan Gomes (B. 04/05/1967)
H.1. Shirley Gomes (B. 17/03/1992; M. 27/08/2021)
Husb. David Singh (B. 27/01/1991)
H.2. Seavers Sanju Gomes (B. 11/08/1993)
Wife: Shatabdi Loerdmary Gomes (B. 14.05.2000)
G.2. James Gomes (B. 05/12/1971; M. 18/02/2000)
Wife: Eva Rozario (B. 16/02/1976)
H.1. Oscar Orka Gomes (B. 26/07/2004)
H.2. Jerome Troy Gomes (B. 10/01/2007)
G.3. Anna Papri Gomes
(B. 23/11/1974; M. 21/10/1993; D 01/02/2001)
Husb: John Liton Halder
H.1. Sharen Valentina Halder (B. 07/02/1995)

F.4. Helena Gomes (B. 09/02/1953; M. 12/05/1979)
Husb. Albin Ranjan Gomes (B. 17/10/1950)
G.1 Sumi Sharmistha Gomes (B. 20/09/1980; M. 10/08/2003)
Husb. Rana Dominic Gomes (B. 27/07/1974)
H.1. Simran Veronica Gomes (B. 02/07/2005)
H.2. Rachel Tania Gomes (B. 30/03/2009)
G.2. Papon Gomes
F.5. Joanna Gomes (B.26.12.1957; M. 24.10.1975 D.23.03.2019
Husb. Louis Quiah (B. 26.04.1947; D. 21.12.2001)
G.1. Angela Jacklin Quiah
Husb. Rohindranath Dhali
H.1. Arundruti Orchi Dhali
H.2. Preetam Prince Dhali
G.2. Ratna Jenifer Quiah
Husb. Franklin Titus Gomes
H.1. Josiah Rudolph Quiah
H.2. Gianna Aurora Quiah
G.3. Joachim Alfred Quiah (B.16.07.1979; M. 21.01.2011)
Wife: Runa Sonia Penheiro (B. 21.09.1981)
H.1 Ethan Maxwell Quiah (M.12.04.2012)
G.4. Maxwel Rudolph Quiah (B.12.09.1980; D.16.12.2010)
F.6. Agnes Provati Gomes (B. 19.01.1958; M. 22.05.1972)
Husb. Clarence Gomes
G.1. Mita Victoria Gomes (B. 19.01.1958; M. 20.04.2001)
Husb. Jacob Anup Costa (B. 23.04.1974)
H.1. Anindo Costa (B. 05/09/2009)
G.2. Rita Gomes
Husb. Julian Quiah
H.1. Daniel Quiah
G.3. Charles Titu Gomes (B. 26.10.1978; M. 16.06.2004)
Wife: Prina Dibra (B. 02.01.1980)
H.1. Christina Dipa Gomes (B. 15.04.2005)
H.2. Martha Dessi Gomes (B. 29.07.2010)
G.4. Stephen Roni Gomes
F.7. Charles Waltar Gomes (B. 19/03/1961; M. 06/07/1991; D. 17/11/2012)
Wife: Maryline Anupama Adikhari (B. 13/09/1972)

G.1. Prem Patrick Gomes (B. 16/06/1993; M. 19/01/2018)
Wife: Mariline Mou Rozario (B. 12/10/1993)
H.1. Eleanor Mikayla Gomes (B. 19/03/2021)
G.2. David Pranto Gomes (B. 20/11/1995; M. 13/04/2021)
Wife: Janey Martha Gomes (B. 28/04/1989)
F.8. Mary Doly Gomes (B. 13/06/1970; M. 22/04/1981)
Husb. Newton Gomes (B. 06/06/1956)
G.1. Dorothy Shina Gomes (B. 26/07/1985; M. 26/12/2006)
Husb. Henry Tipu Rozario (B. 07/07/1983)
H.1. Mary Tisha D' Rozario (B. 03/11/2007)
H.2. Cecilia Annayasha Rozario (B. 02/07/2011)
H.3. Achilles Newton D' Rozario (B. 12/07/2020)
G.2. Aney Gomes (B. 26/08/1988; M. 01/05/2013)
Husb. Sumon Benjamin Costa (B. 26/01/1983)
H.1. Justin Anthony Costa (B. 17/06/2014)
H.2. Jeshon Joachim Costa
F.9 Promila Victoria Gomes
Husb. Milton Quiah
G.1. Christella Nelly Quiah (B. 25/12/1985; M. 16/01/2009
Husb: Stanley Dipu Mozumdar (B. 28/12/1982)
H.1. Florentila Adrita Mozumder (B. 14/11/2010)
H.2. Issac Alexandar Mozumder (B. 10/07/2017
G.2. Priscilla Martha Quiah (B. 26/04/1987; M. 23/08/2013)
Husb. John Gomes (B. 20/11/1985)
H.1Arvin Evans Gomes (B. 09.04.2015)
H.2. Elisa Matilda Gomes (B. 27.07.2024)
G.3. Gary William Quiah (B. 01.05.2001)
F.10. Babu Gomes (B. 03.01.1972; M. 30.12.1998)
Wife: Josna Gonsalves (B. 10.09.1978)
F.11. Noel Gomes (B. 22.08.1972; D. 8.9.1990)

"Special Relations because Cynthia called Collette "Mom"
Cynthia Gomes (B. 20.02.1947; M. 03.02.1965; D. 30.01.2014)
Husb. Subash Sarker (B. 17.09.1942; D. 27.12.2007)
G.1. Maristella Jharna Sarker (B. 06.02.1966)
Husb. Mr. F. Roy
H.1. Steve Vincent Roy (23.07.1989)

H.2. Peter Austin Roy (09.05.1996)

G.2. Pinku Anthony Sarker (B. 08.01.1967; M. 16.01.1997)

Wife: Bridget Chompa Sarker (B. 18.07.1977)

H.1. Keven Augustin Sarker (B. 09.01.2001)

H.2. Christopher James Sarker (B. 19.10.2001)

G.3. Juliet Lipi Sarker (B. 09.08.1996; M. 05.03.2017)

Husb. Elvis Cruze (B. 11.10.1996)

G.4. Marshal Rinku Sarker (B. 04.02.1974; M. 02.01.2002)

Wife: Sylvia Leoni Sarker (B.24.06.1979)

H.1. Borsho Karine Sarker (B.08.01.2003)

H.2. Augustine Sporsho Sarker (B. 27.06.2007)

N.B. Thanks to James Gomes for updating E.4 (Nov. 2021)

E.5. Veronica Hilda D'Rozario (B. 24.4.34; M. 4.3.1947; D.21.2.2010)

Husb: Sebastian Gomes (B. 04.04.1925; D. 1.7.1997)

F.1. First Child died at birth

F.2. Joyesree Gomes (B. 22.8.1951; M.17.8.01; D. 10.11.2020)

Husb. Fidelis Dessa (B.14.9.1944; D.17.8.2001)

G.1. Joy (Buba) Dessa (B. 6.3.1979; M. 4.1.2008)

Wife Lisa Mimi (B.25.9.1982)

H.1 Tristan Dessa (B. 20.11.2011)

F.3. Eric Gomes (B. 17.1.1953; M. 3.10.1984)

Wife Rufina Gomes (B. 19.12.1956)

G.1. Chironjit Gomes (B. 4.7.1986; M. 28.12.2015)

Wife: Cindela (B. 8.1988)

H.1. Cavin (D. 17.9.2018)

H.2.

F.4. Tapan Desmond Gomes (B. 6.8.1954; M. 14.10.1984; D.)

Wife Lidia Krishna Gomes (B. 29.3.1965)

G.1. Dona Surya Gomes (B.19.5.1986; M. 27.10.2012)

Husb. Anosh Verghees (B. 30.8.1982)

H.1 Ellain (B. 25.11.2013)

H.2. Eric (23.10.2018)

H.3.

F.5. Madhobi Clara Gomes (B. 10.2.1960; M. 12.10.1981)
Husb. Pius Gain (B. 16.8.1946; D. 14.9.2018)
G.1. Biswajit Gain (B. 17.9.1983; M. 14.2.2011)
Wife: Sawagota (B. 4.12.1986)
H.1 Angel Veronica (B. 22.1.2013)
G.2. Abhijit Gain (B. 29.3.1985; M.18.1.2010)
Wife: Andrica (separated); Remarroed
H.1 Barbee Morium (B. 24.10.2014)
F.6. Angela Rina Gomes (B. 30.9.1962; M. 6.3.1985)
Husb. Sudip Gomes (B. 24.8.1958)
G.1. Arindam Gomes (B. 20.9.1986)
G.2. Ria Gomes (B. 26.7.1991; M. 21.6.2010)
Husb. Santanu Singha
H.1. Shrisha Singha (B. 22.6.2019)
F.7. Godfrey Swapon Gomes (B. 30.10.1964) + Patel Robertson
Wife : Patel Robertson (Separation)
Wife Anju 2nd Marriage:
G.1. Andrea Gomes (B. 5.4.2000)
F.8. Margaret Bani Gomes (B. 20.2.1966; M. 27.2.1990)
Husb. Joseph Ramu Gomes (B. 29.2.1960)
G.1. Ricky Gomes (B.15.2.1991; M. 24.10.2019; D. 12.7.2020)
Wife: Silvia (B. 15.2.1997)
F.9. Miscarriage Child
F.10. Dorothy Mira Gomes (B. 6.2.1969; M. 4.1.1988)
Husb. Nirmol Gomes (B.12.1.1965)
G.1. Rimi Gomes (B. 4.9.1990; M. 8.1.2018)
Husb. Max Gomes (B. 21.9.1990)
H.1. Mathias (B. 14.5.2020)
H.2. Abigail (B. 2.9.2021)
F.11. Ratan Noel Gomes (B. 1.8.1970; M. 18.6.1998)
Wife: Sheuli Bareek (B. 23.10.1976)
G.1. Reeshav Sebastian (B. 23.7.2000)
G.2. Reeju Gomes (B. 23.1.2006)
F.12. Jharna Philomena Gomes (B. 17.9.1973; M. 11.5.1996)
Husb. Kollayan Gomes (B. 25.7.1969)
G.1. Trishita Gomes (B. 15.1.2000)

F.13. Florence Mona Gomes (B. 8.5.1976; M. 19.9.1999)
Husb. Bashob Sarker (B. 24.8.1970)
G.1. Tithi Sharon (B. 14.9.2000)
G.2. Auditya Erica (B. 18.12.2008)

E.6. Gabriel D'Rozario (B. 4.7.1936; D. 13.8.1959)

E.7. Iris D'Rozario (B. 17.8.1940; M. 18.2.1957)
Husb: Martin Gomes (B. 20.9.1926; D. 20.12.1986)
F.1. Babu Aloysious Gomes (died after 15 months)
F.2. Romeo Gomes (adopted) (B.1.9.1963)
Wife Gitaly
G.1. Biswajit (17.9.1984)
F.3. Agnes Mary Yvonne Gomes (B. 14.1.1965; Rel. Prof.
Fin. Prof. 9.6.1996; Bp. Patrick & Bp. Linus)
F.4. Josephine Linda Gomes (B. 2.12.1967; M. 18.11.1991)
Husb: Rothin Bhattacharya (B. 5.8.1967)
G.1. Prianka Bhabna (B. 15.10.1993)
G.1.Rohit Rahul (B.7.1.2001)
F.5. Nelson Aloysius (Babu) Gomes (B. 23.8.1969; M. 7.2.1994)
Wife: Shoma Biswas (B. 24.10.1971)
G.1. Ankita Mimi (B. 22.1.1995)
N.B. Thanks to Josephine Bhattacharya for updating E-5 & 7. (March 2021)

E.8 Patrick Peter D'Rozario (B. 01.10.1943)
Entry into Holy Cross Novitiate, Sagardi (13.06.1961)
First Profession in Holy Cross (14.06.1962)
Final Profession in Holy Cross (01.01.1971)
Priestly Ordination (08.01.1972)
Episcopal Ordination: First Bishop of Rajshahi (12.9.1990)
Installation as Bishop of Chittagong (21.04.1995)
Coadjutor Archbishop of Dhaka (25.11.10)
Archbishop of Dhaka (22.10.2011)
Appointment as Cardinal (09.10.2016)
Installation in Rome as Cardinal (19.11.2016)
Retirement as Archbishop of Dhaka (01.10.2020)

দ্বিতীয় অধ্যায়: উইলিয়াম ডি'রোজারিও, পন্ডিত বাড়ির বংশ-তালিকা

B.1. William D'Rozario (Pandit Bari, Dighirpar) +
C.1. Francis (Michael) D'Rozario + Anna Maria Gomes
D.1. John (Dimu) D'Rozario

E.1. Justina D'Rozario + Venancio (Banas) D'Costa
E.2. "Seraphina D'Rozario + Benedict Gomes
(Deshantarkati, Uttar Bari)"

D.2. Manuel (Notu) D'Rozario

E.1. Napoleon D'Rozario+ D/O Post Master
F.1. Philomena D'Rozario + Robin D'Rozario
G.1. Shobita Gomes +
G.2.. Shima Gomes + Swapon Gomes
H. 1. Abhishek
H. 2. Animesh
G. 3. Nomita Gomes +
G.4. Tapan Gomes
F.2. Panku D'Rozario + Maria Dias
G.1. Juliet D'Rozario +
G.2. Molly +
G. 3. Peter D'Rozario +
G. 4. Castra D'Rozario +
F. 3. Sr. Bondona (Sr. Anne's Congregation)
F. 4. Dolly Rozario + (husband died)
F. 5. Koly D'Rozario + Suresh
F. 6. Martina D'Rozario +

E 2. Joanna Dorothy D'Rozario
E.3 Milligan James D'Rozario
F. 1. John Gregory Nipu D'Rozario
F. 2. Elezabeth Beauty D'Rozario
F. 3. Methilda Sweety D'Rozario
F. 4. . Manuel Demarce D'Rozario
E. 4. Carolina D'Rozario + Abel Gomes,S/o. Joseph Baburchi)
E. 5. Eugene D'Rozario (F/O of Nipu's wife, Parer Babur Bari)
F. 1. . Joseph Jewel D'Rozario

F. 2. Rosemary Jui D'Rozario
F. 3. David Rony D'Rozario
F. 4. Elezabeth Rini D'Rozario
F. 5. Perpetua Jhini D'Rozario
F. 6. Teresa Monica D'Rozario
F. 7. James Jhony D'Rozario
F. 8. . Jacob Sunny D'Rozario

E. 6. Angelina Shanti D'Rozario (W/O. Prof. Gabriel Manik)
E. 7. Theresa Aloka D'Rozario (w/o Solomon Malu Costa, Nagari,Dhaka)

D. 3. William Ramuel (Ram) D'Rozario + Agnes Albina Gomes (Deshantarkathi)

E. 1. Maria D'Rozario
E. 2. Magdalena Putty D'Rozario
E. 3. Abel D'Rozario
F. 1. Anna Milion D'Rozario + Paul Pintu Gomes (S/o. Jantu Gomes)
F. 2. William Brian D'Rozario
F. 3. Philomina Leone D'Rozario + Pius D' Costa(Daroga Bari)
F. 4. Juliet Santana D'Rozario + Philip Dilip Gomes (Matibhanga-Canada)
F. 5. Charles Octive D'Rozario
F. 6. Andrew Prottush D'Rozario

D. 4. Samuel (Sam) D'Rozario + Priscilla Gomes (Matibhang)

E. 1. Martina Mato D'Rozario + Anthony Gomes (Michael Chukidar Bari)
E. 2. Catharina D'Rozario + Valerina
E. 3. Francis Boni D'Rozrio
E. 4. Regine D'Rozario
F. 1. Joseph Samir D'Rozario
F. 2. Maria Goretti Rina D'Rozario
F. 3. Washington Shymol D'Rozario
F. 4. Jasinta Shima D'Rozario
F. 5. Samuel Komol D'Rozario
F. 6. Olivia D'Rozario
F. 7. Precila Octovia D'Rozario
F. 8. Francis Titu D'Rozario
F. 9. Jerry Nixon Mithu D'Rozario
F. 10. Prince Stanislaus D'Rozario

E. 5. Oliver Albin D'Rozario

E. 6. Blaise Hurbert D'Rozario

F. 1. Monica Poline D'Rozario

F. 2. Rosy D'Rozario

F. 3. Precila Shila D'Rozario

F. 4. Henry Lawrence Liton D'Rozario

F. 5. Teresa Leela D'Rozario

F. 6. Mary Stela Rita D'Rozario

F. 7. Abraham Lincoln D'Rozario

E. 7. Marceline Khokon D'Rozario

F. 1. Fr. Ripon Anthony D'Rozario

F. 2. Charles Joachim D'Rozario

E. 8. Barbara D'Rozario + Richard Diky Frazer (Tumilia, Dhaka)

D. 5. Joseph (Josi) D'Rozario + Cecilia Gomes

E. 1. Rock Robin D'Rozario

F. 1. Joseph Gerald Dilip D'Rozario

F. 2. Gertrude Dipali D'Rozario

F. 3. Gabriel Dipok D'Rozario

F. 4. Marian Dipika D'Rozario

F. 5. Maria Deepti D'Rozario

F. 6. Roselda Dipanki D'Rozario

F. 7. Grace Dipa D'Rozario

E. 2. Rita Fluery D'Rozario + Banas Gomes (Pankhawala Bari)

F. 1. George Topon Gomes

F. 2. Maria Goretti Mona Gomes

F. 3. Komol Gomes

E. 3. German Medin D'Rozario

F. 1. Prechencia Diba D'Rozario

F. 2. Cecelia Eva D'Rozario

F. 3. Teresa Munni D'Rozario

F. 4. Elezabeth Mukta D'Rozario

F. 5. Benedict Dipankar D'Rozario

F. 6. . Briget Rikta D'Rozario

তৃতীয় অধ্যায়: ফিলিপ ডি'কস্তা (পোস্টমাস্টার) বাড়ির বংশ-তালিকা

Former Generations

B.1. William D'Rozario (Pandit Bari, Dighirpar) +

C.1. Francis (Michael) D'Rozario + Anna Maria Gomes

C.2 Cecilia D'Rozario + Manuel D'Rozario

(Abp. Patrick's Grand Mother and Grand Father)

C.3. Agnes D'Rozario + Gabriel D'Costa

D.1. Philip D'Costa (Postmaster) + Delphina (D/O. Lalu Shikdar)

E.1. Alexandra (Xandra) D'Costa + Peter Paul Gomes

F.1. Henrietta Gomes (Boton) + Alley Joseph Belasso

G.1. Gertrude Joyce Belasso + Mauro D'Souza

H.1. John D'Souza + Neha Agarwal

H.2. Arun William D'Souza

H.3. Andrea D'Souza

G.2. Ophelia Belasso+Anthony Quiah

H.1. Christel Quiah+Tuhin Quiah

H.2. Cassandra Quiah

G.3. Patricia Belasso + Ronald Quiah

H.1. Charles Bruno Quiah + Priyanka Cecilia D'Cruze

H.2. Clyde Brenton Quiah + Valentina Shaha

H.3. Clayton Bradley Quiah

G.4. Maclean Jude Belasso + Natasha Pereira

H.1. Clyde Shawn Belasso + Nadia

H.2. Kaitlyn Belasso

G.5. Ryan Dominic Belasso + Cheryl Pereira

H.1. Nicole Belasso

H.2. Matthew Belasso

F.2. Dorothy Senorita Gomes (Runu) (D. 5.6.2004)

Husb. Lawrence Rodrigues (B.9.10.1939, M. 5.6.1965, D. 16.05.2021)

G.1. Jasper Kenedy Rodrigues (B. 9.3.1966) + Lina Gomes*

H.1. Melissa Rodrigues

H.2. Austin Joel Rodrigues

G.2. Anita Rodrigues (B. 21.02.1970) + Jacob Mondol

H.1. Lindsay Pipasha Mondol

H.2. Alio Plabon Mondol

G.3. Fr. Terence Rodrigues (B. 3.11.1967, Ord. 8.11.1996)

G.4. Benedicta Rodrigues (B.31.08.1975)
Husb. Christopher Lawrence Quiah
H.1. Shane Joshua Quiah
H.2. Alec Jordan Quiah

F.3. Arnold C. Gomes
Wife: Lily Usha Gomes
G.1. Moushumi Shilpi Gomes + Shalin Chowdhury
H.1. Shimanto
H.2. Shayonto
H.3. Shopto
G.2. Falguni Gomes + James Adhikary
H.1. Arko
H.2. Rochona
G.3. Rana Gomes + Misty Huck
H.1. Anghina
H.2. Abbritri
G.4. Kakon Gomes+ Babu Gomes

F.4. Ratna Gomes + Patrick Gomes
G.1. Mary Gomes
G.2. Bini Gomes
G.3. Damian Gomes
G.4. Dicky Gomes

F.5. Allen James Gomes (Kobi) + Elizabeth Dasgupta (Khulna)
G.1. Olimpia Gomes
G.2. Claudia Jolly Gomes

F.6. Jacinta Gomes + George D'Sanges
G.1. Ralph James D'Sanges + Vernita
G.2. Ruth Clare D'Sanges + Ross Umbrello
G.3. Andre Matthew D'Sanges

চতুর্থ অধ্যায়: গ্রেগরী পিওন ডি'রোজারিও বাড়ির বংশ-তালিকা

V: CARDINAL PATRICK'S GRAND UNCLES AND AUNTIES

A.1. Paulo D'Rozario + 2nd marriage with Muslim Girl from SayeedGen. (1800?)
Cardinal Patrick's Great Great Grand Father

B.1. Adai D'Rozario (1832 ?) + Wife (?)
Cardinal Patrick's Great Grand Father

B.2. Mariano D'Rozario + Wife (?)

C.1. Gregory (Peon) D'Rozario + Regina (lst Wife) + Rufina (2nd mar.)
Wife First Marriage: Regina; Second Marriage: Rufina

D.1. Peter D'Rozario + Catherine Gomes

E.1. Theresa D'Rozario (1933-2017) + Claud Gomes (1925-1991)

F.1. Marcillius Sanu Gomes + Mary Nelly Francis

G.1.Rachel Jena Gomes (adopted)

F.2. Bernadette Gomes + Cedric Clement Randolph

G.1. Karen Dorothy Randolph +Evertte Johnson

G.2. Dominic Clive Randolph +Cheryl Gonsalves

H.1 Anaya Randolph

H.2 Taylan Randolph

G.3. Conred Randolph

F.3. Yvonne Gomes + Stanford Aloyisus Pereira (1952-2020)

G.1. Avila Sabrina Pereira

G.2. Aren Savio Pereira +Faith Richerdson

H.1 Racco Evan Pereira

H.2 Royee Kaven Pereira

F.4. Juliana Gomes + Rony Gomes (1954-2021)

G.1. Savio Ray Gomes + Cecilia Penheiro

G.2. Stuart Rayan Gomes+ Poly Sarker

H.1 Samyia Gomes

H.2 Jaxon Adniou Gomes

G.3.Shawan Rory Gomes

F.5. Clotilda Gomes (1961-2020)+ Derek Gonsalves

G.1. Aleasta Gonsalves

F.6. Mildred Gomes + Allen Thomas

G.1. Sheldon Thomas

G.2. Shamul Thomas

G.3. Savnna Thomas

F.7.Eilves Gomes +Hilda Gomes

G.1Claudia Gomes

G.2.Claude Gomes

G.3 Crystal Gomes

F.8. Brian Gomes +Leonita Shipra Gomes *

G.1. Brace Gomes

G.2.Brinna Gomes

F.9. Kingsley Gomes + Rosy Rozario

G.1. Elishah Hilaria Gomes (2000-2023)

G.2 Eluiro Gomes

F.10. Adrian Gomes + Priti Kana Bollove

G.1.Fiona Athalia Gomes

F.11. Sandra Gomes + David Rozario

G.1. Leahia Rozario

G.2. Danial Rozario (D-2017)

G.3. Mikaela Rozario

E.2. Dorothy D'Rozario + Augustine Gomes

F.1. Newtom Gomes + Mary Dolly Gomes *

G.1. Dorothy Shina Gomes + Henry Tipu D Rozario

H.1.Cicilia Annshya D Rozario

H.2. Achilles Newton D Rozatio

G.2. Contela Anny Gomes + Sumon Benjamin Costa

H.1 Justin Anthony Costa

H.2 Jeshon Joachim Costa

F.2. Ignatius Babu Gomes + Shabita Gomes

G.1. Clive Gomes

F.3. Elizabeth Baby Gomes + Shyamol Gomes

G.1. Shormily Gomes

G.2. Shoshi Gomes + Silvia Salina Mandez

F.4. Albert Prasanta Gomes + Rina Joanna D'Rozario *

G.1. Dipto Gomes

G.2. Pranto Gomes

F.5. Beauty Gomes + Sebastian Mondol

G.1. Selin Teresa Mondol +Milon Dhali

H.1Methio Sushil Dhali

G.2.Shon Stiphen Mondol

F.6. Leoni Gomes + Martin Gomes

G.1.Agnes Jenny Gomes +Christopher Penheiro

F.7. Catherina Lina Gomes + Jasper Kanny Rodrigues*

G.1. Melissa Rodrigues*

G.2. Austin Joel Rodrigues

E.3. Isaac D'Rozario + Philomena Ranga Gomes

F.1. Shobita D'Rozario + Khokon Biswas

F.2. Basil D'Rozario + Beauty Biswas

F.3. Minu D'Rozario + Babul Rozario

G.1. Akash Rozario

G.2. Marlyn Rozario

F.4. Bina D'Rozario + Solomon Sarker

G.1.Stive Alles sen Sarker

G.2 Monica Gloria Sarker

F.5. Rina D'Rozario + Komol Gomes

G.1. Grace Gomes

F.6. Shila D'Rozario + Leo Gonselves

G.1. Austin Gonselves

G.2.Alvin Gonselves

F.7. HilariusElu D'Rozario +Shima Mondol

G.1 .Alex D Rozario

G.2. Eloria D Rozario

E.4. "Robin D'Rozario + Theresa D'Rozario, (Hashnabad)"

F.1. Roni D'Rozario (adopted) + Mukti D'Rozario

G.1. Rana D'Rozario

F.2. Shima D'Rozario + Bijoy Rozario

G.1. Epiphania Rozario

F.3. John D'Rozario + Elin D Rozario

G.1. Joy D Rozario

F.4. Chamelia D'Rozario+ Pinku Rozario

E.5. Sylvester D'Rozario + Mary Biswas

F.1. Anthony Komol D'Rozario + Anna Quiah

G.1. Teresa Twinkle D'Rozario

G.2. Alfred Stanely D'Rozario

F.2. Peter Shaymol D'Rozario + BernadeteMoreino

G.1.Noven Karen D Rozario

G.2 Shalden D Rozario

F.3. Roseline Shaymoli D'Rozario

F.4. Silvia Sandy D'Rozario + Dominic Shamson

F.5. Jacob Sumon D'Rozario+ Taposhe Sarker

G.1. Adrianna Gabriella D Rozario

G.2. Andrea Jonna D Rozario

E.6. Dominic D'Rozario + Shelly Gomes

F.1. Shampa D'Rozario +Jerry Penheiro

F.2. Shilpi D'Rozario

F.3. Sumi D'Rozario

E.7. Shanti D'Rozario + Albert Piku Gomes

F.1. Bijoy Gomes + Dolly Catharine Gomes

G.1.Christopher Prony Gomes

G.2. George Prokash Gomes

G.3.Teresa Prantika Gomes

F.2. Binoy Gomes + Rina Gomes

F.3. Rosevelt Gomes+Tina Veronica Gomes

G.1. Albert Pritom Gomes

G.2.Inesta Pratik Gomes

F.5. Larose Gomes + Madhabi Jharna Gomes

G.1. Alexzander Proloy Gomes

G.2.Kaspiya Gomes

D.2. Norman D'Rozario + Fulkiria (lst Mar.) + Margaret (2nd Mar.)(Cal)

E.1.Lilly D'Rozario + Sebastian Coilhoe

F.1. Rony Coihoelo

F.2. Anasthu Coihoelo

F.3. Aroti Coihoelo

F.4. Ava Coihoelo

F.5. Tonny Coihoelo

F.6.Tarun Coihoelo

E.2. Dilip D'Rozario (d. 20.10.2011, Ctg) + Barbara Chinu Biswas

F.1. Levio Lincoln D'Rozario

F.2. Bob Bush D'Rozario

E.3. Damian Depankar D'Rozario + Theresa Rozario

F.2. Romeo D'Rozario+Tushi Teresa Gomes

G.1.Aaron D Rozario

F.3. Rubi D'Rozario

E.4. Cecilia Ila D'Rozario + Nanu Moses

F.1. PrityVelankini Moses

E.5. Marcel Shankar D'Rozario + Monlina Sarkar

F.1. Angela D'Rozario

D.3. Richmond D'Rozario (B. 5.07.1916; M. 24.02.1943; D. 30.10.1980) + Celina Campoo (B. 15.03.1926)

E.1. Clorine Swapan D'Rozario + Rita Gomes

F.1. Lisa D'Rozario+Subra Gomes

G.1. Hidhy Gomes

E.2. Jacinta D'Rozario + Gerald Gomes (Died 17.1.1994)

F.1. Christopher Rocky Gomes + Florence Mukta Gomes

G.1. Rufash Gomes

G.2. Arora Gomes

F.2. Vallery Jessica Gomes + Andrew Rodrigues

G.1. Josh Rodrigues

E.3. AkhilaD'Rozario (B. 2.01.1954; M. 22.06.1991) + Cecilia Quiah (B. 27.04.1967)

F.1. Naomi D'Rozario (B.29.05.1992; M. 14.02.2014) + Joachim Costa

G.1. Nerissa G. Costa (B. 25-4-22).

F.2. Natalie D'Rozario (B.14.08.1998)

E.4. Angelina D'Rozario (B. 31.12.1955) + RaxAugley

F.1. Yvette Augly + Mervin

Ex husband Richard (Ricky) Gomes

G.1. Alexander Rouseau Gomes

G.2. Rono Gomes

F.2. Warren Augley + Vall Eqbal

G.1.Vivienne Augley

G.2.Yvonne Augely

E.5. Maria Dilkushi D'Rozario + John D'Costa (D. 1994)

E.6. Cyril Khokon D'Rozario (B. 09.02.1961) + Baby Baroi

F.1. Nicola D'Rozario

E.7. Elizabeth Tulu D'Rozario (B. 18.04.1963) + Daniel Dutta

F.1. Owen Robin Dutta

E.8. Rufina Shabitri D'Rozario (B. 13.02.1965) + Noel Polacco (B.01.01.1965)

F.1. Nathen Polacco (B.13.03.1991) + Anamika Gomes

E.9. Marlyn Lucky D'Rozario (B. 26.02.1969) + AldrineTul Tul Dewry

F.1. Ian Dewry

F.2. Ethen Dewry

E.10 Pakhi Jacklin D' Rozario

D.4. Sheby D'Rozario (D. 1999)+ Joseph Gomes (D.1972)

D.5. Anna Maria Kalo D'Rozario (D.1998) + Bernard D'Rozario (D. 1985 Ctg)

E.1. Gabriel D'Rozario

E.2. Raphael Danu D'Rozario + Juliet Malakar

F.1. Bernard Lincon D'Rozario+Prinka D Rozario

G.1 Leona Juliet D Rozario

G.2. Liones Simon D Rozario

G.3.Lopa Maria D Rozario

F.2. Greta Virginia D'Rozario + Shamir D'Rozario

G.1. Shiney D'Rozario

G.2. Glen D'Rozario

F.3. Anna Edith D'Rozario+Dominick Lelin Gomes

G.1.Judith Gomes

G.2.Daniel Ethen Gomes

F.4. Bernadette Khuku D'Rozario+ Pery Penheiro

E.3. Angelina Prabhati D'Rozario (D. 5.12.2006, Ctg)

E.4. Cynthia Shireen D'Rozario

E.5. William D'Rozario (D. 29.3.1999)

E.6. Jacinta Mary D'Rozario + Morshed Chowdhury

F.1. Siam Chowdhury +Emily Hildrey

E.7.Lina Marleen D'Rozario + Pulok Dhali

F.1. Aunik Arnold Dhali

F.1. Anannya Monica Dhali + Lincon Fernandez

D.6. Benedict D'Rozario (1923) (Cal) + Margaret Gomes

E.1.Sylvester Badol D'Rozario + Monjula Gomes

F.1. Anny D'Rozario

E.2. Tarcius Bablu D'Rozario + Kolpona Rozario

F.1. Lisa Sutishna D'Rozario

F.2. Lina D'Rozario

E.3. Adline Shila D'Rozario

E.4. Paul Bikash D'Rozario +Anjana D Rozario

F.1. Rick Richmond

E.5. AndrioBorun D'Rozario +Nipu D Rozario

F.1. Rose

E.6. Bernadette Bani D'Rozario + AmmitMondol

F.1. Anita Mondol

Akhila D'Rozario has updated the above with cooperation of others. August 1, 2024

C.2. Emmanuel (Showdagar) D'Rozario (Araibaki)

D.1. Elizabeth D'Rozario + Thaddeus Gomes (Cal)

D.2. Theresa D'Rozario + Banas D'Rozario

E.1. Roman D'Rozario (Dhaka)

E.2. Raymond D'Rozario (Dhaka)

D.3. Catherine D'Rozario + Benjamin Campoo (Deshantarkathi)

পঞ্চম অধ্যায়: যোসেফ গোমেজ হাওলাদার বাড়ির বংশ-তালিকা

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও'এর নানার বংশ-তালিকা

C.1. William Gomes (Nana)

Wife: Nani (Sister of German Pandit)

D.1.Emmanuel Shoda Gomes

Wife : Emily Gomes

(Abp. Patrick's maternal Uncle and Aunty)

E.1. Betty Gomes

Husb. Louis Gomes

E.2. Kalo Gomes

Husb. Kala Gomes (Kalada)

F.1. Xavier

E.3.Albin Gomes (died)

Wife: Catherina Gomes (died)

F.1. Badol Gomes (died)

F.2. Prodeep Gomes

Wife: Gita Gomes

G.1. Khokon Gomes

Wife: Archana Gomes

H.1. Liza Gomes

H.2. (Daughter)

G.2. Gopal Gomes

F.3. Dilip (Dilu) Gomes

F.4. Arun Gomes (B.4.7.1968; M.21.4.2010)

Wife: Madalena Gomes (B.30.12.1985)

F.5. Mary Celine Gomes (B.16.10.1971; M.11.6.1996)

Wife: Raphael Das (B.15.8.1965)

G.1. Riya Das (30.1.1999)

F.6. Putul Mariatta Gomes (B. 24.11.1974; M.8.8.1998)

Husb. Bidya Das (B.10.12.1978)

G.1. Susmita Das (B. 2.9.1998.)

Husb. Biswanath Sinha (B.20.2.1987)

I.1. Rishab Sinha (B.30.9.2021)

G.2. Sanchita Das (B. 22.12.2009)

E.4. Maria Gomes (died)

E.5. Elizabeth Gomes

E.6. Alloy Gomes (B. 24.11.1937; M. 11.10.1965

Wife: Rita Gomes (B. 4.5.1950; D. 19.7.2014)

F.1. Aparna Gomes (B. 31.8. 1967; M. 21.11.1991.)

Husb. Xavier Bimal Rozario (3.2.1963)

G.1. Annie Sneha Rozario (B. 9.10.1992)

F.2. John Suvro Gomes (B. 6.8.1969: M. 26.1.1998)

Wife: Judith A. Gomes (B. 14.5.1976)

G.1. Jeson Joy Gomes (B. 16.8.2000)

F.3. Ujjal Gomes (B. 18.10.1972.; M. 6.4.2002)

Wife: Jayashree Gomes (B. 24.10..1976.)

G.1. James Riyo Gomes (12.9.2004.)

F.4. Santo Gomes (B. 25.9.1975.; M. 28.12.2007)

Wife: Rose Mary Gomes (B. 18.05.1984)

G.1. Sara Mildred Gomes (B. 31.10.2008)

N.B. Thanks to Annie Sneha for updating D.1. (Nov. 2021)

D.2. Leo Gomes

Wife: Stella Gomes (Mridha Bari, Deshantorkathi)

E.1. Martin Gomes (B. 19.02.1923; D.02.04.1991)

Wife: Olivia Gomes (Matibhanga) (B. 31.11.1929)

(D. 20.11.2020)

F.1. Roseline Gomes (B. 27.04.1945)

Husb. Victor Campoo (B. 18.04.1944; D. 17.09.2012)

G.1.Pius Philip Campoo (B. 05.05.1967)

Wife: Srabanti Rakhi Campoo

H.1. Sharon Campoo

H.2. Nancy Campoo

G.2. Remegius Campoo (B. 06/09/1972; M. 01/02/2001)

Wife: Dolly Marth Campoo (16/10/1978)

H.1. Margerita Neha Campoo (B. 10.11.2001)

H.2. Noel Campoo (03/01/2008)

G.3. John Nirmol Campoo (B. 10/12/1974; M. 18/01/2006)

Wife: Mousumi Campoo (B. 05/11/1986)

H.1. Angelina Jesnny Campoo (B. 22/10/2006)

F.2. Oben Gomes (B. 04.11.1948); M. 03/06/1994)

Wife: Sagorika Gomes (B. 04.04.1965)

G.1.Francis Gomes (B. 01./04/1995)

F.3. Shomen Gomes (B. 01/01/1951; D. 16/090/2013)

F.4. Helen Mungli Gomes (B.12/09/1954)

F.5. Mongla Gomes (B. 15/02/1958)

Wife: Rita Gomes (D. 03/01/1970)

G.1. Mousumi Gomes (D. 08/05/1995)

G.2. Benedict Bikrom Gomes (D. 17/09/1999)

F.6. Lazarus Gomes (B. 09/04/1965)

F.7. Thomas Gomes (D. 20/09/1967; M. 14/10/1999)

Wife: Urmila Gomes (D. 28/08/1981)

G.1. Sucilia Gomes (B. 25.12./2002; M. 25/02/2019)

Husb.

G.2.Rony Gomes (D. 08/10/2007)

E.2. Zavier Gomes (B. .... 1931; D. 27/09/1997)

Wife: Beatrice Gomes (B. .... 1935)

F.1. Agatha Gomes (B. 30/11/1952; M. 12/03/1974)

Husb. Raphael Gomes (D. 01/01/1944; D. 24/02/2013)

G.1.Komol Leo Gomes (B. 04/03/1975; M. 02/02/2003)

Wife: Cynthia Gomes (D. 30.01.1978)

H.1. Kevin Gomes (B. 30/01/2009)

H.2. Kacey Gomes (B. 27/09/2014)

G.2. Peter Dipak Gomes (B. 12/10/1976; M. 12/01/2011)

Wife: Mitali Gomes (B. 06/06/1986)

H.1. Pamela Gomes (B. 23/10/2015)

G.3. Swapna Gomes (B. 05/10/1978; M. 07/05/2002)

Husb. Subir Corraya (B. 30/05/1969; D. 19/10/2017)

H.1. Dominic Corraya (B. 30/10/2017)

G.4. Parimal Gomes (B. 06/10/1981; M. 17/11/2010)

Wife: Mary Punam Gomes (B. 22/06/1986)

H.1. Angel Gomes (B. 13/09/2011)

H.2. Agnes Gomes (B. 01/11/2015)

G.5. Joseph Gomes (B. 01/08/1984; M. 28/01/2013)

Wife: Christina Gomse (B. 26/09/1984)

H.1. Adolpha Gomes (B. 17/04/2017)

F.2. Robin Gomes (B.06/05/1962; M. 25/01/1989)

Wife: Jharna Gomes (B. 02/10/1972)

G.1. Monisha Jenifer Gomes (B. 10/01/1995)

E.3. Seraphina Gomes (B. 06/10/1926; D. 12/06/1997)

Husb. Komol Roy (B. 21/09/1982)

F.1 - F.12

G.1-42

N.B. Thank to Josephine Linda Bhattacharya for updating D-2. (07/11/2021)

D.3. Veronica Missu Gomes (Cardinal's Mashi)

Husb. Ramuel Gomes

E.1. Stella Gomes

Husb. Joseph Gomes (South)

F.1-4. Four Sons

F.5-8. Four Daughters

E.2. Vincent Gomes (India)

E.3. "Augustine Gomes+ Bartha Gomes, Son : 4"

F.1-4 Four Sons

E.4. Maria (Maru) Gomes (B. 05/08/1930, M. 28/12/1943, D. 31/08/19...)

Husb. Anthony Campu

F 1-4 Four Sons

F 5-7 Three Daughters

E.5. Gracia Gomes

German Gomes (South)

F 1-2 Two Sons

F 3-7 Four Daughters

E.6. Shelly Gomes

E.7. Priscila Gomes

Husb: (Juma) Martin Gomes

f.1 Khokon

D.4. Dispina (Dispiosa/Disu) Gomes (Cardinal's Mother)

Husb: Michael Ningal D'Rozario (Cardinal's Father)

C.2. Joseph Howladar

D.1. Peter Howlader

C.3. Aladina Gomes

N.B. Thanks to Evon D'Rozario for updating D.3 (Nov. 2021)

ষষ্ঠ অধ্যায়: শিকদার বাড়ির বংশ-তালিকা

SHIKDAR BARI FAMILY GENEALOGY

(Compiled by Monica Gomes (2015) & updated Aug-Sept 2024. with inputs from Edward Aloysius, David Aloysius, Leena Gomes, Pauline Francis, Rupert Gomes, Olivia Gomes, Mabel Gomes, Rebecca Gomes, Soma Gomes, Noman Aloysius Rahman, Boniface Gomes, Harold Levi Gomes, Lucia Gomes, Lima D'Cruze, Christina D'Rozario, Molly Aloysius, Nino George Biswas, Marylin Tina Gomes, Ishita Benedict, Marcella Gomes, Christina Lipy, Poly Aloysius, Cecilia Romala Rozario, Mary Rani Gomes, Derrick Alexander Gomes & others)

A.1 Nortu Gomes (aka Mongol Shikdar) – great-grandfather of Manuel Gomes (from Kalada)

B.1 Juje Gomes (aka Kaptan Shikdar) – grandfather of Manuel Gomes (Padrishibpur)

C. 1 Edwin Gomes (aka Shodagor Shikdar) – father of Manuel Gomes

Wife: Asusana Presioza (sister of Francis Gomes aka Lalu Shikdar, Mistiri bari)

D.1 Manuel Gomes aka Manuel Shikdar (D. 03/12/1950)

Wife: Virginia Gomes (d/o of Francis Gomes aka Lalu Shikdar, Mistiri bari, D. 27/09/1969)

E.1 Aloysius Gomes (aka George Aloysius) (B. 02/10/1901; D. 09/12/1981)

Wife: Irene Aloysius (d/o Ali Chand Mohori) (B. 12/06/1916; D. 12/03/2001)

F.1 Mark Aloysius Gomes (Clifford) (B. 19/01/1936; D. 18/06/2018)

Wife: Suniti D'Costa (d/o Nicholas D'Costa, Bhawal)
(B. 12/09/1946; D. 27/04/2019)

G.1 Kona Aloyisous (Connie) Gomes (B. 18/12/1967)

Husb. Simson Chowdury (B. 01/09/1960)

H.1 Stalon Paul Chowdury (Sandhy) (B. 19/06/1988)

H.2 Dominic Chowdury (Sangeet) (B. 09/11/1995)

G.2 Poly Aloysius Gomes (B. 20/05/1970)

Husb. Anthony Richard Gomes (B. 03/09/1961)

H.1 Liyana Aloysius (B. 17/05/1993)

G.3 Molly Aloysious Gomes (B. 05/03/1972; M. 08/07/1991)

Husb. Lucas Sarker (Khulna) (B. 24/09/1965; M. 08/07/1991)

H.1 Alex Akash Sarker (B. 25/08/1992)

Wife: Shoshi Japamala Rozario (d/o Robi Rozario, Bhawal)

H.2 Andrew Shurjo Sarker (B. 06/01/2003)

F.2 Philomena Aloysius (Philu)

Husb. Napier D'Costa, Padrishibpur (D. 04/02/2000)

G.1 Marcel Gabriel D'Costa (Biton)

Wife: Juliet Pompa D'Costa

H.1 Mildred D'Costa

H.2 Megan D'Costa

F.3 Fabian Aloysius (Febi) (B. 05/05/1939; M. 11/06/1978; D. 27/12/1996)

Wife: Anna Campu (Shunu) (d/o Anthony Campu, Matibhanga)
(B. 27/09/1958; M. 11/06/1978)

G.1 Pricilla Moyna Aloysius (B. 01/05/1979; M. 27/10/2000)

Husb. Tapan Martin Serrao (Gazipur) (B. 03/10/1970; M. 27/10/2000)

H.1 Andrea Christine Serrao (B. 15/04/2003)

H.2 Ame Loretta Serrao (B. 02/04/2008)

G.2 David Aloysius (B. 21/06/1983; M. 06/01/2012)

Wife: Mrinmoyee Grace Rozario (d/o Clement Rozario, Nagori)
(B. 31/07/1989; M. 06/01/2012)

H.1Siddharth Fabian Aloysius (B. 24/01/2013)

H.2 Sangjukta Florence Aloysius (B. 05/05/2019)

G.3 Mily Irine Aloysius (B. 24/10/1984; M. 31/12/2010)

Husb. Anil Leo Costa (Gazipur) (B. 20/11/1973; M 31/12/2010)

H.1 Arko William Costa (B. 17/01/2012)

F.4 Ignatius Aloysius Gomes (Monu) (B. 01/01/1943; M. 17/01/1971; D.26/11/2017)

Wife: Nilima Das (d/o Umesh Das, Gopalganj)

(B. 09/09/1948; M.17/01/1971)

G.1 Edward Aloysius (Mukto) (B. 08/01/1973; M.19/04/2002)

Wife: Doreen Gonsalves (d/o Lance Lord Gonsalves, Malumghat) (B.06/04/1975; M. 19/04/2002)

H.1 Grace Annietta Aloysius (B. 18/11/2003)

H. 2 George Edwin Aloysius (Arnob) (B.28/05/2009)

G.2 Albert Mickey Gomes (B.05/05/1980; M.20/06/2008)

Wife: Sweety Adhikary (d/o Proshanto Adhikary, Banari Para) (B. 10/08/1985; M.20/06/2008)

H.1 Mithila Marcia Gomes (B.07/12/2020)

F.5 Dominic Aloysius (Doni) (D. 20/10/1990)

Wife: Mira Baroi (d/o Upen Baroi, Gournadi) (B. 24/11/1951)

F.6 Richard Aloysius (M 13/05/1976)

Wife: Teresa Aloysius (Mira) (B. 09/06/1955; M 13/05/1976)

G.1 Manual Joy Aloysius

Wife: Silvia

H. 1 Federico Aloysius

G.2 Dimple Aloysius

Husband: Deep Singh

H. 1 Sabrina Singh

H. 2 Arien Singh

G.3 Monica Aloysius (Rimi)

Husb. Davide Gosti

H. 1 Elenora Gosti

H. 2 Govanni Gosti

F.7 Bernadetta Aloysius (B. 02/12/1947; D. 24/12/2006)

Husb. Azizur Rahman (Khokon) (B. 03/12/1941; D. 07/01/2016)

G.1 Lisa Rahman

Husb. Robert Rozario

H.1 Aurinia Bernadetta Rozario

H.2 Adrian Francis Rozario

G.2 Noman Aloysious Rahman (Buro)

Wife: Afiffa Munawar

H.1 Mehran Khan Rahman

H.2 Aviran Khan Rahman

G.3 Sylvia Rahman (Shimla)

Husb. Nelson Eric (Nipu)

H.1 Irvane Nelson (Amit)

H.2 Ariella Philomina Nelson

G.4 Julia Rahman (Lila)

Husb. Sanam Mittal

H.1 Mansi Mittal

H.2 Armaan Mittal

F.8 Rita Aloysius (B. 07/12/1950)

Husb. Nicholas D'Cruze (D. 04/03/1991)

G.1 Teresa Lima D'Cruze

Husb. Norman Gomes (Opu) (D. 19/01/2016)

H.1 Prema Eliana Gomes

H.2 Priya Emily Gomes

H.3 Preeti Evelyn Gomes

G.2 James D'Cruze

Wife: (ex.) Pushon Rose Gomes, Dhaka, Atharogram

H.1 Jonathan D'Cruze

2nd Wife: Adity Roy

H.2 Jeffrey D'Cruze

G.3 Ranjit Jacob D'Cruze

Wife: Rupali Maria Corraya (d/o Benjamin Corraya, Dhaka, Bhawal)

H.1 Samantha D'Cruze

H.2 Jaden D'Cruze

F.9 Josephine Aloysius (Juju)

Husb. Anthony Harris Gomes

G.1 Aurelia Roselyn Gomes

Husb. Simon Apu Gomes

H.1 Alethea Prity Gomes

H.2 Anthea Patricia Gomes

H.3 Aldrin Pius Gomes

G.2 Oscar Brian Gomes
Wife: Mouri Gomes
H.1 Laurel Srabonti Gomes
H.2 Justin Olvis Gomes

E.2 George Benedict (B. 08/07/1908; D.13/01/1969)
Wife: Mary Mcfield (Padrishibpur) (D. 05/01/1987)

F.1 Josephine (adopted, d/o Peter Gomes, (Mistiri Bari)
(B. 06/05/1944; D.13/04/l 2019
Husb. Andreo Biswas (Khulna) (D. 02/11/1990)
G.1 Nino George Biswas (B. 11/06/1970); M. 04/01/2001)
Wife: Chaplin Piu Samadder (d/o, Albert Buran Samadder, Khulna) (B. 13/09/1976; M. 04/01/2001)
H.1 Ryan Kevin Biswas (B. 27/12/2001)
H.2 Rio Albert Biswas (B. 19/02/2009)
G.2 Mary Florance Juni Biswas (B. 27/07/1971; M: 03/01/1992)
Husb. Billy Penheiro (B. 07/08/1962, M: 03/01/1992)
H.1 Leon Andrew Penheiro (B. 18/12/1992)
H.2 Labonnya Filomina Penheiro (B. 02/06/2008)

E.3 Stanislaus Benedict (D. 26/07/1961)

Wife: Lily Rita Benedict (D. 21/04/1957)
F.1 Josephine Benedict (Mamta) (B. 19/11/1938; M. 19/11/1957; D. 18/12/1990)
Husb. Sebastine D'Cruz (B. 13/05/1935; M. 19/11/1957; D. 17/09/2010)
G.1 Filomina D'Cruz (B. 12/12/1959; M. 14/05/1981)
Husb. Vincent Santiago (B. 15/02/1955; M. 14/05/1981)
H.1 Vinita Agnes Santiago (B. 18/04/1982; M. 04/01/2014)
Husb. Anthony Santiago (B. 14/09/1978; M. 04/01/2014)
I.1 Mathew James Santiago (B. 17/10/2015)
H. 2 Smita Santiago (B. 17/02/1987; M. 09/02/2014)
Husb. Swapnil Deshbhratar (B. 14/05/1987; M. 09/02/2014)
I. 1 Sharanya Deshbhratar (B. 13/12/2017)
I. 2 Taisha Deshbhratar (B. 20/12/2022)
H. 3 Simon James Santiago (B. 04/12/1996)
G.2 Christina D'Cruz (B. 27/01/1961; M. 09/11/1986)
Husb. Savior Mathan (B. 14/04/1956; M. 09/11/1986)
H. 1 Sheeba Mathan (B. 08/08/1987)
H. 2 Sheeji Mathan (B. 15/02/1993)

G. 3 Christopher D'Cruz (B. 13/06/1965; M. 27/12/1991; D. 23/01/2016)
Wife: Marylen D'Cruz (B. 01/01/1966; M. 27/12/1991)
H. 1 Dominic D'Cruz (B. 02/01/1993)
H. 2 Fadric D'Cruz (B. 27/11/1996)
G. 4 Elizabeth D'Cruz (B. 20/11/1970; M. 20/11/1994)
Husb. Henry Peter (B. 20/03/1965; M. 20/11/1994; D. 31/12/2023)
H. 1 Irene Peter (B. 17/07/1995)
H. 2 Sylvia Hariyet Peter (25/01/2003)
G. 5 Stanly D'Cruz (B. 16/06/1972; M. 12/06/2011)
Wife: Reena D'Cruz (B. 02/07/1974; M. 12/06/2011)
H. 1 Stacey D'Cruz (B. 03/12/2012)
H. 2 Celestine Sebastine D'Cruz (B. 06/04/2016)

F.2 Joseph Emmanuel Benedict (Robi) (D. 18/04/1980)
Wife: Rita D'Rozario Benedict (D. 02/09/2013)
G.1 Diana Benedict (B. 13/01/1979; M. 03/01/2003)
Husb. Joachim Gomes (Kolkata) (M. 03/01/2003)
H.1 Joannah Nicole (B. 23/02/2009)

F.3 Felix Benedict (Jyoti) (bachelor, late)

F.4 Denis William Benedict (Montu)
(B. 24/05/1941; M. 26/01/1978; D. 20/12/2021)
Wife: Mercy Edna Benedict (B. 27/2/1946; M. 26/01/1978; D. 06/06/2011)
G.1 Anita Mary Benedict (Rinku) (B. 14/01/1979)
G.2 Ishita Agnes Benedict (Miku) (B. 10/07/1982)

F.5 Wilfred Ivan Benedict (Joy)
Wife: Tresea Benedict
G.1 Anil Benedict (adopted)

E.4 Albert Gomes (bachelor) (D. 14/01/1975)

E.5 Quentella Pricilla Francis (B. 02/01/1913; M. 10/07/1929; D. 31/05/1986)
Husb. Charles Nicholas Francis (Bhoora), Dhaka Atharogram (Golla) (B. 30/04/1892; M. 10/07/1929; D. 25/04/1958)
F.1 Bridgette (Sr. Dorothy, MC) (B. 05/09/1930; D. 21/12/2014)
F.2 Helena Francis (B. 12/10/1933; M. 27/05/1952; D. 23/08/2007)
Husb. Peter Gomes (M. 27/05/1952; D. 28/01/2004)
G.1 Uma Gomes
Husb. Gilbert Gomes
G.2 Dilip Gomes

Wife: Meena Gomes

G.2 Roma Gomes

F.3 Anne (Anna) (Sr. Charles, MC) (B. 08/03/1935; D. 19/04/1989)

F.4 Cecelia (Sr. Cecelia, RNDM) (B. 27/06/1937; D. 07/06/2007)

F.5 Gilbert Francis (B. 01/05/1939; M. 09/01/1971; D. 10/10/2020)

Wife: Pauline D`Rozario (d/o Joseph D`Rozario, Atharogram, Golla) (B. 13/06/1951; M. 09/01/1971)

G.1 Joy Nicholas Francis (B. 21/12/1971; M. 07/01/2000)

Wife: Christina Shikta Rozario (d/o Shunil Rozario, Atharogram, Golla) (B. 09/10/1977; M. 07/01/2000)

H.1 Angelina Nodee Francis (B. 01/12/2004)

H.2 Nakhatra Gilbert Francis (B. 20/07/2007)

G.2 Sanjoy Cleofus Francis (B. 12/06/1973; M. 05/08/2005)

Wife: Bernadette Swapna D'Cruze (d/o Habel D'Cruze, Tuital, Atharogram) (B. 30/11/1974; M. 05/08/2005)

H.1 Oritri Pauline Francis (B. 18/11/2006)

H.2 Anindo Cornelius Francis (B. 13/09/2012)

G.3 Subhro Victor Francis (B. 20/01/1976; M. 09/02/2007)

Wife: Andrea Dalanics (d/o Janos Dalanics, Hungary) (B. 17/02/1983; M. 09/02/2007)

H.1 Joseph Zac Francis (B 28/03/2013)

F.6 Raymond Francis (migrated to Japan) (B. 01/09/1942)

Wife: Issi (Japanese)

F.7 Stella Francis (B. 17/02/1946; M. */02/1966; D. 28/12/2021)

Husb. Anthony Gomes (M. */02/1966; D. */11/2000)

G.1 Ashish Lawrence Gomes (B. 10/03/1967)

Wife: Iti Gomes

H.1 Ador

H.2 Oishi

G.2 Ruth Keya Gomes (B. 06/12/1968)

Husb. Anthony Ranjan Gomes (B. 09/04/1964)

H.1 Ornob

Wife: Rini

H.2 Rosemary Urmi

G.3 Rana Gomes (B. 29/03/1970)

Wife: Lucky

H.1 Hubert
H.2 Benjamin
H.3 Jennifer
G.4 Joya Gomes
Husb. James Gomes
H.1 Jennifer
H. 2 Justin
H. 3 Javin
G.5 Charles Partho Gomes
Wife; Shumi Suzannah Gomes
H.1 Stella
H.2 Desmond
F.8 Eric Francis ((B. 04/03/1954; M. 07/01/1983; D. 03/07/2020)
Wife: Panna Roselyn Gomes (M. 07/01/1983)
G.1 Pricilla Brishti Francis
G.2 Patricia Dutee Francis
G.3 Kevin Dhrubo Francis
E.6 Lurdiana Tutu Gomes (D. 29/12/1987)
Husb. Anthony Gomes (Barisal Sadar, originally from Kalada) (D. 18/12/1980)
F.1 Denis Gomes
Wife: Carmelina (Ranu) (d/o Fredrick Gomes, Padrishibpur)
G.1 Roselene Gomes (Sweety) (B. 22/08/1966)
Husb. Eugene Gomes (Ramna, Dhaka) (D. 01/04/2010)
H.1 Vincent Gomes
Wife: Elora Gomes
G.2 Lovely Gomes (B. 12/02/1969)
Husb. Placid Mendez
H.1 Irene Martha Mendez
H.2 Mark Mendez
G.3 Biplob Shimson Gomes (B. 01/04/1971)
F.2 Flavian Gomes (B. 15/08/1937; M. 26/03/1963)
Wife: Puspo Baroi (from Sonatola, Patuakhali) (B. 07/04/1942; M. 26/03/1963)
G.1 Lucky Virginia Gomes (B. 13/11/1964)
G.2 Patriar Jonson Gomes (Prodip) (B. 06/09/1965; M. 08/03/1996)
Wife: Junu Juliet (B. 31/12/1975; M. 08/03/1996)
H.1 Reahana Amanda Gomes (B. 10/11/1997)

H.2 Racheal Agnes Gomes (B. 24/09/2013)

G.3 Christina Florenda Gomes (Lipy) (B. 05/05/1976; M. 24/10/2008)

Husb. Robin Jawhar Das (B. 24/12/1970; M. 24/10/2008)

H.1 Jeromi Anthony Das (Surjo) (B. 20/08/2012)

F.3 Nirmala Josephine Gomes

Husb. Peter Gain (Barisal)

F.4 Ignatius Gomes (Sani) (B. 10/12/1945; M. 14/07/1974; D. 10/04/2010)

Wife: Rekha Gain (d/o Monoronjon Gain, Dhamshar, Ujirpur)

(B. 14/02/1957; M14/07/1974)

G.1 Lurdiana Gomes (B. 08/12/1975; M. 10/07/1993)

Husb. Sylvester Rozario (B. 07/11/1964; M. 10/07/1993)

H.1 Charles Alex Rozario (B. 27/10/1998)

H.2 Jonathan Rozario (B. 28/06/2000)

G.2 Marylin Tina Gomes (B. 02/03/1981; M. 24/01/2003)

Husb. John Ricky Gomes (B. 10/02/1971; M. 24/01/2003)

H.1 Nicholas Gomes (B. 24/11/2003)

H.2 Dominic Gomes (B. 10/01/2007)

G.3 Pricilla Dina Gomes (B. 13/09/1985; M. 30/ 12/2005)

Husb. Joseph Cornelius Gomes (B. 10/04/1975; M. 30/ 12/2005)

H.1 Wilmina Jerrline Gomes (B. 12/07/2008)

H.2 Andra Josephine Gomes (B. 13/03/2016)

G.4 Benedic Nipun Gomes (B. 09/09/1989; M. 02/10/2021)

Wife: Shipra Mondol (d/o Proshanto Mondol, Shatkhira, Khulna) (B. 07/12/1997; M. 02/10/2021)

F.5 Gastin Patrick Gomes (B. 08/10/1944; M. 19/11/1981; D 21/12/2018)

Wife: Marcella Rozario (d/o Daniel Rozario, Atharogram, Dhaka)

(B. 16/08/1956; M. 19/11/1981)

G.1 Sandra Cecilia Gomes (B. 26/09/1984; M. 04/05/2007)

Husb. Robert Kennedy Dari (Dhaka)

G.2 Steve Gomes (B. 29/01/1988; M. 17/09/2021)

Wife: Hymonti Immaculata Rozario (d/o Subodh Rozario, Solepur)

H.1 Elizabeth Marcella Gomes (B. 12/06/2024)

G.3 Gloria Florence Gomes (Flora) (B. 21/09/1989; M. 17/01/2014)

Husb. Johny Placid Palma (B. 01/10/1984; M. 17/01/2014)

H.1 Maria (Emily) Palma (B 06/07/2017)

F.6 Shefali Gomes

Husb. (ex.) Allen Rodrigues (Noakhali)

G.1 Aldrin Rodrigues

G.2 Richard Ansly Rodrigues (B. 10/02/1973)

Wife: Mary Bernadette Rodrigues (Baby) (Khulna)

H. 1 Rose Amy Rodrigues (B. 28/12/1998)

H. 2 Stafy Clara Rodrigues (30/09/2008)

G.3 William Anthony Rodrigues (Leslie) (B. 02/04/1974)

Wife: Mukti Rodrigues (Khulna)

H. 1 Veronica Antara Rodrigues

H. 2 Angelus Rodrigues

H. 3 Adrian Rodrigues

G. 4 Antina Grace Rodrigues (B. 08/05/1983)

Husb. Subir Robert Howlader (B. 19/01/1985)

H. 1 Escalton Aaron Howlader

G. 5 Catherina Arina Gomes

Husb. Ripon Gomes

H. 1 Kabbyo Gomes

E.7 Benjamin Franklin Gomes (B. 18/11/1919; M. 27/12/1946; D. 27/09/1988

Wife: Daisy Veronica Perris (B. 10/05/1931; M. 27/12/1946; D. 20/12/2016)

F.1Mabert Arun Gomes (B. 25/12/1947; M.20/02/1982; D. 18/04/2015)

Wife: Sharmila Sinha (B. 01/01/1958; M. 20/02/1982; D. 29/09/2009)

G.1 Ankur Gomes (B. 14/07/1986; M. 30/11/2018)

Wife: Riya Ghosh (B. 20/12/1990; M. 30/11/2018)

F.2 Rupert Ranjit Gomes (B. 28/05/1950; M. 21/12/1983)

Wife: Subhasree Susan Mundle (B. 13/08/1957; M. 21/12/1983)

G.1 Christine Veronica Gomes (B. 31/03/1985; M. 01/09/2018)

Husb. Melroy DeSouza (B. 02/12/1983; M. 01/09/2018)

G.2 Adam Daniel Gomes (B. 22/11/1991)

G.3 Aaron John Gomes (B. 22/11/1991)

F.3 Herbert Anjan Gomes (B. 21/01/1952; M. 30/12/1983)

Wife: Sandhya Neogy (B. 10/12/1950; M. 30/12/1983)

G.1 Rohit Gomes (B. 08/03/1985)

G.2 Richa Gomes (B. 21/03/1987; M. 11/10/2021)

Husb. Jakub Talatnik (B. 06/09/1987; M. 11/10/2021)

F.4 Egbert Swapan Gomes (B. 22/01/1955; M. 03/02/1989; D. 16/06/2023)
Wife: Sheila Suzanna Gomes (B. 24/09/1966; M.03/02/1989)
G.1 Sneha Anna Gomes (B.09/12/1990)
G.2 Sonal Rupert Gerard Gomes (B. 09/04/1996)
E.8 William Albin Gomes (B. 15/02/1922; M. 21/04/1945; D. 27/03/1997)
Wife: Theresa Shotodol Barory (d/o Rajendranath Barory, Narikelbari, Faridpur, (B. 24/06/1918; M. 21/04/1945; D. 16/02/1982)
F.1 Michael J. Gomes (B. 02/08/1946; M. 10/02/1973; D. 31/03/1993)
Wife: Juliet Anima Dias (d/o Urfin Dias, Noakhali;
B. 26/07/1955; M. 10/02/1973; D. 10/07/2009)
G.1 Christina Gomes (Tina) (B. 08/10/1976; M. 27/12/2001)
Husb. Rony D'Rozario (B. 01/03/1966; M. 27/12/2001)
G.2 Boniface Stanislaus Gomes (Bonnie) (B. 15/07/1978; M. 26/09/2008)
Wife: Jane Juliet Gomes (Neela) (d/o Augustine Dias,
Noakhali) (B. 30/07/1985; M. 26/09/2008)
H.1 Christopher Ethan Gomes (Chris) (B. 19/06/2023)
G.3 Steven William Gomes (Bobby) (B. 21/01/1984; M. 26/12/2016)
Wife: Archana Chambugong (d/o Ronik Chiran,
Muktagacha) (B. 05/12/1987; M. 26/12/2016)
F.2 Mary Margaret Gomes (B. 15/04/1948; M. 08/07/1968)
Husb. John Gomes (Bhuiya) from Dhaka Boxonagar
(B. 19/01/1940; M. 08/07/1968; D. 03/07/2015)
G.1 Lynda Catherine Gomes (B. 17/04/1969; M. 15/01/1988)
Husb. Manuel Babul Gomes (B. 21/09/1957; M. 15/01/1988)
H.1 Andrew Peter Gomes (B. 14/01/2003)
G.2 Chester Joseph Kenneth Gomes (B. 25/11/1971; M. 01/09/2001)
Wife: Rani Isabella Gomes (B. 01/06/1974; M. 01/09/2001)
H.1 Rachel Barbara Mary Gomes (B. 18/02/2005)
G.3 Alan Mark Gomes (B. 08/06/1973; M. 23/01/2004)
Wife: Elizabeth Liza D'Rozario, d/o Martin D'Rozario,
Tejgaon, (B. 05/12/1977; M. 23/01/2004)
H. 1 Alisha Margaret Gomes (B. 14/12/2010)
G.4 Christer Paulinus Gomes
Wife: Maria Rozario
G.5 Harold Levi Peter Gomes (B. 31/10/1981)
G.6 Sarah Pamela Gomes (B. 29/08/1986)

F.3 Raphael Gomes (B. 15/01/1950; M. 07/06/1978)
Wife: Olivia Mildred D'Costa (Beauty) (d/o Benedict Paul D'Costa, Padrishibpur) (B. 22/09/1961; M. 07/06/1978)
G.1 Sylvia Teresa Gomes (B. 10/11/1980; M 31/07/2005)
Husb. Faizan Ghani (B. 01/12/1980; M 31/07/2005)
H.1 Amber Ghani (B. 30/11/2009)
H.2 Noah Ghani (B. 02/12/2015)
G.2 Charles William Gomes (B. 18/06/1987)
G.3 Carolina Maria Gomes (B. 05/08/1993; M 06/10/2018)
Husb. Stefan Bruno (B. 15/03/1992; M 06/10/2018)
F.4 Mary Monica Gomes (B. 10/04/1951; M. 15/04/1972)
Husb. Leonard Titus Gomes (Sanu) (B. 04/01/1946; M. 15/04/1972; D. 09/11/2005)
G.1 Richard Maurice Gomes (Ricky) (B. 16/10/1973; M. 04/01/2000)
Wife (ex): Yvette Mary Augley (B. 29/09/1978; M. 04/01/2000)
H.1 Russell Alexander Gomes (Rusho) (B. 30/11/2000)
H.2 Shane Leonard Gomes (Rono) (B. 27/06/2006)
G.2 Carolyn Jennifer Gomes (Jenny) (B. 17/07/1980; M. 17/01/2004)
Husb. Peter Liton Penheiro s/o Benjamin Penheiro, Noakhali (B. 06/12/1973, M. 17/01/2004)
H.1 Andrea Elizabeth Penheiro (B. 31/12/2006)
H.2 Leo Benjamin Penheiro (B. 09/01/2012)
H.3 Elena Monique Penheiro (B. 09/10/2017)
F.5 Mabel Gomes (B. 18/08/1952; M. 07/04/1975)
Husb. Rowland Quiah (M. 07/04/1975)
G.1 Florence Catherine Quiah (Flora) (M. 12/08/2001)
Husb. (ex) Byron Folgar (M. 12/08/2001)
H.1 Aiden Rowland Folgar
H.2 Sophie Folgar
G.2 Samuel Charles Paul Quiah (B. 24/09/1980; M. 28/04/2012; D. 17/03/2022)
Wife: Devjani Das (d/o Sitansu Das, Kolkata) (M. 28/04/2012)
H.1 Saajan Luke Das Quiah
H.2 Amar Noah Das Quiah
G.3 Angelina Maria Angie Gomes (M. 23/02/2019)
Husb. Raybel Batista (M. 23/02/2019)
H.1 Samara Batista

F.6 Gabriel Gomes (B. 26/02/1954; M. 15/08/1988; D. 08/01/2018)

Wife: Anna Shanti Gomes (Ratna) (d/o Manuel Gomes, Padrishibpur) (B. 28/09/1969; M. 15/08/1988)

G.1 Don Stephan Gomes (B. 22/09/1991; M. 13/01/2017)

Wife: Ritu Cathrin Rozario (d/o Somir Rozario, Tejgaon) (B. 25/10/1992; M. 13/01/2017)

H.1 Aries William Gomes (B. 14/11/2017)

G.2 Derrick Alexander Gomes (B. 28/01/1994)

F.7 John Gomes (Johnny) (Ret'd Army Capt.)

B. 20/09/1955; M. 14/06/1985; D. 14/02/2023)

Wife: Rebecca Sarkar (Reba) (d/o Rajendra Nath Sarkar, Ramshil, Gopalganj) (B. 10/11/1962; M. 14/06/1985)

G.1 Stella Ruth Gomes (B. 15/09/1987; M. 17/05/2014)

Husb. Ankur Sam Sharma (B. 05/02/1983; M. 17/05/2014)

H. 1 Darvin Romeo Sharma (B. 07/01/2023)

G.2 Steve Jonathan Gomes (B. 11/08/1992)

F.8 Jacinta Gomez (B. 2/06/1957; M. 17/01/1986)

Husb. Jude Vivian Gomez (from Bhawal, Dhaka) (B. 28/10/1954; M. 17/01/1986)

G.1 Andreas Harvey Gomez (B. 08/05/1988)

F.9 Lucia Gomes (B. 02/12/1958; M. 28/12/1984)

Husb. Arthur Gomes (B. 18/06/1954; M. 28/12/1984)

G.1 Alistair Gomes (B. 08/01/1986)

F.10 Virginia Gomes (B. 02/03/1961; M. 15/02/1988)

Husb. Francis Atul Sarker from Satkhira, Khulna (B. 03/02/1958; M. 15/02/1988)

G.1 Elizabeth Bianca Sarker (B. 09/11/1990; M. 14/03/2023)

Husb. Luke Pretzie (Michigan) (M. 14/03/2023)

G.2 Prianka Maria Sarker (B. 22/01/1992)

E.9 Sylvester Regin Gomes (bachelor) (D. 17/09/1975)

E.10 Dr. Bartholomew Medlicot Gomes (Medin) (B. 07/06/1929; M 27/12/1961; D. 07/06/1994)

Wife: Leena Gomes (d/o Christopher Gomes of Dhaka Atharogram) (B. 05/01/1944; M 27/12/1961)

F.1 Christopher Tapash Gomes (B. 05/04/1963; M. 31/01/1993; D. 26/07/2020)

Wife: Soma Gomes (d/o Alan Eustace Gomes) (B. 11/03/1968; M. 31/01/1993)

G.1 Trijeet Immanuel Alexander Gomes (B. 02/08/2000)

F.2 Gerald Subroto Gomes (B. 29/10/1964; M. 04/05/1996)

Wife: Swapna Mukherjee (d/o Shaktipada Mukherjee) (B. 02/09/1966; M. 04/05/1996)

G.1 Sweata Loreto Gomes (Mimi) (B. 28/04/1997)

F.3 Jude Pijush Gomes (B. 23/09/1966; M. 21/11/1998)

Wife: Anjana Pal (d/o Hemanta Pal) (B. 05/08/1975; M. 21/11/1998)

G. 1 Bartholomew Tanishq Gomes (Tanny) (B. 14/09/2000)

G.2 Godfrey Shanauq Gomes (Hunny) (B. 03/11/2001)

D.2 Milat Gomes (father of Hiron Gomes), died when he was 33 years old

Wife: Gracie Gomes (daughter of German Moktar of Moktar bari)

E.1 Hiron Matthew Gomes

Wife: Anima Mukuti (Barisal)

F.1 Clarence Babu Gomes (B. 1947)

Wife: Mukta Dewri

G. 1 Marvyn Cheiro Gomes

Wife (ex.): Molly Rozario

H.1 Rudoshi Merlin Gomes

G.2 Kanta Gomes

Husb. Simshon Biplob Das

H.1 Toishi

H.2 Kevin

H.3 Troee

F.2 Basil Nontu Gomes (B. 1949)

Wife: Mitali Dewri

G.1 Rigby Satu Gomes

Wife: Kolyani Mondol

H.1 Rayan Ravin Gomes

H.2 Anthony Ritom Gomes

F.3 Rita Gomes (B. 1950)

Husb. Swapon Clorin Herbert D'Rozario

G.1 Florence Lisa D`Rozario (B. 22/12/1985)

Husb. Henry Subro Gomes (B. 09/11/1984)

H.1 Henrietta Hridi Gomes (B. 09/08/2018)

F.4 Peter Gomes (B. 1955)

Wife: Roma Dewri

F.5 Mary Margaret Gomes (Rani) (B. 11/02/1963)
Husb. Marshall D' Rozario (Tejgaon, Dhaka) (B. 13/01/1956; D. 06/02/2017)
G.1 Florence Linda D'Rozario (B. 17/11/1985; M. 05/07/2013)
Husb. Adnan Nurul Kabir (B. 17/03/1985; M. 05/07/2013)
H.1 Zaira Kabir (B. 31/07/2021)
G.2 Anthony Larry D'Rozario (B. 27/08/1988)
F.6 Titas (Titu) Gomes (B. 1959)
Wife: Joyanti Polin Gomes
G.1 Jurasek Liam Gomes
Wife: Papia Biswas
F.7 Opu Paul Gomes (B. 1961)
Wife: Elizabeth Adhikari

E.2 Edward (Edu) Gomes

Wife: Helena Gomes
E.3 Sebastian (died young)
E.4 Lucas (died age 16 years)

E.5 Rosy (Rusie) Gomes (Brown)

Husb. Augustine Brown (D'Rozario), (brother of Ningel Shadhu)
F.1 Sheila Brown (b. 1945)
Husb. Albin D' Rozario
G.1 Mony D'Rozario
G.2 Hiro D' Rozario

E.6 Sanchia (Sanu) Gomes

Husb. Vincent Gomes (Jhola bari)
E.7 Florence (Fuluri)
Husb. Anthony Shudhir Das (Barisal)

D.3 Bernard Bonu Gomes (Bachelor, died when 30 years)

D.4 Magdalene Gomes

Husb. Edwin (Edu master) (s/o German Moktar, Moktar bari)
E.1 Iris (Irene) (spinster)
E.2 Bertha
Husb. Peter Wheatley
F.1. Yvonne Wheatley (lives in Boston)
E.3 Ethel (spinster)
E.4 Martin
E.5 Sylvia (Silu) (spinster)

D.5 Victoria Gomes

Husb. German Gomes (from Barisal)

E.1 Teresa (Khadu) - lives in Kalada

Husb. Paul Gomes (Dhanu Shikdar's son)

F.1. Peter Gomes (works in Caritas)

E.2 Stanis (Tanis)

E.3 Puti

E.4 Fuli

F.1. Panu

D.6 Bridgette Gomes (aka Borgi/Bodo, sister of Manuel Shikdar)

Husb. Roishyan: had no children; she was crippled in her legs, and lived with Manuel Shikdar after becoming widowed.

সপ্তম অধ্যায়: সান্তামারীয়ার বাড়ি এবং পঞ্চায়েত বাড়ির বংশ-তালিকা

SANTA MARIA BARI & PANCHAYAT BARI GENEALOGY

(Compiled by Capt. Leonard Gomes (Sanu) 1975-2004; & updated Aug-Sept 2024 by Monica Gomes with inputs from Jarmen Torun Gomes, Dulal Gregory Gomes, Jerry Gomes, Rudolph Rossie Gomes, Pearl Anthony Rozario, Victor Khokon Gomes, Jessica Gomes, Kirit Sebastian Gomes, Ricardo D'Costa, Lorenzo D'Costa, James Gomes, Andrew Litu Gomes, Sr. Swapna Gomes, Babu Gomes & others)

B.1 Gregory Gomes – grandfather of Santa Maria Gomes (originally a Brahmin with the surname of Chakravorty, was a cook at the Portuguese timber merchant's house, converted & given this surname)

C.1 Peter Gomes (Pedru) – father of Santa Maria Gomes

Wife: Name unknown (sister of Francis Gomes aka Lalu Shikdar, Mistiri bari)

D.1 Michael Gomes

Wife: Isabela Gomes

E.1 Francis Gomes

E.2 Nicholas Gomes

F. Nicholas Gomes' children: Baby, Colin, Mariana, Elsie, Frank, Mavis, Theodora; and by 2nd marriage: Gerald, Horatio, Sarah

E.3 William Gomes

E.4 Catherine Gomes

E.5 Elsia Gomes

D.2 Mary Gomes

Husb. Gabriel Rozario

E.1 Edwin Rozario

D.3 James Gomes

Wife: Louisa Gomes (she was Granny Carolina's cousin)

E.1 Joseph Gomes

Wife: Shebi D'Rozario (d/o Peon Gregory D'Rozario, Paschim par)

E.2 Pricilla Gomes

E.3 Jacob Gomes

D.4 Cajetan Santa Maria (B. 06/08/1881; D. 12/10/1963)

Wife: Carolina Gomes (d/o Francis Gomes aka Lalu Shikdar, Mistiri Bari) (B. 16/07/1890; D. 14/01/1970)

E.1 Vincent Gomes (B. 09/07/1909; M. 18/04/1945; D. 13/01/1980)

Wife: Philomena Gomes (d/o Charles Gomes, Gurumoshai)
(B. 06/09/1928; M. 18/04/1945; D. 24/07/2005)

F.1 Leonard Titus Gomes (Sanu) (B. 04/01/1946; M. 15/04/1972; D. 09/11/2005)

Wife: Mary Monica Gomes (d/o William Albin Gomes, Shikdar bari) (B. 10/04/1951; M. 15/04/1972)

G.1 Richard Maurice Gomes (Ricky) (B. 16/10/1973; M. 04/01/2000)

Wife (ex.): Yvette Mary Augley (B. 29/09/1978; M. 04/01/2000)

H.1 Russell Alexander Gomes (Rusho) (B. 30/11/2000)

H.2 Shane Leonard Gomes (Rono) (B. 27/06/2006)

G.2 Carolyn Jennifer Gomes (Jenny) (B. 17/07/1980; M. 17/01/2004)

Husb. Peter Liton Penheiro, Noakhali (B. 06/12/1973; M. 17/01/2004)

H.1 Andrea Elizabeth Penheiro (B. 31/12/2006)

H.2 Leo Benjamin Penheiro (B. 09/01/2012)

H.3 Elena Monique Penheiro (B. 09/10/2017)

F.2 Gerald Rufus Gomes (B. 31/08/1948; M. 10/11/1975; D. 17/01/1994)

Wife: Jacinta D'Rozario (Joshi) (d/o Richmond D'Rozario, Padrishibpur) (B. 25/07/1951; M. 10/11/1975)

G.1 Christopher Ronald Gomes (Rocky) (B. 12/08/1976; M. 06/01/2006)

Wife: Mary Florance Gomes (Mukta) (d/o Fidelis Gomes, Padrishibpur) (B. 27/10/1981; M. 06/01/2006)

H.1 Rufus Angelo Gomes (B. 28/03/2009)

H.2 Aurora Geraldine Gomes (B. 10/10/2015)

G.2 Valerie Jessica Gomes (Jessie) (B. 16/11/1981; M. 20/06/2003)

Husb. Andrew Virgil Rodriguez (Chittagong) (B. 12/05/1973; M. 20/06/2003)

H.1 Marcelius Aaron Rodriguez (Josh) (B. 02/06/2004)

F.3 Edna Victoria Gomes (B. 01/03/1950; M. 15/05/1974; D. 08/11/2016)

Husb. Martin C. Gomes (Padrishibpur) (B. 03/07/1948; M. 15/05/1974; D. 08/27/2020)

G.1 David Thomas Gomes (B. 11/05/1975; M. 18/06/2004)

Wife: Sylvia Lithi Paroi (d/o Bivash Paroi, Khulna)
(B. 10/05/77; M. 18/06/2004)

H.1 Eldren Drubo Gomes (B. 10/10/2005)

H.2 Alvin Dipto Gomes (B. 09/01/2017)

G.2 Kirit Sebastin Gomes (B. 31/01/1977; M. 30/04/2010)

Wife: Seeme Cindrella Penheiro (d/o Ambrose Penheiro,
Noakhali), (B. 02/11/1986; M. 30/04/2010)

H.1 Aiden Hubert Gomes (B. 06/06/2012)

H.2 Adria Magdeline Gomes (B. 24/06/2014)

H.3 Adwin Francis Gomes (B. 25/07/2017)

F.4 Jerry Basil Gomes (B. 6/02/1953; M. 17/05/1980)

Wife: Paulina Adhikari (d/o Deben Adhikari, Padrishibpur)
(B. 22/06/1959; M. 17/05/1980)

G.1 Juliet Orpita Gomes (Jui) (B. 27/04/1981; M. 22/01/2000)

Husb. Cornelius Swapon Gomes (Hasnabad, Atharogram)
(B. 21/09/1970; M. 22/01/2000)

H.1 Davien Mughdo Gomes (B. 04/12/2002)

H.2 Dylon Muhurto Gomes (B. 27/04/2008)

G.2 Rudolph Gomes (Rossie) (B. 12/02/1989; M. 07/07/2023)

Wife: Tithi Agatha Halder (d/o James Tapon Halder, Manikganj)
(B. 03/09/1991; M. 07/07/2023)

F.5 Roney Ignatius Gomes (B. 15/07/1954; M. 10/06/1983; D. 10/04/2021)

Wife: Juliana Gomes (B. 14/11/1958; M. 10/06/1983)

G.1 Savio Vincent Gomes (Ray) (B. 29/10/1985; M. 08/02/2019)

Wife: Cecilia Penheiro (d/o Simon Penheiro, Noakhali)
(B. 28/02/1993; M. 08/02/2019)

G.2 Stuart Cyril Gomes (Ryan) (B. 22/11/1987; M. 11/16/2016)

Wife: Roslin Sikder (Poly) (d/o Bulu Sikder, Gournadi)

(B. 08/11/1987; M. 11/16/2016)

H.1 Tereasa Samiah Gomes (B. 26/09/2017)

H.2 Adonias Jaxon Gomes (B. 31/01/2019)

G.3 Shawn Bernard Gomes (Rory) (B. 25/01/1993)

F.6 Julian Wilfred Gomes (B. 16/02/1957; M. 28/12/1991)

Wife: Norma Gonsalves (d/o Basil Gonsalves, Noakhali)

(B. 20/09/1971; M. 28/12/1991)

G.1 Rommel Nicholas Gomes (Rimo) (B. 14/02/1992)

E.2 Evelin Gomes (B. 11/12/1911; D. 26/04/2001)

Husb. Francis Gomes (aka Mounna Francis) (D. 15/07/1950)

F.1 Philip Edgar Gomes (Khokon) (bachelor) (B. 14/07/1931; D. 19/06/2019)

F.2 Milton Richard Gomes (Montu) (B. 07/06/1935; 28/06/2009)

Wife: Esmerelda Juliana Quiah (Esmy) (B. 07/11/1945; D. 12/12/2011)

G.1 N.F. Maxwell Gomes (Maxy) (B. 06/12/1963)

Wife: Elizabeth Gomes (Tumpa) (B. 06/12/1972; D.14/08/2014)

H.1 Anthony Michael Gomes (B. 11/10/1999)

G.2 Hilary Leslie Gomes (B. 06/05/1965; M. 28/04/2006)

Wife: Daisy Anita Gomes (B. 29/06/1979)

H.1 Faustina E. Queenie Gomes (B. 02/12/2015)

G.3 Vincent Stanley Gomes (B. 05/04/1967; M.15/01/2004)

Wife: Jennifer Gonsalves (Dimple) (B. 07/05/1976)

G.4. Ann Margaret Sally Gomes (Shelly) (B.19/12/1968)

Husb. John Prodip Gomes (B. 30/04/1962; D. 20/06/2015)

H.1 Joseph Gomes (Alex) (B. 09/04/1994)

H.2 Agnes Carmelina Gomes (Neha) (B. 07/01/2004)

G.5. Roger Gomes (died)

G.6 Felix Gomes (Leon) (B. 14/01/1972)

F.3 Denis Gomes (Bhula) (B. 23/07/1935; D. 07/07/2013)

Wife: Juliet Gomes

G.1 Snigdha Gomes

G.2 Ajit Gomes

Wife: Shilpe Gomes

F.4 Camelius Gomes (Benu) (B. 10/02/1939; D. 06/09/2005)

Wife: Daisy Gomes (31/03/1945)

G.1 Bridjet Neli Gomes (Neli) (B. 27/08/1971)

Husb. A B M Sayem Chowdhury (B. 30/08/1970)

H.1 Sajed Chowdhury (Turjo) (B. 11/09/1994)

H.2 Muntasir Chowdhury (Toki) (B. 16/03/2001)

G.2 Sophia Roselin Gomes (Mily) (B. 23/04/1973)

Husb. Moses Shamol Gomes (B. 26/01/1965)

H.1 Stanley Franklin Gomes (Frank) (B. 29/09/1997)

H.2 Gregory Mark Gomes (Ayon) (B. 01/09/2004)

G.3 Andrew Gomes (Litu) (B. 23/02/1975)

Wife: Pricilla D'Rozario (Sheema) (B. 08/11/1985)

H.1 Vincenza Reana Gomes (Orva) (B. 23/09/2010)

H.2 Usebious Benu Gomes (Orvyn) (B. 08/08/2012)

G.4 Maria Laner Gomes (Lipi) (B. 17/08/1979)

F.5 Boniface Gomes (Arun) (B. 18/07/1939; D. 16/06/2023)

Wife: Evelyn Penheiro (d/o Patrick Penheiro, Noakhali)
(B. 08/04/1947; D. 30/07/2018)

G.1 Delsie Gomes

G.2 Clarie Gomes

F.6 Fr. Christopher Tapan Gomes (Jesuit Priest)
(B. 29/11/1941; Ordination 17/04/1979; D. 22/05/2018)

F.7 Angelina Dora Gomes (Shobita) (B. 31/05/1946)

Husb. Arnold Karmaker (Subir)

G.1 Noel Karmaker

Wife: Chandra Karmaker

H.1 Ricardo Akas

G.2 Mildred Karmaker (Happy)

Husb. Brandt Gomes (Kakon)

H.1 Christina Gomes (Srewoshi)

G.3 Bappi Enoch Karmaker

E. 3 Robin Eusebius Gomes (B. 04/02/1918; D. 02/07/1984)

Wife: Sophia Gomes (B. 30/01/1931; D. 12/06/2007)

F.1 Bertin Kanu Gomes (B. 16/12/1947)

Wife: Olivia Tultul Gomes (Barisal) (B. 02/12/1960)

G.1 Cleopetra Joyosree Gomes (Joya) (B. 10/10/1975)

G.2 Henrieta Rajosree Gomes (Raju)

Husb. Jerome Rodrigues

H.1 Andre Rodrigues (B. 16/10/2003)

F.2 Constant Bhanu Gomes (B. 16/10/1951; M. 26/02/1976)
Wife: Soma Gomes (d/o Sebastian Monu Gomes, Dhaka Atharogram)
(B. 29/06/1963; M. 26/02/1976)
G.1 Paul Sumon Gomes (B. 22/01/1977; M. 05/01/2007)
Wife: Juliana Liza Gomes (d/o Anthony Morice Gomes,
Dhaka Atharogram) (B. 22/05/1984; M. 05/01/2007)
H.1 Ethan Adrian Gomes (B. 02/03/2009)
H.2 Eleeza Gomes (B. 25/12/2017)
G.2 Perseus Kevin Gomes (B. 21/12/2000)
F.3 Gertrude Renu Gomes (B. 20/01/1954; D. 13/08/2014)
Husb. William D'Silva (Billy) (B. 18/04/1949)
G.1 James Joseph D'Silva (B. 13/11/1978)
H.1 Hayden William D`Silva (B. 28/07/2007)
G.2 Jessie Elizabeth D'Silva (B. 25/11/1983; M. 07/01/2010)
Husb. Steve Andre Cyprian (B. 25/10/1982; M. 07/01/2010)
H.1 Kiara Valencia Cyprian (B. 05/06/2016)
H.2 Tiana Audrey Cyprian (B. 16/07/2023)
G.3 Jonathan Jude D'Silva (B. 09/09/1987; M. 03/01/2014)
Wife: Jacklin Rumpa Gomes (d/o Francis Gomes, Chittagong)
(B. 30/07/1990; M. 03/01/2014)
H.1Anthony Johan D'Silva (B. 18/01/2018)
F.4 Fr. Lawrence Borun Gomes (Diocesan Priest)
(B. 12/03/1957; Ordination 27/12/1985)
F.5 Anna Gomes (Minu) (B. 29/12/1960; M. 02/05/1981)
Husb. Bryan Sampson (Chittagong)
(B. 02/09/1954; M. 02/05/1981; D. 26/12/2023)
G.1 Elvis Sampson (Mighty) (B. 06/03/1983)
Wife: Glory Talukdar
G.2 Cyril Sampson (Sunny) (B. 22/08/1992)
F.6 Jarmen Torun Gomes (B. 05/01/1971; M. 03/01/2000)
Wife: Nupur Saha Chowdury (Moni) (d/o James Malay Saha Chowdury
, Barisal) (B. 03/04/1973; M. 03/01/2000)
G.1 Arnob Robin Gomes (B. 09/06/2001)
G.2 Adrian Aryan Gomes (B. 20/09/2006)

E.4 Ruth Gomes (B. 14/03/1920; D. 19/06/2011)

Husb. Norbert Anthony Gomes (B. 05/11/1918: D 17/01/1993)

F.1 Fr. Noel Dipak Gomes (Jesuit Priest) (B. 20/02/1946; Ordination 24/10/1981)
F.2 Sr. Swapna Benedicta Gomes (Loreto Sister)
(B. 26/12/1947; Final Vows 07/09/1975)
F.3 Monica Chhanda Gomes (B. 25/12/1949)
Husb. Carlyle D'Rozario (D. 15/09/1995)
F.4 Mercella Meera Gomes (B. 29/09/1951; M. 07/01/1989)
Husb. Kenneth Abreu (B. 30/03/1952; M. 07/01/1989; D. 21/06/2024)
G.1 Tanusree Abreu (B. 03/10/1990; M. 05/07/2021)
Husb. Thakur Subhang Singh (B. 13/02/1989; M. 05/07/2021)
F.5 Merlyn Khuku Gomes (B. 21/07/1954; M. 03/06/1989)
Husb. Utpal Steven Das Gupta (B. 12/09/1954; M. 03/06/1989; D. 23/11/2023)
G.1 Rupasree Mary Anne Das Gupta (B. 01/04/1993)

E.5 Margaret Gomes (spinster) (B. 17/12/1923; D. 10/12/2001)

E.6 Scholastica Hilda Gomes (Anu) (B. 15/07/1931; D. 01/08/1993)
Husb. Joseph Starling Crowley (B. 08/04/1922; D. 26/07/2000)
F.1 Catherine Muriel Crowley (Baby) (B. 22/03/1956; D. 26/12/2021)
Husb. Leslie D'Costa (B. 10/11/1944; D. 29/07/2015)
G.1 Sonia D'Costa (Munmun) (B. 25/03/1979)
Husb. Benedict Lucky Gomes (B. 01/12/1976)
G.2 Richardo Joseph D'Costa (Rico) (B. 27/09/1980)
Wife: Faustina Kathleen D'Costa (B. 24/09/1985)
H.1 Starling Leslie D'Costa (B. 02/04/2011)
H.2 Reynaldo Angelo D'Costa (B. 26/05/2015)
G.3 Marcel Lorenzo D'Costa (B. 20/12/1987)
Wife: Tahira Hoque (B. 28/12/1987)
H.1 Aaryan D'costa (B. 11/03/2015)
F.2 Adrian Hillary Crowley (Bobby) (B. 26/12/1959; D. 24/10/2006)
Wife: Philomina Crowley
G.1 Sharon Scholastica Crowley

D.5 Anthony Gomes (Anthony worked as the gram panchayat (village arbitrator), so the house was called 'Panchayat bari', they had a 'kachari ghor')
Wife: Cecelia Gomes (sister of Dr. Francis Gomes, Moktar bari)

E.1 Phulkeria Teresa Gomes
Husb. Gabriel Albert D'Costa (Lovely D'Costar bari, Padrishibpur)
F.1 Michael Wilson D'Costa
Wife: Agnes Gomes

G.1 Jonas D'Costa
G.2 Sanjay Lawrence D'Costa
G.3 Sandhya D'Costa
Husb. Ajay Rozario
G.4 Mollica D'Costa
Husb. Abhijit Kanoongo
F. 2 Eugine Xavier D'Costa
F. 3 Tarun Anthony D'Costa
Wife: Nilima Deepa Kujur
G.1 Nidhi D'Costa
F. 4 Arun Paul D'Costa
F.5 Dorothy D'Costa
Husb. Sunil Peter Chakraverty
G.1 Monica Chakraverty
Husb. Henry Rosario
G.2 Sudhir Patrick Chakraverty
F.6 Mary D'Costa
Husb. Sebastian Gomes
G.1 Regobert Gomes
G.2 Martin Gomes
G.3 Ratna Liliyana Gomes
Husb. Gabriel Rozario
G.4 Konica Bertha Gomes
Husb. Alfred Gain
H.1 Archana Elizabeth Gain
Husb. Rana Pratap Saha
F.7 Elizabeth D'Costa

E.2 Kupertin Gomes

Wife: Margaret Gomes
F.1 Rina Gomes

E.3 Eugene Gomes (bachelor)

E.4 Roman Peter Gomes

Wife: Margaret Gomes
F.1 Francis Xavier Gomes (Raju)
F.2 Rita Gomes (Shipra)
Husb. Lovell Peter Rodrigues

G.1 Janell Joan Rodrigues
Husb. Dominic Arnold
G.2 Karenza Katherine Rodrigues
F.3 Cecelia Magdalene Gomes (Mithu)
Husb. Richard Francis Gomes
G.1 Bernadette Agatha Gomes (Smita)
Husb. Kaushik Roy Chowdhury
H.1 Zephen Roy Chowdury
F.4 Ann Bernadette Gomes (Shilpi)
Husb. Ashish Mukherjee
G.1 Jaanhavi Mukerjee
F.5 Agatha Gomes (Shoma)
Husb. Thomas Mitra
G.1 Justin Joel Mitra
F.6 Mary Jacinta Gomes (Moushumi)
Husb. Lyndon Rodrigues
F.7 Agnes Gomes (Ruma)
Husb. Dominic Pillai

E.5 Benedict Gomes

Wife: Magdelina Hashi Gomes
F.1 Victor Gomes (Khokon)
Wife: Anuradha Sah (Alpana)
G.1 Margaret Nivedita Gomes (Nisha)
Husb. Alen Paul Gomes
H.1 Glenn Xavier Gomes
H.2 Anjalic Hashi Gomes
G.2 Vincent Gomes (Souvik)
F.2 Anjali Gomes
Husb. Partha Dey
G.1 Pranjal Dey
F.3 Swapan Anthony Gomes
Wife: Mary Rozario
F.4 Tapan Peter Gomes
Wife: Archana D'Costa
G.1 Trisha Khushi Gomes
G.2 Arpan Gomes

E.6 Claudine Gomes

Wife: Jita Gomes (Bhokto bari, Padrishibpur)

F.1 Joseph Gomes (Jhantu)

F.2 Mintu Manuel Gomes

Wife: Piu Gomes

G.1 Stephen Deep Gomes

F.3 Paul Pintu Gomes

Wife: Sunita Gomes

G.1 Arick Gomes

G.2 Edwin Gomes

E.7 Irene Martha Gomes (B. 15/04/1927)

F.1 Pearl Veronica Anthony (B. 01/12/1965; M. 06/08/1999)

Husb: Louis Rozario (B. 04/10/1966; M. 06/08/1999)

G.1 Valentine Rozario (Mridongo) (B. 08/05/2000)

G.2 Roland Rozario (Auritro) (B. 15/11/2001)

D.6 Claris Gomes

Husb. Manuel Anthony Gomes (aka Mounya Chraprashi)

E.1 German Gomes

Wife: Catherine Gomes

F.1 Eugene Gomes (B.10/02/1930; D. 29/10/2006)

Wife: Elizabeth Gomes (d/o Erman Gomes) (B. 01/01/1950)

G.1. Oliver Gomes (B. 10/03/1965; D. 15/12/2003)

G.2. Lina Gomes (B.19/10/1969; M. 10/02/1986)

Husb. Patrick Penheiro (B. 17/10/1962; M. 10/02/1986)

H.1. Norin Penheiro (B. 13/12/1986; M. 20/10/2006)

Husb. Samuel Penheiro (B. 25/06/1976)

I.1. Philip Penheiro (B. 02/02/2008)

H.2. Xavier Penheiro (B. 22/05/1992)

H.3. Francis Penheiro (B. 26/09/1996)

G.3. David Gomes (B. 26/09/1971; M. 26/06/2009)

Wife: Daize Rakhi Dutta (B. 02/01/1976)

H.1. Ariana Deshna Rajarshi Gomes (B. 25/12/2014)

G.4. Nothnel Gomes (B. 27/10/1981; M. 24/01/2014)

Wife: Thuinuching Marma (B. 17/09/1988)

H.1. Angelina Alice Gomes (B. 18/10/2016)

F.2 Mary Gomes
F.3 Olivia Gomes
F.4 Wilson Gomes (B.29/05/1938; D. 03/02/2021)
Wife: Petrolina (d/o Avelyn Gomes) (B07/11/1951, M. 04/05/1968)
G.1 Champa Maria Gorety Gomes (B 30/09/1969; M. 05/01/1990)
Husb. Robert Ranjan Gomes (B.04/05/1967; M.05/01/1990)
H.1 Shirley Gomes (B.17/03/1992; M. 27/08/2021)
Husb. David Singh (B. 27/01/1991)
H.2 Seavers Sanju Gomes (B. 11/08/1993; M. 20/10/2023)
Wife: Shatabdi Lourdmary Gomes (B.14/05/2000)
G.2 James Gomes (B.05/12/1971; M. 18/02/2000)
Wife: Eva Rozario (16/02/1976)
H.1 Oscar Orka Gomes (B. 26/07/2004)
H.2 Jerome Troy Gomes (B. 10/01/2007)
G.3 Anna Papri Gomes (B. 23/11/1974; M. 21/10/1993; D. 01/02/2001)
Husd. John LitonHalder
H.1. Sharen Valentin Halder (B. 07/02/1995)
F.5 Gilbert Gomes
F.6 Peter Gomes (Petu)
G.1. Manik Gomes (B.07/10/1981)
Wife: Nally Gomes
G.2. Ratan Gomes (B. 21/09/1987; M. 26/12/2017)
Wife: Rumi Bala (B. 31/03/1997)
H.1. Rajon Peter Gomes (B. 02/10/2021)

C.2 Paul Gomes (Santa Maria's Chacha - Uncle)

D.1 Gregory Gomes (aka Gregory Master) (Santa Maria's chachato bhai)

Wife: Teresa Gomes

E.1 Kalyani Gomes

Husb. Benjamin Rozario
F.1 Pradip Rozario
F.2 Rani Rozario
F.3 Nilu Rozario
F.4 Golapi Rozario
F.5 Johon Rozario
E.2 Lucy Gomes
Husb. Eric Gomes (Sr. Lilian's brother)

F. 1 Lily Gomes

F.2 Champa Gomes

F.3 Nipu Gomes

F.4 Chandra Gomes

F.5 Buny Gomes

F.6 Mithu Gomes

E.3 Augustine Gomes (B. 24/08/1954; M. 22/02/1982)

Wife: Nilu Helena Gomes (d/o Boniface Gomes) (B. 24/12/1960; M. 22/02/1982; D. 28/02/2021)

F.1 Ratan Gomes (B. 05/01/1984; M. 03/01/2005)

Wife: Jenny Gomes (d/o John Gomes) (B. 14/12/1981; M. 03/01/2005)

G.1 Andrew Kishore Gomes (B. 10/07/2009)

G.2 Prionti Gomes (B. 11/07/2011)

F.2 Dulal Gregory Gomes (B. 19/12/1985; M. 16/11/2017)

Wife: Teresa Tithi Boiragi (d/o Topon Boiragi, Kotalipara, Gopalganj) (B. 12/10/1996; M. 16/11/2017)

G.1 Paul Prince Gomes (B. 05/05/2020)

G.2 Abraham Alex Gomes (B. 05/01/2023)

F.3 Shukla Gomes (B. 03/02/1990; M. 04/04/2011)

Husb. Pradip Gomes (B. 15/08/1981; M. 04/04/2011)

G.1 Prema Gomes (B. 15/06/2012)

G.2 Priya Gomes (B. 13/07/2018)

E.4 Kiron Gomes, Husb. Delo Gomes

F. 1 Kobi Gomes, 2. Robi Gomes, 3 Roni Gomes, 4 Sani Gomes, 5 Ripa Gomes

অষ্টম অধ্যায়: দেশান্তরকাঠি বংশ তালিকা (নির্মলা গোমেজ)

A. Jhuru Gomes

B.1. Bitu Gomes

C.1. Babu Gomes

D.1. Manuel Gomes

E.1. Eugene Gomes

E.2. Regin Gomes

E.3. Robin Gomes

E.4. Benjamin

E. 5. Gomes

D.2. Joseph Gomes

E.1. John Gomes

E.2. Mathew Gomes

E.3. Andrio Gomes

E.4. Alvaris Gomes

D.3. Francis Gomes

E.1. Picard Gomes

C.2. Chabu Gomes

D.1. Tonu Gomes

E.1. Albin Gomes

E.2. Marcel Gomes

D.2. Peter Gomes

E.1. Maglin Gomes

E.2. Medin Gomes

E.3. Martin Gomes

C.3. Baptista Gomes

D.1. Justin Gomes

E.1. Gastin Gomes (Kolkata)

E.2. Khokon Gomes (Kolkata)

E.3. Fr. Anil Gomes (Kolkata)

E.4. Ashim Gomes (Kolkata)

D.2. Benedict Gomes

E.1. Simon Gomes

D.3. Bernard Gomes

E.1. Subho Gomes (Kolkata)

E.2. Roton Gomes (Kolkata)

E.3. Babu Gomes (Kolkata)

D.4. German Gomes

B.2. John Gomes

C.1. Michael Gomes (Michael Shaheb) Shaheb Bongsho starts - Zamindar who donated land

D.1. Estro Shaheb

D.2. London

D.3. Leo Shaheb

D.4. London

D.5. Georgi Shaheb - London

B.3. William Gomes

C.1. Anthony Gomes

D.1. Paul Gomes

E.1. Sentu Gomes

E.2. Jhantu Gomes

E.3. Pintu Gomes

E.4. Mintu Gomes

C.2. Robert Gomes

D.1. Daughter (died)

পরিশিষ্ট – ৩ ঃ গ্রন্থপঞ্জি – BIGLIOGRAPHY
Cardinal Patrick D'Rozario, csc.

1. BEVERIDGE, H.B.C.S, The District of Bakerganj: Its History and Statistics, London Trumer & Com., 1876. Reprint by Bakerganj District Council, Habib Press & Publications, 88 Sadar Road, Barisal, 1970

2. J.J. A Campos, History of the Portuguese in Bengal, First Published Calcultta 1919, Asian Educational Services Reprint: New Delhi 1998.

৩. "বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস", সম্পাদক: তপংকর চক্রবর্তী ও সিকদার আবুল বাসার, আনন্দধারা, ২০০৪ খ্রি. ঢাকা। এই গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য তিনটি বইয়ের পুনর্মুদ্রণ। এখানে আছে: "বাকলা" - রোহিনীকুমার সেন; "বরিশালের বিবরণ" – ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত; "বাকরগঞ্জের ইতিহাস" – খোসালচন্দ্র রায়; "চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস" – বৃন্দাবনচন্দ্র পূততুণ্ড।

4. Bishop Alfred Le Pailleur, csc, Bishop of Chittagong, Religieuses Missionaires dan Le Diocese de Dacca et Chittagong, 22nd October, 1941. (Manuscript)

5. Bishop Alfred Le Pailleur, the first, Le District de Chittagong et Notre Mission Catholique, vol 1, and Le Diocese de Chittagong au Bengale, Vol II, Manuscript, Written in 1943.

6. Bp. Alfred LePailleur, csc., Le District de Backerganj et Nos Mission, Manuscript, 1941

7. CHITTTAGONG LETTER, Mimeographed Document, Printed from Bishop's House, from 1958-1968. Edited by Mr. Edward McInerney (former DM, an Englishman) and Mr. Anselmo Moreino

8. Archives of Chittagong District, Holy Cross Fathers, Moreau House, Rampura

9. ORIENT, French Periodical 1941- 1978; Archives Moreau House, Rampura

10. Archives of Padrishibpur Parish Office
    Book of Chronicles from 1963-1974; Chronicles of 1991-1997; Register Books: Baptism Registers, Marriage Registers, Confirmation Registers, Funeral Registers. Some Historical Notes

11. Bp. Patrick D'Rozario, Early Years of Church in Chittagong (1517-1927), Fr. Pierre Benoit, The Diocese of Chittagong (1970-2000) Chittagong Diocese 2000: Souvenir.

12. Bro. Alberic Houle, csc, The Sampan of Hope: Life of Brother Flavian Laplante, csc. Dhaka 27th May 2005.

13. Bro. Alberic House, csc, History of Diocese of Chittagong (1927-2003): 150 Years of Holy Cross in East Bengal (1853-2003), Dhaka, 27th March, 2005

14. Cardinal Patrick D'Rozario, খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড, প্রেক্ষিত: ১ম খণ্ড: রাজশাহী ও চট্টগ্রাম, ২য় খন্ড: ঢাকা আর্চডাইয়োসিস, কার্ডিনাল-পরম্পরা, ২০২১ খ্রি.

15. Catholic Bishops' Conference of Bangladesh (CBCB) Catholic Directory: Year 1973, Year 1986, Year 2023.

16. ফাদার যোসেফ এম জীবন গোমেজ, ধর্মীয় পালাগান: মৃত্যুঞ্জয়ী যিশু (রামুর পালা), পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান ডেভলেপমেন্ট কমিটি, ঢাকা, ১৯৯৩ খ্রি.

17. পাদ্রীশিবপুর শ্রীমন্ত তটে – ১৯৮০ খ্রি.

18. পাদ্রীশিবপুর শ্রীমন্ত তটে – ২০০০ খ্রি.

19. পাদ্রীশিবপুর শ্রীমন্ত তটে – ২০০৩ খি

20. পাদ্রীশিবপুর শ্রীমন্ত তটে – ২০০৪ খ্রি. PCWA, Dhaka.

21. পাদ্রীশিবপুর শ্রীমন্ত তটে – ২০১৪ স্মরণিকা: PCWA-এর সুবর্ণ জয়ন্তী

22. পাদ্রীশিবপুর শ্রীমন্ত তটে – ২০১৫ স্মরণিকা PCWA, Dhaka.

23. পাদ্রীশিবপুর শ্রিমন্ত-তটে - ২০১৬ খ্রি. নব-নিযুক্ত কার্ডিনালের প্রতি নিবেদিত।

24. পাদ্রীশিবপুর শ্রিমন্ত-তটে - ২০২৩ খ্রি. পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, ঢাকা

25. উদয় – ২০১৬ খ্রি., পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান যুব সংঘ, ঢাকা, মনিপুরিপাড়া, ঢাকা, ৮ই ডিসেম্বর

26. পথপ্রদর্শিকা কুমারী মারীয়ার গির্জা, স্মরণিকা, জুবিলী স্মরণিকা, ২০১৬ খি.

27. সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুল এবং কলেজ: অফিস ও সংরক্ষণাগার
    * রজত জয়ন্তী: জানুয়ারি – ১৯৩৩ – ডিসেম্বর ১৯৫৮ খ্রি.
    * সুবর্ণ জয়ন্তী – স্মরণিকা : ১৯৩৩ – ১৯৮৩ খ্রি.
    * প্লাটিনাম জুবিলী: গৌরবময় ৭৫ বছর : ১৯৩৩ – ২০০৮ খ্রি.
    * স্মরণিকা – গৌরবময় আট দশক : ১৯৩৩ – ২০১২ খ্রি.
    * স্মরণিকা – গৌরবময় নয় দশক : ১৯৩৩ – ২০২২ খ্রি.
    * স্মরণিকা – পুরনো ফাইল পত্র থেকে নেয়া কিছু ছেরা পাতা।

28. ফাদার ফিলিপ ডি'রোজারিও-র যাজকীয় জীবনের সুবর্ণ জয়ন্তী –স্মরণিকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, বরিশাল কাথলিক ডাইওসিস, বরিশাল

29. নবযাত্রা - স্মরণিকা: মাটিভাঙ্গা শান্তির রানী ক্যাথলিক ধর্মপল্লী, ১৬ মে, ২০২১ খ্রি. মাটিভাঙ্গাকে নতুন ধর্মপল্লী প্রতিষ্ঠার স্মরণিকা

30. স্মরণিকা – চট্টগ্রামকে আর্চডাইয়োসিকে উন্নতিকরণ, সেপ্টেম্বর ৮, ২০১৭ খ্রি.

31. স্মরণিকা – বিশপীয় অভিষেক, বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও, ১৯ আগস্ট, ২০২২ খ্রি.

32. Reminiscence of 1972, by Fr. Germain Grandmaison, csc, Parish Priest of Padrishibpur, 2022.

33. যোসেফ ডি'রোজারিও, কার্ডিনালের জীবন-চরিত, কার্ডিনাল পরম্পরা, জানুয়ারী ৮, ২০২২ খ্রি.

34. দখলদারদের কবলে শ্রীমন্ত নদী, নিজস্ব সংবাদদাতা, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল, দৈনিক জনকণ্ঠ. ২৫ নভেম্বর ২০২৩ খ্রি.

35. শংকর লাল দাশ, শেরে বাংলা – জীবনানন্দের বরিশাল, গলাচিপা, পটুয়াখালী, দৈনিক জনকণ্ঠ. ২৪ নভেম্বর ২০২৩ খ্রি.

36. ড. ডেনিস দিলীপ দত্ত, আমি ও আমার সময়, প্রকাশক: অর্ণিতা দত্ত আফজাল-লিলি, ডিসেম্বর ২০১৭

37. রাইট রেভা; হেমেন হালদার, হৃদয়ে চার্চ অব বাংলাদেশ, ঢাকা, মার্চ ১, ২০২৪ খ্রি.

38. মিথুশিলাক মুরমু, বরিশালের লাল গির্জা এবং খ্রিস্টিয়ানদের গোড়াপত্তন, বিডি. খ্রিস্টান নিউজ, জুলাই ২৫, ২০২৪।

39. Martin Gomes ex. Asst. Secretary, Indian Christian Association, Bengal. The Shield, April 3, 1976.

40. The Roman Catholic Archdiocese of Calcutta, Directory 2022. Calcutta, India

41. Catholic Diocese of Baruipur, Directory 2021. Baruipur, Calcutta – 700144

42. Government Information: Bakarganj Upazila (one out of 9 Upazila/Sadar)

43. Government Information: Padrishibpur Union (One out of 14 Unions)

44. Government Information: Padrishibpur Village (One of Total 10 Villages) https://padreeshibpurup.barisal.gov.bd/bn/site/page/m2un-https://www.google.com/search?q=bakerganj+upazila+padrishibpur+union&oq=&aqs=chrome.0.35i39i362l8.31974752j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

45. গ্রন্থ-সম্পাদনা কমিটির তথ্যসংগ্রহ ২০২৩-২০২৪ খ্রি.: জরিপ, এফ.জি.ডি আলোচনার ফলাফল, সাক্ষাৎকার ও তথ্য সংগ্রহ

OTHER SOURCES: INTERVIEWS, INFORMATION, SURVEY OPINIONS AND FGD QUESTIONS AND GROUP DISCUSSIONS.

1. Information Gathering: Population Survey and Focus Group Discussions (FGD) in Padrishibpur with representatives of the Parish, 15th September, 2023.
2. Information Gathering: Population Survey and Focus Group Discussions (FGD) with Padrishibpur people in India, 27 Aug-September 3, 2023 and December 28, 2023 and Visit to Murgihata and Boithankkhana and other places in Calcutta on January 1-2, 2024
3. Dr. Mary Monica Gomes, External Migration of the Padrishibpurians in Canada and USA. Toronto, Canada, August 2024
4. Information Gathering: Mr. Jermen Torun Gomes, Doha, Sources made available.
5. Information Gathering: Population Survey and Focus Group Discussions (FGD) from the representatives of Padrishibpur people living in Dhaka on 25th November, 2023, 12/17th July, 2024.
6. Information Gathering: Population Survey and Focus Group Discussions (FGD) from the representatives of Padrishibpur people living in Chittagong on December 1, 2023.
7. Interviews in Padrishibpur: April 1-8, 2024
    - Mr. German Tarun Gomes, Presently in Doha, Qatar.
    - Mr. Lazarus Foku Gomes, Rajabaria (Interview, 2nd April, 2024
    - Ms. Margaret Shikha Sarker (Interview, 2nd April, 2024)
    - Mrs. Dipti Gomes and Uttam James Gomes, and Arimohon Gomes, Matibhanga (Interview 2nd April, 2024)
    - Group Inter-action (4th April): Fr. Lazarus Kanu Gomes, Fr. Jerome Rinku Gomes, Sr. Aroti D'Costa, LHC. Fr. Lawrence Borun Gomes, Cardinal Patrick D'Rozario, csc.
    - Miss. Nirmola Gomes, Catechist of Deshantorkathi, Interview on 5th April, 2024

Time Frames for the Publication of শ্রীমন্ত-বাটে পাদ্রীশিবপুর : ঐতিহ্যবাহী একটি খ্রিস্টান জনপদ

1. July-August, 2023 initial planning
2. July – December: Collecting of Written/Printed Sources; consultation of Archives, etc.

3. July- December, 2023: Data Collection through Survey Forms and FGD Questions through workshops in Padrishibpur (including Sub-Centers), Calcutta, Chittagong, Dhaka, Abroad.
4. January – February, 2024: Verification of collected information.
5. March – April, 2024: Analysis of Information, Selecting and Planning the Contents of the Book
6. May-August, 2024: Composition and Writings of the Book by Three Writers.
7. September, 2024: Scrutinizing the contents of the Books by a Team of Readers.
8. October-November, 2024: Manuscripts to the Press, Proof Reading and Printing
9. December 26-31, 2024: Launching of the Book on the 260th Anniversary of Padrishibpur Parish.
10. January-February 2025: Putting in Webpage and other Social Media.

BRIEF PRESENTATIONS OF THE AUTHORS



Cardinal Patrick D'Rozario, csc, Archbishop Emeritus of Dhaka Archdiocese, hails from Padrishibpur. He was born on 1st October, 1943, brought up and educated in the "Parish of Our Lady of Guidance" in Padrishibpur. He did his I.A. and B.A. from Notre Dame College, Dhaka and B.A in Philosphy and B.Th in Theology from Christ the King Seminary, Karachi. After his Priestly Ordination on 8th January, 1972, Fr. Patrick went to the University of Leuven, Belgium and received STL Degree and did STD studies.

From 1976-1990 Fr. Patrick taught Moral Theology in the Post-Graduate Philosophical and Theological Institute, Holy Spirit Major Seminary, Banani, Dhaka. He was consecrated as Bishop on 12th September, 1990. He did his Episcopal Ministry as Bishop of Rajshahi (1990-1995), Bishop of Chittagong (1995-2010) and as Archbishop of Dhaka (2011-2020). On 19th November, 2016 Archbishop Patrick D'Rozario, csc, was installed as Cardinal by Pope Francis.

Besides the work of a Bishop, teaching, lecturing and writing have been Cardinal's main pre-occupations. In addition to his regular writings in periodicals Cardinal has already 18 publications.



Joseph D'Rozario was born in Padrishibpur on 4th March, 1957. After doing his primary education in Padrishibpur Joseph joined the Little Flower Seminary and passed his SSC from Holy Cross High School in Bandura. He studied I.A. from Khulna Majid Memorial City College and completed his B.A. in 1980 from Dhaka University.

From high school days he has been interested in writings, and contributing in different periodicals as regular columnist. In his professional life, he has been a teacher for 30 years or so and worked in the NGO called The Metropolitan Christian Housing Society, Ltd. where he ws responsible for editing its regular magazine called "Neer". His first book published was "JIBON CHARIT of Cardinal Patrick D'Rozario, csc", in 2022.

Joseph is married with Marylin Mira Gomes. They have three Children, two are in Australia and one daughter is working as Accountant in Caritas Bangladesh.



Dr. Mary Monica Gomes, with her roots in Padrishipur, was born in Dhaka on 10th April 1951 and raised and educated there. She completed her B.A (Hons) and M.A. in Psychology from the University of Dhaka in 1975, and did her doctoral study at the University of Massachusetts, Amherst, USA where she earned her Doctor of Education (Ed.D) in May 2007.

Dr. Monica Gomes has over 30 years of experience in education, development, gender and human rights. She worked in CARE Bangladesh in the field of non-formal education, participatory community development and women and girls' education, and served as Project Coordinator, Gender Advisor and Sector Coordinator-Education from 1996 to 2002.

As an academic specialist, she worked at the Institute of Educational Development, BRAC University as Professor and Coordinator of the Master of Education (MEd) program from 2007 to 2015, and as an Advisor and Consultant in their faculty development programme from 2019 to 2021.